শংকর

ভ্রমণ সমগ্র

২

শংকর
ভ্রমণ সমগ্র
দ্বিতীয় খণ্ড

শংকর
ভ্রমণ সমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সাহিত্যম্ ॥ কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

লেখকের নিবেদন

নতুন লেখার সংযোজনে আকার বেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অখণ্ড ভ্রমণ সংগ্রহকে দ্বিখণ্ডিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

যৌবনকালে যে আমাকে প্রথম বিদেশে পাঠাবার উদ্যোগ নিয়েছিল সেই সুপ্রিয় বনার্জি বেশ কয়েকবছর আগে কারও অনুমতি না নিয়ে সেই-ভ্রমণে বেরিয়েছে যেখান থেকে ফেরার কোনো তাগিদ থাকে না। নবকলেবরে নতুন এই সংগ্রহটি সুপ্রিয়র হাতে তুলে দিতে পারলে মন্দ হতো না, কিন্তু তা যখন সম্ভব নয় তখন চুপি-চুপি বলি, সুপ্রিয়, তুমি যেখানেই থাকো এই সংগ্রহের প্রথম কপিটি তোমারই জন্যে।

শংকর

সূচি

দ্বিতীয় খণ্ড

জানা দেশ অজানা কথা

ভ্রমণকাল
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

রচনাকাল
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রথম সাহিত্যম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৮৮

উৎসর্গ
ক্লিভল্যান্ড ওহায়োতে
ষষ্ঠ নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্সের
সংযুক্ত সভাপতি
শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশি ও
শ্রীরণজিৎ দত্ত-কে—
যাঁদের সাদর আমন্ত্রণে
১৯৮৬ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে
আমার পক্ষে মার্কিন দেশ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল।
সেই সঙ্গে
শ্রীনীলাদ্রি চাকী-কে—
যে আমাকে প্রায় জোর করে
মার্কিন দেশ থেকে কানাডায় নিয়ে গিয়েছিল।
এবং অবশ্যই
শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-কে
'দেশত্যাগী হও' এই অভিশাপ দিয়ে
যে আমাকে আবার দেশ-ছাড়া করেছিল।

লেখকের নিবেদন

দেশ ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে এবারও অসংখ্য মানুষের অকৃপণ সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকেই জানা দেশের অজানা কথা লেখা সম্ভব হলো।

রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশকালে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাভাবে উৎসাহ ও উপকরণ জুগিয়েছেন। তাঁদের সকলকে নমস্কার।

শংকর

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৮

সম্প্রতিকালে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী বাঙালির নাম কী? এ-বিষয়ে আমার মনে যত জিজ্ঞাসা ছিল তার অবসান ঘটলো আচমকা নিউ ইয়র্কে ইউনাইটেড নেশনস ভবনে এসে।

না, তিনি কলকাতার লোক নন, যদিও কলেজ স্ট্রীটের চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে এক-আধবার বই কিনতে এসেছেন। আমাদের বইপাড়া তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়ী নগরীতে যিনি পরম সম্মানের সঙ্গে তাঁর প্রিয় সাধনায় নিমগ্ন রয়েছেন সেই মানুষটির সঙ্গে এই উপমহাদেশের বৃহত্তম জনপদের প্রায় কোনোরকম যোগাযোগ নেই বলতে একটু সংকোচ বোধ করছি। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন খাস কলকাতা শহরে। বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ আন্দোলনের হোতা প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত ওরফে অভয়চরণ দে জন্মেছিলেন কলকাতার শহরতলিতে। বিরাট এক নগরীতে গড়ে-ওঠার মানসিকতা নিয়েই ভারতবর্ষের জন্যে পশ্চিমের সিংহদ্বার খুলতে তাঁরা সাগরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং অভাবনীয় সাফল্যও অর্জন করেছিলেন।

এবার অবশেষে নিউ ইয়র্কে আমি যাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম তাঁর জন্ম চট্টগ্রাম বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামের নামটা জানা হয়নি, কারণ এই ধরনের মানুষ নিজের অতীত সম্পর্কে বিশেষ কথা বলতে অনাগ্রহী। কিন্তু নদীর নাম জানা হয়ে গিয়েছে—কর্ণফুলী। এই নদীই দীর্ঘ দ্বাদশ বছর ধরে একটি দুরন্ত বালকের সংখ্যাহীন খেয়ালিপনার অংশীদার ছিল। সেই নদীর প্রাণশক্তিই এই ১৯৮৬-তে প্রাণবন্ত রয়েছে পঞ্চান্ন বছরের বিনয়ী মানুষটির মধ্যে, যিনি এখনও পাতলা টেরিকটনের শাদা পাঞ্জাবি, শাদা প্যান্ট এবং পাম্পশু পরে আমাদের প্রজন্মের টিপিক্যাল বাঙালির ভাবমূর্তি বিদেশে অক্ষত রেখেছেন। আর এমন সব অসম্ভব কাজ করে চলেছেন যার স্বীকৃতি রয়েছে জানা অজানা নানা দেশের কীর্তিমান নরনারীর সশ্রদ্ধ নমস্কারে।

অথচ কী আশ্চর্য, আমাদের এই দেশে শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের নাম প্রায় অজানা বললেই হয়। প্রায় বিশ বছর বাদে সাতদিনের নোটিশে আবার মার্কিন দেশে পুনঃভ্রমণের সুযোগ যখন এলো তখনই ঠিক করেছিলাম এবার এমন কিছু মানুষের সন্ধান করবো যাঁরা নিজেদের প্রতিভায় ও সাধনায় বিদেশে মানুষের সম্মানের আসনটি সংগ্রহ করেছেন।

যাবার আগেই আনন্দবাজার অফিসের উদ্যোগী সম্পাদকের ঘরে বসে কিছু নামধাম সংগ্রহ হলো। কেউ বললেন—অমুকবাবু জীব-বিজ্ঞানে বিদেশে খুব নাম করেছেন, অমুক এখন অর্থনীতিতে প্রায় এক নম্বর, অমুকবাবু এমন এক সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করে ব্যবসায় নেমেছেন যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। খুব ভাল লেগেছিল এই তালিকা সংগ্রহ করতে। আরও ভাল লেগেছিল সেই তালিকার মধ্যে কয়েকজন বোস, চক্রবর্তী, সেন, গুপ্ত ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে। কিন্তু অস্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই তালিকার তলার দিকেও কোনো ঘোষের উল্লেখ ছিল না।

আমার এই হঠাৎ দ্বিতীয়বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ভিতরের কাহিনীটা যথাসময়ে সবিস্তারে পাঠকের কাছে নিবেদন করতে হবে, কারণ স্বদেশ অথবা বিদেশ কোনো ভ্রমণই যে আমার ধাতে সয় না তা অনেকেরই অজানা নয়। আমি হচ্ছি সেই ধাতের ঘরকুনো যে শুতে পেলে বসতে চায় না, বসতে পেলে দাঁড়াতে চায় না, দাঁড়াতে পেলে যার হাঁটার কথাই ওঠে না। যে নামহীন মনীষী বহু বছর আগে বাঙালির কানে-কানে অঋণী, অপ্রবাসী হয়ে ঘরের দুধ-ভাত খেয়ে নিজের চেনা পল্লী-বটছায়ায় জীবনযাপনের মহামূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই আমার নমস্য। সেই দূরদর্শী পুরুষও আমার শ্রদ্ধাভাজন যিনি হুজুগে বাঙালীকে হুঁশিয়ার করেছিলেন—ঘরের খাও, কিন্তু বনের মোষ তাড়িও না। রক্তের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার নেশা চাগাড় দিলে যত খুশি ভ্রমণ সাহিত্য পড়ো, তাতে মন না-ভরলে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের গ্রাহক হও, কিন্তু কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এবং বুক পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে কিছুতেই বিদেশ-বিভুঁইয়ে রওনা দিও না।

ট্র্যাভেল এজেন্সির বড় মেমসায়েব, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে তামা-তুলসী স্পর্শ করে স্বীকারোক্তি করতে বলুন, তাঁরাও চুপি চুপি মেনে নেবেন, নিজের ঘরের কোণের মতন জায়গা বিশ্বভুবনে নেই—নাথিং লাইক হোম। নাথিং লাইক নিজের চৌকি সে যতই নড়বড়ে হোক!

এই সব অকাট্য যুক্তির পরেও যদি জাম্বোজেটের বিমানবালাদের মোহিনী হাসি রঙিন ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন-পাতা থেকে বেরিয়ে এসে কাউকে নীতিভ্রষ্ট হবার অবকাশ দেয়, তাহলে অগতির গতি রবি ঠাকুরের শরণ নিতে হবে। তিনিও অতি চমৎকার ভাষায় অযথা বহুদেশ ঘুরে ঘরের কাছে শিশিরবিন্দুকে অবহেলা না-করার স্ট্রং অ্যাডভাইস দিয়েছেন।

আমাদের ঘরকুনো সোসাইটি এখনও রেজিস্ট্রিকৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কিন্তু আমরা কয়েকজন সমভাবাপন্ন বঙ্গপুঙ্গব প্রায়ই জনসাধারণকে বলে আসছি, যদি কিছু দেখতেই হয় ঘরের কাছে কলকাতা দেখুন। এক নয়, পর পর

সেভেন জেনারেশন ধরে এ-শহরের লীলাখেলা অবলোকন করলেও সিকিভাগ দেখা হবে না। জেনুইন বাঙালি হয়ে জন্মে আপনার কিসের দুঃখ যে আচমকা বিবাগী সেজে বিদেশে যাবেন?

শুনুন, বিদেশ যাবার হাজার হাঙ্গামা। পাসপোর্ট অফিসে সিভিলিয়ান ড্রেসে চোরাগোপ্তা পুলিশ সব বসে আছেন। তাঁদের চাপা হুঙ্কার—তুমি কে বট হে? সুখে থাকতে কেন বিদেশে যাবার ভূত তোমায় কিলোচ্ছে? তাঁরা গোপনে-গোপনে মোটা মোটা খাতাপত্তর মেলাবেন—কবে আপনি কি গর্হিত কম্মো করেছেন। কোন্ অভিযোগে স্বনামে অথবা বেনামে আপনি জেল হাজতে বসবাস করেছেন? আপনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা ঝুলছে কিনা? রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন্ কোন অপকর্মের সঙ্গে আপনার প্রকাশ্য অথবা গোপনে যোগসাজশ হয়েছে? কিংবা কিঞ্চিৎ বিদেশি মুদ্রার লোভে আপনি দেশের শত্রুদের সঙ্গে সিক্রেট যোগাযোগ রেখে ভারতমাতাকে আবার গভীর গাড্ডায় ফেলবার তালে আছেন কি না? ছা-পোষা লোক হিসেবে কফি-পোষার খপ্পরে পড়বার চান্স আছে কিনা তা-ও বাজিয়ে দেখা হবে—অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রায় বিদেশি বাণিজ্যে টু-পাইস করে আপনি গরীব ভারতমাতাকে কাঁচকলা ঠেকাচ্ছেন কিনা তা-ও অতি সাবধানে বিচার-বিবেচনা করা হবে।

সাব-ইনেসপেক্টর বাবুর দরবারে এই সব প্রশ্নের আশানুরূপ সমাধান হলেও আপনার হাঙ্গামা শেষ হচ্ছে না। বিদেশ থেকে যদি আপনাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয় তাহলে আপনাকে জননী-জন্মভূমির নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার খরচাপাতি কিভাবে মেটানো হবে তার আগাম হিসেবও আপনাকে দাখিল করতে হবে।

নিজের দেশে জন্মে একই চৌহদ্দির মধ্যে সারাজীবন চরে বেড়ানোর একটা মস্ত সুবিধে, কারও পিতৃদেবের সাহস হবে না আপনাকে এই সব আজেবাজে প্রশ্ন করে ঘাঁটাবার।

স্বদেশের মাটিতে দিশিভায়ের খোঁচামারা কোশ্চেন তবু তো সহ্য হয়! কিন্তু অজানা দেশের এয়ারপোর্টে পাশপোর্ট ও ভিসা থাকা সত্ত্বেও ভিনদেশের ইমিগ্রেশন-রমণী আপনার দিকে বরফ-ঠাণ্ডা চোখে এমনভাবে দৃষ্টি হানবেন যেন আপনি কোনো মহা অপকর্ম করবার জন্যেই নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশের দাওয়ায় হাজির হয়েছেন।

মিষ্টি-মিষ্টি কণ্ঠে হাড়জ্বালানো প্রশ্ন : কেন আসা হয়েছে? কী কী কাজে এখন মন দেওয়া হবে? পরের দেশে ঢুকে পড়ে পাকাপাকি গেঁড়ে বসবার কোনো কুমতলব নেই তো? টক-ঝাল প্রশ্ন শুরু হলে আর থামতে চাইবে না।

ইমিগ্রেশন-দিদিমণিকে আপনি হয়তো অনেক কষ্টে সন্তুষ্ট করলেন। কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই। তিনি কমপিউটারের সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলে আপনাকে আর-এক কদম এগোতে দিলেন। অমনি ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার—অর্থাৎ আপনি কাস্টমসের খপ্পরে পড়লেন।

কাস্টমস বলতে ছোটবেলায় ইংরিজীতে পড়েছিলাম আচার-ব্যবহার—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইউনিফর্ম-পরা একদল সন্দেহবাজ লোক, যাঁদের ধারণা আপনি স্পেশাল কায়দাকানুন করে গাঁজা-সিদ্ধি-চরস অথবা সোনা-রুপোর বাট নিয়ে নিরীহ একটি দেশের নৈতিক চরিত্র এবং অর্থনীতি ডোবাতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিন্তু সদাসতর্ক 'কাস্টমসদা' তা কিছুতেই হতে দেবেন না।

এ ছাড়াও তৃতীয় এক ভাবনা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভ্রমণ-হাঙ্গামায়। বেশ, আপনি পরের দেশে ঘরজামাই থাকতে কিংবা গাঁজা বেচতে আসেননি ভাল কথা, কিন্তু আপনি যে বিমান অথবা বিমানবন্দর বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার প্যাঁচপয়জার কষছেন না তার গ্যারান্টি কোথায়?

আপনি বলবেন, রাইস ইটিং ভেতো বাঙালি আমি। মুখের ভাব দেখে মানুষ চিনলেন না, এতোদিন আরক্ষা লাইনে থেকেও। তাহলে শুনবেন, তথাকথিত নিরীহ, ফ্রায়েড ফিশ যারা উল্টে খেতে পারে মনে হচ্ছে না, তাদের মাসসুতো ভাইরাই মহাশূন্যে বিরাট-বিরাট প্লেন হাইজ্যাক করেছে। চান্স পেয়ে পাঁচ টাকার চোর কোটি-কোটি ডলার পণ দাবি করেছে। আগে বাঙালি পুত্রের ভাগ্যবান বাপই মেয়ের বাপের কাছ থেকে বরপণ দাবি করতো। এখন মওকা পেলেই দুনিয়ার যে-কোনো লোক মুক্তিপণ চেয়ে বসে। অথচ পণপ্রথার কালিমা কেবলমাত্র ইন্ডিয়ান জাতের ওপরেই থেকে গেলো!

যাই হোক, এই সব দুঃখেই কুড়ি বছর আগে পাওয়া নিজের পাশপোর্টকে চিরকালের জন্যে অকেজো করে মনের সুখে গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছিলাম। কিন্তু কপালে দুঃখ লেখা ছিল, কুড়ি বছরের পুরনো বিষ আবার শরীরে ফুটে বেরুলো, আমি পাকেচক্রে সাতদিনের নোটিশে আবার আমেরিকায় হাজির হলাম।

কোথায় কী অঘটন ঘটলো? কে যাতায়াতের ব্যবস্থা করলো? ইমিগ্রেশন রমণী আমাকে কিভাবে একাধিকবার হাতের লেখা প্রাকটিশ করতে বললেন, জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখে আমার দিশেহারা অবস্থার কী পরিণতি ঘটলো এবং কিভাবে হাতে-বাঁধা তাবিজের কল্যাণে সব বাধাবিপত্তি ডোন্টকেয়ার করে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ড শহরে ধুতি-চাদর পরা প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের খপ্পরে পড়লাম সে-সব সংবাদ যথাসময়ে নিবেদন করা যাবে। আপাতত ধরে নিন আমি নিউ ইয়র্কে।

আমি আছি ম্যানহাটান দ্বীপপুঞ্জে ইউ-এন বিলডিংসের খুব কাছে। যিনি আমাকে পরমানন্দে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, বয়সে তরুণ হলেও তিনি এক কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি—ইউ-এন অফিসের তাবড়-তাবড় স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁকে কথায়-কথায় হিজ এক্সেলেন্সি বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। নাম জনাব আনোয়ার উল-করিম চৌধুরী, আমাদের জয়। ইউ-এন-ও-তে বাংলাদেশ সরকারের দু'নম্বর স্থায়ী প্রতিনিধি। এক নম্বর পদ খালি, সুতরাং অস্থায়ী হেড অফ দ্য মিশন।

এতো সায়েবসুবো টেলিফোনে এবং সামনাসামনি আমার স্নেহভাজন এই বঙ্গসন্তানটিকে 'ইওর এক্সেলেন্সি' বলছে শুনে কান জুড়িয়ে গেলো। মনে হলো বঙ্গজনম সার্থক হলো। জিন্দা রহো বাংলাদেশ! জয় বাংলা বলতে লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সম্প্রতি-ছড়ানো চোখের রোগটির ডাকনাম স্মরণ করে চুপচাপ থাকাই প্রশস্ত মনে হলো।

ম্যানহাটানে আনোয়ারের বাড়িতে বসেই বিদেশে বিখ্যাত বাঙালিদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সম্পাদক অভীক সরকার নিজের ঠাণ্ডাঘরে বসিয়ে পই-পই করে বলে দিয়েছেন, নতুন-নতুন জিনিস দেখে আসতে হবে। "মনে রাখবেন, সাতষট্টি সালের বিদেশ-ভ্রমণ থেকে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' লিখে খালি মাঠে গোল করেছিলেন। এখন আমেরিকা সবার অত্যন্ত জানা দেশ, ওদেশ সম্বন্ধে যত লেখার বিষয় ছিল তা এই ক'বছরে প্রায় সব লেখা হয়ে গিয়েছে—সুতরাং অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে অজানা দৃষ্টিকোণ খুঁজে বার করতে হবে।"

সম্পাদকের এই সাবধানবাণী বিদেশে আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে, কিছুই প্রাণভরে উপভোগ করতে পারছি না। হাজার-হাজার শিক্ষিত বাঙালি ঘন-ঘন আমেরিকায় আসছেন-যাচ্ছেন। তাঁদের সবারই চোখ দুটো ভগবান একই জায়গায় এঁকেছেন—সুতরাং দৃষ্টিকোণ নতুন হবে কী করে? ক'দিন বিদেশে ঘুরে-বেড়িয়ে অজানা এমন কী দেখা যাবে যার সম্বন্ধে এখনও লেখা হয়নি? ঘরে ফিরে গিয়েই লিখতে বসতে হবে এই দুশ্চিন্তা নিয়ে যে-মানুষ ভ্রমণে বের হয় তার মতো অভাগা এই পৃথিবীতে কে আছে?

বিখ্যাত বাঙালি বলতে নিউ ইয়র্কে বিশ বছর আগে রবিশঙ্করকে দেখেছিলাম। তখন প্রচণ্ড নাম-ডাক তাঁর। আমার নামের পাশেও একটা শংকর থাকায় কিছুটা সুবিধেও হয়েছিল। দু'একটি কিশোরী শ্বেতাঙ্গিনী জানতে চেয়েছিলেন আমি ও রবি আত্মীয় কিনা। রবিশঙ্কর ইতিমধ্যে দেশে ফিরে গিয়েছেন। চোখের সামনে সারাক্ষণ না থাকলে এদেশের মানুষ কাউকেই মনে রাখতে চায় না, একমাত্র যীশুখ্রীস্ট ছাড়া। আর একজন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন রেকর্ড করবেন—বাংলাদেশের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, ইউ-এন জেনারেল

অ্যাসেমব্লির প্রথম (আমাদের জীবনের শেষ) বাঙালি সভাপতি হবেন। একশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এ সুযোগ আর আসবে না। কিন্তু হুমায়ুন চৌধুরী জেনারেল অ্যাসেমব্লির গদিতে বসবার আগেই আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

বিদেশে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, ব্যবসায় ও পেশায় কৃতী ভারতীয়দের তালিকা আমার নোটবইয়ে ইতিমধ্যেই কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আনোয়ার উল করিম চৌধুরী হঠাৎ শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের কথা তুললো। আমি ওঁর সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখি না শুনেও সে কিছুটা অবাক হলো। "শ্রীচিন্ময়ের নাম সত্যিই কলকাতায় আপনারা শোনেননি?"

অপরাধ নতমস্তকে স্বীকার করে নিতে হলো। আনোয়ার স্বভাবে অতি বিনয়ী। কিন্তু হাবেভাবে যা বললো—গেঁয়োযোগী নিজের গাঁয়ে ভিখ পায় না, কিন্তু অন্য গাঁয়ে পূজা পেলে সে-খবর তার নিজের গাঁয়েও অবিলম্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাঙালিদের চরিত্র আলাদা—কোনো মানুষের সামান্য মঙ্গলও পরশ্রীকাতরের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

আনোয়ার বললো, "চলুন আপনাকে ইউ-এন ঘুরিয়ে আনি।" যন্ত্রবৎ বিশাল ভবনটির একের পর এক তলা ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সব জায়গা দেখছি, যা প্রায়ই সংবাদপত্রের শিরোনামায় উপস্থিত হয়। সেই সব সভাকক্ষ, যেখানকার আলাপ-আলোচনায় বিশ্বের কোটিকোটি অসহায় মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

বেশ কয়েকটি তলা ঘোরার পর কফিশপে এসে আমার প্রদর্শক জিজ্ঞেস করলো, "স্পেশাল কিছু নজরে পড়লো?"

"নজরে পড়েছে, কিন্তু তুমি বয়োকনিষ্ঠ, বলতে সংকোচ বোধ করছি। মহিলাদের বেশবাস লক্ষ্য করে একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছি—শাড়ি ব্লাউজ এতো বেশি দেখবো আশা করিনি। শাড়ি কি শেষ পর্যন্ত ইউ-এন বিজয় করবে? মেমসায়েবদের বেশ দেখায় কিন্তু এই শাড়িতে।"

"এই তো পয়েন্টে এসে গিয়েছেন!" বললেন আমাদের আর একজন বাংলাদেশী সঙ্গী, যিনি ইউনিসেফে কাজ করেন। যা জানা গেলো, "পৃথিবীর পাঁচ মহাদেশের শত শত মহিলাকে এখানে শাড়ি পরতে দেখবেন। শাড়ির নমনীয়তা ও সহজাত সৌন্দর্য এঁদের আকৃষ্ট করেছে ভেবে ভুল করবেন না। এর পিছনে রয়েছেন একজনই—তিনি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ।"

আমি আরও সজাগ হয়ে উঠলাম। শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, চীনা, জাপানী সব রকমের শাড়ি পরিহিতা মহিলাই নজরে পড়লো। ইন্ডিয়ান সিল্কের প্রচারকরা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতেন।

হাঁটতে-হাঁটতে এবার আরও বিস্ময়! শুনলাম, এইসব মহিলা নাকি শুধু শাড়িই পরেন না, সবাই বাংলা গান জানেন। এক আধটা নয়, কয়েক শত।

আনোয়ার বললো, "কিছুদিন আগে কার্নেগি হলে এক অনুষ্ঠানে এরা আমাকে অবাক করেছিল। কয়েক শ' সায়েব-মেম শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশে কয়েক ডজন বাংলা গান শোনালো, এমন কি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও!"

সেই সভায় ইউ-এন-ও-র অসংখ্য দেশের জাঁদরেল সব প্রতিনিধি দল বেঁধে গিয়েছিলেন। সভাগৃহ একেবারে বোঝাই। ইউ-এন সেক্রেটারি জেনারেল তো বিশেষ ভক্ত, হুট বলতেই চলে আসেন শ্রীচিন্ময়ের ডাকে। এবং এ-ব্যাপারটা আজকের নয়—শুরু হয়েছিল উ-থান্টের সময়ে। তারপর যিনিই এ-পদে বসেছেন তিনিই শ্রীচিন্ময়কে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন—কুর্ট ভেল্ডহাইম, দ্য কুয়েলার পর্যন্ত। কিছুদিন আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লির সভাপতি ছিলেন Jorge Illueca (বাংলা উচ্চারণ জর্জ ইউয়েকা)—এখান থেকেই পানামার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। ইনিও চিন্ময়ভক্ত।

এবার আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে। খবরাখবর নেওয়া শুরু করলাম। সরকারী ব্যাপার এই ইউ-এন-ও—নিজের দেশের সরকারী তকমা পরে এখানে সবাই আসেন। এর মধ্যে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম এই শ্রীচিন্ময় ঘোষ। সেক্রেটারি জেনারেলের আমন্ত্রণে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টার—প্রতি সপ্তাহে দু'দিন দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকের সময় শ্রীচিন্ময় এখানে আসেন। তখন বেসমেন্টের সভাঘরে প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। হয়তো দেখবেন কানাডার রাষ্ট্রদূতের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর পিছনেই হয়তো জাপানের সহকারী রাষ্ট্রদূত এবং কোরিয়ার প্রবীণ প্রধান। একটু পরেই হয়তো হাজির হলেন ইউ-এন-ওর এক নম্বর দু'নম্বর কর্ণধার। তার পাশের আসনটিতেই হয়তো একজন সাধারণ মহিলাকর্মী।

সপ্তাহে দু'দিন এঁরা এখানে আসবেনই—হয়তো একশ পঁচিশটা দেশেই রয়েছে কিছু শ্রীচিন্ময়-অনুরাগী।

এই দু'দিন ছাড়াও প্রতি মাসে ইউ-এন-ও-র নিয়ন্ত্রণে শ্রীচিন্ময় ড্যাগ হ্যামারশিল্ড স্মৃতি-বক্তৃতা করেন। নানা বিচ্ছিন্নতাবোধের মধ্যেও ড্যাগ হ্যামারশিল্ড এখানে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। তাঁর একটি কথা শ্রীচিন্ময়ের খুব প্রিয়—'যে-শান্তি সবাইকে শান্তি দিতে পারে না তা শান্তি নয়।' স্মৃতি-বক্তৃতা চলেছে বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু এখনও শ্রোতার এবং ভক্তের অভাব হয় না, প্রায়ই বসবার সব আসন বোঝাই হয়ে যায়।

যেখানে পদে-পদে এক দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আর-এক দেশের প্রতিনিধির মতভেদ সেখানে শ্রীচিন্ময়ের ব্যাপারে অনেকের একমত হওয়া বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। এই তো কিছুদিন আগে ইউ-এন-ও-র চল্লিশতম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপিত হলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো অফিসিয়াল বাণী দেওয়া সম্ভব হলো

না, এ বাণীর বয়ান নিয়ে দু'দলের মধ্যে প্রবল মতভেদ হলো। কিন্তু বেসরকারীভাবে অনেকেই এলেন শ্রীচিন্ময়ের মেডিটেশন সেন্টারে। কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে শুভদিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। সেই ১৯৭০ সাল থেকে তিনি এখানে অসংখ্য মানুষের মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত করেছেন—ধর্মমত বিভিন্ন, কিন্তু তাতে কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না।

আমার প্রদর্শকদের জরুরী কাজকর্ম ছিল। তারা একটি শ্বেতাঙ্গিনী শাড়ি পরিহিতার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েই কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিলো। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, "আমাকে ডেকো 'ঋজুতা' বলে।" এটা যে আমাদের দিশি নাম তা বুঝতে একটু সময় লাগলো। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো, "পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমরা এসেছি এখানে। আমাদের সেতু হচ্ছেন শ্রীচিন্ময়।"

"মিস্টার চিন্ময় ঘোষ বলো না কেন?"

"বাঃ রে, শ্রীকথাটা কি কম মিষ্টি? দেখো, উনি আমাদের কোনো বন্ধনের মধ্যে ফেলেন না। কিন্তু আমরা যখন ওঁর খুব কাছে আসতে চেষ্টা করি তখন ভাবি উনি কবে খুশি হয়ে আমাদের একটা বাংলা নাম দেবেন। বাংলা নাম পাবার জন্যে কত লোক যে পাগল! আমাদের মধ্যে এখানে পাবে 'নয়না', 'নীলিমা,' 'রঞ্জনা'।"

"তোমরা এই সব নামের অর্থ বোঝো?"

"বাংলা তো জানি না, কিন্তু ওঁর কাছে মানে জেনে নিই—আমার নামের অর্থ স্ট্রেট, কোনো আঁকা-বাঁকা নেই। শ্রীচিন্ময় কখনও-কখনও আবার মজার নাম রাখেন ইচ্ছে করে—আমার এক বান্ধবীর নাম রেখেছেন 'লোভনীয়'। হাউ সুইট!"

"এই মেয়েটির কি একটু আধটু খাবারের লোভটোভ আছে?"

"ও নো। না না! শি ইজ অ্যাট্রাকটিভ! পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই যে অ্যাট্রাকটিভ এই দুর্লভ শিক্ষা আমরা শ্রীচিন্ময়ের কাছে পেয়েছি।"

শুধু মেয়েদের নয়, পুরুষ সায়েবদের মধ্যেও বাংলা নাম পাবার জন্যে হুড়োহুড়ি। পৃথিবীর সেরা শহরের সেরা দরজির তৈরি সর্বাধুনিক সুট পরিহিত সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, তার নাম 'কাঙাল'। ওই কাঙাল আসছে—কিন্তু নিজের চোখে ইউ-এন ভবনে তাকে রাজকীয়ভাবে না দেখলে মনে হতো স্বপ্নে উলটোপুরাণের দেশ দেখছি।

কাঙাল শব্দটির ইংরিজী অর্থ যে 'বেগার' তা আমার নতুন পরিচিতাকে বিব্রত করলো না। বললো, "কাঙাল নিজেই বলেন উনি হলেন 'ডিভাইন বেগার'।"

আর একটি শাড়ি পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী আমাদের দলে যোগদান করলেন।

তরুণী, তন্বী ও সুন্দরী। আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "তুমি কত ভাগ্যবান! তুমি বাংলায় জন্মেছো, তুমি বাংলা জানো। আমরা বাংলা জানি না, শ্রীচিন্ময় অনেক সময় বাংলায় কথা বলেন, আমরা আন্দাজে বুঝে নিই। তোমার মতন বাংলা জানা থাকলে ওঁর আরও কাছে আসতে পারতাম।"

এঁদের প্রায় কেউই ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আসেননি। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যে কী আন্তরিক চেষ্টা!

"কে তোমাদের শাড়ি পরতে বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"কেউ না! শ্রীচিন্ময় খুশি হলেও হতে পারেন এই ভেবে নিয়ে আমরা শাড়ি পরে অফিসে আসি। উনি তো আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। মনে রেখো, অনেকেই ওঁর সভায় আসেন নিজের-নিজের পোশাক পরে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই কারুর।"

ইতিমধ্যে আমরা আবার একটা কফিকেন্দ্রে ঢুকে পড়েছি। শাড়ি পরিহিতা নবাগতা যে একজন ফরাসি তা বোঝা গেলো। ফরাসিনীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী এমন শিক্ষা তোমরা ওঁর কাছে পাও যা তোমাদের এমনভাবে বিস্মিত করে?"

"একদিন আমাদের দুপুরবেলার মেডিটেশনে এসো, নিজের কানেই শুনবে। আজকাল বেশির ভাগ সময় অবশ্য নিস্তব্ধতা—কোনো কথাই হয় না, কিন্তু এমন একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে যে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই খুঁজে পাই। তারপর কিছু কিছু গান হয়, আমরা যে যা পারি গাই—বেশির ভাগ বাংলা গান। এতো বিভিন্ন ভাষার মানুষ উপস্থিত থাকেন, কিন্তু অসুবিধা হয় না—বাংলার সুর ওদের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।"

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করি। ফরাসি যুবতী কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, "উনি আমাদের বলেন মানুষকে' দেখলেই প্রথমে তার কি নেই তা মনে আনবে না—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে।"

আমি বললাম, "এই কথা আমাদের দেশে যুগযুগান্ত ধরে বলা হচ্ছে।"

"হাউ লাকি ইউ আর!" ফরাসি সুন্দরী এবার যেন আমাকে হিংসে করতে আরম্ভ করলো। "তোমরা, পূর্বদেশের লোকেরা, মানুষের অমূল্য চিন্তার মণিমাণিক্য হাজার-হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছো। এবার আমরা শ্রীচিন্ময়কে পেয়েছি, আস্তে-আস্তে কুড়িয়ে নেবো আমরা, তোমাদের মতো সব বুঝে নিতে একটু সময় লাগবে এই যা।"

আমাদের টেবিলে আর এক মহিলা এসে যোগ দিলেন। বললেন, "আমি নতুন এসেছি—সবাইকে চিনি না—কিন্তু ধ্যানসভায় গিয়ে খুব শক্তি পাই। ওই

দু'দিন আমি লাঞ্চ খাই না, সোজা ওখানে চলে যাই। সব বুঝি না, কিন্তু ভাল লাগে।"

ফরাসিনীর কাছে আমার এখনও কিছু জানবার আছে—জীবনযাত্রা সম্বন্ধে শ্রীচিন্ময়ের কোনো বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা?

"অনেকদিন ধরে যোগাযোগ রেখেছি। কখনও কিছু নির্দেশ দেন না। খুব ধরাধরি করলে বলেন, দিনে একবার ধ্যানে বেসো। যারা আরও এগোতে চায় তারা দিনে দু'বার। তবে আমরা সারাক্ষণ চেষ্টা করি খুঁজে বার করতে কিসে চিন্ময় খুশি হন। যেমন ধরো আমি স্মোক করতাম—ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মন থেকেই যেন নির্দেশ পেলাম। ড্রাগের নেশা আমার ছিল না—দু'একজন নিজের অন্তরের তাগিদেই ড্রাগকে গুডবাই করেছে। মাংস আমি অফিসিয়ালি ছাড়িনি—কিন্তু মাংস আমার আর ভাল লাগে না, আমি এখন ওঁর মতন ভেজিটারিয়ান হতে চাই।"

আমি সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে আছি। সে হেসে বললো, "আমি একবার ওঁকে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি সরল শিশুর মতন হেসে বললেন 'যা নিজে ভাল মনে করবে তাই করবে'—ডুইং দ্য রাইট থিং—তাই চেষ্টা করি, মনে অনেক শান্তি পেয়েছি।"

উল্টোপুরাণের দেশে গভীরে ঢুকে যাচ্ছি আমি! এই সব যোগযাগ, তন্ত্রমন্ত্র তপস্যায় আমার তেমন বিশ্বাস নেই, যদিও ছোটবেলা থেকে মঠে-মিশনে আমার যাতায়াতের সুযোগের অভাব হয়নি। পশ্চিমের বিজ্ঞানী মন এখনও খুব বিচক্ষণ এবং যুক্তির ছাঁকনিতে যাচাই না-করে কোনো কিছুই তারা গ্রহণ করে না, এই খবরই আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার অবস্থা বুঝুন। খোদ নিউ ইয়র্ক শহরে, ইউ-এন ভবনের কফি টেবিলে বসে আমি অতীত ভারতবর্ষের আকর্ষণে সম্মোহিত যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। তারা বিশ্বাস ক'রে সুখী হতে চায়।

মেয়েরা আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে এবার নিচু গলায় গান ধরলো। মেয়েরা গাইছে বাংলায় ঃ

"নামিছে আজ আনন্দ প্লাবন
মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন
ভাঙিছে মোর সকল বন্ধন
খুলিছে সব দ্বার
মিলি গেছে ব্যথাভার
যত অন্ধকার।"

মার্কিন, ফরাসি এবং বৃটিশ উচ্চারণের ঐকতান! বাংলা কথাগুলো কিছু

বুঝছি, কিছু হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কিন্তু বিপুল উদ্দীপনা বোধ করছি। মনে হচ্ছে, এবার নিউ ইয়র্কে না এলে আমার ভারতসন্ধান অপূর্ণ থেকে যেতো।

মেয়েটি খুব লজ্জা পাচ্ছে—উচ্চারণের দীনতার জন্য ক্ষমা চাইছে বার-বার। আর আমার লজ্জা ততই বাড়ছে। গানটা আমি বাংলায় লিখে নেবার চেষ্টা করে সফল হচ্ছি না দেখে একজন সুন্দরী বলে উঠলো, "আমি বাংলা অক্ষর জানি না। কিন্তু যদি তুমি কিছু মনে না করো, রোমান অক্ষরে লিখে দিতে পারি।"

অবাক কাণ্ড। অতি দ্রুত ছ'টা লাইন ইংরিজী অক্ষরে লেখা হয়ে আমার হাতে চলে এলো। মার্কিন সুন্দরী বললো, "গান শেখবার আগে আমি এইভাবে লিখে নিই—দরকার হলে কমপিউটারে জমা করে রাখি।"

"কত গান জানা আছে?"

আবার অবাক হবার পালা। দু'শ তিনশ বাংলা গান এদের কাছে কিছুই নয়। ওরা ততক্ষণে আমাকে নিজের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছে। "তুমি জানো শংকর, ওঁর যখন মুড আসে তখন শত-শত গান লিখে ফেলেন। তারপর নিজেই সুর দেন। আমরাও অভ্যেস করে নিই।"

"কিন্তু তোমরা কি অন্ধের মত অনুকরণ করো? না কিছু বুঝতে পারো?"

হাসলো ফরাসিনী। "আনন্দ প্লাবন আমরা বুঝতে পারি—ফ্লাড অফ ডিলাইট। কিন্তু তেমন বুঝতে পারি না—মৃদুল পবন প্রাণে করে আনন্দ বহন। শম্ভু'র কাছে একবার বুঝতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল ইন্ডিয়ান ওয়েদার এবং মেটিরিওলজি সম্বন্ধে ক্লিয়ারকাট আইডিয়া না থাকলে টোটাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সম্ভব নয়।"

আমার ভাল লাগছে, আবার ভয়ও লাগছে। পূর্বদেশীয় গুরুদের সম্বন্ধে এখন সমস্ত মার্কিন দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট সন্দেহ। এঁদের কয়েকজনের কীর্তিকাহিনী ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—খুন জখম গুণ্ডামি স্বেচ্ছাচার কোনো কিছুই এই সব কাহিনী থেকে বাদ থাকে নি।

অধ্যাত্মবাদীদের সম্পর্কে জনগণের এই সন্দেহের কথা আমি ইচ্ছে করেই তুললাম। মার্কিন যুবতী হাসলো। "ঠিক একই প্রশ্ন শ্রীচিন্ময়কে করেছিলেন একজন স্থানীয় সাংবাদিক। উনি কোনো রকম বিরক্তি না দেখিয়েই চমৎকার উত্তর দিলেন। বললেন, 'একই পরিবারের একজন ভাই হয়তো ভাল, আরেক ভাই হয়তো খুব খারাপ। কিন্তু এই খবর থেকে সেই পরিবারের অন্য লোকেরা ভাল কি মন্দ আন্দাজ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে?' কাগজটা আমার বাড়িতে আছে, তোমাকে দিতে পারি—এখানকার কাগজওয়ালারা কাউকে অন্ধভাবে স্তুতি করে না, লেখার আগে অনেক কিছু বাজিয়ে দেখে।"

মহিলারা অতিমাত্রায় অতিথি-বৎসলা। আমাকে একবারও কফির দাম দেবার

সুযোগ দিলো না। শ্রীচিন্ময়ের দেশের লোক পেয়ে মৃদুল পবন কেমন করে প্রাণে আনন্দ বহন করে নিয়ে যায় তা জানবার চেষ্টা করতে লাগলো পূজারিণীর প্রসন্নতায়।

ইতিমধ্যে আমার স্থানীয় গার্জেন নিজেদের কাজকর্ম সেরে কফিশপে ফিরে এলো আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। আনোয়ার বললো, "সুখবর আছে। আগামীকাল দুপুরে আপনি ইচ্ছে করলে ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে উপস্থিত থাকতে পারেন। তার থেকেও সুখবর, শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে আপনার একান্তে দেখা হবার এবং কথাবার্তা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথায় দেখা হবে. কখন দেখা হবে তা আজ রাত্রেই জানা যাবে। আপনি একজন বিখ্যাত বাঙালির সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে তৈরি হয়ে থাকুন।"

মেয়েরা বললো, "কাল আবার দেখা হচ্ছে প্রার্থনাসভায়।"

আমি বললাম, "আরও বাংলা গান গাইবে তো?"

ওরা বললো, "সেটা নির্ভর করবে শ্রীচিন্ময়ের নির্দেশের ওপর। উনি যা চাইবেন আমরা তা করবো।"

"সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই তীর্থক্ষেত্রে এসে শেষ পর্যন্ত গুরু-ফুরুর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন!" শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি প্রস্তুত হচ্ছি জেনে নিউ ইয়র্কের এক বাঙালি শুভানুধ্যায়ী মিস্টার সেন আমার সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এই ভদ্রলোক সন্ধ্যাবেলায় বললেন, 'জ্ঞানকে কিভাবে মানুষের ভোগে নিয়োগ করা যায় তার জন্যে পৃথিবীর বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ চলছে নবীন এই মার্কিন মহাদেশে। জাপান-টাপান যাই বলুন, কেউ এখনও এর নখের যোগ্য নয়। সমস্ত কিছু মন দিয়ে লক্ষ্য করে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষকে কোথায় বলবেন—হচ্ছে হচ্ছে হবে-হবে মনোবৃত্তি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়ো, তা নয় এই বিদেশেও সাধুসন্ন্যাসীর দিকে মন দিলেন!" আমার বিজ্ঞানীবন্ধু সেনসায়েবের কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ, কিছুটা সমালোচনার সুর।

বললাম, "যতটা খবর পেয়েছি, এই শ্রীচিন্ময় সাধুও নন, সন্ন্যাসীও নন। ভারতের যুগ যুগান্তের চিন্তাধারার একজন বিশ্লেষক ও প্রচারক মাত্র।"

আরও বললাম, "আমাকে ক্ষমা করুন, এই আধ্যাত্মিক মানুষদের সম্পর্কেই

তো সায়েবদের যত আগ্রহ—রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, বিজ্ঞানে আমরা যতটুকু করছি তা পশ্চিমের মনে এখনও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না। স্রেফ জাপানের মতন স্বীকৃতিটুকু পেতেই বহু যুগ কেটে যাবে। অথচ অধ্যাত্মবাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদেশে এখনও সুবিপুল কৌতূহল।"

সেনসায়েব বললেন, "শুনুন শংকরবাবু, গুরুর ভেক ধরে কত লোক যে এদের ঠকাচ্ছে। এক-একজন এক-একটা 'কাল্ট'-এর সৃষ্টি করছে—তারপর রঙিন ফানুশ ফেটে যাচ্ছে, ভারতবর্ষের বদনাম হচ্ছে। একটা কথা জেনে রাখবেন, এই দেশ ঠকতে রাজি নয়—ঠকালে এদের মেজাজ ঠিক থাকে না।"

"স্বামী বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্ত—কেউ তো এঁদের ঠকাননি। বাঙালি প্রভুপাদ সত্তর বছর বয়সে দুর্জয় মনোবল নিয়ে এই তো সেদিন নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করে যে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু নিজের ঘরে বিবেকানন্দের মতন স্বীকৃতি তিনি আজও পেলেন না।"

সেনসায়েব সুরসিক, এক কালে প্রচুর বাংলা চর্চা করতেন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। মিষ্টি হেসে তিনি উদ্ধৃতি দিলেন, "একদিকে প্রভুপাদের শেষজীবন খুবই ড্রামাটিক।"

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম। দেশে থাকতে ছোটবেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে আমিও শুনেছিলাম। শ্রীচৈতন্যের এই বাণী যে এমনভাবে কারও সাধনায় সত্য হবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আমেরিকায় খোল করতাল বাজিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করে ভক্তিবেদান্ত তা সার্থক করলেন ১৯৬৫ সালে জীবনের সায়াহ্নবেলায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে কী হচ্ছে দেখুন!"

বিখ্যাত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে সেবারেই ইসকন সম্পর্কে কিছু দুশ্চিন্তা করার মতন খবর বেরিয়েছে—এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থাকছে না।

সেনসায়েব এবার একটি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটালেন। "প্রভুপাদকে আমি শ্রদ্ধা করি, মাত্র বার বছর বয়সে কার্তিক বোস ল্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মচারি বিদেশে যা করেছেন তা তুলনাহীন, কিন্তু সায়েবদের বোধহয় তিনি পুরোপুরি চিনতে পারেননি।"

"কী বলছেন, মিস্টার সেন!"

"আমি ঠিকই বলছি। ভারতীয় গুরুর সায়েব-ভক্ত দেখলে আমরা খুব আনন্দ করি। আমার কথা হচ্ছে, ভক্ত হিসেবে এদের সম্মান দেখান, কিন্তু ভুল করেও সায়েবদের কখনও গুরুর পদে বসাবেন না।"

আমার মুখের দিকে তাকালেন মিস্টার সেন। "অভয় চরণ দে ওরফে

ভক্তিবেদান্তর প্রথম ভুল হলো—তিনি ওভার-এস্টিমেটেড দ্য অ্যামেরিকানস্। আমেরিকানরা কোনোদিন গুরু হতে পারবে না, এর জন্য ভারতীয়রা শত শত গুণ উপযুক্ত। যতই বলুন, এরা কৌতূহল দেখাতে পারে, ভক্তি করতে পারে, কিন্তু এদেশে সন্ন্যাস নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার—নেকসট টু ইমপসিবল্। অপ্রিয় কথাটা হলো, এদেশের ডিসিপ্লিন অফ লাইফ নেই যা ভারতবর্ষে অঢেল রয়েছে। সায়েব যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়, তাহলে সে-প্রতিষ্ঠানও কোম্পানীর মতন হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী আমেরিকান অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতন।"

"আপনি কি ভক্তিবেদান্তর কোনো গুণ দেখতে পান না?"

সসম্ভ্রমে জিভ কাটলেন মিস্টার সেন। "একটা কথা ইতিহাসে থেকে যাবে—এতো অল্পসময়ে প্রভুপাদের মতন কেউ কখনও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজয় করতে পারেননি।"

আমরা এবার আগামী দিনের প্রোগ্রামে ফিরে এলাম। জানালাম, শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানকেন্দ্রে আমি যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হবে আমার।

ইতিমধ্যে কী করছি জানতে চাইলেন আমার বিজ্ঞানীবন্ধু। বললাম, "একটু লেখা-টেখা পড়ে নিচ্ছি। ভদ্রলোকের জন্ম ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে। বারো বছর বয়সে কোনো আশ্রমে চলে যান।"

"আশ্রমটা হলো পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, আমি জানি।"

"একুশ বাইশ বছর ওখানে ছিলেন। তারপর অভয় চরণ দে'র মতন কী ইচ্ছা জাগলো, সাগরপারে পাড়ি দিলেন। বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার একটা মস্ত অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি নিশ্চয় আছে তাঁর।"

সেন বললেন, "এই অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিগুলোই আসল গল্প—ভারতীয়দের এসব জানা দরকার। আমরা এমনিতে বড্ড নরম, কিন্তু বাঙালি যখন বেঁকে বসে কিংবা একটা কিছু করবে বলে গোঁ ধরে তখন সে দুনিয়ার নামস্য! এই গোঁয়ার বাঙালির সংখ্যা যাতে কমে না যায় তা দেখবার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। গোঁয়ার বাঙালি পারে না এমন কাজ নেই। চাটগাঁয়ের ইংরিজী উচ্চারণ নিয়ে আপনারা কলকাতায় এখনও হাসিঠাট্টা করেন, কিন্তু সেই চাটগাঁইয়া এখানে হাজার-হাজার সায়েবের নাকে দড়ি পরিয়ে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে।"

"যে-শক্তিতে তা সম্ভব হচ্ছে তা বোধহয় অধ্যাত্মশক্তি। এই অধ্যাত্মশক্তির সামনে পশ্চিমের একটা অংশ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে, অথচ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে আমরা যে নতুন ভারতবর্ষ গড়বার চেষ্টা করছি তার সম্বন্ধে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নেই।"

আমি আরও বললাম, "শুনুন সেনসায়েব, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ যা লিখছেন বা বলছেন ভারতবর্ষের পক্ষে হয়তো তা নতুন কোনো কথা নয়। তিনি বিদেশির

জন্যে সরলভাবে প্রাচীন কথা বিশ্লেষণ করেছেন—'যেখানে আনন্দ অনুপস্থিত সেখানে ভালবাসাও অনুপস্থিত। যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে কোনো কিছুই নেই। যেখানে সত্য রয়েছে সেখানেই তো পূর্ণতা, যেখানে পূর্ণতা সেখানেই তো ঈশ্বরের উপস্থিতি'।"

সেনসায়েব আবার তাঁর প্রিয় বিষয় অ্যাডভেঞ্চারে ফিরে গেলেন। বললেন; "শোনা যায়, শ্রীচিন্ময়কে এদেশে থাকবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এখানকার দূতাবাসে কেরানির কাজও করেছেন বেশ কিছুদিন। সুযোগটা করে নিয়েছিলেন তাই ভাল, কারণ এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসাররা বড়ই বেরসিক। গ্রীনকার্ড না থাকলে স্বয়ং যীশুখ্রীস্টকেও এরা নির্দ্বিধায় দেশছাড়া করে দেবে। একমাত্র রক্ষাকর্তা এই সব দূতাবাস—ডিপ্লোম্যাটরা যাকে খুশি টেমপোরারি নিয়োগপত্র দিতে পারে, নিরীহ আশ্রয়প্রার্থীকে নগর কোটালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাই দেখবেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিয়েও বাইরের লোক বিদেশি দূতাবাসে ড্রাইভারের চাকরি করছে—এইভাবে কয়েকটা বছর চালালে যদি আসল সবুজপত্র মিলে যায়।"

যে-ভদ্রমহিলা দয়াপরবশ হয়ে চিন্ময়কুমার ঘোষকে ভারতীয় দূতাবাসে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে মনে মনে নমস্কার জানালাম। ঐটুকু সাহায্য না পেলে, যিনি এক বিশ্বজোড়া আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যিনি হার্ভার্ড, ইয়েল, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডের মত শত শত বিশ্ববিদ্যালয় চষে বেড়াচ্ছেন তিনি পুনর্মূষিক হয়ে আমাদের দেশের কোনো মফঃস্বল শহরে জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করতেন। যে-মানুষ একদিন গ্রীনকার্ডের জন্য কনিষ্ঠ কেরানি হয়েছিলেন আজ সমস্ত বিশ্বে তাঁকে নিয়ে টানাটানি—রবিবার তিনি নিউ ইয়র্কে তো সোমবারে তিনি ওয়াশিংটনে, পরের দিন লন্ডন, তার পরের দিন প্যারিস কিংবা স্টকহোমে। জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন সর্বত্র তাঁর মেডিটেশন সেন্টার রয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকাতেও পা বাড়িয়েছেন—জামবিয়াতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। জাপানেও কেন্দ্র রয়েছে।

সেনসায়েবকে বললাম, "ভদ্রলোক নিশ্চয় একটি হিউম্যান ডাইনামো বিশেষ। লোকমুখে শুনলাম, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেন, বাকি সময় হাজার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ইউ-এন-ওর এক জাঁদরেল অফিসার বললেন, শত শত বই লিখেছেন ইংরিজীতে।"

সেনসাহেবের মন্তব্য, "গেঁয়ো বাঙালিরা হঠাৎ আমেরিকায় এসে কিভাবে ইংরিজীতে তুখড় হয়ে যায় বুঝতে পারি না! আপনি বিবেকানন্দের অসাধারণ ইংরিজী বাকপটুতার কথা ভাবুন—এখনকার নর্থ ক্যালকাটা সিমুলিয়ার ছেলেরা তো ইংরিজীর নাম শুনলে ভয় পায়। স্বামী অভেদানন্দও চমৎকার ইংরিজী

লিখতেন। ভক্তিবেদান্ত তো ইংরিজী ভাষার মাস্টার—ঐ সামান্য ক' বছরে তিরিশ চল্লিশ খণ্ড বই লিখে ফেলেছেন। আর শ্রীচিন্ময় তো শুনেছি ছ'-সাতশ বই ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।”

“এঁর ইংরিজী পড়লাম। পূর্বদেশের সরলতা এঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বাংলাভাষার দু-একটি বিশিষ্টতা ইংরিজীতেও চালু করার ইচ্ছে রয়েছে মনে মনে কিন্তু আজ সকালে একজন ইউ-এন কর্তার সঙ্গে দেখা হলো, তিনি নিজে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজী সাহিত্যচর্চা করেছেন, তিনি তো খুব প্রশংসা করলেন ওঁর ইংরিজী লেখার।”

“আর আপনি গদগদ হয়ে সায়েবের সব কথা হজম করে ফেললেন!”

“মোটেই না। আমি বরং মার্কিনী সাংবাদিক স্টাইলে গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিলাম, মহাশয়, এই পৃথিবীতে সব মানুষেরই কিছু-কিছু দুর্বলতা থাকে। ভগবান এখনও নিখুঁত কোনো মডেল তৈরি করেননি। সুতরাং এক-আধটা দোষ খুঁজে দিন। ভদ্রলোক খুব হাসলেন, তারপর বললেন, 'ওঁর হাতের লেখা আমি দেখেছি, এক-আধবার বানান সম্বন্ধে পিছলে পড়েছেন!' সাহেবের কথা শুনে ভরসা পেলাম।”

বিজ্ঞানী মিস্টার সেন বললেন, “ওঁর লেখা থেকে আপনি কি পেলেন?”

“এই ক'ঘণ্টায় আর কতটা আন্দাজ করবো বলুন? যেটা দেখেছি, এদেশে বসবাস করলে অগোছালো বাঙালির চিন্তাতেও একটা গোছালো ভাব এসে যায়—যাকে অনেকে বলেন, মানসিক পরিচ্ছন্নতা। ওঁর লেখা থেকেই নোটবইতে কপি করেছি—'ঈশ্বরের একজন স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট প্রয়োজন। ভাবছি, মাথা নত করে আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করবো'।

“আর একটি কথা লিখে নিয়েছি—'তোমার জীবনপথে অসংখ্য ট্রাফিক লাইটের লাল চোখরাঙানি, তার কারণ তোমার হৃদয় কোনোদিন প্রাণভরে সবুজ আলোর সংকেত চায়নি।' অথবা, 'একবার কোনোরকমে নিজেকে বিশ্বাস করাও, তুমি অপরিহার্য নও। তোমার মন শান্তিতে প্লাবিত হবে।' অথবা, 'আমি সোজাসুজি জ্ঞানের আলোক চাই। অপরের ব্যাখ্যা মানেই তো বাধা।'

“আরও একটি লাইন মন্দ লাগলো না—'ব্যক্তিমানুষ পার্থিব সম্পদের মধ্যে, সুখের মধ্যে এবং কখনও-কখনও ত্যাগের মধ্যেও শান্তি চায়। এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলাপ-আলোচনা, ডিপ্লোম্যাসি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে শান্তি সুনিশ্চিত করতে চায়। এই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কৌশল দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব আনে না। বাইরের জগৎ থেকে শান্তি আসে না, তার উৎপত্তি মানুষের হৃদয়ে'।”

মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে চুপি-চুপি অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করলাম। আমার অবিশ্বাসী মন বেশ সজাগ হয়ে রয়েছে—বিশ্বাস করে-করে আমার দেশের অভাগা মানুষ যে বারবার ঠকেছে। কিন্তু এ কথাও তো সত্য, বাজিয়ে না দেখে সব কিছু ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলেও মানুষের অগ্রগতি হতে পারে না। পশ্চিমের বিজ্ঞানী-মন তাই সারা পৃথিবীর প্রাচীনতম ঐতিহ্যগুলি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখছে কোথায় সত্য লুকিয়ে রয়েছে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে নানা দেশে নানা সময়ে মানুষ কী ভেবেছে তার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। এই অনুসন্ধিৎসু পশ্চিমী-মনের কাছে ভারতবর্ষ অবশ্যই একটি স্বর্ণখনি, যদিও আমরা ভারতীয়রা নিজেরা কোনো খোঁজখবর না নিয়ে সায়েবরা কি করে তা দেখবার জন্যে উঁচিয়ে বসে আছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি বলতে একসময় এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বোঝাতো। এখন নয়। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু জায়গা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার দেখতে যাবার কথা ছিল সকালে, কিন্তু আমি তার বদলে শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

অবশেষে শ্রীচিন্ময়ের সঙ্গে দেখা হলো। ইউ এন মেডিটেশন সেন্টারে যাবার আগে টার্কিশ সেন্টারে বাংলাদেশ মিশনের একটি ঘরে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

খোদ সাহেবের দেশে সন্ন্যাসী নয়, সাধু নয়, হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালি বাবু-শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ। বয়স পঞ্চান্ন, রঙ কালো, সুশাসিত শরীর, ওজন একশ ষাট পাউন্ড (সাহেব ভক্তদের মহৎ গুণ সব বিবরণ অনুসন্ধিৎসুদের জন্যে রেডি!)। শ্রীচিন্ময় সাদা পাঞ্জাবি পরেছেন, সেই সঙ্গে ধুতি এবং পাম্পসু—যে ধরনের মানুষকে একসময় হাওড়ার বাজারে এবং শিয়ালদহ রেল স্টেশনে শত শত দেখা যেতো। এখন অবশ্য টেরিলিনের কল্যাণে সব বাঙালি পুরুষই সাহেব—খাঁটি বাঙালি বেশবাস দেখতে হলে আপনাকে এখন বিয়ের লগনসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, অথবা পাসপোর্ট-ভিসা করে এই নিউ ইয়র্কে হাজির হতে হবে।

মানুষটির সবই সাধারণ, শুধু চোখ দুটি ছাড়া। ফিলিপস্ কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ভাষায়—একজোড়া আর্জেন্টা ল্যাম্প—যেখানে শুভ্র আলোর স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু ক্ষতিকারক উত্তাপ নেই। আলো দিচ্ছে, কিন্তু জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে না। এই প্রসন্ন আলোই অতিমাত্রায় সফিসটিকেটেড পশ্চিমকে টানছে অজ চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার দিকে। হাডসন রিভার হার মানছে কর্ণফুলির কাছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। অতি সাধারণ সব বাঙালি কথাবার্তা—দেশ কোথায়, কবে দেশ ছাড়লেন। দেশে যান না কেন? শ্রীচিন্ময় পরিচয় দিলেন নিজের বাংলা সাহিত্যপ্রীতির। একসময় রবি ঠাকুর, নজরুলে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কুড়ি বছর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। একসময় নলিনীকান্ত গুপ্তর সেক্রেটারির কাজ করেছেন—এই নলিনীকান্তর জন্ম শতবার্ষিকী ১৯৮৮-তে। বললেন, "নলিনীকান্তর কিছু লেখা অনুবাদ করেছিলাম, অরবিন্দর একটা জীবনীও লিখেছিলাম। তারপর কী ছিল বিধাতার মনে, চলে এলাম সাত সাগরের পারে।"

ওঁর সঙ্গে রয়েছেন লম্বা-চওড়া এক সাহেবভক্ত—ডাক নাম লম্বু, ভাল নাম অধীরতা।

না, এরা নিজেদের ঘরসংসার কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে গুরুসেবার জন্যে আশ্রমে ঢুকে পড়েনি। ইউ-এন অফিসে ভাল কাজ করেন লম্বু। টুক করে একবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে এলেন গত বছরে, এবারেও ঐ ধরনের কিছু একটা করবেন। শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখায় বিশ্বাস করেন শ্রীচিন্ময়—সকালবেলায় পেট ভুটভাট করলে, নাভিদেশে মোচড় মারলে, মাথা ধরলে, দন্তশূল হলে মানুষ ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা চালাবে কি করে? শরীরকে নিজের কন্ট্রোলে রাখতে হবে সবসময়। এই তো আজ সকালে শ্রীচিন্ময় নিজেই একশ ষাট পাউন্ডের দেহ নিয়ে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনশ ত্রিশ পাউন্ড ওয়েট লিফটিং করে এলেন।

আমাদের কথা যেন শেষ হতে চায় না। এরপর আমরা চললাম ইউ-এন মেডিটেশন সেন্টারে। বিরাট একটি ঘর ততক্ষণে নানা বেশের পুরুষ ও রমণীতে ভরে উঠেছে। পুরুষদের সবাই কোটপ্যান্ট পরেন ডিপ্লোম্যাসির এই সুরসভায়। এতো নিখুঁতভাবে ড্রেস করা পুরুষ একসঙ্গে পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাবেন না। মেয়েরা অনেকেই নিজেদের ড্রেস পরেছে, আবার কেউ-কেউ শাড়ি পরিহিতা।

আমি চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি এদের শাড়ি পরতে নির্দেশ দিয়েছেন?"

শ্রীচিন্ময় বললেন, "মোটেই না। আমি ধুতি পরি তো, তাই ওরা ভেবে নিয়েছে ওরা শাড়ি পরলে আমি সন্তুষ্ট হবো।"

হল ঘর ভরে উঠলো। চেয়ার না পেয়ে অনেকেই কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন পরম আনন্দে। অনেক মহিলা জুতো খুলে চেয়ারের উপর পা মুড়ে নিলেন।

মহাশক্তিমান রাজপুরুষ ও রমণীদের এই সভায় আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জুতো খোলা আমার ধাতে নেই।

সর্বত্র এক আশ্চর্য শৃঙ্খলা। কেউ-কেউ নীরবে একটু-আধটু সভার কাজ করে দিচ্ছে। স্বদেশে আমাদের প্রার্থনাসভায় যে অব্যবস্থা, অনিশ্চয়তা এবং হৈ চৈ থাকে তার কিছুই নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বধর্মমহাসভা দেখেছিলেন, আমি দেখলাম বিশ্বধর্মের মিলনসভা। আশ্চর্য এই সভা। কোনো বক্তৃতা নয়, কোনো শাস্ত্রপাঠ নয়, কোনো মন্ত্র উচ্চারণ পর্যন্ত নয়—শ্রীচিন্ময় এঁদের মুখোমুখি বসে ক্রমশ ধ্যাননিমগ্ন হলেন। শতাধিক অপরিচিত বিশ্ববাসীও তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করলেন ঐকান্তিকভাবে। কেউ ধীরে-ধীরে চোখ বন্ধ করলেন, কেউ নতমস্তকে পাথরের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

এইভাবে চললো অনেকক্ষণের নীরবতা। আমার মনে পড়লো, ইউ-এন-ও'র কক্ষে চলেছে মানুষের দলবদ্ধ ঘৃণার দ্বন্দ্ব, কোথাও চলেছে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে অবিশ্বাসের অসহ্য জ্বালা। আর এখানে হঠাৎ কিসের আকর্ষণে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথা নত করছে বোয়ালখালি থানার এক কৃষ্ণাঙ্গ বঙ্গ সন্তানের কাছে? কী সে দিতে পেরেছে, যা এই বিশাল বিশ্বসভার আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়?

দীর্ঘ নীরবতার শেষে সুবেশী নরনারীর ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীচিন্ময় এবার সঙ্গীতের ইঙ্গিত দিলেন এবং এবার আমার চোখ ও কানের বিস্ময় শুরু হলো! সাদা কালো মঙ্গোলীয় ককেশীয় সবাই একসঙ্গে বাংলা গান শুরু করলেন। এঁরা কেউ বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু হৃদয়ের গভীর থেকে এমন পবিত্র নিবেদনের গান আমি বাংলাতে কখনও শুননি :

"হিয়া পাখি এগিয়ে চলো
দেখো না আর ফিরে
বিশ্ব যাহা দিতে পারে
তা যে তুচ্ছ মিছে।"

ও বার্ড অফ মাই হার্ট ফ্লাই অন, ফ্লাই অন—আমি নিজেই তখন ইংরিজীতে চিন্তার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছি।

গানের পর গান। পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে গভীর আকুতি :

"ভুলিতে দিও না প্রভু
যদি আমি ভুলে যাই কভু।
তীব্র বেদনে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু
বেদনার তাপে যদি ভুলে যাই
মরণের ঘুম যদি কভু পাই

অমর পরশে জাগাবে আমায়
ভুলিতে দিও না কভু...”

একের পর এক বাংলা গানের আসর চলেছে। ভক্তের হৃদয়ে তার মূর্ছনা :

“জাগে না জাগে না পরাণ জাগে না
ঘুমঘোর আর ভাঙে না...”

আজ ইউ-এন-ও’র বড় মিটিং আছে। শক্তিমান রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকে একটি রাঙতায় জড়ানো ‘কুকি’ শ্রীচিন্ময়ের হাত থেকে নতমস্তকে গ্রহণ করে একে একে বিদায় নিলেন। তিনি কারও সঙ্গে কোনো কথা বললেন না সেদিন।

পুরুষ ভক্তদের বাংলা নামগুলি এই সুযোগে শুনিয়ে দিই। স্টিভেন হাইন হয়েছেন ‘ধ্রুব’। কেভিন কীফ-এর নাম হয়েছে ‘অধীরতা’। কীথ ফারম্যান নাম পেয়েছেন ‘আশ্রিত’। দুই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়-ভ্রাতা ম্যাথু ও ল্যারি হোগান হয়েছেন ‘ভীম’ ও ‘তেজিয়ান’। শুনেছি এক জ্যাজ গায়ক মাইকেল ওয়লডেন হয়েছেন ‘নারদ’। এবং এক ওলিম্পিক ট্র্যাক চ্যাম্পিয়ান কার্ল লুইস ‘সুদেহী’। কার্লো সানতাতা নাম পেয়েছেন ‘দেবদীপ’।

অধীরতা ও ধ্রুব দুই বিশিষ্ট ইউ-এন কর্মীর সঙ্গে শ্রীচিন্ময় আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দুপুরের খাবার খেয়ে আসতে। ভারী স্নেহপ্রবণ মানুষ। কে খেলো কে খেলো না সব দিকে নজর রাখেন।

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে স্টিভেন হাইন বললেন, “একজন য়ুরোপীয় ওঁকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি যা প্রচার করেছেন, তা কি ধর্মমত?’ উনি বললেন, ‘না আমি ধর্মপ্রচার করি না, কেবল পথের ইঙ্গিত দিচ্ছি। যে-কোনো ধর্মে বিশ্বাস রেখেই এই পথ ধরে চলা যায়’।”

কেভিন কীফ বললেন, “ওঁর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা সমাজে কোনো বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছি না। সমাজকে মেনে নিয়েই আমরা সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটাতে উৎসাহী। সকলেরই একাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।”

স্টিভেন হাইন বললেন, “ইউ-এন ছাড়াও অন্যত্র শ্রীচিন্ময়ের ধ্যানসভা বসে। অনেকে নানা প্রশ্ন করেন, শ্রীচিন্ময় উত্তর দেন।”

পশ্চিমীদের মনে কি ধরনের প্রশ্ন জাগে তা জানবার আগ্রহ চেপে রাখতে পারলাম না। শুনলাম, নানা ধরনের প্রশ্ন ওঠে। কেউ জিজ্ঞেস করেন—কিভাবে ধ্যান করতে হয়? কেউ প্রশ্ন করেন—ধ্যানের সময় যাতে ঘুমিয়ে না পড়ি তার জন্যে কি করতে হবে? কেউ বলেন—ধ্যান করতে বসে এই মনে হয় কিছু হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হয় না, এর কারণ কি [illegible] জানতে চান—ধ্যান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে? কেউ বলেন—[illegible] করছি, কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না!

আমি বুঝছি, ভক্তিযোগের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক বলতে যাঁদের বোঝায় শ্রীচিন্ময় তাঁদের একজন।

অন্য ধরনের প্রশ্নও আছে। কিছু কিছু নোটবইতে লিখে নিয়েছি। কিছু নমুনা না দিয়ে পারছি না :

প্রশ্ন : চারদিকে সংঘাত, চারদিকে সংঘর্ষও এই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা?

শ্রীচিন্ময় : কখনও-কখনও ঈশ্বরেরই এই লীলা। ভাল এবং মন্দ দুই-ই প্রকাশমান হয়, অবশেষে ন্যায়ের জয় হয়। বর্তমান পৃথিবীর সংঘাত ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে মনে হয় না, মানুষের দুর্বলতা থেকেই সংঘাতের উদ্ভব। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখাতে চান, আমি যা বলি তাই ঠিক, তুমি যা বল সব ভুল। আমি দেখাতে চাই আমি একজন কেউকেটা, তোমার ওপর প্রভুত্ব করার মতন শক্তি আমার আছে, আমার চরণতলে তোমাকে পতিত হতে হবে। আমরা সবাই আমাদের অন্ধ অথরিটির প্রসার সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত।

অনেকগুলি প্রশ্নের মধ্যে পশ্চিমী মানসিকতার গতিপ্রবাহ কিছুটা ধারণা করা যায়। বিজ্ঞানের হিমালয়শিখরে আরোহণ করেও মানুষ এখন নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব তা বোঝা যায়।

প্রশ্ন : চিন্তা এবং ধ্যান কি এক জিনিস?

শ্রীচিন্ময় : মোটেই এক জিনিস নয়, বরং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর মতন। যখন আমরা ধ্যান করি তখন আমাদের লক্ষ্য সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্তি। চিন্তা হলো ব্ল্যাকবোর্ডে একটা দাগের মতন। ধ্যানের সময় ওটা মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। ধ্যানের প্রথম স্তরে কিছু চিন্তা এসে যায়, কিন্তু গভীরতম পর্যায়ে চিন্তার কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ন : যে-লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে কি ধ্যানের চেষ্টা চালাতে পারে?

শ্রীচিন্ময় : যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে ধ্যান করতে পারে, কিন্তু তার কিছু লাভ হবে না। ধ্যানের পথ আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। যদি আপনার ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকে তা হলে আপনি ঐ পথ ধরবেন না এটাই স্বাভাবিক। ধরুন, আপনি অফিসে রয়েছেন। যদি আমি বলি আপনার অফিসের অস্তিত্ব নেই, অথবা আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, তা হলে কি আমি আপনার অফিসটা কোথায় তা জানবার চেষ্টা করবো?

প্রশ্ন : যে-লোক কিছুই জানে না সে কিভাবে ধ্যানের 'একসারসাইজ' শুরু করতে পারে?

শ্রীচিন্ময় : যারা অধ্যাত্মপথে প্রবেশ করতে চায় তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা। ধ্যানে বসে প্রথমে আপনার মাথার কথা ভাবুন এবং 'সরলতা' কথাটি নিঃশব্দে সাতবার চিন্তা করুন। এবার আসুন হৃদয়ে এবং

সাতবার 'নিষ্ঠা' শব্দটি ভাবুন। তারপর নাভিতে মনঃসংযোগ করে 'পবিত্রতার' কথা ভাবুন সাতবার। এবার আপনার দুই ভ্রূ'র সংযোগস্থলের একটু ওপরে তৃতীয় নয়ন সম্বন্ধে সচেতন হোন এবং চিন্তা করুন যে আপনি দ্বিধাহীন। এবার হাতটি মাথার ওপর দিন এবং নিঃশব্দে তিনবার বলুন আমি সরল, আমি সরল, আমি সরল। এবার বুকে হাত দিয়ে তিনবার বলুন, আমার হৃদয়ে নিষ্ঠা রয়েছে। এবার নাভি স্পর্শ করে তিনবার বলুন, আমি পবিত্র। এবার তৃতীয় নয়ন স্পর্শ করে বলুন, আমি দ্বিধাহীন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এবার সজাগ হোন। যদি আপনার প্রেমময় ঈশ্বরকে পছন্দ হয় তাহলে মনের মধ্যে সাতবার বলুন—প্রেম, প্রেম। যদি আপনার শান্তি পছন্দ হয়, তাহলে এইভাবে সাতবার শান্তি আবৃত্তি করুন। যদি আপনার আলো ইচ্ছা হয়, তাহলে বলুন আলো—শুধু প্রাণহীন আবৃত্তি নয়, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করুন যেন আপনি ভালবাসা, শান্তি ও আলোর ঝরনাধারায় অবগাহন করছেন।

আর একটি অনুশীলন চাই। অনুভব করার চেষ্টা করুন যেন আপনি নিজের হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে আপনার কয়েকজন স্বর্গীয় বন্ধুকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এঁদের আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন—ভালবাসা, শান্তি, আলো, আনন্দ। এঁদের আপনি এক একটি মানুষ হিসাবে কল্পনায় আনবার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি মানসচক্ষে এঁদের দেখতে পান। যদি সব বন্ধুকে একই দিনে হৃদয়ে না আনতে পারেন—এক-একদিন এক-একজনকে নিমন্ত্রণ করুন।

এরপর আর একটি অনুশীলন। শ্বাস নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকুন এবং অনুভব করুন আপনি এই প্রাণশক্তি ধরে রাখছেন তৃতীয় নয়নে। এতে আপনার মনঃসংযোগ বাড়বে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নিয়ে হৃদয়কেন্দ্রের কথা অনুভব করুন। তৃতীয়বার নাভিকেন্দ্রের কথা ভাবুন। এতেও আপনার কিছুটা সুবিধে হবে।

প্রশ্ন : ধ্যানের শ্রেষ্ঠ সময় কোনটি?

শ্রীচিন্ময় : শ্রেষ্ঠ সময় সকাল তিনটের থেকে চারটে, যাকে আমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত বলি। বৈদিক ঋষিরা এই সময়টিই সবচেয়ে পছন্দ করতেন। কিন্তু পশ্চিমে যাঁরা রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের ঐ সময়ে শয্যাত্যাগ করতে বললে উল্টো ফল হতে পারে। কারণ যাঁরা অধ্যাত্মপথের নতুন যাত্রী তাঁদের সাত-আট ঘণ্টার ঘুম প্রয়োজন। আমি বলবো, সকাল সাড়ে-চারটে অথবা পাঁচটায় ধ্যান আরম্ভ করুন। অধ্যাত্মপথে কিছুটা অগ্রগতি হলে আপনি ঘুমের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবেন। আমার জানাশোনা অনেকে সাড়ে-পাঁচটা এবং ছটার মধ্যে ধ্যান করেন।

প্রশ্ন : আমি শান্তি খুঁজছি। আমার পক্ষে কখন ধ্যান করা যুক্তিযুক্ত হবে?

শ্রীচিন্ময় : যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় সন্ধ্যা ছটা এবং সাতটার মধ্যে।—প্রকৃতি এই সময় জীবকে সান্ত্বনা দেয়।

যদি আপনি শক্তির পূজারী হন, তাহলে শ্রেষ্ঠ সময় দুপুর বারোটা।—দিনের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে কাজের সময়।

যদি আপনার আনন্দ প্রয়োজন থাকে তাহলে সকাল পাঁচটা-ছ'টায় ধ্যান করুন। জননী বসুন্ধরা আপনাকে সাহায্য করবেন।

যদি আপনার ধৈর্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে সুযোগ মতো একটি গাছের তলায় বসে সন্ধ্যার শেষে ধ্যান করুন।

যদি ভালবাসাই আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে মধ্যরাত্রই শ্রেষ্ঠ সময়। নিজের ছবি সামনে রাখুন—আপনার হৃদয়-মাঝিই আপনাকে সাহায্য করবে।

যদি আপনার পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে তাহলে ভোরে বিছানা ছাড়বার আগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ধ্যান করুন। আপনার আত্মা আপনাকে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন : যদি আমি এই সময়-শৃঙ্খলা মানতে না পারি?

শ্রীচিন্ময় : প্রত্যেক প্রচেষ্টার একটা শ্রেষ্ঠ সময় আছে, কিন্তু তা বলে ঈশ্বরের দ্বার অন্য সময় বন্ধ থাকে না। ধরুন ব্রেকফাস্ট—সকালে খাওয়াটাই রীতি। কিন্তু ঐ খাবারগুলো যদি আপনি সন্ধ্যায় খেতে চান—খেতে পারেন, পুষ্টির অভাব হবে না—খাবারগুলো তো খারাপ নয়।

প্রশ্ন : অধ্যাত্মপথে এগোবার জন্যে কি নিরামিষ খাওয়া প্রয়োজন?

শ্রীচিন্ময় : নিরামিষ আহার অধ্যাত্মজীবনে একটা বড় ভূমিকা নেয়। এই আহার আমাদের পবিত্র হতে সাহায্য করে। আমরা যখন মাংস খাই তখন কিছু পশুপ্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে। মাছ তো আরও খারাপ। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আলস্য, সঙ্কীর্ণতা এবং বিবেকহীনতা। শাকসব্জি, ফল আমাদের নম্রতা দেয়, মিষ্টতা দেয় এবং পবিত্রতা দেয়। সুতরাং নিরামিষাশী হলে ভাল। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ঠাণ্ডা দেশ আছে যেখানে কেবল শাকাহার করে জীবনধারণ করা শক্ত। সেখানে অবশ্যই মাংসাহার করতে হবে। কারণ, তা না হলে মন চাইলেও শরীর বিদ্রোহ করবে। শাকাহারী না হলে ঈশ্বর-অনুভূতি হবে না এ কথা ঠিক নয়। যীশুখ্রীস্ট, বিবেকানন্দ এবং আরো অনেক মহাপুরুষ মাংস খেতেন।

অধ্যাত্মপথ ছাড়াও শত-শত অন্য প্রশ্ন আছে। এই সব প্রশ্ন করেন এমন সব মানুষ যাঁরা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে কৃতী, কারও কারও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

একজনের প্রশ্ন : দুনিয়ার সবাইকে সন্দেহ করার প্রবৃত্তি আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি?

শ্রীচিন্ময় : প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে এই সন্দেহপ্রবৃত্তি থেকে আমার কোনো উপকার হয়েছে কিনা। দেখবেন, কিছুই হয়নি। সন্দেহ-বশবর্তী হয়ে আপনি আরও নিচে নেমে গিয়েছেন। তারপর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কি বোকা? না বুদ্ধিমান? আপনি নিশ্চয় বোকা নন, সুতরাং আপনাকে বুদ্ধিমানের মতন কাজ করতে হবে।

তারপর খুঁজতে হবে, সন্দেহটা কোথায়? মনে না শরীরে? মনের সন্দেহ পর্বতের মতো অনড়। মনের এই সন্দেহকে বলুন—আপনার কাছ থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া আমি কিছুই পাইনি, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনি আমার বন্ধু। এখন বুঝছি, আপনি আমার শত্রু, সুতরাং সত্বর আমার এই গৃহ ত্যাগ করুন। আমার এই স্বল্পপরিসরে আপনার জন্য কোনো স্থান নেই।

আরও মনে রাখতে হবে, চিরকাল কেউ শত্রু থাকে না। আপনার অন্তর যখন প্রকৃত আলোকে ভরে উঠবে তখন সন্দেহ আপনার মনে প্রবেশ করলেও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, বরং নিজেই আলোকিত হয়ে উঠবে।

অবশেষে নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীচিন্ময় ঘোষের সঙ্গে। সায়েব-মেমরা সামনে বসে রয়েছেন, কিন্তু তিনি সস্নেহে আমার সঙ্গে বাংলা কথায় মশগুল হয়ে উঠলেন। সায়েবরা কিছু মনে করলেন না—বাংলাকে এঁরা এমনভাবে শ্রদ্ধার আসনে বসালেন কেন কে জানে!

মানুষের অন্তরের শান্তি, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক, মানব সমাজের অনন্ত জিজ্ঞাসা থেকে শুরু করে সুদূর বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নলিনীকান্ত গুপ্ত অনেক কথাই উঠলো। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে শৈশব ও বাল্যকাল কাটিয়েও আমি যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠিনি তা হয়তো শ্রীচিন্ময় আন্দাজ করলেন। আমি বললাম, "আমার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পেনডুলাম সারাক্ষণ দুলছে। আমি এই ভাবনাকে বাধা দিইনি, কারণ পরিপূর্ণ সমর্পণ করলে গল্প-লেখকের 'অপ্রত্যাশিত' হবার শক্তি শেষ হয়ে যায়।"

শ্রীচিন্ময় মৃদু হেসে এমারসন থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, "তুমি নিজে ছাড়া কেউ তোমার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে না।"

আমি ভাবছি, আমার সমস্ত বিস্ময়ের পর্ব চুকিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবো, "আপনি কোন শক্তিতে বিদেশে এই বিপুল শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েও অন্য অনেকের মত সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন না, অথবা বিপুল বৈভবের মধ্যে ডুবে রইলেন না—যা এদেশের করা খুবই সহজ ছিল।" (আমার কাছে খবর আছে, তাঁর নিজের একটা গাড়িও নেই—ইউ-এন অফিসের কোনো

কোনো স্বেচ্ছাসেবী তাঁকে পালা করে বাসস্থান জামাইকা থেকে মেডিটেশন সেন্টারে নিয়ে আসেন এবং পৌঁছে দেন।)

কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের সময় পাওয়া গেল না। শ্রীচিন্ময় তখন কলকাতার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় তাঁর ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। চক্রবর্তী চ্যাটার্জির দোকানে বই কিনেছেন। কিছুদিন আগে জন্মভূমি বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন—সে-সব গল্পও চলতে লাগলো। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শিশির ঘোষের কথাও উঠলো।

বুঝলাম, শ্রীচিন্ময় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ডুবে আছেন। সুদূর প্রবাসে নিজের লেখা গানের মধ্যে বারেবারে ওঁর ছায়া এসে যায়।

কথা বলতে-বলতে আমরা দুজনে সুবিশাল রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের পিছনে ইউ-এন ভবন গগন স্পর্শ করছে। সামনেই পরম পরাক্রান্ত মার্কিনীদের ইউ-এন সংক্রান্ত দপ্তর এবং তারই পাশে টার্কিস সেন্টার, আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থল।

আমার খুব আশ্চর্য লাগলো, ধুতি-পাঞ্জাবি ও পাম্পশু পরে, নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে, শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের মতন বিশ্ববিজয় করা আজও তাহলে সম্ভব!

শ্রীচিন্ময় ঐসব ব্যাপারে মোটেই ব্যস্ত বলে মনে হলো না।

"দেশের জন্যে চিন্তা হয় না?" আমি জানতে চাইলাম।

"যাদের রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রয়েছে তাদের আবার চিন্তা কী?" এই বলে উদাসী শ্রীচিন্ময়কুমার নিউ ইয়র্কের রাজপথ ধরে আপন মনে হাঁটতে লাগলেন।

"বিত্তসাধনার দেশ আমেরিকা বেড়াতে এসে শুধু মোক্ষসন্ধানীদের পিছনে সমস্ত ব্যয় করলে চলবে কী করে?"

নিউ ইয়র্কে এসে পুরো দু'দিন আমি শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষের খবরাখবর করছি জেনে রসিকতা করলো আমাদের হাওড়া-বিবেকানন্দ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডাক্তার তপন সরকার—কালি কুণ্ডু লেন টু কাসুন্দে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম টু কলেজ স্ট্রীট মেডিক্যাল কলেজ টু লন্ডন রয়াল কলেজ অফ মেডিসিন। তারপর লম্বা এক লাফে অতলান্ত মহাসাগর পেরিয়ে নিউ ইয়র্ক এবং সেখানে ডাক্তারি।

যেসব ডাক্তারের 'মাটিয়া কলেজ' চত্বরে বদনামের শেষ নেই তারাই সাগরপারে গিয়ে হীরে-মানিক কুড়োয়। বাঙালি ডাক্তারের ফুল বিদেশে গেলেই ফোটে! তাদের গ্যারেজে থাকে রোলস্ রয়েস এবং মার্সেডিস বেন্‌জ, সমুদ্রের ধারে বাঁধা থাকে প্রমোদতরণী যার নাম ইয়াট। কেউ-কেউ আবার প্রাইভেট এরোপ্লেন কিনে ছোটবেলায় প্রাণখুলে না-উড়তে পারার বাসনাটা পুরিয়ে নেয়।

তপন সেই ধরনের ছেলে যে বিদেশি ডিগ্রী ও সাফল্যতে মোড়া থাকলেও 'ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী'। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওড়া-কাশুন্দে সম্বন্ধেই তার উৎসাহ বেশি। অ্যান্ড হোয়াই নট?

সারা আমেরিকার লাখ-লাখ সফল নরনারী এখনও প্রাণভরে তাদের পূর্বপুরুষের ছেড়ে-আসা ইউরোপীয় গাঁ অথবা শহরের প্রশংসা করছে। বলছে, পেটের দায়ে বাপ-পিতামহ দেশত্যাগী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুনিয়ার এমন জায়গা নেই যেখানে আমার শিকড়—সারা জঁহা সে আচ্ছা!

আর ধন্য এই মার্কিন মুলুক, এখানে নিজের কম্মোটা মন দিয়ে ক'রে লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে মানুষ যা-খুশি করার স্বাধীনতা পায়। তোমার রোজগারের টাকা কোথায় খরচ করবে, কেমনভাবে খরচ করবে এসব বিষয়ে সরকার কোনো ফতোয়া জারি করে না। এমন কি কেউ বলে না, তুমি 'প্রভিনসিয়াল,' তুমি অমুক, তুমি তমুক।

সাফল্যের এই দেশে মানুষের কলজের জোর আছে, শিরদাঁড়া সোজা আছে। তাই লোকে ধরেই নিয়েছে, তোমার বাপ-পিতেমো যদি আয়ারল্যান্ড থেকে এসে থাকেন তাহলে ওই দেশ সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা তো থাকবেই। তুমি ইহুদির লেড়কা, দুনিয়ার ইহুদি সম্পর্কে তুমি তো ভাববেই। তুমি ইতালিয়ান বংশোদ্ভুত—তুমি তো একটু-আধটু ইতালিয়ানদের দিকে টেনে কাজকর্ম করবেই। কোনো আপত্তি নেই, যতক্ষণ এই কমপিটিশনের বাজারে হেরে গিয়ে নিজের প্যান্টুল খুলে তোমাকে পালাতে হচ্ছে না। যতক্ষণ তুমি অর্থনৈতিকভাবে লড়ে যাচ্ছো এবং যতক্ষণ পাবলিক তোমাকে চাইছে ততক্ষণ তুমি কোনো ভুল করতে পারো না।

প্রতিযোগিতার তীর্থভূমি এই মার্কিনমুলুক। অপদার্থ এবং ব্যর্থদের জন্যে চোখের জল ফেলবার সময় এখানে যেমন কারও নেই, তেমনি বিজয়ীদের পায়ে শিকল পরিয়ে সারাক্ষণ তাদের পিছনে কাঠি দেবার দুঃসাহসও কারও নেই।

কাজকর্মের কেত্তন চলেছে অষ্টপ্রহর। সারা দুনিয়া থেকে মানুষ বুকের মধ্যে অসীম উচ্চাভিলাষ নিয়ে এখানে ছুটে আসছে বিত্তলক্ষ্মীর বিজয়মুকুট নিজের মাথায় পরবার জন্যে। রুজি-রোজগারে ফেল করে মোক্ষ চাও? তাহলে বাছাধন ইন্ডিয়ায় যাও, ইন্দোনেশিয়ায় যাও।

পকেটে টু-পাইস জমিয়ে তারপর যদি মোক্ষ-টোক্ষ ব্যাপারে মন চনমন করে তাহলে এখানে নো অবজেকশন। ফলে মজার ব্যাপারও হচ্ছে। বিত্তবান ফোর্ডের ছেলে যেমন মোক্ষসন্ধানী হচ্ছে, তেমনি মোক্ষের পথ প্রদর্শন করতে এসে সর্বত্যাগী গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, যিনি একদা নিজের দেশে বিরজা হোম নামক নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করেছিলেন, তিনি সোনার শিকলে বাঁধা পড়ছেন।—সন্ন্যাসী চাইছেন রোল্‌স রয়েস, ইঙ্গিত দিচ্ছেন—বলো না কোথায় ললনা?

এক বঙ্গবালা নিউ ইয়র্কে বসে আমাকে বলেছিলেন, "কাজের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সমস্ত জাতটা। এখানে হেরেছো তো মরেছো, এখানে ঠকেছো তো ডুবেছো, এখানে জিতেছো তো সারা দুনিয়াটাই তোমার। সাফল্য-সচেতন সমাজ—রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড সোসাইটি। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে বলে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়েছিলেন। এখানে জন্ম থেকেই শিশুরা জানে, করতে না পারলে মরতে হবেই—হয়তো না খেতে পেয়ে নয়, কিন্তু অপমানে কিংবা কিছু না করতে পারার দুঃসহ মানসিক জ্বালায়।"

এই মহিলাকে সবিনয়ে বলেছিলাম, "ভদ্রে, আপনার ইঙ্গিত আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, আমাকে একটু চান্স দিন। শুধু মোক্ষসন্ধানীদের গলায় মালা পরাবার জন্যে আমার এই দেশে পুনরাগমন নয়। আমি এবার চোখ এবং কান যতটা সম্ভব খুলে রেখে রাস্তা চলবো—হুজুগে পড়ে সমস্ত সময় অপচয় করার বাঙালিসুলভ দুর্বলতা যতটা পারি এড়িয়ে চলবো।"

ঠিক এই সময় প্রবীর রায়ের খবর পাওয়া গেলো। প্রবীরের কথা প্রথম শুনেছিলাম ডাক্তার তপন সরকারের কাছেই। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে বিপন্ন বঙ্গ সন্তানদের অগতির গতি বলতে এই প্রবীর রায় যে কোন ব্যাপার আটকে গেলে বিগতযুগের বাংলায় যেমন হরি ঘোষের গোয়াল ছিল তেমনি বিদেশে বিপদগ্রস্ত বাঙালিদের নিজস্ব ঠিকানা এই প্রবীর রায়ের টেলিফোন নম্বর। স্থানীয় মহলে যা জানা গেলো, পরোপকার করাটা এই বিয়াল্লিশ বছরের বঙ্গসন্তানটির একটি মুদ্রাদোষ অথবা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তপনের সঙ্গে যখন দেশে দেখা হয়েছিল তখন বলেছিল, "আপনি যখন নিউ ইয়র্কে আসবেন তখন আমি স্টেটসে না-ও থাকতে পারি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, প্রবীর রায়ের টেলিফোন নম্বর তো আপনার কাছে রইলো।"

আমি ভেবেছিলাম বাড়িয়ে বলাটাই বাঙালিদের স্বভাব-ধর্ম। আমাদের যা কিছু সামর্থ্য এবং দুর্বলতার উৎস হলো এই অতিরঞ্জন প্রবণতা। কিন্তু প্রবীর রায় সম্পর্কে সব জানবার পরে প্রবাসী বাঙালিদের আমি অত্যুক্তিদোষ থেকে মুক্তি দিয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত খবরাখবর নেবার পরে, আমার মনে সন্দেহ রইলো না, নিউ ইয়র্কে ট্যুরিস্ট হিসেবে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দর্শনের পরে কোনো বঙ্গসন্তানের পরবর্তী অবশ্যদর্শনীয় এই প্রবীর রায়।

না, অযথা আশঙ্কা-অনলে দগ্ধ হবেন না। প্রবীর রায় কোনো আধ্যাত্মিক পুরুষ নন। আর পাঁচজন ভোগী গৃহীর মতন বিয়ে-থা করে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে প্রবাসে সংসারযাত্রা করছেন চুটিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে উপদেশ দিয়েছিলেন—রোজগারপাতি করে দোলদুর্গোৎসব চালাও। সব লোক এই ভবসংসারে বৈরাগী হবার মনস্থ করলে সৃষ্টিকর্তার মূল উদ্দেশ্যেই তো বালি পড়বে! একবার তো বৌদ্ধযুগে ওই কাণ্ড ঘটেছিল—দেশের সেরা পুরুষগুলো দলে-দলে মুণ্ডিতমস্তকে সঙ্ঘে প্রবেশ করলো, সেকেন্ড-রেট্ মানুষগুলো কেবল ঘরসংসার করলো। ফলে পরবর্তী প্রজন্মে ভারতবর্ষের অকল্পনীয় অবনতি ঘটলো।

কিন্তু সংসারে এক এক জন লোক থাকেন যাঁরা বিষয়ের মধ্যে থেকেও নিরাসক্ত, বৈরাগী—এই ধরনের ক্যারেকটার বাংলা উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা এক সময় খুব পছন্দ করতেন। এঁরা বিষয়-রসে ডুবে থাকলেও এঁদের মনে লোভের চ্যাটচেটে ভাব থাকে না, ফলে কোনো ব্যাপারেই এঁরা অহেতুক সেঁটে গিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব করেন না।

আরও শুনলাম, প্রবীর রায় একজন কাজ-পাগলা লোক। সমাজসেবা করেন বলে নিজের বৈষয়িক কাজে মন দেন না এমন নয়।

তপন বলেছিল, "লোকটা কাজের নেশায় মাতাল—ইংরিজীতে যাকে বলে ওয়ার্কোহলিক অর্থাৎ ওয়ার্কের অ্যালকোহলে যে মজেছে। কিন্তু তারই মধ্যে দেশের জন্যেও যথেষ্ট ভাবে এবং কাজও করে। যে কোনো দায়িত্ব ওর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—আমেরিকান কর্মদক্ষতা এবং ভারতীয় হৃদয়বেত্তা দিয়ে সে-কাজ প্রবীর করবেই।"

তপন বলেছিল, "যখন দেখা হচ্ছেই তখন প্রবীরের কাছেই শুনবেন, গোটা পঞ্চাশেক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট—যাদের আপনারা সি-এ বলেন, ১৯৭৯ সালে দুটো ফ্লাইটে কলকাতা ছেড়ে নিউ ইয়র্কে চলে এসেছিল। তারপর তারা কিভাবে দিগ্বিজয় করলো।"

আর একজন রসিকতা করলো, "যারা ভাবে বাঙালি কুঁড়ে, বাঙালির মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার নেই, ভেঞ্চারও নেই, যারা চুপিচুপি বলে বেড়ায় উদ্যমহীন বাঙালি উচ্ছন্নে গিয়েছে, বাঙালির দ্বারা 'কিসসু' হবে না, তারা একবার এই পঞ্চাশটা বাঙালি সি-এ'র বিদেশযাত্রার ইতিহাসটা সবিস্তারে সংগ্রহ করুক। তারপর বুঝবে এককাট্টা হলে এই ভেতো বাঙালি এখনও কী করতে পারে!

যাদের ধারণা পরস্পরের পিছনে লাগা, পরনিন্দা ও পরস্পরকে ডোবানো ছাড়া বাঙালি অন্য কোনো বিশিষ্টতা নেই তারাও চলে আসুক এই পঞ্চাশটি যুবকের জীবনবিচিত্রা সংগ্রহ করতে। বাঙালি বালকরা স্বদেশের ইস্কুলে বসে শুধু দুলে দুলে অকুতোভয় শ্বেতাঙ্গ পিলগ্রিম-ফাদারদের কথাই পড়বে, আর সত্তর দশকের দূরদর্শী সংগ্রামী বঙ্গীয় যুবকদের জানতে পারবে না, তা কেমন করে সহ্য হয়?"

প্রবীর রায়ের সঙ্গে প্রথম দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফস্কে গেলো। তিনি নাকি হঠাৎ ফেঁসে গিয়েছেন। দোষ ওঁর নয়, একজন প্রবাসী বাঙালি মহিলা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। প্রবীর রায় ওই ব্যাপারেই জড়িয়েছেন, তাই দেখা না-হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। শ্মশানসঙ্গী হিসেবে বাঙালিরা যে পৃথিবীর এক নম্বর জাত তার পরিচয় মার্কিন দেশেও মিললো।

দ্বিতীয় দিনে দেখা হলো। প্রবীর রায়ের সায়েবী অফিসের সুবচনী মেমসায়েব মধুকণ্ঠে কটা বেজে ক' মিনিটে কোথায় মিস্টার রে'র সঙ্গে দেখা হবে তা জানিয়ে দিলেন। এই এক মুশকিল এই দেশে। ডায়াল করেছিলাম, কিন্তু তোমার লাইন পাইনি, বলার উপায় নেই। বেঁচে থাকুন কলকাতা টেলিফোনের কর্তাব্যক্তি এবং কর্মীরা! ওঁদের দোহাই দিয়ে যে-কোনো যোগাযোগ চেষ্টাকে যতদিন খুশি ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব। টেলিফোনে কাউকে পাওয়াটাই যেখানে অঘটন সেখানে যে-কোনো মিথ্যাচার ওঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করা যায়। আর পশ্চিমে চলেছে সামর্থ্যের প্রতিযোগিতা। চব্বিশ ঘণ্টার সময়কে রবারের মতন টানতে-টানতে প্রতিটা মিনিট থেকে এরা কর্মরস নিংড়ে নিতে চায়। তাই মিনিট অনুযায়ীই অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়, কাল অনন্ত এই বলে আমাদের মতন হাত গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই।

প্রবীরের যে ভাবমূর্তি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম বাস্তবে তার সঙ্গে মিললো না। ভেবেছিলাম একটি মার্কিন ছাঁচে ঢালাই-করা ভূতপূর্ব বাঙালিকে দেখতে পাবো। কিন্তু মোটেই তা নয়। এই রকম হাবভাব ও চালচলনের সাধারণ বাঙালিকেই তো বি-বা-দী-বাগ-এর আশেপাশে ট্রাম-বাস ও মিনির জন্য অপেক্ষা করতে দেখি। একটু লজ্জা হলো। ওঁদের, অর্থাৎ ওই বিবাদীবাগী বাঙালি দেখে ভাবি, মোস্ট অর্ডিনারি, বিশ্বসংসারের কোনও শক্ত কাজ ওঁদের দ্বারা হবে না। ধারণাটা যে পঁচাপচা তা প্রবীর রায়ই প্রমাণ করে দিচ্ছেন। স্লিম শরীরের শ্যামবর্ণ বাঙালি। সাধারণের তুলনায় একটু লম্বা, বেশবাস সম্বন্ধে একটু উদাসীন—কোথাও কোনো এ-আর-আই (অনাবাসী ভারতীয়) ছাপ নেই।

অচিরেই আড্ডা জমে উঠলো। বললাম, "পঞ্চাশজন সি-এর মার্কিনমুলুক বিজয় সম্বন্ধে কিছু শুনেছি।"

হাসলেন প্রবীরবাবু। "পঞ্চাশ নয়—শেষ পর্যন্ত আটচল্লিশ। দু'জন ফিরে গিয়েছিল ডিজগাস্টেড হয়ে—ওদের জন্যে কিছু করা গেলো না," দুঃখ করলেন প্রবীর রায়। যেন ওই দুটো বঙ্গীয় ব্যর্থতার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী।

জানা গেলো, "এই আটচল্লিশজন সি-এ এদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে—কাজকর্ম খারাপ করছে না। আর খারাপ করবেই বা কেন? আমরা তো কোনো ভাবেই কারও থেকে ইনফিরিয়র নই।"

'ইট নিট রেস্তোরাঁর ব্যাপারটা কী? দেশে ফিরে গিয়ে দোকানটা আমাকে দেখতেই হবে।"

"আপনি ডালহৌসি পাড়ার নেতাজী সুভাষ রোডে আমাদের ফেবারিট চায়ের দোকানটার তথ্যও শুনে নিয়েছেন! একসময় সায়েবপাড়ার চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ফার্মের ছেলেরা ওখানে আড্ডা জমাতো। ওই দোকানে বসে-বসেই তো আমাদের বিদেশে আসবার পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল।"

প্রবীরের মুখেই শোনা গেলো—সে এক দুঃসময়। সত্তর-একাত্তর-এর কলকাতা—সর্বত্র হতাশা। কলকাত্তাওয়ালী কালীর বেপরোয়া নৃত্য চলেছে—ডুবতে বসেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রমোদতরণী। ব্যবসা থাকলে তো হিসেব, হিসেব থাকলে তো হিসেবরক্ষক। তরুণ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টদের চোখের সামনে অন্ধকার। বড় বড় অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে সায়েব সাজার স্বপ্ন উধাও। লাভলক লুইস, ফার্গুসন, প্রাইস ওয়াটার হাউসের মতন বিখ্যাত অডিট প্রতিষ্ঠানের অনেক তরুণের মধ্যেও তখন বিভ্রান্তি। সেই সময় কে খবর আনলো, আমেরিকা দরজা খুলছে। সেখানে এখন যাওয়া সম্ভব।

"তার পরের ব্যাপারটা ড্রামাটিক বলতে পারেন। ১১ই অক্টোবর ১৯৭১ এবং ১৩ই অক্টোবর কলকাতা থেকে দুটো ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে পঞ্চাশজন বাঙালি সি-এ দেশছাড়া হলো—বিগেস্ট এক্সোডাস্ অফ সি-এজ ইন হিস্টরি বলতে পারেন!"

সেই দলে প্রবীরবাবু কেন নাম লেখালেন তা আমি অন্য সূত্রে শুনেছি। যে-অফিসে চাকরি করছিলেন সেখানে সম্পর্কটা ভাল চলছিল না। একটু উত্তেজনা, একটু প্রতিবাদ, একটু কথা কাটাকাটি—বাঙালির রক্তে বিপ্লব ও প্রতিবাদের জীবাণু তো এখনও সম্পূর্ণ উধাও হয়নি। প্রবীর রায় অবশ্য ওসব কথা তুললেন না, শুধু বললেন, "আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এখনও ভীষণ স্বার্থপর, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা—মানুষকে সম্মান দেবার শিক্ষা ওখানে যে কবে হবে!"

আমি বললাম, "হবে, কিন্তু বেশ দেরি হবে। মানুষ যতদিন সহজলভ্য থাকবে, তু করে ডাকলেই যতদিন হাজার-হাজার হা-ঘরে একটা চাকরির জন্যে

ছুটে আসবে ততদিন মানুষ তার মর্যাদা ফিরে পাবে না।"

প্রবীর রায় বললেন, "নিউ ইয়র্কে এসে আমরা অথৈজলে পড়লাম। কোথায় হাজার-হাজার ডলার পকেটে পুরে ফরেন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন, আর কোথায় বেকারত্বের অভিশাপ, তা-ও আত্মীয়হীন বিদেশে। তারপরেই এলো হাড়কাঁপানো শীত। আমাদের দমিয়ে দেবার পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। শুধু আমরা নই—নিউ ইয়র্কের পরপর কয়েকটা বাড়িতে তখন প্রায় এক হাজার বাঙালি ইমিগ্র্যান্ট—কারও কোনো চাকরি নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট সবাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে-কোনো নিয়োগপত্রের জন্যে। এক-এক ঘরে গাদাগাদি করে তিন-চারজন লোক—সবাই একসঙ্গে চাকরি খুঁজতে বেরুচ্ছে। হাজার-হাজার কপি বায়োডাটা নিয়ে শত-শত নিঃসম্বল মানুষ দরজায়-দরজায় ধরনা দিচ্ছে—অথচ দেশে এদের অনেকেরই রুজিরোজগার ছিল। কে যেন মন্তব্য করেছিল তখন, একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

"তারপর?" আমি জানতে চাই।

উৎপাটিত বাঙালি তো নেতিয়ে পড়ে না, তার বুকের বাঘটা তো তখনই হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। এই বাঘটাই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং রাখবে। এই বাঙালি-বাঘকে সমীহ করে না এমন জীব এখনও সৃষ্টি হয়নি।

প্রবীরবাবু বললেন, "চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের আবার ইউ-এস-এতে বাড়তি মুশকিল। ইন্ডিয়ান সি-এর শিক্ষাগত যোগ্যতার এদেশে স্বীকৃতি নেই। সি-এর আমেরিকান কাউন্টারপার্ট হলো সি-পি-এ। আমেরিকান সি-পি-এ ফার্মগুলির ধারণা আমরা কোনো আজব দেশ থেকে এসেছি—আমরা ডেবিট ক্রেডিট জানলাম কী করে তাই বুঝতে পারে না।"

বেকার বাঙালিরা সবাই তখন অড্-জব খুঁজছে। প্রবীর রায় বললেন, "সে হোক টেবিল চেয়ার মোছা, 'বাথরুম সাফ করা বা প্যাকিং বাক্স নড়ানো অথবা লরিতে মাল তোলা—যে কাজই হোক। তখন কলকাতার কত ডাক্তারবাবু এদেশে ঘণ্টা হিসেবে নাইট-শিফটে দারোয়ানের কাজ করছেন কয়েকটা ডলারের বিনিময়ে। দেশের আত্মীয়রা ভাবছেন, ছেলে আমার ফরেনে গিয়েছে বড় কাজ নিয়ে!"

প্রবীর বললেন, "তখন আমেরিকান সিস্টেমের হাওয়া কিন্তু আমাদের গায়ে লেগেছে। ডাকে আবেদনপত্র পাঠিয়ে লাভ নেই—অফিসে-অফিসে ঢুঁ মারা। সবাই এক অফিসে ভিড় করে লাভ নেই—পথখরচ বাঁচানোর জন্যে এক একজন এক-এক অঞ্চলে যাও। তারপর দেখা করো কোনো এক কমন জায়গায়। দিনের শেষে আমরা দেখা করতাম নিউ ইয়র্ক লাইব্রেরিতে। তার একটা কারণ লাইব্রেরির টয়লেট ব্যবহার করা যায়—সারাদিন তো কোথাও ঢোকবার জায়গা

নেই। যেখানেই যাই সেখানেই ইন্ডিয়ানদের জন্যে নো ভেকান্সি। আমরা নিজেরাও বাজার খারাপ করে দিচ্ছি—একই অফিসে চোদ্দ পনেরোজন ইন্ডিয়ান চাকরির জন্য ফোন করছি।"

বিকেল চারটে থেকে এক ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অড্‌-জব করতেন প্রবীরবাবু। "লেম ব্রান্টে আমার কাজ ছিল শীতের কোট ২৮ থেকে ৪৬ সাইজ পর্যন্ত রঙ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা এবং অন্য এক বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত এই কাজ চলতো—তখন প্রতিদিন পেতাম পনেরো ডলারের মতন। আমাদের ঘরভাড়া ছিল সপ্তাহে সাতাশ ডলার। বাকি যা থাকতো তাতে আমাদের ঘরের তিনজনেরই খাওয়ার খরচ চলে যেতো। ওরা দুজন তখন হোলটাইম চাকরি খুঁজছে—সব অফিসে ব্যক্তিগত রিজিউমে পাঠাচ্ছে, "অ্যাকাউনটেন্সির হেন কাজ নেই যা আমি নিজের দেশে না করে এসেছি—আমাকে পেলে তুমি বর্তে যাবে'।

"বাঙালি বেকারদের একবার হোলসেল রেটে সাময়িক কাজ জুটে গেলো। একজন এজেন্ট বললো, 'কতজন লোক আনতে পারো'? বললাম, যত চাও। শেষ পর্যন্ত তিরিশ জনের কাজ হলো ঘণ্টায় আড়াই ডলার হিসেবে ব্লু ক্রশ-এ।"

কিন্তু প্রফেশনাল চাকরি? কেউ অচেনা ইন্ডিয়ান অ্যাকাউটেন্ট নিতে উৎসাহী নয়। এক ইটালিয়ান ভদ্রলোক—নাম রবার্ট বেনেগুরা, অবশেষে সহানুভূতি দেখালেন। বললেন, "আমি সিমপ্যাথেটিক—কিন্তু পার্টনারদের বোঝাই কি করে যে তুমি কাজের লোক?"

প্রবীরের সোজাসুজি উত্তর : "যে কোনো রেটে পনেরো দিন ট্রায়াল দিন। তবে একটি শর্তে।" সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "মাইনে বাড়াবার শর্ত?" প্রবীর বললেন, "সেটা আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আমার শর্ত : আমার কাজ পছন্দ হলে আমার আরও কয়েকজন বন্ধুকে চান্স দেবেন।" সায়েব তাজ্জব, কিন্তু রাজি হলেন।

প্রবীর রায় বললেন, "চাকরিতে ঢুকেছিলাম ২৮শে নভেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর ট্রায়ালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। সাড়ে-সাঁইত্রিশ ঘণ্টার সপ্তাহের জন্যে মাইনে দাঁড়ালো ১৫০ ডলার এবং সবচেয়ে যা আনন্দের, ক্রমে-ক্রমে বারোটি বঙ্গসন্তানের অন্নসংস্থান হলো ওখানে।"

এই সময় অ্যাকাউন্টিং-এর কাজে যেসব অফিসে যেতেন প্রবীর সেখানেই খোঁজ করতেন লোক লাগবে কিনা এবং লাগলে সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি বেকার প্রবাসীর চাকরির ব্যবস্থা হতো। মেঘ কেটে যাচ্ছে—রবার্ট বেনেগুরা নিজে ইমিগ্রান্ট হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন, তাই এদের দুঃখ বুঝেছিলেন এবং

সেই সুবাদেই এদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।

এরপর সকলের চেষ্টা আরম্ভ হলো, কি করে এদেশে সি-পি-এর স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান সি-এদের ব্যাপারটা আমেরিকানদের অজানা—পরীক্ষায় কোনো ছাড় নেই। তখন দেখা গেলো এম-বি-এ হলে ব্যাপারটা ওঁদের অনেক সহজ হতে পারে। নিউ ইয়র্কের বাঙালি সি-এ-রা তখন ঝাঁকে ঝাঁকে এম-বি-এ পড়ছে। বাপের হোটেলে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনার অভ্যাস করে এসেছে বাঙালি—পরীক্ষায় তাদের বেকায়দায় ফেলা অত সহজ নয়, বললেন প্রবীর রায়।

একটু চান্স পেয়েই, এক বছর পরে প্রবীর রায় পুরনো চাকরিটা ছাড়লেন। সরে না পড়লে এদেশে মাইনে বাড়ে না। ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে প্রবীরের মাইনে দাঁড়ালো বাৎসরিক পনেরো হাজার ডলার। নতুন অফিসে ছয়-সাত জন বঙ্গসন্তানের কাজও জুটলো।

আত্মোন্নতি ছাড়া তখন এই প্রবাসী যুবসম্প্রদায়ের আর কোনো লক্ষ্য নেই। সবাই নানা বাধা সত্ত্বেও সি-পি-এ পরীক্ষায় বসতে লাগলো। ইন্ডিয়ান ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে ঘাড় গুজে লিখিত পরীক্ষায় বাজিমাত করার ব্যাপারে ভারতীয়রা তুলনাহীন।

"আমেরিকান অ্যাকাউনটেন্টের তকমা নিয়ে অবশেষে যে-অফিসে গটগটিয়ে ঢুকলাম তার নাম ল্যাভেনথল অ্যান্ড হরওয়ার্থ। ওঁদের দু'শ ব্রাঞ্চ, কাজকর্ম দেখে কর্তারা খুব খুশি। ইঙ্গিতে বুঝলাম এইভাবে এগোলে যথাসময়ে পার্টনারশিপও পাওয়া যেতে পারে। আরও কিছুদিন কাজ করে, ছুটি নিয়ে দুনিয়া দেখতে বেরোলাম। ওয়ার্লড ট্যুর করে এসে হঠাৎ মনে হলো, চাকরির জন্যেই কি বাঙালির জন্ম হয়েছে? আমরা কি নিজের চেষ্টায় কিছু করতে পারবো না!"

প্রবীর রায় নিজের মনেই বললেন, "দুম করে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে। নিজেই কোম্পানি করলাম। ইন্ডিয়ান ক্লায়েন্ট বেশি ছিল না, বেশির ভাগ এদেশীয়—একজন ইটালিয়ান ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছিল বাড়ি, কারখানা ইত্যাদি তৈরির কারবার। কনস্ট্রাকশন লাইন থেকে অনেক বন্ধুকে আস্তে-আস্তে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটা ভাগ্য, যে-ক্লায়েন্ট আসে সে আর চলে যায় না। প্রতি বছরই নতুন কিছু ক্লায়েন্ট জোটে—তাই বাড়তে-বাড়তে একাধিক অফিস আমাকেও করতে হয়েছে। কনসট্রাকশন সংক্রান্ত হিসেব-নিকেশের কিছু স্পেশাল জ্ঞানও হয়েছে।"

বেশ ক'জন সায়েব এখন প্রবীরবাবুর ফার্মে কাজ করেন।

কিন্তু চার্টাড অ্যাকাউনটেন্সি ফার্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি এই সাক্ষাৎকার নিতে

আসিনি। বিদেশে বাঙালিদের সাফল্য সম্পর্কে যে সংবাদ নেবার জন্যে এসেছি তার ইঙ্গিত এবারে দিতে হলো।

প্রবীরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যারা একদিন অড-জবের জন্যে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেরিয়েছে তারা এখন গুছিয়ে বসেছে। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কেও এই কথাটা বলতে পারেন। এই তো খবর বেরিয়েছে, এ-দেশে যত এথনিক গ্রুপ আছে তার মধ্যে এখন ভারতীয়দেরই গড় আয় সবচেয়ে বেশি! আগে ছিল আইরিশ, তারা পিছু হটেছে। নিজেদের নিষ্ঠা ও সাধনায় ভারতীয়রা এই সম্মান অর্জন করেছেন।"

ব্যাপারটা যে সোজা নয়, বেশ বুঝতে পারছি। এই তো এখানকার কাগজে রিপোর্ট পড়লাম, প্রতি একলাখে ১৩৬ জন মিলিয়নেয়র আছেন এই দেশে। টাকার হিসেবে প্রতি লাখে ১৩৬ জন কোটিপতি! নর্থ ডাকোটাতে এঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রতি লাখে ৫৬৫ জন!

প্রবীরবাবু বললেন, "নিউ ইয়র্ক এবং লাগোয়া আরও দুটি স্টেটে হাই ইনকাম ব্র্যাকেটের অনেক বাঙালির সঙ্গেই আমার যোগাযোগ। এঁদের অনেকের হিসেবই শুধু আমি রাখি না, টাকাটা কিভাবে খাটানো যায় তার দায়িত্বও আমার ওপরে তুলে দেন এঁরা।"

আমি বললাম, "তাজ্জব ব্যাপার! কলকাতায় তো বাঙালিরা অন্য প্রদেশের বড়লোকদের হাতে নিজের ভদ্রাসন বেচে দেবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে, বাঙালির নিজস্ব ভিটে বলতে কিছুই এই চার্নক সায়েবের নগরীতে থাকবে না। এইসব শুনে যখন মন খারাপ হচ্ছিল তখন শুনলাম বাঙালিরা নিউ ইয়র্ক শহরে বিরাট এক ম্যানসন বাড়ি কিনে নিয়েছে যেখানে বত্রিশটি পরিবার থাকতে পারে। বাড়ির নতুন নাম : বঙ্গভবন। নিউ ইয়র্ক শহরের কাছে বিরাট এক সম্পত্তির মালিকানাও এখন তাঁদের হাতে। সেখানে নাকি নতুন একটা শহরের পত্তন হবে।"

প্রবীরবাবু স্বীকার করলেন, আমি খুব মিথ্যে শুনিনি। ছ'মাইল লম্বা একটা জমি নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র একশ মাইল দূরে কেনা হয়েছে। সেখানে ৮২৫ একর জমিতে চোদ্দ মাইল রাস্তা তৈরি হবে।

আমার মাথা ঘুরছে। এ-জানলে, একাত্তর সালে কলকাতায় আরও একটু গোলমাল করতাম, দুখানার জায়গায় চারখানা প্লেনভর্তি যুবক পাঠাতাম নতুন ভূ-খণ্ডে ভাগ্যের সঙ্গে নতুনভাবে মোকাবিলা করতে!

প্রবীরবাবু একটু লজ্জা পেলেন। ওঁর কথা হলো, সব সম্প্রদায় যখন লক্ষ্মীর সাধনায় এগিয়ে চলেছে তখন আমরাই বা পিছিয়ে পড়বো কেন? জমি-জমা সম্পত্তির ব্যাপারে ইন্ডিয়ানরা অবশ্যই মন দেবে, আমরা কী চিরকাল এই

বি॰ শে ছন্নছাড়া হয়ে থাকবো?

ক.নস্ট্রাকশন সংক্রান্ত কোম্পানির হিসেব-নিকেশ করতে-করতে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয় প্রবীর রায়ের। তারপর ইচ্ছা হলো সেটা কাজে লাগাবার। যাঁদের কিছু সঞ্চয় আছে তাঁরা নিরাপদ-ব্যবসায় কেন টাকা খাটাবে না? সেই সঙ্গে এদেশে যাঁরা অনেক বেশি আয় করেন তাঁদের ... হার কমাবার নানা আইনসঙ্গত পথ আছে।

ঃ জিনিস আমার মাথায় তেমন ঢোকে না। অঙ্কটা কোনদিনই আমার প্রিয় ।। কিন্তু প্রবীরবাবু ছাড়বার পাত্র নন। রসিকতা করলেন, "আপনিই তো ঘোষের উদ্ধৃতি দিলেন—চ্যালেঞ্জ ইওর লিমিটেশন। নিজের ক্ষতাকে নিজেই চ্যালেঞ্জ করো। ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। মরিকান সরকার মানুষকে নতুন-নতুন বিষয়ে ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দেয়—সেই-সব উদ্যমে ডলার বিনিয়োগ করে লোকসান হলে তা ট্যাক্স থেকে কাটা যায়। সম্পত্তি সৃষ্টির ব্যাপারটা এই রকম। যাঁরা টাকা ঢালছেন, তাঁরা গোড়ার দিকে লোকসানের জন্যে তাঁদের দেয় ট্যাক্স থেকে কিছুটা রেহাই পাচ্ছেন— কয়েক বছর পরে সম্পত্তির দাম বাড়ছে, তখন হচ্ছে মূলধনী লাভ—ক্যাপিটাল গেইন্‌স।"

প্রবীরবাবুর বিনিয়োগ পরিকল্পনায় যাঁরা টাকা রাখছেন তাঁদের বিনিয়োগের দাম প্রতি বছর ডবল হচ্ছে, সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ট্যাক্স রেহাইয়ের আইনসঙ্গত পথ।

প্রবীরবাবু বললেন, "প্রথমে একটা আকর লোহার খনি কিনেছিলাম। বহু টাকা লোকসান হলো। দাঁড়াতে পারতাম না, কিন্তু অন্য প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টে লাভের মুখ দেখা গেল।"

এখন ওঁদের গ্রুপের মধ্যে প্রচুর বাঙালি এবং কিছু ইহুদি ও ইটালিয়ান আছেন। সম্পত্তির দাম হবে অন্তত ষাট কোটি টাকা। নতুন লগ্নি আসছে প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকা এবং সেই লগ্নির জোরে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে পঁচিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিকল্পনায়। প্রতি বছর ডেভেলপ করা একটা সম্পত্তি বেচে দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন দুটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। কোথায় কোন্ জায়গায় বাড়ি করলে লাভ হবে তা ঠিক করা এদেশে এক জটিল কাজ—এর জন্যে উকিল, রাজনীতিবিদ, নগর-পরিকল্পনাবিদ থেকে আরম্ভ করে তদ্বিরকারক পর্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

নতুন শহর পত্তন করার ব্যাপারে প্রবীরবাবু বললেন, "হ্যাঁ স্বীকার করছি। দেশের লোকদের বলতে পারেন, আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরে ছ'মাইল জমি কিনেছি, একটা পাহাড় সমেত। মোট ৮২৫ একর জমি।

এখানে শ'আড়াই প্রাসাদ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ৬০/৬৫ কোটি টাকার পরিকল্পনা।"

এসব শুনেও আনন্দ। বললাম, "আপনি আমাদের মরা গাঙে জোয়ার আনছেন। এসব থেকে শুধু আপনাদেরই সমৃদ্ধি হচ্ছে না, দেশে আমাদেরও উপকার হবে। আমরা ভাবতে পারবো, বাঙালিরা নিজেদের বুদ্ধিতে এবং শক্তিতে মার্কিন দেশে গিয়েও বিজয়ী হতে পারে। কে বলে প্রতিযোগিতায় গোহারান হারবার জন্যেই আমাদের জন্ম হয়েছে?"

প্রবীরবাবু বললেন, "আমরা ভার্জিনিয়াতে কেবলমাত্র বাঙালিদের জন্যে একটা বার্ধক্যনিবাস তৈরির কথাও ভাবছি। কুড়ি বছর আগে যখন আপনি এদেশে এসেছিলেন তখন বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা যেতো—দেশে ফিরে যাবার জন্যে সবাই উঁচিয়ে থাকতো। বয়সটাও ছিল খুব কম—তখন তো কেবল তারুণ্যের জয়গান। তারপর নতুন করে দরজা খুললো আমেরিকার, আমরা কিছু মানুষ ঐ সাতের দশকের গোড়ায় রিস্ক নিয়ে চলে এলাম। সেই সব তরুণের এখন বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। গড়পড়তা বয়স বলতে পারেন পঁয়তাল্লিশ। এখন থেকে পনেরো-ষোলো বছর পরেই বার্ধক্যের সমস্যা দেখা দেবে বেশ বড় ভাবে। আমেরিকায় প্রতিপালিত নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বার্ধক্যে একত্রে বসবাস সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ, এদেশের সামাজিক পরিবেশকে অস্বীকার করে আমাদের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হচ্ছে না।"

প্রবীরবাবুর মতে, 'টাকা থাকলেও নিজের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা বুড়ো বয়সে অসম্ভব ব্যাপার। কে ঝাঁট দেবে? কে বরফ তুলবে? তাই আমরা ভাবছি একটা সমান্তরাল ইন্ডিয়া সেন্টারের কথা—যার একটা শাখা থাকবে ভারতবর্ষে, আর-একটা এদেশে। কারও কোনো নির্দিষ্ট ফ্ল্যাট বা ঘর থাকবে না। তবে যেখানে যখন খুশি গিয়ে থাকতে পারবে। ইচ্ছে হলে ছ' মাস দেশে চলে যাও। মন চাইলে ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি এসো। ইটালিয়ান বা গ্রীকদের সঙ্গে একই হোমে শেষ জীবন কাটানো ভেতো বাঙালির পক্ষে বোধহয় সম্ভব হবে না।"

"কিন্তু এই যে এবারেও অনেকে বললেন, তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন?" আমার প্রশ্ন।

মাথা নাড়লেন প্রবীরবাবু। "আমার মনে হয় না এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারবে। এদেশের প্রবেশপথ আছে, প্রস্থান-দ্বার নেই! যে এসেছে সে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো এক মোহিনী মায়ায় এই বিচিত্র সমাজদেহে লীন হয়ে গিয়েছে। এদেশে প্রবাসী ভারতীয়রা মাঝে মাঝে ভুলে যান যে তাঁরা যেমন ইন্ডিয়ান তেমন দু'একটি আমেরিকান সিটিজানের জনক-জননী।"

প্রবীরবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। বাঙালি সমাজের সেবায় তাঁর অনেকটা সময়ে কেটে যায়। যেখানে যত সমস্যা তার খবর প্রথমেই ওঁর কাছে এসে যায়। ভদ্রলোকের দুঃসাহসও আছে। সুযোগ পেলেই দেশের আত্মীয়-স্বজনদের এদেশে আনিয়েছেন। আর কতশত চেনা-অচেনা মানুষকে নিজের দায়িত্বে স্পনসর করিয়েছেন তার হিসেব নেই।

প্রবীরবাবুর স্ত্রী এখন মার্কিন নাগরিক। প্রবীরবাবু নিজের মনেই বললেন, "উপায় ছিল না। সিটিজানশিপ না নিলে নিজের ভাইকে এদেশে আনাতে পারতো না। পাসপোর্টের রঙ যাই হোক, মানুষের জন্মের ইতিহাসটা তো মুছে ফেলা যায় না। আমাদের বুকের মধ্যে ভারতবর্ষের ছাপ চিরকাল আঁকা থাকবে—আপনারা আমাদের নিজের দেশের লোক বলুন, চাই না বলুন।"

প্রাণ হাতে করে ম্যানহাটানের মস্ত এক রাস্তা পদব্রজে পার হচ্ছি, সেই সময় নির্ভেজাল হাওড়ীয় উচ্চারণে কে যেন পিছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো।

এখানে রাস্তা পার হবার সময় কোনো সৌজন্য নেই, সামাজিকতা নেই, একেবারে হিজ-হিজ হুজ-হুজ। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—এই উপদেশ আনোয়ার ও মলি আমাকে পই-পই করে দিয়েছিল। পথ পেরোতে গিয়ে একেবারে ভবসাগর পেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা বিদেশে এতোই সহজ যে ডবল সাবধান হওয়াটা মোটেই বোকামির কাজ নয়। সুতরাং আমি নিজের হাওড়ার প্রাণহরা ডাক শুনেও মনঃসংযোগ না হারিয়ে প্রথমেই পথ পেরোনোর কাজটা সেরে ফেললাম।

হাওড়া-কাসুন্দিয়ার ভয়েস ততক্ষণে আমার খুব কাছে চলে এসেছে। বলছে, "আরে শংকর না? তুই এখানে? দুনিয়াটা সত্যিই ছোট হয়ে গিয়েছে।"

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক! "মিছরিদা না?" সত্যিই মিষ্টি এক সারপ্রাইজ!

মিছরিদা ততক্ষণে আমার হাত চেপে ধরেছেন। বলছেন, "ফরেনে ইন্ডিয়ান দেখলেই আনন্দ হয়, আর খোদ কাসুন্দেপাড়ার ছেলে 'কাসুন্ডিয়ান' দেখলে তো ভেরি ভেরি স্পেশাল আনন্দ।"

দুই দেশোয়ালির দেখা হওয়ায় আমরা ফুটপাথের একধারে সরে এলাম। মিছরিদার ভাল নাম মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, বয়সে আমার থেকে অন্ততঃ ছ'বছরের

বড়। মেদহীন শরীর, সাড়ে পাঁচফুট লম্বা। চুলগুলো কাঁচায়-পাকায় মেশানো। একেবারে গেরস্ত মানুষ। মিছরিদা এবার বলে উঠলেন, "তা তুই এখানে? বলা নেই কওয়া নেই খোদ নিউ ইয়র্কে?"

আমি মাথা নিচু করে বললাম, "পাকে-চক্রে হয়ে গিয়েছে মিছরিদা। কোনো আগাম পরিকল্পনা ছিল না। ছুটি নিয়ে শিবপুরের বাড়ির কেঠো চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে উপন্যাসের শেষ কয়েকটা পরিচ্ছেদ লিখছিলাম—শেষ দিকে ভীষণ কনসেনট্রেশন লাগে আপনি জানেন তো! গল্প হচ্ছে উড়োজাহাজের মত—যা কিছু বিপত্তি তা হয় টেক-অফ না-হয় ল্যান্ডিং-এর সময়। বিশেষ করে ওই ল্যান্ডিংটা খুবই বিপজ্জনক! তা লেখার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি, এমন সময় প্রায় তিন সপ্তাহ পরে বিকল বাড়ির টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। ফোনের ওধারে আমার 'নাইনটিন ফরটি-এইট মার্কা' বন্ধু সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সুপ্রিয় যে টোয়েন্টি ইয়ারস্ এগো আমাকে ওভারকোট ধার দিয়ে প্রথম ফরেনে পাঠিয়েছিল। সে-ই ফোন করছে।"

"তা কী বলগো সেই ছোকরা?"

"খুব ড্রামাটিক। বললো, 'বাড়ি থেকে বেরিও না। আধঘণ্টার মধ্যেই ফরেন থেকে একটা ফোন-কল পাবে। প্লিজ স্ট্যান্ড বাই।' আপনি তো জানেন, ফরেনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, একমাত্র ফরেন বুক ছাড়া। তা আধঘণ্টার মধ্যে ফোন এলো, ক্লিভল্যান্ড ওহায়ো থেকে। ডক্টর রণজিৎ দত্ত—তিনিও নাইনটিন ফর্টিএইটে ম্যাট্রিক পাশ করে ভায়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ফরেনে কেষ্টবিষ্টু হয়েছেন। সুপ্রিয়ই আমাকে টিপস্ দিয়েছিল, 'মার্কিন মুলুকের বঙ্গ-সন্তানের সঙ্গে আলাপ হলেই নির্ভয়ে সারনেমের আগে একটা ডক্টর জুড়ে দিতে পারো—নাইন আউট অফ টেন কেসে ভুল হবে না'।"

মিছরিদা শুনে যাচ্ছেন। বললাম, "ডঃ রণজিৎ দত্ত আমার চক্ষু ছানাবড়া করে দিলেন। উত্তর আমেরিকা—অর্থাৎ ইউ-এস-এ ও কানাডার বঙ্গীয় সমাজ তিনদিনব্যাপী এক বেঙ্গলি কনফারেন্স করছেন। সেখানে একজন 'দ্যাশ'-এর লোক নিয়ে যাবার অভিরুচি হয়েছে উদ্যোক্তাদের, সুতরাং আমি নিশ্চয় যাচ্ছি। কথা বলবো কী, হঠাৎ আর একটা বাঙালি গলা কোথা থেকে ভেসে এলো—'চলে আসুন!' আমি সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎবাবুকে বললাম, সর্বনাশ! ফরেন কলেও ক্রশ কানেকশন হয়েছে, একজন লোক মাঝখান থেকে টিপ্পনি কাটছে।

"রণজিৎবাবু আমাকে আবার তাজ্জব করলেন। 'ক্রশ কানেকশন নয়—আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে টেলিফোন কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করে কনফারেন্স লাইন নিয়েছি। ওদিকে রয়েছেন আমাদের সেমিনার

সেক্রেটারি ডক্টর দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, আপনার সঙ্গে আপনার বক্তৃতার বিষয়ে কথা বলে নেবে।'

"অতীব সুখের কথা! একটি বক্তৃতা থেকেই যদি রাহা খরচ জোটে! কোনো সিরিয়াস বিষয় নয়—দেশের গপ্পোগুজব শোনবার জন্যে আমেরিকার বঙ্গীয় সমাজ নাকি উপোসী ছারপোকার মত হয়ে রয়েছেন, রসিকতা করলেন দিব্যেন্দুবাবু।

"কিন্তু হাতে মাত্র একসপ্তাহ সময়। আমি রণজিৎ দত্তকে বললাম, আমার পাসপোর্ট নেই। ওসব পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি। দত্ত-ভট্টাচার্য কনফারেন্স লাইনে ক্লিভল্যান্ডের দুই প্রান্ত থেকে হাসাহাসি করলেন। বিশ্বাস করলেন না যে পাসপোর্ট নামক বস্তুটি আমার সত্যিই নেই। 'আপনি তাহলে কোন ফ্লাইটে আসছেন জানিয়ে দেবেন, আমরা সোজা মার্কিন ভিসা অফিসকে স্পনসরশিপ পাঠাচ্ছি'—এই বলে আমাকে অথৈ জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁরা লাইন কেটে দিলেন।"

মিছরিদা বললেন, "গাঁজাখুরি মারার জায়গা পাসনি! তুই বলতে চাচ্ছিস, পাসপোর্ট অফিস, পুলিস অফিস, ভিসা অফিসকে ডিঙিয়ে তুই এই শর্ট টাইমে ফরেনে এসেছিস!"

"মোটেই গাঁজাগুলি নয়, মিছরিদা। পাসপোর্ট অফিসে এখনও অনেক দয়ার শরীর রয়েছে। ওই অফিসের খোদ কর্তা যেমনি শুনলেন বঙ্গীয় সমাজের ডাকে আমি বিদেশে যেতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না, যদি পুলিস আপনাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ে।' পরবর্তী দৃশ্যে হাওড়া পুলিসের কাছে আমি করজোড়—দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিন।' ওখানকার ডি-আই-বি প্রধান দত্তসায়েব বললেন, 'আপনার কথা রাখতে পারলাম না! দু'দিন নয়, এখনই রিপোর্ট পাঠাচ্ছি'।

"সব যেন ম্যাজিকের মতন হয়ে গেলো, মিছরিদা। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসলাম ক্লিভল্যান্ডে। তারপর পাক খেতে-খেতে এই নিউ ইয়র্কে—দুনিয়ার মানুষ যেখানে আসার স্বপ্নে মাতাল!"

"তা তোর বঙ্গীয় সম্মেলনের কী হলো?" মিছরিদা জিজ্ঞেস করলেন।

"সে সমস্ত গল্প, অনেক সময় লেগে যাবে। মার্কিনী দক্ষতার সঙ্গে বাঙালি মেজাজের খাদ মিশলে যা-হয় তার নাম গিনি সোনা—বাইশ ক্যারাট। কিন্তু তার আগে আপনার কথা বলুন।"

মিছরিদা বললেন, "ওরে হতভাগা, এটা তোর হাওড়া-কাসুন্দে কিংবা বাজেশিবপুর নয়। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলা ঠিক নয়। চল কোথাও গিয়ে একটু ড্রিংক করবি।"

ড্রিংক! মিছরিদা! এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! নিষ্ঠাবান, রক্ষণশীল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবার, সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। তিন ভাই, পিক্যুলিয়র ডাক নাম—পাটালি, মিছরি ও বাতাসা।

মিছরিদা হাওড়ায় টোটো করে ঘুরে বেড়ান, আমাদের খুব ভালবাসেন। জোর দেন প্লেন লিভিং ও হাই থিংকিং-এর ওপর। সত্যি কথা বলতে কি, অফিস যাবার সময় ছাড়া মিছরিদাকে আমরা শহরের কোনো জায়গায় ফতুয়া এবং লুঙি বাদে অন্য কোনো ড্রেসে দেখিনি। আমরা বলতাম, হাওড়া কোনোদিন কলকাতার খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য হলে ওই ফতুয়া এবং লুঙিই হবে আমাদের ন্যাশনাল ড্রেস। আমি মানসচক্ষে দেখলাম, ফতুয়া-লুঙি পরে ম্যানহাটানের বার-এ বসে আমি ও মিছরিদা ড্রিংক করছি।

মিছরিদা কিন্তু একটু হতাশ করলেন। "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত সেবাইত আমরা—মদের লাইনে যাবো না। আমরা ড্রিংক করবো কোকাকোলা অথবা কফি।"

"হোয়াট অ্যাবাউট চা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

জিভ কাটলেন মিছরিদা। "ছিঃ ছিঃ—এখানে চায়ের নামে যা চলে তা চা নয়। এই নিউ ইয়র্কে এসে বুঝতে পারলাম, কেন স্যার পি. সি. রায় বলতেন, চা পান না বিষ পান! এ-জানলে, কলেজ স্ট্রীটের সুবোধের দোকান থেকে কিছু চা সঙ্গে নিয়ে আসতাম, লোকে বুঝতো চা কাকে বলে।"

মিছরিদা বুঝিয়ে দিলেন, আপ্যায়নের খরচ তিনিই দেবেন। "এখানে আমার পয়সার কোনো অভাব নেই রে! এসেই এক ডাক্তারের দুটো ছেলের পৈতে দিয়ে দিয়েছি। কিছুতেই শুনলো না, গামছায় তিনশ ডলার বেঁধে দিয়েছে। কি করে খরচ করবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

মিছরিদা বললেন, "তোর যদি জানাশোনা কোনো ছোকরা পুরোহিত থাকে তো পাঠিয়ে দে। এদেশে টু-পাইস করবে।"

"কিন্তু গ্রীন কার্ড?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"হিন্দু ধর্মটা যে হাই-টেকনলজি তা বোঝাতে পারলেই স্পেশাল সুযোগ পেয়ে যাবে। তাছাড়া এদেশের বাঙালি মেয়ে বিয়ে করলে তো কোনো কথাই নেই। মেয়ের বাপরা এতোদিন দেশ থেকে ডাক্তার ইমপোর্ট করছিল। এখন সে-গুড়ে স্যান্ড! ইন্ডিয়ান ডাক্তার কিছুতেই আমেরিকান লাইসেন্স পাচ্ছে না। পাবে কী করে? এখানকার ডাক্তারি আর ওখানকার ডাক্তারি তো আকাশপাতাল তফাত হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্রীন কার্ড-হোল্ডার বউ থাকা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান ডাক্তারবাবু এখানে নাইট দারোয়ানগিরি কিংবা দোকানে চাকর-বাকরের কাজ করছে। আর এই সব আমেরিকায় বড় হয়ে-ওঠা বাঙালি মেয়েদের কথাও কী

বলি! একটা কমবয়সী পুরুত দেশ থেকে আনলে তার গৃহিণী হিসেবে অনেক বেশি সুখে থাকবে।"

মিছরিদা কোকাকোলা অর্ডার করলেন। "যদ্দিন এখানে আছিস, একটু খেয়ে নে। দেশে তো ও-জিনিস পাবি না। আর এই কোকাকোলার স্বাদ যার ভাল লেগেছে তার পোড়া মুখে আর কিছু রুচবে না। বাহাদুর কোম্পানি বটে—কোলায় কী মেশায় তা কেউ এখনও ফাঁস করতে পারলো না। গোপন ফর্মুলায় বিশ্ববিজয় করলো।"

মুখ বেঁকালেন মিছরিদা, "দ্যাখ, আমেরিকানরা বোকা। ওরা যদি সম্রাট অশোকের পলিসিটা মন দিয়ে স্টাডি করতো তা হলে গায়ের জোরে দুনিয়া কনট্রোল করার স্বপ্ন না-দেখে কোকাকোলা দিয়েই বিশ্ববিজয় করতে পারতো। সম্রাট অশোক তো এই লাইনকেই বলেছিলেন ধর্মবিজয়।"

মিছরিদা কলকাতায় এক প্রাইভেট অফিসে মাঝারি কাজ করেন। অবসর সময়ে একটু-আধটু পুরোহিতগিরি চলে। "সাত পুরুষের লাইসেন্স, ইচ্ছে করলেই ফেলে দেওয়া যায়নারে।"

"এবার বলুন, আপনি হঠাৎ আমেরিকায়?"

"প্রফেশনাল কাজে, তোরই মতন," গম্ভীরভাবে ঠোঁট বাঁকালেন মিছরিদা। "তফাতের মধ্যে, তুই একটা টেলিফোন কলেই চলে এসেছিস, আমি পরপর সাতখানা চিঠি পেয়েও নট নড়ন-চড়ন ছিলাম। তুই তো আমার ছোটভাই বাতাসাকে চিনতিস, যার ডাকনাম অনাদি। এখানে অ্যানডি হয়েছে। অনেক বছর রয়েছে এখানে মেমসায়েব বিয়ে করে। আমাদের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। বছরে এক-আধখানা চিঠিচাপটা চলতো। সেই অ্যানডির মেয়ে সমত্থ হয়েছে, বিয়ের ঠিকঠাক। মেয়ের ইচ্ছে একেবারে বাঙালি মতে বিয়ে হোক।

"তা সেই খবর পেয়ে আমরা লিখলাম, পাত্রী নিয়ে দেশে চলে এসো। বরযাত্রীও আসুক পিছু-পিছু। এখানে এই ধরনের বিয়ে এক-আধটা হচ্ছে। সায়েবরা মন্তর-টন্তর পড়তে পেলে খুব খুশি হচ্ছে। কিন্তু বাতাসা লিখলো খুব বড়লোকেরা ওই ধরনের বিয়ে দেশে গিয়ে দিচ্ছে। বরযাত্রীরা গিয়ে উঠছে কলকাতার ওবেরয় গ্র্যান্ডে, ওখানকার রাজকীয় বলরুমেই ছাদনাতলা হচ্ছে। কিন্তু বাতাসা অত খরচ করতে চায় না। তখন ঠিক হলো দেশ থেকে পুরুত আসবে।"

এরপর মিছরিদা যা বললেন তা এই রকম : পুরোহিতের বংশ। সুতরাং কোনো অসুবিধে নেই। প্রথমে দাদাকে (যাঁর ডাকনাম পাটালি) ধরা হলো। পাটালিদা নিষ্ঠাবান ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। রাজি হলেন না। বললেন, ম্লেচ্ছ সংসর্গে বাতাসার সবই তো নষ্ট হয়েছে, এখন আবার হিঁদুয়ানি কেন? স্বস্ত্যয়ন করে

দোষটোশ কাটিয়ে নেবার প্রস্তাব উঠেছিল। এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়, সেই আদিযুগ থেকেই হিন্দুরা তো হিনট দিচ্ছেন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। বাতাসার বিদেশি বধূটি সত্যিই রত্নবিশেষ। কিন্তু পাটালিদা সাহস পেলেন না।

অগত্যা মিছরিদা সাহস দেখালেন। "বড্ড মিষ্টি মেয়ে আমার এই ভাইঝিটা। পাঁজি, পুরোহিতদর্পণ ইত্যাদি ব্যাগে পুরেই সোজা চলে আসতে হলো। ঠিক হয়েছে ছোটভাই নিজেই সম্প্রদান করবে, আর আমি পুরোহিতগিরি করবো। আমি তো অন্তত শ'দেড়েক বিয়ে দিয়েছি।"

মিছরিদা জানালেন, "এসে হাজির হয়েছি। কিন্তু বিয়ে এখনো হয়নি, দিন কয়েক বাকি। সেই সময়টা একটু ঘুরে নিচ্ছি। দেশটা দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়—তুই এদের সম্বন্ধে লিখে যা খণ্ডের পর খণ্ড। বাহাদুর জাত বটে। এমনভাবে এদের জীবন দেখবি এবং এমনভাবে লিখবি যাতে আমাদের দেশের ছোঁড়ারা ভিরমি খায়! এই দেখ না, আমার কেসটা—দেশে তো পুরুতের বৃত্তি উঠে যেতে বসেছে, সবাই রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বর-বউ হবার জন্যে ছটফট করছে। আর এখানে আমার হবু ভাইঝিজামাই রিং করছে হিন্দু প্রিস্ট-এর সঙ্গে লম্বা ডিসকাশনের জন্যে। বলছে রিহার্শালে আপত্তি নেই তার। দেশ থেকে ম্যারেজের কোনো ভিডিও টেপ নিয়ে এসেছি কিনা ফর ট্রেনিং পারপাস। আমি কোন্ লজ্জায় বলি, ওরে বাপধন, দেশের বিয়ে দেখলে তোমার এই ধরনের বিয়েতে অরুচি ধরে যাবে। বাঙালি বিয়েবাড়িতে সবাই খেতে এবং খাওয়াতে ব্যস্ত। ব্যাচ বসেছে আর উঠছে। পুরোহিত কী মন্ত্র পড়লেন তা সিকি আনি দুয়ানি সাইজের বাচ্চা ছাড়া কেউ শোনে না।"

"মিছরিদা, এদেশে যা-যা দেখছেন, দু'একটা পয়েন্ট এই অধমকে দিন। আমি একেবারে ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছি—এই ক'দিনে কী এমন দেখবো যা দেশের পাঠকের পাতে দেওয়ার মতন হবে?"

আমার কাতর আবেদন কর্ণগোচর হওয়া মাত্র ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ বুজলেন মিছরিদা। বললেন, "তুই আমাকে 'কোট' কর—আমি বলছি, ওয়ার্লডে আমেরিকার মতন গ্রেট দেশ নেই। এখানে আসবার পথে আমি ফরাসিদেশ এবং ইংলন্ডে এক-একদিন কাটিয়ে এসেছি।"

আমি জানতে চাইলাম, কেন এমন কথা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মিছরিদা বলছেন? আমেরিকার বিপুল বৈভব আছে বলে? বিরাট বিরাট কমপিউটার আছে বলে? হুট করে বোতাম টিপে মহাশূন্যে যানবাহন পাঠাতে পারে বলে? মিছরিদা আমার কথা শুনছেন, কিন্তু ইমপ্রেস্ড হচ্ছেন না। "এসব তো অজানা নয়, দেশে থাকতে থাকতেই পড়েছি।"

"তা হলে, মিছরিদা, আপনি কি ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক অস্ত্র, তারকা যুদ্ধ

ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলছেন?"

"ছোটখাট সাইজে ওসব যন্ত্র আমরা ইন্ডিয়াতেও তৈরি করতে শিখেছি রে! যদিও দু-একখানা মিসফায়ার হয়ে যায়।" মিছরিদা এখনও আমার কথায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন না।

"এখানকার মানুষরা আপনাকে তাহলে মজিয়ে দিয়েছে। ভাবী ভাইঝি-জামাইয়ের দেশকে আপনার 'সারা জাঁহা সে আচ্ছা' মনে হচ্ছে স্রেফ বাৎসল্য রস থেকে!"

চোখ বুজেই মাথা নাড়লেন মিছরিদা। "আমরা হাওড়া-কাশুন্দের লোকরা হানড্রেড পারসেন্ট স্বদেশী। আমরা জানি, চান্স পেলেই এখানকার সরকার আমাদের সরকারের পিছনে কাঠি দেয়, আমাদের শত্রুদের টাকাপয়সা জোগায়—তবু এবার আমি নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম গ্রেটেস্ট কানট্রি বলতে 'ইউ-এস-এ'কেই বোঝায়।"

"তাহলে বলছি, আপনি এদেশের হাসপাতালগুলো দেখছেন। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক দেখে আমার নিজের চোখই তো ছানাবড়া। ওখানে বাঙালি মহিলা শুভা সেন পাকড়াশীকে দেখে আমার বুক তো গর্বে ফুলে উঠলো।"

মিছরিদা হারবার পাত্র নন। "আমেরিকান হাসপাতালে চোখ দু'বার ছানাবড়া হয়—একবার চিকিৎসার দক্ষতা দেখে, আর একবার চিকিৎসার বিল পেয়ে। হার্ট উইক থাকলে তখনই হাসপাতালে রি-অ্যাডমিশন!"

"তাহলে কিসের গ্রেটনেসের কথা বলছেন মিছরিদা!"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মিছরিদা। "আমি ঠিক করে এসেছিলাম, পরের মুখে ঝাল খাবো না। নিজে চেক করবো সব কিছু—স্বামী বিবেকানন্দ তো সাবধান করে দিয়েছিলেন, খাজা আহাম্মকের চোখে বিদেশকে দেখবে না। করছিও তাই—লাস্ট দশ বারো দিন তিনটে স্টেটে আমি শত-শত এক্সপেরিমেন্ট করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি।"

এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন মিছরিদা। "আমাদের অফিসের পিলকিংটন সায়েব আমাকে চুপি-চুপি বলেছিলেন—এ জেন্টলম্যান ইজ নোন বাই হিজ শুজ্—জুতোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কে কেমন ভদ্রলোক। তেমনি এ নেশন ইজ নোন বাই..." আবার থামলেন মিছরিদা। "আমি অফিসের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি তাই সহজে জাতটার মহত্ত্ব বুঝতে পারলাম। আমি বিভিন্ন জায়গায় চান্স পেলেই অন্তত শ তিনেক টয়লেট ফ্লাশ টানলাম। অবাক কাণ্ড ইন্ডিয়ার কেউ বিশ্বাস করবে না, প্রতিটি ফ্লাশ কাজ করলো। পৃথিবীতে এমন দেশ থাকতে পারে, আমার কল্পনাতেও ছিল না। ইন্ডিয়াতে কোনো পাবলিক বাথরুমে ফ্লাশ কাজ করতে দেখেছিস তুই? পিলকিংটন সায়েব

ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন, এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস্ টয়লেটস্—বেঁচে থাক ভাই এই দেশ। লাখ-লাখ বাইরের লোক ঢুকিয়েছে, তবু ফ্লাশ চালু রাখার অসাধ্য সাধন করেছে।”

গাঁইয়ার মতন কোকের পরে আমরা কফির অর্ডার দিয়েছি. মিছরিদাকে বললাম, “শুধু ভাল দেখবেন না. একটু-আধটু দুর্বলতাও এদেশের দেখুন। এই দৃষ্টি না-থাকলে এখানকার কোনো খবরের কাগজের অফিসে আপনি চাকরি পাবেন না!”

“যারা কুটুম হতে চলেছে তাদের দোষ ধরতে নেই। কিন্তু তুই যখন নাছোড়বান্দা তখন একটা স্টেটমেন্ট নে : জন্মাবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ জায়গা এই ইউ-এস-এ, আর মরবার পক্ষে ইন্ডিয়ার এখনও তুলনা নেই।”

“সব দেশের লোকই তো বলে সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে।”

“এক দেশে জন্মে আর এক দেশে পেটের তাগিদে যাওয়ার মতন দুঃখ কিছুতে নেই। আমেরিকায় ভূমিষ্ঠ হওয়া মানেই গ্রীন কার্ড নিয়ে জন্মগ্রহণ করা—সে তোমার বাবা-মা যে-দেশের নাগরিকই হোক না। শুনলাম, তাই এদেশে পোস্টিং পেয়ে, অনেক দেশের ডিপ্লোম্যাটদের মধ্যে সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। এদেশে একটা বেবি হওয়া মানেই—অন্তত ১৮ বছর পরেও একজন আমেরিকানের গার্জেন হয়ে বাবা-মায়ের এখানে ফিরে আসাব সুযোগ রইলো।”

“ওঃ, মিছরিদা, আপনি বাঘা-বাঘা গোপন খবর জোগাড় করেছেন! পৃথিবীর যত কার্ড আছে তার মধ্যে এখন মহামূল্যবান এই গ্রীন কার্ড—সারা বিশ্বে এই সবুজপত্র পাবার জন্যে হাহাকার।”

মিছরিদা হাসলেন, “আমি এসবের মাহাত্ম্য বুঝতাম না। এখানে এসে ক'দিন পাড়া বেড়িয়ে আমার চোখ খুলে গেলো। পাকিস্তানী বল, বাংলাদেশী বল, শ্রীলঙ্কাবাসী বল, ইন্ডিয়ান বল গ্রীন কার্ডে কারও অরুচি নেই। এই কার্ড পাবার জন্যে কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।”

এরপর মিছরিদা আরও দু'একটা গল্প বললেন। “সেদিন হঠাৎ পাইকপাড়ার আকবরের সঙ্গে এই নিউ ইয়র্কেই দেখা হয়ে গেলো। খুব কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলো। তবু ছাড়লুম না, গেলুম ওর বাড়িতে। খুব ছোট্ট বাড়ি। বললুম, তুমি না জার্মানিতে ছিলে?”

পাইকপাড়ার আকবর প্রথমে কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না। তারপর মিছরিদা যা জানতে পারলেন. জার্মানিতে থাকা আকবরের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন আরও কিছু পাকিস্তানী এবং ইন্ডিয়ানের সঙ্গে সে বাহামাতে হাজির হলো। মাথাপিছু কয়েক হাজার ডলারের বিনিময়ে রাতের নৌকো বাহামা

থেকে ফ্লোরিডায় নামিয়ে দিয়ে যায়। ভারতীয় অথবা বাংলাদেশী বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর জীবন এইভাবে শুরু হয়। তারপর জনারণ্যে মিশে যাবার জন্যে অনেকে নিউ ইয়র্কের মতন বড় বড় শহরে হাজির হয়।

আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে অবশ্যই উকিলের শরণাপন্ন হতে হয়। রাতকে দিন করতে আমেরিকান উকিল অন্য কোনো দেশের উকিলের থেকে কম যায় না। মক্কেলের টাকা থাকলে তারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের মামলা শুরু করে দেয়। এখানে একটা সুবিধে, মামলা করলে তার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে বিতাড়িত করা যায় না। উকিলবাবু চেষ্টা করেন রাজনৈতিক আশ্রয়ের মামলা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আকবর ওসব হাঙ্গামায় যায়নি। ওর ঘরে গিয়ে মিছরিদা একটু অবাক হলেন। রাস্তায় আকবর বললো, সে ব্যাচেলার। অথচ ঘরের সর্বত্র মেয়েদের ব্রা ও প্যান্টি ঝুলছে একটু অশোভনভাবেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না মিছরিদার। নিউ ইয়র্কের ছেলে হবার আগে আকবর তো পাইকপাড়ার ছেলে ছিল, এরকম নির্লজ্জ তো হবার কথা নয়!

তারপর ব্যাপারটা চোখের জল ফেলতে-ফেলতেই স্বীকার করলো আকবর ছোকরা। ইমিগ্রেশন ম্যারেজ ছাড়া উপায় ছিল না। হাজার তিন-চার ডলার দিলেই এদেশি মেয়ে পাওয়া যায়। তারা নাম-কা-ওয়াস্তে বহিরাগতকে বিয়ে করে—আমেরিকান ললনার বিদেশি স্বামীকে কে দেশছাড়া করে? পৃথিবীর সর্বত্র ঘরজামাই-এর স্পেশাল স্ট্যাটাস! এই কাগুজে বউ প্রয়োজনে ইমিগ্রেশন আদালতে তোমার পক্ষে সাক্ষী দিয়ে আসবে।

আকবরের বউ কি কাজকর্ম করে জানতে চেয়ে খুব লজ্জা পেয়েছিলেন মিছরিদা—'কাজ' করে, কলগার্লের।

মুশকিল হলো ইমিগ্রেশন ইনেসপেক্টরদের নিয়ে। তারা মাঝেমাঝে হামলা করে, সরেজমিনে তদন্ত করতে আসে, কেমন ঘর-সংসার হচ্ছে। সেই জন্যে বাড়িতে মেয়েদের জামাকাপড়, অন্তর্বাস বেশ কিছু পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কিছু চিঠিপত্তর—অন্তত খামের ওপরটুকু, যাতে বউ-এর নাম এবং ঘরের ঠিকানা লেখা আছে।

মিছরিদা বললেন, "বেচারার হয়েছে উভয়-সঙ্কট। থাকার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হলে কাগুজে বউকে তালাক দিয়ে সে নিজের ঘরসংসার পাতবে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। কাগুজে বউ তাল বুঝে বেঁকে বসেছে। সে প্রতি মাসে বাড়তি তিনশ ডলার আদায় করছে। না দিলে এখুনি পুলিশকে সব বলে দেশছাড়া করে দেবে।"

বেচারা আকবর! সে দুটো কাজ করে—দিনের বেলায় রেস্তোরাঁয় এঁটোকাটা পরিষ্কার, তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে গ্যাস স্টেশনে গাড়িতে তেল ভরার রাত-ডিউটি।

মিছরিদা জানালেন, "আকবর ছোঁড়াটাকে বললাম, ফিরে চল পাইকপাড়ায়। কাগুজে বউয়ের খপ্পরে পড়ে এমনভাবে জীবনটা নয়ছয় করার কোনো মানে হয়? কিন্তু গ্রীন কার্ডের নেশা ওকে চেপে ধরেছে। একদিন ওর আইনের সমস্যা মিটবে—তখন অন্য অনেকের মতন সে-ও গাড়ি চাপবে, বাড়ি কিনবে এবং কপালে থাকলে আসলি মেমসায়েব সাদি করবে, তখন সুখের শেষ থাকবে না।"

মিছরিদা এরপর বললেন, 'দুদিন আমি এক ডিপ্লোম্যাটিক অফিসারের বাড়িতে অতিথি ছিলাম। ওঁদের রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা। সেখানে এক ড্রাইভার ছিল—নাম চি চো। ভগবান জানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোন্ দেশ থেকে এসেছে—বোধহয় ভিয়েতনাম।"

এই ডিপ্লোম্যাট কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এখানেই, তবে নিজের দেশের ছেলের সঙ্গে। গৃহিণী বললেন, বর বউকে চি চো-ই ড্রাইভ করেছিল বিয়ের পর। কিন্তু লোকটার বোধহয় মাথায় ছিট আছে। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বলে খুব খুশি। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলো, বেবি চাই। খুব তাড়াতাড়ি—এবং এখানেই। ভেরি গুড প্লেস টু হ্যাভ বেবি।

"মেয়ে জামাই শাশুড়ি সবাই চি চোর কথা শুনে লজ্জায় অস্থির। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না।"

মিছরিদার সংযোজন : "জানিস তারপর একদিন গাড়িতে এই উচ্চশিক্ষিতা গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করছি। আমারও তো ফিলজফি অনার্স ছিল। গৃহকর্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে যাবার পরে চি চো হঠাৎ আমার সঙ্গে ওয়েস্টার্ন ফিলজফি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলো। আমি তো অবাক।"

মিছরিদা তারপর শোনালেন, "চি চো নিজের দেশে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ করেছিল। ওইসব ডিগ্রি নিয়ে কোন দুঃখে যে বাছাধন এই দূর দেশে ড্রাইভারি করতে এলো!"

তারপরের খবরটা দুঃখের। চি চো বিয়ে করেছিল। একটি মূক ও বধির পুত্রের জন্ম হওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়লো। গরিব দেশে সুস্থ মানুষেরই কোনো মূল্য নেই—বিকলাঙ্গ মানুষকে কে দেখবে? খোঁজখবর নিয়ে চি চো জেনেছে, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে আমেরিকাই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ। তাই সে বহু কষ্টে নানা পথ ঘুরে এখানে পালিয়ে এসেছে। একদিন নিশ্চয় সে এখানে সসম্মানে বসবাসের সুযোগ পাবে, তখন তার প্রথম কাজ হবে ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ছেলেটিকে এবং তার মাকে এদেশে নিয়ে আসা।

ছেলেটি এখানে পড়বে, তারপর কমপিউটরের কাজে ঢুকে যাবে—চি চো মরে যাবার পরেও তার কোনো অসুবিধা হবে না।

ইতিমধ্যে অবশ্য বেশ কিছু মুশকিল রয়েছে। বে-আইনীভাবে যারা এদেশে প্রবেশ করেছে তাদের পক্ষে এ-দেশে থেকে যাবার সব চেয়ে সহজ উপায় কোনো বিদেশী কূটনৈতিক অফিসে কাজ নেওয়া। এদেশের এমপ্লয়মেন্ট সংক্রান্ত আইন-কানুন ওঁরা মানতে বাধ্য নন। কেউ এমব্যাসিতে কাজ করছে এই সার্টিফিকেট দেখলে পুলিশ তাকে স্পর্শ করতে সাহস পায় না।

মিছরিদা বললেন, "আমার চোখ খুলে গেলো, ব্রাদার। বিদেশ-বিভূঁইতে এসে অভাগা সন্তানের প্রতি এমন অসাধারণ ভালোবাসা দেখবো তা কল্পনা করিনি। আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হলো না, কেন চি চো বিয়ের দিনেই কনেকে বলেছিল, হ্যাভ বেবি কুইকলি। চি চোর ছেলেটা যদি এখানে ভূমিষ্ঠ হতো তাহলে বেচারার কোনো কষ্টই থাকতো না।"

আমি এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। হাতে এখনও কিছু সময় আছে। মিছরিদা বিদেশের মাটিতে দেশের লোককে পেয়ে তাকে ছাড়তে চাইছেন না।

আমি বললাম, "মিছরিদা, আপনি যে মূল্যবান স্টেটমেন্ট দিয়েছেন একটু আগে, তাতে বলেছিলেন, জন্মাবার শ্রেষ্ঠ জায়গা এই মার্কিন মুলুক—কিন্তু মরবার পক্ষে সেরা হলো ইন্ডিয়া। প্রথম পার্ট তো ব্যাখ্যা হলো, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা তো পরিষ্কার হচ্ছে না।"

মিছরিদা বললেন, "ওই সাবজেক্টটা বেশ জটিল। ব্যাপারটা বুঝতে হলে তোকে আমার সঙ্গে এখনই একটু বেরুতে হবে।"

ম্যানহাটানের চায়ের দোকানে (থুড়ি! কফি বার-এ) বসে বাজে শিবপুরের ব্রাহ্মণ সন্তান মিছরিদার মুখের দিকে আবার তাকালাম। বুকের মধ্যে একটু ধুকপুকুনি রয়েছে—খোদ মার্কিন মুলুকে ভাগ্যলক্ষ্মীর এই ভদ্রাসনে আমরা দুই হাওড়ীয় বঙ্গসন্তান যে রং-ফন্টের মতন বিরাজ করছি তা কি সায়েবদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে?

প্রুফ-রিডিং-এর ভাষায় রং-ফন্ট-এর উল্লেখ করায় মিছরিদা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। ঠোঁট উল্টে চিবুক শক্ত করে তিনি বললেন, "মেক নো মিসটেক—এরা যদি স্মলপাইকা হয়, তা হলে আমরা ইন্ডিয়ানরা অবশ্যই পাইকা। এরা যদি লিকলিকে 'রোমান ফেস' হয় তা হলে আমরা বোল্ড।"

আমার নিবেদন, 'দুষ্টজনরা বলে, আমরা হলাম 'ইটালিকস'। অর্থাৎ কিনা সায়েবরা সোজাসুজি মানুষ—আমরা একটু বাঁকা!"

মিছরিদার মধ্যে এই মুহূর্তে গভীর আত্মপ্রত্যয়। "আমরা হলাম কিনা প্রাচীন

সভ্যতার প্রতিনিধি—ওল্‌ড সিভিলাইজেশনে মানুষের মন অনেক জটিল ভাবনার ধারক হয়! যারা ‘কালকা যোগী’ তারা সব কিছু বুঝে উঠতে পারে না—ট্যাকের জোর তাদের যতই থাকুক! সুতরাং ওরা তো আমাদের বাঁকা দেখবেই। কিন্তু দেখবি সমন্বয় শক্তি যদি কারও থাকে সে আমাদের। আমরা অতি সহজে ডুডুও খাই টামাকুও খাই—সায়েবরা পারে না।”

এবার আহ্বান জানালেন মিছরিদা, “চল্‌ একটু হাঁটা যাক—জুতোর হিল খইয়ে একটু চরে না বেড়ালে দেশ দেখা যায় না।”

আমরা দু'জনেই শিবরাম চক্রবর্তীর অমরসৃষ্টি হর্ষবর্ধনও গোবর্ধনের মতন বিরাট নিউ ইয়র্ক শহরের লীলাখেলা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। “বাড়িগুলোর ডগা দেখার চেষ্টা করিস না—বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘাড়ে সটকা লেগে গেলে কে দেখবে?” মিছরিদা সাবধান করে দিয়ে বললেন, “গগনচুম্বী প্রাসাদ নয়, স্রেফ আকাশের পেটে চাকু মেরে তার মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বাড়িগুলো আরও ওপরে উঠে গিয়েছে।”

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেন্ট্রাল পার্কে হাজির হয়েছি। মিছরিদা বললেন, “মোক্ষম জায়গা এই সেন্ট্রাল পার্ক—এখানে একটু সাবধানে ঘুরতে-ফিরতে বলেছে আমার মেমসায়েব ভাইবউ।”

ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম—সব পাশাপাশি বিরাজ করছে এই পার্কে। কেউ গাঁজা খেয়ে গুম হয়ে বসে আছে—কেউ মাতাল হয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে মাতামাতি করছে—আবার কেউ আপন মনে প্রভু যীশুর গুণগান গাইছে। মিছরিদা বললেন, “এইখানে কেত্তন গেয়েই তো আমাদের হুগলি সাহাগঞ্জের ভক্তিবেদান্ত (অভয়চরণ দে) বৃদ্ধবয়সেও যে বিশ্ববিজয় করা যায় তা দেখিয়ে দিলেন। বাঙালিদের সব আছে, শুধু থিংক বিগ-এর উদ্দীপনা নেই। ছাইপাঁশ ন্যাকামি এবং অবিশ্বাসের গপ্পো না-লিখে তোরা বাঙালিকে একটু সাধনা ঔষধালয়ের সঞ্জীবনী সালসা খাওয়া। বল, তোমরা বাঘের বাচ্চা—কেন ভেড়া সেজে ব্যা-ব্যা করছো? তোমরা কি কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, সুভাষচন্দ্র বসু, ভক্তিবেদান্ত, কালীপ্রসাদ চন্দ'র নাম শোনোনি?”

“লাস্ট লোকটি কে দাদা?”

“তোরা লেখক হয়েছিস কিন্তু লেখাপড়া করিস না! কলিকাতা নিবাসী বাবু রসিকলাল চন্দ মহাশয়ের পুত্র বাবু কালীপ্রসাদ—ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে যিনি অভেদানন্দ হলেন। এই নিউ ইয়ার্কে হাজির হয়েছিলেন ১৮৯৭ সালে—বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধনায় আমেরিকানদের তিনি তাক লাকিয়ে দিয়েছিলেন।”

মিছরিদার সাজসজ্জা এই সেন্ট্রাল পার্কের পরিবেশের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়েছে। চৌকো চৌকো ডিজাইনের ব্রাউন টুইডের কোট পরেছেন, সেই সঙ্গে ম্যাচিং ট্রাউজার। নিজেই বললেন, "দেশে আমার ভাবমূর্তির সঙ্গে মিলছে না তো? আমি এখন সমন্বয়ে বিশ্বাস করি। এসেছিলাম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেশে ধুতি পাঞ্জাবি পরে, সঙ্গে নামাবলিও এনেছি—কিন্তু মেমসায়েব ভাইবউ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে গিয়ে এই সায়েবী সাজ কিনে দিলো। কিন্তু যেটা তোকে বলতে চাইছিলাম, পুরনো সিভিলাইজেশনের লোক বলে আমরা সহজেই সমন্বয় করতে পারি। কোট-প্যান্ট পরে সায়েব হয়েছি বটে, কিন্তু গলায় পৈতা ঠিক ঝুলছে। আজ সকালে তো মজার কাণ্ড। এক অফিসের টয়লেটে গিয়েছি, ওখানে একটু পরে আমাকে নিয়ে টানাটানি—ইন্টারভিউ দিতে হলো। ওদের কিউরিয়সিটির কারণটা বুঝতে পারছিস তো? ইউরিন্যাল ব্যবহার করার আগে আমি কানে পৈতেটা জড়িয়ে নিয়েছিলাম। ওরা এই ধরনের পার্শোনাল ডিসিপ্লিন কখনও দেখিনি। বললুম, ব্রাহ্মিন হওয়া সহজ নয়, অনেক 'হ্যাপা' সামলাতে হয়। তবে সে পুরোহিতের মর্যাদা পায়।"

"মিছরিদা, আপনি সাক্ষাৎ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠছেন!"

খুব খুশি হলেন মিছরিদা। "শুধু আমি কেন, আমাদের পুরো ফ্যামিলিটাকেই তো ইষ্ট-ওয়েষ্ট জংশন বলতে পারিস। আমার ছোট ভাইটাকে দেখ। গোঁড়া ভটচার্য্যি বামুন, সকালে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতো। মায়ের কাছে পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিদেশে বিধর্মীর কিছু করবে না। সেই বেচারা এই বিদেশে ঈশ্বরের লীলাখেলায় কমবয়সী কিন্তু বিদুষী মেমসায়েবের নজরে পড়লো। নিজের মনেও যখন দুর্বলতা আসছে বুঝলো আমার ভাই, তখন ভীষণ অবস্থা। দিনের পর দিন মেমসায়েব বান্ধবীর সঙ্গে সে ঘুরছে, প্রবল আকর্ষণ বোধ করছে, কিন্তু দেহ স্পর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। মেমসায়েবও এমন পুরুষমানুষ কখনও দেখেনি—ডেটিং-এ যায়, কিন্তু দূরত্ব কমায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তুই এখন গপ্পোটপ্পো লিখিস, প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিস, ব্যাপারটা জেনে রাখ—পরে কোথাও লাগাতে পারবি। প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাশার দ্বন্দ্ব হলে মানুষ কীভাবে জ্বলে-পুড়ে মরে তার একটা নমুনা পাবি। আমার ভাইয়া তো টানা-পোড়েনে পড়ে তার এক বাউন্ডুলে বন্ধুর কাছে নিজের সমস্যার কথা খুলে বললো। সে বন্ধু পরামর্শ দিলো। 'যস্মিন দেশে যদাচার।' এদেশে বিয়ে-থা করতে হলে প্রেম-টেম করতে হয়। প্রেম করতে হলে এই সমাজে একটু-আধটু দেহ স্পর্শ প্রয়োজন। তুমি ব্যাচেলার লোক, তোমার বান্ধবীও অপরের বিবাহিতা নয়—সুতরাং কোথাও কোনো অন্যায় নেই। প্রজাপতির নাম করে প্রাণের ইচ্ছাকে একটু প্রশ্রয় দাও।"

গল্পটা বেশ জমে উঠেছে! মিছরিদা বললেন, "আমার ভাই তখন বন্ধুর কাছে আসল সমস্যাটার দিকে আলোকপাত করলো। এদেশের প্রত্যেক মেমসায়েব বীফ খায়। গোখাদিকার দেহস্পর্শ করা মানেই তো গোমাংস ভক্ষণ করা। নিষ্ঠাবান ভট্চার্য্যি ব্রাহ্মণের সন্তানের পক্ষে এই অধঃপতন কল্পনা করাও কষ্ট। আমার ছোটভাই এতোখানি নিষ্ঠাবান যে সে-বেচারা মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করাই ছেড়ে দিল। কারণ ডেটিং-এ বেরুলে ইন্দ্রিয়গুলি যদি স্পর্শসুখের জন্যে কাতর হয়ে ওঠে।"

"আহা! তাহলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলো না।" এর আগে পটলদার মেমসায়েব বউয়ের ব্যাপারে শুনেছিলাম, স্রেফ সার্ভিস প্রিভির স্যানিটারি কারণে এডিথ মেমসায়েব শাশুড়ির ঘর ছেড়ে চলে এলেন, ইষ্ট-ওয়েষ্টের সফল মিলন হলো না। এবার জানছি, নিষিদ্ধ মাংসভোজীর শরীরও নিষ্ঠাবানের পক্ষে নিষিদ্ধ—স্পর্শ থেকেই সবরকম সংক্রমণের শুরু! ভাল একটা গল্প হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও এদেশের লোকরা বলবে, ইন্ডিয়ান হিন্দু যে কতটা ধর্মান্ধ এবং আচার বিচারের অনুশাসনে কীভাবে বন্দী তার প্রমাণ এই তরুণ-তরুণীর প্রণয়-ব্যর্থতা।"

"মেমসায়েব মেয়েটি কিন্তু আমার ছোট ভাইকে দেখে মুগ্ধ। সে বেচারা তো ততক্ষণে হৃদয় দিয়ে ফেলেছে। ছোটভাইও যে মুগ্ধ তা সে বুঝতে পেরেছিল।"

আমি বললাম, "এটা তো মিছরিদা, ট্র্যাজেডির একটা বিশেষ রূপ। যদি আমাকে খেলিয়ে গল্পটা লিখতে হয়, তা হলে অনেক ডিটেল নোট করতে হবে। কিন্তু মেন ব্যাপারে এর কোনো গুরুত্ব নেই—কারণ হিন্দুমতে বলুন, খ্রীষ্টীয় মতে বলুন, স্পর্শহীন বৈবাহিক মিলন তো সম্ভব নয়।"

মিছরিদা অধৈর্য হয়ে উঠে আমাকে বকুনি লাগালেন। "আগে ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শোন্। বিয়ে হয়েছিল এবং সেই বিয়ের প্রথম কন্যাসন্তানের বিবাহে পৌরোহিত্য করবার জন্যে আমি শিবপুর থেকে এখানে এসেছি, সঙ্গে রয়েছে হাওড়া সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির ফুল। তোদের সন্দেহপ্রবণ মন। তোরা ভাবছিস গোখাদক বাপমায়ের কন্যাকে হিন্দুমতে সম্প্রদানের জন্যে আমি এখানে এসেছি। মোটেই না।"

মিছরিদা এরপর রহস্য উদঘাটন করলেন। গোমাংসে পরিপুষ্ট রমণীশরীর স্পর্শ অবশ্যই গোমাংস ভক্ষণের সমপর্যায়, এই কথা ভেবে ছোটভাই তো দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলো। বেচারি মেমসায়েবব বুঝে উঠতে পারছে না হঠাৎ কী হলো! ভট্কারিয়া কি শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো স্বর্ণকেশিনীর সংস্পর্শে এলো? খুব মনে দুঃখ তার। সেই সময় অন্য বন্ধুর কাছে আসল ব্যাপারটা জেনে সে একদিন ভট্কারিয়া অর্থাৎ ভট্টাচার্যির অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলো। কমন বন্ধুও

সেই সময় উপস্থিত। বন্ধু বললো, সমন্বয়ই হচ্ছে ভারতবর্ষের শক্তি—পরস্পরবিরোধী মতকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে ইন্ডিয়ানরা দুনিয়ার সেরা। মেমসায়েব বললো, "বীফ এমন কিছু প্রিয় খাদ্য নয়, ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতে পারি।"

কিন্তু যে-শরীর এতোদিন গোমাংসে পরিপুষ্ট হয়েছে? বন্ধু বললো, "খুব সহজ ব্যাপার। দেশ থেকে আসবার সময় তুমি তো বোতলে করে গঙ্গাজল নিয়ে এসেছো। ওর সঙ্গে মেশানো যাক হাডসন নদীর জল। আর্যরা এই ভূখণ্ডে এলে গঙ্গা গোদাবরী যমুনার সঙ্গে হাডসনের জলও হয়ে উঠতো পবিত্র।" সেই জল ছড়িয়ে অস্পৃশ্য মেমসায়েবকে 'স্পৃশ্য করা হলো এবং তার কয়েক মাস পরেই শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেলো।

"কী হলো? এখনও গোমড়া মুখ করে আছিস কেন?" কোশ্চেন করলেন মিছরিদা।

"গল্পটা যদি লিখি এবং কোনোক্রমে ইংরিজীতে অনুবাদ হয়ে সায়েবদের হাতে পড়ে তাহলে খুব খারাপ ফল হবে, মিছরিদা। একটি মেয়ের দুর্বার প্রেমের সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা তাকে বীফ খাওয়ার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করলো!"

মিছরিদা হা-হা করে হাসলেন। "আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হতো। অনুরাগে রক্তিম কোনো রমণীকে তার বিশেষ সাধ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, বরং নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু আমার ভাইবউ এবারে আমাকে কী বলল জানিস? 'বিশ বছর আগে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম এখন সমস্ত আমেরিকাই তা ত্যাগ করতে চলেছে।' ভট্‌চার্যি বাউনের কথা যারা কানেও তুলতো না ডাক্তারের ওয়ার্নিং-এ তারাই গোমাংস ত্যাগ করছে—বীফের বিক্রি অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এখন মাংসখেকো সায়েবদের নজর পড়েছে মাছ আর শাকসব্জির ওপর। এই রেটে চললে বাঙালি আর আমেরিকানের আহারের মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। আমার ভাইঝিটা ফোড়ন কাটলো, 'সাধে কী গীতায় লিখেছে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, দ্য ওয়ার্লড থিংকস্ টুমরো'!"

"গীতা! ওটা তো মহামতি গোখলের উক্তি!"

"আমি কি আর তা জানি না ভাবছিস? কিন্তু 'দ্য গীতা' থেকে যখন ও নিজেই কোটেশন দিচ্ছে তখন দিক না—লোকে যদি একটু বেশি বিশ্বাস করে তো করুক। বাঙালিদের সম্বন্ধে এক-আধটা ভাল কথা বলার চান্স পেলে মিস্টার অর্জুনের ড্রাইভার কিষাণজী নিশ্চয় আপত্তি করতেন না।"

মিছরিদা এবার সগর্বে মণিবন্ধের এইচ-এম-টি'র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বললেন, "সময়ের মাপজোকটা আমি বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নই। আমার ছোটভাই বিশ বছরে যতই সাহেব হোক, হাতের দিশি ঘড়ি ছাড়েনি। আমি তো নতুন জামাইয়ের জন্যেও দেশ থেকে এইচ-এম-টি নিয়ে এসেছি ভাইবউয়ের রিকোয়েষ্টে। বিয়ের যাবতীয় জিনিসপত্তর ইন্ডিয়া থেকে আসুক এই ছিল ওদের ইচ্ছে।"

"পান নিয়ে আসেননি তো? একবার কাস্টমসের খপ্পরে পড়লে দেশছাড়া করে দেবে।"

"সুপুরি এনেছি বুক ফুলিয়ে। পান এখন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। পাত্রী নিজেই হবু জামাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে কিনে এনেছে—ওদের কেবল দুঃখ এই পান ইন্ডিয়ার নয়। ভিয়েতনাম না কোথায় থেকে এসেছে।"

মিছরিদা বললেন, "এলাম শুভ কাজে—কিন্তু জড়িয়ে গেলাম দুর্দৈবে। যেদিন পৌঁছলাম তার পাঁচদিন পরেই ভাইবউয়ের দূর সম্পর্কের কাকা মারা গেলেন। কী কুক্ষণে বলেছিলাম, হাজার হোক কুটুম। দাহের সময় শ্মশানে যাওয়া লোকাচার।"

"দাহ কোথায়? এখানে তো মাটি দেওয়া!"

"ওই হলো। পঞ্চভূতে লীন হবার তিন-চারটে রুট আছে—হয় ভস্মীভূত হওয়া, না হয় ক্ষুধার্ত পশুপক্ষীকে দেহ উপহার দেওয়া, না হয় গোরস্থ হওয়া।"

"আপনি ইনভাইটেড হয়েছিলেন তো মিছরিদা?"

খুব বিরক্ত হলেন মিছরিদা, "ওরে হতভাগা, আমি ম্যারেজের কথা বলছি না। লোকের বিপদ-আপদে শ্মশানযাত্রী হবার জন্যে কেউ ছাপানো রঙিন কার্ড প্রত্যাশা করে না। খবর শুনলেই যেতে হয়।"

কিন্তু দাহ, অশৌচ ইত্যাদির ব্যাপারে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন মিছরিদা। "এখন বুঝতে পারছি, এখানে কেউ মরতে চায় না কেন? যে করে হোক বেঁচে থাকাটা খুব প্রয়োজন, বুঝলি। মরার হাঙ্গামাটা বড্ড বেশি।"

প্রথমে মিছরিদাই বলেছিলেন, "দুঃসংবাদ যখন এসেছে, তখন তালুইমশাইয়ের বাড়িতে কাকিমার সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।"

প্রথম ধাক্কা ওখানেই। মিছরিদা শুনলেন, এখানে কেউ নিজের বাড়িতে মরে না। মৃত্যু হয় রাস্তায় পথ-দুর্ঘটনায় অথবা হাসপাতালে। মরবার পরেও ডাক্তার-

বদ্যির হাত থেকে মুক্তি নেই—কেন মরণ হয়েছে তার একটা ফাইনাল ডায়গনোসিস প্রয়োজন। মিছরিদার দুঃখ : "মরা অবস্থায় নিজের বাড়িতেও তুই ঢুকতে পাবি না। এখানে মড়াদের পৃথিবীটাই আলাদা।"

মরার খবর রটলেই সেলসম্যানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। হাসপাতাল থেকে বডিকে ফিউনারাল হোম-এ নিয়ে যাবার জন্যে কোন কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করবেন স্যার?

"মরলি আর সঙ্গে-সঙ্গে জানাশোনা লোকের কাঁধে চড়ে কেওড়াতলায় হাজির হলি, ওসব তড়িঘড়ি ব্যাপারে সায়েবরা নেই। মরেছো তো কী হয়েছে? সাজগোজ করো ; কয়েকটা দিন এয়ারকণ্ডিশন ঘরে থাকো। এই ফিউনারাল হোমগুলোকে মড়াদের হোটেল বলতে পারিস! টুপাইস থাকলে মড়া অবস্থাতেও ফাইভস্টার কমর্ফট পাবি।"

"আমি দেখলাম, ভাইবউ জেনিফার একটা টেলিফোন পেয়ে পুরনো ছবির অ্যালবাম খুঁজতে লাগলো। কাকার একটা বহুকাল আগেকার ছবি সেলসম্যানের হাতে দিয়ে দিলো।"

মিছরিদা পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় জেনিফারের সঙ্গে ফিউনারাল হোমে গিয়ে কাকুকে দেখে তাজ্জব। জেনিফারের সঙ্গে কাকুর শেষ ছবিটা মিছরিদা দেখেছেন—মুখখানা রোগে এবং বার্ধক্যের প্রকোপে শুকনো কিসমিসের মতন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কফিনে শোওয়া মূর্তি দেখে মিছরিদা তো অবাক। কাকু মরার আগে তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন। ফুটফুটে জামাইবাবুটি যেন সুখনিদ্রা যাচ্ছেন।

"আহা! এতো সুন্দর শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে মানুষটা চলে গেলো!" মিছরিদা দুঃখ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভাইয়ের কাছে যা শুনলেন তাতে দমে গেলেন।

"যার যত পয়সা আছে মরার পরে সে তত ছেলে-ছোকরা হয়ে যেতে পারে!" ফিউনারাল হোমের স্পেশালিস্টরা মরাকে বাঁচাতে পারে না, কিন্তু বৃদ্ধকে যুবক করতে ওস্তাদ। শুধু হুকুম করুন, কোন্ বয়সে ফিরে যেতে চান। দিয়ে দিন সেই বয়সের একটা ছবি। তারপর কয়েকটা ঘণ্টা ওদের মেকআপের জন্যে দিন। ছুঁচসুতো প্যাড ইত্যাদি দিয়ে আর্টিস্টরা অসাধ্যসাধন করে দেবে। যত বয়স কমাতে চাইবেন তাতে খরচ বেশি।

মিছরিদা বলবেন, "আমার চক্ষু ট্যারা! কাকাবাবুকে মেক-আপ দিতে লেগেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? একবার চাই দু'বার তো কেউ মরবে না! সুতরাং মাটি-চাপা পড়বার আগে মরণোত্তর সাধ আহ্লাদগুলো তুমি মেটাবে না কেন?"

সাজগোজের নাম ক্লিন-আপ। কিন্তু ক্লিন-আপের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে

আছে কফিনের ব্যাপারটা। "একখানা কফিন বাক্সের দাম কত হতে পারে শুনলে তোরা ভিরমি যাবি। সবচেয়ে কম ১৮০ ডলার—ওসব গরিবদের জন্যে। পছন্দসই কফিন রয়েছে ৯০,০০০ টাকা দামে। তাতে কত সুখের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এই স্টেজেই জানাতে হবে, নাইট ভিউয়ের সময় তুমি শরীরের কতটা দেখতে চাও—সেই অনুযায়ী স্প্রিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। এবং মেক-আপ আর্টিস্টরা শরীরের ততটুকু অংশকেই স্পেশাল সাজগোজ করাবে।"

নাইট ভিউতে কত লোক আসবে তা-ও আগাম জানাতে হবে, সেই অনুযায়ী বড় বা ছোট হলঘরের ব্যবস্থা হবে। পয়সা ঢাললে কোনো অসুবিধে নেই—ফিউনারাল এখানে মস্ত এক ব্যবসা।

মিছরিদা বললেন, "আমেরিকানদের যত তড়িঘড়ি বেঁচে থাকার সময়, মরবার পরে এরা শান্ত। অনেক গয়ংগচ্ছ করে এরা কবরে যায়! আমরা বেঁচে থাকি গয়ংগচ্ছ ভাবে, কিন্তু মরলেই তড়িঘড়ি—বাসিমড়া শাস্ত্রবিরোধী।"

তবে একটা ব্যাপারে মোহিত হয়েছিলেন মিছরিদা। "ওরা বলে সার্ভিস। জানাশোনা লোক সব আসছে, গাইছে মৃতের গুণগাথা। কে বলে সায়েবরা স্বভাবচাপা—ভাব প্রকাশ করতে চায় না? সার্ভিসের বক্তৃতা শুনে আমার তো চোখে জল এসে গেলো। একজন এলেন স্থানীয় ক্লাব থেকে। বললেন, 'জন-এর মতন মানুষ লাখে একটা হয় না। সবসময় আমাদের ক্লাবের কথা ভাবতেন।' আর একজন এলেন স্কাউট থেকে—বললেন, "তুলনাহীন মানুষ এই জন। মনুষ্যত্বের সঙ্গে দেবত্বের সংমিশ্রণ যারা দেখতে চায় তারা জন সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর করুক।"

একের পর এক বক্তা দশ-পনেরো মিনিট ধরে বলে চলেছেন আর চোখ দিয়ে জল ঝরেছে মিছরিদার। প্রয়াত মানুষটা একবার তাঁকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠিয়েছিলেন, কেন তিনি ওঁর সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করেননি!

মিছরিদা চোখ মুছতে-মুছতে দেখলেন, পাথরপ্রতিমার মতন জনের বিধবা বসে আছেন কালো ড্রেস পরে। মাঝে-মাঝে বক্তৃতা শুনছেন আর চোখ মুছছেন, কিন্তু 'ওগো আমাকে কোথায় রেখে গেলে গো। আমার কী হবে গো? আমায় কে দেখবে গো?' বলে বাঙালি স্টাইলে মরাকান্না নেই।

মিছরিদা স্বীকার করলেন, "সার্ভিসে ইংরিজি বক্তৃতা শুনে সায়েবজাতটা সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। ইংরিজিতে কী গভীর ভালবাসার প্রকাশ, কী সুখস্মৃতির প্রাবল্য, কী কৃতজ্ঞতার ধারাবর্ষণ। ইংরিজি ভাষা যে বাংলা থেকেও ইমোশনাল এবং হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা বুঝলাম জনের পরিচিতজনদের বক্তৃতায়। দুর্জনের মুখে শুনেছিলাম, বড্ড ব্যস্ত জাত এরা, কারুর জন্যে কারুর সময় নেই, যে যার কাজ নিয়ে মশগুল। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম, নিজের

কানে যা শুনলাম তাতে জানালাম, এতোদিন নির্জলা মিথ্যে বুঝেছিলাম।"

দু'এক জন পড়শীও বক্তৃতা করলেন। আরও বক্তৃতা হবে দু'তিন দিন ধরে। একজন বৃদ্ধা তো স্বগতোক্তি করলেন, হাউ লাকি ইজ জন। ওঁর গিন্নিরও কত ভাগ্য, নিজের কানে স্বামী সম্বন্ধে এইসব সুন্দর কথা দিনের পর দিন শোনার সৌভাগ্যবতী।

রাত হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক আত্মীয়বন্ধুরা বিদায় নিচ্ছেন। জেনিফার হঠাৎ আসছি বলে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর ফিরে এসে ক্ষমা চাইলো মিছরিদার কাছে দেরি হবার জন্যে।

কাকিমা আসলে জেনিফার-এর ওপর কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। মিছরিদা বলতে যাচ্ছিলেন, আমার এদেশ সম্বন্ধে অন্য ধারণা হলো, মানুষ মানুষকে কতখানি ভালবাসতে পারে তা বুঝলাম। সেই সময় জেনিফারের মুখে শুনলেন, "কাকিমা নিজে পারলেন না। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বক্তাদের পেমেন্টগুলো মিটিয়ে দিতে। ওরা খুব রিজনেব্‌ল—প্রতি পাঁচ মিনিট বক্তৃতার জন্যে মাত্র একশ ডলার চার্জ করলো। খুব অনেস্ট—ঠিক যত মিনিট বক্তৃতা করেছে তার জন্যে টাকা নিলো।"

মিছরিদা বললেন, "জীবনে আমি কখনও এমন শক খাইনি! তোকে বলছি, এখানে মরার কোনো মানে হয় না।"

দু'দিন পরে পাদ্রির বক্ততাও শুনেছিলেন মিছরিদা! অসাধারণ বক্তৃতা—অ্যাওয়েক সার্ভিস—অর্থৎ কিনা জাগরী।

ফাদার বললেন, "আসাধারণ পুরুষ এই জন—যার সমগ্র জীবনটি যেন বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখছি শিকাগোতে জন জন্মগ্রহণ করছে। পিতৃ ও মাতৃ পরিচয় কী দেবো? এমন বংশ গৌরব নিয়ে আমরা ক'জন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি? মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখছি, শিশু জন হামাগুড়ি দিচ্ছে এবং বিরাট এই বিশ্ব থেকে মহামূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করছে।"

কৌশোর, বাল্য ও বিদ্যাশ্রমের অধ্যায় পেরিয়ে পুরোহিত এবার ব্যবসায়ী জীবনের সুকঠিন সাধনায় মগ্ন জনকে চিত্রিত করলেন। 'ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখছি ব্যবসায়ে সফল জনকে। জন তার প্রথম মিলিয়ন ডলার এই সময়েই উপার্জন করে। কিন্তু এর পরের অধ্যায়ে আমরা দেখছি দশলক্ষপতি হয়েও জন আমাদেরই লোক—আওয়ার ম্যান। তার আচরণ, তার বিনয়, তার মিষ্টতা দেখে কে বলবে একটা নয়, চারটে ডাইংক্লিনিং দোকানের সে কর্ণধার? কে বলবে জন ইতিমধ্যেই তিনটি ফ্ল্যাট কিনেছে? আমি বলবো, শুধু জন ধন্য নয়, ধন্য তার সুযোগ্য বর্তমান সহধর্মিণীও, যাঁকে এই জীবনের ষষ্ঠপর্বে জন নিজের আপনজন

হিসেবে পেয়েছিল। জন চিরদিন বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়ে. জনকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারবো না। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আগামীকাল আমাদের স্থানীয় প্রিয় রাজনৈতিক নেতাও জনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।"

মিছরিদা বললেন, "কোন্ কুক্ষণে আমি ফাদারের বক্তৃতার প্রশংসা করেছিলাম। প্রত্যুত্তরে শুনলাম, ইনি কৃতী প্রফেশনাল। পনেরো মিনিটের বক্তৃতার জন্যে হাজার ডলার চার্জ করেছেন। আর যেহেতু জনের জীবন সম্বন্ধে আমরা ঘটনাগুলি সাজিয়ে দিইনি সেজন্য বাড়তি পাঁচশ ডলার ওঁর গবেষণার পারিশ্রমিক। রাজনৈতিক নেতাও আসছেন, ওঁকে দু'হাজার ডলার দেওয়া হবে বলে। শোক দেখাবো অথচ পয়সা পাবো না তা এই কাজের দেশে কেমন করে হয়?"

মিছরিদা বললেন, "মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও তুলনাহীন। সেই ট্রাডিশন এই মার্কিন মুলুকের বাঙালিরা সমানভাবে চালু রেখেছে। বেঁচে থাকতে যতই জ্বালাক, কেউ চোখ বন্ধ করলে বাঙালি এখনও ওয়ার্লডের এক নম্বর। যে-বাঙালি পরনিন্দা না করে অন্নগ্রহণ করে না সেই বাঙালি তোমার মৃত্যুতে ঝরঝর করে চোখের জল ফেলবে বিনা পারিশ্রমিকে। যে-বাঙালি-সাংবাদিক তোমাকে সারাজন্ম ধরে অপদার্থ বলে চিহ্নিত করেছে সে-ই লিখবে, তোমার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো তা কোনোদিন পূরণ হবে না। যে তোমাকে চিরদিন আড়ালে স্ত্রীর ভ্রাতা বলে গালি দিয়েছে সেই-ই হৃদয় থেকে বলবে তুমি ছিলে প্রাতঃস্মরণীয়।"

এরপর মিছরিদা বললেন, "চল তোকে একজন আশ্চর্য মানুষের কাছে নিয়ে যাই, বিপদ-আপদে সব মানুষকে কাছে টেনে নিতে, প্রবাসে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে যার তুলনা নেই। ছেলেটাকে দেখে আমি মজে গিয়েছি। আদর্শ শ্মশানবন্ধু বলতে পারিস—সস্তায় কী করে মরতে হয় সে ব্যাপারেও একজন আন্তর্জাতিক অথরিটিও বটে।

বাসে চড়িয়ে মিছরিদা আমাকে যার কাছে হাজির করলেন তাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। মিছরিদা বললেন, "শরৎ চাটুজ্জ্যে বেঁচে থাকলে একে নিয়ে চমৎকার একটা ক্যারাকটার সৃষ্টি করতে পারতেন। এর নাম প্রবীর রায়।"

প্রবীর রায়! আবার দেখা হয়ে গেলো। বাঙালির বিত্তবাসনা ও সাধনার প্রতীক প্রবীরবাবু এবারে মৃত্যু সম্বন্ধে কথা বললেন।

"জানাশোনা লোকের মৃত্যুতে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যে বাঙালিরাও কি পয়সা নিতে শুরু করেছে?"

আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন প্রবীর রায়। বললেন, "এখানকার বাঙালিদের বয়স বাড়ছে—মৃত্যু এখন তেমন দুর্লভ ঘটনা নয়। এক একটা মৃত্যু আসে, সমস্ত সমাজকে আচমকা নাড়া দিয়ে চলে যায়। ন্যায্যমূল্যে মরবার খরচ-খরচা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি—দুঃসময়ে মানুষের কাজে লেগে যায়।"

এখানকার ফিউনারাল খরচ সম্বন্ধে একটা আন্দাজ দিলেন প্রবীরবাবু। একটু হাত খুলে কাজ করতে গেলে লাখ তিন-চার টাকা কিছুই নয়।

ধরুন কবরের জমির দাম। প্রাইভেট কবরখানা চমৎকার বিজনেস—টাকা বিনিয়োগ করার পক্ষে অতীব প্রশস্ত। একটু ভাল জায়গা নব্বুই বছরের লিজে নিতে হলে আড়াই লাখ টাকা। ফুলের ঘায়েও মূর্ছা যেতে পারেন আপনি! হাজার তিনেক টাকার ফুল কিছুই নয়। যাঁরা শ্মশানযাত্রী তাঁরাও সবাই ফুল দেবেন। এফ-টি-ডি বলে ফুলওয়ালাদের ইউনিয়ন আছে—আমেরিকার যে কোনো জায়গায় তারা কুড়ি মিনিটের মধ্যে আপনার নাম করে ফুল পাঠিয়ে দিতে পারে।

আর ডোম তো ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে আসবে। কফিনের মাপ তাকে আগাম দিতে হবে—ড্রেজার যন্ত্র দিয়ে সে কিছুক্ষণের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে দিয়ে হুশ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাবে। চেহারা দেখে মনে হবে ফিল্মস্টার—আমাদের শ্মশান-ডোম দেখলে ভয়ে হার্টফেল করার অবস্থা হয়। এখানে সুদর্শন লোককে এই কাজের জন্যে নির্বাচন করা হয় যাতে পারলৌকিক কাজের সময় পারিপার্শ্বিক স্নিগ্ধতা বজায় থাকে। গাঁটের পয়সা খরচা করে যমদূতের মতন ডোম আপনি ভাড়া করবেন কেন?

ফুল শুধু কবরের দিন দিলে চলবে না। কয়েকদিন নিকটজনরা প্রত্যহ ফুল দিয়ে যাবেন। তারপর কোম্পানিকে স্থায়ী অর্ডার—তারা নিয়মিত ফুল রেখে যাবে আপনার নির্দেশিত জায়গায় বছরের পর বছর। মৃত্যুদিনে স্পেশাল ফুলে সাজিয়ে দেবে স্মৃতিস্তম্ভ।

কিন্তু এসবের জন্যে প্রয়োজন অর্থ। দূরদর্শী লোকরা তাই বয়স থাকতে থাকতে মরবার টাকা জোগাড় করতে আরম্ভ করেন। তিরিশ বছর বয়স থেকে প্রতিমাসে ইনসিওর কোম্পানিকে ষাট-সত্তর ডলার দিলে পরিণত বয়সে নিশ্চিন্তে মরার হিল্লে হয়ে গেলো। মরার পরে ছেলেমেয়ে যদি শুনলো আপনি শ্মশান-খরচার জন্যে আলাদা অর্থের ব্যবস্থা করে যাননি তাহলে হয়ে গেলো আপনার অবস্থা—মরেও আপনার শরীরের জ্বালা কমবে না। যে বাপ-মা ছেলের ঘাড়ে মরতে চায় তাদের দুর্দশা অনেক। ছেলে বা ছেলের বউ কেউ এ-ব্যাপারে খুশি হবে না।

আর টাকার ব্যবস্থা যদি থাকে তো সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন হয়ে যাবে। নানা খুঁটিনাটির তদারকি করার জন্যে লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কোম্পানিই

এসে জিজ্ঞেস করবে—খবরের কাগজে শোক-সংবাদ কিভাবে প্রচার হবে? ছবি কোন সাইজে ছাপা হবে? কাদের খবর দেওয়া হবে? কতগুলো কালো ড্রেস ভাড়া নিতে হবে? অথবা আপনি যদি নাকউঁচু সমাজের সভ্য হোন একেবারে ড্রেশ কিনে নেবেন?

শোকে মুহ্যমান হলে নিজে গাড়ি চালানো শোভন নয়। কোনো চিন্তা নেই, ফিউনারাল কোম্পানিই প্রত্যেককে বাড়ি থেকে তুলে নেবে, আবার বাড়ি পৌঁছে দেবে। প্রতিটি লিমোজিন ঘণ্টায় একশ ডলার এবং ড্রাইভারের পারিশ্রমিক ঘণ্টায় মাত্র পঞ্চাশ ডলার। যত ঘণ্টা খুশি রাখুন, প্রাণভরে শোক করুন। এইসব গাড়ি যখন শোভাযাত্রা করে আপনার কফিন-গাড়ির পিছুন-পিছুন যাবে তখন ট্রাফিক পুলিশও আপনাকে রাজকীয় সম্মান দেখাবে—লাইফে একবারই ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে, পুলিশকে কলা দেখিয়ে আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন।

"ভারতীয়দের তো তাহলে এদেশে মরার কোনো মানে হয় না।" মনের দুঃখে মিছরিদা বললেন, "বেঁচে থাক আমার বাঁশতলা, নিমতলা, কাশীমিত্তির, কেওড়তলা।"

প্রবীরবাবু বললেন, "পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মধ্যে লজিক আছে। নব্বুই বছরের লিজ প্রয়োজন হলো না। তবে প্রতি পদে দরদস্তুর করতে হয়। আমাকে অনেকবার এইসব দায়িত্ব নিতে হয়েছে—শোকের সময় নিকট-আত্মীয়দের এসব বোঝাপড়ার শক্তি থাকে না। হাসপাতাল থেকে হোম পর্যন্ত ট্রান্সপোর্টেশন খরচ থেকেই সাবধানে শুরু করতে হয়। ক্লিন আপ, নাইট ভিউ, ইত্যাদি আমরাও নিই। লিমোজিন আমরা ভাড়া করি না। নিজেরাই ড্রাইভারি করি। আমাদের পুরোহিত খুব এফিসিয়েন্ট—ব্যাগের মধ্যে দাহকাজের সব জিনিসপত্তর নিয়ে চলে আসেন মিস্টার পট্টবর্ধন। আগে দক্ষিণা ছিল সাড়ে ছ'শ টাকা এখন হাজার দিলেই খামের মধ্যে চিতাভস্ম পাওয়া যাবে। ইচ্ছে হলে ওই ভস্ম দেশে পাঠিয়ে দাও—মিশে যাক গঙ্গাযমুনায়।"

এখানে একটা মুশকিল। দাহকার্যে ইন্ডিয়ান ধূপধুনো জ্বালানো নিষিদ্ধ—পরিবেশ দূষণের কথা ভেবে কোনোরকম গন্ধদ্রব্য পোড়ানো যাবে না। "এই নিষেধটা আন্দোলন করে আমাদের তুলতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক বিড়ি-সিগারেট ফুঁকছে চলমান চিমনির মতন, তাতে কিছু হচ্ছে না, পরিবেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে ডজনখানেক ধূপ জ্বালালে।"

প্রবীরবাবু আশ্বস্ত করলেন, "আমাদের এখনও বক্তৃতা দেবার জন্যে লোক ভাড়া করতে হয় না। বিদেশে বিপদের সময় ভারতীয়রা তুলনারহিত—খবর পেলেই তাঁরা ছুটে আসেন সব কাজ ছেড়ে, চরম বিপদের সময়ে নিঃসঙ্গ বোধ করার কোনো ভয় নেই।"

মিছরিদার মন্তব্য, "সায়েবদের শ্মশানের পরিচ্ছন্নতা আমার খুব ভাল লেগেছে। এরা টু-পাইস হাতিয়ে নেবার জন্যে ছটফট করে বটে, কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলা। আমার ভাল লাগলো, সবাইকে খাতায় সই করতে হলো, আমিও নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। সুতরাং কে এসেছিল, কে আসেনি তা জানবার জন্যে ওনের বিধবাকে ছটফট করতে হবে না।"

মিছরিদার প্রস্তাব, "এই সিস্টেমটা তোরা দেশেও চালু কর। মৃত্যুর পরে যাঁরাই বাড়িতে আসবেন বা শ্মশানে যাবেন সবাই খাতায় নাম-ঠিকানা লিখবেন। একটা পারিবারিক রেকর্ড থেকে যাবে।"

প্রবীরবাবু শুনলেন, কিন্তু মন্তব্য করলেন না। বললেন, "যত কমেই হোক, বিদেশে মরতে গেলে অন্তত হাজার দুই তিন ডলার আপনার রেডি রাখতে হবে।"

মিছরিদা সেই শুনে বললেন, "অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি তোকে বলেছি, জন্মাবার পক্ষে বেস্ট জায়গা এই আমেরিকা, কিন্তু মরবার পক্ষে ইন্ডিয়া এখনও এক নম্বর।"

নিউ জার্সিতে মিছরিদা-সান্নিধ্যে প্রবীর রায়ের বাড়িতে বসে মৃত্যুকেন্দ্রিক মার্কিনী ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাবাতা শুনে কান খাড়া হয়ে উঠছিল।

মুখে একটু মুখশুদ্ধি পুরে মিছরিদা আমার দিকে একটি বটিকা এগিয়ে দিলেন। (বহু কষ্টে আমেরিকান কাস্টমসের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে বস্তুটি তিনি এদেশে নিয়ে এসেছেন। দুটি শিশির একটি লালু কাস্টমসদাকে নমুনা-উপহার হিসেবে ছেড়ে এসেছেন, রায়াসনিক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, গোলমেলে কিছু আছে কি না!)।

চোখ বুজে মুখশুদ্ধির রস গভীরভাবে উপভোগ করে মিছরিদা বললেন, "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা একেই বলে! যদি ঠিকমতন মালকড়ি না থাকে তাহলে বংশধরদের মুখ চেয়ে কারুর মরতেই ইচ্ছে করবে না স্রেফ ঘাটখরচের ভয়ে।"

মিছরিদার পরবর্তী বক্তব্য, "তোকে কি বলবো, লোকগুলো একেবারে বে-আক্কেলে। ডলারের ব্যাপারে কোনো রকম লজ্জাশরম নেই। আমিও হচ্ছি শ্রাপধন হাওড়া-কাসুন্দের মিছরি ভট্‌চার্যি, চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে একটু-আধটু বাগিয়ে নিয়েছি—এই দ্যাখ!" বলে মিছরিদা আমাকে একটা ঝকঝকে দামী চাবির রিং দেখালেন।

"কি ব্যাপার মিছরিদা?"

"নেহাত গোরস্থানের ডোমদের ব্যাপার, না হলে দেশে ফিরে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির পুরুতমশাইকে উপহার দিতাম। ও বেচারা অনেকদিন আমার কাছে একটা ভাল চাবির রিং চাইছে।"

মিছরিদা এবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। "শ্মশানে-গোরস্থানে কিংবা ফিউনারাল হোমে গেলে নাম-ঠিকানা নিজের হাতে খাতায় লিখে রাখার সিস্টেমটা আমার প্রথম খুব ভালে লেগেছিল। তখন তাই ভাই-বউয়ের কাকার অন্ত্যেষ্টিতে নিজের নাম-ঠিকানা লিখেছিলাম। ভিতরের ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝিনি। ওমা! ঠিক তিনদিন পরে বাতাসার ঠিকানায় আমার নামে ঝকঝকে একটি চিঠি এলো।"

মুখশুদ্ধির রসটা টেনে নিয়ে মিছরিদা বললেন, "আমেরিকান কোম্পানি বুঝতে পারেনি যে আমি দু'দিনের অতিথি, ভাই-ঝি'র বিয়েটা দিয়েই আমি কেটে পড়বো, আর কখনও এদেশে আসবো না। কোম্পানি ভেবেছে আমি এখানেই মরতে এসেছি!"

"তারপর?"

"তারপর আর কি!" মুখ বেঁকালেন মিছরিদা অর্থাৎ মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য। "আমার ভাই বাতাসা, আমার ভাই-বউ খুব লজ্জায় পড়ে গেলো। আমার তো ধারণা ছিল চৈত্র মাসে কাপড়ের দোকানেই শুধু সেল দেয়। ওমা! এখানে মড়ার ব্যাপারেও সেল! ঠিক দিনক্ষণ দেখে মরতে পারলে অনেক রেট সস্তা হয়!"

"কী যা-তা বলছেন মিছরিদা!"

"দেখ না, তুই। মড়া-কোম্পানির চিঠিটা তো আমার পকেটেই রয়েছে। শোন কী লিখছে কোম্পানির সায়েব ভাইস প্রেসিডেন্ট : 'আশা করি সেদিনের গভীর দুঃখের রেশ কাটিয়ে উঠে তুমি আবার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে বিপুল বিক্রমে দৈনন্দিন কাজ শুরু করবার মানসিক শক্তি সংগ্রহ করেছো। যদি তোমার দুঃখের মুহূর্তে কোনো সঙ্গীসাথী প্রয়োজন হয় তা হলে জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমাদের প্যানেলে স্পেশালি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক আছে, মাত্র ঘণ্টায় কুড়ি ডলারের বিনিময়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে সানন্দে তোমার দুঃখের ভাগিদার হবে।

'এইসঙ্গে আমরা একটি স্মারক চাবির রিং পাঠালাম। সেই স্মরণীয় দিনটি যাতে সুন্দর একটি উপহারের মাধ্যমে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে।

'কিন্তু সেইসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কথা। তোমার ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছি তুমি একজন শহুরে মানুষ। জীবিতকালে অর্থোপার্জনের জন্যে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, শহরের নানা ঝামেলা তোমাকে মুখ বুজে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই চাও না, সব কর্মের শেষে তুমি যখন চিরশান্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে তখনও ওইসব গাড়ির আওয়াজ, কংক্রিটের গরম তোমাকে জ্বালাতন করে। সেইজন্যেই চমৎকার আগাম ব্যবস্থা। চিঠির সংলগ্ন ম্যাপ দেখো। যেখানে তুমি শুয়ে থাকবে, তাঁর চারিদিকে সবুজ গাছ, রঙিন ফুলের শোভা। এইসব জমি দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি মাসে-মাসে শতখানেক ডলার জমা

দিয়ে আগাম ব্যবস্থা করে রাখো যাতে মৃত্যুর পরে কোনো হাঙ্গামা না থাকে। একদিন অনুগ্রহ করে, আমাদের প্রতিনিধিকে তোমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দাও। সবকিছু জলের মতো সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। ভবদীয়...

'পুঃ অমুক তারিখ পর্যন্ত আমাদের বিশেষ সেল চলেছে। দশ পার্সেন্ট কমে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করার এমন চমৎকার সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া কোরো না'।"

মুখ থেকে মুখশুদ্ধিটা বার করে বেসিনে ফেলে এলেন মিছরিদা। বললেন, "ভাগ্যে তোর বউদি সেই হাওড়া থেকে এখানে আসেনি। হার্টের দোষ রয়েছে। চিঠিটা দেখলে কী অবস্থা হতো বল দিকি।"

মিছরিদা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু বাতাসা বললো, ওতে বিপত্তি বাড়বে। দু' তিন সপ্তাহ পরে কম্পিউটার থেকে আবার অটোমেটিক রিমাইন্ডার আসবে।

ফলে বাধ্য হয়ে চিঠির উত্তর দিতে হলো। মিছরিদা দামী লেটার হেডে নিজের হাতে লিখলেন—"আমার মরণোত্তর সুখসুবিধে সম্পর্কে আপনাদের গভীর উদ্বেগের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। মরার পরে সব দুশ্চিন্তা বিসর্জন দিয়ে চিরকাল পা-ছড়িয়ে শুয়ে থাকার জন্যে আপনার শান্ত জায়গাগুলিই যে সব থেকে মনোহর সে-সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সাত সমুদ্র পারে হাওড়ার বাঁশতলা ঘাটে আমি ইতিমধ্যেই ডি-লাক্স প্লট বুক করে রেখেছি—আমার বহু জানাশোনা লোক আড়ালে আবডালে বহুদিন ধরে জানতে চাইছে কবে আমি বাঁশতলা ঘাটে ভিজে কাঠের বেদিতে উঠবো। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে আপনাদের স্পেশাল কনসেশনের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হলো না। আপনার মনোমোহন চাবির রিংটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এটি আমি যথাসময়ে বাঁশতলার ডোমের হাতে তুলে দেবো। ভবদীয়—শ্রীমিহিরকিরণ দেবশর্মণঃ"

মিছরিদা বললেন, "আমার ভাই বাতাসা চিঠি পড়ে বললো, 'সব ভাল, কিন্তু ভট্টাচার্য লেখো—কম্পিউটার হচ্ছে বুদ্ধিমান-বোকা। দেবশর্মণঃ দেখে ঘাবড়ে যাবে, ভাববে অন্য কেউ চিঠি লিখেছে, ফলে আবার রিমাইন্ডার পাঠাবে'।"

মনের দুঃখে মিছরিদা লিখলেন, "হোয়াট ইজ ফিফটি-টু ইজ অলসো ফিফটি থ্রি: ইওরস ফেথফুলি—মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য।"

"ওটা কী হলো, মিছরিদা?"

ঠোঁট উল্টে মিছরিদা ব্যাখ্যা করলেন, "সায়েবদের বুঝিয়ে দিলুম, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। ভট্টাচার্যই খাটে উঠে ঘাটে যাবার সময় দেবশর্মণঃ হয়। তাতে বাইবেল, গীতা, কোরাণ অশুদ্ধ হয় না।"

প্রবীর রায়ের নিউজার্সিভবন থেকে বেরিয়ে মিছরিদা বললেন, "এখন কোথায় যাবি? এর নাম আমেরিকা! বউমা 'এখনো কেন বাড়ি ফিরছে না' ভেবে তোর জন্যে মুখ শুকিয়ে থাকবেন না, চল দুজনে একটু এধার-ওধার ঘুরে বেড়াই।"

"আপনি কি শেষ পর্যন্ত নাইট ক্লাবে যাবার কথা ভাবছেন, মিছরিদা?"

জিভ কাটলেন মিছরিদা। "আমরা হলাম কিনা বিবেকানন্দর সেবায়েত। উনিওতো এসেছিলেন এ-দেশে, কিন্তু গিয়েছিলেন কি কোনো নাইট ক্লাবে? আসল ব্যাপারটা কি জানিস, আমরা যে অভাগা দেশে জন্মেছি তা তমসাচ্ছন্ন! সমস্ত দেশটাতেই যখন নাইট তখন আর ক্লাবে গিয়ে কি এমন বাড়তি সুখ হবে?"

আমরা এবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে ফিরে এলুম। মিছরিদার প্রস্তাব, "চল আমার ভায়ের বাড়ি। বাতাসার জল খেয়ে শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করে নিবি।"

মিছরিদা আমাদের অবাক করলেন। ভাইপো ভাইঝিদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দেবার জন্যে সঙ্গে করে সত্যিই পাটালি, মিছরি এবং বাতাসা এনেছেন। "বাপের ডাক-নাম যে বাতাসা এবং তার অর্থ যে সুইট তা তারা জানে, কিন্তু আসল বস্তুটি কি তা আন্দাজ করতে পারেনি। এবারে ভাইঝি লিখেছিল, আঙ্কেল, যদি পারো সঙ্গে 'ব্যাটাসা' এনো। আনতে হলো। বোঝাতে হলো, যে সুইটের মধ্যে বাতাস অথবা এয়ার ইনজেক্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তারই নাম বাতাসা। লর্ড বিষ্ণু, ইনচার্জ অফ মেইনটিন্যান্স-এর স্পেশাল ফেভারিট এই বাতাসা। খুব পেট ঠাণ্ডা রাখে।"

বললুম, "বছর তিরিশেক আগে এদেশে এলে ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারতেন বাতাসা ম্যানুফ্যাকচার করে। গভীর দুঃখের ব্যাপার, এখন সারা দেশটাই মাংস এবং মিষ্টি ছেড়ে দিতে চায়। এই রেটে খাবারে অনীহা হলে গোটা আমেরিকান জাতটাই না শেষ পর্যন্ত বিবাগী হয়ে বনে চলে যায়, মিছরিদা।"

"রাখ ওসব বাজে কথা। স্রেফ বাতাসা দেখতে আমার ভাইয়ের বাড়িতে কত সায়েব-মেম আসছে। ভাইঝি একটা জবরদস্ত নাম দিয়েছে—ক্যান্ডিয়ানা! ওটা বুঝলি তো? ক্যান্ডি প্লাস ইন্ডিয়া প্লাস আনা অর্থাৎ ইন্ডিয়া থেকে আনা মিষ্টি!"

একটা ব্যাপারে মনটা খচখচ করছিল। বললাম, "মিছরিদা, শ্মশানের কোনো জিনিস ব্যবহার করলে অমঙ্গল হতে পারে। আপনি ওই চাবির রিংটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেন না!"

মিছরিদা হাসলেন। "তুই ভাবছিস বিদেশে দৈবের বশে যদি কিছু অঘটন ঘটে

যায়! কিন্তু শুনে রাখ, এখানে মরা খুব শক্ত! সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান আহরণ করে, শত শত যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তাররা এখানে যমকে প্রায় লে-অফ করে রেখেছে। আমাদের কালী কুণ্ডু লেনের ডাঃ তপন সরকারেরও তো বেশ নামডাক। যমের যত তেজ ইন্ডিয়াতেই—এখানে উনি মাথা নিচু করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন, আর বুড়োরা টপাটপ ষাট, সত্তর, আশি এমনকি নব্বুই পেরিয়ে কেন সেঞ্চুরি করবে না তার এক্সপ্লানেশন চাইছে ডাক্তারের কাছে।"

মিছরিদা বললেন, "অনেক কাঠ-খড় না পুড়োলে এখানে মরা সম্ভব নয়। দেহটাকে এরা মোটরগাড়ির মতন করে ফেলেছে—সব রকম স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়, যেটা অকেজো সেটা পাল্টে দিয়ে তোমাকে চাঙ্গা করে তুলবে। তোমার পকেটে যতক্ষণ পয়সা আছে ততক্ষণ যমও তোমাকে খাতির করে চলবে, কাছে ঘেসবে না!"

মিছরিদা বললেন, "বড্ড ভাল লাগলো, এখানকার ডাক্তারবাবুরা রোগীদের ভীষণ ভয় করেন। পান থেকে চুন খসেছে তা লাখ-লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে রোগীকে। ডাক্তারি ডকে উঠবে এক মামলায়!"

মিছরিদা : "আমি তো নিজের চোখে নিউ ইয়র্ক হাসপাতাল দেখে এলাম। তাজ্জব ব্যাপার। তুই ওইসব ডিজনিল্যান্ড বা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন-ফ্যানিয়ন না দেখে এক-আধটা হাসপাতাল ভিজিট করে যা, মানব জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। মানুষকে এরা কতটা মূল্যবান মনে করে তার প্রমাণ হাতে-নাতে পেয়ে যাবি। তোরা তো কবিতা লিখে, গান গেয়ে, মানুষই সবার ওপরে ইত্যাদি বুলি কপচে জাতীয় কর্তব্য শেষ করলি। আমাদের চোখের সামনে এই ক'বছরে দেশের হাসপাতালগুলো কেন কসাইখানার অধম হয়ে গেলো সে-বিষয়ে সাহিত্যিকমাথা ঘামালি না। ইন্ডিয়া যতই অধঃপতনে যাক পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যেখানে মানুষের চিকিৎসা উচ্চতম সাধনার পর্যায়ে উঠে গিয়েছে তার রিপোর্ট এবার তুই দে, আমাদের দেশের মানুষ অন্তত জানুক।"

আমি চুপ করে রইলাম। বড় দুর্বলস্থানে আঘাত করেছেন মিছরিদা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের আত্মীয় শৈলেন তখন দেশের এক হাসপাতালের ডাক্তার, এক রাতে এগারোখানা ডেথ সার্টিফিকেট দিলো—মর্গে পর্যন্ত মাথাগোঁজার জায়গা নেই। কিন্তু এ নিয়ে কর্তাব্যক্তি কারও মাথাব্যথা নেই। সেই শৈলেন মনের দুঃখে দেশত্যাগী হয়ে এদেশে এসে চমৎকার কাজ করছে। হাসপাতালে প্রচণ্ড সুনাম হয়েছে।"

আমি জানি, ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতই এক নম্বর হই, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে বাঙালিরা বোধহয় দুনিয়ার নিকৃষ্ট। আমাদের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের যে কোনো হাসপাতাল বলে দেবে কি করে

যৌথ দায়িত্ব পালন করতে হয় তা আমরা জানি না। যেখানেই মিলি-মিশি করি কাজ-এর প্রয়োজন সেখানেই আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি। এবং সবচেয়ে যা লজ্জার, অবস্থা ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ পরিচালনা-বিজ্ঞান ব্যাপারটি আমাদের কাছে নিষিদ্ধ মাংসবৎ। আমাদের অধ্যাপক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অপদার্থ, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিতে নমস্য কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাগৈতিহাসিক, আমাদের ডাক্তারবাবু চিকিৎসাবিদ্যায় কৃতী কিন্তু হাসপাতাল পরিচালনায় অক্ষম। অথচ এই বেড়ালই যে বনে গিয়ে বন-বেড়াল হয় তা পূর্বে বলেছি।

মিছরিদা ও আমি ম্যানহাটানের এক চাইনিজ দোকানে ঢুকেছি কিছু খাবার জন্যে। মিছরিদা বললেন, "দ্বারিক অথবা নকুড় এখানে একটা সেলস্ কাউন্টার করলে পারতো—টু পাইস বাড়তি রোজগার হতো স্বচ্ছন্দে!"

এবার মিছরিদা বকুনি লাগালেন, "তুই তা হলে অ্যাদ্দিন এখানে করলি কি? একটা চিকিৎসাকেন্দ্র পর্যন্ত দেখলি না!"

আমি বললাম, "দেখেছি মিছরিদা। আমেরিকার গর্ব ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক। আমি ওখানকার এক নামকরা গবেষকের সঙ্গে ঘুরে দেখে নিয়েছি। দেখলে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা।"

মিছরিদার ভবিষ্যদ্বাণী, "বহু মানুষের তপস্যায় চিকিৎসাবিজ্ঞান এদেশে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত এরা হয়তো ভীষ্মের মতন ইচ্ছামৃত্যুর আশীর্বাদ লাভ করবে। এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যমদেব ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড অফিস ইন্ডিয়ায় সরিয়ে নিয়েছেন।

ফ্রায়েড রাইস ও আমেরিকান চপসুয়ে ভোজন করতে-করতে আমি ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক পর্যটনের কথা স্মরণ করতে লাগলাম।

এক বয়োজ্যেষ্ঠ বাঙালি অধ্যাপক তাঁর যথাসর্বস্ব বেচে দিয়ে একমাত্র সন্তানের চিকিৎসার জন্যে তখন ক্লিভল্যান্ডেই রয়েছেন। একজন বললেন, "ভদ্রলোক বাড়াবাড়ি করছেন, দেশে কি আর চিকিৎসা হয় না?" আর ভাগ্যহীন সেই পিতার কাতরোক্তি, "আমার একমাত্র সন্তান। সব জেনেশুনে কি করে হাতগুটিয়ে বসে থাকি? একবার শেষ চেষ্টা করার জন্যে যথাসর্বস্ব বেচে দিয়ে এদেশে এসেছি।"

আর একজন দুঃখ করলেন, "প্রতি বছর বেশ কয়েকজন ভারতীয় এইভাবে বহু বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করে এখানে চলে আসেন চিকিৎসার জন্যে। সেই টাকাগুলো একত্র করলেই তো কয়েকটা ভাল চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যেতো। ইন্ডিয়ার ডাক্তার তো এই হাসপাতালেও কাজ করছেন।"

আমি লজ্জায় যা বলতে পারলাম না, সমস্যাটা অর্থের নয়, সমস্যাটা ম্যানেজমেন্টের। আমরা যৌথভাবে কিছু পরিচালনার বিদ্যাটা আয়ত্ত করতে আগ্রহী নই।

জীবন, মৃত্যু, শরীর ও চিকিৎসার কথা যখন উঠলোই তখন একবার ক্লিভল্যান্ড ওহায়োতে ফিরে যাওয়া যাক—যেখান থেকে আমার মার্কিন মহাদেশে পরিক্রমা শুরু হয়েছিল।

প্রথমেই এসে পড়ে প্রখ্যাত পাকড়াশী দম্পতির কথা। স্বামী ব্রজেশ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, যাঁর কার্ডিওলজি ক্লিনিকে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে রোগীর আগমন হয়। কৃত্রিম হার্টভালভ আবিষ্কারের ব্যাপারেও তাঁর বোধহয় কিছু অবদান আছে। ব্রজেশ-গৃহিণী শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশী একজন বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা-গবেষক। তিনি শুধু নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কনফারেন্সের কো-চেয়ারপার্সন নন, উচ্চ রক্তচাপের বিষয়ে তাঁর কাজকর্ম পৃথিবীর ডাক্তারি মহলে নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আশুতোষ কলেজের ছাত্রী শুভা সেন কলকাতার মেয়ে। এস-এস-সি পড়াশোনা করে এক সময়ে ব্যাগে আট ডলার নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। তিনি এখন ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের লাগোয়া ক্লিভল্যান্ড ফাউন্ডেশন গবেষণা কেন্দ্রের একটি স্তম্ভ। ভবানীপুর হরিশ পার্ক থেকে ক্লিভল্যান্ড অনেক দূর—কিন্তু কলকাতায় যেসব কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও করে উঠতে পারেননি তাই ক্লিভল্যান্ডে সম্ভব হয়েছে।

শাড়িপরা শ্যামাঙ্গিনী স্নেহময়ী শুভাকে রাস্তায় দেখে আপনার মনে হবে আর-একটি মধ্যবয়সিনী বঙ্গবধূ। কিন্তু ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের গবেষণাকেন্দ্রে কোটি কোটি ডলারের বিচিত্র যন্ত্রপরিবেষ্টিতা এই মহিলার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখলে বুঝতে পারবেন কেন তাঁর এতো সম্মান। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের আয়োজন চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যৌথ প্রচেষ্টায় মানুষের কর্মদক্ষতা কোন্ পর্যায় পৌঁছতে পারে তা এইসব প্রতিষ্ঠানে না-এলে বোঝা যায় না।

কলকাতার মন্ত্রী, ডাক্তারবাবু, নার্স, ওয়ার্ডবয়, কুক, দারোয়ান সবাইকে একবার এখানে বেড়াতে নিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় আমার। নিজের চোখে তাঁরা দেখে যান দুটো চোখ, দুটো হাত আর একখানা মাথা এবং কিছুটা প্রতিভা নিয়ে যৌথভাবে এখনও লেগে পড়লে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে কোথায় পৌঁছতে পারি।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে প্রতিদিন সকালে কয়েক ডজন হার্ট সার্জারি হয়। অন্য সার্জারি শত শত। রোগীরা আসেন পৃথিবীর সব দেশ থেকে। ক্লিনিকের আর্থিক লাভ থেকে ক্লিভল্যান্ড ফাউন্ডেশনে গবেষণার কাজকর্ম চলে।

ক্লিভল্যান্ড ফাউন্ডেশনে শুভা সেনের গবেষণাগারে একটি ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। চিত্রা দামোদরণ এম-ডি করে হাইপার টেনশন সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। আমি যখন ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম চিত্রা তখন একটি ইঁদুরের ব্লাডপ্রেসার মাপতে ব্যস্ত।

হার্ট-সংক্রান্ত অপারেশনে পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা হাসপাতাল এই ক্লিভল্যান্ড। হার্টের ওপর হাইপারটেনশনের প্রতিক্রিয়া হলো শুভার গবেষণার লক্ষ্য। আরও একটি ভারতীয় মেয়েকে দেখলাম, বিজয়াস্বামী।

শুভা সেন এখানকার পড়াশোনা শেষ করে একবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু একাত্তর সালের অশান্ত কলকাতায় কিছু হলো না। বিপ্লবের নাম করে কয়েকজন কমবয়সী ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ঢুকে তাঁর বই ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দিলো। মনের দুঃখে শুভা আবার দেশত্যাগী হলেন।

ক্লিভল্যান্ড হাসপাতাল নয় তো, একটা শহর। এই হাসপাতালের বর্ণনা করতে গেলে একটা বই লিখতে হয়। এখানেই প্রথম হার্টের বাইপাস সার্জারি সফল হয়েছিল। সেই-সময় এখানে কলকাতার এক ডাক্তার ছিলেন—ডক্টর অমর সেনগুপ্ত। আমি দেশে ফিরে আসবার পরে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম।

বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের একটি প্রমাণ সাইজের জনসংযোগ বিভাগ আছে এবং ওঁদের পি. আর. ও. আমাকে যত্ন করে ভিডিও প্রোগ্রামে হাসপাতালের বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম, ইন-ডোর ছাড়াও, প্রায় পাঁচ-ছ লাখ রোগী প্রতি বছরে আউডোরের সুবিধে নেন। এঁদের চমৎকার একটি নিয়ম আছে—যে দেশ থেকে রোগী ভর্তি রয়েছেন সে-দেশের ফ্ল্যাগ ওড়ানো হবে। ফ্ল্যাগের সংখ্যা দেখলে আপনি তাজ্জব হবেন। বলা বাহুল্য ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগও উড়ছে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগের সঙ্গে।

না, যমে-মানুষের লড়াইয়ে মানুষ কিভাবে বিজয়ী হচ্ছে, তার বর্ণনা দিয়ে নিজের দেশের মানুষদের দুঃখ ও হতাশা আর বাড়াবো না। শুধু যা না বলে থাকতে পারছি না, এইসব প্রতিষ্ঠানও বিশিষ্ট ভারতীয়দের মাথায় করে রেখেছেন। নাম শুনলাম ডক্টর অতুল মেহতার, এঁর সুন্দরী স্ত্রী বাঙালি। অতুল মেহতা নাকি কলকাতায় পড়াশোনা করতেন। ভাল জিনিস যে বাঙালিরা সবসময় হাতছাড়া করে না জামাতা অতুল মেহতা তারই একটি প্রমাণ! ডঃ মেহতা কাজে ব্যস্ত, দেখা হলো না।

যাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ পেলাম তাঁর নাম ডাক্তার শারদ দেওধর, চেয়ারম্যান অফ ইমিউনো-প্যাথলজি, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক। শারদের পিতৃদেব মোটামুটি সুস্বাস্থ্য নিয়েই নিজের দেশে বসবাস করছেন। ছিয়াশির জানুয়ারিতে শারদ পুণায় এসেছিলেন পিতৃদেবের পঁচানব্বইতম জন্মজয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করতে। শারদের মাতৃদেবী কুড়ি বছর আগেই দেহরক্ষা করেছেন।

শারদ দেওধরের সঙ্গে আমেরিকার যোগসূত্র অনেকদিনের। উনিশ বছর বয়সে ১৯৫০ সালে বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে এখানে এসেছিলেন। তারপর পেনসিলভেনিয়া থেকে পি-এইচ-ডি। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১৯৬৪ থেকে। মার্কিনী তনয়া বিবাহ করেন ১৯৫৫ সালে। তিনটি সন্তান। বড় মেয়েটিকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন ধ্রুপদী নাচ শিখতে। কর্মব্যস্ত মানুষ শারদ দেওধর আমার সঙ্গে প্রায় বিনা নোটিশেই কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন। দেশ ছাড়লেও দেশের মানুষদের মায়া ছাড়া যে কঠিন ব্যাপার, তা শারদ দেওধরকে দেখে আর একবার বুঝলাম।

শারদ মানুষটি অত্যন্ত বিনয়ী। শান্তভাবে বললেন, "চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশই এমন জটিল হয়ে উঠছে যে একজন মানুষের পক্ষে সর্বজ্ঞ হয়ে থাকা এখন আর সম্ভব নয়। তাই এখন মিলিত হয়ে টিম হিসেবে প্র্যাকটিস করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। এইজন্যেই ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক এখন বিশ্বের এক তুলনাহীন প্রতিষ্ঠান। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের স্পেশালিস্টরা সুসংহত দল হিসেবে কাজ করেন। কারণ শেষ পর্যন্ত রোগীকে একটা মানুষ হিসেবেই চিকিৎসা করতে হবে।"

আকারে-ইঙ্গিতে দেওধর যা বললেন তার অর্থ হলো, এই টিমওয়ার্কের ব্যাপারটা এখনও ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে স্বীকৃতি পায়নি। আমরা ফুটবল খেলবো, ক্রিকেট খেলবো টিম হিসেবে, কিন্তু চিকিৎসা করবো একা-একা! এর ফলেই বহু প্রতিভাধর মানুষ থাকা সত্ত্বেও দেশটা চিকিৎসার ব্যাপারে শোচনীয়ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেওধর বললেন, "ভারতবর্ষে যা দরকার তা হলো চিকিৎসাক্ষেত্রে পুলিং অফ আইডিয়াজ। এর থেকেই চিকিৎসার মান ক্রমশ উন্নত হতে আরম্ভ করবে।"

দেওধর কিন্তু দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অনবহিত নন। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "মেডিক্যাল কেয়ারের মান ধরে বিচার করলে ইউ-এস-এই পৃথিবীর এক নম্বর দেশ। কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, এখানে খরচ অসম্ভব।" তফাতটা কোথায় জানতে চাইলে দেওধর বললেন, "অন্য দেশেও বড় বড় ডাক্তার আছেন বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু প্রথমে একজনের কাছে যাও, তারপরে আর একজন স্পেশালিস্টের কাছে যাও, তারপর আর একজনের কাছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুটা টেকনলজির, কিন্তু বেশিরভাগ হলো, সমস্ত বিশেষজ্ঞ একসঙ্গে

পরামর্শ করে রোগীর চিকিৎসার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। শরীরের যত রকম জটিল রোগ আছে তা একসঙ্গে নিয়ে কেউ ক্লিভল্যান্ডে আসুক, ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়ে যাবে। একটা জটিল ট্রান্সপ্ল্যান্ট অপারেশনে দরকার হলে কুড়ি জনের টিম একসঙ্গে কাজ করবে। অবশ্য তেমন একটি জটিল কেসে বারো-তেরো লাখ টাকা খরচ হতে পারে।"

আমার আর এক প্রশ্নের উত্তরে দেওধর বললেন, "চিকিৎসা গবেষণাতেও আমেরিকা এখন পৃথিবীর এক নম্বর দেশ।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানালেন, "এরপরে যদি তিনটে দেশের নাম করতে হয় তা হলো জাপান, জার্মানি ও সুইডেন।" চিকিৎসার খরচ সম্পর্কে দেওধর বললেন, "ইনসিওরেন্স আছে বলেই এই ধরনের খরচের ভার রোগীরা বইতে পারেন। যাঁরা বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করেন তাঁদেরও চলে যায়। সমস্যা হলো গরিবদের, বেকারদের—যাঁদের মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স নেই, তাঁদের। এঁদের যেতে হয় সরকার পরিচালিত কম্যুনিটি কেয়ার হাসপাতালে—যেখানে চিকিৎসার মান এখানকার মতন উন্নত নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, যতই গরিব হোক, কোনো আমেরিকানকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় না। এইসব জায়গায় যে কোয়ালিটি অফ কেয়ার পাওয়া যাবে তা তুলনায় একটু নিরেস এই যা।"

ডাক্তার দেওধর সবিনয়ে স্বীকার করলেন, "আমেরিকার ভারতীয় ডাক্তারদের যথেষ্ট সম্মান, কারুর তুলনায় ভারতীয়দের মাথা নিচু করে থাকবার প্রয়োজন নেই। যাঁরা কিছুদিন আগে এসেছেন তাঁদের অনেকেরই এখন যথেষ্ট খ্যাতি।" ইন্ডিয়ান ডাক্তার সম্পর্কে আমেরিকান কর্তাদের সাধারণ ধারণা—এঁরা পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ। সুদূর প্রাচ্যের সবার তুলনায় ইন্ডিয়ান গ্র্যাজুয়েটরা তাই একটু প্রিমিয়মে রয়েছেন।

দেওধরের বয়স ছাপ্পান্ন। দেশ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। শান্তভাবে বললেন, "যখন এখানে এসেছিলাম তখন ভেবেছিলাম চার বছর পরেই ফিরে যাবো। কিন্তু পাকচক্রে ফেরা হল না, ছত্রিশ বছর রয়ে গেলাম। বাবা একটু কষ্ট পেলেন, এই যা। তিনি একবার এখানে এসেছিলেন পঁচাশি বছর বয়সে, ১৯৭৫ সালে। আমি দূরে আছি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সাফল্য আমাকে আনন্দ দেয়, ভারতবর্ষের কষ্ট আমাকে এখনও কষ্ট দেয়।"

দেওধরের টেলিফোন বেজে উঠলো। কিডনি গ্রাফটিং-এর একটা অপারেশনের টিম কনফারেন্স এখনই শুরু হবে, আমাকে শুভা সেন পাকড়াশীর হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তার শারদ দেওধর বিদায় নিলেন।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে গেলে মনে হয় না হাসপাতালে এসেছি। যেন ফাইভস্টার

কোনো আনন্দলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানকার হালচাল দেখে অনেক রোগ নিজেই ভয় পেয়ে দেহ ছেড়ে পালাবে!

শুভা সেন জানতে চাইলেন, "অপারেশন দেখবেন? রোগীর আত্মীয়দের অপারেশন দেখাবার জন্যে টিভিতে বিশেষ ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললাম, "ওসবের মধ্যে আমি একদম নেই। চিরকাল এসপ্লানেড থেকে ট্রামে কলেজ স্ট্রীট যাবার সময় আমি 'মাটিয়া কলেজের' সামনে মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে থেকেছি।"

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের নানা বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই। মানুষের এইটুকু শরীরের তদারকির জন্যে কতরকম যন্ত্রপাতি যে বেরিয়েছে তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। নিজের দেশের হাসপাতালে তো একটা ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্রপাতি ঠিক থাকে না, আর এখানে এতো কলকব্জা এরা সামাল দেয় কি করে!

শুভা বললেন, "এ আর কি? এখানে রয়েছে বৃহৎ এক আণবিক বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিন। আণবিক বিদ্যা শুধু বোমা মারবার জন্যেই ব্যবহৃত হয় না, ডাক্তারিতেও তার নিত্য ব্যবহার।"

"ওসব আমাকে দেখাবেন না, ডক্টর সেন পাকড়াশী। আমরা ভারতীয়রা হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর স্টেথিসকোপটা ঠিক থাকলেই বর্তে যাই।"

"কী বলছেন শংকরবাবু? এখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের যন্ত্রপাতি যিনি সামাল দিচ্ছেন তিনি তো আমাদেরই লোক। নিউক্লিয়ার মেডিসিন না দেখুন, অন্তত একজন বিখ্যাত বাঙালি দেখে যান!"

গোপালবন্ধু সাহা ওপার বাংলার মানুষ। জন্ম ও আই-এসসি পর্যন্ত পড়াশোনা চট্টগ্রামে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা থেকে বি-এসসি এবং পরের বছরে এস-এসসি। তারপর ফেলোশিপ নিয়ে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওখান থেকেই পি-এইচ-ডি। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত গোপালবন্ধুবাবু আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। পরের তিন বছর পুরো প্রফেসর। এরপর নিউ মেক্সিকোতে, মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসর ডিরেক্টর খুব অল্পবয়সে। ১৯৮৪-তে চলে এলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক ফাউন্ডেশনে।

শুভা সেন চুপি চুপি বললেন, "মেয়ে এবং গিন্নির চাপে পড়েই নিউমেক্সিকো ছাড়লেন গোপালবন্ধু সাহা। ওখানে কাছাকাছি কোনো বাঙালি পরিবার নেই। মেয়ে বাংলা গান গাইবার জন্যে পাগল। কিন্তু ওখানে বাবা এবং মা ছাড়া কে বাংলা শুনবে?"

কোটি কোটি টাকার জটিল যন্ত্রের সাহায্যে গোপালবন্ধু সাহার গবেষণার

বিষয় শুনে আমার মতন আনাড়ি বঙ্গসন্তানের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করলো। রিঅ্যাকটর ও সাইক্লোট্রন প্রোডাকটর ও সাইক্লোট্রন প্রোডাকশন অফ রেডিও নিউক্লাইডিস থেকে শুরু করে, হাই-পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি এবং নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং ইত্যাদি কত সব বিচিত্র শব্দ, যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি জানি না।

গোপালবন্ধুবাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। এমনভাবে বসে থাকে যেন মফস্বলের সরকারী হাসপাতালের ভাঙা স্টেথোসকোপ এল-এম-এফ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর কোনো তফাতই নেই।

আমি বললাম, "আমার মাথা ঠিক থাকছে না সাহামশাই। এতোসব যন্ত্রপাতি, কিন্তু খারাপ হয় না কেন? আপনার ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র ঠিক রাখেন কি করে? আমাদের দেশে নাড়ি-টেপা ডাক্তাররাই তো এখনও ধন্বন্তরী, উইদাউট এনি যন্ত্রপাতি শ খানেক টাকা ফি-এর চেম্বার অষ্টপ্রহর বোঝাই রেখেছেন।"

গোপালবন্ধু সাহা আশা দিলেন, "হয়ে যাবে। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। যে-দেশে রবিঠাকুর জন্মেছেন সে-দেশে কিছু আটকে থাকবে না। আমাদের শুধু ধৈর্য ধরে মানুষকে কলকব্জার ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ শেখাতে হবে।"

আমি বললাম, "সায়েবদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো না। যন্ত্রপাতি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে ওদের জন্মগত অধিকার।"

স্বভাববিনয়ী গোপালবন্ধুবাবু চুপ করে রইলেন। কিন্তু সুরসিকা শুভা সেন পাকড়াশী বললেন, "কি বলছেন শংকরবাবু? আপনি কি জানেন, আমেরিকান সাহেব-ডাক্তাররা মেডিক্যাল কলেজে কার বই পড়ে নিউক্লিয়ার ফার্মাসি শিখছে? বইটার নাম হচ্ছে : ফান্ডামেন্টাল্‌স্ অফ নিউক্লিয়ার ফার্মাসি। লেখক চাটগাঁইয়া, নাম গোপালবন্ধু সাহা। আর আপনি ধরে নিচ্ছেন, বাঙালিরা কখনই যন্ত্রপাতি ঠিক রাখতে পারবে না!"

গোপালবন্ধু লজ্জা পেলেন। তারপর বললেন, "চিন্তা করবেন না। তেড়ে-ফুঁড়ে লাগলে সব হবে, হতে বাধ্য। অচল গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে একটু স্টার্ট দিয়ে দেওয়া, তারপর দেখবেন গাড়ি ছুটছে।" গোপালবন্ধু এবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নিউ ইয়র্কে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বসে মিছরিদা মন দিয়ে আমার ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক পরিক্রমা সংবাদ শুনলেন। আমি কিছুটা হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের দেশের গাড়ি সত্যিই কি কখনও স্টার্ট নেবে, মিছরিদা?"

আমার দিকে একটা মুখশুদ্ধি বটিকা এগিয়ে দিয়ে মিছরিদা বললেন, "সময়ের

সঙ্গে তাল রেখে এগোবার মনোবৃত্তি ছিল না বলেই আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র একদিন মরে গিয়েছিল। আমাদের ডাক্তারিরও সেই অবস্থা হতে চলেছে—নাড়ি টিপে বড়ি বেচার দিন শেষ। মিলেমিশে হাসপাতাল চালানোর বিদ্যেটা ইন্ডিয়াতেই শুরু হয়েছিল—পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল এই ইন্ডিয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের স্রোতে এবং উদ্যমের অভাবে আমরা লাস্ট বয় হয়ে গেলাম। শারদ দেওধর তোকে খুব দামী কথা বলেছে—সায়েবরা টিমওয়ার্কের রাজা। আমরা যেদিন টিমওয়ার্ক শুরু করবো মন দিয়ে, সেদিন দেখবি এখানকার সায়েবরাই ছুটবে কলকাতার মাটিয়া কলেজে চিকিৎসা করাতে।"

"সেদিন কবে গো কবে?" আমি মিছরিদার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

কোন্ এক পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। নিউ ইয়র্কের রাস্তা ধরে সান্ধ্য পরিক্রমায় বেরিয়ে আমার মনে হলো বাঙালির মতন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে কম সচেতন জাত বোধহয় পৃথিবীতে নেই। নিজের শক্তি সম্পর্কে অতিমাত্রায় অবহিত হলে যেমন জাতিগত ঔদ্ধত্য গড়ে ওঠে (যার অবশ্যম্ভাবী ফল পতন) তেমন আত্মবিশ্বাসহীন মনুষ্যকুলেরও অবক্ষয় অনিবার্য।

এক প্রচণ্ড অ্যাডভেঞ্চারাস জাতের কপালে কেমন করে কূপমণ্ডুক শিরোপা জুটলো তা সামাজিক ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। ম্যানহাটানের পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে মিছরিদা বললেন, "ব্যাপারটা খুব সহজ। দোষটা তোদের, হতভাগা বাঙালি রাইটারদের। প্যানপ্যানে প্রেমের পানসে গপ্পো লিখেই সারা জীবন তোরা নিজেদের ব্যস্ত রাখলি, দুঃসাহসী বেপরোয়া বাঙালির বিজয়পর্বটা তোরা খোঁজখবর করে বইতে জড়ো করলি না। কিছু মনে করিস না, বাঙালি লেখকদের সমাজচেতনা বড্ড কম। ইতিহাস তোদের লেখায় ঠিকে-ঝিয়ের মতন মাথা নিচু করে বাসন-মেজে যায়—জাতটা তাই প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারে না।

"তবু তো বাঙালিকে দাম্ভিক এই অপবাদ সহ্য করতে হয়," আমি মিছরিদাকে মনে করিয়ে দিই।

"যেসব জাত হেরে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, দিশেহারা হয়ে পড়ছে দাম্ভিকতার অম্লরস তাদের পক্ষে প্রয়োজন। তোরা গুজব ছড়াচ্ছিস, বাঙালির যা কিছু তা ওই গোল্ডেন এজ নাইনটিনথ সেঞ্চুরিতে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অচেনা-অজানা বাঙালি এই টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতে যা সব কাণ্ড করেছে তার পুরো ইতিবৃত্ত জোগাড় হলে আমাদের শিরদাঁড়া এইভাবে লাউডগার মতন নুইয়ে নরম হয়ে পড়তো না।"

"মিছরিদা, আপনি বাঙালি ডাক্তার আর বাঙালি খালাসীর কথা লিখতে বলছেন আমাদের?"

"কেন নয়? এরাই তো সেই আদ্যিকাল থেকে দুনিয়াটাকে বুড়ো আঙুলের কাছে এনে ফেলেছে। পানামা, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া, ইউ-এস-এ, কানাডা, বাহামা—দুনিয়ার কোথায় তুই বাঙালি ডাক্তার অথবা জাহাজ পালানো খালাসি দেখবি না? এরা তো ইউরোপীয় সাহেবদের মতনই বিশ্ববিজয় করেছে, কিন্তু আমরা কোনো স্বীকৃতি দিইনি। দিলে লাভ হতো। আমাদের ছেলেগুলো হাফ-হিজড়ের মনোবৃত্তি ত্যাগ করে পুরুষসিংহের মতন গর্জন করতো। দুনিয়ার লোক আমাদের একটু সমীহ করে চলতো, কথায়-কথায় মাথায় চাঁটি মারবার আগে একটু ভেবে-চিন্তে দেখতো।"

হঠাৎ মিছরিদা থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি নিউ ইয়র্ক রাজপথের একটি সাইনবোর্ডে নিবদ্ধ। দর্শনের নিষ্ঠা দেখে মনে হচ্ছে মিছরিদা লাইফে প্রথম তাজমহল দেখছেন। মিছরিদা বিড়বিড় করলেন, "দ্যাখ, দ্যাখ, দ্যাখ! সাইট ফর দ্য গড্স। কলকাতায় বাংলা সাইনবোর্ড নির্বংশ হতে চলেছে, আর এখানে বঙ্গ সন্তানরা কী করছে একবার পরান ভরে দেখে নে! সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

সত্যিই দেখার জিনিস। বাংলা ভাষায় নিউ ইয়র্কের দোকানের মাথায় জ্বল জ্বল করছে, "কৈ মাছ ও পাবদা আছে।"

মিছরিদা চোখটা একটু মুছে নিলেন, বোধহয় নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

"কী দেখছেন দাদা?" আমাদের দুজনকে বাংলায় কথাবার্তা বলতে শুনে আর এক বঙ্গসন্তান ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

"আমাদের কলকাতায় বাংলায় সাইনবোর্ড উঠে গিয়েছে, তাই ভাই প্রাণভরে দেখছি, কিছু মনে করবেন না।"

এই ভদ্রলোক বাংলাদেশি মুসলমান। বললেন "আর একটু এগিয়ে যান। ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ও সেকেণ্ড অ্যাভিনিউয়ের মধ্যে সিক্সথ স্ট্রীটে পুরো রাস্তা ধরে অন্তত বারোখানা বাঙালি দোকান দেখতে পাবেন। সবই শিলেটি, যদিও লেখা

আছে ইন্ডিয়ান ফুড।”

“আহা কী সব নাম!” মিছরিদার চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসে আর কী। “শা বাগ, আনার বাগ, মিতালী, শ্যামলী, মিনার, মিলনী, এটসেটেরা, এটসেটেরা।”

আমাদের নতুন বন্ধু বললেন, “আপনার উচিত মুনীর আমেদের সঙ্গে দেখা করা —একটা পুরো রেস্তোরাঁ-চেনের প্রতিষ্ঠাতা।”

“আহা! প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি!” মিছরিদা নিজের অনুভূতি চেপে রাখতে পারলেন না। খুব দুঃখ হলো, কী কুক্ষণে আমরা দামী ডলারগুলো চীনের দোকানে দিয়ে এলুম আমাদের জাতভাই থাকতে। পুঁইশাক দিয়ে দুটো ভাত মেখে খাওয়া যেতো।”

পথের বন্ধু বললেন, “দূর দেশ থেকে এসে নিউ ইয়র্ক শহরে রেস্তোরাঁ চালানো সোজা কাজ নয়। অনেক হাঙ্গামা। মাফিয়াদের হাত না করলে রেস্তোরাঁ দুদিনেই ডকে উঠবে। তবে জেনে রাখুন, এমন বাঙালি এখানে আছেন, মাফিয়ারা যাকে ভয় করে চলে।”

“বলেন কি মশাই? দু' একজনকে রি-এক্সপোর্ট করুন না আমাদের কলকাতায়!” মিছরিদা আন্তরিক আবেদন জানালেন।

বন্ধু বললেন, “থেকে যান সপ্তাহখানেক, একখানা নভেলের মেটিরিয়াল পেয়ে যাবেন। সেক্স, ভালোলেন্স, এফ-বি-আই, ব্ল্যাকমেলিং সব কড়া ডোজে পেয়ে যাবেন এক একখানা দোকানকে কেন্দ্র করে।”

মিছরিদা বললেন, “আমার এই বন্ধু ক্যালকাটার রাইটার—ওঁরা প্যানপেনে প্রেম ছাড়া লেখায় কিছুই সামলাতে পারেন না! আমাদের খোঁজ করতে হবে অ্যাডভেঞ্চার রাইটারদের। তা গপ্পোটার আউটলাইন কী রকম হতে পারে? আমার ভাইঝিগুলো বড় না হয়ে উঠলে আমি নিজেই ট্রাই নিতাম।”

বাংলাদেশি বন্ধু বললেন, ‘ধরুন, এমন একটা ক্যারাকটার করলেন যে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ইস্কুলে পড়তে এসে সুবিধে করতে পারলো না।”

“প্রথমেই ফেলিওর দিয়ে শুরু করতে বলছেন? অবশ্য সব ব্যাপারে ফেলিওর হবার জন্যেই তো বাঙালিদের সৃষ্টি।”

বাংলাদেশিটি সুরসিক। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “সাফল্যের ছাদকে ধরে রাখবার জন্যে অনেক ব্যর্থতার থাম দরকার হয়, দাদা।”

“অকাট্য যুক্তি! বলে যান ভাই,” মিছরিদা গ্রীন সিগন্যাল দিলেন।

খুশি হয়ে বাংলাদেশি বললেন, “ফরিদপুর কিংবা বরিশাল থেকে আপনি হাজির হলেন নিউ ইয়র্কে। শুরু করলেন রেস্তোরাঁ-বয়ের জীবন। একটু চান্স পেয়ে একখানা দোকানের অংশীদার হলেন—গা-গতর আমার, সম্পত্তি

তোমার। এদেশে সম্পত্তির অভাব নেই, টানাটানি গা-গতরের। গতরের ময়দায় যদি একটু মগজের ময়ান মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই।"

"চমৎকার বলেছেন ভাই," উৎসাহ পাচ্ছেন মিছরিদা।

বাংলাদেশি বললেন, "মনে করুন আপনার খাবারের দোকান তেমন চলছে না। বড্ড ছটফটে জাত এই আমেরিকান। ওদের নজর টানা বড্ড কঠিন কাজ। চীনারা একসময় নজর টেনেছিল। এখন ইন্ডিয়ানদের জয়জয়কার, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে এই বাংলাদেশি প্রেম। দোকানে লোক টানবার জন্যে এই ইস্কুল পালানো ছোকরা এক কাণ্ড করে বসলো—দেশ থেকে একখানা সাইকেল-রিকশ এনে হাজির করলো কিউরিও হিসেবে এবং এই রিকশটাই সাজিয়ে রাখলো প্রধান আকর্ষণ হিসেবে। হাতে হাতে ফল। এই রিকশ দেখবার জন্যে সমস্ত নিউ ইয়র্ক ভেঙে পড়তে লাগলো তার দোকানে।"

"এ জানলে খান দশেক সাইকেল-রিকশ ভাঙা অবস্থায় এনে এখানে জুড়ে নিতাম। এতে হাওড়ার ট্রাফিক জ্যামও একটু কমতো আর এখানেও টু-পাইস কমানো যেতো।" মিছরিদার আক্ষেপ।

"এখন আর কাজ হবে না। যা কিছু ভাল ফল হয় তা প্রথম বারে। যে ফার্স্ট করতে পারবে সে মালা পাবে। তারপর কেউ তাকিয়ে দেখবে না, এই হচ্ছে এদেশের চরিত্র। দ্বিতীয়র কোন সম্মান নেই এখানে, তাই সবাই প্রথম হবার নেশায় মেতে আছে।"

"তা রিকশ থেকে শেষ পর্যন্ত রোলস রয়েস হলো?" জানতে চাইলেন মিছরিদা।

সুরসিক বাংলাদেশি বললেন, "পয়সা হতে বাধ্য। এবং সেই পয়সায় বেঙ্গলী বুটিক চালু হলো, শুরু হলো ডিসকোথেক।"

"বোঝা যাচ্ছে, বিদেশে বাঙ্গালি ব্যর্থ হয় না," মিছরিদার মন্তব্য।

বাংলাদেশি বললেন, "এর পরেই তো জমে উঠবে শংকরবাবুর গপ্পোটা। মাফিয়াদের সঙ্গে মিশছে এক বঙ্গসন্তান। এবং তারপর হঠাৎ একদিন..."

"বেচারা বঙ্গসন্তান খুন হয়ে গেলো, এই তো," আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। এইসব গল্পের শেষটা আন্দাজ করতে আমার একটুও কষ্ট হয় না।

"থাম থাম," বকুনি লাগালেন মিছরিদা। "তোদের কলকাতার গল্পে ওরকম হতে বাধ্য কারণ তোরা হেরো-হেরো ডাক তুলেই সমস্ত জাতটাকে সত্যিই হারিয়ে দিলি। প্লিজ, ওই সোনারচাঁদ বাঙালিটা যদি এখানে খুন হয়েও থাকে তা এই ছোকরাকে বলবেন না। সমস্ত জাতটাকে আর একবার কাঁদিয়ে সাহিত্যিকের কেরামতি দেখাবে, কিন্তু জাতের কোনো কাজে লাগবে না।"

বাংলাদেশি বললেন, "এর পরেই তো নাটক। মাফিয়ার বোনের সঙ্গে আমাদের ভাইয়ের ভাব-ভালবাসা হলো। তারপর মাফিয়ার বোন একদিন সিভিল ম্যারেজ করে বসলো আমাদের ভাইয়াকে। বললে খুনোখুনি লুটোপাটিতে অরুচি হয়ে গিয়েছে, এখন আমি স্বামীর হাত ধরে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাই।"

খুব খুশি হচ্ছেন মিছরিদা। নির্দেশ দিলেন, "মাফিয়ার মেয়েগুলোর শরীরস্বাস্থ্য কেমন হয়, জামাকাপড় কেমন পরে এসব ডিটেল তুই ভাল করে শুনে নে, দেশে গিয়ে তোকে এই বিষয়েই লিখতে হবে। প্রত্যেক মাফিয়াকে এখন থেকে প্রত্যেক বাঙালি 'শালা' বলতে পারে, অথচ তাতে কোনো অন্যায় হবে না।"

বাংলাদেশির মুখে জানা গেলো, বিয়ের পরেই অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। এফ-বি-আই নাকি জামাইবাবুর সঙ্গে যোগসাজশ রেখেছিলেন। এই এক মজা এই দেশে। যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই পুলিশের ইনর্ফমারের খবর পাওয়া যায়। দুষ্টজনেরা সন্দেহ করেন, প্রায় প্রত্যেক অসামাজিক ব্যক্তিই পুলিশের টাকা খাচ্ছে।

মাফিয়ারা নাকি বাংলা-মার্কিন বিবাহ সম্পর্কে খুশি হয়নি। তারা একদিন আচমকা হাজির হয়ে জামাইয়ের দোকান ভাঙচুর করলো।

"এর পরেই খুনের অধ্যায়টা তো?" আমি আন্দাজ করতে পারি সহজেই।

কিন্তু বাংলাদেশি ভদ্রলোক আমাকে আবার নিরাশ করলেন। করিৎকর্মা না হলে এরপরেই খুন হতেন ভদ্রলোক। কিন্তু কৌশল জানলে এদেশে কোনো চিন্তা নেই। বাংলাদেশি জামাইবাবু এবার সোজা খবরের কাগজের শরণাপন্ন হলেন। বড় বড় হেডলাইনে বিখ্যাত সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হলো, মাফিয়ারা একজন বাংলাদেশিকে খুন করতে চায়। যাকে বলে কিনা একেবারে আমেরিকান টাইপের পাবলিক রিলেশনস। সেই সঙ্গে একটু-আধটু দিশি মশালা—দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশের মিলিটারি সিক্রেট চুরির প্রচেষ্টার সঙ্গে এর কি কোনও যোগ আছে? ইত্যাদি।

কাগজে কোনো রিপোর্ট বেরুলে এখানে কর্তাদের টনক নড়ে। ফলে জামাইবাবু প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পেলেন, তিনি এখন ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছেন। অর্থাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ সাফল্যকাহিনী।

বাংলাদেশি বন্ধু বললেন, "গল্পটা যদি আরও নাটকীয় করতে চান, আর একটা ক্যারাকটার পাশাপাশি নিয়ে আসুন। নিঃসঙ্গ মুসলিম বঙ্গসুন্দরী এখানকার অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করেন। স্বদেশের কোনো এক মহাশক্তিমান রাজপুরুষ তাকে গোপনে বিবাহ করে ঝামেলা কমাবার জন্যে মোটা খরচে নির্বাসিতার

জীবনযাপনে বাধ্য করেছেন। এই মহিলা এখন গোপন বিবাহের সংবাদটি ফাঁস করে সতীনের দেমাক কমাতে চান। দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।"

মিছরিদা গুজগুজ করে এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর ঘোষণা করলেন, "মিছে রবিঠাকুর আমাদের কলকাতায় জন্মেছিলেন! তোরা সাহিত্যিকরা দুটো রেস্তোরাঁর ভাল নামও দিতে পারিস না। কলকাতার সব রেস্তোরাঁর নাম বিদেশ থেকে চুরি করা। আর যত চমৎকার অরিজিন্যাল নাম এই নিউ ইয়র্কে। লিখে নে একটা রেস্তোরাঁর নাম, যত শুনছি তত প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে—নির্বাণ অন্ রুফটপ'! আহা! নামটা কয়েকবার আবৃত্তি করলেই নির্বাণত্বের দিকে মন টানবে। শুনছি একই স্টাইলে রয়েছে—নিরভানা অন্ টাইম স্কোয়ার', 'নিরবলি অন সেন্ট্রাল পার্ক'। এই স্টাইলের নাম হলে তোকে দোকানের ঠিকানা মনে রাখতে হবে না। আমাদের ওখানে হওয়া উচিত ছিল—গাঙ্গুরাম অন গোলপার্ক, গুপ্তাজী অন গড়িয়াহাট, বিনোদ অন বি-বি-ডি বাগ, ভীমনাগ অন মহাত্মা গান্ধী রোড, ভিয়েন অন সেক্সপীয়ার সরণী, এটসেটরা এটসেটরা!"

মিছরিদার খুব ইচ্ছে ছিল মাফিয়াদের জগাইবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ভদ্রলোককে পাওয়া গেল না। মিছরিদা বললেন, "আবার যদি কখনও এ-দেশে আসবার সুযোগ পাস তা হলে ওঁকে ইন্টারভিউ করবি। দেশের লোকেরা এইসব মানুষের কথাই তোদের কাছ থেকে জানতে চায়।"

সেদিন জয় ও মলির ম্যানহাটান অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে দুঃসাহসী বাঙালিদের কথা নিজের খাতায় লিখলাম। বাঙালিরা শুধু রেস্তোরাঁ চালায় না, তারা এখন ট্যাক্সিচালক, নিউজস্ট্যান্ডের মালিক। ওষুধের দোকানেও যথেষ্ট প্রতাপ বাংলাদেশিদের। ফার্মাসি বিদ্যাটা আমাদের সহজে এসে যায়।

এক ভদ্রলোক বললেন, "কখন যে কি হয়ে যায় ঠিক বোঝা যায় না। এক ফার্মাসিতে যেতাম, সেখানে সায়েব আছেন ও সেই সঙ্গে এক বাঙালি আমার বাঙালি নাম দেখে ছোকরা যেচে এসে কথা বলতো। বিদেশে নিজের দেশের লোক দেখলে বাঙালিদের ব্রেক ফেল করে হুড়মুড় করে অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে যায়। আমি কয়েকবার গিয়েছি, সাহেবের কাছে প্রেসক্রিপসন দেওয়া সত্ত্বেও এই বাঙালি ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

গত সপ্তাহে আবার দোকানে গেলাম। দেখি সায়েব নেই, ওই বাঙালি ছোকরাই ঝাঁপ খুলেছে। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, সায়েব মালিক কোথায়? এখনও আসেননি কেন?

কিন্তু উত্তর শুনে আমি তো তাজ্জব! বিনীতভাবে ছোকরা আমাকে জানিয়ে দিল। দোকানের মালিক সে নিজেই। সায়েবকে সে চাকরিতে রেখেছে মাইনে দিয়ে। সায়েব ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছিল তাই এবার বিদায় করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন মুলুকে বাঙালির নিজস্ব অ্যাডভেঞ্চার করে শুরু হয়েছিল তা ঠিকমতন খোঁজ করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে এ বিষয়ে ক্লিভল্যান্ডে আমার আশ্রয়দাতা ডক্টর রণজিৎ দত্তর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। চিরকুমার রণজিৎবাবু পেশায় বৈজ্ঞানিক, কিন্তু নেশায় ঐতিহাসিক। ওঁর সংগ্রহে মহেঞ্জোদরোর একটি মৃৎপ্রদীপ আছে।

রণজিৎবাবু এবারের নর্থ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলন উপলক্ষে ক্লিভল্যান্ডের আদিবঙ্গীয় সমাজ সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর করেছেন। ১৮৮০ সালের আদমসুমারিতে দেখা যাচ্ছে ওই শহরের এক লক্ষ ষাট হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ন'জন ভারতীয়, এঁদের মধ্যে কয়েকজন যে বাঙালি ছিলেন তা অবশ্যই ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১৯২০ সাল নাগাদ অবশ্য ১০/১২ জন বাঙালির খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে বহু বছর পরে (১৯৬০ সাল নাগাদ) কথাবার্তা বলে অনেক দুঃখের কথা জানা যায়। এই সব বাঙালি মুসলমান জাহাজ থেকে পালিয়ে এই শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুঃখ, হতাশা ও নির্জনতা ছাড়া তাঁদের জীবনে বিশেষ কিছু ছিল না। কেমন করে এদেশে এসেছেন তা এঁরা কেউ বলতে চাইতেন না, এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতেন সকলকে!

বশিক-এর কথাই ধরা যাক। এঁদের জাহাজের ইঞ্জিনে কিছু গোলোযোগ দেখা যায়। জাহাজ সারাতে-সারাতে অনেক সময় লাগলো—বরফজমা শীতে গ্রেটলেকস ততক্ষণে জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তখন খালাসিদের টাকা দেওয়া হলো নিউ ইয়র্কে যাবার জন্যে এবং সেখানে কলকাতার জাহাজ ধরা যাবে। সেই টাকা নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বশিক আমেরিকার জনসমুদ্রে মিশে গেলেন, দেশে ফেরা হলো না।

মজিদ আমেরিকায় এসেছিলেন পানামায় এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের ভরসায়। ক্লিভল্যান্ডে এসে শুনলেন, পানামা এখান থেকে অনেক দূর। খেয়ালের বশে ভদ্রলোক এখানেই থেকে গেলেন, পানামা গিয়ে ভাইকে আর খুঁজে বার করা হলো না।

এই সব দিকহারা ঘরছাড়া বাঙালি মুসলমান ইস্ট নাইনটি ফাইভ স্ট্রীটে ছোটোখাটো দোকান অথবা রেস্তোরাঁ চালাতেন এবং যথাসময়ে মেমসায়েব বিয়ে করতেন। কিন্তু মেম বিয়ে করলেও, এঁদের ধর্মীয় নিষ্ঠায় ভাঁটা পড়তো না।

নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতন এঁরা মদ স্পর্শ করতেন না, শুয়োর খেতেন না এবং নিয়মিত নামাজ পড়তেন। রোজার সময় চলতো উপবাস।

রসিদ আলির কথাই ধরুন। খিদিরপুর থেকে কত বছর বয়সে বিদেশে পালিয়ে এসেছিলেন তা নিজের স্মরণে নেই। পাকেচক্রে একদিন লেক ইরির ধারে জাহাজ ভিড়লো এবং রসিদ আলির নতুন পলাতক জীবন শুরু হলো। মুসলিম জীবনযাত্রার সঙ্গে এই সমাজের কোনও পরিচয়সূত্র ছিল না।

রসিদ আলি এখানে বিবাহ করলেন, পুত্রকন্যার জনক হলেন, কিন্তু এই সমাজের সঙ্গে নিজের ধর্মীয় আচার নিয়ে মিশে যেতে পারলেন না। তাঁর নামাজ পড়া, তাঁর মদ ও শূকর মাংসে অনীহা বিদেশী প্রিয়জনদের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে রইলো। তারপর এই ব্যঙ্গ ও অসম্মান এমন তীব্র হয়ে উঠলো যে বিয়ের পঁচিশ বছর পরে রসিদ আলি একদিন ঘরসংসার ত্যাগ করে আবার বিবাগী হলেন। বেশ কিছুদিন পরে ১৯৬০ সালে ক্লিভল্যান্ডের এক পোড়ো বাড়িতে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলো। পুলিশের মতে কয়েকদিন আগে কঠিন নিউমোনিয়ায় নিঃসঙ্গ রসিদ আলির মৃত্যু হয়েছে।

রণজিৎবাবু আরও তিনজন বাঙালি মুসলমানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেছেন। সেন্ট ক্লেয়ার-এ জব্বর-এর একটা পুরনো জিনিসের দোকান ছিল। খালেদ চালাতেন পূর্ব ক্লিভল্যান্ডে একটা মুদিখানার দোকান। ওয়েস্ত পার্কে জামালের রেস্তোরাঁ ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রম রম করতো।

আরও দুই মুসলমান ভাইয়ের খবর পেয়েছিলাম রণজিৎ দত্তর কাছে। ১৯২৭ সালে হামিদ ও গণি আব্দুল আমাদের এই হুগলি থেকে বেরিয়ে ভায়া খিদিরপুর এবং লন্ডন হয়ে এই ক্লিভল্যান্ডে হাজির হয়েছিলেন, আর ফেরেননি। এঁরা স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। হামিদ সম্পর্কে হয়তো বিশেষ কিছু লেখবার থাকতো না যদি না তিনি এক বিখ্যাত আমেরিকানের পিতা হতেন। ১৯৩৩ সালে হামিদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর ছেলে রউলের বয়স চার। রউল এখন নিউ ইয়র্ক শহরের বাসিন্দা, খ্যাতনামা কনসার্ট বাদক, গায়ক এবং সঙ্গীত সমালোচক।

দ্বিতীয় প্রজন্মের বামারিকান (বাঙলা-আমেরিকান—ডাঃ রণেশ চক্রবর্তীর ভাষায়) হিসেবে এক অসাধারণ উপন্যাসের নায়ক হতে পারেন এই রউল, যিনি নিজেকে ব্ল্যাক আমেরিকানদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন। কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের লেখক এই হুগলি-সন্তান রউল—ফেমাস ব্ল্যাক এনটারটেনার্স অফ টুডে (১৯৭৪), ব্ল্যাকস ইন ক্ল্যাসিকাল মিউজিক (১৯৭৭), কালা কবিতার তিন হাজার বছর (১৯৭০) ইত্যাদি।

রউলের কাকা গণি দেহরক্ষা করেন ১৯৬২ সালে। তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময়

মুসলিম এবং খ্রীষ্টিয় রীতি দুই-ই পালন করা হয়েছিল।

খুব ইচ্ছা ছিল রউলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। রণজিৎবাবু ক্লিভল্যান্ড থেকে নিউ ইয়র্কে ফোনও করেছিলেন। কিন্তু রউল তখন ইউরোপে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে এ-যাত্রায় দেখা করাটা আমার কপালে নেই।

কিন্তু রণজিৎ দত্ত উৎসাহ দিয়েছিলেন, "দুঃখ করবার কিছু নেই। রউল সায়েবকে না পেলেন তো কি হয়েছে? আপনাকে খোন্দকার আলমগীরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো? খোন্দকার আলমগীরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে নিউ ইয়র্কের বঙ্গীয়সমাজ সম্পর্কে আপনার কী অজানা থাকতে পারে।"

মৃদু হেসে রণজিৎবাবু বললেন, "আমি রিপিট করছি—খোন্দকার আলমগীর ইজ খোন্দকার আলমগীর।"

খোন্দকার আলমগীরের খবর না পেলে আমার এবারের বিদেশ ভ্রমণ সত্যিই অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। বিপ্লবী বাঙালি এখন মৃত আগ্নেয়গিরির মতন, এ কথা যাঁরা বলে থাকেন তাঁদের উচিত ডাক্তার আলমগীরের মতন তেজস্বী পুরুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

খোন্দকার আলমগীরের প্রসঙ্গ উঠলো ক্লিভল্যান্ডে। আমি প্রবাসী বাঙালিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করছি শুনে এক বন্ধু বললেন, "প্রবাসে বাঙালির সাফল্য যেমন আপনাকে আকৃষ্ট করছে, তেমন বিদেশে বিফল বাঙালিদেরও একটু স্থান করে দেবেন আপনার লেখায়।"

বামারিকান মানেই রোজগেরে উচ্চশিক্ষিত বাঙালি আমেরিকান মিলিয়নেয়র নয়। বামারিকান বিধবা চোখের জল ফেলে অমানুষিক পরিশ্রমে নাবালক সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলছেন, বামারিকান বৈজ্ঞানিক যোগ্য চাকরি না পেয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মোট বইছে, বামারিকান ডাক্তার প্রয়োজনীয় স্বীকৃতির অভাবে দারোয়ানের কাজ করছে, বামারিকান অভাগা বড় বড় শহরে ট্যাক্সি চালাচ্ছে বিত্তবান মানুষের এই মহাতীর্থে।"

এই বন্ধুই বলেছিলেন, "গরিব দুর্ভাগা বাঙালির প্রকৃত বন্ধু বলতে বোঝায় খোন্দকার আলমগীরের মতন মানুষদের। যেসব বাঙালির ইনসিওর নেই, সরকারী স্বীকৃতি নেই, ইমিগ্রেশন ইনসপেক্টর যাকে ধরবার জন্যে সারাক্ষণ ঘুরে

বেড়াচ্ছে, তাদের অসুখ করলে দেখাশোনা করার যে দু'একজন লোক নিউ ইয়র্কে আছেন তাঁদের মধ্যে আলমগীর কবীর একজন। মাস তিনেক ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। বাঙালি কষ্ট সইতে পারে না, বাঙালির ধৈর্য নেই ইত্যাদি যারা বলে তাদের যোগ্য উত্তর আপনি ডজনে-ডজনে খুঁজে পাবেন।"

"কে এই খোন্দকার আলমগীর?"

"এক বাঙালি ডাক্তার। অনেকদিন আমেরিকায় এসেছেন। কয়েক মিলিয়ন ডলার কামিয়ে কেষ্টবিষ্টু হয়ে মনের আনন্দে ভোগসুখে ডুবে থাকতে পারতেন, কিন্তু বুকের মধ্যে সারাক্ষণ দেশের মানুষের জন্যে ভালবাসার আগুন জ্বলছে। কোনো কষ্টকেই তোয়াক্কা করেন না।"

এই ধরনের মানুষের একটাই সমস্যা হয়। এঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারেন না। এঁরা কখন যে কোন্ ব্যাপারে বেঁকে বসবেন তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না, তাই অনেকে এঁদের একটু দূরে-দূরে রাখতে চান। সারাক্ষণ সত্যি কথা শুনবার জন্যে এই দুনিয়া তৈরি হয়নি, যাঁরা সদা-সত্যের লাইনে যাবেন তাঁদের কপালে অবশ্যই অনেক কষ্ট!

শুনলাম আলমগীর ক্লিভল্যান্ডের বঙ্গ সম্মেলনে আসবেন, সুতারং নিউ ইয়র্কের জন্যে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যাবে। এ-দেশে ডাক্তারের সময় মহামূল্যবান, যখন-তখন ডাক্তারবাবুকে চাইলেই পাওয়া যায় না, তিনি আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্টের জালে বন্দী।

নর্থ আমেরিকান বঙ্গ সম্মেলনে নানা কৃতি বাঙালি সপরিবারে এসেছেন। এঁদের স্ত্রীরাও অনেকে বিদুষী এবং বলা বাহুল্য সুন্দরী। এইসব সুবেশিনী বাঙালি রঙিন প্রজাতির মতন স্বামীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রবাস তাঁদের ব্যক্তিত্ব দিয়েছে, স্বচ্ছলতা দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস দিয়েছে আর দিয়েছে মুক্তির স্বাদ যা জন্মভূমিতে এতো সহজে এইভাবে পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না।

সম্মেলনের সভার কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই সময় মঞ্চ থেকে একটি অপূর্ব দৃশ্য আমার চোখে পড়ে গেলো। একজন বেঁটে সাইজের শ্যামবর্ণ বাঙালি কোলে করে এক শাড়ি পরিহিতা গৌরী বঙ্গতনয়াকে হলের মধ্যে নিয়ে এসে একটি চেয়ারে অতি সাবধানে বসিয়ে দিলেন। তারপর পরম স্নেহে তাঁর দেখাশোনা করতে লাগলেন। তেমন শারীরিক অসুস্থতা থাকলে সাধারণত এই ধরনের সম্মেলনে কেউ আসেন না। কিন্তু এই মহিলাটি তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোকের পক্ষচ্ছায়ায় সভার কাজকর্ম পরমানন্দে উপভোগ করতে লাগলেন। স্বদেশ ও সংস্কৃতির প্রতি এমন অনুরাগ নজরে পড়ে না বলেই হয়তো দূর থেকে আমি এই দৃশ্য মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

তারপর শুনলাম, ভদ্রমহিলাও ডাক্তার। গুরুতর অপারেশন ইত্যাদির পরে

এখনও সুস্থ নন, কিন্তু বাঙালি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। তাই সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামীর সঙ্গে মোটর গাড়িতে ওহায়ো রাজ্যের এই ক্লিভল্যান্ডে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি দূর থেকে দেখলাম, স্ত্রীকে চেয়ারে বসিয়ে অসীম ধৈর্য সহকারে ওই ভদ্রলোক আবার কাগজের কাপে ঠাণ্ডা পানীয় সংগ্রহ করে আনলেন। কাকে যেন বললেন, "আমাকে দুপুরে একটু নুন ছাড়া খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে হবে।"

আমার তখন সভার কাজকর্মের দিকে তত মন নেই, আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এই দুটি মানুষের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার এবং পুরুষ মানুষটির সস্নেহ দায়িত্ববোধের নমুনা সংগ্রহ করছি। ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্যেও বিরক্ত নন, অধৈর্য নন, এই ধরনের বোঝা থাকায় তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ বলে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন।

মানুষটি সম্বন্ধে আমার যখন গভীর শ্রদ্ধা জাগরিত হচ্ছে সেই সময়েই হলঘরের বাইরে রণজিৎ দত্ত আলাপ করিয়ে দিলেন, "এই নিন আমাদের খোন্দকার আলমগীরকে।"

"দুঃখিনী বঙ্গজননীর আদর্শ সন্তান।" এই বিশেষণ আমার মুখে শুনে লজ্জা পেলেন খোন্দকার আলমগীর। বললেন, "আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

শ্রীমতী আলমগীরও শারীরিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমি মনে-মনে ভাবলাম স্বদেশে সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞরা মেড-ফর-ইচ-আদার দম্পতি হিসেবে যেসব আমোদিনী রমণী ও তাঁদের স্বামীদের বিজ্ঞাপিত করেন সেই তুলনায় সহস্রগুণ আকর্ষণীয় এই আলমগীর-দম্পতি—কোনো অবস্থাতেই এঁরা পরস্পরকে অবহেলা করতে প্রস্তুত নন। অথচ এই ভালবাসা এসেছে প্রসন্ন প্রীতির প্রসার থেকে, কর্তব্যবোধ অথবা চক্ষুলজ্জা থেকে নয়।

আলমগীর বললেন, "বাঙালিকে জাগান, বাঙালিকে বিজয়ী হতে বলুন—আমাদের সামনে তেমন কোনো বাধা তো দেখছি না। শুধু লক্ষ্য রাখবেন আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি যেন বিপন্ন না হয়।"

আমি বললাম, "ওই সব বাংলাদেশি অভাগা, যারা আইনসম্মত পথে এদেশে ঢোকেনি, যারা লুকিয়ে-লুকিয়ে নিউ ইয়র্কে ট্যাক্সি চালায়, তাদের কথা শুনতে চাই আলমগীর সায়েব।"

"কোনো অসুবিধে নেই। থাকুন আমার সঙ্গে কয়েক মাস। চোখের সামনে দেখুন। আসুন নিউ ইয়ার্কে। এই নিন আমার ঠিকানা।"

একজন চুপি-চুপি বললেন, "আশ্চর্য মানুষ। চিকিৎসার মাধ্যমে যে কত

মানুষের উপকার করেন। নিজের শরীরও তেমন ভাল নয়। বাড়িতে স্ত্রীর এই অবস্থা। কী অসাধারণ চেষ্টা করে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের দেশ হলে এতদিন বাঁচার কথাই উঠতো না। এইসব চাপে অন্য মানুষ হলে কোথায় ভেসে যেতো। কিন্তু আলমগীর এরই মধ্যে বাঙালিদের জন্যে ভেবে চলেছেন, কাজ করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। দেশের সাহিত্যের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন। আলমগীরকে দমিয়ে রাখবার ক্ষমতা বোধ হয় ঈশ্বরেরও নেই।”

সভার শেষে দেখলাম খোন্দকার আলমগীর আবার তাঁর স্ত্রীকে বহন করে এক সভাগৃহ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অন্য এক সভাগৃহের দিকে চলেছেন। ওই অবস্থাতেও পরমানন্দে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বক বক করে চলেছেন। এই মহিলা শরীর সম্পর্কে যতই ভাগ্যহীনা হোন না কেন স্বামী সম্পর্কে পরম সৌভাগ্যবতী!

নিউ ইয়র্কে এসেই খবর পেলাম আলমগীর সায়েব আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন নিজের বাড়িতে। প্রথমে একটু দ্বিধা হচ্ছিল। এই দেশে যে কাজের লোকজন পাওয়া যায় না এবং সব কাজকর্ম যে নিজেকেই করতে হয় তা আমার অজানা নয়। এমতাবস্থায় একজন সদাশয় ভদ্রলোককে এইভাবে বিরক্ত করাটা কি সমীচীন হবে? যাঁরা আলমগীরকে চেনেন তাঁরা বললেন, “ওইসব কিন্তু-কিন্তু কাটিয়ে ওখানে হাজির হোন, উনি যখন ঠিক করেছেন আপনাকে নিজের বাড়িতে খাওয়াবেন তখন খাওয়াবেনই।”

আলমগীর সায়েবের ছবির মতন বাড়িটি একটি খালের ওপর। অঞ্চলটির নাম ফ্রি পোর্ট, খালে যখন জোয়ার আসে তখন পথঘাট জলে বোঝাই হয়ে যায়। বাড়ির পরিকল্পনা এমনই যে পিছন দরজা থেকেই আপনি নৌকাবিহারে রওনা হতে পারেন। ভদ্রলোকের ইয়াটিং বাতিক আছে কিনা তা অবশ্য জানা হলো না। ধরুন জায়গাটা হলো নিউ ইয়র্কের ভেনিস!

আলমগীর সায়েবের বাড়িতে আর একটি যুবককে দেখলাম। আতিথ্যকর্মে সাহায্য করার জন্যেই এই যুবকটিকে তিনি আজ নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা পৌঁছবার পরেই নিকটবর্তী এক চাইনীজ দোকানে আলমগীর ফোন করে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই যুবকটিকে ওই খাদ্য সংগ্রহে পাঠালেন। নিজেও কয়েকটি পদ রান্না করে রেখেছেন। এমন ভাব দেখালেন যেন এতো সব যন্ত্রপাতি রয়েছে যে রান্নাটা এখানে কিছুই নয়।

শ্রীমতী আলমগীরও আমাদের আড্ডাসভায় অতীব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। মনে হলো, এঁদের যাকে বলে ‘লাভম্যারেজ’ তাই। ভদ্রলোক সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই ফায়ারব্রান্ড ছাত্র নেতা। এই আগুনের কাছেই অসামান্য সুন্দরী

ডাক্তার-মহিলা নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন এবং এক সময় রাজনৈতিক কারণে প্রায় বাধ্য হয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন।

"কিন্তু দেশ থেকে তাড়িত হলেও মন থেকে দেশকে তাড়ানো যায় কি?" প্রশ্ন তুললেন খোন্দকার আলমগীর।

কঠিন প্রশ্ন। অনেকে দূরে সরে গিয়ে দেশকে ভুলতে পেরেছে—এমন মানুষ এই মার্কিন মুলুকে ভূরি ভূরি রয়েছে। যেমন ধরুন ইহুদিদের কথা। এদের অনেকেই অন্য স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এক সময় নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এখন অবশ্য সে অবস্থার অবসান ঘটেছে। ইহুদিরা অনেকটা আত্মস্থ হয়েছে।

খোন্দকার আলমগীর সকৌতুকে বললেন, "আমাদের দাদু বলতেন, যত দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবে তত কাছে চলে আসবে, এই ব্যাপারটা যারা গায়ের জোরে দেশ চালায় তারা বড্ড দেরিতে বোঝে।"

দাদুর পরিচয় জানতে আগ্রহ হয়। খোন্দকার আলমগীর বললেন, "দাদুই আমাদের দু'জনের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন। দাদুকে পাওয়াটাই আমার বিদেশ-জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয়।"

দাদুর নাম যে প্রফুল্লকুমার মুখার্জি তা শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। আলমগীর জিজ্ঞেস করলেন, "এর আগের বার সাতাত্তর সালে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন দাদুর সঙ্গে দেখা হয় নি?"

দেখা হয়নি, কিন্তু নাম শুনেছিলাম। প্রবাসী ভারতীয় সমাজের প্রবীণতম পুরুষ প্রফুল্ল মুখার্জি স্থানীয় টেগোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। এঁর স্ত্রী মার্কিন—শ্রীমতী রোজ মুখার্জি।

আলমগীর বললেন, "অগ্নিপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন দাদু। কোনোরকম অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করেননি সমস্ত জীবন। জন্মসূত্রে দেশ ভারতবর্ষ এবং নাগরিকসূত্রে দেশ আমেরিকা—দুটিকেই প্রাণভরে ভালবাসতেন। প্রায়ই আপন মনে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথ থেকে—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তাহে যেন তৃণসম দহে'।"

আলমগীর বললেন, "দাদুই আমার প্রবাসজীবনের প্রাণপুরুষ। ষাটের দশকে এদেশে এসে পিছুটানে ভুগছি, সেই সময় এক রবীন্দ্রসংগীতের আসরে দাদুর সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি আমাকে স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। শুনলাম দাদুও সেই বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সরকারী আদেশে ১৯০৬ সালে দেশছাড়া হয়েছিলেন। ভাগ্যচক্রে এই আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। দাদু পেশায় ছিলেন একজন ধাতুবিদ্যাবিশারদ, কিন্তু স্বভাবে ছিলেন বিপ্লবী। যেখানেই প্রতিবাদ প্রয়োজন

সেখানেই দাদু রুখে দাঁড়াবেন দ্বিধাহীন চিত্তে—সে ভিয়েতনাম যুদ্ধ হোক, অথবা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হোক। দাদুর জীবনটা একটা নাটকের মতন, আমেরিকা ছাড়াও তিনি রুশ দেশেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, ওদেশের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।"

আলমগীর মনে করিয়ে দিলেন, "ষাটের দশকে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে অংশ গ্রহণ করা পাকিস্তানীদের পক্ষে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো। দীর্ঘদিন ধরে 'অভাববোধ' অর্থাৎ হোমসিকনেস যেটা ছিল তা যেন ওঁর সান্নিধ্যে এসেই কর্পূরের মতো উবে গেলো। একটা চাপা পাথর বুকের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন দাদু। অনুষ্ঠানের শেষে সস্ত্রীক দাদুর বাড়িতে এলাম। দাদু তাঁর গভীর ভালবাসায় আমাদের দু'জনকে নিকট আত্মীয় করে নিলেন।"

আলমগীর বললেন, "ছেড়ে আসা জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য পালন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেমন তাঁর ছিল—তেমন ছিল, বেছে নেওয়া নতুন দেশকে নিজের করে নেওয়ার পর—আমেরিকার জন্য একই প্রীতি ও কর্তব্যবোধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রতি শনিবার সেন্ট্রাল পার্কে হাতে এক ফেস্টুন নিয়ে পাঁচ-ছ ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখাতেন। বৃষ্টি-বাদল, ঝড়-ঝাপটা, তুষার-শীত কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি, সময়মত তিনি সেখানে হাজির হবেনই—একা হলেও কথা নেই। গুনগুন করে গাইতেন মাঝে মাঝে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে একলা চল, একলা চল রে'। অপরের মুখেও গানটা শুনতে খুব ভালবাসতেন।"

১৯০৬ সালে দাদু বিতাড়িত হয়েছিলেন স্বদেশ থেকে, কিন্তু মাতৃভূমিকে ভোলেননি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদু আবার দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ষোলটি বিভিন্ন সংগঠনকে একটি মোর্চায় এনে সৃষ্টি করেছিলেন অ্যাকশন কোয়ালিশন ফর বাংলাদেশ। রুডলফ আয়াস্কো হলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ন' মাস দাদু সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

আলমগীর স্মৃতিচারণ করলেন, "তখন নানা জায়গা থেকে ডাক আসতো কিছু বলার জন্যে, দাদু বৃদ্ধ বয়সেও সব জায়গায় যাবেন। নিউ ইয়র্কে দুটো বিরাট বিক্ষোভ শোভাযাত্রা, জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্টে, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে স্বাক্ষর সংগ্রহে দাদুর পরিশ্রম যুবকদেরও হার মানিয়েছিল।"

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আলমগীর নিজেই ভারত বাংলা সীমান্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আমার স্ত্রীর অসুস্থতার কথা ভেবে দাদু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর আত্মীয়দের কাছে লিখে আমাদের থাকা এবং আমার স্ত্রীর দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দেন।"

আলমগীর বললেন, "নভেম্বরে সাময়িক ভাবে ফিরে এসেছি। বাসা তুলে

দিয়ে আবার ফিরে যাবো। সীমান্তে, আহতদের চিকিৎসা করবো। বাড়িতে নেমে দাদুকে ফোন করতেই বললেন, কবি গিনসবার্গ সমস্ত বিকেল দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে তাঁর রচিত 'যেশোর রোড' গেয়েছেন। কলকাতার সল্টলেকে বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুহারাদের বসবাসের অনুকরণে কিছু মার্কিন ছেলেমেয়ে কয়েকদিন ওখানে থাকার ব্যবস্থা করেছে। দাদু নিজের চোখে সব কিছু দেখার জন্যে সেই রাত্রেই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। দাদুকে নিয়ে দাগ হামারশোল্ড প্লাজাতে গিয়ে দেখি ছেলেমেয়েরা কংক্রিট পাইপের অনুকরণে কার্ডবোর্ড পাইপ তৈরি করে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেও কিছু খেতে পায়নি। রাত প্রায় এগারটা, বাঙালিরা কোনো ব্যবস্থা করেনি। দাদু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এদের না-খাইয়ে তিনি যাবেন না। রাত বারোটায় খাবার নিয়ে এলাম দুই রেস্তোরাঁ থেকে। 'বিট অব বেঙ্গল'-এর কাজী সামসুদ্দিন ও রুচিরার মালিক রিয়াজউদ্দিন সায়েব সাহায্য করেছিলেন।"

আলমগীর বললেন, "আমরা ছিলাম গুরুশিষ্য। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা ছিল দাদুর ধর্ম। দাদু কোনোদিন নাম চাননি, খ্যাতি চাননি। তিনি চাইতেন কাজ হোক, পৃথিবীতে শান্তি আসুক। ভালোবাসা আসুক, মানুষ মানুষকে সম্মান করুক।"

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমি এখানে আসিনি। কিন্তু খোন্দকার আলমগীর দাদু প্রসঙ্গ না তুলে থাকতে পারছেন না। বললেন, "আমার ব্যক্তিগত জীবনে দাদু গভীর রেখাপাত করে গেছেন। বিদেশে অসুখ-বিসুখের সময়, বিপদে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে দাদু পাশে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন সাহস জুগিয়েছেন। হাসপাতালে আমার স্ত্রীর জন্যে তাঁর বিখ্যাত সুজির মোহনভোগ প্রায়ই নিয়ে আসতেন। আজও তাঁর অভাবটা অত্যন্ত প্রখর হয়ে বুকে বাজে।"

এই সব কথা শুনে আলমগীর মানুষটিকে চিনে নিতে আমার সুবিধে হচ্ছে। ভদ্রলোক একবার টেলিফোন ধরবার জন্যে উঠে গেলেন, সেই সময় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বাঙালি ও ভারতীয় সমাজে ফিরে এলো।

কথা উঠলো এদেশে কত দেশিভাই আছেন? একজন বন্ধু জনসংখ্যাবিদ পৃথ্বীশ দাশগুপ্তের রচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯৮০ সালের মার্কিন জন-গণনায় একটি প্রশ্ন ছিল 'এই লোকটি সাদা, কালো অথবা নিগ্রো, জাপানিজ, চাইনিজ, ফিলিপিনো কোরিয়ান, ইন্ডিয়ান (আমেরিকান), এশিয়ান, হাওয়াইয়ান, গুয়ামানিয়ান, সানোয়ান, এসকিমো, অথবা কি না নির্দেশ করো।'

এই প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে ৩,৮৭,০০০ ইন্ডিয়ান, ১৫,৭০০ পাকিস্তানী, ৩,০০০ শ্রীলংকান এবং ১৩০০ বাংলাদেশী—মোট ৪ লাখ ৭ হাজার

ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ আছেন।

ইংরিজি ছাড়া কে কোন ভাষায় কথা বলেন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা মাত্র আড়াই লক্ষ মানুষের সন্ধান পাচ্ছি। তার মধ্যে হিন্দীভাষী (১৩০,০০০), গুজরাটী (৩৭,০০০), পাঞ্জাবী (২০,০০০), বাংলা (১৩,০০০) এবং মালয়ালী (১১,০০০)।

জটিল অঙ্কের মাধ্যমে পৃথ্বীশবাবু হিসেব করছেন, ১৯৮০তে মার্কিন মুলুকে বাঙালির সংখ্যা ছিল ২১,০০০। এর পরে ১৯৮০-৮৫তে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের ধরলে বর্তমান সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,০০০-এর মতন। এঁরা ছড়িয়ে আছেন এই ভাবে। নিউ ইয়র্ক (২১.৩%), নিউ জার্সি (১০.১%), ক্যালিফোর্নি: (৯.৪%), টেক্সাস (৬.১%), ইলিনয় (৬%), মিশিগান (৫.১%), পেনসিলভেনিয়া (৪.৮%), মেরিল্যান্ড (৪.৮%), ম্যাসাচুসেট (৩.৫%), ভার্জিনিয়া (৩.৫%)। পৃথ্বীশবাবু দেখিয়েছেন, এদেশের মোট জনসংখ্যার তুলনায় এশিয়ান ইন্ডিয়ানরা নস্যি—প্রতি ছ'শ জনেও একজন নন।

বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থাগুলির ফেডারেশনের প্রধান টমাস আব্রাহামের এক সাক্ষাৎকার টাটকা পড়েছিলাম। তাঁর হিসেব মতো, ১৯৮৫তে এদেশে ৫২৫,০০০-এর মতন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ রয়েছেন। এঁদের বৃত্তিগত ব্রেকডাউন আব্রাহাম সায়েবের হিসেব অনুযায়ী এইরকম : ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, এম-বি-এ ইত্যাদি—৪০,০০০, ডাক্তার ও ডেনটিস্ট—২৫,০০০, পি-এইচ-ডি বৈজ্ঞানিক— ১৫,০০০, ব্যবসায়ী, ট্রাভেল এজেন্ট ইত্যাদি ৫,০০০ হিসেব বিশেষজ্ঞ, উকিল ইত্যাদি—৩,০০০, দোকানদার—১,০০০, রেস্তোরাঁ মালিক—৫০০, হোটেল মালিক—১৫,০০০।

ভারতীয়দের মধ্যে, কোটিপতি বেশ কয়েক হাজার। আব্রাহাম সায়েবের মতে 'দশ কোটিপতি'র সংখ্যাও নেহাত কম হবে না।

টেলিফোনালাপ শেষ করে আমাদের জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে ফিরে এলেন খোন্দকার আলমগীর সায়েব। বললেন, "বাঙালির সংখ্যা তিরিশ হাজারের বেশি বলে আমার ধারণা।"

ওঁর মতে, বেশি বাঙালি এখানে আসবার সুযোগ পাননি। সরকারী, বেসরকারী ও অর্থনৈতিক কারণগুলো বাঙালিদের বিপক্ষে কাজ করছিল। ১৯৬৮-৭০ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানীদেরই এখানে দেখা যেতো। পশ্চিমবাংলা থেকেও তেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন আসেনি—হয়তো বা বৃত্তিগুলির ভাগ-বাঁটোয়ারাতে সর্বভারতীয় খাতে তাঁদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। ইমিগ্রেশন ভিসা পাওয়ার কড়াকড়িটা কমে ১৯৬৯-৭০-৭১ সালে।

আলমগীর বললেন, "পেশাগত হিসেবে দেখলে এদেশে চিকিৎসক, ফার্মেসিস্ট, ডেনটিস্ট, ইনজিনিয়ার, কলেজ শিক্ষক, গবেষণারত বৈজ্ঞানিক অ্যাকাউনটেন্ট, ডায়েটিশিয়ান, নার্স এঁরাই সাধারণত এসেছেন।"

প্রবাসজীবনের সামাজিক সমস্যা আলমগীরকে সর্বদাই চিন্তিত করে রেখেছে। বললেন, "সাফল্যের হিসেবটা আপনি নিজেই নেবেন। কিন্তু ব্যর্থতার খবর কিন্তু আমার কাছে আছে। পরিবার ভেঙে যাওয়ার সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। প্রেমঘটিত অপরাধী, খুন-খারাপি ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। ভবঘুরে, মদ্যপায়ী কাউকে-কাউকে ওয়েলফেয়ারের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। হাশিস, ভাঙ, গাঁজা প্রভৃতি বেচাকেনার দায়ে বাংলাদেশের কেউ-কেউ পুলিশের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিছু ছেলেমেয়ে নেশাভাঙের খপ্পরে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

এইবার জাহাজী শ্রমিকদের কথা তুললাম। আলমগীর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, "এঁদের প্রায় সবাই বিনা অনুমতিতে জাহাজ থেকে নেমে পাড়ায় আইন অনুযায়ী ফেরারি হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। ইমিগ্রেশনের জন্যে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা উকিলদের দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এঁরা। লুকিয়ে-লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে কাজ করতে হয় এঁদের—ধরা পড়লেই দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয় ইমিগ্রেশন বিভাগ। এঁদের শ্রম বিক্রি হয় জলের দামে। বেশির ভাগ বাড়ি রং-করা, টুকিটাকি মেরামতের কাজ করেন। সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত টাকার দুই তৃতীয়াংশ চলে যায় উকিলের পেটে। এমন কি নিজের দেশের দূতাবাসের কিছু আমলাও ফায়দা লুটছেন এঁদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে।"

আলমগীর সোজাসুজি বললেন, "দিনের শেষে কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পরে ছোটখাট বদ্ধ ঘরে ঠাসাঠাসি করে এঁরা রাত কাটান এবং প্রায়ই অসুখ-বিসুখে ভোগেন। দু'চারজন খুবই কম বয়সে নানা ব্যাধিতে ভুগে বিদেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আরও অনেকেই এই পথে জীবন শেষ করবে।"

আলমগীর জানালেন, "এঁদের অনেকে এখন বাধ্য হয়েই এদেশি মেয়ে বিয়ে-থা করে ইমিগ্রেশন ভিসা জোগাড় করছে। অবশ্য উকিলদের পরামর্শ মতোই। ফলে দেশের বউ, ছেলেমেয়েরা এদের দেখা পাচ্ছে না—আট দশ বছর পরেও। কেউ-কেউ ওদিককার পাট তুলতেই বসেছে, কেউ-কেউ দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

আরও জানা গেলো, এখানেও কেউ-কেউ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় জড়িয়ে পড়ছে, এদেশি মহিলাদের ব্যাপারে। আর্থিক খেসারতও দিতে হচ্ছে। মানসিক অশান্তি বেশ বাড়ছে।

আলমগীর সায়েব এ-বিষয়ে নিজেও কিছু লেখালেখি করেন। "কিন্তু তেমন ফল হয় কই?"

আলমগীর বললেন, "ক্লিভল্যান্ডের রণজিৎবাবু আপনাকে ব্যর্থ বাঙালীর হিসেব-নিকেশ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলে শুনুন, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং সংসার ভাঙা ছাড়াও অন্য সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছে। এখানকার সমাজ জীবনের চাপ, দ্রুত গতি, কর্মজীবনে দক্ষতার উঁচুমানের সার্বক্ষণিক তাড়া কেউ-কেউ সইতে পারছেন না। কেউ কেউ আত্মহত্যা করে জীবন থেকে ছুটি নিয়েছেন। কেউ-কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে এখানকার মানসিক হাসপাতালে আশ্রয় নিচ্ছেন। কেউ চিকিৎসাধীন আবস্থায় কর্মচ্যুত হচ্ছেন। কাউকে-কাউকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজকর্মের চাপে, অতি উচ্চাভিলাষীদের কঠিন প্রতিযোগিতায় মধ্য-বয়সের প্রারম্ভে বা যৌবনের প্রান্তে কারও-কারও হৃদযন্ত্র অসুস্থ হচ্ছে। অকাল মৃত্যু বাড়ছে, কেউ-কেউ মধ্য জীবনেই অর্ধপঙ্গু হচ্ছেন।"

আলমগীর সায়েব যে তাঁর নিজস্ব সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলছেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু শ্রীমতী আলমগীর সস্নেহে বাধা দিলেন, "বেচারা দু'দিনের জন্যে এসেছেন। দেশে তো অনেক দুঃখই আছে, এখানে কেন ওঁর কষ্ট বাড়াচ্ছো?"

আলমগীর সায়েব ক্ষমা চাইলেন। বললেন, "আমাদের খাবার এসে গিয়েছে। এখনই সদ্ব্যবহার করা যাক। আপনি শুধু আমার কথার ওপর বিশ্বাস করবেন না। একটু সময় নিয়ে নিজের চোখে সব দেখে যান।"

ওঁর একটা লেখা বিদায়ের সময় আমার হাতে দিয়ে বললেন, "কাজকর্ম খুঁজে বার করতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে অনেক বাঙালির। কেউ-কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও আজেবাজে কাজ করছেন। কেউ-কেউ হতাশ হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। ভুলবেন না, নতুন আগন্তুকদের প্রতি বিরূপ ভাব এ দেশেও যথেষ্ট দেখানো হয়ে থাকে। কিছু-কিছু এলাকায় বর্ণ-বিদ্বেষের সমস্যাও রয়েছে।"

আলমগীর সে-রাত্রে আমার চোখ খুলে দিলেন। বললেন, "যারা দেশ ছেড়েছে ভাগ্য সন্ধানে কিছু-কিছু জটিলতা তাদের সঙ্গী হয়ে থাকবেই। এই জটিলতার মধ্য দিয়ে জীবন চলবে। এই সব কষ্টকে সাথী বলে মেনে নিয়েই এখানকার বাঙালি সমাজ ও তাঁদের বংশধরদের এগিয়ে যেতে হবে।"

আলমগীরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিউ ইয়র্কের রাজপথে নেমে এসে গভীর শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠলো। আজ আমি বিদেশের পরিবেশে একজন মানুষের মতন মানুষকে দেখেছি। যতদিন আমাদের এই বঙ্গভূমি এমন সব তপন সরকার, প্রবীর রায়, খোন্দকার আলমগীরের মতন পুরুষের জন্ম দেবে ততদিন কোনো জটিলতাই আমাদের পঙ্গু করতে পারবে না।

এক ডাক্তারের হাত থেকে আরেক ডাক্তারের খপ্পরে। খোন্দকার আলমগীরের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি যাঁর ওপর ভর করছিলাম তাঁর নাম ডাক্তার তপন সরকার। যে-অঞ্চলে তপনের বসবাস তার নাম 'গ্রেট নেক'। সুরসিক তপনকে যা বলা হয়নি, কলকাতায় এখনও 'গলাকাটা ডাক্তার' কথাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে এবং ওই শহরের কোনো অঞ্চলে লম্বাগলা শব্দটি থাকলে সেখানে কোনো ডাক্তার চেম্বার খুলবেন না অথবা সম্পত্তি কিনবেন না।

আলমগীর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অকারণ কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে দেখলাম আমার ভুল হয়নি। পূর্ব আমেরিকার বহু বাঙালির হৃদয়েই তিনি শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। একজন তো বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন, নিজের আদর্শ এবং নিজের স্ত্রীর জন্যে ভদ্রলোক নিজেকে তিলে-তিলে উৎসর্গ করছেন হাসিমুখে।

ছোটবেলায় দুষ্টু থাকলে বড় হয়ে শান্ত ও মিষ্টি হয়, কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ এই তপন সরকার। ইস্কুলে সে আমাদের জুনিয়র ছিল এক বছর এবং সুযোগ পেলেই নানাভাবে বয়োজ্যেষ্ঠদের ভোগাতো। আমরা প্রার্থনা করতাম কবে এই হাঙ্গামাবাজ জুনিয়রের হাত থেকে মুক্তি মিলবে। সেই তপনই কলেজে ঢুকে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেলো—এমন চমৎকার মিষ্টি স্বভাবের পরোপকারী পুরুষ খুঁজে পাওয়া শক্ত ব্যাপার।

নিউ ইয়র্কে তপন একটি ছোটখাটো সামাজিক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল একটি যৌথ পরিবার স্থাপন করে। এই পরিবারের সভ্য তপন, তার ডাক্তার স্ত্রী, দুই নাবালক পুত্র, তপনের ইঞ্জিনিয়ার দাদা তড়িৎ, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা। এই জয়েন্ট ফ্যামিলি স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মার্কিন সমাজে বিস্ময় উৎপাদন করলেও বেশ চমৎকার চালু ছিল এবং এক সময়ে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং এই পরিবারকে কেন্দ্র করে তিনি মার্কিন দেশেও যৌথ পরিবার সম্পর্কে একটি সাড়াজাগানো প্রবন্ধ রচনা করেন। মার্কিন মহলে এই সমাজবিজ্ঞানী এখন খ্যাতনামা। ডাঃ পরমাত্মা শরণ একদা বিহারে বসবাসকারী ছিলেন, এখন নিউ ইয়র্কে গবেষণা ও অধ্যাপনাকর্মে নিয়োজিত আছেন।

তপন ও তার ডাক্তার স্ত্রী মায়া রসিকতা করলো, এখানকরা বাঙালি মেয়েদের সায়েব স্বামীগুলি নাকি মন্দ হচ্ছে না। ওদের জানাশোনা এক ডাক্তার মেয়ে কলকাতায় গিয়ে একজন মার্কিনী 'ভেট' (পশু-চিকিৎসককে) বিয়ে

করলো। বিদেশ থেকে তেইশ জন বরযাত্রী এসেছিল কলকাতায়। পাছে আমি ভুল করি তাই মায়া আমাকে সমাধান করে দিলো, মার্কিন সমাজে পশুচিকিৎসকদের রুজিরোজগার মনুষ্য চিকিৎসকদের থেকে বেশি। ডাক্তারি কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে ভেটারিনারি কলেজে প্রবেশপত্র পাওয়া বেশি শক্ত। ঘোড়ার ডাক্তার কথাটা কলকাতায় ব্যঙ্গ হলেও মার্কিন মুলুকে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পাত্রী-হিসেবে বঙ্গললনার চাহিদা হবু মার্কিনী জামাই-সমাজে বেড়েই চলেছে। কলকাতার বিদেশি বিবাহবাসরে একজন তরুণ মার্কিনী বরযাত্রীকে মায়া সরকার জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমিও কি এদিশি মেয়ে বিয়ে করতে আগ্রহী?" ছোকরাটি গোপন খবর ফাঁস করেছিল, কয়েকটি ভারতললনা ইতিমধ্যেই তার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করছে। স্বদেশের গ্রীনকার্ড, সন্ধানী ভাবী জামাইদের পক্ষে যা খারাপ খবর তা হলো বিদেশে প্রতিপালিত বাঙালিনীরা একটু কম বয়সেই বিবাহিতা হচ্ছে এবং অনেকেই সায়েব পাত্র পছন্দ করছে।

"জামাই হিসেবে এরা মন্দ নয়"। তপনের সুচিন্তিত মন্তব্য। এক সায়েব জামাই (ম্যাথু) গানবাজনা শিখে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করছে এবং টেলিফোন করলে ভাঙাভাঙা বাংলায় বলে, "কাকা, তুমি কেমন আছো?"

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পরে তপন আমাকে ডঃ পরমাত্মা শরণের বাড়িতে নিয়ে গেলো। প্রবাসী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক লেখাগুলি ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শরণ একটু-আধটু বাংলা জানেন এবং নিজের স্ত্রী এবং জননীর একই ছাদের তলায় বসবাসের ব্যবস্থা করে স্থানীয় সায়েব পড়শীদের বিস্ময় ও বয়োবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

পরমাত্মার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো না, তিনি তখন শুয়ে পড়েছেন। অধ্যাপক মশায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো।

আবার সেই পুরনো কথা, ভারতীয় গল্পলেখকদের জন্য স্বর্ণখনি সৃষ্টি হয়েছে এই মার্কিন মহাদেশে। নতুন এই সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যরক্ষার লড়াই যে-কোনো সাহিত্যের সেরা উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

ইমিগ্রান্ট ইন্ডিয়ানদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে সেই ১৮২০ সাল থেকে—ঐ বছর একজন ইন্ডিয়ান আমেরিকায় পা দিয়েছিলেন। এঁর নাম ও পরিচয় খুঁজে বার করতে পারলে মন্দ হতো না। ১৮৫১-৬০ এই দশকে ভারতীয় ইমিগ্রান্টদের সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে ৪৩। বিংশ শতকের গোড়ায় ৬৮ জন। তারপর ভারতীয়দের জন্যে আমেরিকার দরজা বন্ধ। ১৯৪১-৫০ সালে মাত্র ১৭৬১ জন। পরের দশকে ১৯৭৩ জন। ১৯৬১-৭০ পর্বে দরজা খুললো—পদার্পণ হলো

৩০,৪৬১ জনের। তার পরের দশকে প্রায় তিনগুণ।

এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৫ সাল থেকে পরের দশ বছরে প্রায় ৪৬,০০০ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক এদেশে ঢোকেন। তাঁদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সংখ্যা ছিল আরও ৪৭,০০০। ঐ একই দশকে যাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা অন্তত ৮,০০০।

এই প্রসঙ্গে পরমাত্মা শরণ একটি মজার কথা বললেন, "আপনি খোঁজ করলে দেখতে পাবেন, যাঁরা এদেশে আগে এসেছেন তাঁরা অনেকে ইন্ডিয়ান পাশপোর্ট রেখেছেন, কিন্তু নতুন যাঁরা এসেছেন তাঁরা চটপট আমেরিকান সিটিজেন হচ্ছেন। মানসিকতায় যাঁরা কম মার্কিনী রয়েছেন তাঁরাই সবচেয়ে আগে জন্মভূমির সঙ্গে আইনগত বন্ধন ছিন্ন করেছেন চিরতরে।"

আর-একটি চমৎকার খবর দিলেন পরমাত্মা শরণ—হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা অনেক তাড়াতাড়ি পিছুটান কাটিয়ে এই সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন, যদিও ধর্মীয় আচারে তাঁদের অনেক কড়াকড়ি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা তাঁরা পালন করে যান।

আরও যা জানবার, নতুন সভ্যতার সাগরে বিলীন হয়ে যাবার ব্যাপারে ভারতীয় মেয়েরা অনেক বেশি তৎপর ভারতীয় পুরুষদের থেকে। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে শরণ বললেন, "সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকদের চোখে আর কী কারণ ধরা পড়বে তা আমি জানি না, তবে মেয়েরা বোধহয় ঘর বদলাবার জন্যে ছোট বয়স থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির পরিবর্তন ঘটে যায় চমৎকারভাবে। এই মানসিকতা নিয়েই তারা আবার নিজেদের পাল্টে ফেলে বিদেশের এই পরিবেশে।"

শরণ বললেন, "তবে মজার ব্যাপারটা হলো, বিদেশে এসে প্রথমে একটা বছর মেয়েদের অ্যাডজাস্টমেন্ট ছেলেদের তুলনায় অনেক শক্ত থাকে। কিন্তু তারপরেই এখানকার ভাষা সড়গড় গয়ে যায়, দোকানপত্তর চেনা হয়ে যায়, আমেরিকা সম্বন্ধে মেয়েদের টান পুরুষদের থেকে বেশি হয়ে পড়ে। তাছাড়া দেশে শাশুড়িদের সামলাতে হয়, এখানে মুক্তি, ওসব হাঙ্গামা নেই।"

"প্রবাসী ভারতীয় পুরুষমানুষদের কথাও একটু বলুন, শরণসায়েব", আমার অনুরোধ।

পরমাত্মা বললেন, "স্বদেশ থেকে দূরে থাকবার বেদনা বাঙালিদের মধ্যে বড্ড বেশি। জীবনযাত্রার মান এখানে উঁচু, দৈনন্দিন সুখ সুবিধে অনেক। কিন্তু ওইটুকু বাদ দিলে রয়েছে সর্ববিষয়ে সারাক্ষণের সংগ্রাম। কর্মক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা এবং ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে ভাবতে খুব কষ্ট। সেই

সঙ্গে রয়েছে নবাগতের সেই বেদনা, যা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেয় কোথাও যেন একটু বৈষম্যমূলক ব্যবহার গণতন্ত্রের এই পীঠস্থানেও রয়ে গিয়েছে।”

তবু স্বীকার করতে হবে, অন্য অনেকের তুলনায় আমেরিকান সমাজে ভারতীয়দের যথেষ্ট আদর। মার্কিনীরা এঁদের পছন্দ করেন। তবে কোথাও একটু ‘হিপোক্রিসি’ও লুকিয়ে আছে। ইমিগ্রান্ট শ্রমিকদের রক্ত জল-করা সস্তা শ্রমের ওপর এই সমাজ এখনও অনেকটা নির্ভরশীল কিন্তু কেউ সে-কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করবে না।

ইমিগ্রান্ট ভারতীয় পুরুষদের সম্বন্ধে পরমাত্মা বললেন, “সম্প্রতি যাঁরা আসছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা ছিল এদেশে আকাশছোঁয়া সুযোগ। এখন হঠাৎ বুঝছেন, সুযোগের সেই আকাশই ভেঙে পড়ছে মাথার উপর। তাই তাঁদের উদ্বেগ বাড়ছে। তাঁরা জীবনসংগ্রামের অনেক ব্যাপারেই মনঃস্থির করতে পারছেন না। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা অনেক বুদ্ধিমতী, লক্ষ্যস্থল সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা অনেক স্পষ্ট।”

“একদিন সমস্ত পিছুটান বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ লীন হয়ে যাবে আমেরিকান সভ্যতার সঙ্গে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে হয়তো নইপল মনোবৃত্তিও দেখা দেবে,” আমি বললাম।

পরমাত্মা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, “হিন্দুরা মাঝে-মাঝে ভাবেন তাঁরা দেশে ফিরে যাবেন, বিচক্ষণ মুসলমানরা তা করেন না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত প্রবাসীদের মধ্যে ভারতীয়ত্ববোধ সুদৃঢ় হচ্ছে, তাঁরা এদেশের মানুষ হয়েও নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলতে রাজি নন। একমাত্র সময়ই এ-বিষয়ে তার শেষ রায় দেবে।”

আমার মনে পড়লো, পিটার পোলের এক মন্তব্য। “একসঙ্গে সহ-অবস্থান সমাজ নয়—সমাজের মূল কথাটা হলো আদান-প্রদান।” যা বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিলেন ‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে’। এই দেওয়া-নেওয়া শুধু জাগতিক অর্থে লেনদেন নয়, ভাব-ভালবাসার লেনদেনও বটে।

পরমাত্মা বললেন, “একটা জি[illegible] ভুলবেন না, গুণের সমাদর করতে এদেশের সমাজের তুলনা নেই। [illegible]নই [illegible]ঙ্গ, যা অভিনব, যা অজানা তার প্রতি এদেশের মানুষদের প্রচণ্ড আগ্রহ। নতুন কিছু দেখলেই ওঁরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন গ্রহণ করার জন্যে।”

পরমাত্মা শরণের পরেই নিউ ইয়র্কে যাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো তাঁর নাম ডক্টর জ্যোতির্ময় মিত্র। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের প্রতিথযশা অধ্যাপক। বিশ বছর আগে এঁর সঙ্গে গল্প করতে এসে ওঁর নিউ ইয়র্ক অ্যাপার্টমেন্টে সমস্ত রাত ধরে আড্ডা জমেছিল, হোটেলে ফেরা হয়নি। জ্যোতির্ময় তখন ছিলেন অকৃতদার। আমাকে ভোরবেলায় একটা নতুন টুথব্রাশ উপহার দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। বলেছিলেন, "হঠাৎ-আসা বন্ধুদের জন্যে বাড়তি টুথব্রাশ রেখে দিই, খুব কাজে লেগে যায়।"

এঁর কথা আমি এপার বাংলা ওপার বাংলাতে সবিস্তারে লিখেছিলাম।

জ্যোতির্ময় এরপর কলকাতায় এসেছিলেন বিয়ে করতে। কারুর কারুর বকুল ফুল একটু দেরিতে ফোটে! আমরা সুইনহো স্ট্রিটে খুব হৈ-চৈ করে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। তারপর আবার দেখা এই নিউ ইয়র্কে।

জ্যোতির্ময় মিত্র প্রথমেই একটু মধুর সারপ্রাইজ দিলেন। বিশ বছর আগে নিউ ইয়র্কে ওর ঘরে তোলা আমার ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে হাজির করলেন। এই ছবির কপি আমার কাছে নেই, বিশ বছর আগে উপস্থিতির প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে খুব ভাল লাগলো। জ্যোতির্ময়গৃহিণী বকুলকে অনেক বছর আগে নববধূর বেশে কলকাতায় দেখেছিলাম, এখন তিনি একজন অভিজ্ঞ নিউ ইয়র্কবাসিনী। এখানে তিনি শুধু ম্যানেজমেন্টের উচ্চ ডিগ্রি সংগ্রহ করেননি, একটা ভাল চাকরিও করেন। কর্মস্থল আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত হোটেল ওয়ালডর্ফ এসটোরিয়ায়।

জ্যোতির্ময় মিত্র টানা পঁয়ত্রিশ বছর আমেরিকায় আছেন। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে হাজির হয়েছিলেন ১৯৫২ সালে, আর দেশে ফেরা হয়নি।

জ্যোতির্ময়ের এক মামা বিখ্যাত শিল্পী অতুল বসু। কিন্তু আমেরিকাসূত্রে জ্যোতির্ময় এবারে বড়মামা পবিত্রকুমার বসুর কথা বেশি বললেন না। জ্যোতির্ময় এর বড়মামা আমেরিকায় আসেন ১৯০৫ সালে হংকং ও জাপান ঘুরে। তখন তাঁর বয়স ২১ বছর। তখন পকেটে ১০০ ডলার না-থাকলে কাউকে আমেরিকায় নামতে দেওয়া হতো না—পাসপোর্ট, ভিসা, ইত্যাদি হাঙ্গামা অবশ্য ছিল না। বড়মামা জাপানে কাজ করে টাকা রোজগার করলেন।

শোনা যায় তারকনাথ দাস সে-সময়ে জাপানে ছিলেন এবং পবিত্রকুমার বসুর দেওয়া বাড়তি টাকা নিয়েই তিনি আমেরিকায় হাজির হতে পেরেছিলেন। শোনা

যায়, তারকনাথ আজীবন এই সাহায্যের কথা মনে রেখেছিলেন।

নতুন প্রজন্মের যাঁরা তারকনাথ দাসের নাম শোনেননি তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, তারকনাথের জন্ম ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঝিপাড়ায় চব্বিশ পরগণায়। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ছাত্রাবস্থায় উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক রাজনীতি প্রচারকালে পুলিশের নজরে আসেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হবার আগেই ১৯০৫ খ্রীঃ জাপানে এবং ১৯০৬ খ্রীঃ আমেরিকায় যান এবং ভারমন্ট সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমেরিকায় তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন এবং সেখান থেকে গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ১৯১১ খ্রীঃ এম-এ পাশ করে তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্স্ বিভাগের ফেলো হন এবং ১৯১৪ খ্রীঃ মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে চীন যাত্রা করে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন ঘোষ আমেরিকায় আসার পর তাঁর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন করেন। মার্কিন সরকার এই অপরাধের অভিযোগে তাঁকে বাইশ মাস কারাদণ্ড দেন। ১৯২৪ খ্রীঃ ওয়াশিংটন জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ের ওপর পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পান এবং ঐ বছরেই তিনি এক মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৫-৩৪ খ্রীঃ ইউরোপে বাসকালে ভারতীয় ছাত্রদের বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার জন্যে প্রায় একক চেষ্টায় মিউনিকে ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তারকনাথ দাস ফাউন্ডেশনের উদ্ভব। ১৯৩৫ খ্রীঃ ঐ ফাউন্ডেশন আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তারকনাথ নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫২ খ্রীঃ দেশত্যাগের সাতচল্লিশ বছর পরে ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসেছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ নিউ ইয়র্কে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাপানে তারকনাথের সাহায্যকারী পবিত্রকুমার ছিলেন অদ্ভুত এক চরিত্র। আমেরিকাতেও নিরামিষ খেতেন। কাজ করতেন এক স্টক ইয়ার্ডে এবং বাড়তি রোজগারের টাকায় ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করতেন। বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের আর্থিক দুর্গতি চিরদিনের।

পবিত্রকুমার ইলিনয় ইউনিভারসিটিতে কেমিস্ট্রি পড়তেন। তখনকার দিনে শাদা ও কালোদের আলাদা হোস্টেলে থাকতে হতো, এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে পবিত্রকুমার ডিগ্রি গ্রহণ করলেন না।

জ্যোতির্ময় মিত্রর বড়মামা দেশে ফিরে গেলেন ১৯১২ খ্রীঃ। মনেপ্রাণে সাহেব হয়েও মামা পরতেন ধুতি ও ফতুয়া। কলকাতার প্রগতিবাদী ব্রাহ্মসমাজে তখন তাঁর দারুণ চাহিদা। ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ এলো। কিন্তু পরাধীন দেশের পরিস্থিতির কথা ভেবে মামা বললেন, তাঁর পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। "কারাগারে থেকে আমি কাউকে পৃথিবীতে আনতে পারবো না।"

আমেরিকায় স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন বড়মামা। বাড়িতে হাওয়াগাড়ি থাকা সত্ত্বেও ধুতি ও ফতুয়া পরে সেকেন্ড ক্লাশের ট্রামে ঘুরে বেড়াতেন। পর্দার আড়াল থেকে ওঁর ইংরিজী উচ্চারণ শুনলে বোঝা যেতো না একজন ভারতীয় কথা বলছেন। বিলিতি সিগারেট বর্জন করে বড়মামা বিড়ি খেতেন।

আমেরিকা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে অপার শ্রদ্ধা নিয়ে গিয়েছিলেন বড়মামা, যেমন ঘটেছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। মিসেস হজসন নাম্নী এক বিদেশিনী মহিলার কাছে জ্যোতির্ময় ইংরিজি শিখতেন। এঁকে মাইনে দেওয়া হতো নতুন নোটে। বড়মামার নির্দেশ, "কোনো মহিলাকে পুরনো জিনিস দেবে না।" প্যান্টপরা ভাগ্নেকে বলতেন, "চোঙাটা যদি পরিস তা হলে পা নাড়াবি না।"

আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালিদের সন্তানদের সম্পর্কে কথা উঠলো। জ্যোতির্ময় জানালেন, "কুড়ি বছর আগে যখন এসেছিলেন, তখন প্রত্যেক বাঙালি ছিল ঘরমুখো, দেশে ফিরবার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি। এখন আর সে-অবস্থা নেই। ছেলেমেয়েরা কেমন হচ্ছে, তা এখনও অনেকটা বাবা-মায়ের ওপরেই নির্ভর করে। কেউ-কেউ সাহেব হবার অতৃপ্ত কামনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিটিয়ে নিচ্ছেন। এঁদের ইচ্ছে, পিছুটান নষ্ট হয়ে যাক, ছেলেমেয়েরা এখানকার মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাক। আরেক দল চাইছেন, দুই সভ্যতার ভাল দিকটাই ছেলেমেয়েরা নিক।"

কোনো-কোনো বাড়িতে দু'ছেলে দু'রকম। বড় ছেলে হয়তো ইন্ডিয়ান সংস্কৃতিতে ডুবে রয়েছে। ছোট ছেলে সম্পূর্ণভাবে এদেশি। বাবা যখন বলেন, শরীরটা ভাল লাগছে না, সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে ধরে নিয়েছে, দরকার হলে বাবা নিজেই ডাক্তারের কাছে যাবে। বাবার জন্যে আহা-উহু, এখন কেমন লাগছে বাবা, এসব ভাবপ্রকাশ করা অনর্থক।

যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা কষ্ট হলেও বাংলাভাষাটা ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে নেন। জ্যোতির্ময়বাবুর মতে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, "কারণ মাতৃভাষার এতোই জোর যে সংস্কৃতিটা ওর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়।"

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে জ্যোতির্ময়-এর। বললেন, "ওদের সম্বন্ধে ভাববেন না, ওরা অনেক বুঝে-সুঝে চলে। নিজেদের

ঐতিহ্য ওরা হারিয়ে ফেলবে না, যদি না ওদের ঘাড়ে জুলুম করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়।”

জ্যোতির্ময়ের ছাত্রদের অনেকেই দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্মের গ্রীক, ইতালিয়ান ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় বললেন, “এখন ওদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে—নতুন করে ভাষা শিক্ষা হচ্ছে। আবার ভাল লাগছে পিতৃপুরুষদের।”

জ্যোতির্ময় বললেন, “ভারতবর্ষীয়দের সম্পর্কে এদেশের মানুষদের একসময় খুব ভাল ধারণা ছিল। সবাই ধরে নিতেন, এঁরা উচ্চশিক্ষিত। এখন এই ধারণা ক্রমশ পাল্টাচ্ছে। সমস্ত মোটেল ব্যবসা প্যাটেলদের হাতে চলে যাচ্ছে। এর আগে ভারতীয়দের কখনও এতোটা চোখের সামনে দেখা যায়নি। নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র স্টলগুলির বেশিরভাগ এখন ভারতীয়দের হাতে। জানি না, এখানকার স্থানীয় গরিবদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না একটা ঠোকাঠুকি লেগে যায়!”

জ্যোতির্ময় তবুও বললেন, “আগে এখানে অনেক ভারতীয় ডাক্তার ছিল—এখন কেরালার নার্স পাবেন প্রচুর। ডাক্তারিতেও বাঙালিদের প্রচুর সুনাম। অধ্যাপনা অথবা গবেষণার কথা নাই বা বললাম—এই নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়েই অন্তত এক ডজন অধ্যাপক পেয়ে যাবেন। বাঙালিদের যদি দেশ ছেড়ে কোথাও থাকতে হয়, তা হলে নিউ ইয়র্কই হলো এক নম্বর জায়গা।”

আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিদের বিয়ের কথা উঠলো। জ্যোতির্ময় বললেন, “বাঙালি-বাঙালি বিয়ের কিছু ঘটকালি করেছি। মুশকিল হলো, এদেশে প্রতিপালিত মেয়েরা বলে, ইন্ডিয়ান ছেলেদের বোকা-বোকা লাগে। এদেশের পরিবেশে মানুষ হলে মেয়েরা অনেক স্বাধীনচেতা হয়। বাবা-মায়েরা অবশ্য চান দেশের কারুর সঙ্গেই বিয়ে হোক। এর মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই। এদেশে থাকা গ্রীক বাবা-মা চান ছেলেমেয়ে গ্রীক বিয়ে করুক, ইটালিয়ানদের ইচ্ছে ছেলে ইটালিয়ান বিয়ে করুক। জাতের বাইরে বিয়ে করেছে বলে বাবা রেগে গিয়ে সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন, এমন খবরও আমার জানা আছে।”

গত বিশ বছরে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা হলো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রগতির কথা কে না জানে? জ্যোতির্ময় বললেন, “এই ক' বছরে মার্কিন দেশের বিত্তবৃদ্ধি হয়েছে দ্রুত, কিন্তু কোথাও যেন আদর্শচ্যুতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। শৃঙ্খলা, নীতিবোধ ইত্যাদির মূল্য থাকছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশেও। সেই সঙ্গে বাড়ছে বেপরোয়া বাধা-বন্ধনহীন জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ। আমেরিকানদের একটা অংশ এখন একটা ইংরিজি সেনটেন্স শুদ্ধভাবে

লিখতে পারে না। বানানে এরা খুবই খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আগে একটা নিজস্ব ফিলজফি ছিল, এখন সবাই চাহিদা ও-জোগানের জালে জড়িয়ে পড়ছে। দূরদৃষ্টি হারিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধাররা এমন স্বল্পমেয়াদী কাজকর্মের দিকে ঝুঁকছেন। শিক্ষার মধ্যে 'বানিয়া' মনোবৃত্তি বেড়েই চলেছে।"

সেক্সের ব্যাপারটা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরের চলে যাচ্ছিল—প্রকাশ্যে নির্লজ্জ দেহমিলন এখানে ডালভাত হয়ে উঠছিল। এখন রোগবিরোগের ভয়ে আবার কিছুটা যৌন-রক্ষণশীলতা ফিরে আসছে।

জ্যোতির্ময় মনে করিয়ে দিলেন, "বেপরোয়া সেক্সের উদ্দাম যাত্রা তুঙ্গে উঠেছিল মেয়েদের গর্ভনিরোধক পিল আবিষ্কারের পর, এখন এইডস রোগ এসে মোড় ফেরাতে বাধ্য করছে।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "আমরা যেমন প্রতিনিয়ত এদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা নিচ্ছি, এরাও কয়েকটা ভব্যতা আমাদের কাছ থেকে নিলে লাভবান হতে পারতো। যেমন ধরুন, এই করমর্দন—অতি বাজে জিনিস—রোগ ছড়ানোর পক্ষে খুব সুবিধে। আমাদের করজোড়ে নমস্কার খুব ভাল সিস্টেম।

"এদের কথা আর কী বলবো! এতো সভ্য দেশ, কিন্তু হুদো-হুদো লোক রুটি ও খাবার কার্পেটের ওপর রাখছে। কুকুরকে চুমু খাচ্ছে—কোনো ঘেন্না নেই। রেস্তোরাঁয় থুতু দিয়ে প্লেট মোছা হচ্ছে। এরা বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকে জুতো পরেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। শোবার ঘরের মেঝেটা আমেরিকানদের কাছে রাস্তার কনটিনুয়েশন, আর জাপানী মতে ঘরের মেঝেটা হলো বিছানার বাড়তি অংশ। দুটো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পার্থক্য।"

জ্যোতির্ময়ের পরবর্তী মন্তব্য, "এরা বড্ড বেশি কেমিক্যালস-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, ফলে ক্যানসার বাড়ছে। এরা কথায় কথায় এক্স-রে করে অযথা ছুরি চালিয়ে অপারেশন করতে খুব আনন্দ পায়—এমন নাইফ-হ্যাপি জাত আপনি দুনিয়ার আর পাবেন না। বড়-বড় রোগের চিকিৎসায় যেমন এদের তুলনা নেই তেমন ছোটখাটো রোগের চিকিৎসায় এরা যা-তা। ঠিকমতো রোগ ধরতে পারে না, বলে বসে, সাইকিয়াটিস্টের কাছে যাও। আপনি লিখে রাখুন, এখানকার একশ্রেণীর ধড়িবাজ ডাক্তারদের ফিলজফি—'তোমার রোগ আমি সারাই চাই না সারাই তোমার টাকাটা আমার নিতেই হবে—হোয়েদার আই ট্রিট ইউ আর নট, আই নিড ইওর মানি। এখানকার বেশিরভাগ ডাক্তার 'শিক্ষিত' নয়, তারা টেকনিশিয়ানের মনোবৃত্তি নিয়ে প্র্যাকটিশ করে চলেছে।"

জ্যোতির্ময় বললেন, "জাত হিসেবে এরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। দরিদ্র এবং ক্রিমিন্যালকে এরা একই চোখে দেখে। এরা জানে না, পৃথিবীর সব দেশে বড়লোকরাই বেশি অপরাধের সঙ্গে জড়িত, আমাদের দেশে দরিদ্ররা ভিক্ষে

করে, কিন্তু খুন করে না। আমাদের দেশে কষ্ট আছে কিন্তু হা-হুতাশ নেই। এরা ওই অবস্থায় পড়লে পাগল হয়ে যাবে। এরা কোনো কিছুর অভাব সহ্য করতে পারে না। মন খারাপ হলেই ছোটে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র পরীক্ষায় খারাপ করলো। খবর নিয়ে জানা গেলো, তার মন খারাপ—সম্প্রতি বালিকা বান্ধবীটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। মাস্টারমশাই তাকে বোঝাতে শুরু করলেন, একটি মেয়ে গিয়েছে তো কী হয়েছে? জীবনে আরও কত মেয়ে আসবে এখন বাছাধন একটু পড়াশোনায় মন দাও। আস্কারা জিনিসটা এই 'পারমিসিভ' সমাজে বড্ড বেশি দেওয়া হয়—বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে।"

"আগে কলেজের অধ্যাপকদের একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ছিল। পাছে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভায়ে তাঁরা নাইট ক্লাবে যেতেন না। এখন মাস্টারমশায়রা ছাত্রীদের সঙ্গে 'অ্যাফেয়ার' চালাচ্ছেন! দু' পক্ষই সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠছে—সান্নিধ্যের বদলে ছাত্রীরা মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে পরীক্ষায় ভাল গ্রেড চায়। ইংরিজিতে একেই বলে, মিউচুয়ালিটি অফ কনভেনিয়েনস্।"

ছাত্রীরা জ্যোতির্ময়ের স্ত্রী বকুলের কাছে এসে গুজ-গুজ ফিস-ফিস করে—কোন প্রফেসর কোন্ ছাত্রীকে বগলদাবা করেছে। কোনো মেয়ে বিশেষ অধ্যাপক সম্বন্ধে বলে, "ওঁর কাছে পি-এইচ-ডি করবো না, ওঁর ভাবগতিক ভাল নয়!"

"পারমিসিভনেস এই জাতটার গোড়াতে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে—অথচ কেউ এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না।" এই বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন জ্যোতির্ময় মিত্র।

জ্যোতির্ময়কে বললাম, 'বন্ধু বীরেন ঘোষ ছাড়া কুড়ি বছরের ব্যবধানে আমেরিকায় এবার একমাত্র আপনার সঙ্গেই দেখা হলো। কুড়ি বছর আগে তোলা নিজের ছবিটা দেখে নিজেকেও খানিকটা খুঁজে পেলাম।"

সুরসিক জ্যোতির্ময় বললেন, "যখন এসেছেন তখন মুখ বন্ধ রেখে চোখ কান ও মগজ তিনেরই সদ্ব্যবহার করুন। এই দেশে কোনো কিছুই স্থির নয়, শুধু আপনাকে অতি সাবধানে দেখতে হবে কোন্‌টা এগোচ্ছে আর কোন্‌টা পিছনের দিকে ছুটছে।"

পুরো একদিন মিছরিদা ডাউন! নিউ ইয়র্কে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বিছানাবন্দী। তবু আজ আমার সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন—নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা হবে।

আমি টেলিফোনে বলেছিলাম, "দু'দিনের জন্যে বিদেশে এসেছেন, বিদেশিদের সঙ্গে সময় কাটান। আমরা তো হাতের পাঁচ রয়েছি, দেশে ফিরে গিয়ে কাশুন্দেতে, বাজে শিবপুরে, ট্রাম ডিপোয় হরবকত দেখা হবে।"

মিছরিদা মজলেন না। বললেন, "ওরে, ওইভাবে তোর দর বাড়াস না। বিদেশ বিভুঁয়ে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ দেখা না হলে পেট ফুলে দম বন্ধ হয়ে যাবে—কত কথা জমে উঠছে বুঝতেই পারছিস।"

আমি টেলিফোনে নিচুগলায় বললাম, "কেন, আপনার ভাই, ভাই-ঝি, ভাই-বৌ হাতের গোড়ায় রয়েছে, ওদের একটু সঙ্গ দিন। ভাবের আদান-প্রদান হোক।

টেলিফোনেই মিছরিদা দুঃখ করলেন, "ওরে এখানে শুধু ভাবের আদান-প্রদানের তেমন চান্স নেই—এমন মন্ত্রীপাক এখানে যে ভাটপাড়ায় ভট্চার্য্যিও কয়েকদিনে আমেরিকান হয়ে যাবে। মোহিনীমায়ায় অপরকে পটিয়ে নিজের করে নিতে এদেশের তুলনা নেই। প্রতি মুহূর্তে সাবধানে থাকতে হবে।"

মিছরিদাকে বলেছিলাম, ম্যানহাটানের কোনো কফিশপে দেখা হোক। কিন্তু মিছরিদার ওই যে সেন্ট্রাল পার্কের ওপর টান জন্মেছে তার থেকে মুক্তি নেই। বললেন, "বড্ড পুণ্যস্থান, স্বয়ং ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ কেত্তন গেয়ে প্রেমের বন্যা বইয়ে জায়গাটাকে পাপমুক্ত করেছেন।"

আমি পার্কের মধ্যে একটা বেঞ্চিতে বসে মিছরিদার জন্যে অপেক্ষা করছি। সামনের বেঞ্চিতে এক কমবয়সী সুতনুকা শ্বেতাঙ্গিনী হাতে একখানা বই নিয়ে মাঝে-মাঝে পাতা উল্টোচ্ছে।

মহিলার টিশার্টের দিকে তাকাবার উপায় নেই! বুকের ওপর মুচমুচে ইংরিজিতে যা লেখা রয়েছে তার অর্থ হলো : "কি ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছো! এসো, আমাকে পটাও।"

মনে পড়লো, ক্লিভল্যান্ডের শ্যামল রায় বলেছিল, "আমেরিকানদের মতন এমন রসিক জাত দুনিয়ায় খুঁজে পাবেন না। গাঁটের কড়ি খরচ করে এরা নিজের সম্বন্ধেই ভাঁড়ামি করে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে তা যদি কেউ সরলমনে বিশ্বাস করে এবং সেইমতো এগোয় তাহলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।"

আসলে সারাক্ষণ এখানে ইন্দ্রিয়কে সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে—সেই সুড়সুড়িতে যদি মজেছো তো মরেছো। সরল আফ্রিকান ছেলেরা অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। ইন্ডিয়ানরা অনেক ঘাগী—দু-তিন হাজার বছরের সামাজিক অভিজ্ঞতা ওদের অনেক বেশি মানিয়ে চলবার শক্তি জোগায়।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি মাঝে-মাঝে। আর ভাবছি এইটুকু-টুকু মেয়ের কি গার্জেন নেই? তাঁরা কি দেখেন না মেয়ে কি জামাকাপড় পরছে? শ্বেতাঙ্গিনী বালিকাও একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বই বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো, "ওয়েটিং ফর সামবডি?"

"হ্যাঁগো, মা লক্ষ্মী। আমার খোদ দেশের লোক এখনই হাজির হবে।"

"পা-কি-স্তা-ন?" সুন্দরীর সকৌতূহল প্রশ্ন।

"কোন্ দুঃখে ভট্চার্য্যি বাউনের সন্তান পাকিস্তানি হতে যাবে? বেঁচে থাক আমাদের ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত।"

"ইন্ডিয়া!" মার্কিনী বালিকার কণ্ঠে বিস্ময়। "আমি তো ইন্ডিয়াতেই যেতে চাই।"

খুব ভাল। এসো মা লক্ষ্মী, পকেটমার পাঁচতারা হোটেলে থাকো, আমাদের দেশ দ্যাখো, নকল গয়নাগাঁটি কেনো, ডবলদামে কার্পেট সংগ্রহ করো—এসব তো খুব ভাল কথা।

মার্কিনী বালিকা বললো, "তোমরা মেয়েদের অপছন্দ করো কেন?"

"বালাই ষাট! কোন দুঃখে আমরা মেয়েদের অপছন্দ করবো? আমাদের দেশটাই তো মাতৃপূজার দেশ—মেয়েদের মাথায় করে রাখবার পরামর্শ মুনি-ঋষি থেকে আরম্ভ করে একালের সাধু-সন্ন্যাসী পর্যন্ত সবাই সারাক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন"।

বালিকা সরলমনে আমার দিকে তাকালো। "তাহলে বলতে চাইছো, নববিবাহিতা বধূদের পুড়িয়ে ফেলতে তোমরা আনন্দ পাও না?"

"ওসব খবরের কাগজের প্রোপাগাণ্ডা। কোথায় সামান্য কি একটা হয়ে গেলো, আর সেই নিয়ে হৈ চৈ বাধালো কাগজের সাংবাদিকরা। যেমন আমরা শুনি, এদেশের ঘরসংসার বলতে কিছুই থাকছে না ; বিয়ে ভেঙে ঝাড়া হাত-পা হবার জন্যে নাকি হনিমুনের পরের দিন থেকেই উঁচিয়ে আছে।"

মেয়েটি হেসে উঠলো। "জানো আমার দাদু-দিদিমার গোল্ডেন ম্যারেজ অ্যানিভারসারি হচ্ছে আগামী নভেম্বরে?"

"তুমি কি নিউ ইয়র্কের লোক?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"মোটেই না। আমি মিড-ওয়েস্ট থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি।"

"সে কি! বাবা-মাকে সঙ্গে আনোনি?"

"আমি কোথায় যাবো, কি করবো, কেমন ভাবে থাকবো, তার সঙ্গে আমার

বাবা-মায়ের সম্পর্ক কি? জীবনটা আমার, না আমার বাপ-মায়ের?” স্বর্ণকেশীর ঝাঁকড়া মাথা ঝলমল করে উঠলো।

“তুমি একলা-একলা এইভাবে ঘুরে বেড়াও? ভয় লাগে না?”

তামারা হা-হা করে হেসে উঠলো। ইতিমধ্যে সে আমার পরিচয়ও কিছুটা নিয়েছে। হিসেব করে দেখেছি, আমার বড় মেয়ে ও তামারা একবয়সী।

তামারা জিজ্ঞেস করলো, “ইংরিজীতে অনার্স পড়া তোমার মেয়ে কি কোনো স্বাধীনতা এনজয় করে না?”

“ফ্রিডম বলতে কি বোঝায়, তার ওপর সব নির্ভর করছে, তামারা।” আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

তামারা বললো, “আমরা এই একুশ বছর বয়সটা আমার ফিরে আসবে না—সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নেবো কিভাবে এই সময়টা আমি উপভোগ করবো। তোমার মেয়ের কি তার একুশ বছরের ওপর কোনো অধিকার নেই?”

আমার মেয়ের সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে না এলে আমরা চিন্তিত হই শুনে তামারা খিল-খিল করে হেসে উঠলো। “কাম অন্” আমার সঙ্গে রসিকতা কোরো না! তুমি নিশ্চয় বলতে চাইছো না, তোমার মেয়ে কখন বাড়ি ফিরবে তার সুইট উইলের ওপর নির্ভর করে না।”

আমি নির্বাক। তামারা বললো, “গত ছ' সপ্তাহে আমি একবার মাত্র ফোনে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আগামীকাল কোথায় থাকবো তা আমি নিজেই জানি না। নিউ ইয়র্কে এক বান্ধবী আছে। তাকে একটু আগে অফিসে ফোন করেছিলাম। সে বললো বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বিকেল পাঁচটায় ডেটিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যদি সেটা শেষ মুহূর্তে ভেস্তে না যায় তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। একটু পরে আবার ফোন করবো।”

“গতকাল কোথায় ছিলে?”

“বোস্টনে। সারাদিন মিউজিয়মে ছবি দেখেছি।”

“আজ যদি বান্ধবী সময় না দিতে পারে?”

“কিছু এসে যায় না, কারণ দোষটা আমার। পুরুষবন্ধুর সঙ্গে ডেটিং ছেড়ে কোনো মেয়ে আমার পিছনে সময় নষ্ট করুক তা আমি নিজেই চাইবো না। আমি কোনো একটা দূর পাল্লার বাস-এ চড়ে বসবো। নিউ ইয়র্ক ছেড়ে শ'তিনেক মাইল দূরে কোথাও নেমে পড়বো, সেখানেই একটা মোটেলে রাত্রি কাটিয়ে দেবো।”

“তারপর?”

তামারা বললো, “মিস্টার ইন্ডিয়ান, ‘তারপর’ এখনও অনেক দূর—মোটেলে রাত্রিবাস করি, ভোর হোক, কফি খাই, তারপর ভাবা যাবে। এই নিউ ইয়র্কের সমস্যা কি জানো? অতিমাত্রায় উচ্চাভিলাষী লোকরা এমনভাবে আগাম

পরিকল্পনা শুরু করে যে মৃত্যুকেও আসতে হবে আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে! এদের জন্যে আমার দুঃখ হয়।"

"তোমার বাপ-মা কিছু বলেন না?"

"কী বলবেন? জীবনটা আমার, তাঁদের নয়। তাঁদের জীবন তাঁরা কীভাবে চালাতে চান তা তাঁরা ঠিক করুন।"

আরও কিছু কথাবার্তা হলো। তামারা কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমাকে আক্রমণ করতে লাগলো, নিজের মেয়ের ব্যাপারে আমরা কেন এতো বেশি নাক গলাই? "মেয়েকে তোমরা ছেড়ে দেবে না কেন? সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে তাকে বাড়ি ফিরতে হবে কেন?"

দূর থেকে মিছরিদাকে দেখা গেলো। এ কি সাজ মিছরিদার আজ!

"মিছরিদা, আপনিও!" আমি না বলে পারলাম না।

একগাল হেসে মিছরিদা বললেন, "তুই আমার নিউ ড্রেশ দেখে অবাক হচ্ছিস! এ-সবই আমার ভাইঝির ষড়যন্ত্র। ভাবী জামাইবাবাজী আমার নামাবলী, পাঞ্জাবী, ধুতি এইসব নিয়ে আমাকে এই টি-শার্ট এবং জিন্‌স উপহার দিয়েছে।"

"টি-শার্ট পরুন! কিন্তু তাই বলে তার ওপরে ওইসব কথা লেখা থাকবে?"

"ওরে আমার অবস্থাটা একটু বিচার-বিবেচনা কর! আমাদের দেশে যত নোংরা কথা লোকে টয়লেটের দেওয়ালে লেখে, আর এখানে ওইসব কথা দিয়েই টি-শার্ট তৈরি হয়। আমাকে দু'খানা শার্ট দেখালো জামাইবাবাজী। একটাতে লেখা—"আমাকে চাবুক মারো, ধোলাই দাও', আর একটাতে লেখা 'লাভ'। ভাবলুম চাবুক খাওয়া থেকে প্রেম চাওয়া ঢের ভাল।"

"মিছরিদা আপনার বয়স অনেক হলো—এখন বুকের ওপর এই 'লাভ'-এর ছাপ নিয়ে আপনি হাওড়া কাশুন্দেতে বাজার-হাট করতে পারতেন?"

ঠোঁট উল্টোলেন মিছরিদা। "বুঝছি তো সব। কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার। এখানে এখন স্পেশাল দোকান হয়েছে—তুই যা অর্ডার করবি তাই ফটাফট টি-শার্টের ওপর লিখে দেবে। এই যে 'লাভ'-মার্কা টি শার্ট নিলাম তার একটা কারণ-এর দাম সবচেয়ে বেশি।"

"কারণ কী, কাপড়টা বেশী দামী?"

"ধীরে বৎস ধীরে। একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে থেকে আমি অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করেছি। ভাবী জামাতাবাবাজীর এক বান্ধবী 'মার্কিন সমাজে প্রেমের প্রকাশ' সম্পর্কে গবেষণা করছে, তারই একটা পরিচ্ছেদ আমাকে গতকাল পড়তে দিয়েছিল। তার মুখেই শুনলাম, আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন চিন্তিত হয়ে উঠেছেন যে পুরুষমানুষরা জন্মদিনে খুবই কম

'লাভ' পাচ্ছেন, ছোট ছেলেদের কপালে 'লাভ' জুটছে আরও কম।"

"সাধে কি আর নদের নিমাইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ছে এই দেশে! প্রেমের দেশে প্রেমখরা হলে একদিন প্রেমবৃষ্টি নামবেই প্রেমকীর্তনের মাধ্যমে।"

"ব্যাপারটা কী, মিছরিদা?" আমি একটু ব্যাখ্যা চাইছি।

মিছরিদার উত্তর : "খুব সোজা ব্যাপার। গ্রীটিং কার্ডের বাণী এবং টি-শার্টের ওপর কী লেখা হচ্ছে তা নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছেন সমাজতাত্ত্বিকরা। মার্কিনীদের মন কোন্ দিকে যাচ্ছে তা ওইসব লেখা থেকেই নাকি বোঝা যায়।"

"মিছরিদা, বড়দিনে, জন্মদিনে, বিবাহবার্ষিকীতে, অসুখ করলে এবং যে কোনো স্মরণীয় দিনে আমেরিকানরা গ্রীটিং কার্ড কিনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পাঠায়, ব্যাপারটা সামান্য জিনিস।"

চোখ বড়-বড় করলেন মিছরিদা। "মোটেই সামান্য জিনিস নয়। ভবিষ্যৎ জামাতাবাবাজীর পাঠানো প্রতিবেদন পড়ে জেনেছি—আমেরিকানরা মুখোমুখি অথবা চিঠির মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে ক্রমশই অপারগ হচ্ছে ; অথচ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্করক্ষায় ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাকি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই দেশজুড়ে এই গ্রীটিং কার্ডের ব্যবসা রমরমা হচ্ছে। কার্ড কোম্পানিরা লাখ-লাখ ডলার ফি দিয়ে দুঁদে মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ করছেন খুঁজে বের করবার জন্যে কোন সময়ে কোন কথা বললে মানুষের ভাল লাগে। সেই সব কথা দিয়ে কার্ড তৈরি হচ্ছে—চলছে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা। কার্ডের দোকানে গিয়ে মুখচোরা আমেরিকান খুঁজছে কোন কথাটা প্রাপকের ভাল লাগবে।"

"ধর, এই 'ভাল-হয়ে ওঠো' (গেট ওয়েল) কার্ড। তোর যদি ম্যালেরিয়ার দেড় সপ্তাহ আপিস যাওয়া বন্ধ থাকে তাহলে যে-কার্ড ভাল লাগবে, হাঁটুর হাড় ভাঙলে সে-কার্ড না-ও ভাল লাগতে পারে। যদি ব্রেনে টিউমার সন্দেহে হাসপাতালে বন্দী থাকিস, তাহলে 'চটপট সেরে উঠে বাড়ি এসো' বউয়ের কাছ থেকে এই কার্ড তোর নিষ্ঠুর রসিকতা মনে হতে পারে। প্রত্যেক অবস্থার সাইকোলজি বুঝে কার্ড লিখছেন দেশের সেরা বুদ্ধিজীবীরা, তবেই না কার্ড কোম্পানির বিক্রি তরতর করে বেড়ে যাচ্ছে। হাওড়া কাসুন্দেতেও লোকের অসুখ করে কিন্তু সেখানে ব্যাপারটা অনেক সোজা। একখানা পঁয়ত্রিশ পয়সার ইনল্যান্ড ফর্মে লিখলেই হলো, 'ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন'। এখানে মঙ্গলময় ঠাকুর, শ্রীভগবান এসব কথা জীবিত অবস্থায় কেউ তেমন শুনতে চায় না। তাদের প্রত্যাশা রসিকতার মারপ্যাঁচ, যার মধ্যে থাকবে সাইকোলজির মশলা।"

মিছরিদা বললেন, "কার্ড কোম্পানি টু-পাইস কামাবার জন্যে কোন্ বছরে

কোন্ কার্ডে কী লিখছে তার ওপর নজর রাখছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের বাঘা-বাঘা গবেষক ও গবেষিকারা। যেমন ধর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ওয়েস্টার্ন লুইসিয়ানা। এঁরা প্রায় হাজারখানেক কার্ডের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ভালবাসার প্রকাশের ওপর আমেরিকান সমাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও কার্ডে 'লাভ' কথাটা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। 'ভালবাসা নাও' অথবা 'তোমার ভালবাসা আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে' এরকম কোনো ইঙ্গিতই এ-বছরে পাওয়া যাচ্ছে না কার্ডের বাজারে।"

"ভালবাসার হিসেব-নিকেশ কি ওইভাবে করা যায়, মিছরিদা?" আমাকে বলতেই হলো।

"এ-জাত তো সব কিছুই হিসেব করে গ্রহণ করে, ব্রাদার। সমাজে কোথায় সামান্য কি পরিবর্তন হচ্ছে তা গবেষকরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছেন। শোন্, এই কার্ডের ব্যাপারে পণ্ডিতরা কী দেখতে পাচ্ছেন? মেয়েরা এখনও কার্ডে কিছু 'লাভ' পাচ্ছেন, কিন্তু পুরুষ মানুষরা যে-সব কার্ড পাচ্ছেন তাতে 'লাভ' নেই বললেই হয়। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়—যেমন বাবা, ভাই, ছেলে—এঁদের 'লাভ' জানাবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, কারণ দোকানে ওই ধরনের কার্ড রাখাই হচ্ছে না। দোকানিদের বক্তব্য, পুরুষদের মন অনেক শক্ত, তাঁদের সাধারণত 'লাভ' জানানোর রেওয়াজ নেই এ-বছরে।"

"মিছরিদা, এ-দেশের পুরুষমানুষরা তাহলে কি জীবনের স্মরণীয় দিনগুলোতে 'লাভ' থেকে বঞ্চিত থাকবে?"

মিছরিদা বললেন, "আমিও ওইরকম দুশ্চিন্তা করছিলাম। ভাবী জামাতাবাবাজী তখন ওঁর বান্ধবী গবেষককে ফোন করলো, রহস্যটা কী? তারপর একগাল হেসে জানালো, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটা জিনিস আবিষ্কার করেছেন। প্রায় সব কার্ডের দাম নব্বই সেন্ট, কিন্তু 'লাভ'-এর উল্লেখ থাকলেই কার্ডের দাম হয়ে যাচ্ছে এক ডলার দশ সেন্ট। আমেরিকানরা ভীষণ হিসেবী জাত—স্রেফ বাপকে ভালবাসা জানাবার জন্যে তারা কুড়ি সেন্ট বাড়তি খরচ করতে রাজি নয়। যতক্ষণ না ভালবাসার কার্ডের দাম কমছে ততক্ষণ ভালবাসা না-জানিয়েই ছেলেমেয়েরা চালিয়ে দেবে।"

"মিছরিদা, আপনার টি-শার্টে আজে-বাজে যাই লেখা থাকুক, আপনার বয়স এখন কুড়ি বছর কমে গিয়েছে।"

মিছরিদা খুশি হলেন। বললেন, "আরও দশ বছর কমতো, যদি না এখানকার কয়েকটা হাঙ্গামায় মাথা ঘুরে যেতো।"

"বিদেশে কীসের হাঙ্গামা, মিছরিদা?"

"এই বিয়ের ব্যাপার ধর। লক্ষ কথা না হলে ইন্ডিয়াতে বিয়ে হয় না তা

দুনিয়ার সবাই জানে। আমি শুনেছিলুম, বিয়ে-শাদির ব্যাপারে এদেশের লোকদের ওপর তত লৌকিকতার চাপ নেই। ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে বলে বাপ-মায়ের ছ'মাসের ঘুম চলে গেলো ওসব কারবার এদেশে নেই। আমাদের অবশ্য অন্য ব্যাপার। আমি কাশুন্দে থেকেই চিঠি লিখে আমার ভাই বাতাসাকে বলেছিলুম, বিদেশে নিজের কন্যাদায় সারছো বলে লোক লৌকিকতার যেন খামতি না হয়। সেই মতন এই নিউ ইয়র্ক থেকে পৌনে-তিনশ আত্মীয়কে এয়ারমেলে নেমন্তন্নর চিঠি ছেড়েছে আমার ভাই এবং ভাই-বউ। চিঠি হয়েছে বড়দার নামে—যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর ইত্যাদি—সায়েব পাত্রপক্ষের বংশপরিচয় ইত্যাদিও দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ার আত্মীয়রা কেউ আসবে না, তবু চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভাবী জামাইবাবাজী নিজেই অনেক চিঠির খাম লিখেছে। যদিও আমি বলেছি ভাবী জামাইকে দিয়ে কেউ এসব কাজ করায় না।"

মিছরিদা বললেন, "তারপর ভাই-বউয়ের কাছে যা গল্প শুনলাম, তাতে বেশ ভয়-ভয় করতে লাগলো। বিয়ে যারই হোক, কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তা চিরকাল আমিই ঠিক করে এসেছি। দাদার তিন মেয়ে, দুই ছেলে ও আমার দুই ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত আত্মীয়দের তালিকা আমিই তৈরি করেছি। পৌনে তিনশ পরিবারের মধ্যে আড়াইশ নাম-ঠিকানা স্মৃতি থেকেই লিখে দিতে পারি। এ-বারেও তাই করেছিলাম।"

কিন্তু ভাই-বউ বললো, "এই ওয়েডিং গেস্ট-এর তালিকা তৈরি নিয়ে আমেরিকান সমাজে বেশ উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে। ভাই-বউয়ের ছোটবোনের বিয়েতে ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল।"

"তালিকা নিয়ে খিটিমিটি আজকাল দেশেও হচ্ছে মিছরিদা। সবাইকে আর নেমন্তন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না।"

মিছরিদা বললেন, "হাওড়ায় মতবিরোধ হলে তুই হয়তো বউমার সঙ্গে একদিন কথা বললি না, কিংবা বাড়িতে গম্ভীর হয়ে বসে রইলি। এখানে কী হচ্ছে জানিস?"

আমি মিছরিদার মুখের দিকে তাকালাম। এখানে যা হয় তা একটু স্টাইলেই হয় তা আন্দাজ করতে পারছি।

মিছরিদা বললেন, "বিবাহোৎসবে অতিথি নির্বাচনের চাপ সহ্য না করতে পেরে আমেরিকানরা ছুটেছে সাইকোলজিস্ট অথবা সাইকোথেরাপিস্টের কাছে!"

বিয়ের কার্ডের ব্যাপারে সাইকোলজিস্টরা কী করবেন?"

"এদেশের সাইকোলজিস্টরা ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সব ব্যাপারে আছেন! আমাদের দেশে গুরুদেবের ভূমিকাটি নিয়েছেন এই সাইকোলজিস্টরা। তোর

জন্যে একটা কাগজের কাটিং এনেছি, রেখে দে কোনো সময়ে তোর কাজে লেগে যাবে। বুঝবি, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের লিস্টি তৈরি করা কত কঠিন ব্যাপার।”

সংবাদপত্রের কাটিং পড়ে ফেললাম। ক্যাথ মেয়ার (৩২) এবং ডঃ ডোনাল্ড জেমস (৩৬) খুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে ভোজসভার অতিথি তালিকা পাকা করতে গিয়ে। প্রথম তালিকায় ২৮০ জনের নাম উঠেছে—কেটেকুটে ১০০ করতে হবে। ভাবী বধূ বলেছে, ১০০ জনের বেশি লোককে তার বাবা-মা আপ্যায়ন করতে পারবেন না। বরের দুশ্চিন্তা, যাঁদের নেমন্তন্ন করা হবে না তাঁরা হয় রেগে যাবেন, না হয় মনোকষ্ট পাবেন। নবজীবনের শুরুতেই এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের অধঃপতন হবে এবং বন্ধুত্ব নষ্ট হবে।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট মেরিলিন রুমানের মতে, চিন্তারই ব্যাপার। বিয়েতে নেমন্তন্ন না পাওয়ায় অনেক সম্পর্কে শোচনীয় অবনতি হচ্ছে, অনেক বন্ধুত্ব চিরদিনের মতন নষ্ট হচ্ছে।

ডঃ ম্যাগডফ আমেরিকার আর একজন খ্যাতনামা সাইকোথেরাপিস্ট। তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন—লিস্টি বানাবার সময় নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে সম্পর্কটা খতিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু এই মূল্যায়ন সোজা কাজ নয়, মনের ওপর বেশ চাপ পড়ে। প্রথমে দেখতে হচ্ছে, লোকটি আমার কতখানি আপনজন। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনে তাঁর উপস্থিতি কতখানি কাম্য তাও হিসেব করে দেখতে হবে এবার।

আরেকজন সাইকোলজিস্ট বলছেন, আগেকার দিনে বিয়েতে নেমন্তন্ন করা হতো আত্মীয়স্বজন এবং ছেলেবেলার বন্ধুদের। কিন্তু এখন কর্মক্ষেত্রের সহকর্মীদের এবং অন্য বন্ধুদেরও বলবার প্রয়োজন হচ্ছে। আগে ভোজসভার খরচটা দিতেন কনের বাবা-মা, ফলে তাঁরাই ঠিক করতেন, কাকে নেমন্তন্ন করা হবে, কাকে করা হবে না। এখন যাদের বিয়ে তারাই ভোজের খরচ বহন করছে, ফলে তারাও চাইছে অতিথি তালিকা প্রস্তুতিতে তাদের মতামত থাকবে।

ডঃ জোন ম্যাগডফ বলছেন, এখন অতিথি নির্বাচন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বাবা-মায়ের প্রায়ই খটাখটি লাগছে। “বর কনে অভিযোগ করছে, চান্স পেয়ে কনের মা তাঁর তাসের আড্ডার বান্ধবীদের ডাকছেন, বরের বাবা নেমন্তন্ন পাঠাতে চাইছেন তাঁর ব্যবসায়িক সহযোগীদের। বর এবং কনে ডাক্তারের কাছে অভিযোগ করছেন, বাবা-মা তাঁদের সামাজিক দায়গুলো ফোকটে ছেলেমেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন!”

সাইকোলজিস্টরা মোটা ফিয়ের বদলে ভুক্তভোগীদের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, “ধৈর্য হারালে চলবে না। বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করে, ওঁদের একটা ছোট্ট

কোটা দিয়ে দাও—ওই সংখ্যার মধ্যে ওঁরা যাঁকে খুশি তাঁকে নেমন্তন্ন করুন। তালিকার সিংহভাগ রেখে দাও পাত্র-পাত্রীর পছন্দসই অতিথিদের জন্যে।”

একজন বিশেষজ্ঞ মাথা খাটিয়ে আর-এক পথ বের করেছেন। “যাদের নেমন্তন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের আলাদা-আলাদা চিঠি দিয়ে জানাও, খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্থানাভাববশত বিবাহবাসরে নেমন্তন্ন করা সম্ভব হলো না—ত্রুটি মার্জনীয়।”

ডঃ ম্যাকলোউইটস নামে ধুরন্ধর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর চেম্বারে রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন—খানাপিনা একদিনে শেষ না করে এক-এক দলকে এক-এক দিনে আসতে বলো। নিকট আত্মীয়রা ও প্রিয় বন্ধুরা আসুক বিয়ের দিন, পাত্রীর অফিসের সহকর্মীরা বিয়ের আগেই একটা লাঞ্চে যোগ দিক, পাত্রের ছোটবেলার ইয়ার বন্ধুরা বিবাহলগ্নের এক সপ্তাহ আগে আইবুড়ো পার্টিতে আসতে পারে আর কিছু সুনির্বাচিত দম্পতি আসুক নতুন দম্পতির নতুন ফ্ল্যাটে, ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চের মাঝামাঝি সময়ে, আমেরিকান ইংরিজিতে যাকে বলে ‘ব্রাঞ্চ’।

এইভাবে দল ভাগ করে দেওয়া নাকি অন্য কারণেও যুক্তিযুক্ত। একজন সাইকোলজিস্ট সাবধান করে দিচ্ছেন—“বিয়ের দিনে আপনার অফিসের বড়কর্তা আপনার মায়ের কাছ থেকে ছোটবেলায় আপনি কীরকম দুষ্টু ছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ শুনতে খুব উৎসাহী না হতে পারেন। তার বদলে বড়কর্তা হয়তো আপনার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে ডিনারে এসে আপনার স্বামীর অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে টেনিস সম্পর্কে ভাবের আদানপ্রদান করে আনন্দ পেতে পারেন।”

মিছরিদা বলেন, “আমেরিকানরা বড্ড মেথডিক্যাল জাত। যা কিছু করে, তা কেন করছে তা খতিয়ে দেখে নেয়। বল দিকি, বিয়েতে আমরা লোকজনকে নেমন্তন্ন করি কেন?”

আমি মাথা চুলকে উত্তর দিলাম, “না, করে উপায় নেই তাই লোকে নেমন্তন্ন পাঠায়—যাকে বলে কি না দায়মুক্ত হওয়া।”

“হলো না”।

মিছরিদা শুনিয়ে দিলেন, “তুই যদি ফি দিয়ে এই বিষয়ে আমেরিকান সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে যাস, তা হলে তিনি তোকে চুপি-চুপি পরামর্শ দেবেন—শুভদিনে কে কে এলো নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এটাই বড় কথা নয়, আসল কথা হলো যাদের তুমি ভালবাসো, যারা তোমায় ভালবাসে তোমার জীবনের স্মরণীয় দিনে তোমার আনন্দ ভাগ করে নেবার সুযোগ তাদের দিলে কি না।”

আমি বললাম, “সবই বুঝলাম মিছরিদা, কিন্তু এইসব পরামর্শ দেবার জন্যে

আমাদের দেশে কেউ ফি চার্জ করে না।"

"করে না বোকা বলে! একটু ধৈর্য ধর, এমন দিন আসছে যখন আমাদের হাওড়া-কাশুন্দেতেও বিনা টাকায় কেউ কোনো পরামর্শ দেবে না। আমার ভাই বলছিল, সব ভালবাসা ফ্রি পেয়ে-পেয়েই বাঙালি জাতটার টুয়েলভ-ও-ক্লক বেজে গিয়েছে।"

নিউ ইয়র্কের পরে আমেরিকার এই শহরে যিনি আমাকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর বাড়িটি নয়নাভিরাম। বেঁচে থাক এদেশের স্থপতিরা। প্রবলা-প্রকৃতির বিভিন্ন দৌরাত্ম্যের কথা স্মরণে রেখেও এঁরা শহরতলিতে যে-সব বাড়ি তৈরি করে চলেছেন তা শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, প্রতিটি যেন অতুলনীয় শিল্পকর্ম।

ক্লিভল্যান্ডের সুনন্দা দত্ত একবার বলেছিল, প্রকৃতি যেমন এদেশের মানুষকে উজাড় করে দিয়েছে, মানুষও তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয় জমিয়েছে সর্বত্র। "অথচ এদেশে প্রকৃতিকে ভালবাসতে গেলে অনেক গতর খাটাতে হয়। তার ওপর আছে শীতের দোর্দণ্ড দাপট।"

আমি যেখানে আশ্রয় নিয়েছি তাঁদের বাড়ির পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা—সেখানে ঘন সবুজের সমারোহ। দিশি মাপে প্রায় একখানা ফুটবল খেলার মাঠ। এই মাঠে ঘাসের কার্পেট বসবাসযোগ্য রাখবার জন্যে পরিবারের সভ্যদের যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রমটা বৃথা যায় না। মনে হয় যেন রূপকথার রাজ্যে বসবাস করছি—যার নমুনা আমাদের দেশের হতভাগ্য মানুষরা একমাত্র রূপালী পর্দায় হিন্দী সিনেমার নায়ক-গৃহ ছাড়া যা কোথাও দেখতে পান না। বেঁচে থাক বোম্বাই সিনেমা—এঁদের দয়ায় অল্প খরচে মানুষ কয়েকঘণ্টা অন্তত স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়।

আমার গৃহস্বামী বাড়ির বাগানে দোলনার ব্যবস্থা রেখেছেন। দুর্বল মুহূর্তে বলেছিলেন, "চাঁদনী রাতে এই দোলনায় দুলতে দুলতে আমরা দেশের ঝুলন পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখি।"

লজ্জায় যা গৃহস্বামীকে বলতে পারলাম না, গুপ্তপ্রেস পাঁজির পাতা ছাড়া আর কোথাও বহু বছর ধরে শহরবাসী বাঙালিরা ঝুলন পূর্ণিমার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পায় না। গ্রামে মানুষের দোলায় দুলবার জায়গা আছে, সুযোগ আছে কিন্তু মানসিকতা নেই। অভাবে-অনটনে পৃথিবী সত্যি গদ্যময়—পূর্ণিমার চাঁদ

ঝলসানো রুটি না-হলেও, কবি চিত্রতারকাদের বিলাসের সামগ্রী।

গৃহকর্ত্রী অনুরাধা এক নম্বর বঙ্গললনা বলতে যা বোঝায়, তাই। বাঙালি বধূর বুকের মধুর সঙ্গে যখন মার্কিনী নৈপুণ্য মিশে যায় তখন সে এক অপরূপ সৃষ্টি—পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। যে-বাঙালিনী একুশ বছর পর্যন্ত কলকাতার রান্নাঘরে কয়লার উনুনের বেশি কিছুর সঙ্গে পরিচিতা হয়নি, সে কেমনভাবে পরবর্তী আট-ন' বছরে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক ও মেকানিক্যাল সাজসরঞ্জামের ব্যবহারে এমন নিপুণা হয়ে উঠলো তা ভাবলে একটা জিনিসই বলা যায়, তা হলো এই দুনিয়ায় বাঙালি মেয়েদের তুলনা নেই। দেবী দশভূজাকে যে মহাঋষি প্রথম মানসনেত্রে কল্পনা করেছিলেন তিনি নিশ্চয় বাঙালি রমণীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট খবরাখবর রাখতেন!

অনুরাধার মতো শান্ত বাঙালিনীর গর্ভে কী করে এমন একটি দুরন্ত বেপরোয়া মার্কিন নাগরিকের জন্ম হলো তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। সাত বছরের এই মিনি মার্কিনীটির নাম জন, যদিও ওর মা দুঃখ করলেন, "নাম রেখেছিলাম, জয়ন্ত, কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে কী করে যে জন হয়ে গেল জানি না।" এমনি করেই জহর হয়েছে 'জো', অনাদি হয়েছে 'অ্যানডি' রণজিৎ হয়েছে 'র‍্যান', হরিন্দর সিং হয়েছে 'হ্যারি'—অমোঘ প্রকৃতির নিয়মে বৃহৎ সমাজ ছোট সমাজকে গ্রাস করে ফেলবেই একদিন।

স্নেহময়ী অনুরাধা সমস্তদিন ধরে শুধু আমার আদর-আপ্যায়নেই ব্যস্ত থাকেনি, আমার জামাকাপড় কেচে ইস্ত্রি করেছে, শোফারের দায়িত্ব নিয়ে স্থানীয় বাজার, পোস্ট অফিস ও ট্রাভেল এজেন্টের অফিস ঘুরিয়ে এনেছে। এই নিপুণা ড্রাইভারকে দেখে কে বলবে অনুরাধার বাপের বাড়ি এমন সরু গলিতে যেখানে রিকশা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের প্রবেশ অসম্ভব?

বেঁচে থাকুক এই এক্সপোর্ট কোয়ালিটির বাঙালি! এরা যদ্দিন আছে তদ্দিন বাঙালি একেবারে ভূগোল থেকে মুছে যাবে না। যদি মূল ভূখণ্ডে কোনো অঘটন ঘটেও যায়, তাহলে সমুদ্রের ওপার থেকে এই স্পেশাল বীজ আনিয়ে নতুন করে বাঙালি চাষ করা যাবে।

বিকেলের দিকে অনুরাধার একটি ব্যবহারের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। প্রায় অচেনা একজন দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-রমণী এমন সহৃদয়া, যে বার-বার আমাকে অন্তর থেকে বলছে এলেনই যখন বউদিকে নিয়ে এলেন না কেন, সেই অনুরাধা সাত বছরের ছেলের বন্ধুদের ব্যাপারে ইংরিজিতে যাকে বলে 'বরফ ঠাণ্ডা'। জয়ন্ত ওরফে জন বললো, "মা, পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের মাঠে খেলাধুলো করবো।"

এক মুহূর্তেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলো। জন রেগে উঠলো। "আমি আমার

বন্ধুদের আনতে চাই, মা।”

মায়ের কাটা উত্তর, “ইচ্ছে হলে তুমি একলা গিয়ে আমাদের মাঠে খেলো।”

“তোমার জানা উচিত, একলা খেলা যায় না।” জনের প্রতিবাদ।

“তাহলে পিয়ানো নিয়ে প্লে করো।”

“আমি খেলবো, মা।”

“এরকম করলে তোমার বাবাকে ফোন করতে হবে।” মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। জনের স্থানীয় বন্ধুরা কি অত্যন্ত দুষ্টু? তারা কি ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে দেয়? অনুরাধা কি চায় না, জন এই সব ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে? এই বয়সের বালককে সমবয়সী বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তা ভাল ফল হতে পারে না।

মা শেষ পর্যন্ত আড়ালে জনকে নিয়ে গিয়ে আরও কঠোর মনোভাবের ইঙ্গিত দিলেন এবং আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এমন সুন্দর মাঠে ছোটরা যদি না খেললো তা হলে এতো যত্নে বাগান করে লাভ কী হলো?

আমার সম্মানে আজ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলো গৃহকর্তা সুশান্ত সেন। সুশান্তর বাবা কলকাতায় ওকালতি করতেন। ওকালতির ওপর বিশ্বাস না থাকায় সুশান্ত প্রথমে অপারেশন রিসার্চে বিশেষজ্ঞ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এম-বি-এ। এদেশের ভাষায় এই ধরনের সফল উঠতি যুবকদের বলা হয় 'য়ুপি'। এরাই এখন আমেরিকান যুবতীদের নয়নের মণি এবং জনক-জননীর গর্ব।

সুশান্তর কাছে অনুরাধা যথাসময়ে জনের আব্দারের প্রসঙ্গ তুললো। আমি ভেবেছিলাম, পিতৃদেব অন্তত জনকে সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে নিজের মাঠে খেলতে অনুমতি দেবে।

কিন্তু সে-ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলো, “খেলতে দাওনি তো? খবরদার দিয়ে না। ঘটিবাটি বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে হতে পারে। জয়ন্তর খুব ইচ্ছে হলে অন্য কোনো বন্ধুর বাড়িতে খেলুক। বন্ধুর মায়েরা কীরকম চালাক হয়ে যাচ্ছে দেখেছো? সবাই চাইছে অন্যের মাঠে খেলা হোক। তুমি সোজা জনকে বলে দেবে, তোমার বাবা এতো বড়লোক না যে নিজের মাঠে তোমার বন্ধুদের খেলতে নেমন্তন্ন করবে।”

ব্যাপারটা যখন আমার বুদ্ধির বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন সুশান্ত বললো, “আপনি এখানকার হাসপাতাল দেখে বলেছিলেন, এদেশে যম ভয় করে ডাক্তারকে। কিন্তু ডাক্তাররা কাকে ভয় করে বলুন তো?”

“মাফিয়াদের?”

"হলো না। আর একটা সুযোগ দিচ্ছি!"

"খুব বেশি রোজগার হলে ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে?"

"হলো না। ডাক্তাররা একমাত্র যাকে ভয় করে তার নাম উকিল—আপনার বাবা, আমার বাবা যে-লাইনে ছিলেন। আমার বাবা তো একবার এদেশে এসেছিলেন। কাণ্ডকারখানা দেখে বললেন, তুই কষ্ট করে ল' ডিগ্রিটা নিয়ে নে। ভগবান তো এদেশটা উকিলদের জন্যেই তৈরি করেছেন!"

সুশান্ত বললো, "কলকাতায় যদি কেউ শোনে নিজের মাঠে আমি নিজের ছেলে বন্ধুদের খেলতে দিচ্ছি না, তা হলে ভাববে আমি আর একটি 'সেলফিশ জায়েন্ট', কিংবা আমার কোনো মাথার ব্যামো হয়েছে। কিন্তু এখানে সবাই আমার অবস্থাটা বুঝবে, বিশেষ করে যাদের বিষয়সম্পত্তি আছে।"

অনুরাধা বললো, "মামলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়। কিছু হয়ে গেলে, মোটা ক্ষতিপূরণের দায় যা আমাদের মতন মানুষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।"

"ভাই সুশান্ত, আমি সায়েব উকিলের বাবু হিসেবে হাইকোর্টে জীবন শুরু করেছিলাম, আর একটু আলো ফেলো।"

এবার সুশান্ত যা বললো তা এই রকম : মরিস ও রোজালিন্ড ফ্রিডম্যান পাড়ার ছেলেমেয়েদের তাঁদের বাগানে এসে যখন খুশি খেলাধুলা করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মত ছিল, আমাদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে রয়েছে, সবাই মিলে যত খুশি খেলুক বাড়ির পিছনের বাগানে। সিভিয়া বলে ন'বছরের একটি মেয়েও একদিন দোলনায় উঠেছিল এবং দোলনা ঠেলছিল পড়শী দুটি বোন—ডেবোরা ও লিজা রোজেনবার্গ। দোলনায় খেলতে গেলে যা হতেই পারে, সিলভিয়ার হঠাৎ পা ভেঙে গেলো। শ্রীমতী রোজালিন ফ্রিডম্যান সঙ্গে সঙ্গে সিলভিয়াকে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালেন এবং তাকে প্রতিবেশীর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে ভাবলেন হাঙ্গামা শেষ হলো।

কিন্তু তিন বছর পরে হঠাৎ ফ্রিডম্যান দম্পতি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, একটা মামলায় তাঁদের দু'জনের নাম অন্য অনেকের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যাঁদের বিবাদী করা হয়েছে তাঁরা হলেন বিখ্যাত সিয়ার্স রোবাক—যে দোকান থেকে দোলনাটা কেনা হয়েছিল এবং টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, যাঁরা দোলনাটি তৈরি করেছিলেন।

সিলভিয়ার বাবা-মায়ের অভিযোগ, মেয়ের হাড় জোড়া লাগাবার পরে পায়ের তেমন বাড় হচ্ছে না এবং অন্য পায়েও অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাতেও সিলভিয়ার ব্যথা থেকে যাচ্ছে। সিলভিয়া বলছে, "আমার শরীরে সারাক্ষণ যন্ত্রণা ও অস্বস্তি রয়েছে। আমার পিঠে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, আমাকে খোঁড়াতে হচ্ছে।"

সিলভিয়ার উকিল ফ্রেড কেলার আদালতে অভিযোগ করলেন, ফ্রিডম্যান দম্পতি যে দোলনা কিনে বাড়িতে বসিয়েছিলেন তার নকশায় ত্রুটি ছিল। ঠিক মত ডিজাইন হয়নি, তাই সিলভিয়ার পা দোলনার আসন ও নিচেকার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আটকে গিয়েছিল।

সিয়ার্স রোবাক ও টারকো কোম্পানির উকিল আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, "দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলভিয়ার ভুলের জন্য—যখন তার বসে থাকবার কথা তখন সে দোলনার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এবং ফলে সে পড়ে যায়।" ফ্রিডম্যান দম্পতির ছেলেমেয়েরা এবং রোজেনবার্গের মেয়েরা তাঁদের উকিলের মাধ্যমে বললো, তারা এই দুর্ঘটনার জন্যে মোটেই দায়ী নয়।

অঘটন ঘটেছিল ১৯৭২ সালে, মামলার নোটিশ এলো ১৯৭৫ সালে এবং এক দশক পরে ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে জুরিরা তিন সপ্তাহ ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা চালালেন এবং হুকুম দিলেন সিলভিয়াকে চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তিন কোটি টাকার ওপর। এর আশি ভাগ দেবে টারকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, কুড়ি ভাগ সিয়ার্স রোবাক—ফ্রিডম্যান ও পড়শী রোজেনবার্গ কোনক্রমে এ-যাত্রায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। কোম্পানি আপিল করবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু খরচ ও সময় বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হলো এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকায়। এর পুরোটা অবশ্য সিলভিয়ার পরিবারে যাবে না, তিন ভাগের এক ভাগ নেবেন তাঁদের উকিল ফ্রেড কেলার।

ফ্রিডম্যান দম্পতি বললেন, "নিজের মাঠে পাড়ার ছেলেমেয়েদের খেলতে দিয়ে বারো বছর ধরে আমাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। আমার মাত্র এক লাখ ডলারের ইনসিওরেন্স ছিল, যদি রায় আমাদের বিরুদ্ধে যেতো তাহলে আমাদের ভদ্রাসন বিক্রি হয়ে যেতো।"

অনুরাধা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বুঝছেন, কেন নিজের মাঠে পরের ছেলেমেয়েদের খেলার নামে আমি ভয় পেয়ে যাই? আপনার বাড়িতে কাউকে আতিথ্য দিলে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার, আমেরিকান উকিলরা বলছে!"

আমার কপালে ভোগান্তি ছিল! ভগবানের হাত! এসব কথা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকানরা মোটেই শুনতে রাজি নয়। তারা সবসময় উকিলের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লোভে। কার দোষে ব্যাপারটা ঘটেছে তা খুঁজে বের করা হচ্ছে। ভাল কেস থাকলে বিনাপয়সায় উকিল মামলা করবে। তারপর রায় বেরুলে ক্ষতিপূরণের টাকার ভাগ নেবে।

অনুরাধা বললো, "আমাদের দেশে হাসপাতালের অনেক ডাক্তার বেপরোয়া—যা খুশি চিকিৎসা করছেন, কারণ তাঁর কোনো দায় নেই। ওখানে

কেউ ডাক্তারবাবুকে কোর্টে টানে না। এখানে ঠিক উল্টো।

সুশান্তের সংযোজন, "দাদা, শুধু ডাক্তারবাবু কেন? এদেশের প্রত্যেকটি কোম্পানি, প্রত্যেকটি দোকানী, প্রত্যেকটি গেরস্ত ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে পাছে কোথাও কোনো দোষ বেরিয়ে যায়—তখন কত টাকা যে গুণাগার দিতে হবে তা কেউ জানে না। একটা মামলার ধাক্কায় একটা কোম্পানি লাটে উঠতে পারে। আজকাল বন্ধু-বান্ধবদের যখন বাড়িতে নেমন্তন্ন করি তখন নো হার্ড ড্রিংকস—আপনার বাড়ি থেকে খানাপিনা করে বেহাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়ি ফেরার পথে আপনার অতিথি যদি কাউকে ধাক্কা দেয়, তাহলে আপনি শুধু সমবেদনা জানিয়ে ছাড় পাবেন তা ভাববেন না।"

নিউ জার্সিতে এক দম্পতি নেমন্তন্ন করেছিলেন তাঁদের বন্ধুকে। কয়েক পেগ চড়িয়ে বন্ধু বাড়ি ফেরার পথে ধাক্কা মারলেন এক মহিলার মোটরগাড়িতে। নিউ জার্সিতে দম্পতির ওপর আদালতের হুকুম, ন'লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাও দরাজ আতিথেয়তার মূল্য হিসেবে। আইওয়া রাজ্যের সুপ্রিম কোর্টও ওইরকম রায় দিয়েছেন।

সুশান্ত বললো, "এইসব মামলার ব্যাপারে সমস্ত আমেরিকান পরিবার এখন অনেক খবরাখবর রাখে। মদের দোকানের অবস্থাও তথৈবচ। উকিলবাবুরা কড়া নজর রেখেছেন ওদের ওপর। মিশিগানের এক 'কাফে'তে মদ্যপান করে জনৈক খরিদ্দার রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে অ্যাক্সিডেন্ট করলো। কাফে মালিক নিহতদের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সুড়সুড় করে মামলা মিটিয়ে নিলেন।"

"অনেক দোকানের মালিক এই খবরটা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে, কেউ বাড়তি কয়েকটা পেগের জন্যে চাপ দিলে তাকে খবরটা দেখানো হয়।"

আমরা আবার উকিল-ডাক্তার সম্পর্কে ফিরে এলাম। সুশান্তর মতে 'পিছনে উকিল না লাগলে ডাক্তারদের পক্ষে এমন সুখের দেশ পৃথিবীতে নেই।" সুশান্তর বেশ কিছু ডাক্তার বন্ধু আছে। তাঁদের কাছে খবর ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রোগীদের মামলার সংখ্যা দশ বছরে ডবল হয়েছে।

চিকিৎসার বদলে অচিকিৎসা হয়েছে বলে এইসব মামলায় উকিলবাবুরা যে সব টাকা দাবি করে বসেন তা শুনলে আপনার-আমার ভিরমি খাবার অবস্থা হবে। ডাক্তারবাবুরা এই বলে শান্তি পাচ্ছেন, এই সব মামলার অর্ধেক শেষ পর্যন্ত আদালতে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু ভিতরের খবর হলো, গত কয়েক বছরে তিনশ সাতষট্টি জন আমেরিকান রোগী ডাক্তারের বিরুদ্ধে মামলা করে কোটিপতি হয়েছেন। জজসায়েবের দয়ায় তাঁরা নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছেন। উকিলবাবুদের সাহায্যে মামলাবাজ রুগীরা অসংখ্য মামলায় জিতছে, অথবা

ডাক্তারবাবুরা আদালতের বাইরেই মামলা মিটমাট করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মামলা প্রতি গড় খরচ পড়ছে প্রায় বিয়াল্লিশ লাখ টাকা। এই টাকা অবশ্য ডাক্তারবাবুরা নিজের তহবিল থেকে দিচ্ছেন না। দিচ্ছে তাঁদের ইন্‌সিওর কোম্পানি। বীমার প্রিমিয়াম হুড়মুড় করে বাড়ছে—উকিলের শনির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আমেরিকান ডাক্তারবাবুরা বছরে ইনসিওর প্রিমিয়াম দিচ্ছেন দু-হাজার দু'শো কোটি টাকার বেশি!

"ডাক্তারবাবুরা বলছেন, হ্যাঁ বাবা নিজের গতর ও বিদ্যে খাটিয়ে টুপাইস কামাই করি এদেশে, কিন্তু বীমা কোম্পানিই রোজগারের ছ'ভাগের একভাগ হজম করছে। তারপর রয়েছে বেইজ্জতি। খবরের কাগজে ফলাও করে মামলার রিপোর্ট বেরুলে অন্য রোগী কমে যায়।"

"ভাই সুশান্ত, ডাক্তার উকিলের এই অহি-নকুল সম্পর্ক তাহলে বেশ জমে উঠেছে! লোভ হচ্ছে, ব্যারিস্টারের প্রাক্তন বাবু হিসেবে আর একখানা 'কত অজানারে'র ভিত্তি স্থাপন করি এদেশে। তুমি যা যা শুনেছো নির্ভয়ে বলে যাও।"

সুশান্ত হাসলো। "উকিলবাবুর ভয়ে অনেক বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডেলিভারি কেস নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। কলোরাডোর দশজন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ তো সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছেন, ইনসিওর প্রিমিয়ামের বোঝা তাঁরা বইতে পারছেন না, প্র্যাকটিশ বন্ধ হয়ে যাবে। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের আর একটি বিপদ—শিশু ভূমিষ্ঠ হলো হাঙ্গামা চুকে গেলো, তা নয়। জন্মাবার ষোলো বছর পরে সেই 'বেবি' হয়তো মামলা করে বসলো, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ডাক্তারবাবু তেমন সাবধান হননি। তাই আমার বুদ্ধি কমে গিয়েছে। অতএব ছাড়ো কয়েক লাখ ডলার।"

নিউ ইয়র্কের ডঃ ডানিয়েল কীফ ধাত্রীবিদ্যার প্র্যাকটিশ ছাড়বার আগে দুঃখ করে বললেন, "প্রসব রুমে নিজের কাজ করবার সময় মনে হয় ডাক্তারি করছি বটে, কিন্তু কে যেন আমার কপালের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে রেখেছে।" প্রাক্তন রুগীদের সাহায্যে উকিলবাবুরা ডঃ কীফের বিরুদ্ধে ছ'খানা মালমা রুজু করেছেন। ভগবানের দয়ায় একটাতেও ডাক্তারবাবুর হার হয়নি, তবু ডঃ কীফ প্র্যাকটিশ ছাড়লেন। তাঁর বক্তব্য, "চৌষট্টি বছর বয়সে যেকোনো একটা ছুতোয় সারাজীবনের জমানো সম্পত্তি হারাবার ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। এর থেকে বাড়িতে বসে অবসর জীবনযাপন করা অনেক ভাল।"

সুশান্তর কাছে জানলাম, খবরের কাগজে লিখেছে, ডাক্তারদের এই মামলার জড়াবার সম্ভাবনার কথা এদেশের ছোট ছেলেমেয়েরাও জেনে ফেলেছে। একজন নিউরোসার্জেন গত পনেরো বছরে ছ'খানা মামলায় পড়েছেন। তিনি দুঃখ করছেন, একটি ষোলো বছরের বালক তাঁর চেম্বারে পরীক্ষিত হবার সময়েই

তার বাবাকে বলছেন, "বাপি একবার ভেবে দেখো ডাক্তার যদি কোনো গোলমাল করে বসে তা হলে তুমি কত টাকা পেয়ে যাবে!"

মনে পড়লো একজন জাপানী অর্থনীতির অধ্যাপক আমাকে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আমেরিকানদের জাতীয় 'শখ' হলো মামলা করা। উকিলবাবুরা যে মাথা খাটিয়ে কত মামলার পথ বের করছেন তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।'

অনুরাধা বললো, "শোনা যায় এক বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। বাড়ির কর্তার মই বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে সে পড়ে গেলো। তারপরেই নাকি উকিলের চিঠি, মই বিপজ্জনক ভাবে রাখার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

সুশান্ত বললো, "ব্যাপারটা বোধহয় রসিকতা। কিন্তু যারা মই তৈরি করে তারা কাগজে বিবৃতি দিয়েছে, মই তৈরি করতে যত খরচ প্রায় তত টাকা ইনসিওর প্রিমিয়াম গুণতে হচ্ছে যদি মই থেকে কোনো দুর্ঘটনা হয় তার সামাল দিতে।"

সুরসিকা অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, "উকিলদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?"

আমি বললাম, 'উকিলের ছেলে, উকিলের ভূতপূর্ব বাবু আমি অবশ্যই উকিলদের পক্ষে। একবার আমার উপন্যাসে এক চরিত্র (শ্রমিকনেতা) উকিলদের সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করেছিলো, তাই পড়ে এক বিখ্যাত আইনজ্ঞ (পরে বিশিষ্ট বন্ধু) আমাকে ফৌজদারী কোর্টের আসামী করলেন—সেই থেকে আমি বন্ধুবর বিষ্ণুচরণ ঘোষকে অলিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, উকিলদের নিন্দে আমি মরে গেলেও করবো না। অমন যে অমন সেক্সপীয়র, যিনি হেনরি সিক্সথ নাটকে একটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রস্তাব করেছিলেন কিছু উকিলকে মেরে ফেলে যাক, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করবো।"

টপাটপ অনেকগুলো খবর সংগ্রহ করে নিলাম দেশের আইনজ্ঞ বন্ধুদের যদি কাজে লেগে যায়। গরিব উকিল কাকে বলে তা আমেরিকায় জানা নেই। আমেরিকায় বটগাছই নেই, তো বটতলার উকিল! যারা বলে আমাদের দেশের কোনো-কোনো উকিল সুযোগ পেলেই মক্কেলের গলা কাটে তারা একবার কষ্ট করে আমেরিকা ঘুরে যাক—হাউ মেনি প্যাডি মেক হাউ মেনি রাইস তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সিভিল ক্ষতিপূরণের মামলায় বাদী হিসেবে আমেরিকান আদালতে যাওয়াই লাভের—কারণ উকিলবাবুকে নগদ না দিলেও চলবে। মামলায় যা পাওয়া যাবে তার চল্লিশ শতাংশ উকিলবাবু নেবেন। কিন্তু বিবাদী হলেই উকিলের টাকা নগদ নারায়ণ। পরামর্শ সভায় ঘণ্টা অনুযায়ী মিটার বাড়বে—প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে ছ'শ থেকে দু'হাজার টাকা। আদালতে মামলা উঠলে লাখ দেড়েক

টাকা উকিল-ফি নস্যি!

বড়-বড় মামলায় ওকালতি খরচ কত তা নিবেদন করলে আমাদের অশোক সেন, দেবীপাল, ননী পালকিওয়ালা, শক্তি মুখার্জির বাবুরাও অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। ১৯৮৩ সালে ফাইন পেপার অ্যানটি-ট্রাস্ট ক্লাশ অ্যাকশন মামলায় ওকালতি খরচের বিল মাত্র ছাব্বিশ কোটি টাকা! আমেরিকান উকিলের খরচ ধরলে আমাদের প্রত্যেকটি উকিলবাবু তো রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী! কিন্তু বিদ্যেয় বুদ্ধিতে আমাদের কালোগাউনের সায়েবরা দুনিয়ার কারও থেকে যে কম যায় না তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

সুশান্ত বললো, "লিখে রাখুন, আপনার কাজে লেগে যাবে। আমেরিকায় সাত লাখ উকিলবাবু বছরে ফি হিসেবে রোজগার করেন সত্তর হাজার কোটি টাকা।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার মাথা ঘুরছে। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমাদের ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেট থেকে শ্যামচাচার উকিলের ফি-ও মেটানো যাবে না।"

পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলির সাম্প্রতিক সংখ্যায় হেনরি আব্রাহামের লেখা একটি প্রবন্ধের নকল সুশান্ত আমাকে দিয়ে দিলো। "পড়ে দেখবেন, ১৯৮৩-৮৪ সালে আমেরিকানরা বিভিন্ন আদালতে আড়াই কোটি মামলা রুজু করেছে, এর মধ্যে চুরানব্বইটা ফেডারেল ডিসট্রিক্ট কোর্টে, মামলার সংখ্যা সাড়ে ছ'লাখ।"

আব্রাহাম সায়েব আমার নজর খুলে দিলেন। মামলার কয়েকটা নমুনা শুনুন। ছেলে মামলা করেছে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে ঠিক মতন প্রতিপালন না করার জন্যে (ভুবনের মাসীর গল্প মনে পড়ে?)—দাবী একলাখ ডলার। সিনসিনাটির এক নাগরিক তাঁর সাংবিধানিক অধিকার বলে রাস্তা দিয়ে তাঁর প্রিয় 'ট্যাংক' চালাবার অধিকার চান। উইসকনসিনের এক পুরুষকর্মী তাঁর মহিলা-বসের বিরুদ্ধে চাকরিতে অবনতি করিয়ে দেবার জন্য দু'লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন। অভিযোগ, মহিলা-বস তাঁকে 'লটঘট'-এর যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা এই পুরুষকর্মীটি গ্রহণ করতে পারেননি বলেই এই শাস্তি এসেছে।

ফ্লোরিডার এক অফিস-বাড়ির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মস্ত মামলা ঝুলছে, টয়লেটের সীট নড়বড়ে হওয়ায় এক মহিলা কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। ফ্লোরিডার এক এপিসকোপাল বিশপ সরকারের কাছে দাবী করেছেন দু'লাখ ডলার। নেভির টেনিস মাঠে খেলতে গিয়ে তাঁর হাঁটুতে চোট লাগে, ফলে চার্চের বেদিতে হাঁটু মুড়তে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় এক পাদ্রির বিরুদ্ধে সাত কোটি টাকার মামলা রুজু করেছেন এক মহিলা। তিনি একবার চার্চের বেদিতে কনফেশন করেছিলেন। এখন অভিযোগ, বিশ্বাসের সম্মান না রেখে

পাদ্রি কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন এই মহিলা চার্চের টাকা তছরূপ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার এক ব্যায়াম-শিক্ষক আহত হয়ে মামলা করলেন যে-কোম্পানি জিমন্যাস্টিক ম্যাট তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে। মামলা জিতে পেলেন ষোল কোটি টাকা। বাড়িওয়ালা শুধু বাড়ি ভাড়াই দেবেন না, ভাড়াটিয়াদের নিরাপত্তায় তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। হোটেলে ও মোটেলে সেই একই কথা। মহিলা গায়িকা কান ফ্রানসিস এক মোটেলে রেপড্ হন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র না-করার অভিযোগে মোটেল মালিকের কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি আদায় করেছেন পনেরো লাখ ডলার।

কোম্পানির বিপদের তো শেষ নেই। অ্যাসবেস্টসের ধুলোয় ফুসফুসের রোগ হয় ও ক্যানসার সম্ভাবনা বাড়ে এমন তিরিশ হাজার ক্ষতিপূরণের মামলা আদালতে ঝুলে আছে। কোটি কোটি ডলার গুণাগার ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে—ম্যানভিল কর্পোরেশনের মতন প্রতিষ্ঠান এই মামলার দাপটে লাটে উঠলো। ভার্জিনিয়ার এই এইচ রবিন্স কোম্পানি মেয়েদের জন্যে জন্ম-নিরোধক আই-ইউ-ডি তৈরি করতো। দেড়হাজার ক্ষতিপরণের মামলায় কোম্পানির গণেশ উল্টোল—তেরোশ কোটি টাকার মতন ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও।

"ভাই সুশান্ত, সবই দেখছি লাখ-লাখ টাকার ব্যাপার। কম ক্ষতিপূরণ হওয়াটা কি উকিলবাবুদের অপছন্দ!"

সুশান্ত বললো, "কাগজে লিখেছে, দশ হাজার ডলারের কম ক্ষতিপূরণ চাইলে কারও পড়তায় পোষায় না।"

আমরা ছোটবেলায় গুজব শুনতাম, বরিশালবাসী ও দখনেরা মামলাবাজ—মামলা বাধাতে পারলে ওঁদের মন নাকি আনন্দে ভরে ওঠে। ইতিহাসের ঊষাকালে বরিশালের সঙ্গে মূল মার্কিন ভূখণ্ডের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা তা গবেষকরা যাচাই করে দেখতে পারেন!

কিন্তু মামলার নেশায় আমেরিকায় উকিলবাবুরা কতদূর এগিয়ে যাচ্ছেন তা শুনুন। পিটসবার্গের এক কারখানাকর্মী লিউকিমিয়ায় মারা গেলেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী মামলা করলেন, বেনজিনের সংস্পর্শে এসেই তাঁর স্বামীর রোগের উৎপত্তি। আগে কেবল যে-কোম্পানিতে কাজ করতেন তার বিরুদ্ধেই কর্মীদের মামলা দায়ের হতো। এখন যাঁরা কোম্পানিকে মাল সরবরাহ করেন তাঁদেরও জড়ানো হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বেনজিন কোন্ কোম্পানি সরবরাহ করেছে তা নিশ্চিত হতে না পেরে আমেরিকায় যে একশো একটি কোম্পানি বেনজিন তৈরি করেন তাঁদের সবাইকে পার্টি করা হলো।

এই প্যাঁচে কিন্তু ফল ভাল হলো না। উননব্বইটি কোম্পানি আদালতে

দেখালো তারা কোনোদিন পিটসবার্গের ওই কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিল না। যে বেনজিন নিয়ে অভিযোগ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তাঁদের। ফেডারেল জজ ব্লক সায়েব বললেন, উকিলবাবুরা বাড়াবাড়ি করেছেন, সুতরাং গাঁটের কড়ি থেকে কুড়ি লাখ টাকার আইন খরচ দাও ওই উননব্বইটা কোম্পানিকে।

মামলার নেশায় মত্ত আমেরিকানরা উকিলবাবুদের নিষ্কৃতি দিচ্ছেন না। তাঁদের বিরুদ্ধেও ক্ষতিপূরণের মামলা হচ্ছে ডজন-ডজন। বিশেষ করে তাঁরা যখন রুজু-করা মমলা ঠিক মতন তদ্বির করেন না অথবা নির্ধারিত সময়ে কাগজপত্র আদালতে পেশ করতে গাফিলতি করেন। উকিলের বিরুদ্ধে ইদানীংকালে সবচেয়ে বিখ্যাত মামলা দায়ের করেছিলেন মহিলা গায়িকা ডরিস ডে। বিবাদী তাঁর প্রাক্তন উকিল জেরোম রোজেনথল। ১৯৮৫ অক্টোবরে ডরিস ডে পেয়েছেন আদালতের ডিক্রি—পরিমাণ তেত্রিশ কোটি টাকা।

আমি বললাম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে মার্কিনীরা ক্রমশই মামলার নেশায় মেতে উঠেছে। এমন ক্ষতিপূরণের ভয় থাকলে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক একদিন বিষময় হয়ে উঠতে পারে। ইন্টারেস্টিং খবর, দেশে ফিরে গিয়ে লেখা যেতে পারে।"

অনুরাধা বললো, "খুব সাবধান শংকরবাবু। এ-দেশে সব সময় বিরোধীপক্ষের একটা বক্তব্য থাকে। সেটা একটু জেনে নেবেন।"

সুশান্ত মৃদু হেসে বললো, "সবার ধারণা গত দশ বছরে বাৎসরিক মামলার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আপীলও বেড়ে চলেছে বেপরোয়াভাবে। আপীলেরও আপীল আছে। একটা খুনের মামলায় আসামী আইনের নানা মারপ্যাঁচ বুঝে বিয়াল্লিশ বার আপীল করেছিল। কিন্তু আইনজ্ঞরা চিন্তিত নন। মামলাবাজি বাড়ছে এ-কথা তাঁরা মোটেই স্বীকার করছেন না। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক মার্ক গ্যালান্টার বলছেন, উনিশ শতকের রেকর্ড খতিয়ে দেখুন—মাথাপিছু মামলার সংখ্যা তখনও কম ছিল না।

"অর্থাৎ মামলাবাজিটা এ-দেশে নতুন নয়, যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন থেকেই এই ব্যাপারে একটু বরিশালী প্রভাব রয়ে গিয়েছে।" আমার এই মন্তব্য শুনে সুশান্ত হাসলো না। সে চুপি-চুপি অধ্যাপক হেনরি আব্রাহামের প্রবন্ধের কয়েকটা লাইনের ওপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

আব্রাহামের নিবেদন : আমেরিকার সাত লাখ উকিলের তুলনায় জাপানে উকিলের সংখ্যা মাত্র ১২,০০০। ইংলন্ডে ৫৩,০০০ ফ্রান্সে ৩০,০০০, সুইডেনে ১৬,০০০। ১৯৭০ সালে প্রতি ৭০০ জন আমেরিকানের জন্যে একজন উকিল ছিলেন, ১৯৮০-তে ৪১০ জনের জন্য একজন, ১৯৮২-তে ৩৩০ জনে একজন এবং ১৯৮৬-তে ৩২০ জনে একজন। আরও তলিয়ে দেখতে পারেন।

ওয়াশিংটন ডি-সির কথা ধরুন—১৯৮১ সালেই আঠারো জন নাগরিক পিছু একজন উকিল। এইভাবে এগোলে, আব্রাহামের মতে, ২০৪৫ সালে আমরা সেই স্বর্ণযুগে পৌঁছবো যখন ওয়াশিংটন ডি-সিতে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একজন করিৎকর্মা উকিলবাবু থাকবেন।

সুশান্তকে আমার শেষ নিবেদন। "দু'একখানা ছাপানো কাগজপত্তরের কপি দিয়ে যাও ভাই ডকুমেন্ট হিসেব, নয়তো দেশে ফিরে গিয়ে এই বিষয়ে লিখলে সবাই ভাববে আমি গাঁজা-আফিম খেয়ে মার্কিন দেশ সম্বন্ধে লিখতে বসেছি।"

স্বদেশের সুখের আশ্রয় ছেড়ে বিদেশে ভূতের কিল খাবার ঝুঁকি যখন নিয়েছিলাম তখন মনের মধ্যে যে-কয়েকটি চাপা প্রত্যাশা ছিল তার মধ্যে একটি হলো আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

আমার এক স্বাধীনচেতা সাংবাদিক বন্ধু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, বিদেশে কখনও বিখ্যাত ব্যক্তির পিছনে ছুটে সময় নষ্ট করবেন না। নামকরা লোকরা আটলান্টিকের অপর পারে সাধারণত একটু পায়াভারি হন। ওঁদের সময় আসলে কতখানি মূল্যবান তা ভগবানই জানেন, কিন্তু সফলস্বপ্ন ব্যক্তিরা এমন ভাব দেখান যে মহামূল্যবান গিনি সোনার মতন এঁরা সময়কে নিক্তিতে ভাগ করে ব্যয় করেন। অর্থাৎ সময় আমাদের এই ইন্ডিয়ায় যত সস্তা তা পৃথিবীর আর কোথাও নয়।

এই বন্ধু আমাকে আরও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, বিখ্যাত লোকদের সান্নিধ্যে আসার প্রচেষ্টার মধ্যে দাস-জাতির মানসিকতা লুকিয়ে আছে। যেমন ১৯৪৭ সালের আগে পরাধীন বাঙালিরা সায়েবসান্নিধ্যে এলেই কারণে অকারণে একখানা প্রশংসাপত্র বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক তো সারাক্ষণ তাঁর গলাবন্ধ কোটের পকেটে একখানা খাতা লুকিয়ে রাখতেন। কখন কোথায় সায়েব দর্শন হবে এবং তাঁর কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট ভিক্ষা পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই!

সার্টিফিকেট আমি চাই না, কিন্তু বিদেশে নিজের দেশের লোকের সাফল্য ও সম্মান দেখে আনন্দ পাবো এতে দোষ কোথায়?

আমার বন্ধুটি নানা সুযোগে গত এক দশকে বহুবার বিদেশ গিয়েছেন এবং কখনও কখনও দীর্ঘ সময় যাপন করেছেন বিখ্যাত সব শিক্ষাতীর্থে। তিনি সাবধান

করে দিলেন, "নামকরা লোক দেখার এই হ্যাংলামো ছাড়ুন। যদি আপনার কোনো কাজকর্ম থাকে তাঁর সঙ্গে তা হলে আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তিনি বিখ্যাত বলেই আপনি তাঁর দর্শনার্থী হবেন এই মানসিকতা তিনি পছন্দ না করতে পারেন।"

সাংবাদিক বন্ধু আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমি সিগন্যাল দিলাম, "বলে যান! থামবেন না।"

বন্ধু বললেন, "বিখ্যাত ব্যক্তিটি হয়তো আপনার মতন এক দেশোয়ালীকে দেখে তাঁর গায়ের যত ঝাল ঝেড়ে দেবার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। উঃ, মশাই বলবার উপায় নেই, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি এবং ছোটখাট একখানা কাগজে কাজ করি। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হবে প্রবাসী ভারতীয়র স্বদেশি লেকচার! ইন্ডিয়া তাঁর মতন প্রতিভাকে বুঝতে পারেনি। দেশের লোক, সরকারের লোক, অফিসারের লোক সব একসঙ্গে পিছনে লেগেছিল তাঁর প্রতিভার টুয়েল্‌ভ-ও-ক্লক বাজাবার জন্যে। নেহাৎ স্বপ্ন ছিল, পুরুষকার ছিল, সাধনা ছিল তাই কোনোক্রমে এই সোনার দেশ আমেরিকায় স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছে। এখন আমার পৈতৃক নামটা ছাড়া আর কিছুর পিছনেই ভারতবর্ষের কোনো অবদান নেই।"

"তারপর শুরু হবে সুদীর্ঘ বর্ণনা, ইন্ডিয়াতে তাঁর ওপর কি কি অন্যায় করা হয়েছে দিনের পর দিন ধরে। এই সব শুনতে-শুনতেই আপনি আবিষ্কার করবেন আপনার নির্ধারিত সাক্ষাৎকারের তিরিশ মিনিট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এক ভদ্রলোকের এতোখানি ঔদ্ধত্য আমাকে বলেন যে, আট ডলার পকেটে করে দেশত্যাগী হয়েছিলাম, তাছাড়া ও দেশের কাছে আমার কোনো ঋণ নেই। এক-এক সময় ভাবি, দিল্লিতে ইন্ডিয়ান রাষ্ট্রপতির নামে ওই টাকাটা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়ে হিসেব চুকিয়ে ফেলবো।"

আমি সাংবাদিক বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, "সেধে কেন অপমান কুড়োবেন? যা এই ভদ্রলোকদের বুঝাতে পারিনি, আপনি নিজের দেশে যা ভুগেছেন তার জন্য আপনার জন্মভূমির দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতাই দায়ী—আপনি যা অবহেলা পেয়েছেন তা শুধু আপনি পাননি, ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষ প্রত্যহ একই আগুনে এখনও ভুট্টার মতন পুড়ছে।"

আমি বাহবা দিই বন্ধুকে, "চমৎকার বলেছেন। যোগ্য উত্তর তো মুখের ওপরেই শুনিয়ে দিয়ে এসেছেন!"

কিন্তু বন্ধু বললেন, "আট ডলারের ভর্ৎসনা শুনিয়েই যদি লেকচার বন্ধ হতো তাহলে তো বাঁচা যেতো। অনাবাসী বাঙালিদের মতন 'অ্যারোগ্যান্ট' গ্রুপ আপনি এদেশের কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাঁরা আপনার ওপর দাদাগিরি ফলাবেন।

জিজ্ঞেস করবেন, ভারত দেশটা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ কেন উচ্ছন্নে যাচ্ছে? কেন আমরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের মতন সাধারণ ব্যাপারও জনসাধারণকে বোঝাতে পারছি না। মন্ত্রীরা আর কত চুরি করবে? সরকারী অফিস ও বে-সরকারী উদ্যোগের মানুষরা কেমন করে এমন অপদার্থ হলো?"

সাংবাদিক বন্ধু বললেন, "বুঝুন ব্যাপারটা। তুমি কাল-কা যোগী, টু-পাইসের লোভে দেশ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে অন্য রঙের পাশপোর্ট নিয়েছো, বেশ করেছো। ইচ্ছে হলে নিজের গর্ভধারিণী মাকে দু-তিন মাস অন্তর দু'দশ ডলার ভিক্ষে পাঠিয়ে তাঁর মাথা কিনে নিও। কিন্তু যে-দেশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক চুকেছে সে-দেশের সব মানুষের ওপর হেডমাস্টারি করার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?"

বন্ধুবর বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। "মনের ইচ্ছাটা, অনাবাসী আমাকে পুরুষোত্তম বলে স্বীকার করে নাও। দেখে যাও আমার গাড়ি, বাহারে বাড়ি। শুনে যাও আমার মাইনের পরিমাণ। ডলারে মাইনে শুনলে তোমার চোখ ছানাবড়া হবে না, তড়াং করে তেরো দিয়ে গুণ করে টাকায় রূপান্তরিত করো। মনের ইচ্ছে, ডলার ও টাকার ফারাকটা ক্রমশই বেড়ে যাক। যখন ইস্কুলে পড়েছিলুম তখন ছিল ডলারে সাত সিকে। দাম কমতে কমতে এক ডলার তেরো টাকা হয়েছে—যত ইন্ডিয়ান রুপির কদর কমছে তত কলকাতার পচা গলিতে-গলিতে অনাবাসী ভারতীয়দের ইজ্জত বাড়ছে।"

আমি কোনো বাধা দিচ্ছি না বন্ধুকে। তিনি বলে চলেছেন, "বেশ বাবা, যে-রেটে আমাদের দেশ পিছোচ্ছে তাতে ডলারে পঁচিশ টাকা হয়তো দেখে যাবো, তাতে যদি তোমাদের সুখ হয় তো হোক। কিন্তু ভারতমাতার জন্যে কপটাশ্রু বিসর্জন ত্যাগ করো। অমন ভাবটা দেখিও না—যদি দেশের অবুঝ, কুঁড়ে এবং অপদার্থ লোকগুলো তোমার মতন উদ্যমী হতো এবং তোমার পরামর্শ শুনতো তা হলে ওই দেশেও সোনা ফলতো। এমন ভাবখানা, যেন এখনই যদি ফিরে যাই দেখিয়ে দেবো কেমন করে সোনা ফলে। এই সব মিষ্টি কথা শুনে দেশের অনেক নেতা বিদেশে এসে বোকা বনেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, দেশের ছেলে দেশে ফিরুক, ভারতমাতার চোখের জল শুকোক। মোটেই না। তাঁরা সুপার সিটিজান হয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে চান সরকারী অতিথি হিসেবে। সরকার তাঁদের সেই হারে পেমেন্ট করুক যে-হারে তাঁরা বিদেশি স্পেশালিস্টদের নিয়ে যান। এই ধরুন—প্রথম শ্রেণীর প্লেন ভাড়া, পাঁচতারা হোটেল খরচ-খরচা বাদে দিনে দৈনিক হাজার তিনেক টাকা।"

"দিনে দু'শো-আইড়াইশো ডলারে সত্যিই কিছু নয়।" আমি মনে করিয়ে দিয়েছি।

"ওদেশে কিছু না হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক টাকা। আচ্ছা, আপনি না হয় কোনক্রমে আক্কেল সেলামিটা দিলেন, কিন্তু তারপর? প্রতি মিনিটে তিনি আপনাকে মনে করিয়ে দেবেন তিনি ভেতো বাঙালি নন, তিনি অনাবাসী ইন্ডিয়ান। দেশের রাস্তা কেন খারাপ? বাড়ি কেন রঙ করা হয় না? হাসপাতাল কেন পাঁচতারা হোটেলের মতন নয়? আইসক্রিম স্বাদ কেন নিরেস, সাইজ কেন ছোট? কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ এক অফিসার সেদিন দুঃখের সঙ্গে দিল্লীতে বললেন, 'অনাবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের মোহ ঘুচে যাচ্ছে। যারা গেছে তাদের যেতে দিন। ভারতমাতার ঘরে সত্তর-পঁচাত্তর কোটি সন্তান—যে আড়াই কোটি দেশের বাইরে রয়েছে তাদের খরচের খাতায় লিখে দিলেও ভারতবর্ষ কোনোদিন অচল হবে না'।"

বন্ধুবরের বিরক্তি প্রকাশ এখনও শেষ হয়নি। বলে চললেন, "মিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলারের কমে কোনো কথা নেই এই ফরেন-বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের। বছরের পর বছর ধরে শুনছি, টাকা ঢেলে কিছু একটা শিল্পটিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারপরে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ দাবি হচ্ছে, বিনা পয়সায় জমি দিন, আমদানি শুল্ক রেহাই দিন এবং আরও কি কি সুবিধে দিতে পারেন তার তালিকা পাঠান। বাঙালিদের ট্র্যাক রেকর্ড এ বিষয়ে সব থেকে খারাপ। কেরলীয়রা, অন্ধ্রের লোকেরা, গুজরাতীরা, তামিলরা বিদেশে থেকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজেদের অঞ্চল সম্বন্ধে যা করেছে তার কানাকড়িও করেনি বাঙালিরা।"

"ইচ্ছে থাকলেও কি সব সম্ভব করা যায় ভাই?" আমি জিজ্ঞেস করি, "আমাদের ভুললে চলবে কেন, প্রবাসের জীবনসংগ্রামে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। মার্কিন জীবনটা দূর থেকে যত সুখের মনে হয় আসলে ততটা নয়।"

"এই সামান্য কথাটা স্বীকার করে নিলেই তো সব মিটে যায়। শুধু পিট-পিট করে সমালোচনায় লাভ কী?"

"অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয়, দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ একটা থেকে গিয়েছে। দেশছাড়া হলেও দেশ সম্বন্ধে আগ্রহ যথেষ্ট রয়েছে।"

"ওটাও বোধ হয় ঠিক নয়," ফোঁস করে উঠলেন বন্ধুবর। "বাঙালি আমেরিকানরা অন্য ভারতীয়দের তুলনায় ক'খানা বাংলা পত্র-পত্রিকা কেনেন? ক'খানা বাংলা বই তাঁদের ঘরে দেখবেন? বাংলা দৈনিক পত্রিকা ক'খানা বাঙালি কম্যুনিটিতে রাখা হয়? ও-কথা তুললেই দামের কথা ওঠে। কিন্তু তেরো টাকা দিয়ে ডলার ভাগ করলে এদেশের খবরের কাগজ খুব দামী এই বদনাম দেওয়া যায় না। আবার কেউ-কেউ বলবে, সময় কোথায় পড়বার? ভাবটা এমন, বিদেশে অনেক বেশি পরিশ্রম ঘরে এবং কর্মক্ষেত্রে করতে হয়। কিন্তু তাঁরাই ভুলে যান, তাঁদের বোন-বউদি বাড়ির হাঁড়ি ঠেলে ট্রেনে বর্ধমান থেকে হাওড়ায়

ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। হাওড়া থেকে বাসে তাঁদের সল্টলেক পর্যন্ত পাল্লা দিতে হয়—চলমান নরক-যন্ত্রণা বললে কলকাতার বাসযাত্রা বোঝায়। দিনের শেষে এঁরা আবার হাওড়ায় ফিরে আসেন, তারপর আবার বর্ধমান। এইসব মহিলা তবু বাংলার সংবাদ, বাংলার সাহিত্য, বাংলার সঙ্গীতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন।"

তাহলে বিদেশে গিয়ে আমার কী করবার থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুবরের পরামর্শ ছিল : কয়েকদিনের জন্যে যাচ্ছেন যান। বিশ্রাম করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যদি দু'এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায় ঘুরে আসুন, ওই পর্যন্ত। ওখান থেকে লেখার কোনো উপাদান যোগাড়ের চেষ্টা করে নিজের এবং পাঠকের কষ্ট অযথা বাড়াবেন না। আদৌ যদি প্রাণ ছটফট করে তাহলে বলবেন, অনাবাসী বাঙালিরা যে উন্নত জাত এই ব্যাপারটা দেশের লোক বিশ্বাস করতে আগ্রহী নয়। যতটা পারেন নিতান্ত অর্ডিনারি বাঙালিদের সঙ্গে মিশবেন, যারা খুব সফল হয়েছে তাদের কাছে গিয়ে পুরনো লেকচারটা আবার শুনবেন না।"

সাংবাদিক বন্ধুর এই মন্তব্য মনের মধ্যে রেখে মার্কিন দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে কিন্তু ওঁর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। যে কথা অনেকদিন আগেই শুনেছিলাম, তাই আবার প্রমাণ হলো, বিদেশে না গেলে বাঙালির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তা বিকশিত হয় না। সেই পুরনো কথা—বাঙালিরা হচ্ছে ধানগাছের মতন, উৎপাটিত হয়ে পুনঃরোপিত হলে তবেই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে।

প্রবাসে বাঙালির মধ্যে পরকে আপন করে নেওয়ার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখেছি তা মনকে অভিভূত করে। ধরুন ক্লিভল্যান্ডের ছোট্ট বাঙালি সমাজের কথা। পরস্পরের সুখে দুঃখে যেভাবে অংশগ্রহণ করেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এঁদের মধ্যে দেশের জন্যে যথেষ্ট ভালবাসা দেখেছি, কোথাও ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিনি।

আমার বন্ধুর মন্তব্য শুনে স্থানীয় এক যুবক বললেন, "আপনার বন্ধু নিশ্চয় কোনো বাজে লোকের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। পেটের দায়ে এবং কিছুটা বড় হবার লোভে দেশত্যাগী হয়েছিলাম, হয়তো পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজনে পাশপোর্টখানাও পাল্টাবো। কিন্তু কেমন করে ভুলবো, আমার জন্ম কোথায় হয়েছিল? সেখানকার মানুষের কত দুঃখ! সেই দুঃখে তেমন কিছু করবার মতন ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে, জন্মভূমিকে আমি ভালবাসি না তবে ভীষণ কষ্ট হবে।"

ক্লীভল্যান্ডের আর একটি সদাহাস্যময় তরুণ বাঙালি ডাক্তার শ্যামল রায় এক সময় আমার পুরনো কর্মস্থল ফিলিপস্ ইন্ডিয়ায় কাজ করতো। তার আর একটি পরিচয় নরেন্দ্রপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভাবধারায়

মানুষ হয়েও এদেশে পড়াশোনা করতে এসে কোনো মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েনি। চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে নতুন দেশের নতুন ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে।

এই শ্যামল অনেক মজার মজার কথা বলে। একবার কে ওকে বলেছিল, "ইন্ডিয়ান ছেলেরা স্মার্ট নয়, ওদের প্রত্যেককে ড্রেস করতে শেখাতে হয়।"

শ্যামলের তাৎক্ষণিক উত্তর, "এক-একটা জাতের এক-একটা সহজাত ব্যুৎপত্তি থাকে—যেমন, কোনো আমেরিকান ছেলে অথবা মেয়েকে শেখানো হয় না কেমন করে 'আনড্রেস' করতে হয়!"

শ্যামল বলেছিল, "দাদা, আপনি পরের কথায় কান দেবেন না, আপনি নিজের চোখে যতটা পারেন দেখে নিন। আপনি আমাদের মতন অর্ডিনারী বাঙালিও দেখুন, আবার কৃতী বাঙালিও দেখুন।"

কৃতী বাঙালির প্রসঙ্গ উঠতেই আনন্দমোহন চক্রবর্তীর কথা আমার মনে পড়ে গেলো। কলকাতায় থাকতেই একবার ওঁর সম্বন্ধে কাগজে রিপোর্ট পড়েছিলাম। গবেষণা করে ও সেই সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকদের জন্য নতুন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে এই ভদ্রলোক মার্কিন সারস্বত সমাজে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন।

বিদেশে বিখ্যাত ভারতীয় আমার মতন একজন মফস্বলবাসী দেশোয়ালীর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে পারেন তা আশঙ্কা করেও আমি আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

ক্লিভল্যান্ডে নেমেই আমার আশ্রয়দাতা ও আসন্ন নর্থ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন ডঃ রণজিৎ দত্তর ওপর নানা চাপ দিচ্ছিলাম—এই দেখতে চাই, ওই দেখতে চাই। ব্যাচেলররা যে এমন ধৈর্যশীল হতে পারেন তা রণজিৎবাবুকে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না। সুপ্রিয় ব্যানার্জির অবশ্য অন্য মত—ব্যাচেলররা কখনই ধৈর্যশীল হয় না, কিন্তু ১৯৪৮ সালে যারা ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাদের ব্যাপারটা আলাদা। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলে কখনও নাইনটিন ফর্টি-এইট গ্রুপ সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। ফর্টি-এইট লয়ালটি ওঁর এতোই বেশি যে জীবনসঙ্গিনী হিসেবেও তিনি এই ফর্টি-এইট গ্রুপ মহিলা নির্বাচন করেছেন।

আর একটি মতামত আছে খ্যাতনামা রোডস স্কলার ও ইতিহাসে বিদগ্ধ অধ্যাপক অসীম দত্তর। তাঁর ধারণা প্রত্যেকটি শিলেটি দত্তকেই সৃষ্টিকর্তা একটু স্পেশাল যত্ন নিয়ে তৈরি করে এই বিশ্বভুবনে পাঠিয়েছেন—তাই দুনিয়ার সর্বত্র রণজিৎ দত্তরা অদ্বিতীয়। আমার সঙ্গে বিদেশে যখন দেখা হলো ডঃ অসীম দত্ত তখন শিলেটি দত্তদের কীর্তিকাহিনী সংগ্রহের জন্য সমস্ত আমেরিকা মহাদেশ

চষে বেড়াচ্ছেন। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অব মর্ডান আর্টস ইত্যাদি মাথায় উঠেছে, অসীমবাবু একমনে শ্রীহট্টীয় দত্তদের বিজয়গাথা সংকলন করে চলেছেন।

অসীমবাবু বললেন, "রণজিৎ দত্তর ধৈর্য থাকবে না তো আপনাদের কলকাতায় এলেবেলে লোকদের ওই গুণ থাকবে? ওর শিকড়টা কোথায় রয়েছে তা একবার দেখুন।"

ধৈর্যময় রণজিৎবাবু আমার সবরকম বালকসুলভ প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন, "আপনার কোনো খেদ আমরা রাখবো না।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর কথা তুলতেই বললেন, "জগদ্বিখ্যাত লোক—পৃথিবীর কোথায় কখন যে ঘুরে বেড়ান। থাকেন শিকাগোয়। তবু চেষ্টা করা যাবে।"

অসীম দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে তার শিলেটি বাংলায় (তা যদি অবশ্য বাংলা হয়!) আকারে-ইঙ্গিতে যা সন্দেহ প্রকাশ করলেন তা হলো, "আনন্দ চক্রবর্তী তো শিলেটি নয়, কিন্তু আনন্দময়ীটি কি শিলেটবাসিনী?" ওঁর দৃঢ় ধারণা, অনেক নিচু লোক শেষ পর্যন্ত জাতে উঠেছে শিলেটি রমণী বিবাহ করে।

রণজিৎবাবু নিরাশ করলেন অসীম দত্তকে। আনন্দ চক্রবর্তী একেবারেই ঘটি। দুনিয়ার পাতে দেবার মতন বীরভূমের দুটি মাত্র প্রোডাক্ট—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর) ও আনন্দমোহন চক্রবর্তী (সাঁইথিয়া)। আনন্দময়ীটিও (নাম কৃষ্ণা) শিলেটি নন শুনে অসীম বাবু একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তারপর বললেন, "দেখবেন খোঁজটোজ করে, হয়তো কলেজেই জানাশোনা করে বিয়ে করেছে—বাপ-মা বাইরের ওর্য়ালডে টেন্ডার ফ্লোট করবার সুযোগই পাননি। শিলেটির লোকেরা এমন ছেলে খোঁজ পেলে নিশ্চয় হাতছাড়া করতো না!"

অসীমবাবু অবশ্য আশ্বাস দিলেন, "চিন্তা করছেন কেন? ইচ্ছাপূরণের আশ্চর্য দেশে এসেছেন। ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাবে।"

রণজিৎবাবুর কাছেই জানা গেলো, তিনি এবং আনন্দমোহন চক্রবর্তী দুজনেই এক সময় জগদ্বিখ্যাত জেনারেল ইলেকট্রিকে কাজ করতেন। এই কোম্পানি ইলেট্রিক ল্যাম্প থেকে আরম্ভ করে এরোপ্লেনের ইঞ্জিন এবং আণবিক চুল্লি পর্যন্ত কি না তৈরি করেন। 'ফ্রিজিডেয়ার' কথাটি বিশ্বময় চালু এখন, যে কোনো ঠাণ্ডা আলমারি বলতে ওই কথাটাই বোঝায়—কিন্তু আদিতে ঐ শব্দটি ছিল জেনারেল ইলেকট্রিকের ট্রেডনাম।

নামেই ইলেকট্রিক, কিন্তু এরা নানা বিষয়ে আছেন, এমন কি এদের গবেষণাগারে 'বাগ' বা ক্ষুদে পোকা সম্বন্ধেও গবেষণা চলতো। আনন্দবাবুর

ব্যাপারটাও এই প্রসঙ্গেই এসে যায়।

অসীম দত্ত চৌকশ ইতিহাস গবেষক। সেদিন লাইব্রেরি থেকে ফিরে এসেই বললেন, "নিন আপনার আনন্দবাবুর ঠিকুজিকুষ্টি। পুরো নাম আনন্দমোহন চক্রবর্তী। আপনার থেকে পাঁচ বছরের ছোট, জন্ম ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৮। জনক-জননী হলেন সত্যদাস ও ষষ্ঠীবালা। আপনার কলকাতা অফিসের কাছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৯৫৮-তে-এসসি এবং দু'বছর বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এসসি। পি-এইচ-ডি করতে একটু সময় লেগেছে—১৯৬৫। ওই বছরে আরও একটি বড় কাজ করেছেন, বিবাহিত হয়েছেন শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর সঙ্গে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইংরিজি মতে ২৬শে মে। ঐ বছরেই দেখা যাচ্ছে দেশত্যাগ—প্রাণরসায়ন, অর্থাৎ বায়োকেমিসট্রিতে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঐ পদেই ১৯৭১ পর্যন্ত। তারপর প্রায় একদশক জেনারেল ইলেকট্রিকের গবেষণাকেন্দ্রে। বিরাট নামধাম—এমনই সাফল্য যে ১৯৭৫ সালে আমেরিকার মস্ত সম্মান সায়েনটিস্ট অফ দ্য ইয়ার। আপনার আমার দেশে তো অন্য ব্যাপার! ফিল্মস্টার অফ দ্য ইয়ার, পলিটিসিয়ান অফ দ্য ইয়ার, ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার এই সব নিয়েই গোটা বাঙালি জাতটা সারাক্ষণ ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, এসবদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। সায়ানটিস্ট-ফায়ানটিস্ট হয়েছো? বেশ কথা, মাইনেপত্তর পাচ্ছো, কাজে ঠেকা দিয়ে যাও। যদি দেশ থেকে কেটে পড়ে বাইরে গিয়ে হরগোবিন্দ খুরানা এটসেটরা হয়ে নামটাম করো তখন আমরা দাবি করবো, ইনি আমাদের লোক। সন অফ মাদার ইন্ডিয়া। এ-ছাড়া আমাদের কোনো আগ্রহ নেই সায়েন্সে, প্রযুক্তিতে—ওসব জার্মানদের, জাপানীদের, আমেরিকানদের কাজ। আমাদের কাজ দেশে যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যেতে চায় তাদের কোমর ভেঙে দেওয়া, তাদের বিষদাঁত তুলে নেওয়া—যাতে সারা দেশটাই অপদার্থ মানুষে ভরে যায়, কাজের কাজ কিছু না হয়!"

খুব হাসলাম আমরা। রণজিৎবাবু বললেন, "বৈজ্ঞানিক মহলে আনন্দমোহন চক্রবর্তীর নাম জানে না এমন লোক নেই।"

"ওঁর কাজটা কী?"

"সায়েন্স তো ও বেচারার গোমাংস! নিরক্ষরদের কাছে সেক্সপীয়র সম্পর্কে কিছু বলা আর মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে শংকরবাবুকে বোঝানো একই ব্যাপার!" অসীমবাবুর নিষ্করুণ মন্তব্য, যেহেতু সমগ্র শ্রীহট্ট চৈতন্যদেব ছাড়া আমার পরিচিতজন কেউ নেই!

তারপর ব্যাপারটা আমার বিদ্যেতে যা দাঁড়ায় বোঝাতে গেলে তা এই

১ -অণুজীবতত্ত্ব নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে এখন বিরাট গবেষণা চলেছে।

অণুজীবীরা মানবশরীরে প্রবেশ করে যেমন নানা রোগের কারণ ঘটায়. তেমন এই অণুজীবীরা মানুষের পরম বন্ধুও বটে। নানারকম পচায়ের ব্যাপারে, নানা রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে, যদিও এদের চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোবায়োলজির এই অনুসন্ধান চলেছে গত কয়েক দশক থেকে এবং লুই পাস্তুর, রবার্ট কক ইত্যাদি কয়েকজনের নাম গল্প-উপন্যাসেও এসে যায়। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী ইউরোপ ও আমেরিকায় পরীক্ষাগারে অভিনব উপায়ে নতুন-নতুন অণুজীব বা পোকাসৃষ্টির সীমাহীন প্রচেষ্টা চলেছে। এই সব পোকা ভাল অথবা মন্দ দুই কাজেই লাগানো যেতে পারে। যেমন যুদ্ধের সময় শত্রুদেশে জীবাণু ছড়িয়ে নানা মহামারী সৃষ্টি করা সম্ভব। আবার বিশেষ পোকা দিয়ে এমন ওষুধ ফারমেনটেশন সম্ভব যা অন্য পন্থায় হয় অসম্ভব না-হয় অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।

মার্কিনী ও সুইস ওষুধ কোম্পানিরা বেশ কিছুদিন ধরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের পোকার চাষ করেন গবেষণাগারে এবং তা নিজেদের কাজে লাগান। এগুলি এতো গোপনে করা হয় যে দু'একজন অতিবিশ্বস্ত কর্মী ছাড়া কাউকে কিছু জানতেই দেওয়া হয় না, পাছে অন্য কোম্পানি তা জেনে বাজিমাত করে। মার্কিন দেশে আর এক মুশকিল, একদল গোঁড়া মানুষ আছেন যাঁরা নতুন জীবন সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখেন—খোদার ওপর খোদকারি তাঁদের পছন্দ নয়। যেমন তাঁদের অপছন্দ গবেষণার নামে বাঁদর ইত্যাদির ওপর নিষ্ঠুরতা দেখানো।

যাঁরা নতুন-নতুন উপায়ে এক ধরনের পোকার সঙ্গে আর এক ধরনের পোকার মিলন ঘটিয়ে ভিন্ন ধরনের পোকা তৈরি করছেন তাঁদের প্রধান অন্তরায়, এই পোকাগুলিকে সরকারী ভাবে পেটেন্ট করা যায় না। অন্য সব আবিষ্কারে পেটেন্টের সুবিধা আছে।

আপনি মাথা খাটিয়ে বহু সময় ও অর্থব্যয় করে একটি নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার করেছেন, পেটেন্টে নিলে কয়েক বছর এই আবিষ্কারের সুবিধা আপনি ছাড়া কেউ নিতে পারবে না। যদি কেউ ওটি ব্যবহার করতে চায় তাহলে আপনার অনুমতির প্রয়োজন হবে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় এর নাম কপিরাইট—শিল্পী যা সৃষ্টি করেছেন তার পার্থিব অধিকার তাঁরই, নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের জন্যে।

পেটেন্টের মহাতীর্থ এই আমেরিকা। স্রেফ এক একটি আবিষ্কার ও তার পেটেন্ট নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক একটি বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। যেমন টেলিফোনের আবিষ্কারক ও পেটেন্টমালিক জন গ্রাহাম বেল প্রতিষ্ঠিত বেল কোম্পানি—মার্কিনী টেলিফোনের হর্তাকর্তাবিধাতা। গল্প আছে, গ্রাহাম বেলের

সমসাময়িক আর একজন ভদ্রলোক একই সময়ে টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক পেটেন্ট অফিসে পৌঁছতে কয়েক ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছিলেন, ইতিমধ্যে জন গ্রাহাম বেল তাঁর আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন। সামান্য কয়েকঘণ্টার জন্যে বিপুল বৈভব থেকে প্রথম লোকটি বঞ্চিত হলেন।

পোকাদের মার্কিন মহলে প্রিয় নাম 'বাগ'—যদিও আমাদের ইস্কুলপাঠ্য অভিধান খুললে বাগ বলতে ছারপোকা ছাড়া কিছুই পাবেন না। অথচ বৈজ্ঞানিক মহলে এখন সহস্র-সহস্র অথবা লক্ষ-লক্ষ বাগের সম্ভাবনা। এতোদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট পাওয়া যেতো সেই সব বিষয়ে, যার প্রাণ নেই। প্রাণ সে তো ঈশ্বরের এক্তিয়ার। সেখানে কী করে পেটেন্ট দেওয়া হবে, সে-প্রাণ যতই অভিনব হোক এবং গবেষণাগারে তার পিছনে যতই সাধনা থাকুক।

জেনারেল ইলেকট্রিক গবেষণাগারে আনন্দমোহন যা সৃষ্টি করলেন তা এক অভিনব পোকা। কথা উঠলো, আদালতে মামলা হওয়া উচিত, কেন এই পোকা তৈরির পেটেন্টস্বত্ব যিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর থাকবে না?

দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চললো। তারপর একদিন আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট আনন্দমোহন চক্রবর্তী ও জেনারেল ইলেকট্রিকের পক্ষে রায় দিয়ে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে প্রবল উত্তেজনা ও বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকরা স্বীকার করলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন শুধু নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে সীমায়িত নয়। নতুন-নতুন প্রাণের সৃষ্টিতে অজানা এক বিশ্ব উন্মোচিত হতে চলেছে। যে-প্রাণ পৃথিবীতে ছিল না, অভিনব পদ্ধতিতে ও প্রচেষ্টায় সে-প্রাণ যদি গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে পেটেন্টের সুরক্ষা না-দিলে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কেউ অর্থলগ্নী করবে না, অথবা গবেষণা চালাবে না। সুতরাং আনন্দমোহন চক্রবর্তী গবেষণাগারে যে 'বাগ' সৃষ্টি করেছেন তার পেটেন্ট তাঁর প্রাপ্য।

এই রায়ের ফলে বিশ্ব অণুজীবতত্ত্বের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো। যা বহু আমেরিকান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন ছিল তা সম্ভব হলো সাঁইথিয়া বীরভূমের একটি মধ্যবয়সী বাঙালির একাগ্রতার ফলে।

কিন্তু 'বাগ' বলতে এখনও ছারপোকা ছাড়া আমি কিছুই কল্পনা করতে পারছি না। সুরসিক অসীমবাবু বললেন, "আরে ব্রাদার, ব্যাপারটা বয়-মিট্‌স-এ-গার্ল স্টোরি নয় যে বাঙালি গল্পলেখক টপাং করে বুঝে ঝপাং করে গপ্পো বানিয়ে ফেলবে। একমাত্র সুকুমার রায় কিছুটা আগাম ভাবতে পেরেছেন—যেমন হাঁস ও সজারুর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে 'হাঁসজারু' হলো। কিংবা ধরো, গাধা ও জেব্রায় ভাব ঘটিয়ে 'গাব্রা' তৈরি করা হলো। কিংবা ধরো, পিঁপড়ের সহায়তায় তুমি এমন ভেজিটারিয়ান ছারপোকা বানালে যে কেবল মিষ্টি খেতেই ভালবাসে—নাম

দিলে ছিঁপড়ে। কিন্তু এসব তবু তো চোখে দেখা যায় যা একদমই দেখা যায় না সেই নিয়েই তো আনন্দবাবুর মতন মাইক্রোবায়োলজিস্টদের কাজ করবার।"

রণজিৎবাবু বললেন, "আপনি নিশ্চয় কাগজে রিপোর্ট পড়েছেন ওঁর গবেষণা হচ্ছে পেট্রোল সংক্রান্ত। ওঁর তৈরি পোকা চটাপট তেল খেয়ে নিতে ওস্তাদ—তেল পেলে তারা কিছুই চায় না। আপনি হয়তো বলবেন, এই পেটুক পোকা নিয়ে কোম্পানিরা কি করবে?"

আমি বললাম, "দয়া করে ইন্ডিয়াতে যেন এই পোকা পাঠানো না হয়। এমনিতেই পেট্রোল স্টেশনে তেলের মাপ নিয়ে সদাসন্দেহ, এরপর পেট্রোলখেকো পোকার ছুতো থাকলে আর দেখতেই হবে না। গোরুতে কয়লা খেয়ে নিচ্ছে এমন অভিযোগও সরকারী স্টকবাবুরা সেই বৃটিশ আমল থেকে ওপর মহলে পাঠাচ্ছেন!"

রসিকতা বন্ধ রেখে 'পেটুকানন্দ' তেলপোকার যা উপকারিতার সম্ভাবনা পাওয়া গেলো তো সুদূরপ্রসারী। মনে করুন, হাজার-হাজার টন তেল নিয়ে কোনো তৈলবাহী জাহাজ চলেছে একদেশ থেকে আর-এক দেশে। তারপর কোনো দুর্ঘটনায় ওই তেল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমুদ্রের জলে। মাইলের পর মাইল ধরে ভেসে এই তেল এগিয়ে আসছে উপকূলের জনবসতির দিকে। এই তেল সর্বনাশ করবে জনপদের—অথচ একে সরানোর কোনো পথ নেই।

এইবার ভাবুন, বৈজ্ঞানিক দিকটা। লক্ষ-লক্ষ মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খবর দিলেন কোনো বিশেষজ্ঞকে। তিনি ওই তেলখেকো পেটুকানন্দ পোকাদের ছেড়ে দিলেন সমুদ্রে—তারা মন্ত্রবৎ বিপুল জলরাশিকে তৈলদূষণ থেকে মুক্ত করলো। এ তো একটি দিক। এই পোকারই মাসতুতো ভাইকে আপনি নামিয়ে দিলেন মাটির তলায়, তেল অনুসন্ধানের কাজে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ আবিষ্কার হলো জীবাণুদের সাহায্যে।

ব্যাক টু আনন্দমোহন চক্রবর্তী। "আনন্দ এখন আর জেনারেল ইলেকট্রিকে নেই। সে শিকাগোতে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টারে মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক। নানা বিস্ময়কর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।"

কিন্তু শিকাগো সে তো এই ওহায়ো রাজ্য থেকে অনেক দূর। আনন্দ চক্রবর্তীর দর্শন কি তা হলে আমার ভাগ্যে নেই?

অসীম দত্ত আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, "হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন আপনি শ্রীহট্টের দত্তর কাছে অনুরোধ করেছেন। শিলেটি দত্তরা যদি একবার ঠিক করে আপনার সাধ-আহ্লাদ পূরণ করবে তা হলে পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তাকে আটকায়। আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছেই—নিদেনপক্ষে

ওঁর শ্যালিকার সঙ্গে! বৈজ্ঞানিক আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সম্বন্ধে কিছু জানতে না-পারলেও জামাইবাবু আনন্দমোহন চক্রবর্তী সম্পর্কে আপনি বহু অপ্রকাশিত খবর নিয়ে যেতে পারবেন ফর কলকাতার মেয়েলী পত্র পত্রিকা।"

বন্যদের বনে. শিশুদের মাতৃক্রোড়ে এবং কৃতবিদ্য গবেষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে স্থাপন না করলে তাদের পূর্ণ মহত্ত্ব বিকশিত হয় না। জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-চত্বরে তাঁর নাম ইউনির্ভাসিটি হাইটস, ওহায়ো। সেখানেই ষষ্ঠ নর্থ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট বিশাল সভাগৃহের অদূরে শ্যালিকাপরিবৃত অবস্থায় এক জামাইবাবু বাঙালিকে হাল্কা মেজাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা গেলো!

সুদূর আমেরিকাতেও সুদর্শন জামাইবাবুটি যে গরদের পাঞ্জাবি ও ধুতি পরেছেন তার নমুনা জামাইষষ্ঠীর শুভপ্রভাতে খোদ এই কলকাতা শহরেও বিরল হয়ে উঠেছে। দেশত্যাগ করার আগে দেশবিভাগ করে বিপ্লবী বাঙালির বারোটা ইংরেজরা বাজিয়ে গিয়েছে। আর দুষ্টনন্দন বাঙালিকে শেষ করলো এই টেরিলিন কোম্পানিরা! ধুতি ছাড়িয়ে চোঙা পরিয়ে জাতটার শেষ বৈশিষ্ট্য তারা মুছে দিলো—এই মহাপাপের জন্য বিলিতি আই-সি-আই ও আমেরিকান ডুপন্ট কোম্পানি বাঙালির ইতিহাসে চিরদিনের জন্য ক্ষমার অযোগ্য হয়ে রইলেন!

তাও ভাল, নর্থ আমেরিকান বাঙালি সম্মেলনে এসে জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আগস্টের এই মধ্যদিনে যত ধুতি পাঞ্জাবিপরা সুবেশী বঙ্গ সন্তান দেখলাম তা অনেকদিন চোখে পড়েনি। বাঙালিত্বের শেষ চিহ্নগুলি খুঁজে বেড়াবার জন্য আগামীকালের গবেষকদের হয়তো বাঙলার বাইরেই সন্ধানকার্য চালাতে হবে।

ইউনিভার্সিটি হাইটস্ সভাগৃহের প্রশস্ত লবির এক কোণে যে জামাইবাবুটি আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন তিনি অবশ্যই অতীব সুদর্শন, বয়স কিছুতেই বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হতে পারে না। মেদহীন সুশাসিত শরীর, সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন স্তম্ভে এই রঙকেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রূপে রাজটীকা দেওয়া হয়।

সম্মেলনের কো-চেয়ারপার্সন রণজিৎ দত্ত বিজয়গর্বে বললেন, "ওই তো আমাদের আনন্দ—আমেরিকার ডঃ এ. এম. চক্রবর্তী—ডিপার্টমেন্ট অফ

মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় মেডিক্যাল সেন্টার।"

পরবর্তী রসরসিকতাটি এই রকম : 'আনন্দ এই কনফারেন্সে আসবে না তা কখনও হয়! ওর শ্যালিকা এখানকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন। ওহায়ো থেকে কান টানলে শিকাগো থেকে মাথা আসবেই!"

আরও আনন্দ সংবাদ, স্বয়ং আনন্দবাবুও নাকি এই অধমের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য খোঁজখুঁজি করছেন। প্রবাসের গেরস্ত বাঙালিরা অনেক কষ্টে টাকা জোগাড় করে দেশ থেকে আসার রাহাখরচ জুগিয়েছেন—এতো দূরে এসে মাইকের সামনে একটা প্রমাণসাইজের 'পালাগান' না-গাইলে পয়সা উসুল হয় না—সেই সাহিত্যসংক্রান্ত কাজটা আমাকে সকালের দিকেই সারতে হয়েছে।

'আজকের বাঙালি সমাজ'—কুলান অডিটোরিয়ামে শ'পাঁচেক দেশি ভায়ের সামনে এই ছিল আমার কেত্তনের বিষয়। অসীম দত্ত মহাশয়ের সময়োচিত রসিকতা, "সমাজও নেই, বাঙালিও যেতে বসেছে! আপনি মিনিট পঞ্চাশেক টানবেন কী করে?"

আমার কাতর নিবেদন, 'বিফলে মূল্য ফেরত' এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। দায় পরিশোধের দুর্মূল্য ডলার এই ছা-পোষা হাওড়ীয় কোথায় পাবে? যদিও শ্রীহট্টীয় নই, তবু একটু সাফল্য প্রার্থনা করুন!"

উঃ সে এক বক্তৃতা! ভ্যালিয়াম নামে এক উদ্বেগনিরোধক সুইস বটিকার কল্যাণে এবং বিবেকানন্দ আশীর্বাদ ভিক্ষা করে সিসটার্স, ব্রাদার্স অ্যান্ড সিসটার-ইন-লজ অফ আমেরিকার সামনে আমি যে কী নিবেদন করেছি তা আমার নিজেরই খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে, এক টুকরো চিরকুটে আমি মূল বক্তব্যটা লিখে নিয়েছিলাম। 'কে বলে বাঙালি মৃত? নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে এতো আনন্দ পৃথিবীর আর কোনো সমাজ পায় না। বাঙালি তিন প্রকার : মাইশু, মিডিয়াম ও সুইসাইড। বাঙালিকে মরিয়া প্রমাণ করিতে হইবে সে মরে নাই! এবং আত্মহনন যেহেতু আইনবিরুদ্ধ সে-হেতু পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজতেই হবে। বাঙালি সমাজের মুক্তির পথ সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সংস্কৃতিতে নয়—মুক্তির পথ বিত্তের সাধনায়, বাঙালির ঘরে-ঘরে আবার লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগ্ম সাধনা শুরু হোক।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তী এই জনসভায় ছিলেন কিনা তা আমি মঞ্চ থেকে লক্ষ্য করিনি। কিন্তু দেখলাম, আমার মূল ব্যক্তব্যটির সারাংশ তাঁর মাথায় বেশ ঢুকে গিয়েছে।

শ্যালিকা সান্নিধ্যে সস্ত্রীক আনন্দমোহন আমাকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর ক্লিভল্যান্ডনিবাসী ভায়রাভাই-এর সঙ্গে। (এই

সম্পর্কটির জন্য একটি পরিচ্ছন্ন নিটোল সংস্কৃত শব্দ থাকলে ভাল হতো!)

বয়সের তুলনায় আনন্দকে অনেক তরুণ দেখায়। বৈজ্ঞানিক সাফল্যের তুলনায় নিজেকে অনেক হাল্কা রাখার দুর্লভ পথটিও তিনি আবিষ্কার করেছেন। আদর্শ জামাইবাবুর মডেল। কন্যার এই ধরনের স্বামীপ্রাপ্তির জন্যেই আমাদের নিকটাত্মীয়ারা উপবাসে শরীর ক্লিষ্ট করেন।

প্রথমে রসিকতার আদানপ্রদানে। আমার সঙ্গীর সংযোজন, "শ্যালিকা ও জামাইবাবুর মধ্যে কে বেশি বিখ্যাত তা বলা খুব শক্ত। ইনিই একমাত্র ক্যালকাটা লোরেটো ললনা যিনি মার্কিন মুলুকে বসে বাইশ রকমের সন্দেশ তৈরি করে অতিথিদের খাওয়াতে পারেন। চক্রবর্তী মশাই তো পোকামাকড়ে ডুবে রয়েছেন, হরলিকসের খালি বোতলে রাতারাতি গলদাচিংড়ি উৎপাদনের কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আমাদের জন্যে এখনও আবিষ্কার করেননি।"

শ্যালিকা প্রতিবাদ তুললেন, "বাইশ নয়, জামাইবাবুর জন্যে এবারে মাত্র এগারো রকম সন্দেশ করে রেখেছিলাম।"

"আমরা ওঁর শ্যালিকাসৌভাগ্য সম্পর্কে ঈর্ষাবোধ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কী করতে পারি?"

শ্যালিকাকে বললাম, "আপনি বিব্রত হবেন না। আপনাকে মার্কিন মুলুকে নিরাপদে সুপাত্রস্থ করার জন্য আনন্দবাবু যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা ওঁর আবিষ্কার-কর্ম থেকে যে কোনোরকমই গুরুত্বহীন নয়, এমন গোপন রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আনন্দবাবু ইলিনয় রাজ্য থেকে ওহায়ো রাজ্যে ঘনঘন এসে আপনার ভাবী স্বামীদেবতা সম্পর্কে পরিচিত মহলে নানা রকম খোঁজখবর নিয়েছেন এবং বিভিন্ন অ্যাসিড টেস্ট-এর পরে কলকাতায় শ্বশুরমশায়কে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। সুখী বিবাহিত জীবনে আপনি জামাইবাবুকে এগারো কেন একশো দশ রকম সন্দেশ তৈরি করে খাওয়ালেও আমাদের কিছু বলার থাকতে পারে না।"

"লোরেটো-শিক্ষিতা বঙ্গতনয়াদের রন্ধনপটুতা সম্পর্কেও দেশবাসীর ভুল ভাঙবে, যদি এ-বিষয়ে যথাসময়ে দু'একটা লাইন কোথাও লেখা হয়।" আরেকজনের মন্তব্য। আমার সংযোজন, "নিজের স্বার্থেই এবার তা আমাকে করতে হবে, কারণ আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাটিও মিড্‌লটন রো-এর ওই কলেজের ছাত্রী। জয় হোক লোরেটো-ললনাদের।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তী এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আপনার কিছু-কিছু লেখা আমার নজরে এসেছে। আপনি শুধু বাঙালিদের গল্পই শোনান না, বাঙালির বিত্তসন্ধান ও অন্নসমস্যা সম্পর্কেও আপনার উদ্বেগ রয়েছে মনে হয়। সবদিক থেকে একই সঙ্গে সজাগ না হয়ে উঠলে জাতির নবজাগরণ শুরু

হবে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও কথা আছে আপনার সঙ্গে। কিছুদিন আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এদেশে এসেছিলেন। এখানকার অনাবাসীদের সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, পুরনো সেই হচ্ছে-হচ্ছে হবে-হবে মানসিকতা ভারতবর্ষ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।"

আনন্দবাবু নিজের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম সামলে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে কয়েকবার দেশ ঘুরে এসেছেন। তাঁর প্রধান কাজকর্ম অবশ্যই রাজধানী দিল্লীতে এবং কিছুটা হায়দ্রাবাদে। দু'একবার কলকাতাতেও বুড়ি ছুঁয়েছেন। কলকাতা তাঁর শ্বশুরবাড়িও বটে। তবে প্রিয় বাসস্থান গোলপার্কে—রামকৃষ্ণ মিশন আন্তর্জাতিক অতিথিশালা। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আনন্দবাবুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে—কারণ ভারতবর্ষের নতুন মানবসমাজ গঠনে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের কিছুটা সমঝোতা প্রয়োজন হবে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতবর্ষের ভিত্তিভূমিতে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন তা এখনও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি।

আনন্দবাবুর সঙ্গে ওই যে জন ক্যারল বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামন্ড রুমের সামনে ভাব হলো তা সামান্য কিছুদিনের মধ্যে বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে, গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন অতিথিশালায়, কলকাতা-বোম্বাই বিমানযাত্রার পথে। পরিচিত হয়েছি তাঁর শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে, চিঠি পেয়েছি পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

শ্বশুরমশাই বলেছেন, "ওই আমার জামায়ের একটি মিষ্টি স্বভাব—পৃথিবীর কত জায়গায় যায়, কত কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু প্রিয়জনদের ভুলে যায় না। সব জায়গা থেকেই পিকচার পোস্টকার্ড পাঠায়, পিছনে কয়েক লাইন লিখে দেয়, আমাদের প্রাণ জুড়োয়।"

বলাবাহুল্য, আমারও সেই সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের এই দেশে একসময়ে লেখকদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের, দার্শনিকদের, চিকিৎসাবিদ্‌দের, আইনজ্ঞদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতো, একে অপরের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করতেন। এখন এই কলকাতা শহরে আমরা সকলেই নিজ-নিজ দুর্গে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে ফোর্ট উইলিয়ম নামটির যথার্থতা প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা করছি!

বিজ্ঞানের যে জটিল বিষয়ে আনন্দমোহনের কাজকর্ম সে-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এতোই কম যে তার গভীরে প্রবেশ করার ধৃষ্টতা একেবারেই নেই। কিন্তু যা বুঝলাম, এই বায়োটেকনলজির ওপরেই মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করছে।

আনন্দমোহনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের গবেষণা ও শিল্পোদ্যমে তার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মার্কিন দেশে বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের সম্বন্ধেও কথা এসে গিয়েছে।

ব্যাপারটা দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে যতটা বুঝেছি, তা অনেকটা এই রকম : আমেরিকা চিরকালই ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগীদের দেশ যার প্রচলিত প্রতিশব্দটি হলো আঁতরপ্রেন্যর। কারবারী বা উদ্যোগী বললে ঠিক ব্যাপারটা আসে না।

সত্তর-আশি বছর আগে ম্যাকেঞ্জি কিং নামে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, "শ্রমিকরা কিছুই করতে পারে না যদি না মূলধন থাকে। আবার মূলধন নিয়ে কী হবে যদি শ্রমিক না থাকে? শ্রম ও মূলধন দুইই অকেজো যদি না তার পেছনে থাকে ম্যানেজমেন্ট। আবার ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালকরা যতই মহাপুরুষ হোন সমাজের সমর্থন ছাড়া তাঁরা কী করতে পারেন?"

আঁতরপ্রেন্যরদের আকুতি থেকেই নাকি আমেরিকার জন্ম। আদি এই উদ্যোগী পুরুষটির নাম কলম্বাস। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার জন্যে মূলধন জোগালেন স্পেনের রাণী ইসাবেলা। নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার হওয়ায় স্পেন যথেষ্ট লাভবান হলো। উনিশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকায় উদ্যোগীদের সুবর্ণযুগ শুরু হলো—সেই সময় কৃষিপ্রধান আমেরিকায় শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তিভূমি রচিত হলো। কয়েকজন উদ্যোগী পুরুষ আমেরিকার ভোল পাল্টে দিলেন—তাঁদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হলো বিরাট-বিরাট ইস্পাত কারখানা, মোটরগাড়ির কারখানা, কেমিক্যাল কোম্পানি এবং পেট্রোল কোম্পানি। এই শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে আবির্ভাব হলো বহুজাতিক কর্পোরেশনের—যেমন ডুপন্ট, ওয়েস্টিং হাউস, আর-সি-এ, জেনারেল ইলেকট্রিক (যেখানে আনন্দবাবু এক সময় গবেষণা করতেন)। এঁদের চেষ্টাতেই আমরা পেলাম রেডিও, টেলিভিশন, নাইলন, ট্রানজিস্টর যা সমস্ত মানবসমাজের জীবনধারা পাল্টে দিলো।

আজকের আমেরিকান শিল্পোদ্যোগের রূপরেখা কিন্তু সম্পূর্ণ পাল্টাতে চলেছে। বিরাট-বিরাট কোম্পানির সেই হৈ-চৈ আর নেই। গত কয়েক বছরে তাঁরা লক্ষ-লক্ষ কর্মীকে ছাঁটাই করেছেন। অথচ ছোট কোম্পানিরা একই সময়ে প্রায় এক কোটি নতুন লোকের অন্নসংস্থান করেছেন।

ইউনিভার্সিটি হাইট্স-এর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কফি পান করতে করতেই আমি শুনলাম "ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমেরিকান অর্থনীতি ক্রমশ সার্ভিস বা সেবামূলক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। যার অর্থ হলো, বড়-বড় ইস্পাত, কেমিক্যাল, এমন কি ইলেকট্রনিক কলকারখানায় যত লোক কাজ করছেন তার থেকে বেশি লোক চাকরি পাচ্ছেন রেস্তোরাঁয়, ট্যুরিজমে, ব্যাংকিং-এ,

কমপিউটর সফটওয়ারে, হাসপাতালে, ইস্কুলে ইত্যাদিতে। ডাইনোসর আকৃতির এমন আমেরিকান কোম্পানিও আছে, যেমন মিনোসোটা মাইনিং ম্যানুফ্যাকচারিং, যাঁরা প্রায় ৬০,০০০ জিনিস তৈরি করেন। কিংবা জগদ্বিখ্যাত জেনারেল মোটরস্ কোম্পানির কথা ধরুন। এঁরা এখন শুধু মোটরগাড়ির ব্যবসাতেই নেই। আমেরিকার বৃহত্তম তেজারতি কারবারি বলতেও এখন তাঁদেরই বোঝায়। এ-ছাড়া এঁরা এখন টানা প্রসেসিং-এর ব্যবসায় নেমেছেন, রোবট বানাচ্ছেন, এমনকি স্বাস্থ্য-যত্ন সংক্রান্ত ব্যবসায়ে নামবার পরিকল্পনা নিয়েছেন।"

আমি শুনছি এই সব কথা। একটা জিনিস জানা ছিল না, আগে সব কোম্পানিই নিজে সমস্ত যন্ত্রাংশ তৈরি করা পছন্দ করতেন। অর্থাৎ যদি মোটরগাড়ি তৈরি করতে চাও তাহলে শুরু করো মাইনিং থেকে—লোহা উঠুক খনি থেকে ইস্পাতে পরিবর্তিত হবার জন্যে, তারপর একই কোম্পানিতে তৈরি হোক সব রকম যন্ত্রাংশ। এক ভদ্রলোক জানালেন, "একসময় হেনরি ফোর্ড প্রতিষ্ঠিত ফোর্ড কোম্পানি ভেড়া পর্যন্ত প্রতিপালন করতেন—কারণ এই ভেড়ার পশম থেকে মোটর গাড়ির সীটকভার তৈরি হতো। এখন রেওয়াজ, যতটা পারো অন্য জায়গা থেকে যন্ত্রাংশ কেনো। ফোর্ডের গাড়ির অর্ধেকের বেশি যন্ত্রাংশ এখন বাইরে থেকে কেনা। কখনও-কখনও গোটা গাড়িটাই বাইরে থেকে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে।"

এর কারণ কী জানতে চাইলে, ওখানেই শুনলাম, "যে-প্রতিষ্ঠান সব চেয়ে সস্তায় সব চেয়ে সেরা জিনিস তৈরি করবে তার কাছ থেকেই জিনিস আসুক। মূল প্রতিষ্ঠানকে অজস্র টাকা খাটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস তৈরির কারখানা বসাতে হলো না, ফলে মূলধনের ওপর চাপ কমে গেলো।"

আনন্দবাবু মৃদু হাসলেন। আমি শুনলাম, "আর একটা কারণ, টেকনলজির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আপনি একটা যন্ত্রের ডিজাইন করলেন, দু'বছর পরেই সেটা নতুন কোনো আবিষ্কারের দাপটে সেকেলে হয়ে গেলো। ইলেকট্রনিকসে এবং কমপিউটারে কোনো-কোনো প্রোডাকট্-এর জীবনকাল মাত্র দুই কিংবা তিন বছর।

আমার মনে পড়লো, আমার অভাগা জন্মভূমির কথা। আমার বাড়ির সামনের পাটকল তিপ্পান্ন বছর আগে যেমন ভাবে চলতো এখনও সেই একই পদ্ধতিতে চলছে। এমন কারখানা আমি দেখেছি (এবং এঁদের নামডাকও আছে) যেখানে ষাট-সত্তর বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি এখনও মনের আনন্দে ব্যবহার করা হচ্ছে। মালিকরা যতটা পারেন টাকা লুটে নিচ্ছেন, নতুন টেকনলজিতে অর্থলগ্নি করে সময়োপযোগী জিনিসপত্র তৈরিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মার্কিন ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, টেকনোলজির এই স্বল্পায়ুর জন্যে বড় কোম্পানিরা একই

ঝুড়িতে সব ডিম না রেখে বাজার থেকে যতটা পারেন যন্ত্রাংশ কিনছেন—এর সুবিধা হলো যে-মুহূর্তে নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আসবে, সে-মুহূর্তে টুক করে পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি থেকে তাঁরা সরে যেতে পারবেন।”

তা হলে মোদ্দা কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে? জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং দাপটে আমেরিকায় বড়-বড় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে? আমার ওদেশে থাকার সময়েই দু'খানা জগদ্বিখ্যাত ইস্পাত কারখানার গণেশ ওল্টালো। এ এক অদ্ভুত জাত। নিজেদের কারখানা একের পর এক বন্ধ করে বাইরে থেকে সেই একই জিনিস জলের দরে কিনছে। তাহলে আমেরিকার শিল্পসমৃদ্ধির সুবর্ণযুগ এবার কি শেষ হবার পথে?

আমাকে বোঝানো হলো, “হ্যাঁ, অনেকে এ-ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ওইরকম নয়। গত বারো বছরে বড়-বড় আমেরিকান কলকারখানায় লাখ পঞ্চাশেক শ্রমজীবীর সংখ্যা কমলেও উৎপাদন বেড়েছে শতকরা চল্লিশ ভাগ।”

এক ভদ্রলোক বললেন, “শুনুন কিছু হিসেব। সেকেলে কলকারখানা যতই লাটে উঠুক, পৃথিবীর ইতিহাসে শান্তিকালীন সময়ে কোনো দেশ কখনও এতো চাকরির সুযোগ তৈরি করতে পারেনি যা করেছে এই মার্কিনীরা। তিয়াত্তর সালের আট কোটি চাকরি পঁচাশি সালে বেড়ে দাঁড়ালো এগারো কোটিতে! আর পঁচানব্বই সালের মধ্যে আরও দেড় কোটি চাকরির সুযোগ তৈরি হবে এদেশের অর্থনীতিতে। আপনি ইস্পাত কারখানায় চাকরি পেলেন, না ম্যাকডোনল্ড ফাস্টফুডে চাকরি পেলেন তাতে আপনার কি এসে যায়? আমেরিকান শ্রমমন্ত্রী তো সগর্বে ঘোষণা করলেন, আগামী তেরো চোদ্দ বছরে চাকরি-সন্ধানীদের থেকে চাকরির সংখ্যা বেশি থাকবে। তবে হ্যাঁ, আপনি ঠিক যেরকম চাকরিটি চাইছেন তা হয়তো না পেতে পারেন। আপনার ইচ্ছে আপিসের বড় কেরানি হওয়া, কিন্তু চাকরি যেটা রয়েছে, সেটা হয়তো কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন কিচেনে আলুভাজার।”

একটি মজার খবর পাওয়া গেলো। সম্প্রতি যে-কোম্পানিটি সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং যার প্রচুর লাভ ও রমরমা তার সঙ্গে তথাকথিত সুপার-হাই টেকনলজির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই! এটি হলো একটি চুল ছাঁটাই সেলুনের চেন!

জয় মা-লক্ষ্মীর জয়! আমাদের নন্দ নাপিতকে কোনোরকমে একখানা গ্রীনকার্ড ধরিয়ে দিলে এখানে ভেল্কি খেলা দেখাতে পারতো। নন্দর স্পেশালিটি—পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ শল্যচিকিৎসকের নিপুণতায় নরুণ দিয়ে কাটা। এই সঙ্গে ইন্ডিয়ান নরুন (গত পাঁচ হাজার বছরে যার কোনো

ডিজাইনিং পরিবর্তন হয়নি) নতুন এক বাজারের সন্ধান পেতো।

নন্দ নাপিত অনাবাসী ভারতীয় (এন-আর-আই) হয়ে মাঝে-মধ্যে যখন আমাদের হাওড়া-শিবপুরে ছুটি কাটাতে আসতো তখন স্থানীয় রোটারি ক্লাবে আমরা তার সম্বর্ধনার আয়োজন করতাম। নন্দর ডলারের দিকে আমরা কোনোরকম শনির দৃষ্টি ফেলতাম না। মায়ের দিব্যি করে বলছি, ভারতসন্তানের ডলার ওই মার্কিন দেশেই সহস্র থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটিতে রূপান্তরিত হোক, আমরা শুধু বিশ্ববাসীকে দেখাতে চাই, এই নন্দই সুযোগসুবিধে পেলে আমাদের মহানন্দের কারণ হতে পারে।

নতুন চুলছাঁটা কোম্পানি সম্পর্কে সবচেয়ে মজার যা খবর—কোম্পানির দুই প্রতিষ্ঠাতারই কাঁচিধরার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

অভিজ্ঞতা না থাকলেও, এদের ছিল মগজ এবং উচ্চাভিলাষ—সারা দিন ক্ষুর শানিয়ে, কাঁচি চালিয়ে শতখানেক ডলার কামিয়ে সন্তুষ্ট হবার ছেলে তাঁরা নন।

তাঁরা ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানীর মানসিকতায় মার্কেট রিসার্চ করলেন—চুলছাঁটার দোকানের সাফল্যের রহস্যটা কী? গবেষণায় বেরুলো : দোকানটা কোথায়, কাছাকাছি গাড়িঘোড়া পাওয়া যায় কিনা এবং চুলছাঁটার জন্য গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কিনা। আপনার পাড়ার নন্দ নাপিতও জানে, সব লোক, এমনকি বেকার এবং বৃদ্ধ পেনসনাররাও সেলুনে এসে ঘড়ির দিকে তাকান, সময় সম্বন্ধে ছটফট করেন।

এই দুইজন সেলুন-পতি লোকজন নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে এবং একের পর এক দোকান খুলে বাজিমাত করে দিয়েছেন। অথচ এঁদের ঠিক আগের ব্যবসায়ে ওঁরা গণেশ ওল্টাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এঁদের একজন খুবই স্টাইলে বড়-বড় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বলেছেন, "কাঁচা টাকা কখন প্রয়োজন হবে তা ফেলি। আগের ব্যবসায় ফেল হওয়ার কারণ, ওই ব্যাপারটা ঠিক ম্যানেজ করতে পারিনি।"

সাধু! সাধু! বোঝা যাচ্ছে, নবীন দেশ আমেরিকায় নব-নবীন উদ্যোগীদের বিপুল সাফল্য-সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও সে-দেশে হেনরি ফোর্ড ও জন ডি-রকিফেলাররা আর জন্মগ্রহণ করবেন না। আমরা আর দেখতে পাবো না কার্নেগি অথবা ডুপঁ-দের।

দুটি বিষয়েই মন্তব্যের ঝড় উঠলো অনাবাসী বাঙালি মহলে। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হলো, নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ইত্যাদি সংবাদপত্রে গভীরতর মনোনিবেশ করতে। এই সব বিষয়ে সেখানে নাকি নিত্য আলোচনা চলে—যা আমাদের রাজনীতি ও রঙ্গজগতমুখী বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে অকল্পনীয়।

প্রথম সমালোচনা : দোহাই, দেশের লোককে এই ভুল বোঝাবেন না যে আমেরিকান সমাজ এমনই প্রাণশক্তিহীন হয়ে উঠেছে যে তাহা এখন আর ফোর্ড, কার্নেগির জন্ম দিতে পারবে না—কারণ এখন মাতসুহিতা, সুমিটোমো, মিৎসুবিসির যুগ! এই খবর পেলে রকে-বসা বাঙালিরা উৎফুল্ল হবেন এই কারণে যে তাঁরা তো স্বীকারই করে নিয়েছেন, রুগ্না বঙ্গজননী ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের জন্ম দিতে পারবে না।

আমেরিকান বন্ধ্যাত্বের কারণ, আমেরিকান কোম্পানি এবং ব্যক্তিদের ওপর আয়কর বিভাগের দুর্জয় দাপট। হেনরি ফোর্ড ও রকিফেলার যখন টু-পাইস কামিয়েছেন তখন ফেডারেল ট্যাক্স ছিল নামমাত্র। ১৯১১ সালে রকিফেলার যখন ব্যবসা থেকে অবসর নিলেন তখনকার যুগে তাঁর সম্পত্তির দাম দেড় হাজার মিলিয়ন ডলার (দু'হাজার কোটি টাকার মতন!) ট্যাক্সওয়ালাদের কল্যাণে এখন আর এই ধরনের ধনসঞ্চয় সম্ভব নয়! তবে এরই মধ্যে দু'চারজন দু'একটা ছোটখাট বুদ্ধি খাটিয়ে, সামান্য কিছু টাকা ঢেলে কোটিপতি হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে কেউ একখানা পোকসওয়াগেন বাস বিক্রি করে অ্যাপ্‌ল কমপিউটার নামে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আবার কেউ সবুজ চায়ের ব্যবসায় নেমেছেন (সেলেসচিয়াল সিজনিংস), আবার কেউ কেক মিঠাই দোকানের চেন শুরু করেছেন আমেরিকান কুকি বেচবার জন্যে। বিরানব্বইটা আমেরিকান কুকির দোকান করে যদি দেশবিখ্যাত হওয়া যায় (আমেরিকান কুকি এমন একটা আহামরি কিছু পদার্থ নয়!), তাহলে আমাদের গিরীশ, নকুড়, ভীমনাগ, দ্বারিক, গাঙ্গুরাম, পরশুরাম, মিঠাই, তেওয়ারি, শর্মারা যদি ভারতীয় মিষ্টান্নমৃত নিয়ে ওদেশে একবার নাক গলাতে পারতেন কী ব্যাপারখানাই যে হতো!

মিছরিদা আমাকে তো দুঃখ করে বলেছিলেন, "ওরে আমাদের রণকৌশলেই ভুল হয়ে গিয়েছে—বিদেশে শুধু বেদান্ত-উপনিষদ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে এজাতকে কাত করা যাবে না। সেই সঙ্গে চাই শিঙাড়া, জিলিপি, গজা, সন্দেশ, রসগোল্লার বহুমুখী আক্রমণ। তারপরেই পাঠাতে হবে ইডলি-দোসা, সুকতো, শাক-চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া টেকনলজি—দ্যাখ না দেশটা আমাদের পায়ের তলায় লুটোয় কিনা। সামান্য টিভি, টেপরেকর্ডার, ভি-সি-আর, আর দু'একখানা দামে-সস্তা কাজে-ভাল মোটর গাড়ি পাঠিয়ে জাপানীরা কী করে ফেললো দেশটার। জাপানীরা এখন নাকি হাজার-হাজার কোটি ডলার ধার দিচ্ছে আমেরিকান সরকারকে এবং আমেরিকান বিজনেসকে!"

মারো গোলি জাপানীদের! ওদের সাফল্য নিয়ে তো বিশ্বময় আলোচনা। খাঁদা-নাকারা দুনিয়ার সবচেয়ে নাকউঁচু জাতের নাক দেওয়ালে ঘষে প্লেন করে দিয়েছে। আমরা ফিরে যেতে চাই ছোট বিজনেসের আলোচনায়। বুঝছি, বিরাট

দেশ আমেরিকায় এখন নতুন স্লোগান—স্মল ইজ বিউটিফুল। ছোট পরিবারই সুখী পরিবার, ছোট উদ্যোগই সেরা উদ্যোগ—অর্থাৎ বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে!

ইউনিভার্সিটি হাইটস-এর লাউঞ্জে দাঁড়ানো এক দেশোয়ালী বন্ধু মন্তব্য করলেন, "কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, ছোট উদ্যমের ব্যর্থতার সংখ্যাও বেশি। প্রতি দশটা উদ্যোগের মধ্যে অন্তত ন'টা প্রথম দু'বছরের মধ্যেই লালাবাতি জ্বালাবে।"

"সে কি দাদা! এসব কথা তো কলকাতার সরকারী ব্যাংকে ধুরন্ধর বেওসাদার সম্বন্ধেই শোনা যায়!"

একজন বললেন, "তফাত একটু অবশ্য আছে। আপনাদের ওখানে ব্যাংকের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকাটা নিয়ে ভেগে পড়াটাই হলো প্রধান ব্যবসা। আর এখানে যথাসাধ্য উদ্যমে নতুন কিছু করবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ায়।"

"তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?" আমার সবিনয় প্রশ্ন। ক'দিনের জন্যে উদ্যমের এই মহাতীর্থে এসে আমি কতটুকুই বা বুঝতে পারি এবং কতটুকুই বা জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারি যা আমার অভাগা দেশের সাধারণ মানুষের কাজে লাগবে?

প্রযুক্তিবিদ্যায় ডক্টরেট একজন হৃদয়বান মধ্যবয়সী বঙ্গসন্তান আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "সংক্ষিপ্তসার করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়াচ্ছে—সুবিশাল কলকারখানায় হাজার-হাজার লোকের চাকরির সম্ভাবনা কমছে, যদিও তার অর্থ এই নয় যে এই ধরনের উদ্যমের উৎপাদনশক্তি কমছে। দ্বিতীয়তঃ, ছোট-ছোট উদ্যম এদেশের নাগরিকদের চোখে নতুন সম্মান লাভ করছে। বড়-বড় উদ্যম এদেশের নাগরিকদের চোখে নতুন সম্মান লাভ করছে। বড়-বড় কোম্পানি ছেড়ে অনেকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন। তৃতীয়তঃ, ম্যানুফাকচারিং অর্থনীতি থেকে সার্ভিস অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানে সম্ভাবনা বেড়েই চলেছে। তাছাড়া ছেলেদের সঙ্গে বেশ কিছু মেয়েও নতুন ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।"

এই শেষোক্ত ব্যাপারটা আমার তেমন জানা ছিল না। এক সুন্দরী বঙ্গললনা বললেন, "এ-দেশে মেয়েদের দুঃখ, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা সমমর্যাদা পান না, যদিও আইন-টাইন তাঁদের পক্ষে করা হচ্ছে। এই ধরুন, কাগজে বেরিয়েছে একজন পুরুষশ্রমিক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে তাকে ডিঙিয়ে একজন মহিলাকে প্রমোশন দেওয়ায় সে মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে সেই মহিলাকে শ্লীলতাহানি করেছে।"

"অ্যাঁ! মহিলামুক্তির মহাতীর্থে একি কথা?"

বঙ্গললনা বললেন, "আপনি মিজ্ মেরি কে অ্যাশ-এর জীবনবৃত্তান্ত নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পুরনো ফাইল থেকে পড়ে ফেলুন। ইনি একটা ছোট্ট ডাইরেক্ট-মেলিং কোম্পানিতে কাজ করতেন যেখানে তাঁর প্রমোশন প্রতিবারই আটকে যেতো স্রেফ মহিলা বলেই। মনের দুঃখে এবং বিরক্তিতে ১৯৬৩ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই ছোট্ট একটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন—মেরি কে কসমেটিকস্ ইনকরপোরেটেড। এঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা হলো দরজায়-দরজায় ফেরি করে প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি করা। প্রচণ্ড সফল উদ্যম। বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ এখন প্রায় আটশ কোটি টাকার মতন। অর্থাৎ আমাদের টাটা ইস্পাত কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন!"

সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ একজন বঙ্গপুঙ্গবের সংযোজন : "সেলফ-এমপ্লয়েড বা স্বনিয়োজিত মানুষের কথা তো কলকাতাতেও এখন শোনা যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে এরকম লাখ পঞ্চাশেক পুরুষ আছেন, কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বাড়ছে না। অথচ স্বনিয়োজিত মহিলারা দলে ভারী হচ্ছেন দ্রুতবেগে। লাখ পঁচিশেক তো হবেনই। অন্তত এক লাখ নতুন মহিলা ঢুকছেন প্রতি বছর!"

"চমৎকার! মা-লক্ষ্মীদের বাড়-বাড়ন্ত হোক। এই দেখে বঙ্গললনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ুন বাণিজ্যলক্ষ্মীর আরাধনায়। এতে বাংলা উপন্যাস-শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হবে (দুপুরে কে শরৎ চাটুজ্যে—শরদিন্দুর ওপর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করবেন?) কিন্তু ভাল হবে দেশের।"

না, আমি ভারতের গর্ব মাইক্রোবায়োলজির বিশ্ববিদিত অধ্যাপক ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী থেকে বড্ড দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ ওই তো তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে জামাইবাবু স্টাইলে অপেক্ষা করছেন আমার সঙ্গে একটু ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে। ভারতবর্ষ ও বাংলার শিল্পভাবনা সম্পর্কে তাঁরও নিজস্ব চিন্তা রয়েছে।

আমি এবার আনন্দমোহনের দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, "আপনাকে ছাড়ছি না। অনেক কথা আছে।"

আনন্দমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা মানেই এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

যে-দেশে আনন্দবাবু বড় হয়েছিলেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও কোম্পানির পরিচালকদের মধ্যে বিপুল মানসিক ও সামাজিক দূরত্ব। কোম্পানির কর্তাদের ধারণা, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁরা উড়ু-উড়ু মনের দার্শনিক, নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ নেই—এমন কি পাণ্ডিত্যে প্রধান হলেও কাজে-কর্মে তাঁরা কতখানি তৎপর, সে-বিষয়ে তাঁদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপকদের মনে

ব্যবসায়—পরিচালকদের সম্বন্ধে প্রবল অবিশ্বাস। এঁদের নৈতিক মানও অনেকের কাছে সন্দেহজনক। দুই পক্ষের মধ্যে কোনো যোগাযোগ না-থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সাধারণ মানুষের কাজে লাগছে না, আর কলকারখানার লোকরা ছুটছেন জাপান, জার্মানি, আমেরিকার বস্তাপচা উচ্ছিষ্ট প্রযুক্তির সন্ধানে।

সেরা যা প্রযুক্তি, তা বিদেশের কোনো কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানিকে দিতে উৎসাহী নন। এইসব তখনই পাওয়া যায় যখন নতুন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে বা হতে চলেছে। নতুন-নতুন প্রযুক্তি অবশ্য এখন পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই পুরনো হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দবাবুর কাছেই জানলাম, আমেরিকায় এই অবস্থাটা ঠিক উল্টো। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের সঙ্গে কোম্পানি কর্তৃপক্ষদের নিবিড় পরিচয় এবং প্রায়ই ভাবের আদান-প্রদান হয়। অনেকে জানেন না যে আই-বি-এম কোম্পানি এখন বিশ্বজোড়া ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছে তার আদিতে ছিল এই কোম্পানির আর্থিক সাহায্যপুষ্ট একটি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রকল্প। আই-বি-এম কোম্পানির দূরদর্শী পরিচালক চেয়েছিলেন এমন একটি যন্ত্র যা শুধু গণনা করবে না, তার স্মৃতিও থাকবে!

বিশ্ববিদ্যালয় ও কোম্পানিদের আত্মিক যোগাযোগের ফলে অধ্যাপকরা হয়ে উঠেছেন অনেক বাস্তবসচেতন এবং কোম্পানিরা হয়ে উঠছে জ্ঞাননির্ভর!

আমাদের দেশে কোম্পানিদের সাফল্যের চাবিকাঠি, কি করে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচা যায়, কি করে আইন বাঁচিয়ে সরকারী করের বোঝা এড়ানো যায় ; কি করে মতলব খাটিয়ে সরকারী অনুদানের সুযোগ-সুবিধা পকেটস্থ করা যায়! তাই বড়-বড় কোম্পানির সবচেয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটি হলেন ট্যাক্স কনসালট্যান্ট অথবা রাজধানীর সরকার সংযোগ-অধিকর্তা। আর-অ্যান্ড ডি অথবা গবেষণা-প্রধানরা এদেশের কোম্পানি কালচারে চতুর্থ অথবা পঞ্চম পর্যায়ে পড়ে আছেন। আর পৃথিবীর সেরা দেশ আমেরিকা বুঝে নিয়েছে ভবিষ্যতের ব্যবসায়িক সাফল্যের সোনার কাঠিটি হলো জ্ঞান—নলেজ, নো হোয়াই, নো হাউ, বৈজ্ঞানিক ইনফরমেশন।

আমি জেনে বিস্মিত হলাম, জগতে শতকরা পাঁচ ভাগ লোকের দেশ ইউ-এস-এ থেকে এই সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎপত্তি হচ্ছিল। সম্প্রতি এটি কমে শতকরা পঞ্চাশ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে মার্কিন মুলুকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খরা শুরু হয়েছে। আসলে ওখানে আবিষ্কার সংখ্যা ঠিকই আছে, কিন্তু অন্যদেশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রচুর বাড়ানো হচ্ছে। এই চেষ্টা বিদেশে আরও বাড়বে এবং পরবর্তী দশ বছরে মার্কিন আবিষ্কারের গুরুত্ব হয়তো শতকরা পঞ্চাশ থেকে

শতকরা তেত্রিশে নেমে আসবে।

জাপানীরা নতুন জ্ঞানসঞ্চয়নে কিভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। ১৯৪৮ সালে জাপানী কোম্পানি ইতাচি আমেরিকায় যতগুলি পেটেন্ট নিয়েছে তার সংখ্যা বিখ্যাত আমেরিকান কোম্পানি টেক্সাস ইনসট্রুমেন্ট থেকে চারগুণ বেশি। অমন যে অমন আমেরিকান কোম্পানি জেনালের মোটরস, ফোর্ড ও ক্রাইসলার—এঁরা তিনজনে মিলে সম্প্রতি যতগুলি আবিষ্কারের পেটেন্ট সংগ্রহ করেছেন একা জাপানী নিশান কোম্পানি তার থেকে অনেক এগিয়ে আছে। জাপানী কোম্পানি ফুজি ফটো ফিলম্‌স বেশি আমেরিকান পেটেন্ট পেয়েছে আমেরিকান ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানি থেকে।

জাপানীরা বিপুল বিক্রমে নতুন-নতুন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করে চলেছেন এবং সেইসঙ্গে অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে মার্কিন মুলুকেও। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বর্ণখনিকে প্রযুক্তিগতভাবে কাজে লাগিয়েই জাপানীরা গত কয়েক দশকে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারা এখন বুঝতে পারছে, আমেরিকার এই অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার অদূর ভবিষ্যতে পর্যন্ত না-ও হতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনে হবে তাদের নিজস্ব সাধনা ও সিদ্ধির।

আনন্দবাবু বললেন, "যেসব বিষয়ে এখন বিশ্বের বৈজ্ঞানিকসমাজে বিশেষভাবে উৎসাহী, তার মধ্যে রয়েছে অতি-অগ্রসর ইলেকট্রনিকস্, সেরামিকস, রোবট, বায়োচিপস্, কৃত্রিম বুদ্ধি এবং অবশ্যই বায়োটেকনলজি।"

এতোদিন আমাদের ধারণা ছিল, যে-দেশে যত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেই দেশের তত সমৃদ্ধি। সেই হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়া উচিত ছিল ইন্দোনেশিয়া, যা এখন দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম।

তারপর ধারণা হয়েছি, যে-দেশে কলকারখানা ও দক্ষ শ্রমিক আছেন তাঁরাই বিজয়ী হবেন—প্রমাণ জাপান, কোরিয়া। আগামী যে যুগ আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো সেখানে জ্ঞান বা ইনফরমেশনই হবে প্রধান জাতীয় সহায়। ওই বস্তুটি থাকলে মূলধন অথবা কাঁচামাল ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবিশ্বাস্য শক্তির ওপর নির্ভর করেই আমেরিকানরা প্রত্যাশা করছেন, ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে উত্তরোত্তর কর্মী-সংখ্যা কমিয়েও তাঁরা দুনিয়ায় নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারবেন। একটা হিসেব এই রকম : ১৯৮৫ সালে শতকরা পঁচিশ ভাগ আমেরিকান কর্মী কলে-কারখানায় ম্যানুফ্যাকচারিং কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একবিংশ শতকের গোড়ায় শতকরা দশভাগ আমেরিকান কর্মী এই কাজ করবেন। এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্পের যোগসূত্র আরও নিবিড় হবে।

ইতিমধ্যেই তার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। একটা উদাহরণ হলো কম্পিউটারের

জন্যে প্রয়োজনীয় মাইক্রোচিপ। এর নক্সা তৈরি হচ্ছে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়ায়, সেটি যাচ্ছে স্কটল্যান্ডে প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্যে, সেই জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এশিয়ার সুদূর প্রাচ্যদেশে পরীক্ষা করে জোড়া দেওয়ার জন্যে। এবার সেই মাল ফিরে আসছে আমেরিকায় বিক্রি হওয়ার জন্যে।

বিশ্বের এই বিস্ময়কর ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় আমরা বাঙালির ছিটেফোঁটা কিছু পাবো কিনা এই প্রশ্ন তুলবার আগেই আর একটি বিষয় উঠলো। মার্কিন দেশে এইসব গবেষণা বা প্রতিষ্ঠান তৈরির মূলধন কারা যোগাচ্ছেন, কারা ঝুঁকি নিচ্ছেন?

আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভেনচার ক্যাপিটাল কথাটা নিশ্চয়ই আপনাদের কানে পৌঁছে গিয়েছে?"

আমরা রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজে নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু জাত-বাঙালি হিসেবে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

আনন্দবাবুর কথায় মনে হলো, 'উদ্যোগ-মূলধন' কথাটি বোধহয় চললেও চলতে পারে! নতুন উদ্যোগ সৃষ্টির জন্যে যে অর্থ তার নাম উদ্যোগ-মূলধন।

এই নতুন উদ্যোগে মূলধন খাটাতে উৎসাহ দেবার জন্যে আমেরিকায় নানারকম কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের রোজগার একটু বেশি, তাঁরা তাঁদের আয়ের একটা অংশ এইভাবে বিনিয়োগ করে ট্যাক্স বাঁচাচ্ছেন। অবশ্যই এইসব উদ্যোগে বেশ কিছুটা ঝুঁকি আছে—প্রচেষ্টা সফল না-ও হতে পারে, টাকাটা জলে যেতে পারে, কিন্তু যদি একবার সফল হয়, তখন অবিশ্বাস্য লাভ!

আপনার যদি কোনো উদ্যোগ-স্বপ্ন থাকে তবে এগিয়ে আসুন—টাকার অভাব হবে না। এই ধরনের প্রচেষ্টায় খাটাবার জন্যে রয়েছে অন্তত বারো হাজার মিলিয়ন ডলার—যাকে দিশি টাকায় রূপান্তরিত করতে গেলে আমার অঙ্ক বিদ্যায় হবে না! অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা শুনতে চান?

মিচেল কাপোর—বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। আগে রেডিওতে অনুরোধের আসরমার্কা একটা প্রোগ্রাম চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারপর কিছুদিন মহেশ যোগী উদ্ভাবিত ট্রান্‌সেনডেন্টাল মেডিটেশন-এর শিক্ষক। এখন কোটি কোটি ডলারের লোটাস ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশনের মালিক।

বড়-বড় কোম্পানি বেশ বিপদে পড়েছেন। তাঁরা দেখছেন মোটা মাইনেতে সেরা ম্যানেজার নিয়োগ করলেও ম্যানেজাররা কিছুদিনের মধ্যে হাজার রকম নিয়মকানুনের ফাঁসে জড়িয়ে নিজেদের সেই কল্পনাশক্তি ও উদ্যম হারিয়ে ফেলছেন যা ছিল এইসব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাদের প্রধান মূলধন। এঁরা অনেকে এখন তাই ম্যানেজারদের উৎসাহ দিচ্ছেন—কোম্পানির অর্থসাহায্যে নতুন কোনো উদ্যোগে সৃষ্টি করুন। কেউ-কেউ আবার ছোট-ছোট গবেষণাকেন্দ্রিক

উদ্যোগে শেয়ার কিনছেন যাতে একদিন ছোট জায়গায় বড় কিছু আবিষ্কার হলে তার কিছুটা সুবিধে পাওয়া যায়।

আনন্দমোহন বললেন, "ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আমেরিকায় এসে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। ঠিক ছিল এক ঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন জমে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত তিনি দু'ঘণ্টা ধরে আলোচনা করলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে বেশ অবহিত—ভারতবর্ষ যেখানে রয়েছে সেখানে থাকতে হলেই যে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হবে তা তিনি বোঝেন। তিনি জানেন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে জোর কদমে আমাদের এগোতে হবে। সরকারী লাল ফিতের বন্ধনই যে অনগ্রসরতার একটা কারণ, তা তিনি অবশ্যই বুঝতে পারেন। এই বাঁধন খানিকটা ঢিলে করলে অগ্রগতি অনিবার্য।"

এরপর আনন্দ চক্রবর্তী দিল্লিতেও সরকারী নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং এইসব যোগাযোগ থেকেই সৃষ্টি হলো ভারতের বিশেষ ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োটেকনলজি। উদ্দেশ্য একটাই, ভারতবর্ষও বায়োটেকনলজির ক্ষেত্রে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করুক এবং তার থেকে নতুন শিল্প সম্ভাবনা গড়ে উঠুক।

"গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগও সন্ধান করছি।" আনন্দমোহন বললেন, "এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হোক যেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও গবেষণায় এগিয়ে চলুন এবং প্রয়োজনে অন্য দেশ তার সুবিধে নিক।"

"এদেশের কোম্পানিদের কিভাবে এই কাজে জড়ানো যায় তা আমরা ভেবে দেখছি", আনন্দবাবু বললেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখ করলেন, 'ইন্ডিয়ান কোম্পানিরা বিদেশ থেকে প্রযুক্তি কিনে চটপট প্রফিট ঘরে তুলতেই ব্যস্ত, গবেষণায় তাঁদের মন নেই। অথচ মার্কিন মুলুকে সব কোম্পানির একটা সুদূরপ্রসারী স্ট্রাটেজিক প্লানিং আছে। ভবিষ্যতে শিল্পের রূপরেখা কি হবে তা আন্দাজ করে লাভের পাঁচ অথবা দশ শতাংশ এমন সব গবেষণায় ব্যয় করেন, যার সঙ্গে হয়তো বর্তমান ব্যবসার কোনো সম্পর্কই নেই।"

"বিজ্ঞান ও ব্যবসায় বুদ্ধির মিলন হলে কী হয়, তা শুনুন এবারে," বললেন আনন্দমোহন চক্রবর্তী।

"এই তো মাত্র সেদিনের কথা—১৯৭৮ সাল। হার্বার্ট বয়ার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রির অধ্যাপক। তিনি বায়োটেকনলজির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও এ-বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা করলেন। খবরের কাগজে সেই বক্তৃতার রিপোর্ট পড়লেন রবার্ট সোয়ানসন নামে এক ছোকরা। রিপোর্ট পড়েই তিনি বয়ারকে লিখলেন, 'আমি সম্প্রতি বোস্টনের

ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম-আই-টি) থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিসট্রেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছি, আমি আপনার সঙ্গে কুড়ি মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই'।

হার্বার্ট লিখলেন, 'আপনি আসতে পারেন, তবে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না'।

"কিন্তু আসল সাক্ষাৎকার চললো দু'ঘণ্টা ধরে। রবার্ট সোয়ানসন জানতে চাইলেন, গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা বয়ার কিভাবে সংগ্রহ করবেন? বয়ার জানালেন, তাঁকে সরকার অথবা কোনো খয়রাতি ফাউন্ডেশনের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে হয়। রবার্ট সোয়ানসন বললেন, 'আমার চাকরিবাকরিতে মন নেই। আমি নতুন কোনো উদ্যমে নিযুক্ত হবার উত্তেজনা খুঁজছি। আসুন না আমরা দু'জনে হাত মেলাই। আপনি আপনার পরবর্তী গবেষণার জন্যে কারও কাছে হাত পাতবেন না। আপনার আমার কোম্পানিই এই টাকা দেবে। আসুন আমরা দুজনে হাজার পঞ্চাশেক ডলার ঢেলে একটা কোম্পানি স্টার্ট করি—নাম হোক জেনেনটেক। আমি এখনই পাঁচ হাজার ডলার ঢালছি। আপনি হবেন এই কোম্পানির গবেষণা সংক্রান্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আমি হবো বিক্রি এবং ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট'।

"তারপরে যা ঘটেছে তা এখন উপন্যাসের থেকেও অভিনব। জেনেনটেক ইনকরপোরেটেড বায়োটেকনলজির ব্যবহার ঘটিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন ডায়াবিটিসের পক্ষে অপরিহার্য ইনসুলিন এবং হিউম্যান গ্রোর্থ হর্মোন বিষয়ে।"

ইনসুলিনের ব্যাপারে আনন্দবাবু যা বলেছিলেন তা আমি ঠিক মতন লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার ভুল হতে পারে। তবে যা মাথায় ঢুকেছিল তা এই রকম—ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত কষাইখানায় পশুশরীর থেকে। এই ইনসুলিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, এবং পৃথিবীতে ডায়াবিটিস রোগীদের বিরাট চাহিদা মেটানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই লাইনে বিখ্যাত কোম্পানির নাম—আমেরিকার এলি লিলি।

জেনেনটেকের গবেষণা হলো টিসু কালচার সংক্রান্ত। যার ফলে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে পশু শরীরে এই ইনসুলিনের উৎপাদন অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে যাবে, যা স্বাভাবিকভাবে জিন তৈরি করতে প্রস্তুত নয়। জিন ও ব্যাকটিরিয়ার কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ ঘটিয়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যে ইনসুলিন উৎপাদন অনেক সহজ হয়ে উঠলো।

এই বিদ্যা দিয়ে জেনেনটেক নিজে নতুন কারখানা খুললো না, তারা এলি লিলি কোম্পানির সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে ফেললো। তার পরের ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ। সেই পঞ্চাশ হাজার ডলারের জেনেনটেক কোম্পানির দাম

এখন কয়েকশ কোটি টাকা। এঁরা দ্রুতগতিতে আরও কিছু ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পৃথিবীর বিখ্যাত-বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানি এই গবেষণা-কোম্পানিতে কিছু শেয়ার নেবার জন্যে ব্যাকুল। সোয়ানসন ও বয়ার পাঁচ-ছ বছরে কয়েক শ কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বায়োটেকনলজির মাহাত্ম্যে।

দেশে ফিরে এসে জেনেনটেক ইনকরপোরেডেট সম্পর্কে কিছু খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করছিলাম। এতো বিরাট সাফল্য, কিন্তু মার্কিন ডাইরেক্টরি দেখলে বোঝে কার সাধ্য! কোম্পানির ঠিকানা চারশ ষাট পয়েন্ট স্যান ব্রুনো বুলেভার্ড, স্যানফ্রানসিসকো। প্রেসিডেন্ট : রবার্ট এ সোয়ানসন। ভাই-প্রেসিডেন্ট : হার্বার্ট ডি বয়ার। বিক্রি : ৩২.৬ মিলিয়ন ডলার। কর্মী সংখ্যা ৫০০। প্রোডাক্ট : ওষুধ, ইনডাসট্রিয়াল কেমিক্যালস ও কৃষি সংক্রান্ত জিনিসপত্তর!

আমার অনুরোধে আনন্দমোহন বায়োটেকনলজির বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এর ফলে নতুন-নতুন ওষুধ আবিষ্কার হবে অনেক কম খরচে যা মানুষ ও পশুদের কাজে লাগবে। তারপর ধরুন নতুন-নতুন ভ্যাকসিন। এর অসীম সম্ভাবনা।

গ্রোথ হরমোনটা কি জানতে চাইলে আনন্দমোহন বললেন, "ধরুন, কয়েক ফোঁটা হরমোন ঢোকালে ছাগল এবং মুরগির সাইজ হয়তো বিরাট হবে। যে ছাগল বড় হতে দু'বছর লাগতো তা ছ'মাসে প্রমাণ সাইজের হবে, ফলে গ্রাম্য চাষীদের রোজগার শতগুণ বেড়ে যেতে পারে এবং সাধারণ মানুষের উপকার হবে। কিংবা ধরুন, গোরুর দুধ দশগুণ বেড়ে যাবে। বাউনের সেই গোরুর কথা আমরা তো শুনেছি, যা খাবে কম অথচ দুধ দেবে বেশি ; তা হয়তো এই বায়োটেকনলজির দ্বারাই সম্ভব হবে।"

"আর কৃষিক্ষেত্রে এই বিদ্যার সম্ভাবনা তো প্রায় রোমাঞ্চ জাগায়। ধরুন এমন ধান বা গমের বীজ তৈরি হলো যা খুব কম জলেও বড় হয়ে উঠলে অতি দ্রুত। কিংবা বাতাবি লেবু সাইজের কমলালেবু আপনার বাগানে ফলতে শুরু করলো। বাতাবি লেবু হয়তো হয়ে উঠলো রাক্ষুসে সাইজের কুমড়োর মতন। চলে আসুন আমের ক্ষেত্রে। দশেরি আম ছোট বলে আর কোনো দুঃখ আপনাদের থাকবে না—সাইজ দশগুণ বেড়ে উঠলো। তারপর টম্যাটোর স্বাদে ভরা পটাটো তৈরি করতে পারেন, নাম দিন পোটোম্যাটো। অর্থাৎ প্রকৃতি তখন মানুষের হাতের মুঠোয়। ছোটবেলায় দেখেছেন, মাঠে একবার ধান হয়, এখন সাঁইথিয়ার তে-ফলা ধানের দেখা পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে হয়তো দেখলেন, এমন ধান হচ্ছে যা দু'সপ্তাহেই প্রমাণ সাইজের হয়ে উঠেছে।"

"তারপর ধরুন সুরাসার ইনডাসট্রিয়াল অ্যালকোহল। ঝটপট আট-দশগুণ

উৎপাদন বাড়িয়ে ফেলা কিছুদিনের মধ্যেই অসম্ভব থাকবে না। যদি আমরা মন দিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাই। আমরা এই বিদ্যা বীট চিনি বা আখের ক্ষেত্রে লাগাতে পারি। নারকোল তেল, সরষের তেল, পাম অয়েলের ক্ষেত্রেও এই বিপ্লব আনা যেতে পারে। তবে ভারতবর্ষ যদি নিজে গবেষণায় না ঢোকে তা হলে পরের দয়ার ওপর থাকতে হবে, এই সব বিদ্যা সংগ্রহ করার জন্যে কোটি-কোটি টাকা রয়ালটি গুণতে হবে। একটা মস্ত সুবিধে, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব নেই—তাদের শুধু একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে এনে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কাজে লাগাতে হবে।"

যা শুনতে খুব ভাল লাগলো, কেন্দ্রীয় সরকার এ-বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহী। এইসব গবেষণা চালানোর জন্যে হাজার-হাজার একর জমি জুড়ে কোটি-কোটি টাকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। এবং অনাবাসী ভারতীয়রাও এই উদ্যোগে টাকা ঢালতে রাজি। ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু ভারতীয় কোম্পানিও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তবে দুঃখের কথা ওই যে কিছুদিন আগে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যাঁরা বিদেশে গিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনও কলকাতার কোম্পানি ছিল না।

"অথচ প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে কলকাতার।" দুঃখ করলেন আনন্দমোহন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভীষণ পিছিয়ে যাচ্ছে, শংকরবাবু। নতুন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভূমিকাই নেই। অথচ পঁচিশ বছর আগে কিন্তু এমন ছিল না।"

অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ এই আনন্দমোহন। কম কথারও মানুষ বটে। তবুও একসময় বললেন, "গত পনেরো বছরে সর্বভারতীয় সম্মানের ক'জন বৈজ্ঞানিক আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়েছেন?"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন আনন্দমোহন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, "এর কারণ কী? কোনো নেতা বা কোনো রাজনৈতিক দলই তো বিজ্ঞানীদের বলেননি, আপনারা বিজ্ঞান সাধনাকে শিকেয় তুলে পলিটিকস করুন।"

উত্তর দিতে চাইছেন না আনন্দমোহন। কিন্তু আমি ছাড়বো না। মুখ না তুলে শান্তভাবে তিনি বললেন, "এখনকার বিজ্ঞানীরা বোধ হয় একটু উদ্যমহীন, নিজেদের এগজার্ট করেন না। বিনা সংগ্রামে পরাজয় স্বীকারের মনোভাব বড্ড বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।"

আমি তাকাচ্ছি আনন্দমোহনের মুখের দিকে। তিনি বললেন, "কাগজে পড়ি কলকাতা 'ডাইং সিটি'। কলকাতার প্রাণশক্তি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলেই আমার বিশ্বাস। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে আমি মাঝেমাঝে যাই। মানুষের সঙ্গে কথা বলি। যা আমাদের অভাব তা হলো 'গাট্‌স্‌', তেজের, সাহসের, সংকল্পের!"

তবে নিরাশ হতে রাজি নন সেন্ট জেভিয়ার-এর প্রাক্তন ছাত্র আনন্দমোহন চক্রবর্তী। "আমি শুনছি, নতুন এক প্রজন্মের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যারা কর্মযজ্ঞে নামতে চায়। আমি এবং বিদেশের অনেকেই তাদের সাহায্য করতে চাই। একটা জিনিস দেশের লোকদের দয়া করে বলবেন, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রগতির যে-চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভূমিকাই থাকবে না, যদি না এখনই আমরা সকলেই সজাগ হই। বায়োটেকনলজির বিপ্লব কলকাতাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। আমার কিছু আমেরিকান বন্ধু আছেন, যাঁরা সামান্য টেকনলজি দিতে অরাজি হবেন না, অনাবাসী বাঙালিরা যোগ্য আধার পেলে কিছু টাকাও ঢালতে পারেন।"

আবার সেই দুঃখের সুর, "গত কুড়ি বছর ধরে ভারতের বিজ্ঞানতীর্থ কলকাতা পিছিয়ে চলেছে তো চলেছেই। আমি যখন আগামী দশকের কথা ভাবি তখন দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। তবে আপনাকে যা বলছিলাম, শুধু সমালোচনা করে কি হবে? নতুন পথ খুলতে হবে। সাফল্য একবার এলে তার নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ আরও সাফল্যের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে। এই ভাবেই তো আমেরিকা তার সাফল্যের স্বর্ণসৌধ গড়ে তুলেছে।"

আনন্দমোহন বললেন, "বিদেশে অনেকদিন থেকে একটা সারসত্য বুঝেছি কাজে ভয় করলে চলবে না, সুযোগ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তবে শুধু উৎসাহ থাকলেই কাজে সফল হওয়া যায় না। সেইসঙ্গে চাই কর্মশক্তি, সহ্যশক্তি, মগজ এবং 'মোটিভেশন'। এই শেষকথাটার বাংলা আমার জানা নেই। এমন এক প্রবর্তনা যা মানুষকে অসম্ভবকে সম্ভব করার সাধনায় অনুপ্রাণিত করে।"

অন্য কেউ হলে কথাগুলো হয়তো লেকচারের মতন শোনাতো। কিন্তু আনন্দমোহনের অভাবনীয় সাফল্য আমাদের যুবক সমাজের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে। আমি জানি, এই যুবকটি একদিন মাত্র আট ডলার পকেটে নিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং নিজের সাধনায় সরস্বতীর মানসপুত্র হিসেবে এখন বিদেশীদের প্রীতি ও সম্মান লাভ করেছেন।

শেষ পর্যায়ে আমি নতুন দেশ আমেরিকা সম্বন্ধে দু'একটি প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

কম কথার মানুষ আনন্দমোহন একটু ভাবলেন। তারপর বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় বক্তব্য একটু না ফেনিয়ে বললেন, "ভীষণ প্রতিযোগিতার দেশ এই আমেরিকা। তবে কাজে ভয় না পেলে যথেষ্ট সুযোগ আছে এখানে। আপনি যতটা সফল হতে চান ততটাই হতে পারেন যদি মদত যোগাতে পারেন।"

"মার্কিনী সভ্যতার শক্তিগুলো যদি একটু দেখিয়ে দেন"—আমার সবিনয় নিবেদন সাঁইথিয়ার ছেলে এবং কলকাতার জামাইবাবু আনন্দমোহনের কাছে।

আনন্দমোহন এবার কোনো চিন্তাই করলেন না। "লিখে নিন, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় এই সভ্যতায় সত্যিই সম্ভব। এ-বিষয়ে কোনো বুজরুকি নেই। যদি কারও কোনো যোগ্যতা থাকে আমেরিকা তাকে সুযোগ দেবে। তবে বড্ড কঠিন প্রতিযোগিতা, দুনিয়ার সব জায়গা থেকে মানুষ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হয়েছে ভাগ্যলক্ষ্মীর জয়মাল্য নিতে। যারা এখানকার লোক তাদের পক্ষেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ কঠিন। কিন্তু অতি-নিন্দুকেরও স্বীকার করতে হবে, বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, যে ইচ্ছে করবে সে-ই রণক্ষেত্রে নেমে পড়তে পারে, যখন খুশি।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

আনন্দমোহন বললেন, "যে-কোনো বিষয়ে যারা নতুন পথের ইঙ্গিত দিতে পারে তাদের মাথায় করে রাখে এই দেশের মানুষ।"

দু'একটা দুর্বলতারও সন্ধান করছি আমি, আনন্দমোহন বুঝলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "প্রচণ্ড প্রতিযোগিতাই এই সমাজের প্রধান দুর্বলতা। প্রত্যেকেই কখন হেরে যাবো এই দুশ্চিন্তায় সারাক্ষণ মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। অনিশ্চয়তার এই পীড়ন বা চাপের ফলে সমাজকে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আপনার নজর এড়াবে না।"

একটু ভাবলেন আনন্দমোহন। বললেন, "এর কারণ বোধহয় মানুষের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা বা স্বাধীনতা। সবাই জানে, যা হয় একটা কিছু করে বেঁচে থাকা যাবে, না খেয়ে মরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থনীতিই বোধহয় সব দেশে পারিবারিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের দেশের ছেলেরা জানে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, কিন্তু আমেরিকায় তা নয়। যে-শক্তি পরিবারকে একসূত্রে গেঁথে রাখে তা আমেরিকায় দুর্বল, সামাজিক ভিত্তিটাও বোধহয় কিছুটা দুর্বল। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ জানি না, তবে এইটাই সত্যি।"

আনন্দমোহনের শেষ কথাটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। খেয়ালের বশে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাধীনতা দুটো মিলিয়েই বোধহয় এমন বিচিত্র সমাজ তৈরি হয়।"

ক্লিভল্যান্ডে সম্মেলনের দিনগুলো বড় আনন্দে কেটেছিল। বাঙালির মানসিক সজীবতার সঙ্গে আমেরিকান কর্মদক্ষতার মিলনে সবরকম ব্যবস্থা হয়ে উঠেছিল অতি চমৎকার।

বাঙালি পুরুষ ও বাঙালি মহিলা মুখে হাসি ফুটিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে চলছে আড্ডা। অথচ সব কিছু আয়োজন চলছে ঘড়ির কাঁটার মতন। কত দূর দূর অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছেন সপরিবারে, তাঁদের অসুবিধেও অনেক। কিন্তু সবাই হাসিমুখে সব রকম কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছেন। সারাজীবনে কম সভা-সমিতিতে যাইনি, কিন্তু ক্লিভল্যান্ডের মতন এমন চমৎকার ব্যবস্থাপনা কোথাও দেখিনি।

কর্মকর্তাদের আর একটা মজার দিক হলো, এতো বড় সম্মেলনের আয়োজনের দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারেই বেশ কয়েকজন দূরের অতিথি এসেছেন, এবং তাঁদের সকলকে নিয়ে সারাক্ষণ এরক গুলজার হচ্ছে! ব্যাচেলর রণজিৎ দত্ত তো দশভুজ হয়ে উঠেছেন, তাঁর বাড়ি এখন হাউস ফুল—অথচ সবকিছু সাংসারিক দায়িত্ব তাঁর। একটি ঠিকে কাজের লোক সপ্তাহে দু'বার ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসেন। কিন্তু রণজিৎ দত্তর ছবির মতন সাজানো সংসার দেখলে কে বলবে তাঁর গৃহিণী নেই, রাঁধুনি নেই, চাকর নেই?

কাজেকর্মে কষ্ট আছে, কিন্তু হাতের গোড়ায় দেশের মানুষ পেলে বিদেশের বাঙালিরা সব দুঃখ ভুলে কিছুক্ষণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। যে-সব পরিবার বাইরে থেকে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রয়েছেন, প্রসন্নহৃদয় রণজিৎ তাঁদের স্ত্রীদেরও বলছেন, "আমার বউ নেই। কিন্তু বাড়িতে সাজগোজের ইনফ্রাস্টাকচার অর্থাৎ আয়না আছে। সুতরাং চলো সব ওখানে সন্ধ্যার আসরে হাজির হবার আগে।" এর অর্থ রণজিৎবাবু অগণিত মানুষকে চায়ের নামে ভুরিভোজনে আপ্যায়ন করবেন—বাড়িটা সব অর্থে আনন্দভুবন হয়ে উঠবে।

ডঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যও এই আড্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। এঁর মেজাজটি অনেকটা মুজতবা আলীর রচনার মতন—সুযোগ পেলেই একটু ইয়ারকি ফচকেমি করে নেন।

আনন্দমোহন সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার কয়েকটি পয়েন্ট আমি রণজিৎ-গৃহের ড্রইংরুমে বসে টুকে নিচ্ছিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু বললেন, "আরে মশাই লেখা তো সারাজীবন আছে, ক্লিভল্যান্ডের এই আড্ডা

তো আর আগামীকাল থাকবে না।"

"বেচারা ঢেঁকি! তাকে স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয়।" আমাকে সমর্থন করলেন রণজিৎবাবু।

আনন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে-বিষয়ে কথা হচ্ছিল তা দিব্যেন্দু কিছুটা শুনেছেন। দিব্যেন্দুর রসিকতা, "সায়েবদের জয়যাত্রা মন খারাপ করে দেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তেড়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা লেখা পড়েছিলাম, প্রধান চরিত্রের নাম মিস্টার মানকেলা—তাকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল!"

এবার জানাতে বাধ্য হলাম মানকেলো সায়েবের ঘটনাটা আমিই লিখেছিলাম— গতবারের মার্কিন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে।

হৈ-হৈ করে উঠলেন দিব্যেন্দুবাবু। বললেন, "লেখাটা এখানে অনেকের প্রিয়—মুখে-মুখে প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজে খুব রটে গিয়েছে।"

দিব্যেন্দু ছাড়েননি। লেখাটা আমাকে পড়তে বাধ্য করছিলেন। মানকেলো সায়েবের এই বৃত্তান্ত কোনো বইতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁর ব্যাপারটা জেনে রাখা প্রয়োজন ভেবেই এখানে দেওয়া হলো।

মাখনদার চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই বুঝলাম, উনি ভীষণ ইনসালটেড ফিল করছেন। বিদেশে এমন ঠাণ্ডা পরিবেশেও তাঁর চোখ দুটো ইলেকট্রিক হিটারের ইগনিশন কয়েলের মতো লাল হয়ে উঠেছে।

আমরা দুজনেই মিস্টার মানকেলোর কার্পেটে-মোড়া ঘরে ফুলের মতন নরম ফোম-রবারের গদিতে বসে আছি। কোনোরকম শারীরিক কষ্ট হবার কথা নয়। তবু মাখনদা বাংলায় আমাকে জানালেন, "খুব অস্বস্তি বোধ করছি, শংকর। মনে হচ্ছে যেন শর-শয্যায় বসিয়ে রেখেছে আমাকে।"

মাখনদার মেজাজ এবং মুখচোখ দেখে আমিও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একেই আমি নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ—তার ওপর পাকে-চক্রে এসে পড়েছি এই ফরেন কানট্রিতে। আমি কোনোরকমে ইডিয়মেটিক বাংলায় হাওড়া-শিবপুরের ইনটোনেশন দিয়ে মাখনদাকে অনুরোধ জানালাম—ধৈর্য ধরো, বাঁধো বাঁধো বুক! বিখ্যাত এই কোটেশনটা হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে তাঁর কোনোদিনই ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু দেশাত্মবোধক উদ্ধৃতিতেও কাজ হলো না। প্রত্যুত্তরে মাখনদা আমাদের ইস্কুলের আর একখানা বিখ্যাত উদ্ধৃতি ছাড়লেন, "ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ!" তারপরেই মাখনদার বিপদ সংকেত, "শংকর, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে—আমার মেজাজের ব্রেক এবার নিশ্চয় ফেল করবে। তুই

আমাকে ক্ষমা করিস। মনে হচ্ছে আমি তলিয়ে যাচ্ছি—কিন্তু আর নিচে নামতে আমি রাজি নই।"

মাখনদার কথাতেই বুঝেছি, ক্রাইসিস পয়েন্টে পৌঁছতে আর দেরি নেই। ধৈর্যের বাঁধ বিপন্ন, বন্যা যে-কোনো সময় বিপদসীমা অতিক্রম করবে।

ক্রাইসিসটা কী? কোথায়? কেন? এবং মানকেলো সায়েবটিই বা কে?

কি করে বিদেশে দৈবের বশে আমি এই গোলমালে জড়িয়ে পড়লাম তা অবশ্যই আপনাদের কাছে নিবেদন করতে হবে। কিন্তু তার আগে মাখনদার পরিচয়টা আপনাদের কাছে জানিয়ে রাখতে চাই।

মাখনদা মানে মাখনলাল পাঁজা। স্বদেশ থেকে সতেরো হাজার সাতশ সাতাশ মাইল দূরে এই শহরে মাখনদার সঙ্গে যে আমার পুনর্মিলন হবে তা আমাদের ইস্কুলের মহাকবি গৌরমোহন দাস পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেননি।

মাখনদার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা হাওড়া ওলাবিবিতলা লেনের মুখে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যখন বললেন, "ও লর্ড, কেন তুমি এই ইন্ডিয়া সৃষ্টি করেছিলে? নরক বলে তো একটা জায়গা তোমার আন্ডারে ছিল, তাতেও মন পোষালো না?"

"কী এমন ব্যাপার হলো মাখনদা? অমন দাপাদাপি করছেন কেন?" আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"যারা নরকেও থাকবার যোগ্য নয়, সেইসব পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যই তো ইন্ডিয়া এবং স্পেশালি এই হাওড়া শহর তৈরি হয়েছে।" এই বলে মাখনদা নাকের ওপর রুমালটা আরও জোরে চেপে ধরেছিলেন।

"রসিকতা করিস না, শংকর। সব জিনিসের ইয়ে একটা সীমা আছে," মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "তুই এখনও ফিক-ফিক করে হাসছিস?"

"কী হলো আপনার মাখনদা?" ইস্কুলের সিনিয়র ছাত্রদের আমরা 'দাদা' ও 'আপনি' বলতে ট্রেনিং পেয়েছি। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখানোর অনেক সুবিধে—বাসে দাদারা কেউ থাকলে টিকিট কাটতে হয় না।

মাখনদা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই কী ওই পচা কাঁঠালের ভুতুড়িটা দেখতে পাচ্ছিস না? তোর নাকের কি কোনো সিরিয়াস অসুখ করেছে?"

নাক তুলে কথা বলায় আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যাকে বলে কিনা অকৃত্রিম হাওড়া নাগরিক, আমাদের নাকের সহ্যশক্তি অনেক। রাস্তা, বাড়ির বারান্দা এসব তো ময়লা ফেলার জায়গা বলেই আমরা জানি। এই তো একটু আগেই বুড়োশিবতলায় মিষ্টির দোকানের সামনে একটা মরা বেড়ালকে পচতে দেখে এলাম। কই আমার তো মেজাজ খারাপ হলো না? সেখানে কেমন খোশ মেজাজে যুবকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা গল্পগুজব চলছে, কেউ তো ব্যস্ত

হচ্ছে না। আর সামান্য একটা কাঁঠালের ভুতুড়ি—যার ওপর মাত্র ডজন পাঁচেক নীলরঙের মাছি নট নড়ন-চড়ন হয়ে বসে আছে, সেই দেখে মাখনদার এমন বদমেজাজ!

"আমেরিকা হলে এতেক্ষণে কী হতো জানিস?" মাখনদা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

আমি ইন্ডিয়ান নাগরিক, আমার আমেরিকা-রাশিয়া-চায়নার খবর রাখার কী দরকার? আমি পরের ব্যাপারে অতশত মাথা ঘামাই না।

মাখনদা বললেন, "এতোক্ষণে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। অন্ততঃ দেড়শ টেলিফোন কল চলে যেতো আমেরিকান মিউনিসিপ্যালিটিতে। পুলিস এসে গ্রেপ্তার করতো যে এই কাঁঠাল ফেলেছে তাকে—কাঁঠাল খাও আর কাঁঠালের ফোঁড় গনো না।"

আমি তখনও অতশত বুঝি না। আমি বলেছিলাম, "আমেরিকা কী এখনও ব্রিটিশ শাসনে রয়েছে?"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন মাখনদা। "এর সঙ্গে স্বাধীনতা পরাধীনতার সম্পর্ক কী? তুই ওয়ার অফ ইনডিপেনডেন্সের চ্যাপটার পড়িসনি? কোন দুঃখে ইউ-এস-এ ব্রিটিশের দাসত্ব করতে যাবে? বরং উল্টোটাই এখন সত্যি হতে চলেছে।"

আমি নার্ভাস হয়ে বললাম, "এই-সব অত্যাচার পরাধীন দেশে ইংরেজরাই চালাতো জানতাম। আমার দেশের রাস্তায় আমার খাওয়া কাঁঠালের ভুতুড়ি ফেলবো তাতে পুলিসের কি? এটা তো আমাদের মৌলিক অধিকার। না-হলে এতো কষ্টে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মেরে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ইংরেজকে কুইট ইন্ডিয়া করিয়ে লাভ কী হলো?"

মাখনদার মাথায় তখন ফরেন ব্যাপারটা গজ-গজ করছে। বললেন, "অনেক পাপ করলে লোকে এই ইন্ডিয়ায় জন্মায়! বিদেশের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। সভ্য হতে আমাদের আরও দেড় হাজার বছর লেগে যাবে।"

মাখনদাই বলেছিলেন, "ফরেনে লোক খৈনি টিপতে-টিপতে কানে পৈতে জড়িয়ে কথায়-কথায় রাস্তার ধারে বসে পড়ে না। ফরেনে আমাদের মতো লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে না, গায়ে গা ঠেকলে ফরেনের সায়েবরা পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।"

"ফরেনে যে মা-ভগবতীকে কেটে খায়, তার বেলায়?" আমি পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু মাখনদার সঙ্গে পেরে ওঠাই শক্ত ব্যাপার। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দুরা যে কথায়-কথায় মোষ বলি দেয় তার বেলায়? মোষ আর গোরুতে তফাৎ কি?

কালো রং বলে যত দোষ!"

আমরা মাখনদার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছি, তিনি মনে-মনে বিদেশকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই ডার্টি ইন্ডিয়ার প্রায় কিছুই তাঁর পছন্দ নয়।

চলনে-বলনে মাখনদা একেবারে পাকা সায়েব হয়ে উঠেছেন। কি করে টাইয়ের গিঁট বাঁধতে হয়, কোন সময় কোন রঙের জুতো পরতে হয়, কখন থ্যাংক ইউ বলতে হয়, কত সামান্য কারণে চেনা-অচেনা লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়, কোথায় পকেট থেকে রুমাল বের করতে নেই, কোথায় ঢেকুর তোলা নিষিদ্ধ—এসব তাঁর কণ্ঠস্থ।

মাখনদার সঙ্গে কিছুক্ষণ মিশলেই আমাদের হীনমন্যতা এসে যেতো। মাখনদার গায়ের শার্ট বকের মতো শাদা, ইস্ত্রিবিহীন প্যান্ট পরতে তাকে কেউ দেখেনি। মাখনদার জুতো সব সময় ঝক-ঝক করতো—ইচ্ছে করলেই ওদিকে মুখ রেখে চুল আঁচড়ে নেওয়া যায়। মাখনদার চুলও সব সময় বিন্যস্ত—সব সায়েবী নিপুণতা, কোথাও দিশিলোকদের মতো খুঁত নেই।

মাখনদার আরও গুণ ছিল। তিনি ইংলিশ স্টেটসম্যান ছাড়া কোনো অখাদ্য কাগজ পড়তেন না—ফরেন থেকে বিমান ডাকে তাঁর নামে আরও কী সব ম্যাগাজিন আসতো, তাতে কী সুন্দর-সুন্দর মেমসায়েবদের ছবি থাকতো! মনে হবে, মেমসায়েব ঠিক যেন আমার দিকেই প্লিজড হয়ে স্পেশাল কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা কোনোদিন ভুলেও হাওড়ার সিনেমায় ঢোকেন নি—তাঁর নিয়মিত গন্তব্য কলকাতার মেট্রো, লাইট-হাউস, এলিট। মাখনদা রেডিও খুলতেন শুধু দুপুরের বিশেষ এক সময়, যখন মনে হয় খোদ বিলেত থেকে সায়েব-মেমদের গান ভেসে আসছে। মাখনদা খাবার ব্যাপারেও ছিলেন পাকা সায়েব। কখনও নগেন পালের কচুরি, হরিধন মোদকের জিলিপি, নানকু সাউয়ের হালুয়া, ক্ষেত্তরের ঘুগনি, হরিদাসের বুলবুলভাজা খেয়ে শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেননি।

মাখনদা বলতেন, "এই পাঁচ আঙুলে ডাল-ঝোল মেখে সাপটে খাওয়া খুবই আন-সায়েন্টিফিক।"

"খাওয়া ইজ খাওয়া। এর সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক রে বাবা?"

আমরা একটু অবাক হয়ে যেতাম।

"বুঝবে একদিন! যখন আজীবন পেটের অসুখে ভুগবে," সাবধান করে দিতেন মাখনদা।

"ওরে বাবা! পেটের ওসুখটা আবার অসুখ নাকি? পেটের অসুখটা তো বলতে গেলে প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্মগত অধিকার! এতে লজ্জার কী, লুকোবারই বা কী?"

মাখনদা বলেছিলেন, "হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারতে আমেরিকা হলে। স্মলপক্সের মতো পেটের অসুখটাও নোটিফায়েবল ডিজিজ—কেউ বারকয়েক বাথরুম করেছে শুনলেই জনস্বাস্থ্য বিভাগে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কেন এমন হলো? কী খেয়েছিলে, কোথায় খেয়েছিলে? কোন দোকান থেকে খাবার কিনেছিলে? এসবের ফিরিস্তি দিতে-দিতে নাড়ি ছেড়ে দেবার দাখিল হতো।"

এসব কারণেই মাখনদা কাঁটাচামচ ব্যবহার করতেন—কোনো সভ্য দেশেই নাকি আজকাল ডান হাতের ব্যবহার নেই। মাখনদা সেজেগুজে ডিনার টেবিলে বসতেন, পায়ে চটি থাকতো এবং সামনে চীনে মাটির ডিশ সাজানো থাকতো। মাখনদা ভুলেও কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতেন না, তাঁর কোলের ওপর থাকতো দুধের মতো সাদা ন্যাপকিন।

মাখনদার আরও এক সায়েবীয়ানা ছিল। ডিনারের পরেই টুথব্রাশ ও পেস্ট নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়তেন। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, "সকালে উঠে দাঁত-মাজাটা নিতান্তই ভুল—ফরেনে কেউ তা করে না। আর দাঁতে বুরুশ অথবা নিম দাঁতন ঘষতে-ঘষতে পাড়া বেড়িয়ে আসার থেকে বর্বরতা সভ্যসমাজে অকল্পনীয়! দাঁত মাজাটা একটা প্রাইভেট অ্যাফেয়ার—পাবলিককে দেখিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অপকর্মের অসভ্যতা কবে যে বন্ধ হবে!" মাখনদা নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারতেন না।

মাখনদা যে জেনুইন্ সায়েব এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ইন্ডিয়ায় জন্ম নিয়েছেন এমন সন্দেহ আমার বন্ধুমহলে প্রায়ই প্রকাশ করতাম।

এই মাখনদা যে শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া ছেড়ে দেবেন তা আমরা আন্দাজ করেছিলাম। মাখনদা যখন সত্যিই কী একটা কাজ নিয়ে দমদম থেকে হাওয়াই জাহাজে উধাও হলেন, তখন কেউ-কেউ মন্তব্য করেছিলেন—ফরেনের জিনিস তো ফরেনে ফিরে যাবেই!

মাখনদার একটা ব্যাপারে আমাদের একটু স্পেশাল উদ্বেগ ছিল। সেটাও ওঁর নাম নিয়ে। পৃথিবীতে সব লোকেরই পোষাকী নামটা ভাল হয় এবং ডাক নামটা একটু নিরেস হয়। মাখনদার ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো, ভাল নাম মাখনলাল পাঁজা, ডাক নাম সুপ্রতীক। ব্যাপারটার পিছনে ভুল বোঝাবুঝি আছে। মাখনদাকে ইস্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁর মায়ের বাবা সুধাসিন্ধু সামন্ত। সুধাসিন্ধুবাবু ভুল করে আদরের নাতির ডাক-নামটাই ইস্কুলের ফর্মে লিখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বিপত্তি। যখন ভুলটা জানাজানি হলো তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। কড়া ইস্কুল, নামের রেকর্ড পালটাতে চাইলে না—বললে এফিডেভিট করতে হবে। সে সব শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি, তাই মিষ্টি নামটাই রয়ে গেলো।

ফরেনে মাখন নামটা কেমনভাবে নেওয়া হবে এ-বিষয়ে আমাদের মনে কিছু

উদ্বেগও ছিল। কিন্তু একজন ফচকে ছোকরা বলেছিল, “অত ভাবিস না—বাটারের সঙ্গে ফরেন ব্রেডের চমৎকার মিল হবে।”

এই মাখনদার সঙ্গে যে অনেক বছর পরে বিদেশে আবার দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেও পারি নি! চান্স পেয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্যে আমেরিকায় এসে পড়েছি। ওয়াশিংটনের প্রাথমিক পর্ব চুকিয়ে আমি ছোট এক মার্কিনী শহরের হোটেলে উপস্থিত হয়েছি। মালপত্তর গুছিয়ে সবে একটু বিছানায় ফ্ল্যাট হয়েছি, এমন সময় টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং।

“হ্যালো মিস্টার শংকর? স্পিক হিয়ার টু মিস্টার পান্‌জা।”

এ আবার কোন সায়েব? আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ওমা! সায়েব নয়। “হ্যালো শংকর, আমি মাখন বলছি। ভেবেছিলি, লুকিয়ে-লুকিয়ে এই দেশ দেখে চলে যাবি। হলো না তো?”

মাখনদা একটু পরেই হোটেলে এসে হাজির হলেন। বললেন, “লন্ডনে পটলের কাছে টেলিফোনে খবর পেলাম।” পটলদা আমাদের ইস্কুলের আর এক ছাত্র।

“পটলের সঙ্গে টেলিফোনে মাঝে-মাঝে আড্ডা মারি।” মাখনদা বললেন।

“অ্যাঁ! আটলান্টিকের দু'পাশ থেকে আড্ডা!”

“অনেকেই আড্ডা মারে—ডাইরেক্ট ডায়ালিং তো! টেলিফোন তুলে পটলের সঙ্গে কথা বললেই হলো। পালং শাকের ঘণ্টোর রেসিপিটা জানা ছিল না, তাই লন্ডনে পটলকে ফোন করতে গেলাম। তখনই শুনলাম, তুই লন্ডনে পটলের সঙ্গে দেখা করেছিস এবং এখানে আসছিস।”

সামান্য পালং শাকের ঘণ্টোর মশলা জানবার জন্যে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে দূরপাল্লার টেলিফোন! ভাবা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম, সায়েব হবার যেটুকু বাকি ছিল তা এদেশে পূরণ করে নিয়েছেন মাখনদা। কিন্তু তিনি কী সুন্দর বাংলায় কথা বললেন। সবচেয়ে আশ্চর্য, মাখনদার বাংলায় বিশেষ ইংরিজি খাদ নেই।

মাখনদা আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। বললেন, “আমি গোলাপীকে বলে এসেছি। ও তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। গোলাপী তোর বউদি।”

খুব লজ্জা করতে লাগলো। মাখনদার কোনো খোঁজ-খবরই রাখিনি আমি। এর মধ্যে তিনি কতবার দেশে ঘুরে গিয়েছেন, কবে গোলাপীকে বিয়ে করে এনেছেন তা-ও আমার জানা নেই।

নিজের পারিবারিক খবরাখবর জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কোন ইয়ারে বিয়ে করলেন মাখনদা?”

মাথা চুলকে তিনি বললেন, "তা ন' বছরে হয়ে গেলো। সময় কী ভাবে উড়ে চলে! তুই আমার দুই মেয়ের সঙ্গেও আলাপ করবি। তোর মেয়ের নাম কী?"

আমি বললাম "জুলি। জুলিয়েট কুরী থেকে অনুপ্রেরণা।"

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। মাখনদা বললেন, 'আমার বড়টির নাম কুসুমকুমারী আর ছোটটি বিপত্তারিণী।"

"এ্যাঁ! এই ইউ-এস-এ-তে বসে মেয়ের নাম বিপত্তারিণী! মাখনদা করেছেন কী?"

"কেন? এদেশে কী বিপদ নেই যে বিপত্তারিণীর প্রয়োজন হবে না।" সরল মনে পাল্টা প্রশ্ন করলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "তা হলে ওঠা যাক এবার।"

হঠাৎ হোটেলের পাট চুকিয়ে কারও বাড়িতে চলে যাবার অসুবিধে আছে আমার। হোটেল ঠিক করে দিয়েছেন আমার নিমন্ত্রণকর্তা।

"ওদের কাছে কিছু দাসখত লিখে দিসনি যে মাখনদার বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবি না," আমার মনে শক্তি যোগাবার চেষ্টা করলেন তিনি।

দাসখত নেই, কিন্তু অসুবিধা আছে। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কোনো-কোনো শহরে স্থানীয় হোস্টের ব্যবস্থা আছে। মিস্টার মানকেলো এখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন—তিনি এখানকার উদ্যোক্তা, তিনি হয়তো কারো সঙ্গে এই হোটেলে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন, সে-সব বানচাল হয়ে যাবে।

"সে-সব দেখা-সাক্ষাৎ আমার বাড়ি থেকেও হতে পারে—আমরা তো পর্দাপ্রথা পালন করি না।" মাখনদা তর্কের পয়েন্ট তুললেন।

অগত্যা সত্যি কথাটা বললাম। "মাখনদা হোটেল ছেড়ে চলে গেলে ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ নষ্ট হয়ে যায়। হোটেল খরচ যাঁরা দিচ্ছেন কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিলে তাঁরা ভাবতে পারেন যে দুটো ডলার বাঁচাবার জন্যে ইন্ডিয়ানরা অতিমাত্রায় লালায়িত।"

এবার মন্ত্রবৎ কাজ হলো। দেশের মান-সম্মানের কথা উঠতেই মাখনদা বললেন, "আলবৎ, ভারতবর্ষের মাথা নিচু হয় এমন কোনো কাজ অবশ্যই করবে না। আমি তো ইন্ডিয়া-ইন্ডিয়া করে পাগল হয়ে গেলাম। ইন্ডিয়ার গায়ে হাওয়া লাগলে আমার দেহটা সিরসির করে ওঠে। কত বড় দেশের সন্তান আমরা, আমাদের মূল্য এরা বুঝতে পারছে না আমরা গরীব বলে।"

মাখনদার পরিবর্তন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেশের সমালোচনায় যিনি সব সময় মুখর হয়ে থাকতেন তিনিই এই বিদেশে কট্টর স্বদেশীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

মাখনদা বললেন, "তোকে তো দেশের কথাই বলতে এসেছি। কাজেকর্মে কথাবার্তায় এখানে এমন দাগ রেখে যা যে ওরা যেন বুঝতে পারে ইন্ডিয়াকে

কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। এমন কিছু করিস না যাতে ভারতবর্ষ ছোট হয়ে যায়। তোকে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই, যদি কারও বাড়ি বাথরুম ব্যবহার করিস বাথটবটা মুছে খটখটে করে তবে বেরিয়ে আসবি। এর যেন কখনও অন্যথা না হয়।”

“কলঘর, সে তো ভিজে থাকবেই, মাখনদা!” আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ি।

“সে আমাদের দেশের কলঘর। এখানে কলঘর মানে শুকনো খটখটে! যদি কারও গাড়িতে বেড়াতে বেরোস তাহলে গাড়ির পার্কিং ফি-টা তুই অফার করিস। আর ট্যাকসিওয়ালাদের খুব লিবারেলি বকশিশ দিবি। বকশিশ না পেলেই ব্যাটারা ইন্ডিয়ার নামে যা-তা রিমার্ক পাশ করে।”

মাখনদার দিকে আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। এ কী সেই মাখনদা একসময় যিনি ইন্ডিয়ার কোনো কিছুই দেখতে পারতেন না?

মাখনদা বললেন, “আর একটা কথা, এখানকার কিছু লোকের বড় দম্ভ। গরীব দেশগুলো সম্বন্ধে বেশ নাক উঁচু ভাব। তাঁদের কখনও ছাড়িস না। লম্বা নাক দেখলেই নাকে একটা থাবড়া দিয়ে দিবি। কিছু হাফ-পচা গম ধারে বিক্রি করে শালারা ভেবেছে একটা প্রাচীন মহান দেশের মাথা কিনে নিয়েছে।”

মাখনদার মুখে আনডিপ্লোম্যাটিক শালা কথাটি শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। কিন্তু সে-রাত্রে ডিনার খেতে ওঁর বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম প্রত্যেক আমেরিকানকে শ্যালক সম্বোধনের অধিকার তিনি আইনগতভাবেই অর্জন করেছেন।

মাখনদার ওয়াইফ দরজা খুলে দিলেন। “মিট ইওর গোলাপী বউদি”, মাখনদা দিশি কায়দায় বললেন।

গোলাপী নাম, কিন্তু এ তো পুরো মার্কিনী তনয়া! ভাঙা-ভাঙা বাংলায় গোলাপী বউদি বললেন, “আপনি খুব আদরের দেবর, আসুন, আসুন।”

কয়েক মিনিটের মধ্যে শার্ট-প্যান্ট ছেড়ে মাখনদা একেবারে দিশি স্টাইলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে লিভিং রুমে হাজির হলেন। মাখনদা বললেন, “তোর বউদির অরিজিন্যাল নাম ছিল রোজী—আমি করে দিলাম গোলাপী। ও অবশ্য খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছে জিনিসটা। আমাদের বড় মেয়ে যখন হলো তখন নামকরণের কোনো অসুবিধা হলো না! গোলাপীর মেয়ে কুসুমকুমারী ছাড়া আর কী?”

ফুটফুটে বালিকা কুসুমকুমারী ইতিমধ্যে ঘরে এসে বসলো। কেমন সুন্দর ভারতীয় প্রথায় কুসুমকুমারী আমাদের প্রণাম করলো! মাখনদা জানালেন, “ওকে আমি দেশের সব ম্যানারস্ শেখাচ্ছি। এয়ারমেলে বাংলা বইয়ের অর্ডারও দিয়েছি।”

গোলাপী বউদি চায়ের সঙ্গে এবার যা এগিয়ে দিলেন তা আমার অকল্পনীয়।

খোদ মার্কিন মুলুকে বসে মুড়ি খাচ্ছি!

মাখনদা বললেন, "খা, খা। অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে, বেশ কয়েকশ ডলারের সরঞ্জাম কিনে তোর অনারে এই মুড়ি ভাজার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। পটলকেও লং ডিস্ট্যান্সে দু'বার কনসাল্ট করতে হয়েছে—ওর মাসীমা যে খুব ভালো মুড়ি ভাজতেন!"

আমি মুড়ি চিবোবো কি! আমার মনে পড়ে গেলো, দেশে মাখনদা চিড়েমুড়ি স্পর্শ করতেন না। টোস্ট এবং এগ ছাড়া সকালে অন্য কিছুই খেতেন না।

গোলাপী বউদি এবার নিজেই কাঁসার গেলাসে জল এনে দিলেন। বললেন, "ইওর দাদার ফেভারিট বেলমেটাল—ইন্ডিয়া থেকে বাই এয়ারে কয়েক হাজার ডলার খরচ করে পুরো সেট আনিয়েছেন।"

"ইনক্লুডিং ওয়ান পিতলের ঘড়া। এই দেখ না ওয়াটার কুলারের ওপর বসিয়ে রেখেছি। খুব কদর হয়েছে এখানে, কত মেমসায়েব যে দেখতে আসে তুই ভাবতে পারবি না!"

গোলাপী বউদি এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্জিন ব্রাটার ড্রয়িং ডিজাইন এবং সিক্রেট ভার্সগুলি তোমার জানা আছে নিশ্চয়?"

আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থা। "হোয়াট ইজ ব্রাটা?" সে আবার কী জিনিস রে বাবা!

"ব্রত রে। কুমারী ব্রত। কুসুমকুমারীকে দিয়ে ব্রতটা করাবো ঠিক করেছি। ওদের ইস্কুল থেকেও খুব উৎসাহ দেখিয়েছে—অবসাকিওর রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখবে। আমি অবশ্য বলেছি রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, তবে অবসকিওর নয়। ইন্ডিয়াতে লক্ষ-লক্ষ কুমারী মেয়ে প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে এসব পালন করেছে। পটলকে লং ডিস্ট্যান্সে ফোন করলাম, কিন্তু ও হতচ্ছাড়াও কিছু জানে না।"

ড্রয়িং ডিজাইন কিছুই জানা না থাকায় আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম।

গোলাপী বউদি বললেন, "আমাদের ছোট মেয়ের নাম বিপট্যারিণী।"

"বিপত্তারিণী নামটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না, বুঝলি," দুঃখ করলেন মাখনদা। "সবাই ট্যারিনী বলে ডাকে, ভাবে ইটালিয়ান নাম। তুই সাহিত্যিক লোক, এই বিপত্তারিণী ব্যাপারটা ভাল করে ব্যাখ্যা কর তো।"

বিদেশে এ কী বিপদে ফেললে বিপত্তারিণী মা আমার! তাঁকে স্মরণ করে দুঃসাধ্য কাজটা শুরু করে দিলাম। গোলাপী বউদির সঙ্গে মাখনদাও খুব মন দিয়ে শুনলেন আমার লেকচার। তারপর নিজেই বললেন, "এক কথায় বিপত্তারিণী হলেন কমবাইনড লাইফফায়ার-মেরিন অ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স পলিসি।" আমার দিকে তাকিয়ে এবার মাখনদা বললেন, "তোর বউদির পক্ষে এইটা বোঝা

সহজ—ও প্রুডেনসিয়াল ইনসিওরেন্সে কাজ করতো।”

ওয়ান্ডারফুল! বিপত্তারিণীর ব্যাখ্যা শুনে মাখনদার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা খুশী হলেন।

রাতের খাবার সময় আবার বিস্ময়। টেবিল চেয়ারের ধারে-কাছে গেলেন না মাখনদা। মেঝেতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে দিলেন গোলাপী বউদি। বললেন, “আমাদের একটা ডাইনিং টেবিল আছে পাশের ঘরে, ‘মাকান’ ওটা পছন্দ করে না।”

খাবার আসতেই খালি হাতেই শুরু করলেন মাখনদা। কে বলবে, এই মানুষটাই কাঁটা চামচের গুণগানে আমাদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করেছিলেন!

“নিজের আঙুল নিজের মুখে পুরে দিলে খাওয়ার টেস্টই পাল্টে যায়! কিন্তু আমার অফিসে ও কর্মটি করবার উপায় নেই।” দুঃখ করলেন মাখনদা।

আমি দেখলাম, গোলাপী বউদি ও মেয়ে খাবার থালায় ডান হাত বাঁ হাত দুই গলিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। গোলাপী বউদি বললেন, “তোমরা প্রত্যেকটি ইন্ডিয়ান এক-একটি ম্যাজিশিয়ান। কী করতে একটি হাতের পাঁচটি আঙুলে কোনো ইনসট্রুমেন্টের হেল্প না নিয়ে তোমরা মাছের কাঁটা ম্যানেজ করো তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।”

“জানিস, ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখাবার জন্যে এখানকার টি-ভি সেন্টার আমাকে প্রোগ্রাম দিয়েছিল। আমি বললাম, এর পিছনে পাঁচ হাজার বছরের দক্ষতা এবং জ্ঞান কাজ করছে! খুব হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছিল প্রোগ্রামটা, বুঝলি, শংকর!” মাখনদা মনের আনন্দে হাত চাটতে-চাটতে বললেন।

রাতে মাখনদা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে এসে বললেন, “একটাই আমার দুঃখ থেকে গেলো—তোকে পান খাওয়াতে পারলাম না। পান এই শহরে দুষ্প্রাপ্য। দোক্তা আনবার উপায় নেই—কাস্টমসে নারকোটিক বলে সন্দেহ করে।”

বিছানায় যাবার আগে আমার মনে পড়লো এই মাখনদাই বলেছিলেন, “গভরমেন্টের উচিত আইন করে পান খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। তাতে শুধু দাঁতের এনামেলের নয়, দেশেরও বারোটা বাজছে।”

ভোরবেলায় মাখনদা টেলিফোনে আবার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “তোর লোকাল গার্জেন কখন আসছেন?”

বললুম, “মিস্টার মানকেলো সাড়ে-আটটা নাগাদ আমাকে তুলে নেবেন।”

“যা ওঁর সঙ্গে কিছুটা ঘুরে আয়। বিকেলে আবার ফোন করবো’খন। তোর সঙ্গে আবার দেখা হবেই। দেখি তেমন দরকার হলে ওই মানকেলোর পারমিশন নিয়ে নেবো’খন।”

এই পর্যন্ত বেশ ভালই চলেছিল। কিন্তু তারপরেই গণ্ডগোলের শুরু হয়েছিল। গোলমালের পাণ্ডা যে ডেভিড মানকেলো সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা আটান্ন বছরের মিস্টার ডেভিড মানকেলোর। শরীরের কাঠামোখানা দেখবার মতোই, এবং লম্বায় অন্তত ছ' ফুট।

ওই চেহারার সঙ্গে করমর্দন করবার সময়ে একটু সপ্রশংস দৃষ্টিতে মানুষটিকে আর একবার দেখেছি। তখনই মানকেলো সায়েব হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্রেফ প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম। পাঁচ জেনারেশন প্রোটিন না খেতে পারলে এরকম কাঠামো হয় না।"

কথাগুলোর মধ্যে একটু ধাক্কা ছিল। মনে হলো মানকেলো সায়েব আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, "তোমাদের দেশে তোমার বাবা, তোমার ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দার বাবা কেউ প্রোটিন খেতে পায়নি।"

মানকেলো সায়েব ধরেই নিয়েছেন ইন্ডিয়ান সব লোক রোগা-রোগা এবং তাদের হাড়গোড়গুলো পাটকাঠির মতো। মানকেলো বললেন, "টি-ভিতে আমি ইন্ডিয়ান চাষীদের ছবি দেখেছি, আহা ভেরি লিকলি। ওইরকম লিকলিকে চেহারায় তারা গুরুতর পরিশ্রম করবে কী করে? যদি কোনো ইন্ডিয়ান কাজে ফাঁকি দেয়, চুপচাপ বসে থাকে, তাকে দোষ দিও না। দোষ দিও তার ঠাকুর্দার বাবাকে—প্রোটিন অভাবে চেইন রি-অ্যাকশন!"

মানকেলো সায়েবের মহড়া নিতে পারে এমন তাগড়াই ইন্ডিয়ান যে হাজার-হাজার আছে একথা বলবার আগেই ভদ্রলোক মুখ খুললেন। "তুমি তো সিটি অফ ক্যালকাটা থেকে আসছো, তুমি তো এই রোগা হাড়ের ব্যাপারটা স্পেশালি জানবে।"

কেন রে বাবা! কলকাতা থেকে এসেছি বলে, ভগ্নস্বাস্থ্য শীর্ণ ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার বাড়তি জ্ঞান থাকবে কেন?

মানকেলো হেসে বললেন, "এই যে আমাদের আমেরিকান নেশন এতো বড়ো কেন?"

মাথা চুলকে উত্তর দিতে গেলাম, "প্রচুর জমিজায়গা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তোমাদের, সেই তুলনায় লোকজন অনেক কম, তাই ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েদেয়েও তোমরা বড়ো হচ্ছো।"

"ওয়ার্লডের বেশীর ভাগ নন-আমেরিকানের এই ধারণা। কিন্তু সেন্ট পারসেন্ট ভুল। আশা করি, নিজের চোখে তুমি কিছুটা দেখে যাবে!"

আমেরিকার গ্রেটনেসের কারণটা এবার ব্যাখ্যা করলেন কট্টর স্বদেশী মিস্টার ডেভিড মানকেলো। তিনি বললেন, "আমরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় চলি। আমরা মতামতে বিশ্বাস করি না, আমরা নির্ভর করি তথ্যের ওপর। কোনো-কোনো দেশ

স্রেফ থিওরির ওপর নির্ভর করে পিছিয়ে যাচ্ছে শুনেছি।"

মিস্টার মানকেলো অগাধ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "এই যে রোগারোগা হাড়ের কথা বললেন, এটা মনগড়া মতামত নয়! তুমিও তো বুঝতে পারছো, আমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি না। আমার এক বন্ধুর বায়োলজিক্যাল দোকান আছে—তার কাছেই শুনলাম, তোমাদের ক্যালকাটা খুব বড় এক্সপোর্টার। পৃথিবীর যেখানে যত নরকঙ্কাল দরকার হয় সব ওখান থেকে একচেটিয়া সরবরাহ হয়। বছরে কয়েক শ নরকঙ্কাল নাড়াচাড়া করতে হয় আমার ফ্রেন্ডকে, কিন্তু সব কাঠির মতো রোগা-রোগা! কলকাতার নাগরিক হিসেবে তুমি তো এ ব্যাপারে আমার থেকে অনেক ভাল জানবে।"

মানকেলো সায়েব আরও বললেন, "যখন টি-ভিতে দেখি কিংবা খবরের কাগজে পড়ি আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাইরের লোকেরা বিশেষ কিছু জানে না তখন খুব দুঃখ হয়। শেষ পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাসেবার কাজ নিয়েছি। বিদেশ থেকে আসা লোকদের হাত-ধরে আমাদের উন্নতিটা দেখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো কেন ইউ-এস-এ সব দেশের আগে রয়েছে।"

বুঝলাম, এই জন্যেই মিস্টার মানকেলো স্বেচ্ছায় আমার সাময়িক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সংবাদে আরও বিচলিত হলাম। সায়েব বললেন, "তুমিই প্রথম ভারতীয় যার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। যদিও সত্যি কথা বলতে কি তুমিই প্রথম ভারতীয় নয় যার সঙ্গে আমার দেখা হলো।"

ব্যাপারটা আবার গুলিয়ে যাচ্ছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "ওই যে কঙ্কাল—আমার ফ্রেন্ডের দোকানে একটা ইন্ডিয়ান স্কেলিটন আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কলকাতা থেকে জাহাজে পাঠানো।"

আমার সঙ্গে দোকানে কফি পান করে সায়েব নিজেই দাম মেটালেন। আমাকে কিছুতেই পয়সা বের করবার সুযোগ দিলেন না। বললেন, "আমি তোমাদের দেশের বিদেশিমুদ্রা সমস্যা সম্বন্ধে পড়েছি। প্রতিটি ডলার সযত্নে রক্ষা করা তোমাদের উচিত।"

আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। সায়েব আমাদের দেশ সম্বন্ধে আরও কি কি পড়েছেন তা ভগবান জানেন! আমি সে-সব কল্পনা করে শিউরে উঠছি।

মানকেলো সায়েব আমাকে বিরাট মোটর গাড়িখানা দেখালেন। বললেন, "আমরা বিগ নেশন, বিগ পিপল, আমাদের মনও বিরাট। তাই বড় মোটর গাড়ি ছাড়া আমাদের চলে না।"

সায়েব আমাকে প্রায় জোর করে গাড়ির পিছনের সীটে ঢুকিয়ে দিলেন। বললেন, "এর বিশেষত্বটা লক্ষ্য করছো? শুয়ে পড়ো।"

শুয়ে পড়ে, সায়েবের নির্দেশে পা ছড়িয়ে দিলাম। "এবার বুঝতে পারছো

নিশ্চয়!" সায়েবের মুখে একগাল হাসি। "পা ছড়িয়ে দিয়েও জায়গা রয়েছে। এর নাম আমেরিকান অটো! নিজের গাড়িটাও নিজের বাড়ি, তুমি কেন পা গুটিয়ে শোবে? হাজার হোক পা তো তোমারই!"

এই বড় গাড়ি সম্বন্ধে আমি একটা গুজব শুনেছিলাম। আমেরিকান মহিলাদের চুলের ক্ষতি হয় বলে হুড-খেলা গাড়ি উঠে গেলো এবং ঘরের বাইরে যুবক-যুবতীদের একান্ত শয্যা-সুখের প্রয়োজন মনে রেখেই বড় গাড়ি সৃষ্টি হলো। কিন্তু মিস্টার মানকেলো আমাকে সে প্রশ্ন তুলবার সময়ই দিলেন না।

পরবর্তী প্রশ্নে তিনি আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। "ইন্ডিয়াতে তুমি কি এখনও বুলক কার্টেই যাতায়াত করো?"

"গোরুর গাড়িতে? আমরা!" আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

মানকেলো আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। বললেন, "তোমাদের দেশে দেড় কোটির বেশি গোরুর গাড়ি আছে পড়লাম। মজুর খাটবার জন্যে কোটি-কোটি বলদ আছে।" আমার আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করবার জন্যেই মিস্টার মানকেলো এবার অভিনন্দন জানালেন "কনগ্রাচুলেশন। খেটে-খাওয়া বলদের সংখ্যায় তোমরা যে ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট তা আমার আগে জানা ছিল না।"

"ছাগলেও তোমরা ফার্স্ট। একসঙ্গে এতো ছাগল-পপুলেশন পৃথিবীতে কোথাও নেই।" মিস্টার মানকেলো এক-একটি খবর ছাড়ছেন, আর আমার স্বদেশী মেজাজ খাট্টা হয়ে উঠছে।

"বাঁদরেও তোমরা ওয়ার্লড লিডার।" শুনিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো।

সায়েবকে সহজে ছাড়বো না। ওই গোরুর গাড়ির ব্যাপারটা আমাকে ফয়সালা করতেই হবে।

সায়েবকে বলেই ফেললাম, "আপনার জেনে রাখা ভাল আমি রোজ মোটর গাড়ি চড়ে আপিসে যাই এবং সেই গাড়ি আমার শ্বশুরবাড়ির টাউনে তৈরি হয়।"

বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন মিস্টার মানকেলো। "তুমি বিদেশিনী বিয়ে করেছো তা আমাকে কেউ বলেনি। তোমার ওয়াইফ ইংলিশ, ইটালিয়ান, জার্মান, সুইডিস, জাপানিজ না আমেরিকান?"

কোন দুঃখে আমার ওয়াইফ বেজাত হতে যাবে! "শী ইজ ভারতীয় এবং আমাদের হিন্দুস্থান মোটর গাড়ির মতোই শতকরা একশ ভাগ স্বদেশী। উভয়েই মেড ইন কোন্নগর, ডিসট্রিক্ট হুগলী, ওয়েস্টবেঙ্গল, ইন্ডিয়া।"

মানকেলো সায়েব খুব লজ্জা পেলেন। বার-বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। "এই জন্যেই পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা হওয়া প্রয়োজন। আমাকে পীস কোরের এক ছোকরা বললো, পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে তোমাদের গোরুর গাড়ির কোনো

ডিজাইন চেঞ্জ হয়নি।" এবার কোনো রিস্ক নিলেন না মিস্টার মানকেলো, জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা—তোমার মোটর গাড়ির মডেল ক'হাজার বছরের পুরনো?"

রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। বললাম "মিস্টার মানকেলো, হাওয়া-ভরা টায়ার এবং হাওয়া-গাড়ি তো এই সেদিন আবিষ্কার হলো। এইট্টিন নাইনটি ফোর না নাইনটি ফাইভে প্রথম মোটর গাড়ি আপনাদের দেশ থেকে আমাদের দেশে গেলো।"

"আর বলতে হবে না, বুঝে নিয়েছি", অপরাধ স্বীকার করে নিলেন মিস্টার মানকেলো।

আমি ঝুঁকি নিলাম না। জানতে চাইলাম, "কী বুঝলেন?"

"সোজা অঙ্ক—তোমাদের মোটর গাড়ি এইট্টিন নাইনটি ফাইভ মডেল থেকে ব্যাকডেটেড হতে পারে না।" সায়েব আবার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি হাল ছেড়ে দিলাম, প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করবার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

গাড়ি চালাতে-চালাতে মানকেলো সায়েব বললেন, "আমাদের দেশে যখন এসেছো তখন দেখে রাখো এই সব আধুনিক জিনিস। এই যে আমি গাড়ি চালাচ্ছি হাতে ঠেলে-ঠেলে গিয়ার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। অটোমেটিক গিয়ার চেঞ্জার। গাড়ি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কোন দিকে যাচ্ছে তা এই যন্ত্রটার দিকে তাকালে বুঝতে পারবে।"

আমার এসব উন্নতির কথা জানা ছিল না, তাই আগ্রহের সঙ্গে দেখলাম। কিন্তু সায়েব তাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সব নোট করে রাখো, ইন্ডিয়াতে ফিরে সবাইকে গল্প শোনাতে পারবে।"

মসৃণ কংক্রিটের রাস্তা ধরে গাড়ি চলেছে—রাস্তা তো নয় যেন শোবার ঘরের চকচকে মেঝে। তারিফ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মানকেলা মেজাজ খারাপ করে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ক্যালকাটার রাস্তার অবস্থা কী রকম?"

আমি প্রশ্নটা না শোনার ভান করলাম—যেন দুপাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমি বুঁদ হয়ে আছি। সায়েব আবার জিজ্ঞেস করলেন, "রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবি এনেছো নাকি তুমি? আমার কয়েকজন বন্ধু সম্প্রতি স্পেনের বুল ফাইট দেখে এসেছে, তারা শুনেছে ক্যালকাটায় স্ট্রীট-বুল ফাইটিং নাকি আরও উত্তেজনাপূর্ণ। আরও বিপজ্জনক!"

ভাগ্যে দেশ থেকে কোনো ছবি আনিনি। আনলে কী অবস্থা হতো আমার!

মানকেলো সায়েব এক দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থামালেন। বললেন,

"এটাও দেখে নাও, দেশে ফিরে গিয়ে গপ্পো করতে পারবে। আলিবাবার স্টোরিতে চিচিং ফাঁকের কথা শুনেছো এবার আমেরিকায় ব্যাপারটা দেখে যাও।"

সত্যি তাজ্জব ব্যাপার। দোকানের কাঁচের গেটের সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেলো। মানকেলো সায়েব আমার মতো দেহাতিকে এই সব জিনিস দেখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন।

আমার বিস্ময় বৃদ্ধির জন্য তিনি বললেন, "ভাবছো কোথাও কোনো গেটম্যান লুকিয়ে আছে এবং আমাদের দেখেই দরজা খুলে দিচ্ছে! মোটেই তা নয়—এসব সায়েন্সের ব্যাপার এবং নিশ্চয় শুনে থাকবে বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যায় আমরা ওয়ার্লডের সবার থেকে অনেক এগিয়ে আছি।"

মানকেলো সায়েবের এই দাবি আমি অনেক আগেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু তবু সায়েব ছাড়বেন না। ওজন-মেসিনের মতো একটা যন্তর দেখিয়ে বললেন, "ওর ওপর পা তুলে দাও।" নির্দেশ মান্য করলাম। সায়েব তখন একটা পঞ্চাশ সেন্ট মুদ্রা দিলেন যন্তরকে। অমনি কোত্থেকে একটা বৈদ্যুতিক বুরুশ এসে আমার জুতো ঝেড়ে দিলো। আমি নেমে পড়ছিলাম, কিন্তু সায়েব ইঙ্গিতে বারণ করলেন। এবার যন্ত্রটা কালি বার করলো এবং আমার জুতোকে ঝকঝকে করে দিলো।

গর্বের হাসি হাসলেন মানকেলো সায়েব। বললেন, "কোন্ দেশে বেড়াতে এসেছো বুঝতে পারছো?"

হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি আমি! আমেরিকার এই মফঃস্বলেই যদি এমন কাণ্ড হয় তাহলে বড়-বড় শহরে কী চলে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার অবস্থা!

ইলেকট্রিক লিফ্‌টের কাছে গিয়ে সায়েব বললেন, "এর নাম লিফ্‌ট।"

আমার একটু দুঃখ লাগলো। সায়েব ভেবেছেন কী? আমি লিফ্‌টও দেখিনি!

মানকেলো সায়েব এবার বড়দা-স্টাইলে ভরসা দিলেন, "মন খারাপ কোরো না, এসব জিনিস একদিন পৃথিবীর সব দেশেই যাবে—শুধু একশ দেড়শ বছর সময়ের প্রশ্ন।"

সমস্ত দিনই এইভাবে চললো। বলবার কিছুই নেই—পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে!

সন্ধ্যেবেলায় মাখনদা টেলিফোনে খবর করলেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "মনে রাখিস নিজের দেশকে তুলে ধরার চেয়ে বড় কাজ তোর এখানে নেই। কখনও কোনো অন্যায় সহ্য করবি না—মুখের ওপর ফটাফট উত্তর দিয়ে দিবি।"

টেলিফোনেই দু'একটা নমুনা শুনতে চাইলেন মাখনদা। ব্যাপারটা তিনি মোটেই হাল্কাভাবে নিচ্ছেন না।

আমি বললাম, "মাখনদা, মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দেশে এতো প্রোটিনের অভাব, ওয়ার্লডের সেকেন্ড হায়েস্ট নাম্বার গোরুবাছুর তোমাদের রয়েছে, অথচ বীফ খাও না কেন?"

"তুই নিশ্চয় মুখ বুজে আক্রমণটা হজম করে নিয়েছিস," টেলিফোনে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন মাখনদা। "তোর প্রথমেই বলা উচিত ছিল, আমাদের দেশের ঋষিরা লিখেছেন, আপরুচি খানা।"

"মাখনদা, ওটা বোধহয় কোনো মোগল-রসিকের উক্তি—কৌপিনধারী উপবাসী ঋষিরা কি খানাপিনা বা পরনা নিয়ে ওই ধরনের পাবলিক বিবৃতি দিতেন?"

"আলবৎ ঋষি। জ্ঞানী-গুণী ঋষিরা মোগলদের থেকে কম যেতেন না," মাখনদা আমাকে সাহস যোগালেন।

"হ্যাঁ শংকর, তোকে যা বলছিলাম, সায়েবের কাছে প্রথম জবাব, আমরা শালা কী খাই-না-খাই, তাতে তোমাদের কি? নাম্বার টু, আমরা তো জিজ্ঞেস করছি না, তোমরা কুকুর খাও না কেন? নাম্বার থ্রি, ইন্ডিয়ানদের একটা বিরাট অংশ গোরু কেন, মাছ মাংস ডিম কিছুই খায় না। নাম্বার ফোর, ইন্ডিয়াতে বিরাট এক পাবলিক গোরু খায়, তারা মুসলমান খৃষ্টান পার্শী এটসেটেরা! নামবার ফাইভ, সবাই বীফ্ খেতে আরম্ভ করলে দেশের চাষ উঠে যাবে—হাল টানবার মতো বলদ, দুধ দেবার মতো গোরু আর একটিও থাকবে না। ছ নম্বর..."

আমার এবার ভয় হয়ে গেলো। "মাখনদা, এতোক্ষণ টেলিফোন এনগেজড থাকলে লাইনে গোলমাল হবে না? ক্রস কানেকশন হবার ভয় থাকবে না?"

"সে আবার কী? ক্রস কানেকশন, নো ডায়াল টোন, ঘড় ঘড় আওয়াজ হওয়া, ডায়াল করলে খট খট খটাং এসব টেলিফোন-রোগের কথা এদেশের কেউ জানে না। খুব সাবধান, ইন্ডিয়ান টেলিফোনের এই সব কথা ভুলেও এখানে তুলিস না।"

মাখনদা আমার অবস্থা আন্দাজ করে টেলিফোন ছেড়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে হোটেলে হাজির হলেন। স্বদেশের জন্যে এমন ভালবাসা দেশের মধ্যে আজকাল নজরেই পড়ে না। দেশকে ঠিক মতো ভালবাসতে হলে প্রত্যেকেরই একবার বোধহয় বিদেশে যাওয়া দরকার।

মাখনদার যে অনেক কাজ, তাঁর সময়ের যে অনেক দাম, তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদেরও যে তাঁর সময়ের ওপর দাবি আছে, এসব আমার অজানা নয়। কিন্তু

তিনি সব কিছু নো-তোয়াক্কা করে দেশের লোকের কাছে চলে এসেছেন।

মাখনদা জানতে চাইলেন আমার সারদিনের কর্মবৃত্তান্ত। বললাম, "একটা ইস্কুলে গিয়েছিলাম, খুব আদরযত্ন করলো। তবে ছোট-ছোট ছেলেরা সব রেড ইন্ডিয়ানদের মতো ড্রেশ করে এসেছিল। আমাকে দেখে তারা একটু হতাশ হলো, জিজ্ঞেস করতে লাগলো কেন আমি জাতীয় পোশাকে আসিনি। খুব ভুল হয়ে গেলো মাখনদা, ডজন-খানেক ধুতি পাঞ্জাবি সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

মাখনদা আমার চোখ খুলে দিলেন। "ওরা তোর ধুতি পাঞ্জাবি দেখতে ব্যগ্র নয়—ওরা ভেবেছে, তুই একটা জ্যান্ত রেড ইন্ডিয়ান! তোকে যে ওয়ার ডান্সিং-এ নামিয়ে দেয়নি তাই ভাল।"

পরবর্তী অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করলাম। "মেয়েদের এক হাই ইস্কুলে গিয়েছিলাম। তেরো-চোদ্দ বছরের টিন-এজ গার্লদের ভিড়ে হল বোঝাই—তিল ধারণের জায়গা নেই। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাবখানা এমন, যেন আমি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছি।"

মাখনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, "প্রথমে ভাবলাম, বাংলা সাহিত্যের কিছু খবরাখবর তাহলে এখানেও পৌঁছে গিয়েছে।"

ইস্কুলের দিদিমণিও স্বীকার করলেন, "এবারে রেকর্ড গ্যাদারিং—সভায় এরকম ভিড় অনেকদিন হয়নি। আগের মাসে ফাদার জনসন এসেছিলেন, সেবার মাত্র পাঁচটি মেয়ে উপস্থিত ছিল।"

মিস্টার মানকেলো আমার পাশেই বসেছিলেন। তিনি আমাকে কানে-কানে বললেন, "আমি কোনো ঝুঁকি নিইনি। যাতে হাউস-ফুল হয় তার আগাম ওষুধ হেড মিস্ট্রেসকে দিয়ে দিয়েছি।"

"তোর সম্বন্ধে সায়েব কী বললো রে বাবা!" চিন্তিত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "বোধহয় বলেছে রবিশঙ্করের ব্রাদার, তোরও শংকর নামটা রয়েছে তো।"

"শেষ পর্যন্ত শুনুন মাখনদা," আমি কাতরভাবে নিবেদন করলাম।

হেড মিস্ট্রেস মিসেস এলিশন এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "মেয়েরা, আজকের এই মিটিংয়ের ব্যাপারে তোমরা যা আগ্রহ দেখিয়েছ তার অর্ধেক আগ্রহ যদি প্রতিদিনের পড়াশোনায় দেখাও তা হলে তোমরা অনেক এগিয়ে যাবে।"

খিলখিল, কিশোরী-হাসির বন্যা বইলো।

"মেয়েরা", আবার আরম্ভ করলেন মিসেস এলিশন। "তোমরা সবাই দশ-এগারো বছর বয়স থেকে বয়ফ্রেন্ড এবং ডেটিং নিয়ে ব্যস্ত। তোমাদের ধারণা, সমস্ত পৃথিবীটাই এইভাবে চলছে। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় এই ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখো। ইনি এবং এঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল

বিয়ের রাতে। তার পরে মেনি ইয়ারস কেটে গিয়েছে।"

"কত বছর?" মেয়েরা তারস্বরে জানতে চাইলো।

"অনেক বছর," উত্তর দিলেন মিসেস এলিশন। "তবু এখনও এঁদের ডাইভোর্স হয়নি। এঁরা হ্যাপিলি ম্যারেড।"

"মাখনদা, প্রত্যেকটি মেয়ে আমাকে এমনভাবে দেখতে লাগলো যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে নতুন কোনো নিদর্শন এসেছে।"

"হুম্", বিরক্ত হয়ে উঠলেন মাখনদা। "ইন্ডিয়ান সোসাইটির বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে তোর কিছু বলা উচিত ছিল। আমাদের মেয়েরা যে এখনও কত নিষ্পাপ, কত পলিউশন-ফ্রি তা তোর ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।"

"ব্যাখ্যা করবো কী মাখনদা? একটা মেয়ে তো তখন আমার বউয়ের জন্যে খুব দুঃখ করছে—পুওর মিসেস শংকর। ভদ্রমহিলা জানতেই পারলেন না লাইফটা কী!"

এমন সময় মানকেলো সায়েবের টেলিফোন এসে গেলো। "হাই! শংকর, কী হলো, এখনও তুমি এলে না? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"খুবই দুঃখিত মিস্টার মানকেলো। আমার বহুদিনের হারানো এক ইন্ডিয়ান বন্ধু এসে গিয়েছেন।" এরপর মাখনদার বিবরণ দিলাম। মানকেলো সায়েব বললেন, "তোমার বন্ধুকে ফোনটা দাও।"

ভালই হলো, মাখনদাও আমার সঙ্গে চললেন। মানকেলো সায়েব ওঁকেও সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মাখনদাকে বাড়িতে ফোন করে ক্ষমা চাইতে হলো। আগামী কাল ভোরে ওঁর অফিস। তবু তিনি আমার সঙ্গী হলেন। কারণ আমাকে একলা পেয়ে ইন্ডিয়ার আর-এক দফা ক্ষতি হোক তা মাখনদা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

গাড়িতে যেতে-যেতে আমি মিস্টার মানকেলোর কথা ভাবছি। মাখনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সাদা সায়েবের নাম কেলো হলো কী করে?"

"পয়সাকড়ি, প্রভাব-প্রতিপত্তি হলে এদেশে সাদা-কালো সবারই সমান দেমাক হয়।" মাখনদা আমাকে সাবধান করে দিলেন। তাঁর চিন্তা তখন স্বদেশ সম্পর্কে। বললেন, "মানকেলো যদি বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আজ যোগ্য শিক্ষা দিতে হবে।" মাখনদা তো ইন্ডিয়াতে নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর গলায় যেন সন্ত্রাসবাদীর সুর।

তিনি বললেন, "আজ কিন্তু ইন্ডিয়াকে ওপরে তুলতেই হবে। যে-করে হোক বুঝিয়ে দিতে হবে সব ব্যাপারেই সায়েবরা এগিয়ে নেই।"

"সেটা কী করে হবে?" আমার চিন্তা বেড়ে যায়। "একমাত্র জনসংখ্যা ছাড়া

সেরকম আর কোনো বিষয় আছে?"

"সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে", মাখনদা নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিচ্ছেন। "ওদের মুখে চুনকালি দেবার মতো বিষয় নিশ্চয় আমাদের আছে। শোন্ তেমন প্রয়োজন হলে, তুই চুপ করে যাবি, তোর নাম করে আমিই মুখ খুলবো। জন্মভূমির নুন তো আমাকে একদিন শোধ করতেই হবে।"

দরজার কলিংবেল টিপতেই মানকেলো সায়েবের ভৌতিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "হ্যালো, শংকর?"

আমার উত্তর পাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেলো অথচ কেউ নেই। অনেক দূরে মিস্টার মানকেলো দাঁড়িয়ে আছেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "এখানে সব অটোমেটিক ব্যাপার। বোতাম টিপে দরজা খুলে দিলাম।"

"যদি আমি না হয়ে অন্য কেউ হতো তা হলে তো বিপদে পড়ে যেতেন!"

"মোটেই নয়," মানকেলো আমাকে বোঝালেন। "তার কারণ, এইখানে সি-সি-টি-ভিতে তোমার ছবি আমি দেখে নিয়েছি। ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন!"

"অ্যাঁ! এ যে ময়দানবের পুরী!"

মিস্টার মানকেলো বললেন, "এই যে তোমার সঙ্গে গল্প করছি এই ছবিও কলঘর থেকে আমার স্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন। এখনই তিনি নেমে আসবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মানকেলো বললেন, "বুঝতেই পারছো, বার বার ছোটাছুটি করে দরজা খুলবার হাঙ্গামা আমাদের নেই। তোমাদের নিশ্চয় এসব যন্ত্রপাতির অভাবে খুব ভুগতে হয়।"

মাখনদা গোড়া থেকেই রেগে আছেন। বাংলায় ফিসফিস করলেন, "বল না, আমাদের অন্য যন্ত্রপাতি আছে। অন্ততঃ এখনকার মতো মান রক্ষে হোক।"

আমার মুখ খুললো না। ভরসন্ধ্যেবেলায় কাঁচা মিথ্যে কথা বলি কী করে?

মিস্টার মানকেলো ততক্ষণে তাঁর বাড়ি দেখাতে শুরু করছেন। "শংকর এর নাম ইলেকট্রিক গ্রাইন্ডার। বোতাম টিপলেই সব কিছু মশলা গুড়ো হয়ে যায়। এই অ্যাটাচমেন্ট জুড়লেই মাংস হয়ে যায় কীমা!"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত এবং আমরা গাঁইয়া অবস্থা দেখে মাখনদা বেশ বিরক্ত।

সায়েব কিন্তু আমার ছানাবড়া চক্ষু দেখে খুব সন্তুষ্ট। বললেন, "এই ঘরে তেইশ রকম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি আছে! সব অটোমেটিক।" ইলেকট্রিক ছুরি, ইলেকট্রিক হাঁড়ি, ইলেকট্রিক বঁটি আরও কত কী সব! আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা।

আমি বোকার মতো বলে ফেললাম, "ছুরি, বঁটি, দা, শিলা-নোড়া হাঁড়ি-কড়া

সবই আমাদের আছে—কিন্তু কোনোটাই অটোমেটিক নয়। প্রত্যেকটির পিছনে বড্ড মেহনত করতে হয়।”

এই ধরনের উত্তরই যেন মানকেলো সায়েব প্রত্যাশা করেছিলেন। সগর্বে বললেন, “দেখে যাও সব—ফিরে গিয়ে তোমার ফ্রেন্ডদের বলতে পারবে। ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ারসে তোমরা তো কিছুই চেঞ্জ করোনি।”

এবার বাথরুমের দিকে নিয়ে গেলেন মিস্টার মানকেলো। ওরে সর্বনাশ! কল ঘরেও কতো রকমের কলকব্জা। সায়েব বললেন, “তোমাদের দেশে দাড়ি কামানোর সরঞ্জামের খুব অসুবিধে বোধ হয়। আমার এক ফ্রেন্ড ডেল্লির রিপাবলিক-ডে-প্যারেডের ছবি তুলে এনেছিল—দেখলাম সমস্ত সৈন্যদের দাড়ি। সঙ্গে অবশ্য ম্যাচিং হেডগিয়ার রয়েছে যার নাম পুগরি।”

“পুগরি নয়, সাহেব, পাগড়ি।”

“আই অ্যাম সরি, তা তুমি এই মেসিনে অটোমেটিক দাড়ি কামাতে পারো।”

সায়েব এবার যন্ত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু না-বাবা ওইসব ইলেকট্রিক জিনিস গালে ঠেকিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেতে রাজী নই। “এদিক-ওদিক একটু-আধটু লিক থাকলেই ইলেকট্রিক শেভার না ইলেকট্রিক ডেস্ট্রয়ার বোঝা যাবে না!”

মানকেলো সায়েব আমার কথায় খুব হাসছেন। “তুমি ইলেকট্রিক শেভারে ভয় পাচ্ছো, আর-এক আফ্রিকান ইয়ংম্যান এসেছিল গত বছরে, সে কিছুতেই ইলেকট্রিক কম্বল গায়ে দেবে না। তাকে নিয়ে রাত্রে আমার রীতিমত সমস্যা, কারণ আমার বাড়িতে ইলেকট্রিক কম্বল ছাড়া কম্বলই নেই।”

কী সব দেখছি বাবা! হয়তো এখনাকার লোটাও ইলেকট্রিক। মাখনদা বাংলায় সাবধান করে দিলেন, “এখানে কেউ লোটা ব্যবহার করে না, তুই আর বাইরের লোকের সামনে আমাদের ইজ্জত ডোবাস না।”

সায়েব এবার দেখালেন, ইলেকট্রিক টুথ-ব্রাশ। পাছে আমি সন্দেহ করি, তাই মেশিনটা চালু অবস্থায় একটু ব্যবহার করে নিলেন।

ইলেকট্রিক-দাঁতন রেখে সায়েব হাত ধুয়ে নিলেন। কিন্তু গামছা বা তোয়ালেতে হাত মুছলেন না। একটা পাইপের সামনে হাতদুটো নাড়তে লাগলেন। আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, “মিসেস মানকেলো হয়তো ধোয়া তোয়ালে দিতে ভুলে গিয়েছেন!”

“নো নো! এটা হলো অটোমেটিক তোয়ালে—সামনে হাত ধরলেই গরম হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে।”

আরও দু-খানা কল দেখিয়ে দিলেন মিস্টার মানকেলো। একখানা অটোমেটিক ডিশওয়াশার—“এঁটো বাসনপত্র ভিতরে ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দাও। বাকি বাসন

মাজার কাজ মেশিনে হবে।” আর একখানা অটোমেটিক কাপড়-ধোলাই কল। ইলেকট্রিক-ধোপা বলা চলতে পারে। এসব জিনিসের কথা কস্মিনকালেও কল্পনা করিনি।

মানকেলো বললেন, “এই মেশিন থাকলে বর্ষাকালেও ডোন্ট কেয়ার। এই মেশিন শুধু কাপড়ই কাচে না, দশ মিনিটে ভিজে কাপড় একেবারে শুনো খটখটে করে দেয়!” মিষ্টি হাসি দিয়ে সায়েব তাঁর বিজয়-ঔদ্ধত্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছি—সুন্দরবন থেকে প্রথম কলকাতায় এলেও লোকে বোধহয় এমন ধাক্কা খায় না।

মাখনদা কিন্তু মোটেই খুশি হচ্ছেন না। শুদ্ধ বাংলায় আমাকে বললেন, ‘মহাভারত বা রামায়ণে তো অনেক আধুনিক জিনিসের বর্ণনা আছে। ওখানে এই বৈদ্যুতিক-ধোপার মতো কিছু নেই?”

আমি মাথা চুলকে বললাম, “উড়ন্ত পুষ্পকরথের কথা আছে। কিন্তু এইসব আজব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে রামায়ণ মহাভারত সম্পূর্ণ নীরব। সীতার সংসারে একটা ডানলপিলো বা একটা ফ্রিজিডেয়ার পর্যন্ত ছিল না।”

দুঃখে মাখনদা মাথার চুল টানতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। মিস্টার মানকেলো কিন্তু ছুটে যাবার ব্যস্ততা দেখালেন না। আমি বললাম, “আপনার টেলিফোন হয়তো কেটে গেলো—কোনো আওয়াজ হচ্ছে না।”

“কোনো চিন্তা নেই।” আশ্বস্ত করলেন মিস্টার মানকেলো। “ওখানেও অটোমেটিক মেশিন আছে—ফোন তুলে মেশিনই জিজ্ঞেস করে নেবে কে কথা বলছেন, তারপর রিকোয়েস্ট করবে, আপনি ধরুন, মিস্টার মানকেলো এখনই আসছেন।”

এ্যাঁ! ভূতকে বাড়িতে মাস-মাইনের চাকরি দিয়েছেন নাকি মিস্টার মানকেলো?

আবার মুচকি হেসে সায়েব রসিকতা করলেন, “এই টেলিফোন অপারেটর-মেশিন তোমাদের দেশে নেই?”

মানকেলো সায়েব এবার টেলিফোন ধরতে চলে গেলেন আর সেই অবসরে মাখনদা রাগের চোটে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন।

নিকটবর্তী ফোম রবার গদিতে বসে পড়লাম আমরা। অপমানে ঘেমে উঠেছেন মাখনদা। মুখ লাল করে তিনি বললেন, “আর সহ্য হয় না। এদের বাড় বড্ড বেড়েছে। কিন্তু অতিদর্পে হত লঙ্কা।”

কিন্তু এটা লঙ্কা নয়—ইউ-এস-এ। যুগটাও বিংশ শতাব্দী, রামায়ণের কাল নয়। এ যুগে অতি দর্পে কিছু হয় না, বরং সম্মান আরও বেড়ে যায়। কিন্তু মাখনদা

আজ দর্পহারী ইন্ডিয়ান মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করতে বদ্ধপরিকর।

"ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি আমি। এবার যা-হয় হবে, আমি সায়েবকে শিক্ষা দেবো, সায়েবকে বুঝিয়ে দেবো ইন্ডিয়াকে নিয়ে রসরসিকতা চলবে না।" মাখনদার স্বদেশী রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে তা বুঝতে পারছি।

মাখনদা বললেন, "শোন। এবার ওই সায়েব তোকে অটোমেটিক ঘড়ি, জুতো, ইলেকট্রনিক চশমা, ফাউন্টেনপেন এটসেটরা আরও কত কি দেখাবার মতলব ভাঁজছে কে জানে। তুই কিন্তু ঘাবড়ে যাস না।"

"আমার আর ঘাবড়াবার বাকী কি আছে, মাখনদা? ইউ-এস-এ এতো এগিয়ে আছে জানলে আমি এখানে আসতামই না। এতো প্রগতি আমাদের সহ্য হয় না। আমাদের পক্ষে বিলেতই ভাল।"

"তুই ওসব কথা মুখে আনিস না, শংকর। তোর মাখনদা তো এখনও মরেনি। আমার এখনও সেই পুরনো শিখ-পাঞ্জাবী পলিসি—শির দেবো তবু শরম দেবো না!"

"মাখনদা!" আমি কাতরভাবে আবেদন জানালাম, "পরিস্থিতিটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চলুন আমরা বরং ফিরে যাই। যাবার আগে বলে যাবো, আমাদের ইন্ডিয়াতে এতো সব জিনিস নেই কিন্তু বুদ্ধ, অশোক, গান্ধী মায় যীশুখ্রীষ্টও তোমাদের দেশে জন্মায়নি।"

"ওসব বড়-বড় নামে চিঁড়ে ভিজবে না রে।" নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোধহয় মাখনদা বললেন। "এদের জব্দ করতে হলে আইটেম-বাই-আইটেম অপমান করতে হবে।"

কী যেন ভেবে নিলেন মাখনদা। তারপর বললেন, "শোন, এবারে সায়েব যা দেখাবেন যা বলবেন, তুই সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস ইন্ডিয়াতে আছে। তারপর আমি দেখছি।"

আমি একটুও সাহস পাচ্ছি না। "বড্ড মেথডিক্যাল জাত এই আমেরিকানরা। যদি পুরো বিবরণ জানতে চায়? তাহলে যে সর্বনাশ হবে মাখনদা।"

"মিস্টার মানকেলো তো ইন্ডিয়ার সবকিছু মুখস্ত করে বসে নেই।" অভয় দিলেন মাখনদা।

তবু আমার প্রয়োজনীয় সাহস হচ্ছে না। "মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়ে গেলে তার থেকে অপমান নেই। বিশেষ করে এই ফরেন কানট্রিতে।"

"আঃ," চাপা বকুনি লাগালেন মাখনদা। "অ্যামবাসাডর-এর ডেফিনিশন শুনিসনি?"

"শুনেছি বৈকি। ফোর্টিন হর্স পাওয়ার, ফোর সিলিন্ডার, সেলুন বডি...।"

"ও তোর শ্বশুর বাড়ির টাউনের অ্যামবাসাডর মোটর গাড়ির ডেসক্রিপশন!'

আমি বলছি রাষ্ট্রদূতের কথা। শোন, অ্যামবাসাডর হচ্ছেন তিনি যিনি বিদেশে যান মিথ্যে কথা বলতে স্বদেশের জন্যে।”

তড়িৎগতিতে আমার মনে পড়ে গেলো আমরা যারাই বিদেশে এসেছি তারাই দেশের বেসরকারী অ্যামবাসাডর। সুতরাং...।

মাখনদার কথা আবার আমার কানে ঢুকছে। “সায়েব যাই দেখাক, তুই বলবি এর থেকে অনেক ভাল জিনিস তোর হাওড়ার বাড়িতে আছে। কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি। জয় মা হাজার-হাত কালী, জয় মা ওলা-বিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

ক্ষুধিত বাঘের মতো মাখনদা এবার মানকেলো সায়েবের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিসেস মানকেলো ইতিমধ্যে সুসজ্জিতা ও সুগন্ধিতা হয়ে নিচে নেমে এলেন। আমাকে খুব হাসিমুখেই অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। বললেন, “জনের মুখের তোমার কথা অনেক শুনেছি। তারপর আজ মেয়েদের স্কুলে তোমাকে নিয়ে যে সেনসেশন হয়েছে তার রিপোর্টও আমার এক বান্ধবীর কাছে পেলাম। গ্রেট! মেয়েরা এমন পুরুষমানুষ কোনোদিন দেখতে পাবে ভাবেনি। তোমার ওয়াইফ সঙ্গে এলে তো ইস্কুল ভেঙে পড়তো—এমন মেয়ে বিয়ের রাতের আগে স্বামীর সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক হয়নি!”

আমি প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছি। কী বলবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

মিসেস মানকেলো এবার সমস্যা আরও পাকিয়ে তুললেন। বললেন, “বিশ্বাস করো, তোমার ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছিল আমার। কিন্তু মিস্টার মানকেলোর মুখে একটা কথা শুনে কিছুটা বিব্রত হলাম।”

আবার কী হলো!

“আমি শুনলাম, দেশে ফিরে গিয়েই তুমি ডেটিং শুরু করবে।”

আমার মাথায় বজ্রাঘাত! কী সব বলছেন এই ভদ্রমহিলা?

মাখনদা ইতিমধ্যে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছেন। তিনি গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করলেন, “মহাশয়া, আপনি ভারতবর্ষের ব্যাপারটা ঠিক বোঝেন নি। আমাদের ওখানে ডেটিং নেই, তবে মেয়ে-দেখা আছে। শংকর দেশে ফিরে গিয়েই মেয়ে দেখা শুরু করবে তার ভাইয়ের বউ সিলেকশনের জন্য।”

খুব ক্ষমা চাইলেন মিসেস মানকেলো। “কী লজ্জার ব্যাপার! আমি তো ধারণা করে নিয়েছি, তোমাদের ওখানে ভাইয়ের ফিউচার ওয়াইফের সঙ্গেই ডেটিং করবার নিয়ম!”

“অল্পের জন্যে রক্ষে হয়ে গেলো, মাখনদা। এরা কী সব ভেবে রেখেছে কে জানে!”

মাখনদা বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। সব ঠিক করে ফেলবো।"

যথাসময়ে মিস্টার মানকেলো ফিরে এলেন। এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মিসেস মানকেলো খাবার সাজাবার জন্যে প্যানট্রিতে চলে গেলেন।

ডিনারের জন্য অপেক্ষা করবার আগে মানকেলো সায়েব আমাদের আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এবার তোমাদের এ-বাড়ির সর্বাধুনিক যন্ত্রটা দেখাবো। একেবারে হালফিল আনা হয়েছে। সম্পূর্ণ অটোমেটিক।" ট্রানজিস্টরাইজড, সলিড স্টেট, হাইব্রিড, হাইফাই আরও কতকগুলো বিচিত্র শব্দ পরের-পর উল্লেখ করে গেলেন মানকেলো সায়েব।

দেখলাম টেবিলের ওপর একটি ছোট্ট কেটলি রয়েছে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "একে অর্ডিনারি জিনিস ভেবো না। আমেরিকান সুপার টেকনোলজির সুপার লেটেস্ট অবদান।"

আমি বোকার মতো তাকিয়ে আছি ওঁর দিকে। মিস্টার মানকেলো বললেন, "কেটলির সঙ্গে একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি রয়েছে যা বছরে হাফ সেকেন্ডের বেশি স্লো-ফাস্ট যায় না। এই ঘড়ির দু-নম্বর কাঁটা ঘুরিয়ে তুমি কেটলিকে নির্দেশ দিতে পারো। চল্লিশটা পর্যন্ত হুকুম এর মিনি কমপিউটারে মজুত রাখা যায়!"

"মানে?"

"মানে কেটলিতে জল ভর্তি করে আমি ঘড়ির কাঁটায় ছ'টা করে দিলাম। ঠিক ভোর ছটার পাঁচ মিনিট আগে অটোমেটিক ইলেকট্রিক হিটার চালু হয়ে যাবে। জল যেমন ফুটতে আরম্ভ করবে অমনি..."

ঠিক এই সময় মাখনদা আমাকে কনুইয়ের ধাক্কা দিলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলাম, "এ-আর কী? এর থেকে বেটার জিনিস আমার বাড়িতে আছে।"

এরকম উত্তরের জন্য সায়েব প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বড়দা স্টাইলে বললেন, "একটু ধৈর্য ধরো, এখনও সবটা বলা হয়নি। জল ফোটা মাত্রই কেটলির ইলেকট্রনিক ঢাকনি অটোমেটিক খুলে যাবে এবং ওপর থেকে অটোমেটিক একটা কিংবা দুটো টী-ব্যাগ জলের মধ্যে নেমে আসবে এবং কেটলির মুখ আবার বন্ধ হয়ে যাবে।"

আমি আবার কনুইয়ের সিগন্যাল পেলাম। এখন আর কোনো উপায় নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ির ব্যবস্থা এর থেকেও বেটার।"

বিরক্তি চেপে রেখে সায়েব বললেন, "এখনও সবটুকু শোনা হয়নি তোমাদের। হাল্কা, কড়া, খুব কড়া—তিনটে বোতাম আছে। যেটা টিপে রাখবে সেই অনুযায়ী চা তৈরি হওয়া মাত্রই কেটলি থেকে টুংটুং হাইফাই স্টিরিওফোনিক বাজনা আরম্ভ হবে। তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে কেটলির কাছে চলে এসো। চা রেডি। কেটলি

থেকে ঢালো এবং খাও। ওয়াইফকেও এক কাপ দাও।”

সায়েব ভেবেছিলেন এবার আমার মুখ বন্ধ হবে। কিন্তু আবার কনুইয়ের খোঁচা খেয়েছি আমি। সুতরাং বললাম, “আমার বাড়ির সিস্টেম এর থেকে অনেক অটোমেটিক—অনেক হাঙ্গামা কম।”

মানকেলো সায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠলো। “ইন্ডিয়া যে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে এতো এগিয়ে গিয়েছে তা জানতাম না। জাপানীরাও এই মিনি মারভেলো মেশিনের কথা ভাবতে পারছে না, শংকর।”

এবার আমার সত্যিই বুক ধুকপুক করছে। মানকেলো সায়েব জিজ্ঞেস করলেন বলে, তোমার বাড়ির মেশিনটি কি রকম?

যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। মানকেলো সায়েব প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। আর আমি একমনে মা হাজার-হাত কালীকে ডাকতে লাগলাম। “মা, এই সায়েবের জিবটাকে আধ ঘণ্টার জন্যে অসাড় করে দাও।”

শিবপুরে মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা পৌঁছলো কিনা জানি না, কিন্তু মাখনদা নিজেই এবার যুদ্ধে নেমে পড়লেন। বললেন, “শংকর একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এই আমেরিকান কেটলিতে অনেক উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। সিটি বাজলেই তোমাকে উঠে আসতে হয়। কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে সিস্টেম রয়েছে তাতে বিছানা ছেড়ে টেবিল পর্যন্ত আসতে হয় না।”

“অ্যাঁ!” মানকেলো সায়েবের চোখ দুটো ছানাবড়া হবার উপক্রম।

আমারও বুকের ধুকপুকুনি বাড়ছে। কী করছেন মাখনদা! এইভাবে কত মিথ্যে বানিয়ে বলবেন!

তিনি বললেন, “শংকরের বাড়িতে যে সিস্টেম আছে তাতে কেটলি থেকে চা কাপে অটোমেটিক ঢালা হয়ে গিয়ে প্রয়োজন মতো দুধ-চিনি মেশানো হয়ে যায়?”

“তাহলে তোমরা ইন্ডিয়াতে এ ব্যাপারে এক কদম এগিয়ে আছো।” মানকেলো সায়েব বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু মাখনদা বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। “দাঁড়াও। এখনও সমস্তটা বলা হয়নি—এক কদম নয়, বহু কদম এগিয়ে রয়েছে ইন্ডিয়া।”

বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন মিস্টার মানকেলো। আমিও তখন বোকা বনে গিয়েছি।

মাখনদা বললেন, “আমাদের বন্ধুটি লাজুক, তাই এইসব মেশিনের কথা উল্লেখই করছে না। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।”

আবার আক্রমণ করলেন মাখনদা। “চা তো কাপে অটোমেটিক তৈরি হলো। তারপর সেই কাপ সোজা মুভ করতে লাগলো বিছানার দিকে।”

"অ্যাঁ! রিমোট কনট্রোল? ফ্লাইং কাপ-ডিস!" মানকেলো সায়েব এবার মোক্ষম ঘা খেয়েছেন।

"ফ্লাইং সসারের একটা মিনি সংস্করণ বলতে পারো। তবে এখনও সবটা বলা হয়নি।"

মানকেলো সায়েব হাঁ করে তাকিয়ে আছেন।

মাখনদা বললেন, "ইন্ডিয়ার প্রধান সমস্যা হলো মশা। তোমাদের আবিষ্কৃত ডি-ডি-টি ছড়িয়ে এইসব মশার কিছুই করা যায়নি। ফলে এনসেন্ট মসকিটো নেট ছাড়া বিছানা হয় না। কিন্তু এই মেজর প্রবলেম সত্ত্বেও ফ্লাইং কাপডিসের কিছু অসুবিধে হয় না।"

"মশারির নেট কেটেই কাপ-ডিস ভিতরে ঢুকে পড়ে!" সায়েবের গলা ঘড়-ঘড় করছে।

"পুওর কানট্রি, প্রত্যেক দিন মশারির নেট ছিঁড়লে চলবে কি করে? স্পেশাল প্রসেসে মশারির মধ্যে কাপ-ডিস ঢোকে কিন্তু নেটের কোনো ক্ষতি হয় না, সেইটাই এই ট্রিপল-সুপার হায়েস্ট-ফায়ডিলিটি করোনেশন কোয়ালিটি ম্যাগনা-সিস্টেমের সিক্রেট বিউটি! ঘুমের ঘোরে চা খাবার পরে এঁটো কাপ-ডিস আবার রিটার্ন জার্নি শুরু করে—যেমন চাঁদের মহাকাশযান চাঁদ থেকে ঠিক সময়ে আবার ফিরে চলে পৃথিবীর দিকে।"

মানকেলো সায়েব এবার সম্পূর্ণ ধরাশায়ী। করুণকণ্ঠে জানতে চাইলেন, "এরকম যন্ত্র কত আছে ইন্ডিয়ায়?"

অসংখ্য। বলতে গেলে প্রত্যেক বাড়িতেই এই যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।"

"কতগুলো বোতাম টিপতে হয়? চলে কিসে? ইলেকট্রিক না ব্যাটারিতে, না নিউক্লিয়ার পাওয়ারে?" নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আগে মানকেলো করুণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

চোখ বুজে বিজয়ী জেনারেল ম্যাকআর্থারের স্টাইলে মাখনদা বললেন, "বোতাম টিপতে হলে তো সেকেলে টেকনলজি হয়ে গেলো মিস্টার মানকেলো।"

"তাহলে কী 'লেজার অ্যাকটিভেটেড' কাজকর্ম হয়ে যায়?"

"ইন্ডিয়া এখনও অনেক এগিয়ে রয়েছে, মিস্টার মানকেলো। টেকনলজিটা খুবই জটিল—একটা সাউন্ড কোড থাকে—যেটা বিভিন্ন মেসিনের পক্ষে বিভিন্ন। সেই সাউন্ড কোড রিপিট হলেই ভয়েস একটিভেটেড চেন রি-এ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। খুবই জটিল পদ্ধতি—অ্যাটম ভাঙার মতো। কিন্তু পদ্ধতি যতই শক্ত হোক, চায়ের কাপ বালিশের পাশে চলে আসে। কুইকলি।"

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল প্রসেস?" জানতে চাইলেন মানকেলো।

"ইলেকট্রো মেকানিক্যাল, না ফিজিও-কেমিকাল সে-সব বলা বারণ, মিস্টার মানকেলো। বুঝতেই পারছেন, ইন্ডিয়ার ন্যাশানাল সিক্রেট।" মাখনদার কথায় চাপা ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো।

সায়েব একেবারে ধরাশায়ী। "সামান্য একটা কোড সাউন্ড থেকে এমন ম্যাজিক অ্যাকশন এখনও অকল্পনীয়। এবং বিভিন্ন মেশিনের জন্যে বিভিন্ন সাউন্ড কোড!"

কাতরভাবে সায়েব জানতে চাইলেন, "এই মেশিনের দাম কতো?"

"এসব মেশিন কখনও সোজাসুজি বিক্রি হয় না, মিস্টার মানকেলো। অনলি ভাড়া সিস্টেম—যেমন তোমাদের আই-বি-এম কমপিউটার মেশিন লিজ পাওয়া যায়।"

সাউন্ড কোডের ব্যাপারটা সায়েবের মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। মাখনদা বললেন, "প্রয়োজন হলেই সাউন্ড কোড চেঞ্জ করা যায়। অনেক বাড়িতে প্রায়ই চেঞ্জ হয় আজকাল। সমস্ত কথা বলা যায় না। তুমি হাওড়া কাসুন্দিতে এসো, শংকর তোমাকেও এই সুপার সিস্টেমে চা খাওয়াবে। এমন মেশিন থাকলে তোমার এই যে ডজন-ডজন অটোমেটিক মেশিন রয়েছে তার কোনোটাই আর লাগবে না। সব কাজই এই সাউন্ড অ্যাক্টিভেটেড টোটাল সিস্টেমে চলবে।"

"সত্যি কথা বলতে, ডিনারের পর এঁটো বাসন মেশিনে পুরতে আমাদের খুব খারাপ লাগে। আর সকালে ওই অটোমেটিক মেশিনে হুইস্‌ল যখন দেয় তখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছেই করে না। তোমাদের এখানে ওই মেশিন অন্তত একটা এক্সপোর্ট করো।" ডিনারের পর আমাদের বিদায় দেবার সময় কাতর অনুনয় করেছিলেন মিস্টার ও মিসেস মানকেলো। কিন্তু মাখনদা পাথরের মতো অটল।

"স্যরি, এই মুহূর্তে কোনো চান্স নেই," এই বলে মাখনদা আমাকে নিয়ে সায়েবের বাড়ি থেকে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলেন।

গর্বিত সায়েবের পতনে খুশী হলেও মাখনদার পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছিল না। "জাতীয় সম্মান রক্ষা প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলে মিথ্যার আশ্রয়!"

আমার মন্তব্য শুনে একটুও বিচলিত হলেন না মাখনদা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন, "একটি কথাও মিথ্যে বলিনি। সব হানড্রেড টেন পারসেন্ট সত্যি।"

গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মাখনদা বললেন, "বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মদন, জগু, কেষ্ট এই রকম কোনো নাম ধরে ডাকলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ির কাজের লোক তোদের মশারির মধ্যে চা এনে দেয় না? এই মেশিনই তো উনুনে আঁচ দেয়, বাসন মাজে, বাটনা বাটে, জল তোলে, কাপড় কাচে, দরজা খুলে দেয়, এঁটো কাপ-ডিস বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং হাজার রকম কাজ

করে। এরকম আশ্চর্য ভয়েস অ্যাকটিভেটেড অটোমেটিক মেশিন এ-শালারা পাবে কোথায়?" এই বলে মাখনদা মনের আনন্দে বাংলা গান গাইতে শুরু করলেন, "সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে।"

ক্লিভল্যান্ডের বাড়িতে বসে লেখাটা শোনবার পরে দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, "এবারে আপনার মাখনদার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। বলবেন, আমাদের অনেকের মনের দুঃখটা আগাম বুঝে নিয়ে উনি চমৎকার চালিয়ে যাচ্ছেন।"

এখন আমি আচমকা কানাডায়! অনুপ্রাসের দিকে দুর্বলতা থাকলে এই অধ্যায়কে বলা চলতে পারে 'টরন্টোয় টানাটানি'!

দৈবের বশে, ইউ-এস-এ থেকে সাময়িকভাবে কানাডায় সরে যাওয়ার পিছনেও রয়েছে মিছরিদার প্রভাব। হঠাৎ সকালে নিউ ইয়র্ক থেকে ক্লিভল্যান্ডে ফোন। 'ট্রাঙ্ক কল' বলে খুব বকুনি খেলাম মিছরিদার কাছে—আটলান্টিক মহাসাগর পেরোতেই ওটা নাকি হয়ে যায় 'লং ডিস্ট্যান্স কল'। মিছরিদার সংক্ষিপ্ত ঘোষণা, "আমি যাচ্ছি। তুই আয় টরন্টোয়!"

লং ডিস্ট্যান্স মিটার কমাবার সৎ উদ্দেশ্যে মিছরিদা টেলিগ্রাফিক স্টাইলে যা বললেন, "ওখানে টেরুদার ছোট ছেলে রয়েছে। ফোনেই আমার হাতে-পায়ে ধরলো, 'কাকু একবার চলে এসো'। না বলতে পারলাম না! তুই টরেন্টোতে পৌঁছে মিস্টার মুন ব্যানকে ফোন করবি।"

কে এই মিস্টার মুন ব্যান জিজ্ঞেস করাতে খুব বিরক্ত হলেন মিছরিদা। "আমাদের চাঁদু ব্যানার্জি—ওইটাই আদি নাম ছিল টেরুদার ছোট ছেলের। এখন হয়েছে সায়েব। কিন্তু ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানী। আমি 'হ্যাং-আপ' করছি।" আমেরিকায় কেউ টেলিফোন নামিয়ে রাখে না—'হ্যাং আপ' করে।

মিছরিদার পরামর্শে কানাডায় এসে আমি যার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি তার নাম নীলাদ্রি চাকী।

"ডায়মন্ড পার্টিকল, অর্থাৎ হীরের টুকরো ছেলে এই নীলাদ্রি," জানিয়েছিলেন মিছরিদা। "আর যদি মণি-কাঞ্চন সংযোগ দেখতে ইচ্ছে থাকে তাহলে দেখিস ওর বউ রাণুকে—স্রেফ ট্যারা হয়ে যাবি, ফরেনে এই রকম হানড্রেড পার্সেন্ট বাঙালি কিভাবে তৈরি হয়।"

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকীসরকারের ভাই নীলাদ্রি ও তার স্ত্রী রাণুই

আমাকে মোটর গাড়ি চড়িয়ে ইউ-এস-এ থেকে টরেন্টোতে হাজির করেছেন। ওঁরা বাঙালি সম্মেলনে যোগ দিতে ক্লিভল্যান্ড এসেছিলেন এবং আমাকে আবার নিরাপদে শ্যামচাচার দেশে পৌঁছে দেবেন, রণজিৎ দত্তকে এই ব্যক্তিগত মুচলেকা দিয়ে নিজেদের গাড়িতে তুললেন।

চলমান গাড়িতেই আমি ওঁদের কাছে খবর পেয়েছি বাঙালিদের পক্ষে কানাডায় তিনটি অবশ্যদ্রষ্টব্য জিনিস আছে—দত্ত, মোহান্ত ও নায়াগ্রা জলপ্রপাত। আমি বলেছি, "মারো গোলি নায়াগ্রাকে—বইতে সুন্দর-সুন্দর ছবি দেখে নেওয়া যাবে নায়াগ্রার। দর্শনের ব্যাপারে বাঙালি সমাজের চিরস্থায়ী গার্জেন ওড়িশার মোহান্ত ও তাঁর প্রাণের বন্ধু বিহারের দত্তকে টপ প্রেফারেন্স দিতে চাই!"

জানা দেশ কানাডায় দত্ত-মোহান্তর অজানা কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে খবরাখবর আপনাদের যথাসময়ে জানাতেই হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে টরন্টো শহরের ইউনিয়নভিল অঞ্চল থেকে আমাদের গাড়ি চলেছে একশ ছিয়ানব্বই নম্বর রয়াল ইয়র্ক রোডের দিকে। গাড়ির চালক বিখ্যাত ডাক্তার প্রশান্তকুমার বসু—টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অপথালমোলজির অধ্যাপক। পৃথিবীর সেরা পাঁচজন কর্নিয়া ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে একসময় তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিদানের ব্যাপারে টরন্টোর স্থান পৃথিবীতে এক নম্বর, আবার সেখানকার এক নম্বর আমাদের কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্রশান্ত বসু। কলকাতায় কোনো হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত থাকলে এতোদিনে নিশ্চয় অনেক গালাগালি খেতেন, মন্ত্রীমশাইরা নিশ্চয় বলতেন, এইসব ডাক্তারের জন্যেই সরকারী হাসপাতাল উচ্ছন্নে যাচ্ছে। কিন্তু বহু বছর আগে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কানাডা পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত বসু বেঁচে গিয়েছেন—বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্য।

সাতসকালে একশ ছিয়ানব্বই রয়াল ইয়র্ক রোডে যাবার পিছনে যিনি রয়েছেন তাঁর নাম সিতাংশু চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী রীনা। এদেশের পি-এইচ-ডি করে সিতাংশু এখন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত—বহু বই-এর খোঁজখবর রাখেন। তাঁর স্ত্রী রীনা শিক্ষিকা, যা এদেশে খুবই সম্মানিত বৃত্তি।

ভারী শান্ত স্বভাবের মানুষ এই সিতাংশু। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এঁর পিতৃদেব দুঃখহরণ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। হঠাৎ আলাপ হয়ে গেলো। কথায়-কথায় সিতাংশু বললেন, "বাঙালি জাহাজ-খালাসী, বাঙালি ডাক্তার এবং বাঙালি ধর্মপ্রচারক আমাদের ঘরকুনো অপবাদ মুছে দিতে পারতো যদি আপনারা লেখক হিসেবে এদের পরিব্রাজক জীবন সম্বন্ধে আরও একটু সজাগ হতেন।"

নিউ ইয়র্ক ইউনাইটেড নেশনস-এ আমি শ্রীচিন্ময়ের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

দেখেছি। এখানেও কেউ আছেন নাকি? শুনলাম টরন্টোতেও একজন অসাধারণ বাঙালি আছেন, যদিও বাঙালি অথবা ইন্ডিয়ান সমাজের সঙ্গে তাঁর ততটা যোগাযোগ নেই।

ডাক্তার প্রশান্ত বসুও এই অধ্যাত্মবাদীর নাম শোনেননি বা তাঁকে দেখার সুযোগ পাননি।

সিতাংশুর কাছ থেকে যা জানা গেলো—এই মানুষটিকে যাঁরা এদেশে অনেক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে এসেছেন এবং মাথায় করে রেখেছেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ-গায়নার প্রাক্তন অধিবাসী, সংক্ষেপে এখন যাদের গাইনিজ বলা হয়।

ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। এক ভেতো বাঙালি কলকাতা থেকে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করলেন ১৬০০০ মাইল দূরের দক্ষিণ আমেরিকায়। তারপর সেখানে মানুষের হৃদয়ে এমন গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করলেন যে, সেইসব মানুষ যখন আবার দেশত্যাগী হয়ে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লো তখন তারা প্রথম সুযোগেই এই বাঙালিটিকে প্রায় মহাপুরুষের সম্মান দিয়ে নিয়ে চললেন নতুন সেই দেশে। তাঁদের সবিনয় নিবেদন, "আপনি ছাড়া আমাদের কে আছে? আপনাকে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকবো কী করে?"

এই মানুষটি দক্ষিণ আমেরিকায়, গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনের কাছে 'কোভ অ্যান্ড জন' নামক জায়গায় একটি ইস্কুলের প্রধান ছিলেন। তারপর ইতিহাসের পাকেচক্রে এই টরন্টো শহরের এক কোণে একটি হিন্দু মন্দিরের রক্ষক এবং কয়েক সহস্র ছিন্নমূল গাইনিজ পরিবারের অধ্যাত্ম-গুরু হয়েছেন। এই মানুষটির আশীর্বাদ ছাড়া কানাডাপ্রবাসী গায়নিজরা কোনো কাজ করেন না। কোটিপতি গায়নিজও এখানে এসে এঁটো বাসন মাজতে বসে যান এবং তাঁর স্ত্রী এই মানুষটির জামাকাপড় কাচেন।

সিতাংশু বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন আমি বিশেষ উৎসাহিত ও কৌতূহল বোধ করছি। বাঙালির বিশ্বজয়ের ইতিহাস কবে লেখা হবে গো? কবে? অক্ষম আমি দুর্বল কলম নিয়ে এই পঞ্চাশোর্ধ পর্বে গভীর দুঃখ বোধ করছি, কেন যৌবনে বেপরোয়া হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়িনি? সমস্ত জীবন ধরে করবার মতন একটা কাজ হতো। অবশ্য আমার তো আর্থিক স্বাধীনতা ছিল না, প্রতিদিনের অন্ন-বস্ত্রের জন্য সারাজীবন অন্য এক বৃত্তির শৃঙ্খলে বন্দী থাকতে হয়েছে।

সিতাংশুবাবু আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করলেন না। ইচ্ছে থাকলে কী না হয়? যাঁরা এই গত অর্ধশতাব্দীতে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন করলেন তাঁরাও ছিলেন কপর্দকশূন্য।

"শুনুন শংকরবাবু, একজনের কথা—তিনি কলকাতার বউবাজারে যেখানে

থাকতেন সেখানে শৌচাগার ছিল না—রাত তিনটের সময় চীনাপট্টির পাবলিক টয়লেটে লাইন দিতে হতো। লক্ষ্যস্থলে প্রবেশের পরমুহূর্তেই 'পানি গিড়াও, পানি গিড়াও' চিৎকার শুনতে হতো এবং নাহি গিড়াইলে দরজায় ধাক্কা।"

"আপনি বঙ্কিম সেনগুপ্তর নাম শুনেছেন? পিতা হরকুমার, পৈতৃক বাটি ফরিদপুর জেলার 'নগর' গ্রামে।"

আমি শুনিনি। "শুনবেন কেন? বাঙালির মতন ইতিহাস অসচেতন জাত পৃথিবীতে কখনও হয়নি শংকরবাবু।"

তারপর সিতাংশুবাবু যা বললেন তাতে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। "মাত্র চার মাস আগে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বাষট্টি বছরের কর্মময় জীবনের ইতি টেনে একাশি বছর বয়সে ১৯৮৬-র মে মাসে কলকাতায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কলকাতায় আপনারা অকাজে বড় ব্যস্ত। বাঙালির ফুটো খুঁজতে-খুঁজতেই বড়-বড় সংবাদপত্রের সর্বশক্তি নিঃশেষ হয়। আপনারা কেমন করে অনুসন্ধান করবেন সেইসব মানুষের কীর্তিকাহিনী যাঁরা আমাদের চোখের সামনেই ভারত-সংস্কৃতির প্রচার করলেন বিশ্বময় এবং এক শতাব্দীর ব্যবধানে দিশেহারা এক মানব সমাজকে আবার সনাতন হিন্দুধর্মের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনলেন। এঁরা কাজ করেছেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং গায়নায়।"

আমি ক্রমশই তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আমি অবশ্যই গত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে সিমুলিয়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং ইদানিংকালে হুগলির এ সি ভক্তিবেদান্তর কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করেছি। কিন্তু বঙ্কিম সেনগুপ্ত আমার সম্পূর্ণ অজানা। এপ্রিল ১৯৮৬-তে আমি কলকাতায় ছিলাম—তাঁর তিরোধানে তো কোনো হৈ-চৈ হয়নি!

সিতাংশুবাবু বললেন, "শুনুন, বিবেকানন্দ ও ভক্তিবেদান্তর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারে মস্ত বড় কাজ করেছে আর এক সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ যার নাম গয়ায় পূর্বপুরুষের পিণ্ডি দেওয়ার সময়ে এবং বন্যা বা প্রকৃতিক দুর্যোগের পরেই আপনাদের মনে পড়ে—আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কথা বলছি।"

পরপর তিনটি নাম আমি লিখে নিলাম। "যশোরের ভেরচ্চি গ্রাম এবং দৌলতপুর একাডেমির (খুলনা) প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্র যিনি সন্ন্যাস জীবনে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন, স্বামী পূর্ণানন্দ (বঙ্কিম সেনগুপ্ত) এবং টরন্টোতে আপনি যাঁকে দেখতে যাবেন সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ যাঁর পূর্বাশ্রম নামটি হল শান্তিরঞ্জন দাস।"

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে যদি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ

থাকতো তা হলে অদ্বৈতানন্দ, পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এতোদিনে সাধারণ বাঙালির হৃদয়সিংহাসনে স্থান পেতেন। অনেকদিন আগেই কোনও এক বিখ্যাত বাঙালি গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, "হায় আমরা সকলে রণজির নাম জানি, কিন্তু রামমোহনকে ভুলিতে বসিয়াছি!" আজও আমরা পৃথিবীর কোন্ মাঠে কে কতবার একটি চর্মগোলককে লগুড়াঘাত করেছে তা কণ্ঠস্থ রেখেছি, কিন্তু বহির্ভারতের যে কয়েক কোটি ভারতীয় বংশোদ্ভুত মানুষ আছেন তাদের জীবনে কে নতুনভাবে ভারতচিন্তার দীপশিখা জ্বালালো তা জানতে আগ্রহী হলাম না।

যতদূর জানা যায়, ব্যাপারটার সূত্রপাত ১৯২৮ সালে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ অনুমান করেন, প্রায় এক কোটি ভারতীয় দেশের বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্প ইত্যাদিতে লিপ্ত। ভারত মহাসাগর অঞ্চলেই ভারতীয়ের সংখ্যা বেশি—সেখানকার ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর তিন চতুর্থাংশ ভারতীয়। পুরুষানুক্রমে ঐসব ভারতীয় বিদেশে বসবাসের ফলে তাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে এবং তারা ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক দূতরা একসময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের মর্মবাণী প্রচার করতেন। এশিয়া ছাড়াও অন্যান্য মহাদেশেও ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য ইত্যাদির বিস্তার ঘটেছিল। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে সাংস্কৃতিক দূতের পরিবর্তে হাজার-হাজার ভারতবাসী শ্রমিকরূপে বিদেশে প্রেরিত হয়। পুরুষানুক্রমে বিদেশে বসবাসকারী এই ভারতীয়রা ক্রমশঃ পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য-আদর্শ ভুলতে আরম্ভ করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দর জীবনও আমাদের এক গৌরবময় কাহিনী। পূর্বাশ্রমে এঁর নাম ছিল বিনোদ ভুঁইয়া। পিতা বিষ্ণুচরণ—জন্ম ফরিদপুরের বাজিতপুরে ১৮৯৬ খ্রীঃ। ১৯১৩ খ্রীঃ গোরক্ষপুরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় একবার গ্রেপ্তার হন এবং পরে মুক্তি পান। ১৯২১ খ্রীঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরোধে দুর্ভিক্ষ পীড়িত সুন্দরবনে একটি অস্থায়ী সেবাশ্রম খুলে সেবাকার্যে ব্রতী হন। ১৯২৩ খ্রীঃ এই সেবাশ্রম ভারত সেবাশ্রম সংঘ নামে পরিচিত হয়। স্বামী প্রণবানন্দ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন।

প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচারের জন্যে স্বামী প্রণবানন্দ ১৯২৯ খ্রীঃ বিদেশে দূত প্রেরণ করেন। প্রথম যাত্রার আগের দিন স্বামী অদ্বৈতানন্দ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর শুভেচ্ছা গ্রহণ করে একাধিকবার ব্রহ্ম, মালয়, শ্যামদেশের সীমান্তে প্রচারকার্য

চালান। তারপর কিছুদিন এ-কাজ বন্ধ থাকে।

১৯৪৮ খ্রীঃ দশজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, জাঞ্জিবার ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় যেসব ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে স্বামী অদ্বৈতানন্দ ১৯৫০ খ্রীঃ দশ নভেম্বর কলকাতা ত্যাগ করেন। একবছর অপ্রতিহত গতিতে প্রচার কার্য চালিয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ব্রিটিশ গায়নায় অভূতপূর্ব সাড়া গাজাতে সমর্থ হয় এই সাংস্কৃতিক মিশন।

আরতি, পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে বিরাট শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটলো সনাতন ধর্মবিস্মৃত ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান নামধারী মানুষগুলির মধ্যে। প্রতিকূল পরিবেশে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকে পরম শ্রদ্ধা সহকারে সঙ্ঘসন্ন্যাসীদের চারপাশে জড়ো হলেন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে অদ্বৈতানন্দ তাঁর দলের অপর সন্ন্যাসী পূর্ণানন্দকে ওদেশে রেখেই কলকাতায় ফিরে এলেন।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ থেকে দূরে বসবাস করায় ভারত সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে গায়নার মানুষ অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ভারতীয় বেশভূষা তো বহুদিন লুপ্ত, ভাষা, রীতি রেওয়াজও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে পশ্চিমী চালচলন ও পোষাক-আশাকে সবাই অভ্যস্ত। পূর্ণানন্দ বৈদিক মন্ত্র ইত্যাদি রোমান লিপিতে লিখে মাইকের মাধ্যমে হাজার-হাজার মানুষকে মন্ত্রোচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। সন্ধ্যা সমাগমে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে ভজন, কীর্তন ও সন্ধ্যাবন্দনায় মুখর হয়ে উঠলো ত্রিনিদাদ, জর্জ টাউন ইত্যাদি অঞ্চল। শতাধিক বছর ধরে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন এই সব মানুষের মধ্যে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মাতৃসংস্কৃতির প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ গড়ে উঠলো।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ধারণা, উপমহাদেশের বাইরে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় তিন কোটি ভারতীয় পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন এবং মাতৃসংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের গভীর যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজন।

সিতাংশুবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, ডাক্তার বসু আমাকে সোজা হিন্দু মন্দিরে নিয়ে যাবেন।

মন্দিরটি খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না। অনেকক্ষণ বেল টেপার পর যিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে দোতলা থেকে নেমে এসে আমাদের দরজা খুলে দিলেন তিনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজীর যে কিছুদিন আগেই গুরুতর ব্রেন সার্জারি

হয়েছে এবং তিনি একাই এই বিশাল বাড়িতে বসবাস করেন তা আমার জানা ছিল না।

খাঁটি বরিশালী উচ্চারণে পরম স্নেহে স্বামীজী আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন। আমরা প্রথমে গেলাম পূজাকক্ষে। একটি বড় হলঘর, সেখানে কোনো দেবমূর্তি নেই, কিন্তু রামসীতা থেকে শুরু করে হনুমান, লক্ষ্মীনারায়ণ, শিব ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর ফ্রেমে বাঁধানো রঙিন ছবি।

“মূর্তি এরা কোথায় পাবে? এই সবই অতি কষ্টে জোগাড় করে এনে সাজিয়েছে,” বললেন স্বামীজী। গুরুতর শল্য চিকিৎসার পর তাঁর কথা একটু জড়িয়ে যায়। কথা প্রসঙ্গে বললেন, “গায়নিজরা মন্দিরকেও চার্চ বলে। হিন্দু চার্চ, মুসলিম চার্চ, খ্রীষ্টান চার্চ।”

শনি-রবিবারের সকালে এলে আমি যে পূজাপার্বণ, আরাধনা, যজ্ঞ ইত্যাদি দেখতে পেতাম তা অতি সহজেই আন্দাজ করতে পারছি। উইক-এন্ডে ভক্তরা সকালেই চলে আসেন, অনেকে এখানেই প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপর বাড়ি ফিরে যান।

সিতাংশুবাবু ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক এসে গিয়েছেন। চুপিচুপি বললেন, “স্বামীজীকে এঁরা দেবতার মতন শ্রদ্ধা করেন।”

ইতিমধ্যে আড়ালে আরও একটু সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়েছি, যা পরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কলকাতা সদর দপ্তরে দিলীপ মহারাজের কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়েছি। পূর্বাশ্রমের কথা বলতে সন্ন্যাসীরা কখনই আগ্রহী নন, কিন্তু মানুষের উৎস সন্ধান আমার এক প্রিয় বিষয়।

সংসারাশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম ছিল শান্তিরঞ্জন, পিতা মনোরঞ্জন দাস। আদি দেশ যে বরিশাল তা বলাই বাহুল্য। শান্তিরঞ্জন কলকাতায় ইন্ডিয়ান সেনট্রাল জুট কমিটির টেকনিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক সহকারীর কাজ করতেন। বৈরাগ্যের সূচনা বোধহয় একটু দেরিতেই, ১৯৬০ সালের শেষ দিকে ছত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন কলকাতায়।

গায়নায় পূর্ণানন্দের প্রচারকার্য তখন মধ্যগগনে। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্থায়ী আশ্রম—ব্রিটিশ গায়না সেবাশ্রম সঙ্ঘ—প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন। রেজাউল মারাজ অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর শ্রীমতী মেঘবরণ মারাজ জর্জটাউন থেকে আঠারো মাইল পূর্বে জন অ্যান্ড কোভ, ইস্টকোস্ট ডামারারো নামক পল্লীতে কুড়ি একর জমি দান করেছেন। এখানেই একটি মন্দির, একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমে ইতিমধ্যে আটজন ত্যাগব্রতী কর্মীও শিক্ষা পাচ্ছেন, যাঁদের পরবর্তী কালে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রেরণ করা হবে।

পূর্ণানন্দজী তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে কুড়িটির বেশি কেন্দ্র স্থাপন করে ফেলেছেন এবং প্রতিমাসে হাজার-হাজার মাইল ভ্রমণ করে প্রায় প্রতিদিন একটি করে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেছেন। গায়নাতে পূর্ণানন্দকে সাহায্যের জন্য যে তরুণ সন্ন্যাসীকে প্রথম প্রেরণ করা হয় তাঁর নাম স্বামী দিব্যানন্দ। ১৯৫৮ সালে তিনি ব্রিটিশ গায়নায় উপস্থিত হন।

সিতাংশুবাবু চুপিচুপি বললেন, "আপনি এক আশ্চর্য দেশে এসেছেন। এখানে মানুষের জীবনে মজা আছে আনন্দ নেই, সুখ আছে স্বস্তি নেই। মানুষ এখানে বড় একা। যাঁরা জানতে চায় কেমন করে একা থাকতে হয়, স্বামীজী তাদের বলেন, ধ্যান করতে শেখো, পুজো করো।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইতিমধ্যে আদর করে আমাদের নিয়ে দোতলায় একটি ঘরে বসিয়েছেন। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। রামকৃষ্ণ মিশন বলুন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বলুন, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বরাবর এমন স্নেহের প্রাবল্য দেখেছি যে আমি বুঝতে পারি না এঁরা কেমন করে সংসারের আপনজনদের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৈরাগ্য ও স্নেহের এই আশ্চর্য সমন্বয়ই বোধহয় মানুষকে মহত্ত্বের উচ্চশিখরে পৌঁছে দেয়। পূর্ণানন্দের কথাই ধরুন। ইনি ছিলেন বিধবার একমাত্র সন্তান। (১৯২৪ খ্রীঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।) সমস্ত জীবন ধরে তিনি দেশে ও বিদেশে আর্তের সেবা করেছেন, আর্তের দুঃখে দুঃখী হয়েছেন। তিনি শেষ জীবনের তাঁর এক সন্ন্যাসীভ্রাতাকে চিঠিতে প্রণবানন্দের মৃত্যু চিন্তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন : "জীবন অতি ক্ষণভঙ্গুর, পিতা-মাতা আত্মীয়-পরিজনের স্নেহবন্ধন দুদিনের, সংসার অনিত্য, আত্মতত্ত্বোপলব্ধিই জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধনেই প্রযত্ন করতে হয়।" তারপরই তিনি লিখেছেন, "মৃত্যুচিন্তা উপদেশের কী অতুলনীয় প্রভাব। পাঁচ ছয়মাস পূর্বেও যে-বিধবা গর্ভধারিণীকে মা, পায়খানায় যাই বলে পায়খানায় যেতাম, তাঁর একমাত্র মাতৃগতপ্রাণ পুত্রসন্তান আমি, সেই ক্রন্দনরতা, নিঃসম্বলা জননীকে মা মাতামহের সঙ্গে গয়াতে দেখা হয়েছে এই একলাইন লিখতেও অস্বীকার করি। মাতামহ হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকেন, আর একখানা দা আমার হাতে দিয়ে তাঁর মাথায় কোপ দিতে বলেন। প্রতিপালক মাতামহের প্রতি আপাতনিষ্ঠুর ব্যবহার বটে। কিন্তু অবিচলিত থাকি। অঙ্গীকার করেছি যে, আর ফিরে যাবো না।"

সুরসিক পূর্ণানন্দের রসিক মনের দুটি পরিচয় এইখানে দিয়ে রাখার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ১৯৮৬ খ্রীঃ মৃত্যুর আগে তাঁকে বেদনার রস খেতে দেওয়া হয়। জিজ্ঞেস করলেন, কত দাম? দাম একটু বেশি শুনে খুব বিচলিত হয়ে উঠে বারণ করে দিলেন আর যেন ওই ফল না-আনা হয়। বললেন, "এ

তো বেদানা নয়, এ হল বেদনা।"

নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে ধর্মপ্রচারে বেরিয়ে কোনো সপ্তাহে কেবল ভাত, কোনো সপ্তাহে কেবল রুটি, কখনো উপবাস চলেছে। অগ্নাশয়ে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগ। তার বহিঃপ্রকাশ জন্ডিসে—সর্বাঙ্গ হরিদ্রাভ, কিন্তু কোনো দুর্ভাবনা নেই পূর্ণানন্দর। সঙ্গীর সঙ্গে পূর্ণানন্দ রসিকতা করলেন, "দেখ, আমি হলুদানন্দ হয়ে গেছি।"

টরেন্টো মিশনের দোতলার ঘরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইঙ্গিতে সিতাংশু গৃহিণী রীনা এবার কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে এলেন আমাদের জন্যে। মহারাজ বললেন, "কত দূর সেই কলকাতা থেকে এসেছেন, খেতে হবে। আমার শরীর ঠিক থাকলে নিজেই রেঁধে খাওয়াতাম।"

আমি এবার অন্য জিনিস জানতে চাই। মহারাজ শান্তভাবে কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করলেন, তারপর অতীতচারণ শুরু করলেন।

ইয়র্ক রোডের হিন্দু মন্দিরের দোতলায় বসে বাষট্টি বছরের স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "গায়নাতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই স্বামী পূর্ণানন্দের। উনি ১৯৬৭-তে আমাকে কলকাতা থেকে জর্জটাউনে নিয়ে গেলেন।"

জর্জটাউনের আঠারো মাইল দূরে প্রাকৃতিক সুষমামণ্ডিত তপোবনের শুদ্ধ পরিবেশে তখন হিন্দু কলেজটি গড়ে উঠেছে। মহারাজের কানাডিয়ান ভিজিটিং কার্ডেও লেখা হয়েছে 'প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল, হিন্দু কলেজ অ্যান্ড আশ্রম, কোভ অ্যান্ড জন, গায়না'।

নাম কলেজ হলেও, আসলে ইস্কুল। এই গুরুকুল বিদ্যালয়ে ইংরিজী, ফরাসি, ল্যাটিন ছাড়াও হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভারতীয় সমাজে হিন্দি ভাষার পুনঃপ্রবর্তন ও প্রচারের অসামান্য কৃতিত্ব এই পূর্ণানন্দর। তাছাড়া অন্য বিষয় হলো ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে অবশ্যই অধ্যাত্মশিক্ষা।

পূর্ণানন্দ নিজেই ইস্কুল সম্বন্ধে লিখেছেন, "প্রাচীন গুরুকুলের মহান আদর্শে তরুণগণ ভারতীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। মন্দিরে কাঁসরঘণ্টার নিক্কণ, পীতবাস পরিহিত আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিগণের মধুর কণ্ঠে সমবেত প্রার্থনা-গীত, সদ্যস্নাত এবং প্রার্থনা-পবিত্র হৃদয়ে আশ্রমবালকগণের কুসুম চয়ন, প্রতিদিনের যোগাভ্যাস, সন্ন্যাসীগণের নির্জন তপস্যা, অপরাহ্নে গীতা-উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন, পূজা-আরতি, ভজন-কীর্তন, রামায়ণ গান, পরস্পর ভারতীয় ভাষা হিন্দীতে প্রাণখোলা মধুর আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি নিত্তনৈমিত্তিক কর্মচাঞ্চল্যতার ভিতর আশ্রমটিকে শুভ্রশির ঋষির পবিত্র

তপোবনের উজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত করিবে।"

দীর্ঘদিন এই বিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। আর পূর্ণানন্দ, তাঁর কথা তো শেষ হতে চায় না। গায়নার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের তিনি নতুন সাংস্কৃতিক অনন্যতা দিয়েছিলেন ধর্মীয় আইডেনটিটির মাধ্যমে। উনিই স্থানীয় সরকারকে বোঝালেন, হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার স্বাধীনতা দিতে হবে। যেমন মৃতদেহের সৎকার। এর আগে শবদাহ সম্পর্কে কড়া বিধিনিষেধ ছিল। পিতৃ ও মাতৃদায়ের পর হিন্দুদের মস্তক মুণ্ডনের স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি পুজো করলে চাকরি হতো না।

সিতাংশুবাবু বললেন, "গায়নার এই নতুন ধর্মীয় অনন্যতা কিন্তু কোনো লড়াকু মনোবৃত্তির জন্ম দেয়নি। যীশুখ্রীস্টকে পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়েছে।"

যারা দেড়শ বছর ধরে দেশের নাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তারা সামান্য ক'বছরে নাটকীয়ভাবে বদলে গেলো। ভাগলপুরের অধ্যাপক ভোলানাথ মুখার্জী গায়নায় হাজির হয়ে তো অবাক। যে-বাড়িতেই যান সেখানেই হিন্দু উপাসনা সম্পর্কে একখানা ইংরিজী বই প্রায় বাইবেলের মতন যত্ন পাচ্ছে। সংকলয়িতা স্বয়ং স্বামী পূর্ণানন্দ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে পূর্ণানন্দ যখন প্রথম ব্রিটিশ গায়নায় গেলেন তখন সর্বপ্রথম যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এঁর নাম ডাক্তার জঙ্গ বাহাদুর সিং। এঁর বাবা নেপাল থেকে মজুর হয়ে ওদেশে গিয়েছিলেন। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, ছেলে লেখাপড়া শিখুক। অতি কষ্টে স্থানীয় ইস্কুলে তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দেন।

এই যৎসামান্য বিদ্যা ভরসা করে জঙ্গ বাহাদুর স্থানীয় এক জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে কয়েক বছর দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করেন। এই সূত্রে ভারতে এসে তাঁর ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে হয় এবং কোনোক্রমে কলকাতার কারমাইকেল মেডিকেলে ভর্তি হন। ডাক্তারি তকমা নিয়ে ব্রিটিশ গায়নায় ফিরে তিনি বিরাট প্র্যাকটিশ গড়ে তোলেন। দীনদুঃখীদের চিকিৎসায় তিনি পয়সাকড়ি পর্যন্ত নিতেন না। এই জঙ্গ বাহাদুরই অদ্বৈতানন্দ ও পূর্ণানন্দকে পরম আদরে কাছে টেনে নেন এবং এঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন।

ব্রিটিশ গায়নায় স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও পূর্ণানন্দের বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন দুই শিক্ষিতা নার্স। বক্তৃতা শুনে বিমোহিত হয়ে তাঁরা আলাদা আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করলেন। তারপর হঠাৎ নিঃসংকোচে অদ্বৈতানন্দকে বললেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনারা বিবাহ করতে এতো নারাজ কেন? আপনি না হয় বয়স্ক ও আচার্যস্থানীয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে তরুণটি রয়েছেন তাঁর চেহারা

কেমন সুন্দর। আমাদের একজনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি কী?" সংসারত্যাগী মহারাজদের তখন অবস্থা কী তা সহজেই আন্দাজ করতে পারবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মহারাজ ভাবলেন কুশিক্ষার প্রভাবে এদেশের মেয়েরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

কানাডা আশ্রমে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন মনে করিয়ে দিলেন, আমেরিকা মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে স্বামী পূর্ণানন্দর দান অবিস্মরণীয় এই কারণে যে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক গত শতকে চুক্তিবদ্ধ প্রথায় শ্রমিক আমদানির মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়নি। এই ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন, ইতিহাসের আদিকালে বৃহত্তর ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সেন্ট্রাল আমেরিকাতে বিস্তৃত হয়েছিল। সেন্ট্রাল আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারের প্রধান-প্রধান কেন্দ্র ছিল মেক্সিকো, পেরু, গুয়াতেমালা, হন্দুরাস, কলম্বিয়া, ইকোয়াদর ও বলিভিয়া।

সে-যুগে মেক্সিকোর দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল মায়াভূমি বলে খ্যাত ছিল। বহু বছর আগে ভারত সেবাশ্রম সঙেঘর মাসিক পত্রিকায় এ-বিষয়ে চমৎকার এক ধারাবাহিক রচনা লিখেছিলেন শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার। কারুর-কারুর ধারণা শুধু মধ্য আমেরিকা কেন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশেই ভারতসন্তানদের পাদস্পর্শ হয়েছিল। এঁরা স্থলপথে সাইবেরিয়া পর্যন্ত গিয়ে বেরিং প্রণালী পার হয়ে আমেরিকা মহাদেশে উপস্থিত হন।

আমি শুনলাম, মেক্সিকোতে আদিবাসীদের মধ্যে চড়কপুজা হয়—ঠিক বাংলাদেশের মতোই বাঁশের আগায় আঁকড়ার সঙ্গে ভক্তরা নিজেদের বেঁধে ঘোরাতে থাকে। আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা নাকি এখনও প্রতি বৎসর রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব স্মরণে 'দশহরা' পালন করে থাকে। প্রাচীন মেক্সিকানরা নিরামিষাশী ছিল এবং অনেকে এখনও তাই। মেক্সিকানরা আজও হিন্দুদের মতো পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে। মেক্সিকান নারীদের পোষাক হিন্দু নারীদের মতন। কয়েক স্থানে নারীদের ঘোমটা দিতে ও সিঁদুর পরতেও দেখা যায়।

মেক্সিকোতে নাকি অনেক জায়গায় সংস্কৃত নাম ছিল। কয়েকটি নাম এখনও সেই পুরনো সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। যেমন মেঞ্চে (মঞ্চ), পালেনকে (পালঙ্ক), করোজাল (করজাল)। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, মেক্সিকোর বিখ্যাত দুটি হ্রদের নাম, 'চপলা'।

আমরা আবার গায়না প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। স্বামীজী স্মৃতিচারণা করলেন, গায়নার রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ খারাপ হয়ে উঠলো—বেধে গেলো তথাকথিত কালা ও ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা। অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এই অবস্থায় সত্তর দশকের গোড়ায় অনেক ভারতীয় গায়নিজ আবার নতুন করে ভাগ্যসন্ধানের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও অন্যান্য দেশে।

নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই এঁরা পূর্ণানন্দের প্রভাবে যা শুরু করেন তা হলো হিন্দধর্ম সাধনা। এঁরা ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠা করেছেন হিন্দু মিলন মন্দির। নিউ ইয়র্কেও মন্দিরের কথা ভাবা হচ্ছে।

টরন্টোতে নিজের পায়ে একটু দাঁড়িয়েই গায়নিজরা জর্জটাউন গিয়ে ব্রহ্মানন্দকে বললেন, "গুরুজী, আপনি আসুন আমাদের নতুন দেশে। আপনাকে আমাদের বড্ড প্রয়োজন।" উনি এলেন এবং গায়নিজরা তাঁকে মাথায় করে রেখেছে।

তত্ত্বদর্শী সিতাংশুবাবু বললেন, "বিদেশি সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস হলেই নিজের পরিচয়-সংকট হয়, যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন আইডেনটিটি ক্রাইসিস। বিরোধী আবহাওয়ায় এসে ছিন্নমূল গায়নিজরা নিজেদের ধর্মকে অবলম্বন করে বাঁচতে চাইলো।"

ছিন্নমূল গায়নিজরা খেটেখাওয়া মানুষ স্বামীজীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করেন—ওঁরা জানেন স্বামীজী ঠকাবার মানুষ নন। তাই ওঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ওঁর কাছে। কোনো রবিবার যদি ওঁরা মন্দিরে আসতে না পারেন তাহলে ফোন করবেন।

এঁরা কৃষ্ণ, রাম, হনুমান ও শিবের ভক্ত। স্বামীজী বলেন, "সবাইকে শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু ইষ্টদেবতার পূজা করবে।"

স্বামীজী হচ্ছেন সমগ্র গায়নিজ সমাজের স্পিরিচুয়াল ফাদার। ব্রহ্মানন্দ বললেন, "দেশে ভিক্ষা করেছি, এখানে কারও কাছে আমি কিছু চাই না।"

মন্ত্র বোঝাবার জন্যে মাঝে-মাঝে সংস্কৃত শিক্ষার ক্লাশ হয়। রবিবারে যজ্ঞ হয় সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে।

সিতাংশু বললেন, "একজন ভক্ত আছেন, মিস্টার মোহন—গোটা পঞ্চাশেক অ্যাপার্টমেন্টের মালিক। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'গুরুজী' 'আমি আপনার মেয়ের মতন।' তিনি অসুস্থ স্বামীজীর জামাকাপড় কেচে দেন।"

ইংরিজীতে প্রকাশিত হয়েছে প্রার্থনা পুস্তক। প্রতি গায়নিজ ঘরে এই বই পাবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কানাডায় এলেন সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। শ'পাঁচেক পরিবার এখানে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সনাতন হিন্দধর্মকে এঁরাই এখানে রক্ষা করছেন।

১৯৮১ সালে আশ্রম স্থাপনের জন্যে টরন্টোতে সম্পত্তি কেনা হলো। ১৯৮২-তে মন্দির উদ্বোধন হলো। স্বামীজী বললেন, "কারও কাছে এক পয়সা চাইনি। ওরাই নব্বুই হাজার ডলার দিয়ে সম্পত্তি কিনলো। ১৯৮৪ সালের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়েছে গায়নিজ ভক্তরা।"

গায়নিজ ভক্তরা বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজা করতে আগ্রহী, কিন্তু এঁরা ভারতীয় ভাষা জানেন না। তাই সম্প্রতি সত্যনারায়ণের পাঁচালি ইংরিজীতে অনুবাদ করানো হয়েছে।

যোগ, তপস্যা এখন আর অজানা শব্দ নয়। কানাডিয়া এরা এখন হিন্দুধর্মের কথা শুনতে চায়, তাই টেলিভিশন প্রোগ্রামে স্বামীজীর ডাক পড়ে। একজন সায়েব বললেন, "আমরা ভোগের তুঙ্গে উঠেছিলাম, কিন্তু দেখছি তাতে আনন্দ নেই। তোমরা কী করে ওসব ত্যাগ করতে পারো?"

বহু সংস্কৃতির মিলনতীর্থ, এই কানাডা। সব সংস্কৃতির এখানে যথেষ্ট সম্মান।

একজন হিন্দু হয়তো হঠাৎ মারা গেলেন। কাছাকাছি কোনো হিন্দু নেই—তখন অন্য কেউ যাতে পারলৌকিক কাজ সেরে দিতে পারেন তার জন্যে হ্যান্ডবুক তৈরি হচ্ছে। সিতাংশু বললেন, "স্বামীজীর শরীর ভাল নয়। একদিন ফোন করতে গিয়ে লাইন এনগেজ্ড পাচ্ছি—এ তো আর কলকাতার টেলিফোন নয়। চিন্তা হলো, হয় ফোনটা ঠিক মতো বসানো হয়নি, কিংবা ফোন করতে গিয়েই স্বামীজী পড়ে গিয়েছেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যখন ছুটে এলাম মন্দিরে, তখন দেখালাম আমি ছাড়াও আরও পাঁচজন গায়নিজ গাড়ি চালিয়ে এসে গিয়েছেন, টেলিফোনে স্বামীজীকে না পেয়ে। সৌভাগ্যবশত দেখা গেলো, স্বামীজী ভাল আছেন, টেলিফোনটাই ঠিক মতন বসানো হয়নি।"

স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। কোথায় বরিশাল, কোথায় কলকাতার সরকারী গবেষণাগার, কোথায় ব্রিটিশ গায়নার জন অ্যান্ড কোভ এবং কোথায় এই টরেন্টো। ভাগ্যের বিচিত্র স্রোত সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী কোন্ অজানা ভূখণ্ডে দুঃখী মানুষের সঙ্গী হয়েছেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন! অথচ এইসব মানুষের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না।

স্বামীজীর সঙ্গে সেদিন অনেক বিষয়েই কথা হলো। বিশেষ করে যে-সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে তিনি জড়িত তার সম্বন্ধে।

বললেন, ছত্রিশ বছর বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অবিরাম প্রচার করে পূর্ণানন্দ ১৯৮৬ তেই কলকাতায় ফিরেছিলেন। তার আগে দীর্ঘদিন ধরে তিনি লন্ডনে একটি সঙ্ঘশাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতা ফিরবার আগে তিনি টরেন্টোতেও এসেছিলেন।

মার্চ মাসে ব্রহ্মানন্দও কলকাতায় গিয়েছিলেন। ফরিদপুরের বঙ্কিম সেনগুপ্ত ও বরিশালের শান্তিরঞ্জন দাসের শেষ দেখা হলো আমাদের এই কলকাতায়। অবিশ্বাস্য মনোবল, গভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ও আজীবন সাধনায় এঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ভারত-ভূখণ্ড থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের এই জনপদে।

ফরিদপুরের বঙ্কিমের নিত্যসঙ্গী এক কপি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—যা তিনি ১৯৪২ সালে ব্রহ্মচর্য জীবনের প্রারম্ভে উপহার পেয়েছিলেন। এর কয়েকদিন পরেই ১১ এপ্রিল ১৯৮৬, পূর্ণানন্দ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

না, সংসারবিরাগী ব্রহ্মানন্দও মৃত্যু সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করতে দিলেন না। আমি বললাম, "আপনার সাফল্যের খবর কিছু সংগ্রহ করেছি। একটা কিছু অসুবিধের কথা বলুন।"

প্রবীণ সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন, "বিদেশে মাঝে-মাঝে বেশ বিপদে পড়ে যাই। কেউ-কেউ ডাক দেন, দেশে আমার বাবা মারা গিয়েছেন, পিতৃদায় উদ্ধার করুন। কিংবা ওই ধরনের কিছু। আমি বলি, আপনার প্রয়োজন পুরোহিতের, আমি হচ্ছি সন্ন্যাসী।" সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের পার্থক্যটা এতো দূরে মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু বড্ড ছোট সমাজ, সব সময় পুরোহিত যোগাড় করাও সম্ভব হয় না, ফলে আটকে গেলে স্বামীজী দায়িত্ব নেন, তবে কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করেন না।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন, "বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক স্রোত আপনার কোনো বইয়ের পটভূমি হতে পারে। ঘুরে-ঘুরে দেখুন, অনেক অজানা খবর পাবেন যা আপনার ভাল লাগবে।"

আমিও আমার সঙ্গী ডাক্তার প্রশান্ত বসু হিন্দু মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসেছি। আমার মতোই ডাক্তার বসুও অভিভূত। এদেশে আসবার আগে তিনি বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

গাড়ি চালাতে-চালাতে তিনি বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ্য করে মনোবল পাই। গত দুশো বছর ধরে বিদেশে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক দূতের তালিকাটা বাঙালিরা প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছে। আমাদের ধারণা ছিল, রামমোহন থেকে শুরু করে বিবেকানন্দতে এসে ব্যাপারটা শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মন দিয়ে যদি খোঁজখবর করা যায় তাহলে দেখা যাবে, প্রচারব্রতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে বাঙালিরা এখনও তুলনাহীন।"*

মিস্টার মুন ব্যান-এর ওখান থেকে টরন্টো নীলাদ্রি-নিবাসে মিছরিদার টেলিফোন এলো।

মিছরিদার কণ্ঠে উদ্বেগ, "তোর সম্বন্ধে খুব খারাপ রিপোর্ট পাচ্ছি! বিদেশে

এসে অধঃপতন ফর এ কাসুন্দিয়ান বয়—আমার পক্ষে এটা মেনে নেওয়া খুউব শক্ত!'

"মিছরিদা! আমি কাসুন্দিয়ান, কিন্তু বয় নই। আমার ফিফটি টু নট আউট চলেছে—এই ডিসেম্বরে তিপান্ন, যদি ভগবান একটু উদার মনোভাব দেখান।"

"দ্যাখ, যারা বয়সে জুনিয়র তারা চিরকালই আমার কাছে 'বয়' থেকে যাবে, এমনকি সেঞ্চুরি করলেও! আর অধঃপতন! এই ফিফটি-প্লাস বয়সটাই' ডেনজারাস যে-কোনো স্খলনের পক্ষে—মানুষ এই সময় 'গিয়ার' পাল্টাবার জন্য ছটফট করে। তুই চলে আয় টরন্টো ডাউনে, সাক্ষাতে সব আলোচনা হবে।"

'ডাউন' বলতে আমাদের দেশে অধঃপতিত এবং পরাজিত এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে, আর উত্তর আমেরিকা মহাদেশে ডাউন টাউন মানেই একনম্বর জায়গা, ব্যবসা-বাণিজ্য আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রভূমি। মিছরিদা আমেরিকান কথাগুলো খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করেছেন।

ইউনিয়নভিল থেকে ছুটলাম ডাউন টাউনে। মিছরিদার নির্দেশ অমান্য করার মতন দুঃসাহস এখনও আমার হয়নি। নীলাদ্রির স্ত্রী রাণুকে বললাম, "তোমরা অনাবাসী ভারতীয়রা তো দু'সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ আমাকে রক্ষে করবে, আদরযত্ন করবে, তারপর আমি তো ব্যাক টু বাজে শিবপুর, শিবপুর অ্যান্ড কাসুন্দিয়া। ওখানকার বাসিন্দারা শরৎ চাটুজ্যেকে পর্যন্ত মাথায় তোলেননি, আমি তো কোন্ ছার। তখন এই মিছরিদা, পটলদা, ছোঁচোদাই তো আমার একমাত্র ভরসা।"

নীলাদ্রি তার গাড়িতে আমাকে যথাস্থানে ছেড়ে দিয়ে গেলো। নির্ধারিত সময়ে আবার তুলে নেবে। আমি দূর থেকে মিছরিদাকে আবিষ্কার করলাম, তিনি একমনে টরন্টোর জনস্রোত দেখে চলেছেন।

মিছরিদাও কবিতা আওড়াচ্ছেন : "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা!"

মিছরিদা জানতে চাইলেন, "হ্যাঁরে, রবিঠাকুর এই লাইনগুলো কী কানাডা ভ্রমণের পরে লিখেছিলেন?"

"কী যা তা মন্তব্য করছেন, মিছরিদা। এগুলো ভারততীর্থ কবিতার লাইন—ইস্কুলে ঠিক মতন ব্যাখ্যা না করতে পেরে একবার মৃগেনবাবুর বকুনি খেয়েছিলাম!"

মিছরিদা ঠোঁট উল্টোলেন। "আমি তোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ভারতবর্ষের অতীতে এইসব কাণ্ডফাণ্ড ঘটেছিল হয়তো। কিন্তু লাস্ট থ্রি হানড্রেড ইয়ার্স হাজার কয়েক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাড়া কিছুই তো ভারতবর্ষের নতুন অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। বরং ভারততীর্থের জল উপচে আফ্রিকায়, ইউরোপে,

আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাকিয়ে দ্যাখ, এই কানাডা দেশের দিকে, কোথা থেকে মানুষ এখানে জড়ো হয়নি? তুই স্রেফ এই টরন্টো শহরেই একটা জীবন কাটিয়ে পৃথিবীর সব জাতের মানুষের বৈচিত্র্য সম্পর্কে উপাদান সংগ্রহ করতে পারিস। এমন কি ইন্ডিয়া সম্বন্ধেও।"

"প্লিজ, মিছরিদা, আড়াইখানা কলকাতায় যত লোক আছে সমস্ত কানাডা দেশটায় তত লোক নেই। সুতরাং ইন্ডিয়ার ব্যাপারটা এখানে তুলবেন না।"

"আলবৎ তুলবো।" জেদ ধরলেন মিছরিদা, "তুই একটা কমন পরিবেশে গুজরাতী, তামিল, পাঞ্জাবী, বাঙালি এটসেটেরা, কিংবা হিন্দু, মুসলমান, শিখ এটসেটেরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করতে চাস, তা হলে এই টরন্টোই হলো তোর মহাতীর্থ—নট্ ইওর ক্যালকাটা, বোম্বাই অর ম্যাড্রাস। তারপর, তুই গোটা ইন্ডিয়ান জাতটার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য জাতগুলোর বিচার-বিবেচনা করতে চাস, তা হলেও টরন্টো হলো তোর সোনার খনি। ওরে কতবার তোদের বলবো, কূপমণ্ডুকতা ছেড়ে বাঙালি লেখকরা একটু দৃষ্টি প্রসারিত করুক! তখন তো এরোপ্লেনের এতো রমরমা ছিল না। তবু রবিঠাকুর চান্স পেলেই ফুড়ুক করে বেরিয়ে পড়তেন সাগরপারের মানুষদের দেখতে।"

মিছরিদা এই ক'সপ্তাহে দোর্দণ্ড বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বভ্রমণকারী হয়ে উঠেছেন। আরও ফাইভ হানড্রেড ডলার প্রণামী পেয়েছেন গোটা চারেক ছেলের গলায় পৈতে ঝুলিয়ে। "বলতে গেলে, আমিও হিন্দুধর্মের প্রচারকার্য চালাচ্ছি এখানে। পয়সার অভাব নেই। চল্ একটু কফি পান করা যাক। গোমাংসখাদকদের দেশের এক সিকিআনিও আমি কাসুন্দেতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না।"

কফিশপে বসে মিছরিদা বললেন, "এক নম্বর পয়েন্ট, তুই যদি একটা জাত স্থানচ্যুত হয়েও কীভাবে ঝটপট দাঁড়িয়ে পড়তে পারে তা নিজের চোখে দেখতে চাস তাহলে এই টরন্টোতে সপ্তাহ তিনেক থেকে চাইনীজদের সম্বন্ধে একখানা বই লিখে ফেল। এরা এই মুহূর্তে আসছে হংকং থেকে—হংকং-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদের মনে যথেষ্ট উদ্বেগ। তাই কিছু একটা বিষয়সম্পত্তি বা ব্যবসার জন্যে এরা কানাডার দিকে তাকাচ্ছে। বাড়ির দালালদের এখন মচ্ছব! যে সম্পত্তির দাম ছিল এক লাখ কানাডিয়ান ডলার, তাই এক বছরে দু'লাখ হচ্ছে। জানাশোনা দু'একটি বঙ্গ পুঙ্গবও এ-লাইনে কেনাবেচা করিয়ে টু-পাইস করছে। দালালরা এখানে ক্রেতার কাছে পায় তিন পারসেন্ট এবং বিক্রেতার কাছ থেকেও তিন পারসেন্ট। দুটো পার্টিই যদি তোমার হয় তা হলে সোনায় সোহাগা!"

"তুই কী নিবি? পপ?" মিছরিদা রীতিমতো উত্তর আমেরিকান ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

আমি ভেবেছি পপকর্ণ অথবা ভুট্টার খইয়ের কথা বলছেন মিছরিদা।

"মিছরিদা, ভুট্টার খই খাবার জন্যে হাওড়া-কাসুন্দের ছেলেরা এতো কষ্ট করে ফরেনে আসে না!"

"ওরে হতভাগা, তুই ফিরে গিয়ে এদেশ সম্বন্ধে কী করে লিখবি? এখানকার কোনো জিনিস তো তোর মাথায় ঢুকছে না।"

"ঢুকেছে মিছরিদা, কিন্তু থাকছে না!"

"ওই হলো। শোন্, কোনো হোস্ট যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি পপ নেবে কি না, তার মানে তুমি কোনো সফ্‌ট ড্রিঙ্ক নেবে কি না। মদ খাওয়াবার ইচ্ছে হলে বলবে 'বুজ'। খবরদার! আমাদের বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে তুই, যস্মিন দেশে যদাচার এই ধুয়ো তুলে 'বুজ' করে বসেছিস এখবর যেন আমার কানে না আসে।"

আমি বললাম, "দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, মিছরিদা। ভয় হয় নিজের স্টিয়ারিং-এর তার ছিঁড়ে গিয়েছে—কিছুতেই নিজেকে ইচ্ছেমতো চালাতে পারছি না অদ্ভুত এই দেশে। গাড়িতে এরা লিখে রেখেছে 'ট্যাক্সি', কিন্তু মুখে বলবে 'ক্যাব'। লেখা আছে 'পুলিস' কিন্তু বলবে 'কপ্‌স'।"

মিছরিদা ডাইরি বের করলেন। "লিখে নে। বই ছাপিয়ে নাম করবি তুই, আর খবর জোগাড় করে মরছি আমি। আমাদের হাওড়ার ছেলে না হলে কোন্ ব্যাটা তোকে দেখতো!"

মিছরিদা বললেন, "এখানে চাবিও উল্টো। খুললে বন্ধ হয়! বন্ধ করলে খোলে! এখানকার ফ্রিজ-এর দরজার হ্যান্ডেল ডানদিকে। এখানে আলোর সুইচ জ্বালালে নেভে, নেভালে জ্বলে। এখানে তরল পেট্রোলের বায়বীয় নাম হচ্ছে 'গ্যাস'! এখানে লিফ্‌ট-এর নাম 'এলিভেটর'। পেচ্ছাপের জায়গার নাম 'ওয়াশরুম'। কত চেষ্টা করে শিখে এসেছিলাম, 'ছোট বাইরে' যেতে হলে বলতে হবে 'টয়লেট'—কিন্তু কাজে লাগলো না।"

মিছরিদা মনের আনন্দে বললেন, "এই যে তোকে জিজ্ঞেস করলাম 'পপ' খাবি কি না, তার উত্তর তুই কি দিবি আমার জানা আছে। তুই বলবি, 'পেট চুঁইচুঁই করছে। পপ ছাড়া আর কী খাওয়াবেন?' তোর অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছে! পকেটে ক'টা ডলার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিস বিশ্বদর্শনে। এখানে লেখক-ফেখক ঐ ভেক ছেড়ে পৈতৃক পেশা পুরুতগিরির পরিচয় দে—ভাল পশার জমিয়ে ফেলবি এবং কিছু বাড়তি আয়ও হয়ে যাবে।"

"তা যা বলছিলাম, কোনো সায়েব যদি জিজ্ঞেস করে পপ খাব কি না, তাহলে তোর উত্তর হবে—আই ডোন্ট কেয়ার!"

"সর্বনাশ! তেষ্টায় যখন গলাটা গোবি মরুভূমি হয়ে উঠেছে—সেই সময় 'আমি পরোয়া করি না' বলবার মতন মনোবল আমার কিছুতেই থাকবে না, মিছরিদা।"

"ওরে হতভাগা, ওর মানে তুই পপ খাবি না, তা মোটেই নয়। এটা ভদ্রতা। এর মানে হলো, 'তুমি দিতেও পারো, না-ও-পারো!' ভদ্রতা শেখ একটু—বিদেশে এসেছিস, দুনিয়ার সেরা জিনিসটা আহরণ করে হাওড়া-শিবপুরে ফিরে যা!"

"মিছরিদা, যুগ যুগ জিও!" ভাল সাইজের খাবার অর্ডার দিয়েছেন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই।

তারপর বললেন, "খা ভাল করে। অপর্যাপ্ত খাবারের দেশ। দুনিয়ার লোককে খাওয়ানোর মতন গম তৈরি করছে ক'টা মানুষ মিলে। আমার মনটা কিন্তু ভাল নয়, শংকর। মুন ব্যান-এর ব্যান-এর মেয়েটা 'অ্যানেরোক্সিয়া নার্ভোসা'য় ভুগছে। শরীরটা যা হয়ে গিয়েছে।"

গুরুতর রোগ নিশ্চয়। "ক্যানসার-ট্যানসার এর উত্তর আমেরিকান নাম নাকি?" আমি অতি সাবধানে প্রশ্ন করি।

"নারে। প্রাচুর্যের দেশে এই রোগ হয়। তুই-আমি ছোটবেলা থেকে খাবো-খাবো করে হ্যাংলামির বদনাম কুড়োই, আর তেরো বছরের মেয়ে এখানে না-খেয়ে না-খেয়ে এই রোগের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। রোগা হয়ে যাবার প্রচেষ্টায় এবং স্লিম থাকার অদম্য ইচ্ছা থেকে এই মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়—তখন খাবার দেখলেই গা গুলোতে আরম্ভ করে।"

"না আমি কোনো নার্ভোসা রোগের খপ্পরে পড়তে চাই না এই বিদেশে। তাতে দু'তিন সপ্তাহে দু'তিন কেজি গুরুত্ব বৃদ্ধি হয় হবে!"

মিছরিদা বললেন, "কাল থেকে তোর সম্বন্ধে আমার খুব চিন্তা। যতবার ফোন করি ততবার শুনি কোথাকার কোন স্বামীজীর সন্ধানে বেরিয়েছিস।"

"কোথাকার কোন নয়, একেবারে আমাদের নিজেদের লোক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এককালে বরিশালে ছিলেন, তারপর স্থায়ী ঠিকানা, কেয়ার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা।"

সন্তুষ্ট হলেন না মিছরিদা। তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্য, "তোর ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারিনি না। বছর দশেক বিবেকানন্দ ইস্কুলের তাঁবে থেকেও তোর মধ্যে ভক্তিভাব জাগরিত হলো না। দেশে যখন থাকিস তখন তো বেলুড়মঠে, নরেন্দ্রপুরে, গোলপার্কে, রহড়ায়, রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে যাবার জন্যে কোনো ছটফটানি দেখি না। আর বিদেশে এসে সাধু-সন্তদের পিছনে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানে হয়?"

মিছরিদার কিনে দেওয়া মিষ্টি 'পপ' এখনও আমার সামনে রয়েছে। আমার পক্ষে শর্করা-হারামি করা কোনোপ্রকারেই সম্ভব নয়। তাই চুপ করে রইলাম।

মিছরিদা বললেন, "ভোগের এই দেশে সাধুসন্ন্যাসীরা যতই চেষ্টা করুন

তেমন সুবিধে করতে পারবেন না। তা ছাড়া প্রভু যীশুর প্র্যাকটিশ এখানে প্রবল—অন্য কেউ দাঁত ফোটাতে চেষ্টা করলে তাঁর দাঁতটাই ভাঙবে।”

আমি বললাম, “সবে পড়ে এসেছি লিলিয়ান স্মার্ট-এর ‘মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতা’ নামক ইংরিজী বই। উনি বলছেন, হিন্দুত্বের মধ্যে সব ধর্মের মিলনসম্ভাবনার স্বীকৃতি রয়েছে—যত মত তত পথ কথাটা সাচ্চা হিন্দুর কাছে নিছক স্লোগান নয়। শত-শত বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে এমন এক জীবনযাত্রার সম্ভাবনা হিন্দুত্বের মধ্যে রয়েছে যে সব ধর্মই বিনা সংঘাতে বিকশিত হতে পারে।”

মিছরিদা খুব খুশি হলেন না। বললেন, “বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ভক্তিবেদান্ত থেকে আরম্ভ করে পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত সবাই যে কাজ করতে চেয়েছেন, সেখানে বেদ, উপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত তাঁদের শক্তি জোগাবেন। তোর সাহায্যে ওঁদের কোনো কাজে লাগবে না। তুই বাছাধন পুজো-আচ্চা সাধন-ভজন জড়িয়ে না-পড়ে বিত্তসাধক বাঙালির পায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দে। সেটাই হবে এ-যুগের বাঙালির জন্যে তোর সবচেয়ে বড় কাজ।”

মিছরিদা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, “আমি এখানে এসে যে বিজনেসম্যানেরই খবর পাই সে হয় গুজরাতী না হয় সিন্ধী, না হয় গাইনিজ। শুনলাম একখানা বাঙালি দোকান আছে, গিয়ে দেখি সে-দোকান উঠে গিয়েছে। তারপর খবর পেলাম, এক বঙ্গসন্তান হাঁস-মুরগী পালন করে টু-পাইস কামাচ্ছে। তাতে খবর পেয়ে কাল থেকেই তোর জন্যে ছটফট করছি। সব তীর্থ পর্যটন বন্ধ রেখে তুই এখনই গোরাবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ কর।”

“তথাস্তু মিছরিদা।”

জয় মিছরিদার জয়! গোরা আদিত্য সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছুটা ওয়াকিবহাল করেছেন। তারপর আমি নিজে অনেক খবরাখবর নিয়েছি এবং সবার শেষে আমি গোরা আদিত্যর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় হাজির হয়ে তাঁকে সপরিবারে দর্শন করেছি।

কানাডায় নাম করবার মতন বাঙালি ব্যবসায়ী নামে বিরাট এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের খোদ প্রেসিডেন্টসায়েব এই গোরা আদিত্য—যাঁর অধীনে কয়েক

ডজন ডাক্তার ও শ'চারেক কানাডিয়ান সায়েব কাজ করেন। টরন্টোর এজিনকোর্টে ৪৫০০ নম্বর শেপার্ড অ্যাভেনিউতে ৫৫,০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে তাঁর বিরাট পরীক্ষাগারের সদর দপ্তর দেখলে বঙ্গসন্তান হিসেবে চক্ষু চড়কগাছ হতে বাধ্য। এই কেন্দ্রটিতেই যা যন্ত্রপাতি আছে তার দাম অন্তত কুড়ি কোটি টাকা।

আরও একটু বিবরণ প্রয়োজন? তা হলে শুনুন, গোরাবাবুর কোম্পানিতে বাইশখানা শোফার চালিত এয়ারকণ্ডিশন্ড গাড়ি আছে, যার প্রত্যেকটিতে একখানা ফ্রিজ পাবেন। এই গাড়িগুলি দিনে ১০,০০০ মাইল ঘুরে বেড়ায় কোম্পানির কাজে।

বিশাল সদর দপ্তর ছাড়াও টরেন্টো শহর জুড়ে গোটা পঞ্চাশেক শাখা আছে মেডকেম ল্যাবরেটরিজ-এর। বায়োকেমিস্ট্রি, হেমাটোলজি, প্যারাসাইটোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, সাইটোলজি, কার্ডিওলজি, রেডিওইমিউনোঅ্যাসে থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইত্যাদি নানা বিভাগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে এই কোম্পানি টরন্টোর এক নম্বর প্রতিষ্ঠান হবার গৌরব অর্জন করেছে। এহেন কোম্পানির বার্ষিক আয় যে পঁচিশ-তিরিশ কোটি টাকা হবে তাতে আশ্চর্যের কী?

গোরাবাবুর কোম্পানির চারশ কর্মীর মধ্যে বেশ কিছু পি-এইচ-ডিও আছেন। যেমন রডনি এলিস, ইনি বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান ও কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আর একজন হলেন স্ট্যান কুপার। ইনি কোম্পানির অপারেশনস ম্যানেজার।

বাঘা-বাঘা বিশেষজ্ঞের এই কোম্পানির শিখরে যিনি সগৌরবে শোভা পাচ্ছেন, সেই গোরা আদিত্যর ভিজিটিং কার্ডে যে শিক্ষাগত যোগ্যতাটুকু ঘোষিত হচ্ছে তা কেবল বি-এসসি। এই ডিগ্রির উৎপত্তি কলকাতার স্কট লেনের বঙ্গবাসী কলেজে, 'বৈঠকখানা বাজার বিদ্যালয়' বলে উন্নত-নাসিকা সারস্বত সমাজে যার সম্বন্ধে রঙ্গরসিকতার শেষ নেই।

নামেও গোরা, গাত্রবর্ণও গোরা। "আদিত্য বরণং বললেও কোনো ভুল হয় না, চুয়াল্লিশ বছর বয়সের এই ভদ্রলোককে। কিন্তুছেলের গায়ের রং দেখে বাবা এ-নাম রাখেননি, তোকে আমি সাবধান করে দিলাম," বলেছিলেন মিছরিদা।

আমার মুখে সে-কথা শুনে গোরা আদিত্য খুব হাসতে লাগলেন। ওঁর বাড়ির পিছন দিকে সুইমিং পুলের ধারে বসে আমরা গল্পগুজব করছি। অদূরে রয়েছেন গোরা-গৃহিণী।

দুর্জয় প্রাণশক্তি সত্ত্বেও গোরা মানুষটি ভীষণ শান্ত, অত্যন্ত বিনয়ী। কোথায় যেন দূর বাংলা সম্পর্কে গভীর ভালবাসা রয়ে গিয়েছে।

এই হাসির আগে গোরা আদিত্য কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের কথা তুললেন। "ওঁর ছেলে মনসিজ আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমার লেখাপড়া হয়নি, মনসিজের হয়েছে—ও এখন ইংরিজীর অধ্যাপক। গড়িয়াহাট ব্রিজের ওখানে থাকে," বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন গোরা আদিত্য। দেখলাম মনটা এখনও ভেতো বাঙালির মতনই রয়ে গিয়েছে। বললেন, "জানেন, মনসিজ প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হতো আমাদের ইস্কুলে।" মনসিজের সঙ্গে এখনও যে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে তার জন্যে গোরা আদিত্যর বেশ গর্ব।

নামকরণ-রহস্যে কিছুটা আলোকপাত হলো এবার। "গায়ের রং-ফং কিছু নয়। বরহমপুরে (মুর্শিদাবাদ) গোরাবাজারে জন্ম, তাই নাম রাখা হয়েছিল গোরা", গোরা আদিত্য তাঁর চৌত্রিশ নম্বর কোবলস্টোন ড্রাইভ থর্নহিলের প্রাসাদে বসেই আমাকে এ কথা বললেন।

এ-বিষয়ে মিছরিদার সঙ্গে পরে আমি আলোচনা করেছি। মিছরিদা বললেন, "একঘেয়ে সাক্ষাৎকারের মধ্যে যাস না। বাঙালি বেঁকে বসলে বা রুখে দাঁড়ালে কী হতে পারে তা তোকে যুব-সমাজের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। সুতরাং ব্যাপারটা তোকে গল্পের স্টাইলে এবং কিছুটা নাটকের ভঙ্গিতে রসিয়ে লিখতে হবে। না হলে বাঙালি জাতের মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢুকবে না। হাজার জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে বাঙালির মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে—ওঠো, জাগো, নিজের জায়গা নিজে খুঁজে নাও, এই সামান্য বাণীটুকু তার মাথায় ঢোকাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে!"

তা হলে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াচ্ছে!

এক যে ছিল দেশ, তার নাম বাংলা। সেই বাংলা যা একদিন সোনার বাংলা ছিল, এখন পোড়া বাংলা। সেই বাংলায়, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাটকেবাড়িতে (সর্বাঙ্গপুর গ্রামে) এক বাঙালি ভদ্রলোকের জন্ম। পুলিশের অতি সামান্য চাকরিতে ঢুকে সুহাসকুমার আদিত্য মহাশয় যথাসময়ে দারোগাবাবু হয়েছিলেন। দারোগাবাবুর স্ত্রীর নাম সুবর্ণপ্রভা। এঁদের সাতটি সন্তান—চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। দেশ ভাগ হবার সময় সুহাসবাবুর পোস্টিং ছিল খুলনা বাগেরহাটে মোড়লগঞ্জে। সাতচল্লিশ সালে দারোগাবাবু সংসার বদলি করলেন কলকাতার শখের বাজারে—নিজে ঘুরে বেড়ান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহকুমায়।

এই দারোগাবাবুর ছেলে মনে করুন ভর্তি হলো বড়িশা হাই ইস্কুলে। পড়াশোনায় মোটেই ভাল নয় এই ছেলেটি। ১৯৫৫ সালে কোনো রকমে স্কুল ফাইনাল পাশ করলো। তারপর বাঙালির একটাই কাজ থাকে—কলেজে পড়া। প্রথমে বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে। তারপর চারুচন্দ্র কলেজে। অবশেষে বঙ্গবাসী কলেজে। মধ্যিখানে একবার বোধহয় ফেলও করেছিল। তারপর

কোনোক্রমে বি-এসসি। গুণের মধ্যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং সাইকেল চালানোয় দক্ষতা।

এই সময় চাকরি খোঁজা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় চাকরি? সেই সময় পিতৃদেব বনগ্রামে দারোগাগিরি করছেন। ছেলেটির ছোড়দা একদিন বেকার ভাইয়ের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে সাফ বলে দিলেন, "গোরা, এখানে থাকতে হলে সংসারে টাকা দিতে হবে—না হলে বেরোও।" এটা ১৯৬১ সালের কথা।

কত বেকার বাঙালি প্রতিদিন সংসারে এই কথা শুনছে, কিন্তু কিছুই ফল হয় না। অভিমানী বাঙালি হলে চোখের জলে, না-হয় আত্মহত্যা। কিন্তু ওসব ছেঁদো বিবরণ দেবার জন্যে আমি তো এই কাহিনী লিখতে বসিনি।

তার পরের দৃশ্যটা হচ্ছে এইরকম। গোরা মনে মনে বলছে, দাদা আমার মহা উপকার করেছে। বড়িশার ছোট্ট বাড়ি থেকে বহিষ্কারের নোটিশ দিয়ে 'লিখে দিল বিশ্ব নিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'!

তখন জার্মানি যাওয়ার রেওয়াজ উঠেছে। বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোক জার্মান ভাষায় চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখতেন। গোটা কয়েক কোম্পানীর ঠিকানা নিয়ে তাঁরই শরণাপন্ন হলো ছেলেটি। ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে একটা কেমিক্যাল ওষুধ কোম্পানিতে শিক্ষানবিশীর কাজ জুটে গেলো। কিন্তু কাজ জুটলেও বিদেশে যাবার জাহাজভাড়া প্রয়োজন। এ টাকা কোথা থেকে আসবে। গোরাবাবুর বড় ভাইয়ের তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। নতুন বউদির নাম সন্ধ্যা। অনেকটা শরৎচন্দ্রের আঁকা বউদির মতন। গোপনে দেবরকে বললেন, "আমার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন গয়না নিয়ে কী করবো? তুমি বরং এক-আধটা বেচে নিয়ে পথের খরচটা জোগাড় করে নাও।"

ইচ্ছে না থাকলেও গোরা তাই করলো। বউদির গয়না-বেচা টাকা সম্বল করে যাত্রা শুরু হলো অজানা দেশের সন্ধানে। গোরা সেই যে ভাগ্যসন্ধানে বের হলো আর পিছিয়ে-পড়া নেই। শোনা যায়, জার্মান ভাষায় অ্যাপ্লিকেশন-লেখককে গোরাবাবু এখনও নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করেন।

গোরাবাবুর বন্ধু মনসিজ বলেন, 'জার্মানিতে গিয়েই ওর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো—জার্মান নিয়মানুবর্তিতা বলতে যা বোঝায়, তাই ঢুকে গেলো ওর রক্তে।"

আর গোরাবাবু বলেন, "ওখানে এমন নেশা ধরে গেলো যে, দিনরাত কাজ করতাম। রাত-কলেজে কেমিস্ট হিসেবেও পড়াশোনা আরম্ভ করলাম।"

চার বছর কাজকর্মের পরে গোরার ইচ্ছে হলো দেশে ফিরে যাবার। "ফিরবার আগে লোভ হলো একবার কানাডা বেড়িয়ে যাই—স্রেফ কয়েকদিনের জন্যে।"

পকেটে মাত্র আশি ডলার এবং স্রেফ একটা ব্রীফ কেস নিয়ে ১৯৬৪ তে

কানাডায় আগমন। প্রথমে বরফটরফ দেখে মনের মধ্যে দ্বিধা।

“এখানে এসে খেয়ালের বশে একটা হাসপাতালে ফোন করলাম চাকরির খোঁজে। ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ানের অভিজ্ঞতা আছে জেনে, ওঁরা তখনি আসতে বললেন এবং পরের দিন চাকরি হয়ে গেলো।”

হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল বিভাগে গোরার কাজ তখন টেস্টটিউব ধোয়া, ট্রে সাজানো। এরই মধ্যে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন গোরাবাবু। চাকরিতেও সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে, কিন্তু কঠোর পরিশ্রম।

এই সময় একদিন ফিলিস গিদিয়ন-এর সঙ্গে আলাপ। এঁর বাবা দিল্লীতে ইস্কুলের মাস্টার। ১৯৬৫তে বিয়ে এবং নতুন সংসারের দায়িত্ব মানতে গিয়ে ডবল শিফটে কাজ। গোরা বললেন, “সমস্ত রাত কাজ করে অনেক সময় হাসপাতালের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়তাম।”

কয়েক বছর পরে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলেন। গর্ভে যমজ সন্তানের ইঙ্গিত রয়েছে। “অনেক টেস্ট করাতে হতো, তার খরচ জোগাতে হাড়ে-হাড়ে কষ্ট পেতাম।”

১৯৬৯-এ একদিন এক ডাক্তারের কাছে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছেন গোরা আদিত্য। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীকে, 'স্বামী কী করেন?' স্ত্রী বললেন “গোরা এখন সানিব্রুক হাসপাতালে বায়োকেমিস্টের কাজ করে। বেচারার স্বপ্ন আছে চাকরি না করে নিজে কিছু করবে, কিন্তু সুযোগ পায় না। এখন খরচাপাতি বাড়বে, অনেক চিন্তা ওর।”

ডাক্তার মানুষটি সদাশয়। বললেন, “আমার এই চেম্বারের বেসমেন্টে জায়গা আছে—ওখানে ছোটখাট একটা ক্লিনিক্যাল ল্যাব শুরু করতে পারে। আগামী সপ্তাহে ওকে নিয়ে এসো।”

স্ত্রী বললেন, “আগামী সপ্তাহে কেন? এখনই নিয়ে আসছি। আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।”

সেই আলাপ হলো ডক্টর স্টিভেন্সের সঙ্গে। বললেন, “যতক্ষণ ভাল কিছু না পাচ্ছ এখানে শুরু করো।”

কিন্তু ল্যাব শুরু করা অত সহজ নয়। কয়েক হাজার ডলার অবশ্য প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির লিস্ট তৈরি—অন্তত দশ হাজার ডলার চাই।

স্ত্রী আবার সহায় হলেন। ফিলিস একদিন রডনি এলিস এবং তাঁর বন্ধু জেরেমি ক্ল্যাম্পকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। এঁরা দুজনেই ইন্ডিয়ান রান্নার ভক্ত।

ফিলিস একসময় স্বামীকে বললেন, “তুমি এখন ছেলেদের ঘুম পাড়াবে না ডিশ ধোবে?” তারপর স্বামীকে একটু দূরে পাঠিয়ে এঁদের বললেন, “গোরা

একটা ল্যাব শুরু করতে চায়। কিন্তু টাকার অভাব।"

একটু পরে গোরা ফিরে এলে জেরেমি বললেন, "গোরা তুমি ল্যাব আরম্ভ করো, টাকার অভাব হবে না।" পরের দিনই ওঁরা দশ হাজার কানাডিয়ান ডলার ধার দিলেন তিন পার্সেন্ট সুদে।

"খরচ বাঁচাবার জন্যে ল্যাবের সমস্ত বেঞ্চি আমি নিজের হাতেই তৈরি করে ফেলেছিলাম", গোরাবাবু সরল মনেই স্বীকার করলেন।

"তারপর?"

"ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দু'বছরে সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেলো। যে-বাড়িতে ল্যাব শুরু করেছিলাম সেই বাড়িটাও কিনে নিয়েছি।"

তারপর অভাবনীয় বৃদ্ধি হয়েছে মেড-কেম ল্যাবরেটরির। কুড়িটা হাসপাতাল এখানে কাজ পাঠায়। কুড়িটা স্পেশাল টেস্টিং সেন্টার আছে। তা ছাড়া আছে পঞ্চাশটা শাখা। টরন্টো থেকে টেস্টভ্যান চলে যায় নিউ ফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত।

এ ছাড়া আছে সম্পত্তি বেচাকেনার ব্যবসা। জহুরির চোখ দিয়ে গোরা আদিত্য বুঝতে পারেন কোন সম্পত্তির কী ভবিষ্যৎ। এই ব্যবসাও গোরাকে ভীষণ ব্যস্ত রাখে—ফলে মোটর গাড়িতেও টেলিফোন রাখতে হয়েছে, এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা যায় না।

গোরা আদিত্যর শেপার্ড অ্যাভেনিউর সুবিশাল দপ্তরে আমি গিয়েছি। এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞ আমি কখনও দেখিনি। শত-শত ইলেকট্রনিক যন্ত্রে নানা ধরনের বিশ্লেষণ চলেছে। এখানে কারখানা অথবা অফিস কথাটা জনপ্রিয় নয়। সবাই বলে 'ওয়ার্ক স্টেশন'—কর্মকেন্দ্র, এই মানে করা যায়।

প্রতিদিন তিন-চার হাজার বিভিন্ন ধরনের নমুনা এখানে পরীক্ষা করা হয়। এই সব পরীক্ষার ফলাফল রোগীর আত্মীয় অথবা ডাক্তারের প্রতিনিধিকে সংগ্রহ করতে হয় না। কমপিউটারের মাধ্যমে সোজা তা ডাক্তারের চেম্বারে অথবা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মেয়েদের জরায়ুর ক্যানসার সম্ভাবনা সম্পর্কে এক ধরনের রাসায়নিক পরীক্ষার সংখ্যা বছরে অন্তত ৫০,০০০।

অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতির কাণ্ডকারখানা দেখে আমি বিস্মিত। একটি যন্ত্রে মাত্র ষাট সেকেন্ডে রক্তের ত্রিশ ধরনের পরীক্ষা-রিপোর্ট তৈরি হয়ে যায়।

আর-একটি মেশিন আছে, যার রক্ষণাবেক্ষণ করেন হাজার হাজার মাইল দূরের এক আমেরিকান কোম্পানি, কমপিউটরের মাধ্যমে। যন্ত্র খারাপ হলেই, ওই আমেরিকান কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা টেলিফোনে বলে দেবেন, আপনি অমুক নম্বর যন্ত্রাংশটা এখনই পাল্টে নিন।

অফিস ঘরের সামনে সকলের অবগতির জন্যে একটি তাম্রফলকে মেড-কেম ল্যাবরেটরিজ-এর উদ্দেশ্যগুলি খোদাই করা আছে : দেশের এক নম্বর ডায়াগনস্টিক ল্যাব হিসেবে নিজেদের সুনাম রক্ষা করা। গবেষণার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানে নতুন পথের সন্ধান করা। কর্মীদের আত্মোন্নতিতে উৎসাহ দেওয়া। প্রতিষ্ঠান এমনভাবে চালানো, যাতে লাভ হয়। সব রকম সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার। যথাসময়ে সমস্ত উত্তর আমেরিকায় কোম্পানির কাজকর্ম প্রসারিত করা।

কথা প্রসঙ্গে গোরা বললেন, "জার্মানে আমাকে তিনটে জিনিস শিখিয়েছে—শ্রমের মর্যাদা আছে, কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই এবং নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কিছু হয় না।"

তারপর কথা উঠলো, ব্যবসায়িক সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করলেন গোরা। "অন্য কারও ঘাড়ে চেপে প্রক্সির মাধ্যমে তুমি স্বর্গে পৌঁছতে পারো না। কথাটা ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রেও সত্যি।"

যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ঘর থেকে বিতাড়িত গোরা আদিত্য হাজার মাইল দূরে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন, তারই একটু ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, "পড়াশোনা ভাল না হয়েও আমি যে জীবনে ব্যর্থ হইনি তার একটা কারণ আমি প্রচণ্ড পরিশ্রমে বিশ্বাস করি এবং সব কিছু বিশ্লেষণ করে নেবার মতন মানসিকতা আমার আছে। যে কাজে একবার নেমেছি সেখান থেকে আমি হেরে পালিয়ে আসতে রাজি নই। পেঁচোয়া নোংরা বুদ্ধি না থাকলে ব্যবসায় ভাল করা যায় না, তা আমি বিশ্বাস করি না। সৎ ভাবে সোজাসুজি পথে মানুষকে বিশ্বাস করে এখনও পর্যন্ত আমার লোকসান হয়নি।"

স্ত্রী ফিলিস যমজপুত্র পিটার ও পল এবং ন'বছরের কন্যা জেনিফারকে নিয়ে গোরা আদিত্যর সুখের সংসার। গোরাবাবু এখনও বছরে একবার কলকাতায় বেড়াতে আসেন। ওঁর বাড়ির কাছাকাছি ঠাকুরপুকুর ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রে তিনি পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি দান করছেন, ওখানকার কর্মীদের নিজের খরচে কানাডায় আনিয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা দিয়েছেন।

গোরাবাবু বললেন, "কলকারখানা তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু নানা ধরনের সার্ভিস ইনডাস্ট্রি আছে যা চালাতে অনেক কম টাকা লাগে। সেই সব দিকে যাওয়াটাই বোধ হয় স্বল্পবিত্ত বাঙালিদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। আমার তো মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই একটা উচ্চাশা থাকা দরকার। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী নিজের কর্মধারা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন এবং তারপরে লেগে থাকো, লেগে থাকো। কারও দয়া ভিক্ষা না-করে খেটে যাও, খেটে যাও। কঠিন

পরিশ্রমে শরীরে বা মনের যে কোনো ক্ষতি হয় না তা আমি নিজের জীবন থেকে বলতে পারি।"

জীবনের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে এমন বিপুল বিক্রমে এগিয়ে যাবার মন্ত্র কোথা থেকে পেয়েছেন জিজ্ঞেস করাতে গোরাবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "যে-সব সাধারণ উপদেশ লোকমুখে নিত্য প্রচারিত হচ্ছে তাই তো যথেষ্ঠ। যেমন ধরুন, 'যা আজকে করা যায় তা কালকের জন্যে ফেলে রেখো না'। এই উপদেশ আমি প্রতিদিন মেনে চলার চেষ্টা করি। তারপর ধরুন, 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। যথা সময়ে কাজ করে আমি অনেক ফোঁড় বাঁচাতে পেরেছি। তারপর মনে করুন, 'রোম শহর একদিনে তৈরি হয়নি' বড় কিছু কাজে হাত দিয়ে রাতারাতি কেল্লা ফতের চেষ্টা আমি করি না।"

শেষ সাক্ষাতের পর মেড-কেম ল্যাবরেটরির সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে গোরা আদিত্য আমাকে যখন গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন তখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমাদের দেশ, বিশেষ করে কলকাতায় এমন একটা বিস্ময়কর ল্যাবরেটরি গড়ে তুলবেন না?"

বহরমপুর গোরাবাজারের গোরা আদিত্য এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। ওঁর গলা ভিজে উঠলো। তারপর বললেন, "আমাদের দেশের মানুষ যে কত গরিব তা আমার অজানা নয়, শংকরবাবু। কোনো পরীক্ষা করে তাদের কাছ থেকে আমি কিছুতেই পয়সা চাইতে পারবো না। আমি বিনা পয়সায় যতটুকু সেবা করতে পারবো ততটুকুই করবো দেশের জন্যে।"

গোরা আদিত্যর জীবনকথা আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা পড়েছে জেনে খুশি হলেন মিছরিদা। তারপর বললেন, "একজন অদ্ভুত সায়েবের খোঁজ পেয়েছি। ওঁকে একটু দেখে যা। না, মুখ বেঁকাস না। তোকে আমি ব্যবসাদার সায়েবের কাছে পাঠাচ্ছি না। এ সায়েব একেবারে অন্য জিনিস।"

মিছরিদা পা নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, "একজন রাশিয়ান পণ্ডিত সেদিন কলকাতায় খুব ভাল কথা বলেছেন ; বাঙালি দু'রকমের—বাঙালি বাঙ্গালি আর অবাঙালি বাঙ্গালি। এই অবাঙালি-বাঙ্গালির মধ্যে যেমন শিখ পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, গুজরাতী আছে, সিন্ধী আছে, মাড়ওয়ারী আছে, তেমনি রাশিয়ান আছে, ব্রিটিশ আছে, আমেরিকান আছে, কানাডিয়ান আছে।"

ব্রিটিশ বাঙালি বলতে আমার আর্থার হিউজ আই-সি-এর কথা মনে পড়ে যায়। শেষ দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে। গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অফ কালচারই দেখা হয়েছিল রাশিয়ান বাঙালি দানিয়েলচুক-এর সঙ্গে। শিখ বাঙালি গুরণেক সিং এখন মার্কিন নাগরিক। বসবাস সিরাকিউজে। পেশায় লাইব্রেরিয়ান। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য একদিন নতুন বি-এ ক্লাশে পড়াতে এসে দেখেন একজন পাগড়িপরা যুবক বসে আছে। তিনি ইংরিজীতে বললেন, তুমি ভুল করেছো, এটা বাংলা ক্লাশ। গুরণেক সিং মাথা নিচু করে বলেছিল, "না স্যর, আমি বাংলা পড়তেই এসেছি।" নিজের ভালবাসায় এবং সাধনায় গুরণেক হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষায় বিদ্যের জাহাজ।

নোট বই বের করে মিছরিদা বললেন, "নাম-ঠিকানা অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি। লিখে নে।"

সগর্বে যে-নামটি মিছরিদা দিলেন—প্রফেসর জোসেফ টি ওকোনেল এবং তাঁর অর্ধাঙ্গিনী ক্যাথলিন ওরফে ক্যাথি বউদি।

হ্যাঁ, এঁদের তো আমি ইতিমধ্যেই দেখেছি ক্লিভল্যান্ড বাঙালি সম্মেলনে। সায়েব বক্তৃতা করলেন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে। কৃতী এবং বিখ্যাত বাঙালি বলতে অবশ্যই চৈতন্যকে বোঝায়—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালি পাঁচশ বছর ধোপে টিকতেন কিনা তা এই মুহূর্তে বলা শক্ত।

মিছরিদার কথা মতন যোগাযোগ হয়ে গেলো ওকোনেল সায়েবের সঙ্গে। খুব খুশি হলেন যখন শুনলেন, কৃতী 'প্রবাসী' বাঙালিদের লিষ্টিতে তাঁরও নাম উঠেছে। সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "আমি বাঙালি এবং প্রবাসী—কিন্তু কৃতী নই!" টেলিফোনেই ওকোনেল আমাকে নেমন্তন্ন জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রেস্তোরাঁয়। বললেন, "তুমি ডাক্তার প্রশান্ত বসুর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে চলে এসো। ওখান থেকে আমার বউ ক্যাথি তোমাকে নিয়ে আসবে।"

ক্যাথি বউদি হাসিখুশি মানুষ। কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালি লেখকের সৃষ্টিকে ইতিমধ্যেই ইংরিজীতে অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল, গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় আছেন। ক্যাথি বউদি স্থানীয় কমিউনিটি কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপিকা।

ক্যাথি ওকোনেল ও তাঁর স্বামী দু'জনেই সমবয়সী, ছেচল্লিশ চলছে। পশ্চিমীদের যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক ও ভোগ সর্বস্ব মনে করেন তাঁদের অবশ্যই এই দম্পতিকে দেখা প্রয়োজন। স্থানীয় বাঙালি সমাজের সবাইকে এঁরা চেনেন এবং তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেদের অত্যন্ত বিনীতভাবে জড়িয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আজ যদি স্থানীয় বাঙালি সমাজের বড় রকমের কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে এঁরা প্রথমেই ওকোনেল দম্পতির কাছে হাজির হবেন। এঁদের এক কন্যা ও দুই পুত্র—দিদি (১৯),

মার্ক (১৬) ও ম্যাথু (৪)।

ক্যাথি বউদি বললেন, "কমিউনিটি কলেজে আমি এ-দেশে নবাগতদের ইংরিজী পড়াচ্ছি। খুব ভাল লাগে। বাংলাটা আমার শখ। এখানে 'ইথজ্' বলে একটা সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। প্রত্যেক সংখ্যা একটা বিশেষ দেশ বা ভাষা সম্পর্কে। আমি সবেমাত্র অতিথি সম্পাদক হিসেবে বাংলা সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যার কাজ শেষ করেছি।"

জোসেফ ওকোনেল যথাসময়ে সেন্ট মাইকেলস্ কলেজ থেকে নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন। তারপর আমাকে বসিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে কাফেটোরিয়াম লাইন দিলেন। মার্কিনী হাওয়া একটুও ওঁদের গায়ে লাগেনি। একেবারে ভারতীয় পদ্ধতিতে অতিথি আপ্যায়নে লেগে গেলেন, আমার জল পর্যন্ত নিজেরা নিয়ে এলেন। লোভনীয় খাবারের সঙ্গে 'পপ'। অতি সাত্ত্বিক মানুষ এঁরা, মদ-টদের ব্যাপার নেই।

প্রথমেই একটা ভুল করে বসেছি। ওকোনেল বললেন, "আমি কানাডিয়ান নই। বহু বছর—১৯৬৮ থেকে কানাডায় আছি, কিন্তু পাসপোর্ট এখনও আমেরিকান।"

ওঁর জন্ম বোস্টনে—দেখলে এবং কথাবার্তা শুনলেই মনে হয় নিউ ইংলন্ড সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। আদিপুরুষ যে আইরিশ তা নাম থেকেই বোঝা যায়।

ওকোনেল বললেন, "আমি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর পি-এইচ-ডি জুটেছিল হার্ভার্ড থেকে।"

ওকোনেল সায়েবের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যে বাংলায় হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

"এখন আমার চাকরি—সহযোগী অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ রিলিজিয়াস স্টাডিজ, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়।"

"তা এই বাঙালি এবং ভারতীয় ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহী হলেন কি করে?" আমার এই প্রশ্নের উত্তরে, ওকোনেল মুচকি হেসে বললেন, "কপাল! আমার তখন পড়াশোনা চলছিল, বিভিন্ন ধর্মে তুলনামূলক আলোচনা সম্বন্ধে। আমি বুঝলাম, পশ্চিমী ক্যাথলিক অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জন্যে আমাকে সংস্কৃত ভাষা শিখতেই হবে। সংস্কৃত শিক্ষায় হাতেখড়ি হার্ভার্ডের অধ্যাপক ড্যানিয়েলস্ অ্যানজেলস্-এর কাছে। গবেষণার তাগিদ ছাড়াও আরও একটা টান ছিল—মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা।"

বাংলার ব্যাপারে ওকোনেল সায়েব বললেন, "ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ভাল করে জানবার জন্যে আমাকে বাংলা শিখতে হলো। বাংলা শিখেছি কলকাতায়। আমার গুরু হলেন ভবানীপুরের ডঃ ভবতোষ দত্ত। ইনিই শিকাগো

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিমক সায়েবকে বাংলা শিখিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম আলাপ হয় সকুমার সেনের বাড়িতে।"

বাংলা শিখতে সায়েবের মাত্র ছ'মাস লাগলো। "গুরুর আশীর্বাদ আর সংস্কৃতজ্ঞান দুটোই কাজে লাগলো," বললেন ওকোনেল সায়েব। "আমার স্ত্রী ক্যাথিও একসঙ্গে বাংলা শিখে ফেললেন।"

"এরপর আমি ললিতপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর কাছে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করি, শেষ পর্যন্ত এই চৈতন্যর ওপরেই আমার হার্ভার্ডে ডক্টরেট। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ করি। তিনিই আমাকে সংস্কৃতে পড়ালেন উজ্জ্বল নীলমণি। অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে এই সময় আমার পরিচয় হয়। পরের বছর (১৯৬৬) আমি রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সঙ্গে কাজ করি। তখন থাকতাম গোলপার্কে, অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের বাড়িতে। এই সময় ক্যাথি সন্তানসম্ভবা হলো।"

কলকাতায় বসবাসকালে বোষ্টম সম্বন্ধে নানা খোঁজ-খবর শুরু করেন খাস মার্কিনী ওকোনেল সায়েব। বললেন, "কত বোষ্টমের বাড়িতে গিয়েছি তখন। ১৯৩১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে দেখলাম, পাঁচ লাখ লোক নিজেদের 'জাত বোষ্টম' বলে পরিচয় দিয়েছে, তার থেকেই আগ্রহ হলো।"

বাঁকুড়ার এক হাই স্কুলের প্রধান মহান্তর সঙ্গে ওকোনেলের আলাপ হলো, মহান্তর সঙ্গে জাত বোষ্টমের সন্ধানে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার গ্রাম চষে বেড়ালেন ওকোনেল সায়েব।

এই সময় হার্ভার্ড থেকে চিঠি এলো, কলেজে না ফিরলে চাকরি যাবে এবার। বাধ্য হয়ে বাংলার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের প্রীতির সম্পর্ক ছেদ করে ১৯৬৭-র গ্রীষ্মের শেষ পর্বে দেশে ফিরে গেলেন ওকোনেল দম্পতি এবং পরের বছর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন।

তারপর বাংলায় ফিরবার জন্যে আবার উসখুস করছেন। ১৯৭২-৭৩ এক বছর বিনা মাইনেতে পড়াতে এলেন বরিশালের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে। গায় টুরানু বলে এক কানাডিয়ান মিশনারি ওখানে ছিলেন। তাঁরই মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে বাংলাদেশের কত জায়গা দেখা হয়েছে ওকোনেল সায়েবের ওই সময় বাংলাদেশের কবিতার এক ইংরিজী সংকলনও তৈরি করেন তিনি।

"বাঙালি মুসলমানের আত্মকথা" এই পর্যায়ে মালমশলা সংগ্রহের জন্যে ১৯৭৫-এ ওকোনেল আবার ভারতবর্ষে এলেন। দু'বছর পরে ছুটি নিয়ে দশ মাসের জন্যে বিশ্বভারতীতে পড়াতে এলেন। এবারের প্রিয় বিষয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

দশ বছর পরে আবার কলকাতায় আগমন চার মাসের জন্যে। গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে গোবিন্দগোপাল মুখার্জির কাছে জোসেফ ওকোনেল পড়লেন

রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতাসিন্ধু। এরপরে চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজকর্ম ও বক্তৃতা হলো।

এবার ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কানাডায় ধর্মীয় প্রভাব কি কমছে?"

একটু ভেবে ওকোনেল উত্তর দিলেন, "চার্চ একেবারে ভেঙে পড়ছে না, তবে প্রভাব নিশ্চয়ই কমছে। কিন্তু মানবপ্রেমী আন্দোলনগুলো বাড়ছে। যেমন অস্ত্র সংবরণ আন্দোলন সম্পর্কে লোক ক্রমশ আগ্রহী হচ্ছে।"

আরেক প্রশ্নের উত্তরে ওকোনেল বললেন, 'ক্যাথলিকের সংখ্যা কমছে না, কিন্তু লোকে চার্চে যাচ্ছে কম। ইহুদিরা কিন্তু খুব ধার্মিক। কানাডায় ইহুদিরা আমেরিকান ইহুদির তুলনায় বেশি শিষ্টাচারী।"

ওকোনেল বললেন, "আমি ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মের বিরোধী নই—অনেক সময় ধর্মীয় আচারই সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। এই সব ক্রিয়াকর্মই একটা ছোট্ট সমাজকে অনেক সময় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখে। যেমন ভারতীয়দের পূজা, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। তবে মূল সাংস্কৃতিক প্রবাহ থেকে অনেক দূরে ছোট সমাজের বহু অসুবিধে—যারা এখানের সমাজে জন্মাচ্ছে এবং বড় হচ্ছে তাদের যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটাও তা হলে সাংস্কৃতিক বন্ধন দ্রুত ছিঁড়ে যাবে। কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে।"

ভারতীয় হিন্দুদের সমন্বয় শক্তির প্রশংসা করলেন ওকোনেল। "এখানে আপনি দেখবেন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার খালি গায়ে পুরুতের কাজ করছে, কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ঘণ্টা নাড়ছে, পুষ্পাঞ্জলির ফুল বিতরণ করছে। মেয়ে এবং পুরুষ উভয়েই কর্মক্ষেত্রে একরকম আবার সংসারে আরেক রকম হতে পারেন অনায়াসে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে যাঁরা এ দেশে এসেছেন তাঁরা ঘরে ও বাইরে দু'রকম হতে পারেন না, ফলে অসুবিধেয় পড়ে যান।"

কানাডায় ভারতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওকোনেল বললে, "দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়রা নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে অন্যত্র। কিন্তু তৃতীয় প্রজন্মে হয়তো প্রচণ্ড আগ্রহ বাড়বে। দেখবেন, তখন অনেকেই দাদামশাই যে-ভাষায় কথা বলতেন তা শেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।"

সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে ওকোনেল দুটি কথা বললেন, "প্রবাসী ভারতীয়রা যাতে মাঝে-মাঝে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে বেড়াতে যান তা দেখতে হবে। এটা খুব প্রয়োজনীয়। আর একটা ব্যাপার—ইমিগ্রেশনের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়াটা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না। যত কম সংখ্যাতেই হোক, ভারতবর্ষ থেকে মাঝে-মাঝে কিছু লোককে এ দেশে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেওয়া দরকার—ভারতীয় সংস্কৃতির দীপশিখা তবেই প্রজ্বলিত থাকবে।"

শেষ প্রশ্ন ছিল, "এখানে আর কোনো কানাডিয়ান বাংলা শিখছে?"

ওকোনেল সায়েব বললেন, "হ্যাঁ, শিখছে বৈকি! আপনি ব্রায়ান ম্যাসভিলের সঙ্গে দেখা করেননি?"

ফোন করলেন ওকোলেন সায়েব। কিন্তু তাঁর ছাত্রকে পাওয়া গেলো না। ওকোনেল বললেন, "ব্রায়ান সংস্কৃত ও বাংলা শিখছে। ও এখন কেদারনাথ দত্ত'র ওপর গবেষণা করছে।"

"কেদারনাথ দত্ত'র নাম শোনেননি?" একটু অবাক হয়ে গেলেন ওকোনেল সায়েব। "ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত, ১৮৩৮ খ্রীঃ নদীয়ার বীরনগরে জন্ম—১৮৬৬ খ্রীঃ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অবসর নিয়ে ধর্ম-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। বৈষ্ণবসমাজ সম্পর্কে অসংখ্য বই লিখেছিলেন। অসংখ্য ভাষা জানতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন।"

আমার এবার অবাক হবার পালা। কলকাতার লোক হয়ে আমি যার খোঁজ রাখি না তাঁকে নিয়েই গবেষণা চলেছে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ওকোনেল আমাকে আবার ডাক্তার প্রশান্ত বসুর হেফাজতে পৌঁছে দিতে দিতে বললেন, "ব্রায়ান নিশ্চয় কলকাতায় যাবে, তখন অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করবে।"

বেজায় খুশি হলেন মিছরিদা। বললেন, "একটা মানুষের মতন মানুষের সঙ্গে দেখা করেছিস। সেই সঙ্গে ঠোক্করও খেয়েছিস—হাওড়ায় ফিরেই ওই কেদারনাথ দত্ত সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে নিবি। কিন্তু পড়বি কোথায়? লাইব্রেরি বলে কোনো বস্তু তো পোড়া বাংলায় নেই। ভিডিও পার্লার-টার্লার বসিয়ে বাঙালিরা উচ্ছন্নে যাবে—লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

এরপরেই মিছরিদার সিংহনাদ, "আর একখানা জব্বর সায়েবের খবর জোগাড় করেছি তোর জন্যে।"

মিছরিদা বললেন, "তোর উচিত এবারের বইখানায় আমাকে সহযোগী লেখক বলে ঘোষণা করা। আমার সমস্ত কপিরাইট-মন্তব্য তুই টপাটপ নিজের নোটবইতে লিখে হজম করে নিচ্ছিস। মিছরিদা সঙ্গে না থাকলে এবার বিদেশে তোর ভরাডুবি হতো।"

"আপনাকে কো-অথর করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার। কিন্তু প্রকাশককে রাজি করাতে পারবো না। 'মিছরিদার সহযোগিতায়' এই খটমট নাম থাকলে পাঠকের আকর্ষণ কমে যেতে পারে।"

"ঠিক আছে, একখানা উকিলের চিঠি দেওয়া যাবে তোর প্রকাশককে—বাপ-মায়ের দেওয়া অমন মিষ্টি নামটার হেনস্থা আমি সহ্য করবো না।"

"তা যা বলছিলাম," মিছরিদা আবার শুরু করলেন। "ইন্ডিয়ানরা বেজায় বড়লোক হলে বিলেতে কিংবা সুইজারল্যান্ডে ভিলা বানায়। এবার উল্টো-পুরাণ শুরু হতে চলেছে। সায়েবরা ছুটছে ইন্ডিয়ায় ঘর-সংসার পাততে। টরন্টোর সেরা জায়গায় থাকেন অথচ ভবানীপুরে একখানা ফ্ল্যাট রেখেছেন এমন এক সায়েবের সন্ধান পেয়েছি। নাম জন মিলনে। তোর জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেডি।"

"এ তো তাজ্জব ব্যাপার, মিছরিদা। আমার তো ধারণা ছিল ভবানীপুরের সব লোক ভিড়ের চাপে অস্থির হয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাবার জন্যে উঁচিয়ে রয়েছে।"

জন মিলনে আমাদের জামাই। ওঁর স্ত্রী ঝরনার বাপের বাড়ি মেদিনীপুরে ঘাটালের কুলিয়াগ্রামে।

ঝরনার সঙ্গে যে হাওড়া শিবপুরের একটা যোগাযোগ আছে তা ওঁদের বাড়িতে গিয়েই বুঝতে পারলাম। নানা দুঃখ-কষ্টের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ঝরনা শেষ পর্যন্ত জন মিলনের মতো সদাশিব স্বামী খুঁজে পেয়েছেন।

টরেন্টোর যে-অঞ্চলে মিলনের নিজস্ব বাড়ী তা শহরের সবচেয়ে দামী অংশ বলাটা অত্যুক্তি হবে না। এই শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই মিলনে পরিবার টরন্টোতে সম্পত্তি কিনে বসবাস করছেন।

মিলনে সাহেবের ভক্তি-শ্রদ্ধা বাহাই সম্প্রদায় সম্পর্কে। এই ছোট্ট আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়টি এক সময়ে কোয়েকারদের মতনই মানব সমাজের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করেছে। দিল্লিতে সম্প্রতি এঁরা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন যার স্থাপত্য সমস্ত বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। এঁরা পাঁচগণিতে একটা ইস্কুল চালান যেখানে সমস্ত বিশ্বের বাহাই-বিশ্বাসীরা ছেলেদের পাঠান। শ্রীরামকৃষ্ণের মতন এঁরা সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী।

আমাদের জামাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে কয়েক মুহূর্তে আপন করে নিলেন। আমন্ত্রণ করলেন তাঁর অতিথি হতে। বললেন, "আপনি শ্বশুরবাড়ির লোক। আদরযত্ন না করলে বদনাম হবে।"

জন মিলনে মানুষটি যে স্থিতধী তা তাঁর শান্ত আচরণেই বোঝা যায়। এই ধরনের বিদেশীর সঙ্গে পরিচিত হতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। বিশ্বনাগরিকত্বের পাশপোর্ট নিয়েই এঁরা পৃথিবীতে এসেছেন।

জন মিলনে বললেন, "পরমতসহিষ্ণুতা পৃথিবী থেকে কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি আড়াই হাজার লোককে সমীক্ষকরা জিজ্ঞেস করেন, 'খ্রীস্ট ও ইহুদি ধর্মের বাইরে কোনো ধর্মের কথা জানো?' শুনে আশ্চর্য হবেন, অর্ধেক লোক কোনো উত্তর দিতে পারেনি।"

মিলনে বললেন, "মানবতার ঐশ্বর্যকে আমাদের বার বার আবিষ্কার করতে হবে, না হলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য।"

শ্রীমতী ঝরনা পাশেই সোফাতে বসেছিলেন। টিপিক্যাল বাঙালি বউ, সায়েব বিয়ে করে বিন্দুমাত্র মেমসায়েব বনেননি। লাজুক প্রকৃতির মহিলা, বেশি কথা বলেন না। সেবায়, ভালবাসায়, ত্যাগে তিনি যে মিলনে পরিবারকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন তা এই বাড়িতে নিশ্বাস গ্রহণ করলেই বোঝা যায়।

জন মিলনে বললেন, "আমার শরীরটা পশ্চিমী, কিন্তু আমার হৃদয়টা প্রাচ্যের।"

মিলনের পূর্ব-পুরুষরাও ছিলেন আইরিশ। চমৎকার সাহিত্য সৌন্দর্যমণ্ডিত ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করেন জন। কথায়-কথায় বললেন, "দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমার খুব কষ্ট হয়। এরা না ঘরকা না ঘাটকা। 'নাইদার ফিশ নর ফাউল।' তবে এদের মধ্যে যারা এক-আধবার পিতৃপুরুষের দেশে গিয়ে কিছুদিন থেকেছে, তারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা টান অনুভব করছে।"

ওঁদের বিয়ে কথা উঠলো। জন বললেন, "একবার পুজোর সময় আমি ঘাটালে গিয়েছিলাম। রাত্রে পুজোর সময় ভাবছি, আমাকে নিশ্চয় ঢুকতে দেবে না। আমার মেয়েকেও সাবধান করে দিলাম, বেশি এগিও না। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পরিবারের সবাই, গ্রামের সবাই আমাদের আপন করে নিলেন, কাছে টেনে নিলেন। ভারতীয়দের যারা গোঁড়া বলে তাদের জেনে রাখা ভাল, আমার নাক-উঁচু পরিবারে ঝরনার স্বীকৃতি বরং অত সহজে আসেনি।"

গ্রামবাংলার প্রচণ্ড ভক্ত এই জন মিলনে। ভারতবর্ষে এলেই টো-টো করে ঘুরে বেড়ান গ্রামেগঞ্জে—কখনও গোরুর গাড়িতে কখনও পায়ে হেঁটে। "কিছু মনে কোরো না, বাংলার হৃদয় ও আত্মার সন্ধান করতে হলে কলকাতার বাইরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি কত চাষীর পরিবারে রাত কাটিয়েছি, তাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে গায়ে-গতরে কাজ করেছি! আমার ঐ একটা জন্মগত উত্তর আমেরিকান দোষ আছে—হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। কিছু একটা কাজ আমাকে করতেই হবে। এই ব্যাপারে অনেক বাঙালি একটু অন্যরকম। কায়িক পরিশ্রমে তাদের অরুচি।"

"নিজের ঘর-দোর ছেড়ে বিশ্বভুবনকে দেখতে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মন্দ নয়, শংকর। আমি খুব আনন্দ পাই। আর প্রত্যেকবারই এ দেশে ফিরবার সময়

আমার 'কালচার শক' হয়!"

ভবানীপুরের বাড়ির কথা উঠলো। সায়েব বললেন, "কলকাতায় একটা বাড়ি না থাকলে চলে? তুমিই বলো!"

সেবার ওখানে জনাদশেক মিস্ত্রি ও জনমজুর লাগানো হয়েছে ফ্লাটের পুনঃসংস্কারে। অধৈর্য সায়েব নিজেও একসময় ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছেন। "খুব বদনাম হয়ে গেলো। সবাই ছি ছি করতে লাগলো!"

মিলনে সায়েব যাবার সময় বললেন, "পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান তোমরা যত খুশি নাও, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মহামূল্যবান এক সম্পদে তোমরা অবিশ্বাস্য রকম ধনী। আমি ভারতীয় নারীর কথা বলছি। ঈশ্বরের এই অপরূপ উপহারটুকু মাঝে-মাঝে বিশ্বের অন্য সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে তোমাদের।"

আমি দেখলাম, ঝরনা মিলনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু আদর্শ বঙ্গললনার মতন অপরের উপস্থিতিতে স্বামীকে কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

টরেন্টোর বঙ্গীয়-সমাজের যিনি মুকুটমণি তিনি একজন ওড়িয়া। এঁর নাম সনাতন মোহান্ত। সনাতনের বাঙালি বন্ধু অসিত দত্তরও সুনাম সর্বত্র—এবং দু'জনে মিলে এঁরা ভক্ত মহলে 'দত্ত-মোহান্ত কোম্পানি' বলে পরিচিত।

মিছরিদা দুঃখ করলেন, "বঙ্কিম চাটুজ্যের মতন কোনো ঔপন্যাসিক এই দত্ত-মোহান্তকে দেখলে একখানা অসাধারণ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পারতেন—আজকালের বাঙালি লেখকের সে কব্জির জোর নেই।"

দত্ত-মোহান্ত সত্যিই এক চলমান কিংবদন্তী—লিভিং লিজেন্ড। ওড়িশার এই সনাতন (বয়স পঞ্চাশ) যদি ইচ্ছে করেন যে কোনো বাঙালির মুণ্ডু কেটে নিতে পারেন, টরেন্টোর বাঙালিরা তা নতমস্তকে মেনে নেবেন! শরৎচন্দ্রের যুগে বাঙালি যৌথ পরিবারে জ্যেষ্ঠভ্রাতার এমন নিঃশব্দ অথচ দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল।

কানাডার ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বিদগ্ধ মানুষ ঋতেন রায় বললেন, ১৯৬৫ সালে এই শহরে এক ডজনও বাঙালি পরিবার ছিল না। বাড়তে আরম্ভ করলো সত্তরের দশকের শুরুতে এবং এখন অন্তত হাজার পাঁচেক বাঙালি এই শহরে বসবাস করেন। এক কথায় নিউ ইয়র্ক ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার

কোনো একটি শহরে এতো বাঙালি আছে কিনা সন্দেহ।

মিছরিদা বললেন, "আমাদের দেশে যারা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং সভাসমিতিতে লেকচার দিয়ে জাতীয় সংহতি প্রচারের নির্বুদ্ধিতা দেখায় তাদের পাঠিয়ে দে এই সনাতন মোহান্তর কাছে—ওঁর পা ধুয়ে চরণামৃত পান করুক বছর খানেক ধরে, তারপর বুঝবে কিভাবে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়!"

মোহান্ত ও অসিত দত্ত দু'জনেই হরিহর-আত্মা—দিনে টেলিফোনে অন্তত দু'বার বাক্যবিনিময় না-হলে এঁদের ভাত হজম হবে না। কিন্তু বাংলা গল্পের চরিত্রের মতন এঁদের মধ্যে মতান্তরও হয় এবং কখনও-কখনও কথা বন্ধ হয়ে যায়। অসিত হয়তো বললেন, "তুমি ঢেঙ্কানলের গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছো—এ ব্যাপারে কী বুঝবে?" মোহান্ত ততোধিক রেগে উত্তর দেন, "আমি এতোদিন বাঙালি চরিয়ে খাচ্ছি আমি বুঝবো না তো তুমি বুঝবে?" পুরো একদিন হয়তো কথা বন্ধ থাকে, তারপর মোহান্তগৃহিণী ফোনে খবর নেন, অসিতের মেয়ের শরীর কেমন আছে। জ্বর বেড়েছে খবর পেয়ে মোহান্ত গাড়ি চালিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে অকুস্থলে আবির্ভূত হয়ে ভীষণ রাগারাগি করেন, "তোমার এতোখানি আস্পর্ধা কোথা থেকে হয়? মেয়েটার একশ এক জ্বর আর আমি জানতে পারিনি।" প্রয়োজনে মোহান্তর গাড়িতেই মেয়ে চালান হয়ে যাবে মোহান্তভবনে, কারণ অসিতবাবুর স্ত্রী একটি অফিসে কাজ করেন।

সনাতন মোহান্ত সত্যিই একটি ইনস্টিটিউশন। আজকের কানাডায় বাঙালিরা প্রায় কেউ সোজাসুজি এদেশে আসেননি। প্রায় সবাই জড়ো হয়েছেন ভায়া জার্মানি। এই বাঙালিরা সাধারণত ইউ-এস বাঙালিদের মতন ডক্টরেটে ভূষিত নয়, বেশির ভাগ তখনকার ইন্টারমিডিয়েট সায়ান্স পাশ করে যুদ্ধপরবর্তী জার্মানির কারিগর অভাব দূর করবার জন্যে ওদেশে হাজির হয়েছিলেন। জার্মানিতে এই শ্রেণীর ভারতীয়রা কিন্তু নিরাপত্তার সন্ধান পাননি।

প্রধানত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হতো সীমিত এক বছরের জন্যে। পাকাপাকি বসবাসের অনুমতি পাওয়া ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। অতিশয় বুদ্ধিমানরা জার্মান-ললনার পাণিগ্রহণ করে জামাই-নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অনেকেই প্রথম ওয়ার্ক-পারমিট ও পরবর্তী পারমিটের মধ্যবর্তী সময়ে আইন বাঁচাবার জন্যে কানাডায় এসে অপেক্ষা করতেন।

যাই হোক, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে জার্মান অর্থনীতির কোনো এক অব্যক্ত কারণে প্রবাসী বাঙালিদের মোহভঙ্গ হতে শুরু হলো এবং তাঁরা অনেকেই আবার নতুন করে ভাগ্য সন্ধানে কানাডার দিকে তাকালেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় কানাডার দ্বার এশীয় কলাকুশলীদের জন্যে খুলছে এবং বহু পরিবার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

এই প্রজন্মের অনেক বাঙালিই কানাডার কোনো খোঁজখবর রাখতেন না। প্রায় অসহায় অবস্থায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঝাঁপ দেবার আগে তাঁরা দত্ত মোহান্তর ঠিকানা সংগ্রহ করতেন এবং সেটাই ছিল যথেষ্ট।

সনাতন মোহান্ত পেশায় একজন ওয়েল্ডার। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে আসবার আগে জানাই, তাঁর বাড়ির বেসমেন্টটি ছিল নবাগত বাঙালি সমাজের প্রথম আশ্রয়স্থল। আমাদের ছোটবেলায় 'হরি ঘোষের গোয়াল' বলে একটি কথা চালু ছিল। বিত্তবান হরি ঘোষ নাকি দাতা ও দয়ালু ছিলেন—এবং স্বল্পবিত্ত ছাত্ররা তাঁর বাড়িতে অবাধে আশ্রয় নিয়ে দুবেলা খাওয়া-দাওয়া করে পড়াশুনা চালাতেন। উত্তর কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রীট বোধ হয় এখনও সেই উদারহৃদয় মানুষটির স্মৃতি বহন করছে। আমরা যদি সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিজেদের কাজে লাগাতাম এবং যার যা পাওনা তা প্রাণ খুলে দিতে শিখতাম তা হলে এই কলকাতায় সনাতন মোহান্তর নাগরিক সম্মানের আয়োজন করতেন।

সনাতন মোহান্তর 'গোয়াল' এক প্রজন্মের ভাগ্যান্বেষী বাঙালিদের সবচেয়ে দুঃখের সময়ে আশ্রয় দিয়েছে। সনাতনবাবুর বেসমেন্টে গোটা পাঁচ-ছয় রবার কুশনের বেড। গৃহস্বামী তাঁর অতিথিদের জন্যে একটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন, যেখানে সারাক্ষণ মজুত থাকতো, একশো পাউন্ড চাল, পঞ্চাশ পাউন্ড পেঁয়াজ, পঞ্চাশ পাউন্ড আলু, তিরিশটা ডিম ও দশটা মুরগী। ফ্রিজ আছে, কুকিং রেঞ্জ আছে। জাহাজঘাটা অথবা বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সিতে সোজা সনাতন-আশ্রমে চলে এলেই হলো।

সনাতন মোহান্ত নিজেই ট্যাক্সিবিদায় করবেন। তারপর আশ্বাস দেবেন, "এসে যখন পড়েছেন তখন চিন্তার আর কী আছে? নিজের খুশিমতন খাওয়া-দাওয়া করুন, যতদিন না মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন, যেখানে-ইচ্ছে ঘোরাঘুরি করুন।"

অনেক সময় দত্ত-মোহান্ত ভ্রাতৃত্ব অনেকের জন্যে চাকরির খোঁজখবর এনেছেন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের পরে বাড়ি খুঁজে দিয়েছেন, দেশে গিয়ে দিশি মেয়ে বিয়ে করে আনতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং দীর্ঘদিন পরেও এঁদের সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়ে আছেন পরমানন্দে। কিন্তু কোথাও কোনো আত্মপ্রচার নেই। ব্যাপারটা যেন এই রকমই হওয়া উচিত।

শুধু পুরুষ নন, মহিলারাও মোহান্ত-আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছেন। সিতাংশু চক্রবর্তীর স্ত্রী রীণা (যিনি একদা গোখেলে অধ্যাপনা করতেন) যখন ভাগ্যসন্ধানে টরন্টোতে আসবার প্রয়োজন বোধ করলেন, তখন মোহান্তর সেই একই কথা। "চলে আসুন, বউদি। চিন্তার কিছু নেই। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবেন, যতদিন খুশি।"

এরপর মোহান্ত তখনকার 'আশ্রমের' বাসিন্দাদের ডেকে বললেন, "খুব সাবধান! একজন বউদি আসছেন।" বাসিন্দারা আদেশ নতমস্তকে মেনে নিলেন। শুধু অসুবিধা হলো বীয়ার সেবনের। বউদির সামনে যে ঐ কাজটি করা শোভন হবে না তা সনাতনবাবু সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার যদি সুযোগ থাকতো তা হলে এই দত্ত-মোহান্তকে নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ছবি অথবা একটি টি-ভি সিরিয়াল তৈরি করতাম। যৌথ পরিবারের রক্ত ও মানসিকতা নিয়ে প্রবাসেও এঁরা দূরকে নিকট ও পরকে আপন করে চলেছেন।

আমি যখন অসিতবাবুর লুসিফার ড্রাইভ-এর বাড়িতে প্রথম গেলাম তখন দেখলাম বাড়িতে বেশ কয়েকজন বাঙালি গিজগিজ করছে। এবং যে-ই বিদায় নিতে চাইছে তাকেই অসিতবাবু জোর করছেন, "আরে কোথায় যাবে এখন। দুটি খেয়ে যাও।"

এইভাবে কতজন যে অসিতবাবুর ওপেন হাউসে আতিথ্য পাচ্ছেন তার বোধ হয় ইয়ত্তা নেই। এঁর স্ত্রী আদর্শ সহধর্মিণীর মতন এসব শুধু সহ্য করেন না, প্রশ্রয়ও দেন, যদিও মুখে বলেন, "কী করবো বলুন? ও কি আমার কথা কখনও শুনেছে? না শুনবে?"

বলা বাহুল্য, আমিও আমন্ত্রিত দলে ঢুকে পড়ে এই পরম আনন্দময় অভিজ্ঞতার অংশীদার হলাম। অসিতবাবু তখন পরবর্তী শনিবারে টরন্টোর বাঙালি ও ওড়িয়া শিশুদের নিয়ে পিকনিক পরিকল্পনা করছেন। বাইরে বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে হৈ-চৈ করা দত্ত-মোহান্তর আর একটি নেশা। কবে কোথায় যাওয়া হবে তা ডিকটেটেরি-স্টাইলে এঁরা দু'জনে হঠাৎ স্থির করেন এবং টরন্টোনিবাসী কোনো বাঙালির ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে দত্ত-মোহান্তর টেলিফোন নির্দেশ পেয়ে তা অমান্য করবে।

দত্ত-মোহান্ত দু'জনেই রন্ধন-বিদ্যায় সুপটু—এবং বিরাট-বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি, মুরগীর মাংস ইত্যাদি রান্নার দায়িত্ব তাঁদের দু'জনের। এই সব দলে সত্তর আশিজন অংশগ্রহণকারী কিছুই নয়। টরন্টোর প্রবাসীরা বেবি সীটিং এও কোনো খরচ করেন বলে শুনিনি, নিজেদের সন্তানগুলিকে যখন খুশী এঁদের জিম্মায় জমা রেখে গেলেই হলো। দত্ত-মোহান্তর একটিই শর্ত : "বাড়িতে ফিরে আর রান্নার হাঙ্গামা রাখতে পারবে না। বেবি ফেরত নেবার সময় দুটো খেয়ে দেয়ে উদ্ধার কোরো।"

অসিত দত্তর ভাই নিউ ইয়র্ক প্রবাসী। তিনিও এই কালচারের অংশীদার কিনা জানা নেই। তবে অসিতবাবুর নিজের সম্বন্ধে কথা বলার সময়ই নেই। তিনি সারাক্ষণই অন্যের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত রয়েছেন। শুধু জানতে পারলাম, এক

সময় বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেলে থাকতেন এবং জামশেদপুর কর্মসূত্রে সময় কাটিয়েছেন, জার্মানি পাড়ি দেবার আগে।

সনাতনবাবুর সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন সেই একই কথা। "আপনি আমাদের কাছে অন্তত তিনটে মাস থেকে যান—সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। আমার স্ত্রীর খুব দুঃখ হয়েছে, আপনি তিন রাত কাটিয়েছেন টরন্টোয়, অথচ ওঁর হাতের রান্না এখনও খাননি।"

সনাতন মোহান্তর বয়স এখন পঞ্চাশ। বত্রিশ নম্বর এডিনবরা কোর্টে চমৎকার বাড়ি তৈরি করেছেন।

যা জানা গেলো, সনাতনবাবুর বাড়ি ওড়িশার ঢেঙ্কানলে, এক গণ্ডগ্রামে। সেই গ্রামের কোনো লোক কখনও বিদেশ তো দূরের কথা কলকাতা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সনাতন মোহান্ত যখন গ্রামে ফিরলেন তখন সেখানে আনন্দ স্রোত বয়ে গেলো। গ্রামবাসীরা রেল স্টেশন থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে মালা দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের কৃতী সন্তানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

হাতের কাজে ওড়িশাবাসীরা যে তুলনাহীন তা আমাদেরও অজানা নয়। স্বল্পশিক্ষিত সনাতন কিন্তু ছিলেন সুদক্ষ ওয়েলডার। বিদেশে আসবার আগে টেক্সম্যাকো, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন ও টাটা স্টীলে কাজ করেছেন।

১৯৬১-৬২তে লক্ষ্মীপথীন গ্রামের ছেলেরা মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের অস্থিরতা এলো। টাকা দিয়ে জার্মান ভাষায় আটখানা চাকরির আবেদনপত্র পাঠালেন আটটি প্রতিষ্ঠানে। এবং কী আশ্চর্য—ডাকযোগে তিনখানি চাকরি তাঁর পকেটস্থ হলো।

জার্মানিতে তাঁর ওয়েলডিং বিদ্যা প্রায় শিল্পকর্মে উন্নীত হলো। কিন্তু জার্মানির ওয়ার্ক পারমিট ইত্যাদির অসুবিধায় অধৈর্য হয়ে সনাতন মোহান্ত সাতষট্টি সালের মে মাসে কানাডায় হাজির হলেন। সুদক্ষ ওয়েলডার হিসেবে সনাতন মোহান্ত চাকরি ধরেন আর ছাড়েন—পনেরো মাসে চৌদ্দটা চাকরি। চাকরি তাঁর পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে বিখ্যাত অনটারিও হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার কমিশনে মোটা মাইনের কাজ পেলেন।

সনাতন মোহান্তর ওয়েল্ডিং কাজ এমনই নিপুণ যে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের সায়েবরা অবাক হয়ে যেতেন। এক্সরেতে অনেক সময় ধরা পড়ে না যে সনাতন ওয়েল্ড করেছেন।

অসিত দত্তও কানাডাতে প্রায় সমসাময়িক। দুজনে হরিহর আত্মা। আবার ছোটখাট ঝগড়াও লেগে আছে। অসিত বললেন, "একটা খাট কিনতে হবে।"

সনাতন সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "খাটের অনেক দাম। আমি ওয়েল্ড করে

খাট তৈরি করে দিচ্ছি।”

খাট তৈরি হলো। অসিত অসন্তুষ্ট। “তোর কোনো সৌন্দর্য-জ্ঞান নেই।”

সনাতনের উত্তর, “রাখ রাখ। কতগুলো ডলার বাঁচলো তার হিসেবটা কর!”

সনাতন বিয়ে করেন বাল্যবয়সে (বোধ হয় বারো-তেরো বছরে)। বউদি সেই কবে একবার কিছুক্ষণের জন্য জামশেদপুর এসেছিলেন। তারপর সনাতন তাঁর ভাগ্নে লক্ষ্মীকান্ত মারফৎ লিখে পাঠালেন, মামা জার্মানি যাচ্ছে!

জামশেদপুর থেকে বিদেশে যাওয়ার পথে নানা বিপত্তি। প্রথমে ট্রেন মিস হলো। একটা মালগাড়ি চড়ে অদম্যহৃদয় সনাতন মোহান্ত কোনোরকমে কলকাতা পৌঁছলেন।

১৯৬৭-তে মোহান্ত যখন কানাডায় আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত তখন গ্রাম্য বধূ মোহান্ত-বউদিকে কেউ বাজে খবর দিলো, সে কলকাতায় শুনে এসেছে সনাতন মেম বিয়ে করেছে। একই সময়ে আরেকটি দুর্ঘটনা। সনাতনের একটি ছেলে মারা গেলো। দুঃসংবাদ পেয়ে সনাতন দেশে ফিরলেন অনেকদিন পরে এবং সবাই তখন বললো, এবার বউদিকে নিয়ে এসো।

সনাতন-গৃহিণী প্রথম যখন কানাডায় এলেন তখন মোহান্ত-আশ্রমে অসিত দত্ত ও আরও তিনচারজন বসবাস করছেন। সনাতন বললেন, “তাহলে এবার ওদের অন্য কোথাও চলে যেতে বলি।” সেই কথা শুনে গ্রামের মেয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। “সে কি কথা! ওরা দেবররা যে যেমন আছে থাকুক।”

গ্রামের বধূর সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তটি মহৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। কাঠের উনুন ছাড়া যিনি কিছুই দেখেননি তিনিই তিন-চারদিনের মধ্যে বৈদ্যুতিক কুকিং রেঞ্জে সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। ভোরবেলায় উঠে সবার জন্যে লুচি করলেন মোহান্ত বউদি।

বাঙালি দেবররা জিজ্ঞেস করতো, “বউদি কি করিছন্তি? লুচি?”

সেই মোহান্ত বউদি একটু-একটু করে ইংরিজী শিখলেন এবং ডাইং-ক্লিনিং এ চাকরি নিলেন।

কয়েক বছর পরে আত্মীয়দের দেশ থেকে আনানোর ব্যবস্থা হলো। প্রথমে এলেন সনাতনের ভাই ও বউদিন বোন। বোনকে নিজের কর্মস্থলে একটা কাজ জোগাড় করে দিলেন বউদি। তারপর যথাসময়ে বোনকে দেশে নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন কটকের এক বি-এসসি পাশ যুবকের সঙ্গে। এক বছর পরে ইমিগ্রেশনের ঝামেলা কাটিয়ে বোনের স্বামী এদেশে চলে এসেছেন। সুযোগ বুঝে নিজের বাড়ির থেকে চারখানা বাড়ির পরেই একখানা বাড়ি ওদের কিনিয়ে দিয়েছেন।

সনাতন মোহান্তর বড় মেয়ে স্বর্ণলতা (কুনি) এগারো বছর পর্যন্ত গণ্ডগ্রামে কাটিয়েছে। কিন্তু এখানে এসে সে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে। ফার্মাসি পাশ

করে একটা ওষুধের প্রতিষ্ঠানে ভাল কাজ করছে। মোহান্ত আবার দেশে গিয়ে মেয়ের জন্যে একটি মনের মতন ডাক্তারপাত্র জোগাড় করে ভারতীয় মতে বিয়ে-থা দিয়ে এদেশে আনলেন। জামাইটি অতীব সুদর্শন ও ভদ্র।

আমি টরন্টোতে পৌঁছনোর সময় সবচেয়ে আনন্দ সংবাদ ও আলোচনার বিষয় সনাতন মোহান্তর বাবা-মায়ের কানাডা পরিদর্শন। এঁরা মাস দুয়েকের জন্যে ছেলের কাছে এসেছিলেন। যে-সনাতন স্থানীয় বঙ্গীয় সমাজের অভিভাবক তাঁর বাবা-মাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্যে অনেকেই বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধ দম্পতির পক্ষেও সে-এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ব্যাগ বইতে অসুবিধে হচ্ছে বলে এঁরা ব্যাগ কলকাতায় ফেলে একটি পুঁটলিতে পাসপোর্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি বেঁধে নিয়েছিলেন। মাথায় পাগড়ি ও কাঁধের ওপর একটা লাঠিতে পুঁটলি বেঁধে এঁরা খালি পায়ে বিপুল সম্মান এ ভালবাসার মধ্যে বিদেশে পদার্পণ করলেন।

ছেলের সংসার দেখে সনাতন-পিতা ও মাতার আনন্দের অবধি নেই। তাঁদের আদরে নাতনী কুনি ট্রেনারের কাজ নিলো। মাঝে-মাঝে ধৈর্য হারিয়ে কুনি বলেছিল, "আর পারছি না দাদু-দিদিমাকে নিয়ে।"

দিদিমা রেগে বলতেন, "তুই চুপ কর! তোকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি, আর এখন তুই আমাদের শেখাচ্ছিস।"

কুনি দাদুকে ইংরিজী অক্ষর শিখিয়ে দিয়েছে—'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত!

ছেলের বাড়িটা ভালই লেগেছে বাপ-মায়ের। কিন্তু দেশটা? তাঁদের মন্তব্য : "গোরু নেই, ছাগল নেই, পুকুর নেই। এ-কেমন দেশ?"

সব মিলিয়ে সনাতন মোহান্তর মতন মানুষের প্রতি অবাধ ভালবাসা না-থাকলে সনাতন মোহান্ত বা অসিত দত্ত হওয়া যায় না।

এরপরে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রপলজির অধ্যাপক অজিত রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সত্যরঞ্জন বক্সীর চেলা, নির্মল বসুর ছাত্র ও জে বি এস হ্যালডেনের মন্ত্রশিষ্য অজিতবাবু ইটালীতে শিক্ষা নিয়ে হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করেছিলেন। তারপর এক সময় হাজির হয়েছিলেন কানাডায় ১৯৭০ সালের দিকে।

অজিতবাবু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বললেন, "মানবজাতি ও সভ্যতার বিরাট এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এই টরেন্টো শহরে। বিভিন্ন জাতের মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে এখানে বসবাস শুরু করেছে—সমাজ ঘন ঘন পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করছে।"

দত্ত-মোহান্তর ভূমিকায় প্রশংসা করলেন অজিত রায়। বললেন, "এঁরা মস্ত

এক সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে।"

বাঙালি সংস্কৃতির ওপর নানা চাপ রয়েছে। বললেন, অজিতবাবু। "কেউ নিজের পুরনো সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কেউ অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলতে চাইছে, আবার কেউ সমন্বয়ের পথ খুঁজছে।"

"এই রকম চাপের মধ্যে থাকলে সৃষ্টিশীল কাজকর্মের বারোটা বেজে যায়। আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, এই সমাজ থেকে সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম হচ্ছে না। অথচ দেশের মানুষের তুলনায় এরা অনেক পার্থিব সুখের মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যেও ক্রিয়েটিভিটির এই সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সবাই পেশাগত বুৎপত্তি অর্জন করে টু-পাইস কামাবার পথটা নিতে চায়—সেখানে আদর্শের বা প্রেমের কোনো স্থান নেই। আর দুই মূল্যবোধের টানাপোড়েনে অনেক সময় ছোটরা দিশেহারা হয়ে উঠেছে।"

তবু ইউ-এস-এ ও কানাডার পার্থক্য কী জানতে চাইলাম। অজিত রায় বললেন, "ইউ-এস-এ-তে এসেছে উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা—আর কানাডায় পাবেন সাধারণ স্তরের বাঙালিদের! যুক্তরাষ্ট্র হলো অবিশ্বাস্য সুযোগের দেশ—কানাডায় সুযোগ আছে, তবে অতোটা নয়। কানাডাকে বলে সবচেয়ে ধনী অনুন্নত দেশ, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ব্যাপারটা এখনও নগণ্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মানুষে-মানুষে তীব্র প্রতিযোগিতা। যাকে আমরা 'র‍্যাট রেস' বলি সেই ইঁদুরদৌড় অনেক বেশি। কানাডায় অতো উত্তেজনা নেই—অনেক ধীরেসুস্থে কাজকর্ম হয় এখানে।"

বিদায় নেবার মুহূর্তে অজিতবাবু বললেন, "ভাববেন না। বাঙালিরা অনেক ধৈর্যশক্তি ও কষ্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসেছে। তারা একটা পথ খুঁজে পাবেই। হয়তো এমন সময় আসবে, যখন কানাডার বাঙালিদের জন্যে মাতৃভূমির আপনারা প্রকৃতই গৌরব বোধ করবেন।"

জয় মা কালী! কলকাত্তাওয়ালী হিসেবে খাঁড়া হাতে, মুখ ভেঙচে, জিভ বের করে কেবল ঠনঠনে, বউবাজার, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর পশার জমিয়েও তোমার মন ভরলো না। যবন দেশ কানাডার টরন্টো শহরে বসে জবাফুলের পুজো নেওয়া ও পাঁঠা খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তোমার।

অত্যন্ত সুখবর। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাপূরণ হতে আর দেরি নেই। কানাডার

বাঙালিরা খোদ টরন্টো শহরেই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। উৎসাহী মাতৃভক্তরা এই অধমের আগমন সংবাদ পেয়ে অনেক কাজ ছেড়ে নীলাদ্রির বাড়িতে এলেন আমাকে কালীবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমার মনে পড়লো কমবয়সে পড়া যাযাবরের দৃষ্টিপাত-এর কথা—পাঁচজন ইংরেজ একত্রিত হলেই গড়ে তোলে ক্লাব, প্রবাসে পাঁচজন বাঙালি হিন্দু একত্রিত হলেই স্বপ্ন দেখেন কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার। তাই বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙালি হিন্দুর পদার্পণ ঘটেছে সেখানেই কালীবাড়ি গড়ে উঠেছে।

যা এক সময় কেবল লখনউ, এলাহাবাদ, সিমলা, দিল্লীতে ঘটেছিল তা এখন দেশের বাইরেও প্রসারিত হচ্ছে। ভবঘুরে বাঙালির জন্য রেঙ্গুনের দরজা হয়তো বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তার বদলে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন নতুন এক মহাদেশ, যার নাম উত্তর আমেরিকা। পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধতম দেশ কানাডায় ও আমেরিকায় তাঁদের সসম্মান বসবাস। এখন মা কালী ওখানেই প্রবাসী ভক্তদের সেবাসুখ লাভ করবেন।

শ্যামা মায়ের নামে বাঙালি যতই আত্মহারা হোক, অস্বীকার করে লাভ নেই, করালবদনা এই মহিলার ভাবমূর্তি সায়েব-সমাজে তেমন তুঙ্গে নয়। চামুণ্ডা মায়ের কীর্তিকাহিনী সম্পর্কে বঙ্গবাসিনী ইংরেজ গৃহিণীরা একসময় সন্ত্রস্ত থাকতেন। মায়ের অনার্যসুলভ নানা আচরণ সম্পর্কে গোপনে-গোপনে ইংরেজমহলে যে আলাপ-আলোচনা চলতো তা শুনলে কালীভক্ত বঙ্গসন্তানের চক্ষু অবশ্যই রক্তবর্ণ হবে। কিন্তু সায়েবেরা যতই কুৎসা রটান, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাগরপারে পাঁঠাখাগী মায়ের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

টরন্টোতে বসেই একজন উৎকলবাসী বন্ধু বললেন, "মা কালী প্রসঙ্গটা অনেকদিন ধরেই জটিল। মালপোয়া ও মুণ্ডু, কীর্তন ও পাঁঠাবলির মধ্যে বাঙালি হিন্দু দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে খোল-করতাল নিয়ে গৌরাঙ্গভজনা চলছে, অন্যদিকে শ্যামামায়ের চরণতলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে শান্ত বাঙালি ছটফট করছে।"

উৎকলবাসী বন্ধু আরও বললেন, "বোস্টম ও কালীসাধকের রেষারেষিতে ওড়িশার মানুষকেও বাঙালিরা একবার জড়িয়ে ফেলেছিল।"

আমি রসিকতা করলাম, "বাঙালির এইটাই দোষ। ঘরের উত্তেজনা বাইরে ছড়িয়ে দিতে তার যে তুলনা নেই তার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। সাধে কি আর সোনার বাংলা ভাগ করে বাঙালির হাড়ে দুব্বোঘাস গজিয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিল!"

এবার যা জানা গেলো তা এই রকম। "ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের সুর তুলে প্রেমের দেবতা নিমাইয়ের ওড়িশা পরিক্রমার কথা কারও

অজানা নয়। যাত্রাপথে ওড়িশার গ্রামে-গ্রামে যে সব আখড়ার পত্তন হয়েছিল তার কথাও বহুজনে শুনেছেন। কিন্তু যা এখনও অজানা তা হলো কালীসাধক বাঙালি কীভাবে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।'

যেখানে-যেখানে বৈষ্ণবের আখড়া গজিয়ে উঠেছিল, ঠিক তার পাশে-পাশে একটি করে নরমুণ্ডমালিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যে একদল দুঃসাহসী কালীসাধক সেই যুগে নিজেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করেছিলেন। কালক্রমে এই সব বঙ্গসন্তান নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে উৎকল সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়েছেন, কিন্তু আজও নীলাচলের পথে ছোট ছোট গ্রামেও চাটুজ্যে, মুখুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যের দেখা পাবেন যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না, কিন্তু এখনও পরমানন্দে বাঙালি টাইটেল বহন করছেন।

যে দুর্জয় দুঃসাহস নিয়ে বাঙালি ডাক্তার, বাঙালি ইনজিনিয়ার, বাঙালি বৈজ্ঞানিক নতুন কর্মের সন্ধানে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন সেই দুঃসাহসের সামান্য অংশও কিন্তু বাঙালি লেখকরা দেখাতে পারেননি। যে-দিন আমাদের সাহিত্যে সেই মানসিকতা গড়ে উঠবে সেদিন কলকাত্তাওয়ালীর চরণে সব ফুল ছুঁড়ে নিঃস্ব না-হয়ে বাঙালি লেখক ছুটবেন চৈতন্যের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নে।

টরন্টো কালীবাড়ির উৎসাহী উদ্যোক্তাদের হতাশ করতে হলো—কারণ ঠিক যে সময় ওঁরা আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন অন্য এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আগাম করা ছিল। ফলে মায়ের দর্শন আগামীবারের জন্যে তুলে রাখতে হলো। তার বদলে নীলাদ্রিভবনে বসে ওঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হলো।

প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্তর সাধনায় পৃথিবীর দিকে-দিকে এখন কৃষ্ণ রাধিকার জয়জয়কার—কৃষ্ণনামে এখন নানা ভূখণ্ডের আকাশ-বাতাস মুখরিত। কিন্তু মা কালী কস্মিন কালেও সায়েব-মেমের হৃদয় জয় করেননি। লকলকে জিভ দেখলেই সায়েব-মেমের হাত-পা সিঁধিয়ে যায়, ডাক পড়ে সায়েব পাদ্রির। গির্জা গড়ে, বাইবেল শুনিয়ে কালীভক্তদের বেলাইনে টানো। কালী এখনও বিরাট এক রহস্য হয়ে রয়েছেন পশ্চিমের সাধারণ মানুষের মনে। তাই মা কালীর মাহাত্ম্য প্রচারের পুরো দায়িত্বটাই নিতে হবে বাঙালিকে আরও কিছুদিন—অন্তত যতদিন না ভক্তি-বেদান্তের মতন পাবলিসিটি অফিসার জোটে চামুণ্ডা মায়ের।

উদ্যোক্তরা বললেন, সমস্ত মার্কিন মহাদেশ জুড়ে এখন মন্দির গড়ার ঢেউ উঠেছে। গণেশ, কৃষ্ণ, তিরুপতি ও শিবের পশার জমে উঠেছে দিকে-দিকে। প্রবাসী হিন্দুরা কয়েক'শ বছর মাথা নিচু করে বসে থাকার পর এখন বিপুল উৎসাহে মেতে উঠেছেন মন্দির প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সেই তুলনায় কালীমন্দিরের

ঘাটতি প্রমাণ করছে সে সঙ্ঘশক্তিতে বাঙালি হিন্দুরা অন্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন।

আমি আন্দাজ করতে পারছি, বিদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সোজা কাজ নয়। বিপুল ব্যয়, তাছাড়া অপরিচিত পরিবেশে পদে-পদে বাধা। কিন্তু আমি মোটেই চিন্তিত নই। মা কালী যদি ক্ষমা-ঘেন্না করে প্রবাসী বঙ্গসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে একদিন তারা মায়ের মন্দির গড়বেই। বাঙালি হিন্দু মাইনাস মা কালী ইজ ইকোয়াল টু মোটরগাড়ি উইদাউট পেট্রোল, রসগোল্লা উইদাউট রস, বন্দুক, উইদাউট গুলি!

অতএব আমার সামান্য কয়েক ঘণ্টা সময়ে আমি পূর্বানির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী বাঙালি বিশেষজ্ঞ ঋতেন রায়ের সান্নিধ্যে কাটালাম।

ঋতেন রায়ের খবর আমি পেলাম নীলাদ্রি চাকি এবং প্রশান্ত বসু মহাশয়ের কাছে। এঁরা দু'জনেই এই ভদ্রলোকের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, কানাডিয়ান সরকারী অফিসার হিসেবে তিনি প্রবাসী বাঙালি সমাজকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

ঋতেনবাবুর আপিসে যাবার পথে একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি তরুণের সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম, এঁর পিতৃদেব অধ্যাপক। বেশ ব্রাইট ছেলেটি। আদর্শবানও বলতে পারেন। ভারতবর্ষ এবং এশিয়াবাসীদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের নোংরামির বিরুদ্ধে বেশ সজাগ। শুনলাম সে সাংবাদিক হবার শিক্ষা নিচ্ছে।

ছেলেটি দুঃখ করলো, এদেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা এখনও রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু নিজেদের অধিকার নিরাপদ করতে হলে রাজনৈতিক সচেতনতা নিতান্ত প্রয়োজন। পড়াশোনায় ভাল হয়েও এই তরুণটিই তাই ধর্মঘটে যোগ দেয়, শান্তিমিছিলে অংশ নেয়, প্রয়োজনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধী-অস্ত্র অনশনের যথাযথ ব্যবহার করে।

আমার গাইড বললেন, "ছেলেটির অভিযোগ : সাদারা একদিন নিরীহ নিরপরাধী রেড ইন্ডিয়ানদের দেশ কেড়ে নিয়েছিল স্রেফ গায়ের জোরে, আর এখন আমরা এশিয়াবাসীরাও নির্লজ্জভাবে সাদাদের সহযোগিতা করছি—এদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।"

ছেলেটির সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুযোগ হলো না। তার তখন জরুরী কাজ রয়েছে। কিন্তু সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে-জিনিসটি আমাকে ভাবিয়ে তুললো তা হলো তার সাজসজ্জা। একটা কানে যেন দুল দেখলাম!

আমি কি ভুল দেখলাম? পুরুষ বাঙালির কানে দুল কেমন করে থাকবে? আর দু'কানেই বা দুল দেখলাম না কেন?

নীলাদ্রির কাছে যথাসময়ে এর উত্তর পেয়েছিলাম। কানাডিয়ান ছেলেরা এখন এক কানে দুল পরছে। দুল পরবার জন্যে তারা কান ফুটোও করছে! এদের জন্যে বেরিয়েছে বিশেষ লিপস্টিক। এদের গলায় মেয়েলি হার। ফিতে দিয়ে চুল বাঁধতেও এদের জুড়ি নেই। এক কথায় বলতে পারেন স্তনবন্ধনী ও স্কার্ট পরিত্যাগ করে শার্ট ও ট্রাউজারের আশ্রয় নিয়ে মেয়েরা হতে চাইছে পুরুষ, আর লিপস্টিক, নেল পালিশ ও নানা অঙ্গরাগে ভূষিত হয়ে পুরুষরা হতে চাইছে নারী।

তবে ভাববার কিছু নেই। প্রাচুর্যের এই দেশে মানুষ বড় অস্থির—এক একটা ঢেউ উঠে আবার যথা-সময়ে মিলিয়ে যায়। কোনো ভাবনা-চিন্তাই বেশিদিন এদের মোহিত রাখতে পারে না! আজ যে পুরুষ বেণী রাখছে, রুজ মাখছে এবং বৃহন্নলাভাবে বিভোর থাকছে সে-ই হয়তো সামনে বছরে পালোয়ান স্টাইলে চুল ছোট করে কড়া পৌরুষ জাহির করবে। টরন্টোর চিত্রাঙ্গদরাও তখন হয়তো রমণীসাজে লজ্জাবতী হয়ে উঠবেন।

"বাপমায়েরা শাসন করে না?" আমার প্রশ্ন।

শুনলাম, শসন করা এখানে খুব শক্ত কাজ। কানাডায় ছোটদেরও গায়ে হাত তোলা যায় না। জানতে পারলে পুলিশ আসবে বাড়িতে এবং ছোটদের অন্য কোথাও চালান করে দেবে। পাশের বাড়ির বৃদ্ধা আমাদের সাবধান করে দেন—খবরদার, রাস্তায় বা দোকানে ছেলের কান মুলে দিও না। ছেলে খুব অবধ্য হলে বাড়িতে এসে বকাবাকি করবে। ইস্কুলেও যেন না জানতে পারে। এতে তোমাদের বিপদে হতে পারে!"

ঋতেন রায় মহাশয়ের বয়স পঞ্চান্ন, কিন্তু মনটি বেমালুম তিরিশ বছরে পড়ে রয়েছে। ছোট্টখাট্ট আড্ডাবাজ মানুষ। চমৎকার বাংলা বলেন। সহজেই আন্দাজ করা যায় যে এক সময় বাংলা লেখার অভ্যাস ছিল। এখানে মিনিসট্রি অফ মালটি-কালচার অ্যাফেয়ার্স-এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। কানাডা সরকারের এইটাই বিশেষত্ব। নানা সংস্কৃতির মানুষ এই মানবতীর্থে উপস্থিত হয়েছে—তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখার জনে একটি বিরাট বিভাগ চলছে। ফলে, করুন না আপনি রবীন্দ্রচর্চা—কানাডা সরকার আপনাকে নানাভাবে উৎসাহ দেবেন, এমন কি অর্থ সাহায্য পাবেন। ভাবলে বিস্ময় লাগে ছোটদের জন্য একটি আদর্শ বাংলা বর্ণপরিচয় লেখাবার জন্যে ওঁরা একজন মহিলাকে বেশ কিছু ডলার দিয়ে সাহায্য করছেন। কানাডা সরকার আন্তরিকভাবে চান অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার চর্চাও এদেশে অব্যাহত থাকুক।

নতুন প্রজন্মের বাঙালিদের বিদ্যাসাগরী প্রথম ভাগ অথবা রাবীন্দ্রিক সহজপাঠে মন ভরবে না—'ধ'-এ ধোপা অথবা 'ঢ'-এ ঢাকী বললে সায়েব বাঙালিরা কিছুই বুঝবে না, তাদের জন্য প্রয়োজন 'ক'-এ কমপিউটার, 'ট'-এ টিভি। এই পথেই বাংলা বই তৈরি করছেন ঋতেনবাবুর উৎসাহে সিতাংশু চক্রবর্তী মহাশয়ের শিক্ষিকা স্ত্রী।

মালটি-কালচার মন্ত্রকের দপ্তর থেকে বের করে এনে ঋতেনবাবুর সঙ্গে আড্ডা জমানো গেলো এক পানশালায়। কানাডার পানশালগুলির পরিবেশ বেশ শান্ত। যারা মদ খায় না তারাও বেশ সহজে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করতে পারেন কোকাকোলা অথবা কানাডা-ড্রাই নামক কোমল পানীয় সহযোগে। কলকাতার পানশালার তুলনায় এখানকার পরিবেশ প্রায় উপাসনালয়ের মতন!

কানাডার বহুবিচিত্র সংস্কৃতি সম্পর্কে ঋতেনবাবু জানেন না এমন বিষয় নেই। দীর্ঘদিন ধরে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে কানাডীয় সংস্কৃতির এই মূল্যবান দিক সম্পর্কে উনি নানা তথ্য সংগ্রহ করে চলেছেন।

ইহুদি, ফরাসী, ইটালিয়ান, আরব আপনি নাম করুন, ঋতেনবাবু আপনাকে ভূরি-ভূরি খবর জুগিয়ে যাবেন চমৎকার বাংলায়, যা আজকাল উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশবাসী ছাড়া আর কোথাও শোনা যায় না।

বহুমুখী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের সঙ্গে কর্মসূত্রে বহুবছর ধরে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ঋতেনবাবুর মনটি এখনও কিন্তু বাঙালি রয়ে গিয়েছে। কানাডীয় শাসকসমাজে বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্লেষণে ইনি সিদ্ধহস্ত—তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রবাসী বাঙালি সমাজের বহু দুর্বলতাও সামাজিক শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ঋতেনবাবুকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

কোকাকোলা পান করতে-করতে ঋতেনবাবু মার্কিনী ডিসিপ্লিনে কানাডীয় বঙ্গীয় সমাজের একটা ছোট্ট বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্য : বিদেশে এখন বাঙালি দু'প্রকারের। দুজনেরই ভাষা বাংলা—কিন্তু একদল ভারতীয়, আর একদল নিজেদের বাংলাদেশী বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত।

ভারতীয় বাঙালিদের প্রসঙ্গে ঋতেনবাবু জানালেন, টরন্টো শহরে ১৯৬৭ সালের আগে একশ জন বাঙালি ছিলেন কিনা সন্দেহ। ১৯৬৩ সালে কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন আইন শিথিল করে সাদা ও কালোর বৈষম্য তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে ইমিগ্রেশন আইনে বিশেষ কোনো দেশের নাগরিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে যাদের ঢুকতে দেওয়া হবে, তাদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশনের ওপর জোর দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ইংলন্ড ও জার্মানির বাঙালি সমাজের এক অংশ কানাডামুখো হবার সুযোগ পেলেন। ১৯৬৭-৭০ এই সময়ে কেবল জার্মানি থেকে শ'চারেক বাঙালি টরন্টো হাজির

হলেন। এঁদের অনেকেই তখনও অবিবাহিত—এদেশে এসে কাজকর্মে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অনেকে দেশ থেকে বাঙালি বউ এনেছে নতুন মহাদেশে নতুন বাংলা সৃষ্টির স্বপ্নে।

বিশ্বভুবনে, বিশেষ করে আমাদের দেশে জার্মানির ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল—তাঁদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের সরাসরি জ্ঞান কম থাকলেও শ্রদ্ধা অনেক বেশি। সেই দেশ ছেড়ে কানাডা যাওয়ার মানে কী আমি বুঝতে পারছিলাম না! প্রবাসী বাঙালিদের কথায় জানতে পেরেছি চিরকালই বোধহয় একটু অকারণেই জার্মানদের সম্বন্ধে আমাদের বেশি শ্রদ্ধা, সেই হিটলারি আমল থেকে। ইংরেজদের আমরা যতই গালিগালাজ করি, আমেরিকানদের আমরা যতই সমালোচনা করি, অনাবাসী ভারতীয়দের স্বদেশে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা জার্মানদের থেকে অনেক বেশি উদারতা ও সহনশীলতা দেখিয়েছেন।

ঋতেনবাবু বললেন, "একদল বাঙালি নতুন টেকনলজি শেখার স্বপ্ন নিয়ে এক সময় জার্মানি পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু হাঙ্গামা অনেক। যেমন ধরুন ভাষার হাঙ্গামা —নাগরিকতা সম্পর্কে রীতিমত অনিশ্চয়তা। একবছরে বেশি কাজকর্ম করার পারমিট পাওয়া কোনো সময়েই সহজ ছিল না। তার ওপর যতই কাজকর্ম ভাল করুন, কর্মোন্নতির পথ প্রায় রুদ্ধ, এই সব ভেবেই জার্মানির বাঙালিদের একটা বড় অংশ আবার দেশছাড়া হতে বাধ্য হলেন। এইভাবে যাঁরা কানাডায় আসবার সুযোগ পেলেন তাঁদের শতকরা নব্বুই ভাগ বসতি স্থাপন করলেন বৃহত্তর টরন্টোয়।

আমরা যে-দেশ সম্বন্ধে যত কম জানি সেই দেশকে তত বেশি শ্রদ্ধা করি। তাই কথায়-কথায় আমাদের জার্মান প্রশস্তি। কিন্তু জার্মানিতে প্রবেশ না করেও স্রেফ ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে যাঁরা কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বিমান বদল করেছেন তথাকথিত জার্মান ঔদ্ধত্য তাঁদের নজরে পড়তে বাধ্য। আমাদের বাল্যকালে যেসব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বলদর্পী হিটলারের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা যে মূর্খের স্বর্গে বসবাস করতেন তা বোধহয় এখন নির্দ্বিধায় বলা চলে।

জার্মানি ছাড়া ভারতীয়দের সঙ্গে বিদেশে কথাবার্তা বলে দেখেছি যে তাঁরা অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবহার ছাড়া কিছুই পাননি ঐ দেশে। সে-তুলনায় ইংলন্ড তো স্বর্গ! কানাডা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কথা নাই বা তুললাম।

ঋতেনবাবু বললেন, "টরেন্টো বাঙালি সমাজের সংখ্যা এখন অন্তত হাজার আটেক হবে। ৯৯% বাঙালি মহিলা বিবাহসূত্রেই এদেশে এসেছেন স্বামীর ঘর করতে। প্রবাসী বাঙালিদের গর্ব করার মতন অনেক কিছুই আছে। এঁরা বিদ্যায় সবাই পি-এইচ-ডি না হলেও, কাজকর্ম ভালই করছেন এবং এঁরা অনেকেই সরকারী পুনর্বাসন সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কানাডীয় অর্থনীতির

উন্নয়নে সাহায্য করছেন।"

ঋতেনবাবু আরও আনন্দের খবর দিলেন। শতকরা আশিটি বাঙালি পরিবারই নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। বেশির ভাগ পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন। শতকরা দশভাগ বাঙালিকে প্রফেশনাল বলতে পারেন—এঁদের মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, অ্যাকাউনটেন্ট এবং বৈজ্ঞানিক। ব্যবসায়ী প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙালি মেয়েরা যেহেতু সোজা দেশ থেকে এসেছেন সেহেতু বাঙালি মেয়েদের শিক্ষাগতমান বেশ উঁচু—এম.এ অথবা এম.বি প্রায় কিছুই নয়।

সমাজতত্ত্বের ইংরেজী শব্দ উল্লেখ করে ঋতেনবাবু বললেন,—বাঙালিরা রীতিমত 'কিনশিপ নেটওয়ার্ক ওরিয়েনটেড', কারণ তাঁদের মধ্যে বাঙালিপনা বেশি। এঁদের আর একটা সদগুণ—সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ। নিজের সংস্কৃতির রক্ষা ও বিকাশের জন্যে এঁরা সময় ও অর্থ দুটোই ব্যয় করতে উদ্‌গ্রীব। এঁরা বাংলা শেখার ইস্কুল, বাংলা গানের ইস্কুল, নাচের ইস্কুল চালাচ্ছেন, গানের আসর জমাচ্ছেন। এ ছাড়া আছে বাৎসরিক কর্মসূচী—দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী।

নেটওয়ার্ক ওরিয়েন্টেশনের আরও বড় প্রমাণ এঁরা দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরকে সাহায্য করেন। একজন অসুস্থ হলে আরেকজন এসে রান্না করে দিয়ে যান। "স্বদেশের আত্মীয়ের অনুপস্থিতি আমরা অনুভব করি না। দেশে থাকতে আমরা কখনও এমনভাবে অনুভব করিনি যে একা-একা বাঁচা হবে না, শুধু অন্যের দুঃখকে নয় অন্যের আনন্দকেও ভাগ করে নিতে হবে।"

ঋতেনবাবুকে প্রাক্-প্রবাসজীবনের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

ভদ্রলোক একটু ভাবলেন। "সেসব কথা মনে রেখে আর লাভ কী বলুন? মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ফিলজফি পড়াতাম। ১৯৭২ সালে নিউ ব্রান্‌সউইক-এ সিম্বলিক লজিক পড়াবার জন্যে এলাম। তিয়াত্তরে দেশে ফিরলাম, কিন্তু খাপ খাওয়াতে পারলাম না। ভাগ্যে স্বদেশবাস নেই!

"চুয়াত্তরের জুন মাসে আবার চলে এলাম। যখন ফিরে এলাম তখন হাতে চাকরিও ছিল না। কোনো রকমে দিন গুজরান। সরকারী চাকরিতে ঢুকলাম ১৯৮০ সালে। এদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছি। মধ্যিখানে খুব কষ্ট পেয়েছি।"

"নিজের পায় দাঁড়াবার পর্যায়ে যথারীতি দত্ত-মোহান্ত জুটির উদার প্রশ্রয় পেয়েছি। এঁরা আপনার মাথার ওপর ছাতা ধরেই আছেন। আপনার কষ্ট কীভাবে লাঘব হয়, দুটো পয়সার কী করে সাশ্রয় হয় তা দেখবার জন্যে এঁরা উদ্‌গ্রীব। মনে আছে একবার বাড়ি বদলালাম। যাতে আমার খরচ কম হয় সেজন্যে

নিজেরাই গাড়ি করে বারবার ওঁরা মাল বয়ে নিয়ে গেলেন। এই হচ্ছে আমাদের অসিত দত্ত ও সনাতন মোহান্ত। এঁদের বুকের ভিতরটা সোনা দিয়ে মোড়া।"

১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালে ঋতেনবাবু নিজের জন্মভূমি দেখে গিয়েছেন। "মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে যেতে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চয় অনেক টাকাকড়ি করেছো।' আমি বললাম, 'অর্থনৈতিক সেনস্-এ দেশে খারাপ ছিলাম না। কিন্তু কানাডায় আমি আত্মোন্নয়ন করতে পেরেছি, ইংরিজিতে যাকে বলে পার্সোনাল গ্রোথ্। কলকাতায় আমি অনেক আজেবাজে জিনিস পড়াতাম। ওঁরা বললেন, 'তুমি ক'বছর বিদেশে থেকেই দেশ সম্বন্ধে এইরকম কথা বলছো!' যে-দেশে আমি জন্মেছি, সে দেশের প্রতি টান কেন কমবে বলুন তো? ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। কিন্তু বিদেশ মার চোখ খুলে দিয়েছে। একজন প্রাক্তন মাস্টারমশাই হিসেবে আমি বলবোই—ছাত্রদের প্রয়োজন সম্পর্কে কলকাতায় কারও তেমন মাথাব্যথা নেই, তাই শিক্ষাব্যবস্থাটা কাজে লাগছে না।"

মনে হলো, ঋতেনবাবু খুব মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন। তাই অন্য বিষয়ে আসা গেলো।

তিনি বললেন, "টরেন্টোর লোকসংখ্যা লক্ষ তিরিশেক। শতকরা দশভাগ ইহুদি। শিখ পাঞ্জাবীর সংখ্যা হাজার পঁচাত্তর, গুজরাতী হাজার ষাটেক, তামিল-তেলেগু হাজার দশেক এবং তার পরেই বাঙালি। শিখরা বহুদিন আছেন—তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত। গুজরাতীরা সবচেয়ে বিত্তশালী। মিলিয়ন ডলারের মালিক বেশ কয়েক ডজন। এঁদের সিনেমা হল্ আছে, হোটেল মোটেল আছে, কমপিউটার বিজনেস আছে। চন্দ্রচূড় বলে এক ভদ্রলোকের তো কুড়ি পঁচিশ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে বাঙালিরা সবচেয়ে দরিদ্র এবং সংস্কৃতির দিক থেকে এখনও সবচেয়ে ধনী।"

সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঋতেনবাবু বললেন, "নবাগত অনাবাসীদের মধ্যে সাধারণতঃ সামাজিক পরিপক্কতার অভাব দেখা যায়।"

সামাজিক পরিপক্কতা নাকি ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। সামাজিক সংগঠনে এঁরা তুলনাহীন।

"যে কোনো সংস্কৃতিকে যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে প্রশ্ন এটা নয় কীভাবে সংস্কৃতিকে রক্ষা করবো, প্রশ্নটা হলো কীভাবে তার প্রসারতা বাড়াবো। এদেশে ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্য, সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে গেলে অন্যের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অন্যের সংস্কৃতিও মন দিয়ে অনুশীলন করতে হবে। না হলে আমাদের সামাজিক নির্বাসন ঘটবে। কালো সম্প্রদায় এদেশের মাত্র ৩%। বাকি ৯৭% সাদা। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক

অনুশীলন নিজেদের মধ্যে সীমিত রাখলে আমাদের সাংস্কৃতিক দিক থেকে একঘরে হয়ে থাকবো। আমাদের সংস্কৃতি শুধু আমাদের প্রয়োজন মেটাবে, কিন্তু মূল প্রবাহে পৌঁছবে না, তা হলে আমরা চিরকাল অবহেলিত হয়ে থাকবে। সুতরাং মূল প্রবাহকে কীভাবে আমাদের সংস্পর্শে আনা যায় তার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে হবে।"

ইহুদিদের কথা উঠলো। ওনটারিও স্টেটের সত্তর লাখ মানুষের মধ্যে ইহুদির সংখ্যা সত্তর হাজার। নিজেদের সামাজিক উপস্থিতি এঁরা সবসময় সোচ্চার রেখেছেন নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এঁরা শুধু নিজের সমাজকেই অর্থ দেন না বৃহত্তর সমাজকেও দান করেন। এঁরা কানাডীয় সমাজকে টাকা দেন আবার ইজরায়েলেও টাকা পাঠান।

"আপনি আমেরিকান ইহুদি অভিনেতা হেনরি ফণ্ডার কথা ধরুন। মৃত্যুর পরে উইলের বিবরণ বেরলো। নিজের ডাইভোর্সড্ স্ত্রীকে দিয়েছেন এক মিলিয়ন ডলার। মেয়ে জেন নিজেই বিখ্যাত, তার অর্থের প্রয়োজন নেই বলে কিছু দেননি। বাকি কয়েক বিলিয়ন ডলার দিয়েছেন জেরুজালেমের ইহুদি বিশ্ববিদ্যলয়কে। আপনি লক্ষ্য করবেন, ইহুদিদের সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রচণ্ড—এঁরা অবশ্যই স্বদেশে ও বিদেশে আমাদের আদর্শ হতে পারেন।"

আরও অনেক কথা হলো ঋতেনবাবুর সঙ্গে। বললেন, "সমাজতত্ত্বটা ভারতবর্ষে তেমনভাবে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে না। যদি পারেন ওদিকে একটু নজর রাখবেন, এতে ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মের খুব উপকার হবে।"

আমার শেষ প্রশ্ন ছিল : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডীয় সমাজের মধ্যে কোনো তফাত আছে কিনা?"

ঋতেনবাবু বললেন, "অবশ্যই আছে। বিদেশ থেকে আগতদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণী হলো : 'আমেরিকায় এসেছেন—সুস্বাগতম্। আসুন, আমাদের একজন হয়ে যান'! আর কানাডা বলে : 'কানাডায় এসেছেন—সুস্বাগতম্। আপনি যা আছেন তাই থাকুন'। বৈচিত্র্যর মধ্যে ঐক্য কথাটা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, জওহরলাল নেহরুও প্রাই তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর একটি মাত্র যে-দেশ তা স্বেচ্ছায় জাতীয় নীতি হিসেবে বরণ করে নিজের দেশকে বহু সংস্কৃতির মিলন তীর্থরূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে তার নাম কানাডা।"

কানাডায় সুস্বাগতম্—কিন্তু যেমন আছো তেমনি থেকো, নিজেকে হারিয়ো না—শুনতে খুব ভাল, কিন্তু কাজে কতখানি সম্ভব?" এই প্রশ্ন তুললেন স্বয়ং মিছরিদা।

মিছরিদার মেজাজ বেশ শরিফ। গতকাল আরও দুটি উপনয়ন সংস্কারে পৌরোহিত্য করেছেন।

"যে-হারে এদেশে গোখাদক ব্রাহ্মণ বালকদের পৈতে জড়াচ্ছেন তাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পরেই ইতিহাসে সনাতন ধর্মের প্রচারক হিসেবে আপনার নাম উঠে যাবে।" আমি বোকার মতন বলে বসলাম।

মিছরিদা সদ্য-কেনা পোলারয়েড সানগ্লাসটি নাক থেকে নামিয়ে আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকালেন। "পৃথিবীর সব ধর্মে যাজকরা বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করছেন শত-শত বছর ধরে একমাত্র এই আমরা ছাড়া। নিজের ধর্মের দুটো লোককে ধর্মীয় সংস্কার শেখাচ্ছি তাতেও তোদের আপত্তি?"

"আপত্তি নয়, মিছরিদা! আমরা আপনাকে ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকায় দেখছি!"

"রাখ রাখ। তোদের হাওড়া-কাসুন্দের স্তুতির নামে নিন্দের স্টাইল আমার হাড়ে-হাড়ে জানা আছে। পঞ্চাশ পেরিয়েছিস তবু তুই ও শঙ্করীপ্রসাদ ওই সব ছেলেমানুষি ছাড়লি না। তোদের হবে কী?"

মিছরিদা এবার সস্নেহে বললেন, "তোর ওপর রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারছি না, কারণ তুই বুদ্ধিমানের মতন কাজ করেছিস ওই সনাতন ধর্ম কথাটা ব্যবহার করে। এ-দেশে আমাদের গাঁয়ের লোক যেসব রয়েছে তারা কেউ জানে না যে খাতায় কলমে হিন্দুধর্ম বলে কোনো ধর্ম নেই—শাস্ত্রে-পুঁথিতে যে-নামটা পাবি তা হলো সনাতন ধর্ম। কঠোপনিষৎ-এ বলেছে 'উপাখ্যানম্... সনাতনম্'। অভিধানে অর্থ দেখবি—অনাদিভূত, নিত্য, চিরকালীন। যা সর্বদা একরূপ। আর এই একটি শব্দে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনকেই বোঝাচ্ছে, যেমন সনাতনী বলতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী থ্রি-ইন ওয়ান।"

এবার মিছরিদার ওপর একটু আক্রমণ। "ব্রাহ্মণ সংখ্যা বাড়াবার উদ্দীপনায় আপনি বিদেশে ভারতীয় সেতার বাদকদের মতন সনাতন নিয়মকানুনের খাঁটি দুধে জল ঢালছেন। আমি তো দেশে শুনেছিলাম আট বছর থেকে বার বছরের মধ্যে পৈতে না দিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। অথচ আপনি যাদের গলায় পৈতে জড়িয়েছেন তারা তো দ্বাদশ বর্ষীয় বালক নয়।"

"অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।" মিছরিদা চটছেন।

রবীন্দ্রনাথ নন, অন্য কারুর উক্তি, এই ইঙ্গিত পেয়ে মিছরিদা দমলেন না। "রবীন্দ্রনাথ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনিও এমন কথা বলতে পারতেন। শোন, ওই বুধবার যাকে বাউন করলাম, তার মেমসায়েব মা-ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। আমি খোদ শাস্ত্র থেকে বক্তব্য উদ্ধৃতি দিলাম। গর্ভাষ্টম বা অষ্টবর্ষ থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নকাল। কোনো কোনো ঋষি বলেছেন, যে-বালকের ব্রহ্মতেজ কামনা করা যায়, তার উপনয়ন পঞ্চম বর্ষেই হবে। দ্বাদশবর্ষ গত হলে 'ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি' হোম করে উপনয়ন দিতে হয়। ষোল বছর হলে ব্রাহ্মণ বালকের ব্রাত্যদোষ ঘটে।"

"আমরা যে শুনেছি ষোল বছরে সাবিত্রী পতিত—আর উপনয়ন হয় না।"

"প্রাচীন ঋষিরা তোদের মতন গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন না—নিয়মও করেছেন এবং নিয়ম ভাঙবার পথও রেখেছেন। সুতরাং তুই আমার উপনয়ন এবং সমাবর্তনে বাগড়া দিতে পারবি না। ষোলো বছর হলেই দোষ নিবারণের জন্যে 'চান্দ্রায়ণ' ও 'গোমূল্য' দানের ব্যবস্থা করে তবে আমি কাজে নামি।"

সমাবর্তনের পর নবীন ব্রাহ্মণকে আচার্যদেব যেসব নিয়মকানুন গোপনে শিক্ষা দেন তার উল্লেখ করে বললাম, "উপদেশগুলো আমার নোটবইতে লেখা আছে, মিছরিদা—রাত্রিতে স্নান করিবে না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না, ধাবমান হইবে না, বৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কোনো বিষয় সন্দিগ্ধ হইবে না।"

একহাত নিলেন মিছরিদা। "আরও একটা আইটেম তুই ইচ্ছে করেই বাদ দিচ্ছিস—'নগ্না স্ত্রী দর্শন করিবে না।' আমি বিদেশে পৈতে দিচ্ছি, তাই বলে দিই যস্মিন দেশে যদাচার। ধাবমান না হলে এ দেশে বেঁচে থাকবে কী করে বাপধন?"

মিছরিদা বললেন, "একজন মেমসায়েব-বউমা আমার সমাবর্তনটা বুঝতে পারলেন না! তাঁর ডাক্তার স্বামীটিও সেই রকম। বললেন, সমাবর্তন মানে তো 'কনভোকেশন'—এম-বি-বি-এস পাশ করে ইউনিভার্সিটি কনভোকেশনে আমরাও উপস্থিত থেকেছি।"

মিছরিদাকে এরপর ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, "পূর্বকালে ব্রহ্মচারীকে উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়ে বেদপাঠ করতে হতো। বেদপর্ব শেষ করে স্বগৃহে ফিরে এলে সমাবর্তন সংস্কার হতো। এখন কে আর গুরুগৃহে যাচ্ছে? তাই একই দিনে চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং সমাবর্তন সারা হচ্ছে।"

মিছরিদা আজও পপ-এর ওপর রয়েছেন। পুরো এক টিন কানাডা-ড্রাই নামক নরম পানীয় সেবন করে আর একটি আনিয়ে নিয়েছেন। সমাবর্তন থেকে শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠলো। মিছরিদা বললেন, "সনাতন ধর্মের যতই গুণ গাই, লেখাপড়ায় এরা আমাদের মেরে বেরিয়ে যাবে। তুই গোটা কয়েক ইস্কুল ঘুরে যা—ডক্টর চক্রবর্তীর পুত্রবধূ তোকে সাহায্য করবে।"

মিছরিদাই যোগেযোগ করিয়ে দিলেন। বললেন, "আমাদের সময়ে এবং তোদেরও কম বয়সে যার কিছু জুটতো না সে ইস্কুল মাস্টার হতো। এখানে কিন্তু মাস্টার অথবা মাস্টারনী হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। ঐ যে ডাক্তার প্রশান্ত বসু, ওঁর ছেলে প্রদীপ। পড়াশোনায় এতো কৃতী, ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে ডিগ্রি নিয়ে এখন ইস্কুলে মাস্টারি করছে। প্রদীপ একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, কিন্তু তার জীবিকা হলো যাদের আমরা মাথা-মোটা বলি অর্থাৎ যারা শিখতে একটু বেশি সময় নেয় (স্লো লার্নার) তাদের মাস্টারমশাই।"

"মাথা-মোটাদের নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে কী লাভ, তুই হয়তো বলবি। আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু দুঃখহরণ চক্রবর্তীর পুত্রবধূ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। তোকে দুটো মাথা-মোটা ছেলের বর্ণনা দিচ্ছি। একজনের বয়স সাত—সেকেন্ডারি ইস্কুলে পড়ে খুব দেরিতে কথা বলতে শেখে। সব বিষয়ে চৌকশ নয়, তাঁদের ধারণা প্রবলেম চাইল্ড। পিতৃদেবও বিরক্ত—ইস্কুলে কারও সঙ্গে মেশে না, খেলাধুলোতেও বিন্দুমাত্র ঝোঁক নেই, একটি জড়ভরত টাইপ।"

"এই ছেলেকে তোরা নিশ্চয় খরচের খাতায় লিখে দিবি। কিন্তু শুনে রাখ এই ছেলেটি হলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। চোখ ছানাবড়া করিস না," হুঙ্কার ছাড়লেন মিছরিদা। "তুই লেখক হয়ে নাম কুড়োবি, আর আমি তার লেখার উপকরণ সংগ্রহ করে মরবো এই কানাডাতে এসেও! তুই যদি হাওড়ার ছেলে না হতিস তা হলে কোনো খবর দিতাম না, বরং খবরের কাগজে বেনামে চিঠি লিখে তোর লেখা যে রাবিশ তার ইঙ্গিত দিতাম।"

"মিছরিদা, পরের ধনে পোদ্দারি করাই তো আমার মতন সাধারণ লেখকের পেশা। পরের জীবনে যা ঘটে তাই আমি জোগাড় করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিই। আমি তো নিজে কোনো কৃতিত্ব দাবী করি না, সবই আপনাদের নামে উদ্ধৃতি দিই, সেই সঙ্গে সবসময় বলি মিছরিদা যুগ যুগ জিও।"

খুশি মনে মিছরিদা বললেন, "পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি, আর বলে নিলে ডাকাতি। তুই আমার অন্ধ-হাওড়া-প্রীতির সুযোগ নিয়ে আমার সর্বস্ব শুষে নিচ্ছিস, দেশে একখানা জ্ঞানগর্ভ চিঠি লেখার মালমশলা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারলাম না।"

"যা-হোক, শোন এবার এক ছ'বছরের ছোকরার কথা। জন্মাবার সময়েই বিরাট সাইজের মাথা—লোকের ধারণা 'ব্রেন ফিভার'। আত্মীয় এবং পড়শিদের

ধারণা গবেট হয়েই জন্মেছে ছেলেটা, কিন্তু সন্তান স্নেহে অন্ধ মা মেনে নিতে পারছেন না ব্যাপারটা। ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা সোজা বলে দিলেন, এ-ছেলের মানসিক অসুস্থতা রয়েছে। মা তো শুনে খাপ্পা। বললেন, ঠিক হ্যায় আমি ছেলেকে ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছি, আমি ওকে বাড়িতে নিজে পড়াবো। এমন মা তো হাজার-হাজার হয় না, হলে হয়তো আমরা হাজারে-হাজারে টমাস আলভা এডিসন-এর মতন বৈজ্ঞানিক পেতাম। বাল্য বয়সের এই রেকর্ড দেখে ক'জন বুঝবে এই ছেলেই টমাস এডিসন হবে?"

থ্যাংক ইউ মিছরিদা, আপনার জন্যেই বিদেশের মাটিতে কোনো চেষ্টা না করেই চমৎকার এক বাঙালি শিক্ষিকার অভিজ্ঞতাকে নিজের করে নিতে পারলাম। রীণা চক্রবর্তীর শিশু-অন্ত-প্রাণ। কলকাতায় গোখেলে অধ্যাপিকা ছিলেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্যে আমেরিকায় আসেন—সেখানে থেকে সনাতন মোহান্তর টরন্টো ধর্মশালায়। তারপর যথাসময়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। এঁর স্বামী সিতাংশু চক্রবর্তীর কথা আগেই কিছুটা বলেছি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

মিছরিদা বললেন, "আমি একটু ভবতারণের ওখানে ঘুরে আসি। ছেলে বউ নিয়ে সুখের সংসার পেতেছিল এখানে, হঠাৎ স্বদেশে ফিরে যাবার বাই জন্মেছে। আরে বাবা, দেশকে এবং দেশ-জননীকে ভালবাস—কিন্তু দূর থেকে ভালবাসার প্রমাণ দেবার জন্যে বেহালায় বা খড়িশায় ফ্ল্যাট নেবার কোনো দরকার নেই। কিন্তু ভবতারণ নাকি বেপরোয়া, ইতিমধ্যেই এখানকার বাড়ি বেচে দিয়েছে, চাকরিতে রেজিগনেশন পাঠিয়েছে। বউটা হাওড়ার মেয়ে—সেও কিছু বলছে না। যাই দেখি, একবার শেষ চেষ্টা করে।"

আমি বললাম, "দরকার হলে নীলাদ্রি চাকীর সাহায্য নিন। উনি রবি ঠাকুরের সময়োপযোগী কোটেশন সাপ্লাই করতে পারবেন।"

"ওরে কোটেশন নয়, এখন মোটিভেশনের প্রয়োজন—বিদেশে যত স্বদেশবাসী রয়েছে, তাদের মধ্যে যদি দেশে ফেরার জেদ চেপে যায় তা হলে ইন্ডিয়ার, বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের কী অবস্থা হবে ভেবে দেখ তো।"

রীণা চক্রবর্তীর মতন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না বাঙালি মহিলা সচরাচর দেখা যায় না। নিজের প্রচেষ্টায় প্রবাসে ভারতীয় পুরুষরা অনেকেই তাঁদের স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলেছেন, কিন্তু এই ধরনের মহিলার সংখ্যা এখনও বেশ কম। আমাদের মহিলারা এখনও স্বামীর গৌরবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে ভালবাসেন, নিজের ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার বিকাশের দিকে তেমন ঝোঁক নেই।

শ্রীমতী রীণা চক্রবর্তীকে অসাধারণ বললাম এই কারণে যে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রচণ্ড মনোবলের সঙ্গে তিনি পেশাগত ও সাংসারিক সবরকম দায়দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নিজের কন্যা সন্তানটি ছাড়াও তাঁর সীমিত অর্থবলের মধ্যে ভারতবর্ষে চারটি অসহায় বালক-বালিকার সবরকম দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এই বালক-বালিকাদের স্বচক্ষে এখনও দেখা হয়নি, কিন্তু রীণা এদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং এদের পড়াশোনা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক প্রগতি সম্বন্ধে সবিস্তারের খবরাখবর রাখেন।

প্রবাসের বাঙালি বালক-বালিকাদের সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা রয়েছে। এঁদের বাংলা শেখাবার প্রচেষ্টা বারবারই ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এবং ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির অভাব সম্পর্কে কথা বললেন। প্রায় পনেরো কোটি মানুষের ব্যবহৃত কোনো ভাষার প্রচার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এতো বেশি অবহেলা ও অবজ্ঞা পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। রীণা চক্রবর্তী কানাডিয়ান সরকারের সাহায্যে একটি নতুন বাংলা বর্ণপরিচয় লিখছেন বিদেশি বাঙালিদের মানসিকতার কথা মাথায় রেখে।

বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সন্তান-সন্ততিরা শিক্ষাক্ষেত্রে কেমন করছেন, কোথায় তাদের বাড়তি শক্তি, কোথায় তাদের অত্যধিক দুর্বলতা যদি জানতে চান তাহলে রীণা চক্রবর্তীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কথা বলা খুব কাজের হবে।

পশ্চিমী সভ্যতা এই মুহূর্তে পশ্চিমী শিশুদের ওপর কী অভাবনীয় চাপ সৃষ্টি করছে তা না জানা থাকলেও দেশের ইস্কুলে শিক্ষিকার ভূমিকা বোঝা বেশ শক্ত হয়ে উঠতে পারে।

রীণা চক্রবর্তীর মতে, ছোটদের বলবার আছে অনেক কিছু কিন্তু ওদের মতন করে বলবার ক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে।

রীণা চক্রবর্তী অনুরোধ করলেন, "সময় পেলেই বিখ্যাত শিশু মনস্তাত্বিক ডেভিড এলকিন্ড-এর 'দ্য হারিড চাইলড' বইটি পড়ে নেবেন, আপনার দৃষ্টি খুলে যাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দ্রুত বেগে বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তা আমরা সব সময় অবহিত হই না।"

আমার মনে পড়লো, মা বলতেন, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রীণা বললেন, "এ-দেশে ছোটদের ব্যাপার-স্যাপার আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আর্থিক স্বার্থে উকিলরা পর্যন্ত এদের ব্যবহার করছেন। শুনুন একটি ঘটনা। একটি সাড়ে-চার বছরের মেয়ে মামলা করেছে তার বাবার বিরুদ্ধে।

মেয়েটির জন্ম-বাপ-মায়ের বিবাহ বন্ধনের বাইরে। বাবা তবু নিয়মিত খোরপোষ দেয় মেয়ের মাকে, কিন্তু যোগাযোগ রাখে না। এখন ছোট মেয়েটি মামলা করেছে, শুধু পয়সা দিলেই হবে না, মাঝে-মাঝে এসে দেখে যেতে হবে।"

কনেকটিকাট, ইউ-এস-এ—তো এখন নতুন আইন অনুযায়ী বাপ কিংবা মাকে 'ডাইভোর্স' করা যায়। ষোলো বছরের ছেলে ডেভিড বার্নস্ মামলা করে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে ডাইভোর্স নিয়েছে।

ডাইভোর্সের এই নবতম বিস্তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। রীণার দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেলো, কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বেশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টিন এজারদের মধ্যে এইটাই হলো মৃত্যুর অন্যতম কারণ—এর ওপরে অবশ্য রয়েছে পথ দুর্ঘটনা এবং খুন। আমেরিকায় এইভাবে প্রতি বছরে অন্তত হাজার পাঁচেক কমবয়সী ছেলেমেয়ে আত্মহত্যা করে। সংখ্যা বাড়ছে। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করে যারা ব্যর্থ হয় তাদের সংখ্যা অন্তত পঞ্চাশ থেকে একশ গুণ বেশি।

যা বুঝলাম, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার পরিবেশে পড়ে আমেরিকা মহাদেশের মানুষ ক্রমশই তাদের মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছে। সারাক্ষণই কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা এবং পিছিয়ে পড়বার ভয়। নিরাপত্তাবোধের অভাব রোজগারি মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে। এই প্রতিযোগিতার মানসিকতা ইস্কুলে-কলেজেও ছড়িয়ে পড়ছে।

এরই মধ্যে চলেছে শিশুদের নিয়ে নির্লজ্জ ব্যবসায়িকে প্রতিযোগিতা। জিনিসপত্র বিক্রির প্রচারে ছোটদের দিকে অকারণে নানা বিজ্ঞাপনের তীর ছোঁড়া হচ্ছে। এর প্রধান অংশটাই টি-ভি-র মাধ্যমে।

ডেভিড এলকিন্ড দুঃখ করছেন, প্রতি বছর মার্কিনী শিশুরা অন্তত কুড়ি হাজার কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপন দেখছে এবং ছোটদের মাথা চিবনোর জন্যে মার্কিনী কোম্পানিরা হাজার-হাজার কোটি টাকা খরচ করছেন। ছোটরা বিজ্ঞাপন এবং প্রোগ্রামের পার্থক্য বুঝতে পারে না, টি-ভিতে যা দেখানো হয় তাই সত্য বলে মনে করে, ফলে বিজ্ঞাপনদাতাদের পরিকল্পনা সফল হয়। তারা প্রত্যেক বাড়িতে একটি দুটি করে খুদে কোম্পানি 'প্রতিনিধি' তৈরি করছে যারা সুযোগ পেলেই বাবা-মায়ের উপর চাপ দেবে টি-ভিতে বিজ্ঞাপিত জিনিস কিনতে।

আমেরিকা ও কানাডায় ছোটদের ইস্কুলগুলি দেখবার জিনিস। শিক্ষার ব্যাপারে আমরা কতটা পিছিয়ে পড়েছি, আমাদের শিক্ষকদের অধিকাংশ কত কম দায়িত্ব পালন করেন তা যদি বুঝতে চান তা হলে আপনাকে ও-দেশের ইস্কুলে যেতে হবে কয়েক দিন।

কিন্তু ও-দেশে কি ছোটদের বড্ড বেশি আস্কারা দেওয়া হয়? ওখানে কি

নিয়মানুবর্তিতা কম?

বলা বাহুল্য, ছাত্রদের দৈহিক নিগ্রহ বে-আইনী। এর ফলে জেল হতে পারে, বিরাট মামলায় পড়তে পারেন মাস্টারমশায়।

ছাত্রনিগ্রহের উল্টোদিকও আছে, যে-বিষয়ে কেউ বেশি মুখ খোলে না। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ছাত্ররা প্রায়ই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মারধোর করছে। স্ট্যাটিসটিকস্‌ না-দিলে যাঁরা কিছু বিশ্বাস করেন না তাঁরা শুনুন, ছাত্রের হাতে মার খাবার ভয় মাস্টারমশায়দের মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। অনেক ইস্কুলে বিমানবন্দরের মতন ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি যন্ত্র বসানো হয়েছে, যাতে ছাত্র ছাত্রী কোনো মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে ক্লাশ ঘরে ঢুকতে না পারে।

ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, এক বছরে এক লাখ দশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ইস্কুলের মধ্যেই মার খেয়েছেন। বাড়ির বাইরে পথে-ঘাটে মার খেয়েছেন আরও হাজার দশেক। আঘাত এতোই গুরুতর যে হাজার কুড়ি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে পাঠাতে হয়েছে। সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন শিক্ষক ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন কখন ছাত্রদের মারধোর হজম করতে হয়। এর সঙ্গে আছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভেঙে দেওয়া বা চুরি করা। জিনিস চুরি হয়ে যাবার ভয় শান্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও থাকে। সতীর্থদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ও প্রবল।

অতি কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ওপর কী ধরনের চাপ পড়ে তার মর্মস্পর্শী ছবি ডেভিড এলকিন্ডের বই থেকেই পাওয়া গেলো। একটি চার বছরের ছেলে, ধরা যাক তার নাম পিটার। এর বাবা মা দু'জনেই চাকরি করেন। তাই পিটারের জন্যে দিনের বেলায় প্রাইভেট নার্সারি স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা ও মা দু'জনকেই খুব সকালে বেরিয়ে পড়তে হয়, তাই পিটারকে তাঁরা জানাশোনা এক পড়শির বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যান।

এই প্রতিবেশী পিটারকে তৈরি করে ন'টার সময় ইস্কুলের গাড়িতে তুলে দেন। দুপুরের পরে ইস্কুলের গাড়ি আবার পিটারকে পাড়ার মোড়ে নামিয়ে দেয় এবং সেখানে থেকে হাঁটতে-হাঁটতে পিটার প্রতিবেশীর বাড়িতে হাজির হয়।

সন্ধ্যের দিকে বাবা অথবা মা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরবার মুখে ওকে বাড়ি নিয়ে যায়।

বলাবাহুল্য, পিটার ইস্কুলে ভাল ফল করছে না। তার মেজাজ খারাপ থাকে, খেলায় পর্যন্ত মন নেই। দোষ দেওয়া যায় কি পিটারকে? ওইটুকু শিশুকে চারটে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিদিন খাপ খাইয়ে নিতে হয়—নিজের বাড়ি, প্রতিবেশীর

বাড়ি, ইস্কুলের গাড়ি, ইস্কুল, আবার ইস্কুলের গাড়ি, প্রতিবেশী এবং নিজের বাড়ি। এই রকম শিশু আপনি বিদেশে হাজার হাজার পাবেন।

যে-সংসারে আবার স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে আর এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। জেনেট নামে দশ বছরের এক বালিকার কথা শুনুন।

ডাইভোর্সড অবস্থায় জেনেটের মা দুটি মেয়ে নিয়ে কোনোক্রমে দিন চালান। তাঁকে অবশ্যই চাকরিতে যেতে হয়। খুব ভোরেই তিনি বেরিয়ে পড়েন। নিজের ঘর গুছনো, নিজের জামাকাপড়ের দায়িত্ব তো আছেই প্রতিদিন জেনেট ব্রেকফাস্ট তৈরি করে বোন ও নিজের জন্যে, তার পরে বোনকে নিয়ে ইস্কুলের জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে জেনেট বাড়ি পরিষ্কার করে। ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে ডিনার তৈরির জন্যে কেটে রাখে। বোনকেও দেখাশোনা করতে হয়। মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এলে কর্মক্ষেত্রে সব রকম নিগ্রহের কথা মন দিয়ে শুনতে হয় জেনেটকে। ওখানকার কয়েকটি লোকের মতিগতি ভাল নয়, মা খুব ভয় পেয়ে জেনেটকে সব শোনান।

ক্লান্ত মাকে ডিনার তৈরিতে সাহায্য করতে হয় জেনেটকে। খাবার পরে মা বলেন, লক্ষ্মী সোনা, আমার শরীর বইছে না, এঁটো বাসনগুলোর একটা গতি করো।

ছোট্ট বয়সে বিরাট এই দৈহিক ও মানসিক দায়িত্বের বোঝা বহন করে জেনেট যে ইস্কুলে আশানুরূপ ফল করবে না এতে আশ্চর্যের কী?

রীণা চক্রবর্তী বললেন, "ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কোনো সমস্যা নজরে পড়লে তা সময়মতো যথাস্থানে না জানালে কানাডিয়ান শিক্ষকদের হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে আদালতে।"

আমার তো চক্ষুচড়কগাছ। রীণা চক্রবর্তী বললেন, "ছোটদের ওপর কতরকম যে শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়তে পারে তা এ দেশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ডেভিড এলকিন্ড তেতাল্লিশ রকম পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন।"

এক ধরনের চাপের জন্যে এক-এক রকম পয়েন্ট দেওয়া হয়। কোনো বালক-বালিকার ওপর মোট চাপ ১৫০ পয়েন্টের কম হলে স্বাভাবিক, কিন্তু ৩০০ পয়েন্টের বেশি হলে খুব খারাপ। এই সব চাপ এবং কোন চাপের জন্যে কত পয়েন্ট, তার কিছু নমুনা শুনুন।

বাবা অথবা মায়ের—মৃত্যু (১০০), ডাইভোর্স (৭৩), বিচ্ছেদ (৬৫), সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর চাকরি (৬৩), পুনর্বিবাহ (৫০), চাকরি যাওয়া (৫০), পুনর্মিলন (৪৫), নতুন কোনো জায়গায় উঠে যাওয়া (২৬), বাড়ি বদল করা

(২০)। মায়ের চাকরি করা (৪৫), সন্তানসম্ভবা হওয়া (৪০), ছোট ভাইবোনের জন্ম (৩৯), সংসারে আর্থিক অবস্থার অবনতি (৩৮), ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি হঠাৎ বেড়ে যাওয়া অথবা কমা (৩৫), জিনিসপত্তর চুরি হওয়া (৩০), দাদু-দিদিমার সঙ্গে গোলমাল (২৯), মাস্টারের সঙ্গে গোলমাল (২৪), হঠাৎ খুব ভাল ফল হওয়া (২৮), ইস্কুল পাল্টানো (২০), ছুটিতে বেড়ানো (১৯), খাওয়া-দাওয়ার পরিবর্তন (১৫), যতক্ষণ টি-ভি দেখা অভ্যাস তার কম-বেশি হওয়া (১৩), জন্মদিনের পার্টি (১২), সত্যি কথা না বলার জন্যে শাস্তি (১১)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চাপে পড়লেই কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়? রীণা চক্রবর্তীর মতে আমাদের দেশের কথা কিছুটা আলাদা। চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে কত মানুষ ভাল হবার সাধনা করছে।

পশ্চিমে ধরেই নেওয়া হয়, কষ্ট মানুষকে নষ্ট করে। যদিও বইতে আজকাল কষ্টজয়ী বালক-বালিকাদের কথাও কিছু-কিছু লেখা হচ্ছে।

যেমন ধরুন, মিনিয়াপলিস-এর একটি দশ বছরের বালকের কথা। একটা ভাঙা ভুতুড়ে বাড়িতে সে বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা দাগী আসামী, জেল খেটেছেন। এখন ক্যানসারে মৃত্যুপথযাত্রী। মা নিরক্ষর। সাতটি ভাইবোনের মধ্যে দুটি গবেট। তবু এই ছেলেটির পড়াশোনায় সাফল্য সম্পর্কে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইস্কুলের সবাই একে ভালবাসে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাসিমুখে।

পাগল এক মায়ের তিন ছেলেমেয়ের কথা শুনুন। এঁর ধারণা, বাড়ির খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। বারো বছরের বড় মেয়েটির মাথাতেও ব্যাপারটা বেশ ঢুকে গিয়েছে—সে রেস্তোরাঁ ছাড়া কোথাও খাবে না। দশ বছরের ছেলেটিকে রোগে ধরেছে, বাবা উপস্থিত না থাকলে সে বাড়িতে জলস্পর্শ করবে না। সাত বছরের ছেলেটি কিন্তু স্বাভাবিক—সে বাড়িতে নির্ভয়ে খাচ্ছে। কেন তার ভয় হচ্ছে না, এই প্রশ্নের উত্তরে মনস্তাত্ত্বিককে সে বলেছে, এখনও পর্যন্ত তো মরিনি আমি। এই ছেলেটি পরবর্তী জীবনে খুব সফল হয়েছিল। মায়ের অসুস্থতা তার সামনে বিপদ জয় করবার চ্যালেঞ্জ এনেছিল এবং দুর্জয় মানসিকতা নিয়ে সে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

পণ্ডিতরা বলছেন, অতীতে কী হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে কী বিপদ হতে পারে এই নিয়ে ভাবতে-ভাবতেই আমরা বেশি কষ্ট পাই এবং মানসিক অশান্তিতে ভুগি। যারা নিজেদের বোঝাতে পারে যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে কিছু করার নেই—গতস্য শোচনা নাস্তি ; ভবিষ্যতের মোকাবিলা যথাসময়ে করা যাবে এবং

হাতের মুঠোর মধ্যে যে বর্তমান রয়েছে তাকে কাজে লাগানো যাক—তারা সাধারণত জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়।

প্রবাসে ভারতীয় ছেলেমেয়েরা সাধারণত সংসারের সুরক্ষা পায় অপর্যাপ্ত। তাই তারা প্রায়ই প্রতিযোগিতায় ভাল করছে। তবে খারাপ খবরও আসে।

একটি ছাত্র ভাল করছে না বলে রীণা তার গার্জেনদের ডেকে পাঠালেন। এই শিখ পরিবার অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী—স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন। ওর বাবা দিনের বেলায় কাজ করে সন্ধ্যাতে বাড়ি ফেরেন, মা তখন রাতের ডিউটিতে যান। ছেলে অনেক রাত পর্যন্ত ভিডিও দেখছে। সে তো ইস্কুলে গোলমাল বাধাবেই।

আর একটি পাঞ্জাবী বালক ইস্কুলে ভাল করছিল না। তার মাকে ডেকে পাঠাতে তিনি ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। স্বামী দুটো চাকরি করেন—বাড়িতে থাকেন না বললেই হয়। যখন বাড়িতে ফেরেন তখন প্রায় বন্য—মদে চুর হয়ে থাকেন।

পরের দিন স্বামীকে ডাকা হলো। স্বামী তো ইস্কুলের খোঁচা খেয়ে বউয়ের ওপরে বেজায় খাপ্পা। এই মারে তো এই মারে গোছ অবস্থা। বউকে গালাগালি দিতে-দিতে তিনি বললেন, আমি মর্নিং শিফটে কাজ করি, আবার ইভনিং শিফটে কাজ করি। বউ যদি সংসার ছেলেপুলে দেখতে না পারে তা হলে ওই অকর্মের ঢেঁকি পুষে লাভ কী? আমি তো বাড়ির লোকদের দামী-দামী জিনিসে মুড়ে রেখেছি। আমি সোজাসুজি বলছি, আমি টাকা পয়সা ছাড়া বউকে আর কিছু দিতে পারবো না। শিক্ষিকা শেষে ছেলেকে ডাকলেন। আড়ালে বললেন, 'ইস্কুলে খারাপ করে তুমি মাকে কষ্ট দিচ্ছ। মা মরে গেলে কী করবে?'

ফল হলো। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো। রীণা চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন, "মা যা বলবেন তা শুনবে।"

ছেলেটি এর পর সত্যিই বেশ ভাল হয়ে গেলো।

আর একটি ভারতীয় বালকের ক্ষেত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেলো, বাবা মদ খেয়ে বাড়ি এসে গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েদের বিছানা থেকে তুলে কান ধরে ওঠ-বোস করায়।

স্ত্রী ইস্কুলে এসে খুব কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বামীর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন না। ভারতীয় মেয়েদের এই স্বভাব—বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

রীণা চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অফুরন্ত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ স্রেফ ওঁর সঙ্গে কথা বলে মোটা-মোটা খাতা ভরিয়ে ফেলা যায়। রীণা বললেন আর এক মহিলার কথা। ধরুন তার নাম মিসেস শর্মা। ছেলে ইস্কুলে খুব খারাপ করেছে

বলে চিঠি পাঠানো হলো। দেখা গেলো চিঠিতে "মিসেস" কথাটা কেটে তিনবার "ডাক্তার" "ডাক্তার" কথাটা লিখেছেন।

তারপর জানা গেলো মিসেস শর্মা মানসিক রোগগ্রস্ত। ভদ্রমহিলা সত্যিই ইন্ডিয়া থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু কানাডার পরীক্ষায় বার-বার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে কিছু করা গেলো না।

ছেলেমেয়েদের সবরকম খবরাখবর রাখতে ইস্কুলের শিক্ষিকারা বাধ্য। তাই তাঁদের পরিশ্রম করতে হয় ভীষণ। প্রয়োজনে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত ইস্কুলে থেকে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। রীণার স্বামী সারাক্ষণই স্ত্রীর প্রফেশনাল সমস্যার কথা বোঝেন। দেরি হবে এই ফোন করতে তিনি বলেন, "কোনো চিন্তা নেই। শুধু বলো, আজ কী রান্না করে রাখবো।"

আমাদের দেশে একবার ইস্কুলে কলেজে কাজে ঢুকলে বাকি জীবনটা অনেকেই স্রেফ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটিয়ে দেন। পঁচিশ বছরের বস্তাপচা নোট ডিক্টেশন দিয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব সারেন অনেকে। কেউ বলবার নেই, চাকরি নিয়ে টানাটানির কথাই ওঠে না। কিন্তু পশ্চিমে ব্যাপারটা অতো সহজ নয়।

রীণা বললেন, "সারাক্ষণ শিক্ষিকাদের কাজের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রতি তিন বছর অন্তর কঠিন রিভিউ। গত এগারো বছরে আটজন শিক্ষিকার চাকরি যেতে দেখেছি আমাদের ইস্কুলেই।"

"এখানে ইউনিয়ন নেই?"

রীণা চক্রবর্তী বললেন, "অবশ্যই আছে। কিন্তু চাকরি থেকে 'স্যাক' করলে তারা কিছু বলবে না। অর্থাৎ নিজে অপদার্থ হলে অপরের কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। শুধু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই ব্যবস্থাটুকু হয়েছে যে এখন থেকে লম্বা রিভিউটা তিন বছরের বদলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হবে।"

আমাদের কথার মধ্যেই মিছরিদার প্রত্যাবর্তন। বললেন, "চল তোকে নীলাদ্রিনিবাসে পৌঁছে দিই। বিশ্বভ্রমণ কাহিনী লেখার শখ অথচ কোনো শহরের একটা রাস্তা পর্যন্ত চিনলি না, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম জ্ঞানটাও তোর হলো না।"

সত্যি, কোনো শহরের কোনো রাস্তাই আমি চিনতে পারি না। আমি শুধু জানা লোকের মুখ দেখলে জায়গাটা কোথায় বলতে পারি।

মিছরিদা আমাকে রাণু চাকী ও তার আদরের কন্যা 'ছুটির'-র হাতে প্রত্যর্পণের আগে বললেন, "ভবতারণ ও তার বউকে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো গেলো না, ব্রাদার। কলকাতার ধোঁয়া, ট্রাফিক জ্যাম,

আবর্জনা, লোডশেডিং, ভেজাল, ভিড় ইত্যাদির সম্বন্ধে আধঘণ্টা লেকচার দিয়েও কোনো ফল হলো না। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? ভবতারণ আট বছরের ছেলেটাকে একটু বকেছিল, এবং চোখ রাঙিয়েছিল কথা না-শুনলে উত্তম-মধ্যম দেবে। তার পরেই বাড়িতে পুলিশ হাজির। ছেলে কোন সময়ে থানায় ফোন করে দিয়েছে বাবার বিরুদ্ধে। পুলিশ বাবাকে শাসিয়েছে, বলেছে আবার যদি ফোন যায় তাহলে ফল ভাল হবে না।"

"ভবতারণ এবং তার স্ত্রী তারপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এদেশে আর থাকবে না। বেঁচে থাক আমাদের ইন্ডিয়া, এই কথা বার-বার বলছে এবং চোখের জল ফেলছে আমাদের ভবতারণ ও তার ভবতারিণী।"

টরন্টো শহর ত্যাগ করে আবার ইউ-এস-এ ফিরবার আগে আমি ও মিছরিদা ডাঃ প্রশান্ত বসুর বাড়ি ঘুরে এসেছিলাম।

কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিদানের ব্যাপারে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশান্ত বসুর বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা আগেই বলেছি।

যা বলা হয়নি, তা হলো বসু-দম্পতির বঙ্গসংস্কৃতির প্রীতির কথা। রবীন্দ্র-সংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এঁরা দুজন সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছেন—চিকিৎসাজগৎ থেকে অবসর নেবার পর রবীন্দ্রনাথই হবেন অধ্যাপক বসুর সারাক্ষণের ধ্যানজ্ঞান।

রসিকতা করে তিনি রবীন্দ্রনাথ "পছন্দিত ও অনুবাদিত" কয়েকটি কবিতা শোনালেন। স্ত্রী মন দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত সাধনা চালাচ্ছেন—শোনা যায়, মনের মতন গুরু পেলে ষাট বছর বয়সে তিনি রবীন্দ্র-নৃত্যেও তালিম নিতে আগ্রহী।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি পাশ করে প্রশান্ত বসু এক সময়ে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে চক্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। চার বছর মাত্র ছিলেন। ওখানেই জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। দুঃসাহসের বশে নিজের তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডঃ বসু কর্নিয়া গ্রাফটিং করলেন যা গ্রাম্য পরিবেশে পৃথিবীতে এর আগে কখনও হয়নি।

কলম্বো পরিকল্পনায় ১৯৫৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য টরন্টোতে আগমন। "এসেছিলাম ছ'মাসের জন্য। হয়ে গেলো বত্রিশ বছর। একবার দেশে ফিরে গিয়েছিলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। অথচ মাসে পাঁচ-ছ'শ টাকা পেলেই আমি

সন্তুষ্ট থাকতাম। সাড়ে আট হাজার টাকা গুণাগার দিয়ে আবার টরন্টোয় ফিরে এলাম।"

এদেশে প্রশান্ত বসুই প্রথম ভারতীয় প্রফেসর অফ অপথালমলজি, প্রথম ডিরেক্টর অফ অপথালমিক রিসার্চ এবং প্রথম ডিরেক্টর অফ আইব্যাংক ল্যাবরেটরিজ।

আবার টিম-ওয়ার্কের কথা উঠলো। প্রশান্ত বসু দুঃখ করলেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা আমাদের হচ্ছে না। "মনে করুন, আপনি পৃথিবীর সব চেয়ে নামকরা আই সার্জেন। খুব যত্ন করে আপনি কর্নিয়া গ্রাফটিং করলেন, কিন্তু বিছানা তৈরির সময় অনভিজ্ঞ নার্স অসাবধানে রোগীর কম্বল ঝাড়লে আপনার সমস্ত বিদ্যা ও শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয়, দেশে এই ব্যাপারটা প্রায়শই হচ্ছে—আমরা সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং টিমস্পিরিট জাগাতে পারছি না।"

প্রশান্ত বসু একটি ব্যাপারে মার্কিন মহাদেশে প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন। এঁর পুত্র ও পুত্রবধূ একটি বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে বসবাস করেন।

মিছরিদা রসিকতা করে বলেছিলেন, "তোকে আমি 'সমবায়িকা' দেখাবো।" আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি, সমবায়ভিত্তিক দোকান 'সমবায়িকা' তো কলকাতায় লিন্ডসে স্ট্রীটে এবং হাতিবাগানে।

"ওরে মূর্খ, সমবায়ভিত্তিক যা-ই চালানো হয় তার নামই সমবায়িকা। প্রশান্ত বসুর সংসার, উনি নিজেই বলছেন, কো-অপারেটিভ হিসেবে চালানো হয়।"

ব্যাপারটা বেশ মজার। একই বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ-পুত্রের সহ-অবস্থান। "বাধ্য হয়ে কেউ এখানে বসবাস করে না, দু'পক্ষই স্বেচ্ছায় এখানে আছি," বললেন প্রশান্ত বসু।

আমাদের দেশে হবু শ্বশুর-শাশুড়িরা প্রশান্ত-রেবা বসুর কাছ থেকে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

"কী বুঝলি?" মিছরিদা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা চুলকোলাম। "এক সঙ্গে আছি অথচ এক সঙ্গে নেই এমন একটা ব্যবস্থা!"

মিছরিদা বললেন, "ব্যাপারটা বুঝে নে, ভাল করে। বাবা-মা অথবা ছেলে-বউ কেউ মিনিটে-মিনিটে অপরের ব্যাপারে নাক গলায় না। দুই দম্পতির কাছেই বাড়ির চাবি আছে; যে যখন খুশি ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে। দুই পক্ষেরই আলাদা-আলাদা ড্রইংরুম আছে, সেখানে তারা নিজস্ব অতিথি এবং বন্ধু-বান্ধবদের আদর-আপ্যায়ন করতে পারে। এর জন্যে পরস্পরের অনুমতির প্রয়োজন নেই।"

"সব চেয়ে যা সুন্দর", মিছরিদা বললেন, "দু-জনেরই দুটি রান্নাঘর আছে। ইচ্ছে হলেই, নিজের মতন রান্না করতে পারে। ছেলের পার্টিতে ইচ্ছে হলে বাবা-মা নিমন্ত্রিত হতে পারেন। বাবা ও মায়েরও একই স্বাধীনতা। তাঁরা যখন নিজেদের পছন্দমত অতিথিদের নিমন্ত্রণ করেন তখন পুত্র-পুত্রবধূ বাদও পড়তে পারে। একই সঙ্গে দুই ঘরে দু-দল অতিথি আপ্যায়িত হচ্ছেন, ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়।"

মিছরিদা বললেন, "হাঁড়ি আলাদা হোক, কিন্তু ছাদ এক থাক—এই নীতিটা ভারতীয় সংসারে ঢুকিয়ে দে। দেখবি অনেক অশান্তি কমে গিয়েছে শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে।"

আমার খবর ছিল, এদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিরা এক বিচিত্র ধরনের জীব। দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই—বাবা-মায়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের অদ্ভুত সব ধারণা। মিছরিদা এদের সম্বন্ধেই নতুন একটা শব্দ সংগ্রহ করেছেন।

"এ বি সি ডি—লিখে নে।" মিছরিদা নিজের নোটবই খুলে বললেন।

ব্যাপারটা যে রসিকতা নয়, তা মিছরিদা ব্যাখ্যা করলেন—আমেরিকা বর্ন কনফিউজ্‌ড দিশীজ্। এরা না ঘরকা না ঘাটকা—না সায়েব-মেম না বাবু-বিবি। এরা হলো অনেকটা হাঁসজারুর মতন। বাপ-পিতামহের সংস্কৃতি এবং দেশকে অবজ্ঞা করে আনন্দ পায়। অথচ যে দেশে বসবাস সেখানেও তাদের পূর্ণ স্বীকৃতি নেই।"

"এদেশে বড়-হয়ে ওঠা ভারতীয় মেয়েদের মুখে ইন্ডিয়ান ছেলে সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত মন্তব্য শুনবি—'নার্ড'। বাংলা করলে যা দাঁড়ায়—'ম্যাদাটে'। পড়াশোনায় ভাল, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় শেখেনি।"

"তাহলে তো 'নার্ড' একটা গালাগালি।"

"অবশ্যই গালাগালি। এখানকার ইন্ডিয়ান কুমারীদের ভয়, বাপ-মা তাকে একটা ম্যাদাটের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।"

এবার প্রশান্ত-সমবায়িকায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। পুত্র প্রদীপ কানাডায় জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু আশৈশব এখানে লালিত। বাংলা জানে না, যদিও বুঝতে পারে।

প্রদীপের স্ত্রী রঞ্জনার বয়স সাতাশ। রঞ্জনার জন্ম কলকাতায়—অতি শৈশবে বাবা-মায়ের সঙ্গে কানাডায় চলে আসে। পরে তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার জন্মভূমি ঘুরে এসেছে।

শাদা শার্ট ও শাদা হট প্যান্ট পরে শ্যামলী বধূ রঞ্জনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগছিল। কলকাতার পরিবেশে শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে বউমার এই বেশবাস এখনও অকল্পনীয়। কিন্তু এটা বহিরঙ্গ। ভিতরে কোথাও দু-পক্ষের মধ্যে চমৎকার মনের মিল রয়ে গিয়েছে। রঞ্জনার বাবা-মা দীর্ঘদিন প্রশান্ত বসু পরিবারের সঙ্গে পরিচিত এবং সেই সূত্রে ছোট বয়স থেকেই মেয়ের দু-বাড়িতে অবাধ যাতায়াত।

রঞ্জনা কৃতী ছাত্রী। সমাজ বিজ্ঞানে এম-এসসি করেছে। ওর বিশেষ আগ্রহ বার্ধক্যের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে। এখন একটি হাসপাতালে কাজ করে। কাজটি অসাধারণ—দুরারোগ্য ব্যাধিতে যারা মৃত্যু-পথযাত্রী তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। মৃত্যু-পথযাত্রীদের সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি সম্পর্কে শত-শত গল্প এই মেয়েটির কাছে জমা হয়ে আছে। মন দিয়ে শুনলে অবশ্যই একটা বই হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের মুহূর্তে মানুষ কী রকম অসহায় হয়ে পড়ে তা বিস্তারিত ভাবে জানলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন বোধহয় অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

প্রশান্ত বসু বললেন, তাঁর বউমার আর একটি শখের কাজ আছে। বিষয়টি হলো বউ-পেটানো।

"হাঁউ-মাউ-খাঁউ—গল্পের গন্ধ পাঁউ!" আমি নিজের ঔৎসুক্য চাপা দিতে পারলাম না।

রঞ্জনা বললো, সে একটা 'ব্যাটার্ড' উইমেন্‌স্ হোম-এর সঙ্গে অবৈতনিকভাবে যুক্ত।

"বউ-পেটানোর কথা তো কেবল আমাদের দেশেই শোনা যায়।"

"মোটেই নয়—এদেশেও বউ-পেটানোর রেওয়াজ আছে। ব্যাপারটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ঘর ছেড়ে মেয়েরা এসে এই হোমে সাময়িক আশ্রয় নেয়।"

শুনলাম, এক ভদ্রমহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্‌স্ হোম চালু হয়েছে।

"যারা বউকে মারধোর করে তারা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত না নিম্নবিত্ত?"

রঞ্জনা বললো, "আমরা যাদের পাই তারা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত। কিন্তু তা বলে ভাববেন না উঁচু মহলে এই রোগটা নেই। বহু মেয়েই মার খেয়েও মুখ বুজে সহ্য করে, কারণ ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাবে? মধ্যবিত্তরা তেমন বিপদে পড়লে, বাবা-মা অথবা বান্ধবীর সাময়িক আশ্রয়ে চলে যায়—হোমে উঠতে তাদের লজ্জা লাগে।"

এই মারধোর কেন হয় তা বলা শক্ত। অনেকে নেশার ঘোরে বউকে মারধোর

করে, পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। কুশিক্ষাও কিছুটা দায়ী। মেয়েরা যেহেতু দুর্বল সেহেতু তাদের হাতে পাল্টা মার খাবার সম্ভাবনা কম। আজকাল অনেক মেয়েই তাই আত্মরক্ষার বিদ্যা, যেমন ক্যারাটে ইত্যাদি শিখছে।

বউ-পেটানো রোগটা কানাডায় কমের দিকে নয়—ক্রমশই বাড়ছে। মেয়েদের প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হচ্ছে!

রঞ্জনা জানতে চাইলো, মদ্যপ বেয়াদপ স্বামীর হাতে মার খাবার পরে আমাদের দেশে কী হয়?

আমি চুপ করে রইলাম। কারণ, আমি জানি, হঠাৎ বিপদে পড়লে মেয়েদের কোথাও আশ্রয় নেবার উপায় নেই আমাদের দেশে। ঘর ছাড়লে বিপদ অনেক বেশি। হয়তো সোনাগাছিতে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হবে। তাই আমাদের কলকাতার মেয়েরা মুখ বুজে শক্তিমান স্বামীর সব অত্যাচার সহ্য করে, অথবা শরীরে কেরোসিন ঢালে, অথবা বিষ খায়।

যে-মহিলার দানে এই ব্যাটার্ড উইমেন্‌স্ শেলটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শুনলাম তিনি নিজেও স্বামী কর্তৃক বারংবার নিপীড়িতা হয়েছিলেন। পতিবিড়ম্বিতা ধনী মহিলারা এদেশে সমস্ত বিত্ত তান্ত্রিক অথবা ঠাকুরের পায়ে ঢেলে দেন, কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা তাঁদের মনে আসে না।

রঞ্জনা বললো, স্বামী খারাপ হলে মেয়েদের উভয় সংকট। অত্যাচার তো আছেই তার ওপর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা। অনেক মেয়ে শারীরিক নিগ্রহ সত্ত্বেও যে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না তার কারণ ওই ছেলেপুলে। সমস্ত জীবন ব্যাটার্ড শেলটারে যে থাকা যায় না তা মেয়েরা ভালভাবেই জানে।

"অনেকে আবার আশা করে বসে থাকে স্বামীর এই বদ-অভ্যাস একদিন কেটে যাবে। কিন্তু আমরা দেখছি, যে-সব মেয়ে বিনা প্রতিবাদে মার হজম করে তারা আরও বিপদে পড়ে যায়, স্বামীর নিষ্ঠুরতা তারা আরও বাড়িয়ে দেয়।"

রঞ্জনার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ অথচ ইস্কুল মাস্টার স্বামী প্রদীপ বসু এবার আমাদের আড্ডায় যোগ দিলো। প্রদীপ আবার একজন চৌকশ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে কানাডার হয়ে চীনের বিরুদ্ধে খেলেছে।

প্রদীপ ইংরিজীতে বললো, "মধ্যবিত্ত বাড়িতেও স্ত্রীদের যে মারধোর করা হয় তা আমরা ইস্কুলে ছোটদের কাছ থেকে খবর পাই। আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন, যারা একটু মানসিক প্রতিবন্ধী, যারা অন্যের তুলনায় একটু বোকাসোকা তারাও বাবার হাতে নিগৃহীত হয়। এদের সম্বন্ধে কারুর কারুর যেমন সীমাহীন

ভালবাসা তেমনি অনেকের আবার সীমাহীন অবহেলা। আমরা অবশ্য এদেশে কোনো অত্যাচারই মেনে নিতে প্রস্তুত নই। তাই আমরা এইসব অভাগা ছেলেদের শেখাই, কী তাদের আইনগত অধিকার, কোন কোন অবস্থায় তারা পুলিশের শরণাপন্ন হতে পারে। বাপের বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুব খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এদেশে প্রায়ই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে অন্য কোনো উপায় থাকে না।"

তথাকথিত গবেট ছাত্রদের পড়াতে কেমন লাগে জানতে চাইলাম। প্রদীপের ধারণা, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং ইস্কুলের সুবিধের জন্যে কাউকে গবেট অথবা কাউকে অসাধারণ চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ একবার গবেট বলে কেউ চিহ্নিত হলে সে সারাজীবন ঐ গ্লানি বহন করবে এবং তার পক্ষে ঐ গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

প্রদীপ বললো, "ওরা যদি বুঝতে পারে আপনি ওদের ওপর করুণা করছেন তাহলে আরও মুশকিল। আমরা তাই ওদের অনুপ্রেরণা জোগাই, ওদের ভিতরে যে ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। যখন সাফল্য আছে তখন খুব ভালো লাগে।"

শুনলাম প্রদীপ এবার থেকে তথাকথিত 'এক্সেপশনাল' ছেলেদের দায়িত্ব নেবে। সুরসিক প্রদীপ বললো, "এদের সমস্যা গবেটদের থেকে বেশি বই কম নয়। এদের প্রধান সমস্যা যে ভগবান এদের মগজে বাড়তি মাল দিয়েছেন।"

প্রতিভাবান বলতে কাদের বোঝানো হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রদীপ জানালো, "যাদের আই-কিউ ১৪০-এর বেশি। কিন্তু মনে রাখবেন, আই-কিউ বেশি মানুষরাই শেষ পর্যন্ত জীবনে চরম সাফল্য অর্জন করে না। কিছুদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামকরা একদল মানুষের সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে এদের মধ্যে ১৪০ প্লাস আই-কিউ-এর সংখ্যা নেই বললেই চলে।"

ছোট ছেলেরাও সব সময় এই বিশিষ্ট তার ছাপ উপভোগ করে না। তাদের ওপর নানা বাড়তি দায়িত্বের বোঝা চেপে যায়। মাস্টারমশাইদের এবং অভিভাবকদের অত্যধিক প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে ছোট বয়সের অনেক ছোটখাট আনন্দ ওদের বিসর্জন দিতে হয়।

আসলে, বিশিষ্টতার ছাপ দিয়ে সাধারণ ক্লাস থেকে এদের বের করে দেবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ক্লাস টিচারের। কারণ ; এরা প্রায়ই টিচারের থেকে বেশি জানে এবং কেউ কেউ সুযোগ পেলেই মাস্টারকে সবার সামনে বেকুব বানায়। হয়তো কোনো সমস্যা উঠলো। দেখা গেলো, অন্যদের মাথায় সমস্যাটা ঢোকবার আগেই তারা উত্তর ঠিক করে বসে আছে। ফলে, ক্লাসে অন্য ধরনের সমস্যারও সৃষ্টি হয়।

মৃত্যু-পথযাত্রীদের কথা উঠলো। আমার জানাশোনা এক বাঙালি মহিলা রঞ্জনার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে প্রায় ভেঙে পড়েছিলেন। রঞ্জনা বললো, "কত রকমের মানুষ দেখি। কেউ আসন্ন মৃত্যুকে মেনে নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে। কেউ বিদ্রোহ করে, না আমার তেমন কিছু হয়নি। কেউ-কেউ এই সময় ব্যক্তিগতভাবে সমাজসেবিকার সাহায্য চান।"

এক ভদ্রলোকের এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, কিন্তু ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিন মুখ দেখাদেখি নেই। ব্যাধি দুরারোগ্য জেনে এই ভদ্রলোক ছেলের সঙ্গে মিটমিট করতে চাইলেন। রঞ্জনা বললো, "ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আমরা। অনেক কষ্টে সব বুঝিয়ে তাকে হাসপাতালে আনা হলো। চোখের জলের মধ্যে পিতা-পুত্র মিলন হলো, দেখে খুব ভাল লাগলো।"

রোগ সারবে না জেনে অনেকে নিজের বাড়িতে ফিরে সেখানেই মরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না। বাড়িতে চিকিৎসা হবে কী করে? সেবা করবে কে? অসুস্থ মানুষকে দেখবার মতন সময় এখানে কারও নেই। এইটাই আমাদের সভ্যতার অদ্ভুত দিক। আমরা নিজেরাই সর্বনাশা ব্যস্ততায় নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়েছি।

রঞ্জনা বললো, "মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানার পরে কারুর-কারুর মধ্যে অতীতের অন্যায় অথবা ভুল সম্পর্কে গভীর অনুশোচনা দেখে যায়। একজন ডাইভোর্সড্ রমণী চোখের জল ফেলে বললেন, 'কেন ওকে আমি ডাইভোর্স করেছিলাম। দোষটা তো পুরোপুরি আমারই।' তখন একটু সান্ত্বনা দেওয়া, ধৈর্য ধরে কথাবার্তা শোনা, ছোটখাট, মন্তব্য করা, কাউকে কাছে আনার চেষ্টা করা—এই সবই সমাজসেবিকার কাজ।"

এই বিষয়েই রঞ্জনা পি-এইচ-ডি করবে। রঞ্জনার বাবাও একজন পি-এইচ-ডি—তিনি বেল টেলিফোন ল্যাবে গবেষণা করেন, থাকেন ওটাওয়াতে।

প্রশান্ত বসু বললেন, "আমরা বউমাকে কখনও বকাবকি করি না। তার কারণ চার বছর বয়সে প্রথম যখন ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল তখন বলেছিল, যদি তোমরা আমাকে বকো তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে চলে যাবো, আর কখনও আসবো না।"

"বিয়েটা আমাদের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদেশে তো বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে। আমাদের ভাগ্য ভাল ওরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করলো।"

প্রশান্ত বসু বললেন, "রঞ্জনা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান—কোনো ভাই-বোন নেই।"

এই কথা শুনেই রঞ্জনা হাঁ হাঁ করে উঠলো এবং শ্বশুরের ব্যক্তব্যের প্রতিবাদ জানালো। "নো, আমার একটা ভাই আছে।"

প্রশান্তবাবু এবার হেসে ফেললেন, "ভুল হয়ে গিয়েছে। ওটাওয়াতে ওর একটা ভাই আছে—ডগ ব্রাদার। ওই কুকুরটা ওর বাবা-মায়ের খুব প্রিয়।"

বিদায় দেবার আগে প্রশান্ত বসু বললেন, "একটা পর্বে রঞ্জনা ও প্রদীপ দু'জনেই ভয় দেখিয়েছিল, বিয়েটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। জোর করে কিছু ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ফল খুব খারাপ হবে। আমরা তাই বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। তারপর ওরা আমাদের খুব সারপ্রাইজ দিলো। ওরা জানালো ওরা বিয়ে করতে রাজি যদি একটা বিশেষ দিনে ওদের বিয়ে হয়। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের খেয়াল-খুশি, আমাদের রাজি হওয়া ছাড়া উপায় কী? তখন ওরা বললো তারিখটা হবে আঠারই নভেম্বর। ওইদিনে আমাদের কর্তা গিন্নীর বিয়ে হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে।"

"ওদের রসিকতাবোধ দেখে আমরাও খুব মজা পেলাম।" বললেন রেবা দেবী।

সুরসিক প্রদীপ সঙ্গে-সঙ্গে বললো, "মোটেই রসিকতা নয়—বছরের পর বছর এক খরচে দুটো বিবাহ বার্ষিকী সেলিব্রেশনের জন্যেই কিপ্টে পরিবারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত।"

কানাডার মায়া কাটিয়ে টরন্টো বিমান বন্দর দিয়ে আবার ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে ফিরে এসেছি। টরন্টো বিমান বন্দরে ওই ভোরবেলায় নীলাদ্রি চাকী উপস্থিত ছিল। নীলাদ্রির মনটি বড় কাব্যিক, অতি সহজে মানুষকে আপন করেও নিতে পারে। বললো, "বড্ড কম সময় থাকলেন কানাডায়। কয়েকটা মাত্র দিনে এমন একটা দেশ সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় না।"

আমি নীলাদ্রির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তবে টরন্টোয় ভারতীয় সমাজ আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁরা শুধু আমাকে সভা করে অভিনন্দন জানাননি, পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন নানা বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। যত লোকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যোগ করলে অনায়াসে চার-পাঁচশ বছর হয়ে যাবে! এঁরা আমার কোনো প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি, আমাকে সব রকমের খবর সংগ্রহ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। কানাডা

প্রবাসী বাঙালিদের এই উদার প্রসন্নতার ঋণ আমি এই জন্মে হয়তো শোধ করতে পারবো না।

মিছরিদা মাথায় একটি টুপি চড়িয়ে, এস্কিমো স্টাইলের সাজসজ্জায় টরন্টো এয়ারপোর্টের ডিপার্চার গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি রসিকতা করলেন, "বাঙালি স্টোরি-রাইটারদের ওপর ভরসা রাখবেন না, মিস্টার চাকী। এতো যত্ন করে মানুষ্যত্বের জয় দেখালেন আপনারা কিন্তু উনি হয়তো হাওড়া কাসুন্দেতে ফিরে গিয়ে লিখে বসলেন প্রেমের গপ্পো। মেয়েমানুষের বিয়ে হলো কি হলো না, এই সাসপেন্সের ওপর ভরসা করেই আমাদের লেখকরা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান! অথচ আমার বক্তব্য হলো, মারো গোলি ভেতো বাঙালির পান্তা প্রেমে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কোন কালে দুঃখ করেছিলেন, 'বাঙালি সবসময় অবস্থার অধীন, অবস্থা কখনও বাঙালির অধীন হয় না!" কথাটা কানাডায় বাঙালিরা বঙ্কিমের প্রায় একশ বছর পরে ভুল প্রমাণ করলো, এইটাই লেখার বিষয়।"

নীলাদ্রি রসিকতা করলো, "শংকরদা, আপনি দুটোর সমন্বয় করে একটা কিছু লিখুন। ছেলে-মেয়ের বিয়ে উত্তর আমেরিকার বাঙালিদের অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ। দেশের আত্মীয়রাও মেয়ের যোগ্য পাত্র সন্ধানের জন্যে আমাদের কাছে প্রায়ই চিঠি লেখেন। এই বিষয়ে যদি কোনো বই, ধরুন—'গাইড টু গুড ম্যারেজ ওভারসীজ' অথবা 'প্রবাসে প্রজাপতি নির্বন্ধ'—লেখেন তাহলে বহুজনপঠিত হবার সম্ভাবনা প্রবল।"

মিছরিদা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। "যদি ও খেটেখুটে এই বিষয়ে কিছু খাড়া করে তাহলে আমি সে-বইয়ের ভূমিকা লিখবো। বিয়েথার ব্যাপারে বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়—অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না যদি না একজন নির্ভরযোগ্য লোকের মুখবন্ধ থাকে।"

"মিছরিদা, আপনার ভূমিকা? প্রথম দিনেই তিন হাজার কপি বিক্রি কে আটকায়? প্রকাশকও জুটে যাবে চটপট! প্রকাশক ভয় পাচ্ছিল, স্বদেশের সদানিন্দিত বাঙালিরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে রাজি নন। যাঁরা চান্স পেলে নিজেরাই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন, কোন দুঃখে তাঁরা ভ্রমণকাহিনী পড়বেন?"

নীলাদ্রি বললো, "আপনি প্রথমে বাংলাতেই বইটা লিখে ফেলুন, তারপর এখানে বড়-হয়ে-ওঠা কোনো মেয়েকে দিয়ে ইংরিজি অনুবাদ করিয়ে নেবো—বিশ্বস্বত্ব সংরক্ষিত রাখবেন। আপনি অ্যানথ্রপলজির অধ্যাপক অজিত রায়ের কুমারী কন্যা আজালিয়ার সঙ্গে তো বিয়ের ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা বলেছেন। ওকেই অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া যাবে!"

এরোপ্লেনে সমস্ত পথ মিছরিদা এই ম্যারেজ হ্যান্ডবুক সম্বন্ধে নানা মূল্যবান মন্তব্য করলেন। "ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিস না—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

ইন্ডিয়ায় এবং বাংলাদেশে কত মেয়ের বাবা-মা যে গ্রীনকার্ড-জামাইয়ের জন্যে ছটফট করছে :' তো জানিস না। সাগর-ছেঁচা জামাই পেলে সহকর্মী এবং আত্মীয়মহলে প্রেস্টিজ তুঙ্গে উঠে যায়।”

মিছরিদা এদের মধ্যে কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছেন না। বাঙালির যখন দিনকাল ভাল ছিল তখন নিজের অপরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছেলের মধ্যে পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখতেন, এখন স্বদেশের বাঙালি পুরুষ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ধাপে-ধাপে নেমে যাচ্ছে তাই বাপ-মায়ের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার একমাত্র সুযোগ মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে। সাগর-ছেঁচা জামাই কথাটা বড্ড আনন্দের।

মিছরিদা বললেন, “কানাডায় দেখলাম, বাঙালি পুরুষদের তুলনায় দেশ থেকে আসা বাঙালী মেয়েরা অনেক উচ্চশিক্ষিতা। কারণ এঁদের বাবারা ভাবী জামাইয়ের কানাডিয়ান ডলারকে দশ দিয়ে গুণ করে দেশী টাকায় রূপান্তরিত করে মাথা খারাপ করে ফেলেছিলেন।”

“সবচেয়ে মুশকিল হয় প্রবাসী ছেলের স্থানীয় বাপ-কাকাদের নিয়ে। এক ভদ্রলোক তো বিরাট গর্ব করে পাত্রীর পিতাকে বলেছিলেন, ‘আমার ছেলে এতো ব্রিলিয়ান্ট যে, খোদ কানাডা সরকার তাকে বাড়িতে বসিয়ে-বসিয়ে হাজার হাজর টাকা দিচ্ছেন ব্রেন খাটাবার জন্যে।’ মেয়ের বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, বিয়ে হলো খিদিরপুরে। তারপর এবারে এখানে এসে খোঁজখবর নিয়ে দেখি জামাতাবাবাজীর চাকরি নেই—এখানে সরকারী বেকারভাতায় আছেন! সুতরাং বাছা, লোককে সাবধান করে দিও, সাগর ছেঁচলে যেমন অমৃত ওঠে তেমন গেঁড়িগুগলিও কপালে থাকতে পারে।”

সব চেয়ে দুঃখ লাগে মেয়েদের জন্যে। বিদেশে কেরিয়ারের লোভে যাকে-তাকে বিয়ে করে বিদেশে এসে সারা জন্ম ধরে ভোগান্তি সহ্য করছে। দেশের ডাক্তার এদেশে এসে যে প্রায়ই স্থানীয় লাইসেন্স পায় না এবং বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করে তা আমরা স্বদেশে বসে জানতে পারি না। এই নিরাশায় অগ্নিকুণ্ডে দেশ-থেকে-আসা পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার দুই পাবেন। পুরুষরা এসেছে বিদেশে-লালিতা ভারতীয় মেয়ের গ্রীনকার্ডের জোরে, আর মহিলারা এসেছে ইমিগ্রান্ট স্বামীর লাগেজ হিসেবে। এই সব পুরুষ ডাক্তার কানাডা অথবা আমেরিকায় নাইট দারোয়ানের কাজ করছে, ডাইং ক্লিনিং-এ ময়লা জামাকাপড় পরিষ্কার করছে, মুদিখানা দোকানে মাল তুলছে। কোনো কোনো গ্রীনকার্ডধারিণী বাঙালিনী ধৈর্য হারিয়ে তাঁদের স্বামীদের যথাসময়ে বিদায় করে দিয়েছেন। একটি ক্ষেত্রে তা তো হাতাহাতি। আর একটি ক্ষেত্রে স্বামীটি কলকাতায় ফিরে এসে আবার দিশী প্র্যাকটিসে মন দিয়েছেন। কম গুণের ডাক্তারবাবুদের সব রকম অপদার্থতা নীরবে মাথা নীচু করে হজম করতে ভারতবর্ষ এখনও তুলনাহীন।

কানাডা এবং ইউ-এস-এ-তে সরকার অনেক সজাগ, নিয়মকানুন অনেক কড়া, রোগীদের সহ্যশক্তিও অনেক কম। পান থেকে চুন খসলেই ডাক্তারবাবুর কোমরে দড়ি জুটতে পারে।

ক্লিভল্যান্ডে ফিরে এসেছি এদেশের বাঙালিসমাজের উদার আতিথেয়তায়। এখানকার বাঙালিরা অনেকটা যৌথ পরিবারের মানসিকতা নিয়ে বসবাস করেন। পরস্পরের প্রতি টান চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

আমার এবার রাত্রিবাস করার কথা ডঃ দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যর বাড়িতে। দিব্যেন্দুর মা শান্তিদেবী ছেলের কাছেই থাকেন। পুত্রবধূ সুমিত্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি বেশ মধুর।

এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে এসেছিলেন আর এক সুরসিক বৈজ্ঞানিক ডঃ রণজিৎ দত্ত। মিছরিদা আমাদের বইটির পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলেন। রণজিৎ দত্ত বললেন, "আমি ব্যাচেলার মানুষ। কিন্তু এই ঘটকালির ব্যাপারে, সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বহু বছর জড়িয়ে আছি। আমার অভিজ্ঞতা কপিরাইটেড হলেও, 'জাতীয় স্বার্থে আপনাদের তা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে।"

রণজিৎ দত্ত আরও বললেন, "যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় অসংখ্য হীরের-টুকরো বাঙালি ছেলে আছে। অনেক মেয়েই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিয়ে করে সোনার চাঁদ স্বামীর সঙ্গে অত্যন্ত সুখে বিদেশে ঘর-সংসার করছে। কিন্তু খোঁজখবর না করে বিয়ে দিয়েও অনেকে খুব ভুগছেন। আপনাকে ডজন-ডজন ঘটনা শুনিয়ে দেবো। তবে মনে রাখবেন, বাঙালি মেয়েরা এদেশে এসে চমৎকার মানিয়ে নিচ্ছেন, স্বামীদেবতাটি যদি অমানুষ না হন।"

দিব্যেন্দুর স্ত্রী সুমিত্রা ও মা শান্তিদেবী আমাকে মুহূর্তে আপন করে নিলেন। এদেশের ঘর-সংসার সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। শান্তিদেবী অতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, সে-যুগে রক্ষণশীল উচ্চবিত্ত পরিবারে বিবাহ সম্বন্ধে চমৎকার একটি স্মৃতিচিত্র লিখে রেখে দিয়েছেন, যা আমাকে পড়তে দিলেও উদ্ধৃতির অনুমতি দিলেন না।

শান্তিদেবী বললেন, "ভালমন্দ বুঝি না, বাবা। সায়েব-মেম, বাঙালি-অবাঙালি সকলের মধ্যে ভাল লোক দেখছি এই দেশে—তবে দু-একটা খারাপ তো থাকবেই।"

বিয়ের কথা তুলতে বললেন, "এদেশের বাঙালি ছেলেরা যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে দেশ থেকে সুলক্ষণা মেয়ে আনবে। তাতে মনোবল বাড়বে, প্রবাসের দুঃখ কমবে। এদেশের বাঙালি ছেলেদের তুমি তো দেখেছো? এরা কোন দিক দিয়ে খারাপ বলো? এদের হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে কোন বাবা-মা নিশ্চিত হবেন না?"

সেই রাত্রেই কলকাতা থেকে টেলিফোন এলো। নমিতাদি আমাকে ফোন করছেন ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে। "কিছু মনে কোরো না ভাই, বাধ্য হয়েই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমেরিকা তোমার ঘরবাড়ি, কত লোক তোমার চেনাশোনা, তোমাকে এই উপকারটুকু করতেই হবে," নমিতাদির স্বর কাঁদোকাঁদো।

নমিতাদির স্বামী মিস্টার বীরেশ্বর বাসু আমার জানাশোনা। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বিলিতি অফিসে কোভেনেন্টেড চাকরি নিয়েছিলেন। তারপর টপাটপ উন্নতি করে রিটায়ার করার আগে ডিরেক্টর হয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্যে। মিস্টার বাসুর মাধ্যমে গলফ মাঠে একবার তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। নিজেই বললেন, "বউদি বোলো না, দিদি বলো—সম্পর্কটা বাপের দিক থেকে হোক।"

বলাবাহুল্য কিছুদিন পরে নমিতাদি তাঁদের কন্যা কুমুদিনীর কথা পাড়লেন। "পড়াশোনায় খুব ভাল। ইংরিজীতে এম-এ দিয়েছে যাদবপুর থেকে। এবার একটা ভাল পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া দরকার।"

ব্যাপারটায় আমি তত কান দিইনি। কারণ, কুমুদিনী ও আমার সামাজিক স্তর এক নয়। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব সবই নিতান্ত মধ্যবিত্ত, কেউ-কেউ তাও নয়। আর কুমুদিনীর মা, মাসি, কাকা সবাই উঁচু স্তরে। এঁদের সবার মোটরগাড়ি আছে, অনেকেরই বাড়ি আছে গড়িয়াহাটা অথবা নিউ আলিপুরে। এই স্তরে ঘটকালি করার অভিজ্ঞতা আমার নেই।

তবু মিসেস বাসু অথবা নমিতাদি তাগাদা দিয়ে যান, "আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করার কথা তোমরা মাথাতেই নিচ্ছো না।"

আমিও ভদ্রতা করে বলেছি, "আপনার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, বিদুষী। গান জানে, গর্ব করার মতন বংশপরিচয়—চিন্তা কী? দেখবেন হঠাৎ একদিন বর এসে হট করে নিয়ে চলে যাবে।"

কিছুদিন আগে নমিতাদির সঙ্গে আবার দেখা। নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম কুমুদিনীর কথা। নমিতাদি বললেন, "তুমি সত্যদ্রষ্টা লোক, যা বলেছিলে তাই হয়েছে।"

ব্যাপারটা এই রকম! আচমকা হীরের-টুকরো বর পাওয়া গিয়েছে। যখন ফুল

ফোটে তখন কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, ঘটক লাগানো কিছুই প্রয়োজন হয় না। যা চেয়েছিলেন তার থেকেও ভাল জামাই পেয়ে গিয়েছেন নমিতাদি। বললেন, "যেমন বিদ্যা, তেমন রূপ, তেমন চাকরি। তোমায় কী বলবো শংকর! পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এমন ছেলে পাওয়া যায় না। মাইনে কত জানো?"

"কত?"

"একটা আন্দাজ করো, তারপর বলবো।"

"একুশশো বাইশশো?" আমি মাথা চুলকে বলে ফেললাম।

হাসলেন নমিতাদি। "না ভাই শংকর, ওই ক'টা টাকায় আমার কুমুর কী হবে— ছোটবেলা থেকে কষ্ট কাকে বলে জানে না তো। সাত-তেরো কত হয়? একানব্বুই হাজার টাকা মাইনে।"

"বছরে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"বালাই-ষাট। কোন দুঃখে বছরে হবে? মাস মাইনে।"

পাত্র যে অনাবাসী মার্কিন মুলুকবাসী তা জানতে পারলাম। নমিতাদি বললেন, "গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ারিং পি-এইচ-ডি। তার ওপর আমেরিকায় বি-রা-ট চাকরি করছে। চমৎকার বেহালা বাজায়। হাতে যেন চাঁদ পেলাম।"

চাঁদ পাবার জন্যে তড়িৎগতিতে কাজ করতে হয়েছে নমিতাদিকে। বললেন, "খবরটা পেলাম ওঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে। পাত্রের বাবা-মা ওঁদের জানাশোনা। বিখ্যাত পরিবার। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে খুব জানাশোনা ছিল। অবনঠাকুরের বইতে নাকি ছেলের কাকা এবং দাদামশায়ের উল্লেখ আছে, তুমি নিশ্চয় জানবে।" আমি বললাম, "ওসব মস্ত সোসাইটি, সবাইয়ের নামও শুনিনি।"

নমিতাদি বললেন, "আর একটু কুঁড়েমি করলেই ছেলে হাতছাড়া হয়ে যেতো। ঝড়ের মতন ব্যাপারটা এগুলো। ছেলে জরুরি কাজে দু'দিনের জন্যে ইন্ডিয়ায় এসেছিল। আসা মাত্রই বাবা-মা চারখানা মেয়ের ছবি দেখালেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনে মেয়ে দেখা শেষ হলো। চতুর্থ দিনে ছেলের বাবা-মা আবার আমাদের কাছে এলেন। সুখবর দিলেন, কুমুকেই প্যানেলে এক নম্বর রাখা হয়েছে, কিন্তু এখনই বিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা।"

এ যে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে!' কিন্তু ভেবে চিন্তে দেখার সময় নেই। নমিতাদি যদি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেন তবে সুযোগ হাতছাড়া হবে। কারণ প্যানেলের দু নম্বর ক্যানডিডেট এখনই বিয়ে দিতে রাজি আছে। পাত্রের নাম ধরুন নবারুণ মজুমদার। বাবা-মা উচ্চশিক্ষিত—প্রবাসে বড় কাজও করেছেন একসময়। বিখ্যাত এক শিল্পী স্বয়ং নাম দিয়েছিলেন নবারুণ।

নমিতাদি বললেন, "বন্ধু-বান্ধব কাউকে বলতে পারলাম না। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে বিয়ে হয়ে গেলো। এখন ছেলে বিদেশে ফিরে গিয়েছে। আমেরিকায়

উঁচু পোস্টে কামাই-টামাই চলে না। কী সুন্দর গলা জানো ভাই। প্রাণভরে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ গাইলো। তোমাকে টেপ শোনাবো, ছবি দেখাবো। কুমু এখন শ্বশুরবাড়ির খুব ন্যাওটা হয়েছে—ওঁরা এক মিনিট ছাড়ছেন না। ওর পাশপোর্ট হয়ে গিয়েছে। তোমরা চেষ্টা-চরিত্র করে যত তাড়াতাড়ি পার ওকে স্টেটসে পাঠিয়ে দাও। যাবার দিন ঠিক হলে একদিন সবাই মিলে হৈ-চৈ করা যাবে—তখন কিন্তু একলা এলে চলবে না, গিন্নীকেও আনতে হবে।"

"অতি উত্তম খবর, নমিতাদি। নতুন জামাই নিশ্চয় বউকে ঝটপট নিয়ে যাবে নিজের টানেই। ইমিগ্রেশন আইনকানুন আমার জানা নেই, আমার তো পাসপোর্টও নেই। আপনি বরং অগতির গতি সুপ্রিয় ব্যানার্জির শরণাপন্ন হোন। হার্ট অফ গোল্ড, আপনাকে নিশ্চয় সাহায্য করবে।"

এরপরে একদিন বিয়ে বাড়িতে ভিড়ের মধ্যে নমিতা ও কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি রসিকতা করেছি, "বিদেশে আটকে-টাটকে গেলে দু' একশ ডলার দিও কুমু। প্রতি মাসে বরের সাত হাজার ডলার খরচ করবে কী করে?"

নমিতাদি দুঃখ করলেন, "যাওয়ার ব্যাপারটা এগিয়েও এগোচ্ছে না। কী দেশ বাবা তোমাদের এই আমেরিকা। ধর্ম সাক্ষী রেখে বিয়ে-করা বউকেও এরা ঝট করে স্বামীর কাছে যেতে দেয় না।"

"ভাববেন না। পার্টি অফিসের মাধ্যমে রাশিয়ায় চিঠি লেখাবো, ব্যাপারটা যাতে ইউ-এস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে উচ্চতম পর্যায়ে আলোচনা করাতে।"

নমিতাদি ফিস-ফিস করে জানালেন, "ওর এক বন্ধু বলছিলেন, দরকার হলে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে মিস কুমুদিনী বসু হিসেবে একবার ওদেশে চলে যাক। প্রয়োজনে ওখানেই আর একবার বিয়ে করে নেবে।"

"অধিকন্তু ন দোষায়," আমি রসিকতা করেছিলাম।

তারপর একেবারে মাঝ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ক্লিভল্যান্ডে এই ফোন। দেশে ফিরে আসবার আগে আমাকে কিছু জরুরি খোঁজখবর নিতেই হবে, নমিতাদির কাতর আবেদন।

যে-জায়গার নামটা টেলিফোন শুনেছিলাম সেটা ম্যাপে খুঁজে বের করা গেলো। সৌভাগ্যগ্রমে জায়গাটা এখান থেকে তেমন দূর নয়। বাস সার্ভিসে চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে।

মিছরিদার সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে আমি ছুটলাম সন্ধানকারীর কাজ নিয়ে। মিছরিদাকে বললাম, "আপনি সিরাকিউজে চলে যান। খাঁটি বাঙালি সর্দার গুরণেক সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমি ওখানেই দেখা করবো।"

নতুন জায়গায় চেনাশোনা বেরিয়ে গেলো। ডাঃ উমাপতি ব্যানার্জি এবং তাঁর স্ত্রী সুনয়নী। অনেকদিন পরে উমাপতিকে খুঁজে পেলাম। পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে খুব আনন্দ। উমাপতিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি নবারুণ মজুমদারকে চেনো?"

সুনয়নী বললো, "খুব চেনে, হাড়ে-হাড়ে চেনে। কিছুদিন আগে দেশে গিয়ে বিয়ে করে এসেছেন। তারপর এখান থেকে আমাদের জ্বালায় সরে পড়েছে।"

"তা তুমি ওর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কী করে? মেয়েটি তোমার আত্মীয়-টাত্মীয় নয়তো?"

"মোর দ্যান আত্মীয়।" আমাকে বলতে হলো।

উমাপতি তারপর যা খবর দিলো তাতে আমার মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। উমাপতি বললো, "ছোটবেলায় বৈঠকখানা বাজারে সুন্দর সুন্দর আপেল আসতো, কিন্তু প্রত্যেকটাতেই পোকা। এই সোনার দেশে এসে সোনার চাঁদ কিছু ছেলের গায়ে পোকা ধরে যায়, ভাই।"

নবারুণ মজুমদার-এর সব ব্যাপার উমাপতির জানা। "ভারী মিষ্টি স্বভাবের ছেলে, কিন্তু ওই আপেলে পোকা। বিলেতে গ্লাসগোতে যখন পি-এইচ-ডি করে তখনই জানতাম। তারপর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ওঁরা এখানে বেড়াতে এসেছেন। বিখ্যাত পরিবার।"

"তা হলে গোমলামটা কোথায়?"

নবারুণের গায়ে পশ্চিমের হাওয়া লেগেছে, ভাই। ডেটিং করতে তুখড়। মেয়েদের মন পটাতে এক্সপার্ট, বিলিতি নাচে গানে একেবারে চৌকশ খেলোয়াড়। গ্লাসগোতেই ও লুশিয়া বলে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়েটা টিকলো না। ইংলন্ড থেকে আমেরিকায় চলে আসার এটা একটা কারণ।"

"তা নবারুণ এখানে এলো। খুব ভাল চাকরি পেলো। বাবা-মা এদেশে এলেন, বললেন, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ে করো। নবারুণ হাঁ না কিছুই বললো না, আমরাও নাক গলালাম না, যদিও আমরা জানতাম, সে মাঝে-মাঝে বাড়িতে গার্ল ফ্রেন্ড আনে। যেসব পুরুষ কৃতী, যাদের রোজগার অনেক, আমেরিকান মেয়েরা তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না কিছুতেই। পুরুষ নির্বাচনের ব্যাপারে ডলারের প্রভাব মেয়েদের মনের মধ্যে প্রায়ই থেকে যায়।

"ডায়না বলে একটি গার্ল ফ্রেন্ড প্রায়ই ওর কাছে আসতো। নবারুণ তাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল একবার। আমরা তখন ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করিনি।

"তারপর সেবার নবারুণ দেশে গেলো। দিন আষ্টেক পরে ফিরে এলো এবং আমাদের চারটে মেয়ের ছবি দেখালো। বললো, উমাপতিদা, এদেরই একজনকে

বিয়ে করে এলাম।”

নবারুণ বললো, “কী করে বউকে এদেশে আনা যায়, মাথা ঘামাতে হবে।”

“তারপর বেশ কিছুদিন কাটলো। ইতিমধ্যে ডায়নার সঙ্গে কেটে যাওয়া প্রেমটা আবার গজিয়ে উঠেছে। নবারুণ একদিন বললো, আমি খুব দুঃখিত উমাদা, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আমার সেকেন্ড থট্‌স হচ্ছে বাবা-মা কেন যে আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে গেলেন।

“ছেলেমানুষী কোরো না, নবারুণ বিয়েটা অত হাল্কা জিনিস নয়,” উমাপতি বকুনি দিয়েছিল।

নবারুণ বললো, “অনেক ভেবে-চিন্তেই আমি কুমুদিনীকে চিঠি লিখে দিয়েছি, এই বিয়েটা নাকচ করে দাও।”

তারপর থেকেই প্রচণ্ড উত্তেজনা চলেছে। নবারুণের বাবা-মায়ের ধারণা, আগের বিয়ের ব্যর্থতায় ওর মনে একটা ভীতি এসেছে। ও ইচ্ছে করেই নতুন বিয়েটা নষ্ট করতে চাইছে না, একটা ফিয়ার কমপ্লেক্স ওর মধ্যে কাজ করছে। ছেলে অথচ বাপ-মায়ের কোনো চিঠিপত্তরের উত্তর দিচ্ছে না।”

উমাপতি বললো, “তোমরা কী রকম গার্জেন! আমেরিকায় ব্রিলিয়ান্ট ছেলে দেখে মোহিত হও, কোনো খোঁজখবর করো না।”

“নবারুণের বাপ-মাও তেমনি। একটা নিষ্পাপ মেয়ের সর্বনাশ করে তাঁরা ছেলেকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ ফিরিয়ে আনবার এক্সপেরিমেন্ট করলেন।”

“আসলে, নবারুণ তখন আবার ডায়ানার মন ও শরীর নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।”

উমাপতির স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললো, “এই হলো এখানকার সংস্কৃতি—কেমিক্যাল কালচার বলতে পারেন—এদের মনুষ্যত্ব নেই।”

“নবারুণ বলে কী জানেন, কুমুদিনীকে দেখে আমি আকর্ষণ বোধ করিনি। চাপে পড়ে—আন্ডার ডিউরেস বিয়ে করেছি। আমি ভুল করে কিছুক্ষণের জন্যে বাপ-মায়ের ওবিডিয়েন্ট সন্তান হয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আমি চিন্তা করেছি, নিজের ভুল বুঝেছি। ডায়নার সঙ্গে আমার একটা চমৎকার সমঝোতা রয়েছে—মনের মিল।”

“বাজে-বাজে বোকো না, নবারুণ,” বকুনি দিয়েছে উমাপতিগৃহিণী। “ওই যে মনের মিলটিল শুনছেন, সব ধাপ্পা। স্রেফ শরীরের আকর্ষণ। এতো বড়ো আস্পর্ধা, বলে কিনা, কুমুদিনী যদি হুট করে এদেশে চলে আসে তাহলে আমাদের ভাই-বোনের মতন থাকতে হবে।”

সুনয়নী : “দেখো নবারুণ, এতো বড় অপমান তুমি কোনো মেয়েকে করতে পারো না। এসব কথা যদি ওর কানে যায়, তাহলে ওর পায়ে ধরলেও ও তোমার

কাছে আসবে না।"

উমাপতি বললো, "আমি গতকালই ওর বাবাকে চিঠি লিখেছি, ফিয়ার কমপ্লেক্স বলে মোটেই মনে হচ্ছে না। নবারুণ নিজে যদি বিয়েটাকে রক্ষে না করতে চায় তাহলে কেউ-ই সাহায্য করতে পারবে না।"

বাপ-মা ভয় দেখাচ্ছেন, "ও যদি এইভাবে কুমুকে পুকুরে চুবিয়ে দেয় তাহলে আমরা কোনোদিনই ওকে ক্ষমা করতে পারবো না—ওকে সন্তান হিসেবে মেনে নিতেও আমাদের অসুবিধে হবে।"

সুনয়নী রেগে উঠলো। "মুখের ওপর কী বলে, জানেন? বিয়ের পরের দিনই চলে এসেছি—কুমুদিনীর সঙ্গে দেহসংসর্গ হয়নি, বিয়েটা যখন কনজিউমেটেড হয়নি তখন আমি যতোটা পারি আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।"

সুনয়নী তখন নবারুণকে বলেছিল, "বৃথাই তোমার ভারতবর্ষে জন্ম—মেয়েদের তুমি কিছুই বোঝোনি। আর তোমার মতো, আজেবাজে বাঙালির কথা আমি কানে শুনেছি, কিন্তু চোখের সামনে এমনভাবে কখনও দেখিনি।"

উমাপতি বললো, "এর পরেই নবারুণ এই শহর ছেড়ে অন্য এক শহরে চলে গিয়েছে। ডায়ানাকেও বোধহয় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। এর পরে তুমি কী কথা বলতে চাও? কুমুদিনীর অপমান ছাড়া কী আর পাবে?"

আমি বুঝছি নমিতাদি তবু জানতে চাইবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিনা। অগত্যা রাত এগারোটা নাগাদ নতুন শহরে ফোন করলো উমাপতি। যা অশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই—এক বিদেশিনী মহিলা ফোন ধরলেন, মনে হলো সুখশয়নে বাধা পড়েছে। এরপর নবারুণ ফোন ধরলো, কুমুদিনীর কথা শুনে আমতা-আমতা করতে লাগলো, ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাড়তি টাকা দিতে চাইলো। তারপর বললো, আগামীকাল ফোন করবে।

পরেরদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। সুনয়নী বললো, "ফোন আসবে না। এরা কী মানুষ!"

উমাপতি বললো, "দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিও, এদেশে কিছু-কিছু বিয়ে ভীষণ ডেনজারাস্। না দেখে-শুনে, স্রেফ পাত্রের বাপ-মায়ের সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করে কেউ যেন এদেশে মেয়ের বিয়ে না দেয়।"

সুনয়নী সুরসিকা। বললো, "লোকভয় কথাটা এদেশের ডিকস্‌নারিতে নেই। তাই আমাদের দেশের কিছু ছেলেও এখানে এসে উচ্ছন্নে যায়। ওর হাসপাতালের কথাটা শুনুন। মার্থা এবং জন বিয়ে না করেই এক সঙ্গে থাকতে শুরু করলো—এই ছোটলোকের দেশে তার নাম হলো লিভিং টুগেদার। কিছুদিন পরে উৎসব হলো—আমাদের সাধভক্ষণের মতন এখানে হয় 'বেবি শাওয়ার'।

লজ্জার মাথা খেয়ে বন্ধুবান্ধবদের ডাকলো, তারা গিফ্‌ট দিয়ে এলো। আরও কিছুদিন পরে জন নিজমূর্তি ধারণ করলো। সে মার্থার রোজগারে বসে-বসে মদ খায়, কাজ করে না। আর সহ্য করতে না পেরে মার্থা ওকে তাড়িয়ে দিলো। তারপর একদিন জন বাড়ির ছাদ ফুটো করে ভিতরে ঢুকে ছেলের সামনে পুরনো গার্লফ্রেন্ডকে রেপ করেছে। মার্থার কপাল কেটে দর দর করে রক্ত পড়েছে। পুলিশ এলো, জন ধরা পড়লো। আদালতে জেল হলো দু'বছরের। এই ক'দিন আগে মার্থার সঙ্গে দেখা হলো। আগে নাদুসনুদুস ছিল। এখন একটু স্লিম হয়েছে। কী ব্যাপার মার্থা?" জিজ্ঞেস করতে মেয়েটা নির্লজ্জের মতন বললো, রোগা হচ্ছি, একজন বয় ফ্রেন্ড তো প্রয়োজন। মেয়েদের ওজন একটু বেশি হলে আজকাল কোনো পুরুষমানুষ তার দিকে তাকাতে চায় না।"

সুনয়নী বললো, "এদের কলেজের প্রফেসর ডিক কানিংহাম। বউ, দুটি ফুটফুটে ছেলে। সেইসব ছেড়ে ল্যাবের নার্স নর্মার সঙ্গে ভিড়লো। নর্মার তিনটি বাচ্চা—এখন দু'জনে সমাজের মুখে ছাই দিয়ে লিভিং টুগেদার। এই তো সমাজের অবস্থা। অথচ যখন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে কেউ দাঁড়াবে, তখন সুখী দাম্পত্যজীবনের জয়গান গাইবে। টেলিভিশনে বলবে, স্বামী-স্ত্রী সন্তান-সন্ততির সংসারই হলো আমেরিকান জীবনের মেরুদণ্ড। ডাহা মিথ্যে কথা। যারা এত অপরিণতবুদ্ধি, যাদের ব্যক্তিজীবনে এতো বঞ্চনা তাদের হাতে দুনিয়ার ভার দেবে কী করে? কোটি-কোটি মানুষের জীবনমরণের দায়িত্ব এদের হাতে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।"

উমাপতি বেশি কথা না বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলো। সুনয়নী বললো, "ওই নবারুণকে আর কখনও আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন কোরো না। ওকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম খেতে বোলো, কারণ ওর মেরুদণ্ডটা এদেশে এসে বেঁকে গিয়েছে।"

সুনয়নীর বক্তব্য, এদেশের বিষাক্ত পরিবেশে পড়ে অনেক ভারতীয়ও মূল্যবোধ হারিয়ে নির্লজ্জ ব্যবহার করেছে। "ওর কলেজবন্ধু দেবকান্ত দাশকে দেখুন না। আর-জি-কর-এ ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়বার সময়ে বিয়ে করল ধনী পরিবারে। শ্বশুরের পয়সায় এদেশে পড়তে এলো। দেশে একটা বাচ্চা ছিল—অথচ এখানে আমরিকান মেয়ে নিয়ে, কোরিয়ান মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করে বেড়িয়েছে। শুনেছিলাম এক হাসপাতালে ফরাসি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে। তা আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেবকান্ত দাশের দেখা হয়ে গেল এক ডাক্তারি কনফারেন্সে। এতো বড় আস্পর্ধা, বলে কিনা চল আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আপনার বন্ধুর তো ফিঁয়াসকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ। ভদ্র মহিলার বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ, সঙ্গে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে, তাকেও এনেছেন।

আপনার বন্ধু তো ভেবেছিল, এই কমবয়সী মেয়েটির সঙ্গেই দেবকান্তর ভাবসাব।”

উমাপতি জিজ্ঞেস করেছিল, “তোর দেশের বউয়ের খবর কী?”

দেবকান্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, “এখনও দুরারোগ্য আমাশয়ের মতন পিছনে লেগে আছে। শাশুড়ি ভয় দেখাচ্ছে, জব্দ করবে।”

“এই লোকটির সঙ্গে আপনার বন্ধুর আবার দেখা হয়েছিল কয়েক বছর পরে। তখন নির্লজ্জের মতন বললো, ‘টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার ওল্ড চিক-এর সঙ্গে একটু ভাব-ভালবাসা হচ্ছে।’ আগেকার বুড়িকে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ওকেই বিয়ে করেছে। শেষ যা খবর পাওয়া গিয়েছে ওদের একটি ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে।”

নরনারীর অবাধ দেহমিলন থেকে যে যথেচ্ছাচারী সমাজ পশ্চিমে আজ দুর্জয় শক্তিতে প্রভুত্ব করছে তার সম্বন্ধে আমি মন খুলে আলোচনা করেছিলাম নিউ ইয়র্ক স্টেটের সিরাকিউজ শহরে কার্ডিওলজির অধ্যাপক ডঃ শক্তি মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এবং ক্লিভল্যান্ডে সমাজসেবার প্রখ্যাত ডঃ প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রণব যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তার নাম কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি।

শক্তি আমাদের সমবয়সী—এদেশে স্থায়ী বসবাস করার আগে পূর্ব জার্মানি ও ইংলন্ডে প্রভূত সামাজিক এবং ডাক্তারী জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। শক্তি-গৃহিণী জ্যোৎস্না সিরাকিউজের ভারতীয় তরুণদের অভিভাবিকার মতন। তার বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব সরস্বতী পুজো লেগেই আছে। শক্তি-গৃহিণী জ্যোৎস্নার মতে, “এদেশে মানুষ সেল্‌ফমেড এবং আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজদেহের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে। শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিচরিত্রের একটা সম্পর্ক আছে ভাবতাম। কিন্তু এদেশে এসে দেখলাম ব্যাপারটা ভুল।”

শক্তি বললো, “আঠারো বছরের মধ্যে প্রায় সব ছেলেমেয়ের যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে—ডেটিং মানে তো দু'তিন বারের দেখাশোনার মধ্যেই বিছানায় শুতে হবে।”

শক্তির বাড়িতে খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কুমার আশুতোষ বললেন, “এই পরিবেশেও ভারতীয় মেয়েরা স্বদেশ থেকে এসে আদর্শ স্থাপন করছে। সে শুধু বধূ নয়, গৃহবধূও বটে—অর্থাৎ এক অঙ্গে শতরূপ। যিনি মিসেস তিনিই অন্নপূর্ণা,

ধোপানী, মেথরানী, ধাইমাতা, সারথিনী এবং বাজার-সরকার! এর পরেও যখন অর্ধেক ইন্ডিয়ান মহিলা অর্থোপার্জনের জন্যে কাজ করতে বেরোন তখন প্রশংসা না করে পারা যায় না।"

সার্জারির অধ্যাপক ডাঃ তুষার রায় বললেন, "মুশকিল হলো, ডলারের ঔদ্ধত্য সীমাহীন। মিথ্যে কথা বলাটা এখানকার এক শ্রেণীর আমেরিকান সূক্ষ্ম আর্টের স্তরে নিয়ে গিয়েছে। এরা সব সম্পর্ক, এমনকি স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কও ডলার দিয়ে হিসেব করতে শিখেছে। স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আলাদা আলাদা হিসেবপত্তর। ছেলেমেয়ে স্ত্রী কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। পার্থিব সুখ অঢেল হলেও তাই কোথাও অসীম শূন্যতা থেকে যাচ্ছে। মার্কিনিরা কিছুতেই স্পিরিচুয়াল সন্তুষ্টি পাচ্ছে না। তাই সব আমেরিকান সাইকোথেরাপিস্ট আছে—চেম্বারে গিয়ে ডাক্তারের সামনে বসে আধঘণ্টা ধরে মিষ্টি কথা শুনে আসে মোটা ফি-এর বিনিময়ে। দলে-দলে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ সম্পর্কের বাইরে সারাক্ষণ যৌন-সম্পর্কের খোঁজ করছে এবং পাচ্ছে। মেয়েরা যখন কারুর খপ্পরে পড়ছে তখন ভালবাসা ছাড়া ডলারের হিসেবনিকেশও করছে।"

অধ্যাপক রায় বললেন, "আমেরিকানরা কাজে ফাঁকি মারে না এটা বাজে কথা। সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়। আর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলাটা এদের জাতীয় চরিত্র। গ্রেট, সুপার্ব, গ্লোরিয়াস কথাগুলো তাই এরা মুড়ি-মুড়কির মতন ব্যবহার করে।"

এদেশের পরিবেশে ভারতীয়দের মধ্যে তিনটে শ্রেণী দেখতে পাবেন। (১) যারা কর্মক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মার্কিনিদের সমতুল্য হলেও নিজেদের মূল্যবোধ একটুও পরিবর্তিত হতে দেয়নি। (২) যারা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক হয়েছে—হঠাৎ আমেরিকান চাকচিক্য দেখে বিমূঢ়। এরা নিজদের ভারসাম্য হারিয়ে সপ্তাহের শেষে বাড়িতে রঙিন আলো জ্বালিয়ে ডিসকো নাচছে। (৩) একেবারে মনেপ্রাণে আমেরিকান হয়েছে যারা—এরা স্বদেশিয়ানা বিসর্জন দিয়েছে এবং এদেশের দোষগুণ সব কিছু গ্রহণ করছে বিনা প্রশ্নে।"

কলকাতায় পড়াশোনা করা নিষ্ঠাবান বাঙালি গুরুণেক সিং ন্যাশনাল লাইব্রেরির চাকরি ছেড়ে অনেকদিন প্রবাসী। এমন চমৎকার মানুষ, এমন সাহিত্যপ্রেমী রসিক বাঙালি আমি জীবনে কম দেখেছি।

পাগড়িপরা গুরুণেক বললো, "এদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য—কেউ নীচ, কেউ মহৎ। বিভিন্ন কালচার থেকে এসেছে, কিন্তু আমি এদের ওপর সব সময় নির্ভর করতে পারি না। অবশ্য আমার জন্মভূমিতেও ছিল নানা সমস্যা। আমাদের মনের আকাঙক্ষা এবং সামাজিক প্রত্যাশা সবসময় সন্ধি করে না। আমরা ভালবাসি

একজনকে বিয়ে করি অন্যজনকে। আমাদের হিসেবের ঠিক থাকে না। এদেশের লোকগুলো অন্তত যা করে সোজাসুজি করে। ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই এখানে। আমাদের বোধহয় জাতীয় চরিত্র বলে কিছুই নেই, আমরা সুযোগ পেলেই অন্যকে টেনে নামাবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই সমাজেও আমি নিজেকে প্লেস করতে পারি না। সোনার চাঁদ ছেলে সায়েবদের মধ্যেও আছে, কিন্তু স্থিরতা নেই—এদের সাংস্কৃতিক স্টেবিলিটি আমি ধরতে পারি না। দু'টো তিনটে ছেলে নিয়ে সুখের সংসার—হঠাৎ বাবা অন্য মেয়ে নিয়ে সরে পড়লো। এদেশে আমার মেয়েদের বিয়ের কথা যখন ভাবি, তখন আমি সংস্কৃতির জন্যে অতটা মাথা ঘামাই না যতটা দুশ্চিন্তা করি ওদের পারিবারিক নিরাপত্তার।"

শক্তি বললো, "বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মেয়েদের নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বাবা-মায়েরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। আমার এক বিশেষ বন্ধু—তাঁর দুটি মেয়ে এখানে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ছেন এদের নিয়ে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে সারাক্ষণ মতবিরোধ। বাবা চাইছেন ভারতীয় প্রথায় মেয়েদের আগলে রাখতে। স্ত্রী কলকাতার রক্ষণশীল পরিবার থেকে এদেশে এসে আধুনিকা হয়েছেন। তিনি মেয়েদের পূর্ণস্বাধীনতা দিতে চাইছেন। বললেন, ওরা সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নেবে না কেন? স্বামী নির্বাক, কিন্তু প্রবল আপত্তি। স্ত্রী বললেন, ছেলেরা যদি যা-ইচ্ছে-তাই করতে পারে, মেয়েরা কেন করবে না? স্বামী অসহায়ভাবে বলেন, মেয়েরা করতে পারবে না কেন? কিন্তু খেসারত কে দেবে? মেয়েরাই তো শেষ পর্যন্ত যা-ইচ্ছে-তাই কাজকর্মের ভিকটিম হবে।"

একই বিষয়ে নানা আলোচনা হলো ক্লিভল্যান্ডে, অধ্যাপক প্রণব চ্যাটার্জির সঙ্গে। কতদিন পরে প্রণবের সঙ্গে দেখা। হাওড়া বিবেকানন্দ ইস্কুলে আমার থেকে কয়েক ক্লাস নিচুতে পড়তো—ভারী ফুটফুটে ছেলে। প্রণব সমস্ত সমস্যাটা এখন বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখছে।

প্রণবের বাড়িতে একদিন দু'জনে বহু রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হলো। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে আমেরিকান মেয়েদের পার্থক্য কোথায়?

প্রণব সোজাসুজি বললো, "আমেরিকান মেয়েদের অত সহজে সতীত্ব যায় না, ভারতীয় মেয়েদের মতন। আগুন নিয়ে খেলা এবং পুতুল নিয়ে খেলা, যদিও

কিছু ভারতীয় মেয়ে চিরকালই আগুনের মতন হয়। তবে যতই আগুন হোক, বাঙালি মেয়েরা আদর্শবাদের ব্যাপারে বাঙালি মূল্যবোধ ব্যবহার করবেই। আমি ধরুন, বাপ-জ্যাঠাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনে সফলকাম হলাম, বিদেশে আসতে পারলাম। আমার এক বান্ধবী ছিলেন শান্তিনিকেতনে, তিনি আমাকে এখনও গালাগালি দেন তুমি বাবার সঙ্গে অন্যায় করেছো। আমি যে সমাজবিদ্রোহী তা বাঙালি মেয়েরা দেখা হলেই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমেরিকান মেয়েদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে সমর্থন আসে। আমার সঙ্গে বাবার কেন মতান্তর হলো তা আমেরিকান মেয়েদের বোঝানো যায়।"

প্রণব বললো, "বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সাধারণত স্বামীর জন্যে সংসারের জন্যে ত্যাগ অনেক বেশি! স্বামীর প্রয়োজন সম্বন্ধে তারা অনেক বেশি সচেতন, সে-জন্যে নিজেদের কেরিয়ার অতি সহজে ত্যাগ করতে পারে। বিদেশে বাঙালি মেয়েদের যত ডাইভোর্স হয় তার জন্যে উদ্যোগ আসে পুরুষদের মধ্যে থেকে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রথম হাঙ্গামা বাধিয়েছে পুরুষরা।"

"দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয় মেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মায়ের ভীষণ চিন্তা—এদের কী হবে?" প্রশ্ন করলাম অধ্যাপক মহাশয়কে।

প্রণব হেসে বললো, "মেয়েদের যা হবে ছেলেদেরও তা-ই হবে! ইটালিয়ান, আইরিশ, গ্রীক অনাবাসীদের যা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে—বিশাল সংস্কৃতির সঙ্গে একবারে মিশে যাবে—নিজেদের কর্মজীবন এবং বিবাহজীবন কেমন হবে তা বাপ-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ছেলেমেয়েরা স্থির করবে। এরা নিজেদের জীবনে ভুল করবার স্বাধীনতা দাবি করবে এবং আস্তে-আস্তে এরা বাবা-মাকে বার্ধক্যেও অবহেলা করবে।"

"পরবর্তী প্রজন্মে তাহলে এদের ভারতীয়ত্ব একেবারে মুছে যাবে?"

প্রণব একমত হলো না। "পলিটিক্সে একটু ছাপ থাকবে বোধ হয়। আফ্রিকানদের যেমন আফ্রিকার ওপর, ইটালিয়ানদের যেমন ইটালির ওপর, ইহুদীদের যেমন ইজরায়েলের প্রতি টান রয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের হয়তো ভারতের দিকে রাজনৈতিক টান থাকবে—মহাত্মা গান্ধীকে, জহরলাল নেহরুকে এরা নিশ্চয় মাথায় করে রাখবে।"

"বাপ-মাকে শ্রদ্ধা করা, বার্ধক্যে বিপদে-আপদে বাপ-মায়ের দেখাশোনা করা, এসব দ্বিতীয় প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে থাকবে না বলছো?" আমার এই প্রশ্নে প্রণব ফোঁস করে উঠলো।

তার বক্তব্য, "বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা, আর বাবা-মাকে তোমার জীবনটা পুরোপুরি কনট্রোল করতে দেওয়া এক জিনিস নয়। এদেশের ভারতীয় বাবা-মায়ের প্রায়ই ডবল-স্ট্যান্ডার্ড থাকে, অথচ অনেক সময় নিজেরাই সে-সম্বন্ধে

অবহিত নন।"

প্রণবের মতে, "দুই প্রজন্মের বিরোধ সায়েব-আমেরিকাতে বিরল নয়। প্রায়ই ঘটছে এবং তখন হয় ছেলে, না-হয় বাবা-মা সোস্যাল ওয়ার্কারের সঙ্গে কথা বলছে অথবা সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছে ছুটছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এটা হ'ল ভীষণ ব্যাপার। সবাই সারাক্ষণ সাংসারিক বিরোধের ব্যাপারটা চেপে রাখার চেষ্টা করছে। দুই প্রজন্মের মধ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাব হচ্ছে একথা আমি বলবো না, যা-হচ্ছে তা হলো দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের মধ্যে সংঘাত।"

"বয়োজ্যেষ্ঠদের তাহলে সমাজে কোনো সম্মান থাকবে না?"

প্রণব আবার মুখ খুললো, "মনে রাখবেন, এদেশে বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে অনেক টাকা-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তি আছে। সুতরাং অর্থনৈতিক অপমান সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা হলো, এদেশে মানুষ অনেক দীর্ঘজীবী হচ্ছে—পুরুষদের গড় আয়ু এখন চুয়াত্তর, মহিলাদের আটাত্তর। এঁদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমশ বাড়ছে। অথচ এতোদিন এখানে ছিল কেবল যৌবনের জয়গান—যাকে এরা বলে ইউথ-ওরিয়েন্টেড কালচার—যৌবনমুখী সংস্কৃতি। ফ্রান্সে ও সুইডেনে দেখলাম বয়োজ্যেষ্ঠরা দলবদ্ধ হয়ে ভোটের ভয় দেখিয়ে অনেক সামাজিক সম্মান ও সুবিধে দাবি করছেন এবং পাচ্ছেন। এদেশেও তাই হবে—তবে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তিগত ভক্তি-সম্মানের জোরে নয়। ছেলেমেয়েরা সম্মান করুক না করুক, সরকার অনেক সুযোগ-সুবিধে দেবেন।"

আমরা আবার মার্কিন দেশে দাম্পত্যসম্পর্কের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলাম। অভিজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে প্রণব অবশ্য কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখালো না। কিন্তু মার্কিন দেশে বর্তমানে কী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই হাওয়া আমাদের দেশে কতটুকু আসতে পারে সে-সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করলো।

তথাকথিত মানবস্বাধীনতা ও মানবমুক্তির দেশ আমেরিকায় মেয়েদের বেশ কিছু অসুবিধে এখনও রয়েছে। যেমন, তিরিশ পেরোলে মেয়েদের বিয়ে হবার সম্ভাবনা খুব কম—প্রতি একশোতে মাত্র একটি। ফলে এদেশে তিরিশের ওপর অনেক আইবুড়ো মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা পুরুষের সঙ্গ চায়, অথচ চট করে সাদা সুপুরুষমানুষ পাচ্ছে না। সমান সুযোগের দেশ বলে বিখ্যাত এই সমাজে পুরুষমানুষরা তাদের থেকে কম বয়সের মেয়েদের সান্নিধ্য পেতে পারে, কিন্তু তার উল্টোটা সম্ভব নয়। পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়ে কিছুতেই পঁচিশ বছরের পুরুষ পাবে না। কিন্তু পঁয়ত্রিশ কেন পঞ্চাশ বছরের পুরুষ পঁচিশ বছরের মেয়ে নিয়ে আকচার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশি লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের সামাজিক অসুবিধে আছে। কারণ বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ের প্রয়োজন উচ্চশিক্ষিত স্বামীর। প্রণবের যেসব ছাত্রী এম-এ পড়ে তারা এম-এ পাশ স্বামী চায়।

কয়েকদিন আগে প্রণব তার এক ছাত্রীকে বলেছিল, "তুমি এতো মেধাবী মেয়ে, পি-এইচ-ডি করছো না কেন?" সে মিষ্টি হেসে উত্তর দিলো, "বেশ বলছো! আমি ডক্টরেট করলে কে আমাকে বিয়ে করবে শুনি? বিয়ের বাজারে মেয়ে ডক্টরেটদের কোনো জায়গা নেই।"

পড়াশোনায় ভাল মেয়েরা যে সত্যিই বিয়ের বাজারে মার খায় তা এদেশে না এলে বিশ্বাস হয় না। প্রণবের এক মেধাবী ছাত্রী অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটি স্বামী খুঁজে পেলো এবং লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়ে টিকলো মাত্র পাঁচ বছর। বেচারা অনেক বেশি বয়সে আবার পি-এইচ-ডি করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে—কিন্তু পোস্টগ্র্যাজুয়েট চাকরির বাজারে সে অনেক জুনিয়র হয়ে যাবে।

মেয়েদের শুধু পড়াশোনায় মন দিলে হবে না, সময় মতো স্বামী পাকড়াবার জন্যে ছেলেদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশতে হবে এবং তাদের প্রশ্রয় দিতে হবে। প্রশ্রয় মানে, বিছানায় যেতে আপত্তি করা চলবে না।

নতুন অসুখবিসুখের ভয় অবাধ যৌনস্বাধীনতার ব্যাপারে সাময়িক বিপর্যয় এনেছে। আজকাল চট করে বার-এ গিয়ে মদ্যপান করে তারপরেই রাত্রে বিছানায় যাওয়া সহজ হচ্ছে না। অনেকে একটু সঙ্গীর স্বাস্থ্যটা বাজিয়ে-টাজিয়ে নিতে চায়। কারণ সিফিলিস, গানোরিয়ার চট করে চিকিৎসা হয়। (এদেশে ঠাট্টা করে বলে 'চিকেন'), কিন্তু হারপিস বলে একটা অসুখ হলে সারাজীবন ভুগতে হয়। খুব বড় ধরনের অসুখ হয়, যৌনাঙ্গে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা হয়। নতুন আসরে নেমেছে এইডস্—এটা হলে এক বছর পরমায়ু। এখানে এই রোগটা কুষ্ঠ রোগের মতন, লোকে ভীষণ ভয় পায়।

প্রণব আমার একটা ভুল ভেঙে দিলো, "দাম্পত্য সম্পর্কচ্ছেদের সময় মানুষের খুব কষ্ট হয়। ধরো পাঁচ বছর আগে তুমি বিয়ে করেছো। আর তোমার বাইরে রক্ষিতা আছে। স্যরি, এদেশে রক্ষিতা হয় না, বান্ধবী আছে। তার সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। স্ত্রীকে ছেড়ে তোমার আবার বিবাহ করার ইচ্ছা হলো। তুমি নিজেই অন্যায় করছো, তবু বিচ্ছেদের মুহূর্তে তোমার দুঃখ হবে। তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু'জনেই ছুটবে সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছে—অনেকটা আমাদের দেশে গুরুদেবের কাছে যাওয়ার মতন। সাইকিয়াট্রিস্ট এই ইনডাস্ট্রিয়াল সমাজে হাই-প্রিস্ট হয়ে উঠেছে।"

ডাইভোর্স চলাকালীন মানুষ এ-সমাজে ভীষণ মুষড়ে পড়ে, যদিও ঘরে ঘরে ডাইভোর্স চলছে। প্রণব দেখেছে, বড় বড় অধ্যাপক ডাইভোর্সের যন্ত্রণার সময় গবেষণার কাজ করেন না। পি-এইচ-ডি ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা দিতে বললে তারা খুব খারাপ করে। লোকে অবশ্য সহানুভূতি দেখায়। বলে, ওমুক এখন খুব খারাপ ডাইভোর্সের মধ্য দিয়ে চলেছে। ওরা এটাকে সাময়িক শারীরিক অসুস্থতার মতন ধরে নেয়। সেই অনুযায়ী দয়াদাক্ষিণ্য দেখায় এই আশায় যে, তুমি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আবার কাজেকর্মে মন দেবে।

ডাইভোর্সের ভয় গোটা সমাজকেই সারাক্ষণ একটা মানসিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছে বলাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। মানুষ জানে, ঘর ভাঙলে আবার দাম্পত্যসম্পর্ক তৈরির জন্যে নিজের শরীরটা সারাক্ষণ আকর্ষণীয় রাখতে হবে। বিষয়সম্পত্তির হিসেবে সারাক্ষণ নজর দিতে হবে।

প্রতি স্টেটে ডাইভোর্সের আইন আলাদা। বেশির ভাগ রাজ্যে আইন—কোনো লিখিত ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি দু'ভাগ হবে। ডাইভোর্স মানেই মোটা খরচের ধাক্কায় পড়া। "মনে করো দশ বছরের বিয়ে। বিয়ের পর বাড়ি কিনেছো। বাড়ির দাম এখন দেড় লাখ ডলার। এর থেকে ব্যাঙ্কের দেনা-দশ হাজার ডলার। সেটা বাদ দিয়ে সম্পদ দু'ভাগ হয়ে যাবে।"

কিন্তু ডাইভোর্স থেকে মেয়েরাই বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে পুরুষদের থেকে। এ বিষয়ে নানা সমীক্ষার উল্লেখ করলো প্রণব।

অনেকসময় স্বামীর তুলনায় আমেরিকান বউয়ের বেশি কর্মদক্ষতা বা কোয়ালিফিকেশন থাকে না। প্রণব তার এক ছাত্রীর কথা বললো। তার বয়স এখন আটত্রিশ, নতুন পড়তে এসেছে। এর বিয়ে হয় বাইশ বছর বয়সে, স্বামীর বয়স তখন চব্বিশ। দু'জনেই প্রেমে গদগদ। স্বামী মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। মেয়েটি ছ'বছর চাকরি করে পড়ুয়া স্বামীর ভরণপোষণ করেছে, ডাক্তারি ডিগ্রি পাবার স্বপ্ন সফল হয়েছে। স্বামী এখন সুপ্রতিষ্ঠিত—তাঁর এখন কমবয়সী গার্ল ফ্রেন্ড অনেক। স্বামী তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি পঁচিশ বছরের এক মেয়েকে নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আটত্রিশ বছরে ডাইভোর্সড হয়ে মেয়েটির কী দুরবস্থা। তেমন কোনো স্কিল নেই, অনেক বছর চাকরির অভিজ্ঞতা নেই। স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া খোরপোষের টাকায় সে আবার কলেজে পড়তে এসেছে।

চল্লিশোত্তর বিবাহ-বিচ্ছেদে মেয়েদের দুর্গতির ছবি এদেশে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেশির ভাগ সময়ে স্বামীর বান্ধবী থাকে। স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে কমবয়সী মেয়ে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ডাইভোর্স হলো। দু'তিন বছরের মধ্যে ধাক্কা সামলে নিচ্ছে পুরুষরা, তাদের রোজগার আবার বাড়তে শুরু করছে।

কিন্তু মেয়েরা যে-তিমিরে সে-তিমিরে।

প্রণবরা একেই বলে—'দারিদ্র্যের মহিলাকরণ' বা ফ্যামিনিনাইজেশন অফ পভার্টি। পঁয়ত্রিশ বছরে নতুন স্বামী পাওয়া খুব শক্ত। বহু ডাইভোর্সড মহিলা দেখা যায় আমেরিকান সমাজে, যাঁরা দ্বিতীয়বার স্বামী জোগাড় করেত পারেননি।

"তাহলে উপায়?" আমার মন্তব্য শুনে প্রণব হাসলো!

একটা আশার কথা শোনা গেলো, "এদেশে বলে, পনেরো বছর পেরিয়ে গেলে বিয়ে সহজে ভাঙে না। যদিও তিরিশ বছরের বিয়ে ভাঙতেও আমি দেখেছি।

"যে-বিয়েগুলো টিকে যায় সেখানে স্বামী অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তির প্ররিচয় পাওয়া যায়। সুযোগ পেয়েও এরা পিছলে পড়ে না, বিয়ের বাইরে চটপট দেহসম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এরা উদ্‌গ্রীব হয় না। এদের কেউ-কেউ বলে, একটা মানুষকে সারাজীবন ধরে খুঁজে পাওয়া, বারবার খুঁজে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে তা তুলনাহীন।"

প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক কার্ল রজার্স তাঁর পঞ্চাশ বছরের বিবাহোৎসবের পর চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কী করে অংশীদার হতে হয়। তিনি লিখেছিলেন, "পঞ্চাশ বছর ধরে আমি শিখছি আমার স্ত্রী মানুষটি কী রকম। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমি আবিষ্কার করি—এ মানুষটা তো সে-মানুষটা নয়। পাঁচ বছর আগেকার মানুষটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সব মানুষই সদা পরিবর্তনশীল। অথচ হৃদয়ের গভীর থেকে প্রেমের এবং আত্মনিবেদনের অনুপ্রেরণা আসছে।' মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের লাইন? 'পুরানো জানিয়া চেও না আমারে আধেক আঁখির কোণে।

প্রণব বললো, "আমাদের দেশে বিয়েটা সামাজিক কনট্রোলের অঙ্গ আর এদেশে বিয়ের ব্যাপারটা ভীষণ রোমান্টিক। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কাছে প্রত্যাশা ভীষণ রোমাণ্টিক—স্ত্রী ভাবে আমার স্বামী আমাকে সারাক্ষণ ইমোশনাল বল যোগাবেন, মিষ্টি কথা বলবেন, রোমান্টিক থাকবেন। প্রেমের সময় মনে থাকে না সারাজীবন ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে কবিতা পড়া যায় না।"

তাই কোনো ছাত্রী যখন বলে, বিয়ের পর থেকে স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে বড় হচ্ছে না—গ্রোয়িং টুগেদার না হয়ে গ্রোয়িং অ্যাপার্ট হচ্ছে তখনই প্রণব আন্দাজ করে বিয়েটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। "যাদের বিশ-বাইশ বছর বয়সে খুব সুখী দম্পত্তি মনে হচ্ছে তাদের ওপর নজর রাখো, খোঁজ নাও পনেরো বছর পরে জীবনটা কোনদিকে মোড় নিলো। চব্বিশ বছর বয়সের সুখ আটত্রিশ বছর বয়সে বিচ্ছেদের বিষ হয়ে দাঁড়ালো। কয়েক বছরের মধ্যে বিয়ে ভেঙে যাবার সম্ভাবনা এ-দেশে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।"

"বিয়ে ভাঙবার একটা কারণ, বিবাহবন্ধনের বাইরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চাপ সব সময় রয়েছে এই সমাজে। যতই গালাগালি দেওয়া যাক, প্রতিষ্ঠিত পুরুষ ও সুশ্রী মহিলাদের বিবাহ-অতিরিক্ত দেহসংসর্গের সুযোগ সর্বদাই রয়েছে এদেশে। মেয়েদের যদি আমাদের সমাজের মতন জবুথবু বুড়ি করে বাড়িতে রেখে দেওয়া যায় তাহলে তাদের সুযোগ হবে না, কিন্তু পুরুষরা সুযোগ পাবে তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে। সুতরাং এদেশে বিয়েটাকে অটুট রাখতে হলে সামাজিক চাপ থেকে অন্তর্নিহিত মানসিক সম্পর্কের বন্ধন বেশি প্রয়োজন।"

ডাইভোর্সের অভিশাপের মধ্যে যেসব ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠে তাদের মানসিকতা সম্বন্ধে প্রণব কিছু খোঁজখবর করেছে। সে যা বললো, তা বেশ চিন্তার ব্যাপার। "এদেশে দেখবে বাইশ-চব্বিশ বছরে অনেক ছেলে-মেয়ে বলবে, আমার বাবা-মায়ের ডাইভোর্স হয়েছিল, তার জন্যে জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, আমি আমার ছেলেমেয়েদের এই বিপদে কিছুতেই ফেলবো না।" কিন্তু সবচেয়ে যা দুঃখের, এক প্রজন্মের বৈবাহিক অনিশ্চয়তা বংশগত বিষের মতন পরবর্তী প্রজন্মকে একই দোষে দুষ্ট করে তোলে।

প্রণব সুন্দর ব্যাখ্যা করলো, "চব্বিশ বছর বয়সে ডাইভোর্সে তোমার প্রচণ্ড ভয়। অনেক দেখেশুনে ছাব্বিশ বছরে তুমি বিয়ে করলে। কিন্তু তারপর বংশগুণে তুমি নিজেই কী করে বসলে তা জানো না। অচেতন মনে তুমি ডাইভোর্স করা বাবা অথবা মাকে নিজের মডেল করে বসে আছো। কাউকে কবিতা-টবিতা বলে, গানটান শুনিয়ে, ওয়াইন খাইয়ে, গালে চুমু খাইয়ে সঙ্গ দেওয়া এক জিনিস আর কারও সঙ্গে পাঁচ বছর ঘর করা আর এক জিনিস। প্রেমের সময় তুমি বার-বার বললে, ডাইভোর্স তুমি অপছন্দ করো, কিন্তু বিয়ের পর ঘর করতে গিয়ে দেখলে অমুক হচ্ছে না, তমুক হচ্ছে না। তারপর একদিন বাইরে চান্স পেয়ে কারও সঙ্গে শুয়ে এলে। সোজা বাংলায়, ডাইভোর্সড বাবা-মায়ের বিবাহিত জীবনে ডাইভোর্স হবার সম্ভাবনা অন্যের তুলনায় অনেক বেশি।"

এদেশে কিছুদিন বসবাস করে যেসব ভারতীয় হুট করে দেশে গিয়ে বিজ্ঞাপন মাধ্যমে বিয়ে করে আনে তাদের কথা উঠলো। প্রণবের মতে, ভারতীয় বিয়েগুলো বেশি টেকে এইজন্যে যে মেয়েদের সহ্যশক্তি অসীম। ডেটিং-এর প্রতিযোগিতায় ভারতীয়রা প্রায়ই আশানুরূপ ফল করতে পারে না এইজন্যে যে তাদের এ-বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। একজন মেয়েকে কি করে উইক-এণ্ডে সময় কাটানোর জন্যে নেমন্তন্ন করতে হয় তাই জানে না ভারতীয় ছেলেরা। তারপর যদি বা কোনো কোনো মেয়ে বেরলো, কিছুক্ষণ পরেই ব্যাপারটা কেমন

অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়! বাঙালি ছেলেরা তো একবার দু'বার ডেটিং করলেই প্রেমে পড়ে যায়। এদেশের ছেলেরা অথবা মেয়েরা এত সহজে প্রেমে পড়ে না।

প্রণব জানালো, বেশিরভাগ ভারতীয় ছেলেই ডেটিং সংস্কৃতিতে ব্যর্থ—জবুথবু মেরে যায়। তার ওপর ভারতীয়রা তো শাদা মেয়ে ছাড়া প্রেম করে না, কালো মেয়েদের দিকে কোনো নজর নেই। শাদা মেয়ে যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন হুট করে দেশে গিয়ে একটি দেশিমেয়ে বিয়ে করে আনে।

প্রণব তার একজন ছাত্রের কথা বললো। মোটামুটি ভাল ছাত্র, ব্যাডমিনটন খেলে, কিন্তু ইংরিজী উচ্চারণে দোষ, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু অপটু। সে শিকাগোয় ডেটিং করলো, কিন্তু তেমন ভাল ফল হলো না! যে শাদা মেয়েদের তার মনে ধরেছিল তারা ওকে পছন্দ করেনি, আর যারা ওকে পছন্দ করেছিল তাদের জন্যে তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। এক কথায়, আমেরিকান মেয়েদের মনোরঞ্জনে সে সফল হয়নি।

তারপর একদিন সে কলকাতায় গিয়ে শুনলো এক ডাক্তার মেয়ে রয়েছে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম-বি-বি-এস পাশ করেছে। খুব উৎসাহী হয়ে সে বিয়ের প্রস্তাব দিলো এবং একবার মাত্র মেলামেশা করে বিয়ে করে ফেললো। বিয়ের পর তড়িঘড়ি বউকে এদেশে নিয়ে এলো এই আশায় যে, এদেশে ডাক্তার হলে অনেক রোজগার করতে পারবে। স্ত্রীর নাম বনলতা।

বনলতা বললো, "তুমি আমাকে বিয়ে করে এনেছো। আমি আর ডাক্তারি করবো কেন? আমি ছেলেপুলে মানুষ করবো। দু'বছরে দুটি ছেলেমেয়ে হলো।"

স্বামী দেবতা এখন বার-এ বসে মদ খায়, আর দুঃখ করে, "আমার স্ত্রী না হলো এদেশি না হলো ও-দেশি! সে ঘরে বসে থাকে, আমাকেই রোজগার করতে হচ্ছে।"

প্রচুর মদ গিলে মাতাল হয়ে সে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরে—বউ এখন খুব কষ্টের মধ্যে আছে।

আমি বললাম, দু'দিন আগে আমি এখানে বড়-হয়ে-ওঠা একটি বাঙালি মেয়েকে দেখলাম গ্রীনকার্ডের জোরে কলকাতা থেকে ডাক্তার স্বামী ইমপোর্ট করেছে। সদ্য বিয়ে হয়েছে, দেখে খুব সুখী বলে মনে হলো।

"ধীরে শংকরদা, ধীরে। এদেশের পরিবেশে মানুষ হয়ে ঐরকম বিয়েতে কতটা সুখ পাওয়া যাবে, এবং সেই সুখ কতটা স্থায়ী হবে তা ঝট করে বলা যায় না। কয়েক বছর পরে খোঁজখবর করবেন—বাইশ বছরে যা সুখ বলে মনে হচ্ছে আটাশ বছরে তা কী হবে তা এদেশে কেউ জানে না।"

এদেশে বড়-হয়ে-ওঠা ভারতীয় মেয়েদের স্বামী নির্বাচন সম্পর্কে কথা উঠলো। প্রণব বললো, ভারতীয় মেয়েদের পক্ষে আমেরিকান স্বামী জোগাড়

করা খুব শক্ত নয়। কিন্তু প্রণব এদেশে যেসব ভারতীয় ছাত্রী দেখেছে তাদের বেশিরভাগের মধ্যেই ভারতীয় পুরুষ সম্পর্কে একটু স্পেশাল টান আছে—ভারতীয় পেলে তারা আর কাউকে বিয়ে করবে না।

যারা এদেশে বড় হয়ে আমেরিকান স্বামী নির্বাচন করছে, তাদের সম্বন্ধে প্রণব বললো, বাড়িতে বাবা-মা সেক্ষেত্রে খুব কষ্ট পায়। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে, ছেলের ক্ষেত্রে অতোটা নয়।

এর কারণ কি জানতে চাইলে, সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক আবার হো হো করে হেসে উঠলো। "সেই পুরনো ভারতীয় সমাজের দু'রকম মূল্যবোধ। ছেলে কোথাও একটু ফক্কুড়ি করে এলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে ফক্কুড়ি করলে তার তো বিয়ে দেয়া যাবে না। আমাদের দেশে ছেলেদের তো সতীত্ব চাওয়া হয় না, মেয়েদের সতীত্ব চাওয়া হয়। ছেলেরা বিয়ের আগে একটু ফক্কুড়ি করলে বিয়ে দেওয়া যায়, মেয়েরা বিয়ের আগে একটু ফক্কুড়ি করলে বিয়ে দেওয়া যায় না।"

দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সোসিওলজির অধ্যাপকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে-দেশের পারিবারিক জীবনে এতো অনিশ্চয়তা, সম্পর্ক যেখানে এতো ঠুনকো তারা কর্মযজ্ঞে সফল হয়ে কেমন করে বিশ্ববিজয়ী হলো? কিন্তু বিজয়ী হলেও, এমন প্রেমহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে বড়-হয়ে-ওঠা শক্তিমানদের হাতে বিশ্বসংসারের দায়িত্ব দেওয়াটা মানব সমাজের পক্ষে নিরাপদ কি না?

প্রণব প্রথমে কোনো উত্তর দিতে চাইলো না। তারপর ভেবেচিন্তে বললো, "আগামী কয়েক বছরে আমাদের নিজেদের দেশে কী হয় আগে তাই ভাবুন। যদি অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, তাহলে নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসবেই। মেয়েরা যদি কাজে বেরোয় তাহলে তারা বদলাবেই। এবং একবার এই পরিবর্তন শুরু হলে সমস্ত দেশে নীরব এক বিপ্লব ঘটে যাবে। মেয়েরা যখন অর্থনৈতিকভাবে অতটা পরনির্ভরশীল থাকবে না তখন সমস্ত পুরুষসমাজের মেজাজটাই পাল্টে যাবে।"

"তুমি বলছো? মেয়েরা স্বাধীন হলে আমাদের সমাজে উৎপাদকতা বাড়বে?"

"আমি ঠিক উল্টো বলতে চাইছি, শংকরদা। আমাদের শিল্প বাণিজ্য বাড়লেই, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই দলে দলে মেয়ে কলে-কারখানায় অফিসে কাজ করতে বেরুবে। আমাদের দেশে মেয়েরা এখন গ্রামে চাষ-আবাদে ক্ষেতে-খামারে খেটে মরছে, কিন্তু স্বামী তাকে কাঁচা পয়সা দিচ্ছে না। শহরে অন্য ব্যাপার! তুমি দেখবে যেসব মেয়ে অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা আত্মনির্ভর তার

স্বামী তাড়িয়ে দিলে সোনাগাছিতে যায় না। গরীব মেয়েরা, নিরক্ষর মেয়েরা সোনাগাছিতে যায় কারণ তাদের পয়সার মদত নেই। যে-মেয়েরা নিজের রোজগার থাকবে, একটা চাকরি থাকবে তার স্বাধীনতাবোধ অন্যরকম হবে। এদের সংখ্যা অনেক হলে সারা সমাজের সেক্সুয়াল আচরণ পাল্টে যাবে। জাপানে যেমন হয়েছে। সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন আমরা বলতে পারবো—তুমি মানুষ। তুমি আমাকে ভালবাসো নিজে ভালবাসছো বলে—যেহেতু আমি পয়সা দিচ্ছি, আমি রোজগার করছি, আমি তোমার স্বামী বলে ভালবাসছো না। এটা যখন হবে তখন সারা জাতটার ভোল পাল্টে যাবে, শংকরদা। পৃথিবীতে সব দেশে যা হয়েছে তার থেকে আমরা আলাদা থাকবো কী করে?"

মনটা বেশ খারাপ। স্বদেশ ও বিদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোসিওলজির বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক প্রণব চ্যাটার্জি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দিব্যেন্দুনিকেতনে একটা ঘরে বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করেও কোথায় থই পাচ্ছি না। এই আমার রোগ বলতে পারেন। আড়াই সপ্তাহের জন্য বিদেশে এসে সবরকম দুঃখ কষ্ট ভুলে না থেকে দেশের মানুষের চিন্তাগুলো আরও ভারি হয়ে উঠছে। গত কয়েকদিন ধরে আমেরিকান নানা শহরে এবং কানাডার টরন্টোয় কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হলো, কত নতুন সাফল্য আবিষ্কার করলাম, কত ব্যর্থতাকে দূর থেকে দেখলাম, আমার সঞ্চয়ের ঝুলি পূর্ণ, কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা বেড়েই চলেছে।

ভোগ ও ঐশ্বর্যের তুঙ্গে উঠেও মানুষ নিজের ঘর-সংসার ভাঙবার নেশায় মত্ত হয়ে যখন অনিশ্চয়তাকে ডেকে আনে তখন তাদের কর্মজীবনে সাফল্য কী মূল্যহীন হয়ে ওঠে না?

আমি ভাবছিলাম, একাকিত্বের বিষে জর্জরিত হয়েও মার্কিন ভূখণ্ডের মানুষদের কেন চৈতন্যের উদয় হয় না? চৈতন্য তো দূরের কথা, সমাজতত্ত্ববিদরা উল্টে ভয় দেখাচ্ছেন এই হাওয়া তোমাদের দেশেও পৌঁছলো বলে। তোমাদের ঘর-সংসারও নবজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আগুনে এবং কামদেবের প্রকোপে ছারখার হয়ে যাবে। সুখের সংসার বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা কোথাও থাকবে না।

ঘরের আলোটা হঠাৎ জ্বলে উঠলো। দিব্যেন্দুজননী শান্তি ভট্টাচার্য ঘরে প্রবেশ করলেন। "একি বাবা! চুপচাপ ঘর অন্ধকার করে বসে আছো, আর আমি পুজো থেকে উঠেই তোমার খোঁজ করছি।"

প্রবীণা মাসিমা এই সুদূর প্রবাসে একেবারে খাঁটি বাঙালি বিধবার জীবনযাপন করছেন। কাপড় কেচে তারে শুকোতে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে পুজোর ফুল তোলা পর্যন্ত কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

মাসিমা খুব কম কথা বলেন, কিন্তু সারাক্ষণ মানুষকে আশীর্বাদ করেন, বেঁচে থাকো, ভালো থাকো, সুখের সংসার হোক। সেই ছোটবেলায় বিধবা হয়েছিলেন, তারপর কষ্ট করে ছেলেদের মানুষ করেছেন। একটি ছেলে সৈন্যবাহিনীতে ছিল, সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় নিখোঁজ। সেই দুঃখ ভুলবার জন্যে এই ক্লিভল্যান্ড, ওহায়োতে হাজির হয়েছেন। বসবাস করছেন স্থায়ীভাবে।

মাসিমাকে আমার উদ্বেগের কথা কিছুটা বললাম। মাসিমা শুনলেন, কিন্তু নিরাশ হতে বললেন না। তাঁর ধারণা, "এ জাত খুব বড় জাত বাবা। এরা প্রবল শক্তিতে সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে। এরা যখনই অসুবিধেয় পড়বে তখনই নতুন কোন মুক্তির পথ খুঁজে বার করে নেবে।"

"এরা শরীরের খিদে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে নেই, আপনি বলছেন?"

মাসিমা হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ান না, সারাক্ষণ খবরের কাগজে খুন জখম বিবাহবিচ্ছেদের রিপোর্ট পড়ে নিজের দুশ্চিন্তা বাড়ান না। কিন্তু পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, তাঁদের সুখদুঃখের খবরাখবর রাখেন।

মাসিমা বললেন, "মানুষ সব দেশেই এক গো—আগে বুঝতুম না, এখন নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস হলো। কিছু গেলে দুঃখ, কিছু এলে সুখ, কিছু গড়লে আনন্দ, কিছু ভাঙলে কষ্ট—তা টালিগঞ্জেও দেখেছি, এখানেও দেখছি বাবা।"

মাসিমা বললেন, "কে বলে এদেশে সংসার বলে কিছু থাকবে না? আমি এদেশে হীরের টুকরো বিদেশি বউমা দেখছি। এদের সঙ্গে কথা বলে তো মনে হয় না, এরা ঘর ভাঙতে এসেছে। তুমি অমলের জার্মান বউ, অঞ্জনের আমেরিকান বউ একটু দেখে যাও বাবা, মনে শান্তি পাবে।"

অমল গাঙ্গুলী এখানে অনেকদিন আছেন। বিখ্যাত ক্লিভল্যান্ড নিউম্যাটিক কোম্পানিতে এরোপ্লেনের যন্ত্রাংশ তৈরির ডিভিশনে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। এঁর স্ত্রীর মাসিমা-অন্তপ্রাণ। প্রতিদিন খোঁজখবর নেন।

এই বউমার নামটি আমার খাতায় লিখে নিতে ভুল করেছিলাম। পরে ব্রজেশ পাকড়াশির কাছে জোগাড় করেছি—এরনা।

মাসিমা বললেন. "এই মেয়েটির তুলনা হয় না। রোজ কিছু না কিছু খাবার তৈরি করে ফোন করবে, আমাকে বোঝাবে, এতে কোনরকম আমিষের সংস্পর্শ নেই, আমি নাকি নিশ্চিন্তে খেতে পারি। এরনা সময় পেলেই চলে আসবে আমার সঙ্গে গল্প করতে। আর দিব্যেন্দু-সুমিত্রা যখন কোনো কাজে ক্লিভল্যান্ডের বাইরে গেলো তখন তো কথাই নেই। গাড়ি হাঁকিয়ে এরনা চলে আসবে আমাদের বাড়িতে নাইট ডিউটি দিতে। সারারাত থাকবে। কত কথা বলবে। একদিন নয়—রাতের পর রাত।"

মাসিমা, আমি ও সুমিত্রা তো শেষ পর্যন্ত এরনা গাঙ্গুলীর বাড়িতে চড়াও হলাম। এরনা তখন স্কার্টের ওপর অ্যাপ্রন পরে বাগানে পাখিদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করছিলেন। শাশুড়ি এসেছেন শুনে হৈ-হৈ করে ছুটে এলেন।

এরনা বিনা নোটিশে বিরাট পেসট্রির প্লেট সামনে হাজির করলেন। বললেন, "কোনো কথা শুনছি না, খেতেই হবে। এখন যত পারো খেয়ে নাও, দেশে গিয়ে উপোস করো।"

"এই হচ্ছে এরনা, যখন খাওয়াবে বলেছে তখন খাওয়াবেই," মন্তব্য করলেন সুমিত্রা।

এরনা হৈ চৈ করলেন, "তুমি শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক, আপ্যায়ন না করলে যে বদনাম হবে তা আমি জানি। আমার শাশুড়ি অমলের মা আমাকে ট্রেনিং দিয়েছে। উনি থাকতেন বিন্ধ্যাচলে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে।"

"দিস আনন্দময়ী ইজ এ রিমার্কেবল পার্সন। আমি যেবার প্রথম ভারতবর্ষে শাশুড়িকে দেখতে গেলাম, অমল তার আগে আমাকে শিখিয়েছিল কেমন করে প্রণাম করতে হয়। কিন্তু আমি হাত বাড়ালেই বিধবা শাশুড়ি ভয় পেয়ে সরে গেলেন আমার স্পর্শ এড়াতে। কিন্তু একটু পরেই আনন্দময়ী মা আমাকে বালা এবং শাড়ি উপহার দিলেন।" সেই বালাটি এখনও এরনার মূল্যবান সম্পত্তি।

এরনার বাড়িতে পোষা বেড়াল রয়েছে। বললেন, "তুমি জেনে সুখী হবে, এখন 'পেট' হিসেবে বেড়ালের জনপ্রিয়তা কুকুরের থেকে বেশী, অন্তত আমেরিকায়। অবশ্য অনেক পরিবার দুটি 'ছেলেপুলে' চায়—একটি কুকুর, একটি বেড়াল।" এরনার বাড়িতে একটি অতিবৃদ্ধ হুলোবেড়াল রয়েছে—যমের দোরে কাঁটা দিয়ে যার বয়স আঠারো। অথচ বইতে দেখবেন, বেড়াল ষোলো বছরের বেশী বাঁচে না।

এরনা গাঙ্গুলী প্রায়ই শত শত ডলারের খাবার কেনেন পাখিদের খাওয়াবার

জন্যে। এরা তাঁর বাগানে নিত্য অতিথি—প্রচুর ছবি তোলেন এদের। পাখিদের খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে এদেশে—কিন্তু শীতকালে অনেকেই তাদের কথা ভুলে যান। তাই এরনা গাঙ্গুলী শীতকালে গাছে-গাছে পক্ষী-ফিডার ঝুলিয়ে দেন এবং তাতে ভর্তি থাকে নানা খাবার।

এরনা বললেন, "এখানে বেড়াল অনেক সুশিক্ষিত। তারা বাথরুম যাবার তাগিদ হলে কাঁদে। এমন বেড়ালও আছে যারা বাথরুমের ফ্ল্যাশ টেনে দেয়!"

এরনা বললেন, "ভারতবর্ষে খাবারের কষ্ট আছে—অথচ এখানে এতো খাবার, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। জার্মান-যুদ্ধের সময় খাবারের কষ্ট কাকে বলে তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। ওঃ সেসব দিন যা গিয়েছে।"

এরনার মনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি এখনও অমলিন রয়েছে। তখন ওঁর ঠাকুমার বয়স পঁচাশির ওপর। সাইরেন বাজলেই এয়ার রেড শেলটারে ছুটে যেতে হতো। কেউ বসতে পাবে না সেখানে। সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

"যুদ্ধ শেষ হলো। আমার ভালো লাগলো না। দেশ থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগলো। চলে এলাম লন্ডনে।"

সেখানে এক হাসপাতালে কাজ করতেন এরনা। "লোকে জার্মানদের খুব অপছন্দ করতো। সারারাত ধরে মরাণাপন্ন রোগীর নার্সিং করলাম। বুড়ো সকালবেলায় যখন একটু সামলে উঠলো এবং বুঝলো আমি জার্মান, অমনি রেগেমেগে বলে উঠলো, তোমরা জার্মানিতে ফিরে যাও।"

এসবে মন খারাপ করতে নেই, শংকর। সবসময় ফাইটব্যাক করতে হয়। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিতাম, ফিরে গেলে তোমাদের হাসপাতালগুলো তো বন্ধ হয়ে যাবে। কে তোমাদের দেখবে?"

এই লন্ডনেই এক বান্ধবীর মাধ্যমে অমল গাঙ্গুলীর সঙ্গে এরনার আলাপ, অমল তখন লন্ডনে পি-এইচ-ডি করছে।

এরনা বললেন, "আমার বাবা প্রায়ই সাবধান করে দিতেন, বিয়েটা খুব কঠিন কাজ। পরামর্শ দিতেন, নিজের জাতের মধ্যে বিয়ে কোরো, তার বাইরে বিয়ে করতে চাও যদি তাহলে তোমাকে ফাইট-আউট করতে হবে। আমি অমলকে বিয়ে করে সুখী হয়েছি।"

"অমলের সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে গিয়েছি। খুব ভাল লেগেছে। অমল এসেছে আমেরিকায়। আমি এসেছি। ও আমেরিকান নাগরিকত্ব নিয়েছে চাকরির নিরাপত্তার জন্যে। আমি নিইনি।"

এরনা বললেন, "অমলের চাকরির মেয়াদ শেষ হোক, তারপর কোথায় শেষজীবন কাটানো যাবে ঠিক হবে। ভারতবর্ষে তোমাদের নানা সমস্যা আছে, কিন্তু বিশ্বাস করো এদেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী ইনটারেস্টিং। আমি

কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, অনেক দুঃখ-দারিদ্র্য নিজের চোখে দেখেছি—তবু বলবো ভারতীয় দৈন্যকে আমেরিকান দৈন্যের মতন দেখায় না। বিন্ধ্যাচলে হাঁটতে-হাঁটতে আমি অনেক পাখি দেখেছি—আকাশ, নদী, পর্বত আমাকে টেনেছে। মনে হয়েছে আমি ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। আমি বিধবা শাশুড়ির সঙ্গে নৌকো চড়ে নদীতে ঘুরেছি—আমার অশান্ত শরীর এবং মন শান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি কখনও এতো রিল্যাক্স্‌ড অনুভব করিনি। ভারতবর্ষের বাতাসে কিন্তু মাদকতা আছে—আমি ওখানে ফিরে যেতে চাই। আমার শাশুড়িকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম—কিন্তু তাঁকে কাছে রাখতে পারিনি। উনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমি তাই ইন্ডিয়ান মাদার খুঁজে বেড়াই। তুমি কি ভাবো, বিনা কারণে আমি দিব্যেন্দুর মায়ের কাছে ছুটে যাই? আমি ওঁর মধ্যে চিরন্তন ভারতবর্ষকে খুঁজে পাই।"

মিসেস এরনা গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওখান থেকে সুমিত্রা আমাকে অঞ্জন ঘোষের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা জানালেন, "অঞ্জনের মাও পুত্র-পুত্রবধূর কাছে থাকেন। ওঁর নাম উর্মিলা ঘোষ। অঞ্জনের স্ত্রীর নাম ক্যাথি। ওকে দেখলে আপনি আমেরিকান মেয়েদের সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস ফিরে পাবেন। মনে হবে বাংলায় লেখা কোনো উপন্যাসের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুটফুটে মেয়েটা।"

ক্যাথিকে আমি ষষ্ঠ নর্থ-আমেরিকান বাঙালি সম্মেলনে দেখেছি। একটি শাড়িপরা সুন্দরী মার্কিনী যুবতী সারাক্ষণ মুখবুঁজে কাজ করে চলেছে। ওঁর স্বামীই যে সম্মেলনের সমস্ত প্রোগ্রাম ভিডিও ক্যামেরায় তুলে নেবার দায়িত্ব নিয়েছেন তা বুঝিনি। অঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—অতি চমৎকার বাঙালি ছোকরা। বিনয়ী, শান্তভাব, সেবাপরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। এইসব ছেলেরা আছে বলেই বাঙালি-সংস্কৃতি এখনও তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে টিকে রয়েছে।

আমি যখন ঘোষবাড়িতে পৌঁছলাম তখন ক্যাথি বউমা কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরেনি—সে এখানকার ব্যাংকে দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছে, অঞ্জনও তখন অফিসে।

বসবার ঘরে ক্যাথি বউমা কিন্তু অনেকগুলি ছবির মধ্যে সদা উপস্থিত। ভারী পবিত্র মুখখানি। নিষ্কলঙ্ক যৌবনের প্রতীক হিসেবে যদি মার্কিন দেশকে কখনও

অঙ্কন করতে হয় তাহলে আমি ক্যাথির মুখখানির নির্বাচন করবো। নিষ্পাপ কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এই প্রাণশক্তিই মার্কিনদেশকে তার নিজস্ব মহিমা দান করেছে। এই নবীনতাই একদিন হয়তো আমেরিকাকে অন্যভাবে বিশ্বজয় করতে সাহায্য করবে।

উর্মিলা দেবী আমাকে কয়েক মুহূর্তে আপন করে নিলেন। বললেন, "কপালে কী ছিল বাবা, শেষ বয়সে বিদেশে আসতে হলো। তবু এখানে দিব্যেন্দুর মা আছেন মঞ্জু গোস্বামীর বাবা-মা আছেন, আমি আছি স্থায়ীভাবে—মাঝে-মাঝে দেখা হয়।"

উর্মিলাদেবী বললেন, "আমার ছেলে ভাল, কিন্তু বউমার তুলনায় কিছু নয়।"

উর্মিলা দেবীরা পাটনার লোক। ১৯৮১ সালে বারো বছরের ছেলে এবং ছয় বছরের মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তারপর এক সময়ে ছেলে চলে এসেছিল বিদেশে ভাগ্য সন্ধানে। শেষে বিয়ে করলো আমেরিকান মেয়ে। "আমার তো দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, বুঝতেই পারছো। আমেরিকান মেয়ে কবে শাশুড়ির তোয়াক্কা করেছে?"

"তা বাবা তোমায় কি বলবো, আমার ভাগ্য। সেই বিয়ের পর থেকেই বউমা লিখছে তোমাদের আমরা এখানে আনিয়ে নেবো। আমি বিশ্বাস করিনি, ভয়-ভয় করেছে। আমার মেয়েটা দেশ থেকে বি-এ পাশ করেছে, এম-এটা হলো না।

"বউমা শেষ পর্যন্ত আমাকে এখানে আনিয়ে নিলো, বউমাকে দেখে আমার ভাল লাগলো। ইমিগ্রেশনের হাঙ্গামা চুকিয়ে আমার মেয়ে এলো এক বছর পরে।

"আমরা তো বাবা দেশে চেপে-চুপে মেয়ে মানুষ করেছি। কিন্তু বউমা ননদকে রাস্তায় বেরনো, হাটে বাজারে যাওয়া, ব্যাংকের কাজকর্ম সব শিখিয়েছে। তারপর বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তুমি বিশ্বাস করবে, প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে আমার বউমা আনন্দ বাজারের পাত্রী চাই-এর বিজ্ঞাপনের উত্তর লিখেছে। তারপর নিজেই এখানকার ভারতীয়দের কাগজ 'ইন্ডিয়া অ্যাব্রডে' বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কী করে সম্বন্ধ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হয় তা আমার বউমা ধৈর্য ধরে শিখে নিয়েছে। তারপর এখানেই দেশ থেকে পাত্র আনিয়েছে বউমা। এখানে সবাইকে ডেকে হিন্দুমতে বিয়ে দিয়েছে—পুরুত ছিলেন ওই ডাক্তার ব্রজেশ পাকড়াশি এবং দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। মেয়ে-জামাই সুখী হয়ে দেশে ফিরে গিয়েছে, এখন আবার এখানে জামায়ের চাকরির জন্য অসংখ্য কোম্পানিতে চিঠি লিখে যাচ্ছে আমার আমেরিকান বউমা।"

উর্মিলা দেবী বললেন, "আমি বাবা ইংরিজী জানি না। বউমা তিনটে কথা শিখিয়েছে—হাই, ইয়েস, নো। বউমা জিজ্ঞেস করে, একটু ড্রিংক? ইয়েস্ অর

নো? বউমা আমার কথা হাবে-ভাবে বুঝতে পারে। আজকাল দু'একটা বাংলা কথা শিখেছে—মা এসো, টেবিলে যাও।"

"বউমা আমার ভীষণ অভিমানিনী। ভাষা না জানলেও কে কি নিন্দে করছে সব বুঝতে পারে। এখন নতুন একটা কথা শিখেছে 'ভারি বজ্জাত'।"

উর্মিলা দেবী জানালেন, তাঁর নাতনীর বয়স পাঁচ। সে কিন্তু ভাল বাংলা শিখেছে। বাবা মায়ের সঙ্গে ইংরিজীতে এবং ঠাকুরমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলে অনর্গল।

"আমি বলিনি, বউমা নিজেই শাড়ি পরে। আমাকে নিয়ে সব জায়গায় বেড়াতে যায়। আমার পুজোর ফুল আছে কিনা খোঁজ নেয়, ধূপকাঠি আছে কিনা অফিস থেকে ফোন করে জেনে নেয়।"

"আমার মুখ গোমড়া করে বসে থাকার উপায় নেই। অফিস থেকে ফিরে আমার মুখে হাসি না দেখলেই চটপট ডিনার সেরে গাড়ি বার করবে। অঞ্জনকে বলবে, চলো একটু ঘুরে আসি কোথাও মাকে নিয়ে, মাদারের মন ভাল নেই। মেম তো নয়, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী।"

আনন্দময়ী আমি থাকতে-থাকতেই ব্যাংক-এর কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলো। আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো, বললো, "এসেছো যখন তখন খেয়ে যেতেই হবে।"

আমি তখনও প্রণবের দেওয়া আমেরিকান মহিলাদের দাম্পত্যজীবনের স্ট্যাটিসটিক্‌সের কথা ভাবছি। ক্যাথির ওসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সে বললো, "দেখবে এই চমৎকার পৃথিবীটা ক্রমশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।"

মাথা নিচু করে আমি সেদিন দিব্যেন্দুধামে ফিরে এসেছি। ক্যাথি, এরনা এদের কথা বার বার মনে পড়ছে।

আর মনে পড়ছে, আমেরিকা-প্রবাসী ইহুদি লেখক আইজ্যাক সিঙ্গারের কথা। সিঙ্গার কিছুকাল আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যাঁরা সৃষ্টিশীল লেখক তাঁরা কোনো সাধারণ ফতোয়া জারি করেন না। তাঁরা কখনও দলের কথা বলেন না, তাঁরা সব সময় একজন মানুষের কথা লেখেন। অবশ্য লেখকের সাফল্যের উজ্জ্বল মুহূর্ত তখনই আসে, যখন সেই একজনের কথাই বহু মানুষের কথা হয়ে ওঠে।

আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি এই মুহূর্তে। সংখ্যাতত্ত্বের জালে আর ধরা পড়বো না, জাতের কথা, দলের কথা কখনোই বলবো না। আমি কেবল খুঁজে বেড়াবো আলাদা-আলাদা মানুষকে বিচিত্র এই মানবতীর্থে।

পরের দিন ভোরবেলায় রণজিৎ দত্ত ও শুভা সেন পাকড়াশি এবং আরও অনেকে আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। সিরাকিউজে রাত কাটিয়ে, নিউইয়র্কের বুড়ি ছুঁয়ে আমি এবার ফিরে যাবো ভারতবর্ষে।

শ্রীমতী শুভা সেন পাকড়াশি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। হার্ট ও হাইপারটেনশনে তাঁর গবেষণার কথা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত। তবু সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতন শুভা সরল মনে জিজ্ঞেস করলেন, "আমেরিকানদের এবং ভারতীয়দের এবার কেমন দেখলেন?"

বললাম, "আমেরিকানও দেখা হলো না, ভারতীয়ও দেখা হলো না—দেখলাম কতকগুলো ভালয়মন্দে মেশানো মানুষকে। না-দেখলে দুঃখ থেকে যেতো।"

রণজিৎ দত্ত আড়ালে ডেকে বললেন, "আপনাকে কয়েদিনের জন্যে পাওয়া গেলো, খুব আনন্দ হলো। পেটের দায়ে ভাগ্যের সন্ধানে অজানা দেশে হাজির হয়েছি আমরা—আমাদের কোনো ভুলত্রুটি হলে দেশের লোকদের ক্ষমা করতে বলবেন। আমাদের পাসপোর্টের রঙ যাই হোক না কেন, যে-দেশে জন্মেছিলাম অথচ যে-দেশে অন্নসংস্থান করতে পারিনি তার ছবিই আমাদের বুকের মধ্যে আঁকা রয়েছে এখনও।"

প্রখ্যাত জি. ই. কোম্পানির খ্যাতনামা গবেষক ডঃ রণজিৎ দত্ত মানুষটাকে প্রথম দর্শনে কাঠখোট্টা ভেবেছিলাম। এবার ভুল ভাঙলো।

রণজিৎবাবু চুপিচুপি বললেন, "দেশের লোকদের বলবেন, আমেরিকা মানেই কিন্তু সাফল্য নয়। এখানেও আমাদের সংগ্রাম আছে, অনিশ্চয়তা আছে, অপ্রাপ্তির বেদনা আছে। আর আছে নিঃসঙ্গতা—বিদেশে অচেনা মানুষের মধ্যে কখনও হারিয়ে যাই তার ভয় আছে সারাক্ষণ। যাতে হারিয়ে না যাই সেই জন্যেই আমরা বাংলায় গান শুনি, বাংলা কবিতা পড়ি, কোথায় কোন বাঙালি আছে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াই। অনেক কিছু পাবার জন্যে এদেশে এসে অনেকদিন পরে বুঝতে পারলাম, এদেশ যেমন দেয় তেমন অনেক কিছু কেড়েও নেয়।

এঁরা কারা? তিনসপ্তাহ আগে আমি তো এঁদের নামও জানতাম না। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য আশীর্বাদ—জানা দেশের নগরে নগরে আমি কত অজানা মানুষকে আবিষ্কার করলাম যাঁরা আমার আপন জন। সামান্য কিছু পাবার জন্যে

অনেককিছু দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

আমার চোখে জল আসছিল। মান সম্মান রেখে কোনোক্রমে এরোপ্লেনের ভিতরে এসে বসা গেলো।

সিরাকিউজের বুড়ি ছুঁয়ে অবশেষে নিউ ইয়র্ক। সেখানে বাংলাদেশের সদাশিব ডিপ্লোম্যাট আনোয়ার উল করিম চৌধুরী আমাকে আশ্রয় দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল।

জয় ও তার স্ত্রী মলি শ্রীঘ্রই ঢাকায় ফিরে যাবে। তবু জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় দেবার মুহূর্তে আনোয়ার ওরফে জয় জিজ্ঞেস করলো, "কয়েকদিনের ভ্রমণে দেশটাকে কি বুঝলেন?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "সব ভাল। কিন্তু অ-নে-ক দূ-র।"

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান যথাসময়ে আমাকে স্বদেশের সোনার মাটিতে পৌঁছে দিয়েছে। নম নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।

স্বগৃহের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে আমি অনেক দূরের মানুষদের সম্পর্কে আবার ভাবতে শুরু করেছি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁদের অনেকেই আমার মনের মধ্যে সময়ে-অসময়ে উঁকি মারতে শুরু করেছেন।

প্রবাসী মানুষগুলো কেমন? সাফল্য কী এঁদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের সৃষ্টি করেছে? ছেড়ে আসা দেশ সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাচিন্তা কি, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করছেন আমার প্রিয়জনরা। এরা কি শুধু অর্থই উপার্জন করেছেন, না নতুন সমাজ তাঁদের সম্মানের আসরে বসিয়েছেন? এঁদের নামে রাস্তা তৈরি হয়েছে কিনা? এঁদের মূর্তি বসানো হয়েছে কিনা? আরও অনেক বেশী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো যদি আমার গর্ভধারিণী মা বেঁচে থাকতেন। কিন্তু তিনি তো কয়েক বছর আগে চলে গিয়েছেন সেই সুদূর দেশে যেখানে আমাদের সকলকেই একদিন যেতে হবে।

সুদূর প্রবাসের স্বদেশবাসীদের মনোভাব এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করা যায় বহু চিন্তা করেও যখন সদুত্তর পাচ্ছিলাম না তখন চিঠি পেলাম ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাপাভ্যালির এক প্রবীণ বাঙালি ডাক্তারের কাছ থেকে। শশাঙ্ক মুখার্জি এম. ডি. বহু দশক আগে এদেশের ডাক্তারি ডিগ্রি পকেটে করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ভাগ্যসন্ধানে। বিখ্যাত কাইজার ফাউন্ডেশন হাসপাতালের চোখ ও ই-এন-টি বিভাগের প্রধান তিনি। কয়েকটি বিখ্যাত ব্যবসায়েরও মালিক এই শশাঙ্ক মুখার্জি—এঁর প্রতিষ্ঠানের তৈরি ওয়াইন হোয়াইট হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের টেবিলে ব্যবহার হয়। এঁর নামে ন্যাপাভ্যালিতে আমেরিকানরা রাস্তা করে দিয়েছে—আমেরিকার একমাত্র মুখার্জি অ্যাভিনিউ।

অজাতশত্রু মানুষ এই শশাঙ্ক মুখার্জি। বয়স বোধহয় সাতের দশকে।

বিদেশিনী বিবাহ করেছেন। প্রবাস-জীবনের সুখ দুঃখ নিয়ে ছোট্ট চিঠি লিখেছেন। বহু বছর ধরে প্রবাসের আনন্দ-বেদনা দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে তিলে তিলে উপলব্ধি না করলে এমন চিঠি লেখা যায় না। শাশাঙ্ক মুখার্জিই আমার কাছে এই মুহূর্তে প্রবাস-জীবনের সিম্বল।

বয়োবৃদ্ধ শশাঙ্ক মুখার্জি লিখেছেন : "উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি আমরা—উজ্জয়িনীর যক্ষের মতন আমরা অভিশপ্ত না হলেও আমরা স্ব-ইচ্ছায় এই প্রবাস জীবন স্বয়ম্বর রূপে বরণ করে নিয়েছি। আমরা মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূর চলে এসেছি। শৈশবের শিশির সিক্ত ফুলের গুচ্ছ শুষ্ক ছিন্নপত্রের মতন পিছনে আমরা ফেলে এসেছি। বরণ করে নিয়েছি আমাদের এই প্রবাস জীবন প্রখর মধ্যাহ্নের কর্মক্ষেত্র।

"এই নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সঞ্চয় করেছি অনেক কিছু। সাংসারিক, আর্থিক উন্নতি করেছি। প্রবাসজীবনকে বেশ কিছুটা সার্থকও করে তুলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার মনে হয় আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শান্তি অপরিপূর্ণ। আমাদের মনের গহন কোণে বেশ বিরাট কিছুটা যেন নেই।

"প্রবাসের এই মহান দেশে রূপে-বর্ণে-গন্ধে-ভরা সব কিছুই আছে,—আকাশ আছে, বাতাস আছে, এখানেও ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে, সূর্যাস্ত হয়, একের পর এক ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পূর্বোত্তর জীবনের নদীর কল্লোর, শাল পিয়ালের তরুমর্মর, পাখির গান, মেঘের কোলে ভাসমান হংস-বলাকা এসব শুধু আমরা স্বপ্ন-সিক্ত মনে অনুভব করতে পারি—কিন্তু পার্থিবভাবে তাদের আবির্ভাব আমাদের জীবনে এখানে হয় না।

"ভোরবেলাকার সানাইয়ের সুরের ভৈরবী আলাপ মাঝে-মাঝে মনে পড়লে আমাদের মন উতলা হয়ে ওঠে—চোখ ঝাপসা হয়ে পড়ে। কশ্চিৎ-কান্তা বিরহ বিধুরার মতন আমরা ধ্যানমগ্ন হয়ে স্তব্ধভাবে বিধাতা-পুরুষের বিচার সহন করি। মনে আকুলতা জাগে, হয়ত বা আমার অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতন ভাগ্যের পায়ে নামহীন, সঙ্গীহীন।

"বিশিষ্ট সুন্দর এই দেশ—এদেশে রুদ্র-বৈশাখের আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাপক্লিষ্ট বৈশাখের আকাশে দিনের চিতা জ্বলে ওঠে না। তরল-অনল এখানে অম্বরতল থেকে গলে পড়ে না। দিক-বধূ মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে অশ্রুজল ছল-ছল চোখে চেয়ে থাকে না।

"বর্ষা এখানেও আসে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোণ থেকে গুরু-গুরু মেঘ গরজি-গরজি গর্জন করে ওঠে না। এখানকার ঘন বরষার উত্তাল তুমুল ছন্দ নেই —শ্রাবণ-সন্ন্যাসী নব-ঘন বিপুল মন্ত্রে আমাদের প্রাণে রাগিণী রচনা করে না।

"এখানকার ধরায় বসন্ত তার নবপল্লব পুলকিত মিলনমাল্যের উপহার আনে, কিন্তু প্রাঙ্গণে আমাদের শিরীষ শাখা নেই। ক্ষান্ত কূজন, শান্ত-বিজন সন্ধ্যাবেলায় এখানে ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটাবার খেলা হয়ে ওঠে না। কুঞ্জবনে এখানে দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণ নেই। বসন্তের মাধবী মঞ্জরী মালঞ্চের অঞ্চল এখানে ভরে দেয় না। এখানে বকুল নেই, পারুল নেই। রজনীগন্ধা নেই। এখানে নেই তাল-তমাল অরণ্য। প্রবাস-কাননে আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ নেই—বন-বিথীকায় কীর্ণ বকুল পুষ্পও ফুটে ওঠে না।

"এখানে সীমাহীন নদ-নদী-গিরি-পর্বত দূর-দিগন্ত সবই আছে। কিন্তু মানসচক্ষে আমরা কেবল অলকানন্দ মিশেছে যেথায় অগ্নিহোত্রী সাথে সেই আলেখ্যই দেখতে চাই। মনে-মনে আমরা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমে মানস যজ্ঞ করি, তর্পণ করি।

"এখানেও পথ আছে—সীমাহীন দিগন্ত-বিস্তৃত পথ, কিন্তু মন আমাদের পড়ে আছে গ্রামের শেষের সেই রাখাল-ছেলের বাঁশির সুর ভরা রাঙামাটির পথে। সেই তেপান্তরের মাঠ—যেটা হয়ত ময়নামতীর ঘটে গিয়ে শেষ হয়েছে।

"এ দেশে—এই বিরাট এই মহান দেশে আছে সবকিছু। সবকিছুরই পরিপূর্ণতা আছে এই দেশে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের এই প্রবাস জীবনের একটা প্রধান পাথেয় যেন নেই। আমাদের দেহ এখানে তৃপ্তিময় প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও মন আমাদের তাই অতৃপ্ত, অশান্ত..."

বার বার পড়েছি এই লেখাটা এবং চোখের জল ফেলেছি। সমস্ত জীবন ধরে প্রবাস-বেদনার আগুনে না পুড়লে কলম থেকে এমন লেখা এখন অবলীলাক্রমে বেরিয়ে আসে না। আমার মনে হয়েছে, সুদূর মার্কিন মহাদেশে যেসব অতৃপ্ত প্রবাসীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল তাঁদের সবাই এই চিঠির মাধ্যমে স্বদেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন।

মানবসাগর তীরে

ভ্রমণকাল
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯০

রচনাকাল
জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৯১

ধারাবাহিক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৯১

প্রথম দে'জ সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৯১

উৎসর্গ
কলকাতা হাইকোর্টের প্রথিতযশা আইনবিদ
শ্রীশক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু

লেখকের নিবেদন

বহুজনের পরামর্শ, সাহায্য ও সমালোচনা ছাড়া আমার পক্ষে ফরাসি দেশ সম্পর্কে এই বই লেখা যে আদৌ সম্ভব হতো না তা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা, ইংরিজি ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য বই থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছি। এইসব লেখকদের সকলকে জানাই আমার নমস্কার। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, কিন্তু সাময়িকপত্রে মুদ্রিত, বহু রচনার ওপরেও প্রাণের দায়ে চোখ বুলোতে হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার এইসব লেখকদেরও জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।

খাস ফরাসি শব্দকে ভেতো বাঙালির উপযুক্ত করে বুঝিয়ে দেবার ব্যাপারে সবসময় হাসিমুখে সাহায্য করেছে শিবপুরের প্রতিবেশিনী চুমকি চ্যাটার্জি। এই ভাল মেয়েটির ভাল নাম শ্রীপর্ণা।

উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং নিরন্তর খোঁজাখুঁজিতে সহায়তা করেছেন অনুসন্ধানী লেখক শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। বোম্বাই থেকে অকাতরে রসদ জুগিয়েছেন প্রসন্নহৃদয় শ্রীসলিল ঘোষ। মাঝপথে আলাপ-আলোচনা করে এবং প্রয়োজনে কাগজপত্তর জুগিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীমতী পারমিতা উকিল, শ্রীবুড়োশিব দাসগুপ্ত, শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুজয় গুপ্ত, শ্রীনীলাদ্রি চাকি ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবীন সন্ন্যাসী স্বামী সমর্পনানন্দ।

ধারাবাহিক প্রকাশকালে যাঁরা আমার নানারকম খামখেয়ালির প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁরা হলেন প্রখ্যাত লেখক ও সম্পাদক শ্রীরমাপদ চৌধুরী ও তাঁর সাহিত্যপ্রেমী সহকারী শ্রীরাধানাথ মণ্ডল।

এই বইয়ের সৃষ্টিকালে দীর্ঘ ষোলো মাস ধরে আমার সমস্ত অবহেলা ও অপরাধ নীরবে ক্ষমা করেছেন সহধর্মিণী শ্রীমতী বন্দনা মুখোপাধ্যায়। ফরাসি ভব্যতার ব্যাকরণ অনুযায়ী তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আরও অনেকের কথা বলা প্রয়োজন, কিন্তু তাঁরা প্রায় সবাই রয়েছেন চরিত্র হিসেবে এই বইয়ের পাতায়। এঁদের যিনি প্রধান তিনি আগাম কথা আদায় করে নিয়েছেন তাঁকে অথবা তাঁর পরিবার কাউকে কোনোরকম ধন্যবাদ দেওয়া যাবে না।

শংকর
২৩ ডিসেম্বর ১৯৯১

শ্রীহরি শরণম্। আপাতত আমি ফরাসি দেশের প্যারিস শহরে। সেই মহানগরে, যার ললাটে শতবর্ষ আগে আমাদের এই কলকাতা শহরের এক সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী জয়তিলক এঁকে দিয়েছিলেন। বিশ্বের সর্বত্র যখন ইংরেজ ও লন্ডনের প্রশ্নহীন প্রতাপ, তখন সিমুলিয়া গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বিশ্বনাগরিক নির্দ্বিধায় সাদা বাংলায় লিখেছিলেন, "কলিযুগের একাধিপতি ইউরোপকে বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রান্সকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোকআঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্টি ভাব এই পারি নগরীতে।"

মহাজ্ঞানী মহাজন এইখানেই থেমে থাকতে পারেননি। উচ্ছ্বাস দমন না করেই লিখেছেন : "এই পারি নগরী যে ইউরোপী সভ্যতাগঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দনগরী।"

ফরাসি দেশে পদার্পণ করবার কোনওরকম পরিকল্পনা আমার ছিল না। দু' বছর আগে মার্কিন দেশে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েই আমার ভ্রমণের শখ পুরোপুরি শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে পাশপোর্ট আর ডজন কয়েক নোটবই নিয়ে নিজের মাল নিজে সামলাতে-সামলাতে এক এয়ারপোর্ট থেকে আর এক এয়ারপোর্টে ছোটাছুটির মধ্যে গতি থাকলেও সুখ নেই। আমি কুঁড়ে বাঙালি, বাবু বাঙালি আমি হাত-পা মুড়ে হাওড়া-শিবপুরে ঘরের এক কোণে বসে থাকতে চাই, আমি বাপু কোনো সাতেপাঁচে নেই, দুনিয়ার প্রতিও আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। ছোটাছুটি করে বিশ্বভ্রমণ ঘরকুনো মানুষের পড়তায় পোষায় না। আমি জানি, শ্রীহরি যদি ইচ্ছে করেন তা হলে দুনিয়াই আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, ঘরের খাটিয়ায় বসেই আমার বিশ্বদর্শন হয়ে যাবে।

পায়ের তলায় যত সরষে ছিল সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যখন মনের সুখে শিবপুরে বসেছিলাম ঠিক সেই সময়েই অঘটন ঘটলো। অথচ এমন হবার কথা

• মিছরিদার কথা অমৃতসমান, আলোচনা করেছি 'জানা দেশ অজানা কথা' বইতে।

নয়। কাসুন্দের পড়শি এবং আমেরিকা ভ্রমণের সময় আমার পড়ে পাওয়া গার্জেন মিছরিদা* পর্যন্ত সেবার দেশে ফেরার পর আমার হাতের চেটোর দাগগুলো অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "তোর বিদেশ ভ্রমণ যোগ শেষ হলো, ওই লাইনগুলো সব মুছে গিয়েছে। পরের পিছনে না ছুটে তুই এবার নিজেকে আবিষ্কার করবি। নিজের মধ্যে তুই দুনিয়াকে খুঁজে বের কর।"

অতীব উপাদেয় প্রস্তাব। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে সময় কাটানোর সত্যিই কোনও মানে হয় না। মানুষ দেখার সম্ভাবনা এবং দু'একটা গল্প খুঁজে পাবার লোভ না থাকলে কস্মিনকালে কেউ আমাকে হাওড়া ছাড়া করতে পারতো না। কিন্তু ওই যে বলে, লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু! মিছরিদা আমার অবস্থা বুঝেছিলেন কিছুটা। আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "বেলুড়মঠের প্রতিষ্ঠাতা তো প্রেসক্রিপশন দিয়ে গিয়েছেন, কখনও হীনমন্যতায় ভুগবি না। কোন দুঃখে তুই আমি পাপীতাপী হতে যাবো? আমরা হলাম কিনা যাকে বলে অমৃতস্য পুত্রা। তুই লেখার আশায় বিদেশে ছুটে যাস, কলজের জোর না থাকলেও। তুই হলি কিনা সেই ফলওয়ালা, রথ সম্বন্ধে আগ্রহ না থাকলেও যাকে রথযাত্রায় কলা বেচতে যেতে হয়।"

মিছরিদা ও আমি একমত যে, দুনিয়ায় দু'একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা না থাকলেও, নাথিং লাইক ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত, নাথিং লাইক বেঙ্গল, এবং সকলদেশের সেরা আমাদের এই হাওড়া কাসুন্দিয়া অ্যাণ্ড শিবপুর। মিছরিদা পাঁচবার দুনিয়া ভ্রমণ করে এসেও প্রার্থনা করেন, "মা গো যখন এই দেশে জন্মাবার চান্স দিয়েছো তখন অপ্রবাসী, অঋণী হয়ে যেন এই দেশেতেই মরি।"

বিদেশের নানা বিপদ সম্বন্ধে মিছরিদা বার বার আমাকে অবহিত করেছেন। ঘর ছেড়ে পথে বেরুনো মানেই তো বাঙালির প্রাণসংশয়। অমন যে অমন জাঁদরেল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি গ্রিফোর্থ সাহেব ছিলেন, তিনিও অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর আশঙ্কা—"প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে এদেহ আকাশ হতে..." মিছরিদা এরপরেই বলেছিলেন, "ওই অঘটন ঘটলে কিছুই করার থাকবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব টাকা খরচ করলেও ফরেন থেকে বডি হাওড়ার বাঁশতলা বা কলকাতার কেওড়াতলা বার্নিংঘাটের জন্যে ফিরে আসবে না। ফলে দেশের শেষ সম্পর্ক গানফট্।"

এসব আলোচনা সত্ত্বেও অঘটন কেমনভাবে ঘটলো, কীভাবে আমি এই ফরাসি দেশে পদার্পণ করলাম তা আপনাদের খোলাখুলি জানাতে হবে যথাসময়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি প্যারিস নগরীর চোদ্দ নম্বর পল্লীর অ্যাভিনিউ জঁ মুলিন-এর পাঁচতলায় বসে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। এখন সকাল দশটা। আমি

একটু দেরি করে ফেলেছি। জ্যাক বেনোয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সুযোগটা না হাতছাড়া হয়ে যায়।

২১ নম্বর জঁ মুলিন অ্যাভিনিউ থেকে আমার গন্তব্যস্থল ২৬ রু বেনার্ড। দুটোই ১৪ নম্বর পল্লীতে—যা কলকাতার ওয়ার্ড নম্বরের মতন। সুতরাং দূরত্ব বেশি নয়। আমার স্নেহময়ী আশ্রয়দাত্রী মোটর গাড়িতে ওখানে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। কলকাতা ছাড়া দেশের ও বিদেশের সর্বত্র আমার পথ হারিয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও পুরনো ঠিকানা খুঁজে পাই না। কিন্তু প্যারিস সত্যিই আলাদা। এই চোদ্দ নম্বর পল্লীটা অন্তত আমাদের কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলের মতন, রাস্তাঘাটে একা চলতে ভরসা পাই, পথ হারাবার আশঙ্কায় ভুগতে হয় না।

জঁ মুলিন অ্যাভিনিউতে গাড়ি কলকাতার রেড রোডের স্পিডে সারাক্ষণই চলছে। ওই রাস্তাটা একবার ধৈর্য ধরে পেরোতে পারলে আর কোনো চিন্তা নেই।

রু বেনার্ড-এ পৌঁছনোর পাঁচ-ছ'টি পদ্ধতি রয়েছে। খুব বড় রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আমার লোভ গলিঘুঁজির দিকে—বলতে পারেন সরু গলির শহর হাওড়ায় সারাজীবন কাটানো থেকে উদ্ভূত মানসিকতা। স্বীকার করে নিচ্ছি, গলি পেলে রাজপথ আমার পছন্দ হয় না। এ-ব্যাপারে পৃথিবীর সমৃদ্ধশালী নগরীর অন্যতম প্যারিস যে অনেকটা কলকাতার মতন তা আমার ধারণা ছিল না।

প্যারিস এমন এক শহর যা কারুর মনেই দূরত্ব সৃষ্টি করে না। বহু বছর ধরে পরকে আপন করে নিতে এই শহরের তুলনা নেই। আমার মতন ভেতো বাঙালিকেও প্যারিস টানছে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্যারিসের এই সময়টা বেশ উপভোগ্য—বাঙালি পরিমাপে একটু শীতশীত ভাব, কিন্তু কোট ফুটো করে হাড়ে কাঁপুনি ধরাবার কোনও চেষ্টা নেই। এই সময়ে আমার মতন কুঁড়েও হাঁটবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাঁটছি, অথচ প্যারিস আমাকে তাড়া দিচ্ছে না, ধাক্কাও মারছে না।

এখানকার ছোট-ছোট গলির বাড়িগুলো আমাকে উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই সরু-সরু বারান্দা, সেই একই ধরনের জানালা। শতখানেক বছর আগে কলকাতা এইভাবে যে প্যারিসের স্থাপত্য টুকলিফাই করেছিল তা আমার জানা ছিল না। জানি না, হয়তো ইংরেজ সায়েবরাও ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে এই স্থাপত্যের মায়ামোহে পড়েছিলেন এবং কলকাতায় ফরাসি স্থাপত্য এসেছিল ভায়া লন্ডন। ইতিহাসের সেই লন্ডন, জার্মানদের বোমার গুঁতোয় চল্লিশের দশকে বিলুপ্ত হয়েছে—কিন্তু টিকে আছে প্যারিস। প্যারিসের সঙ্গে কলকাতার শুধু একটাই তফাত। কলকাতায় এই মহামূল্যবান স্থাপত্য নিদর্শনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মলিন। তার সর্বাঙ্গে অকালবার্ধক্যের ইঙ্গিত। আর প্যারিসের বাড়িগুলো আধুনিক

দেশলাই বাক্স স্থাপত্যকে দাবড়ি দিয়ে যেন বলছে, চ্যাংড়ামি কোরো না, বেশি বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। প্যারিসের এই স্থাপত্য যেন চিরযৌবনা, তার কপালে ক্লাসিক ডিগনিটির অক্ষয় তিলক।

প্যারিসের পথ ধরে যেতে-যেতে মনে হলো, আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের নগরগুলোকেও এমন সুন্দর এমন অনন্তযৌবনা রাখতে পারতাম। একটু ধুলো ঝেড়ে, মাঝে-মাঝে একটু রঙের পলেস্তারা লাগিয়ে আমরা উত্তর কলকাতার গৃহমালাকে পৃথিবীর দর্শনীয় বস্তু করে তুলতে পারতাম। সত্যিকথা বলতে কী, কলকাতায় এই বাড়িগুলো যে সত্যিই এতো সুন্দর তা প্যারিসের এই অঞ্চলে এসে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম। আমার মনে পড়লো, শুধু উত্তর কলকাতা নয়, আমাদের হাওড়া, শালকে, কাসুন্দিয়া, শিবপুরেও এমন অগণিত মধ্যবিত্ত আবাস আছে যা সোজা এনে প্যারিসে বসিয়ে দেওয়া যায়।

প্যারিসের অলিগলি ধরে রু বেনার্ড-এর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে আর একটা জিনিস নজরে পড়লো। স্থপতিদের এখানে বিশেষ সম্মান। প্রতিটি ছোট বাড়ির দরজার মাথায় স্থপতির নাম ও বাড়ি তৈরির বছরটা খোদাই করা হয়েছে। বাড়ির জন্মবৎসরটা বড় করে লিখে রাখাটা এই সেদিন পর্যন্ত সমস্ত বাংলায় রেওয়াজ ছিল—এমনকি মফস্বলের টাউনেও। কিন্তু স্থপতিকে সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়াটা আমাদের রক্তে নেই। তাই আমরা জানি না তাজমহলের ডিজাইন কে করেছিলেন, আমরা কেবল জানি সেই সম্রাটের নাম যিনি ওই প্রকল্পের বিল পাশ করেছিলেন। স্রষ্টাকে অসম্মান করার এই ধারা স্বাধীনতার পরেও আমরা নির্লজ্জভাবে চালিয়ে যাচ্ছি স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, এমনকি চিত্রকলায়। তাই রাজপথে কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় যে মন্ত্রী বিল পাশ করেছেন তাঁর নাম নির্লজ্জভাবে ফলাও করে সরকারি খরচে বিজ্ঞাপিত হয়, কিন্তু থাকে না তাঁর নাম যিনি এই মূর্তির স্রষ্টা। স্থপতিদের অবস্থা আরও খারাপ, বিশেষ করে এই বাংলায়। প্রত্যেক বাঙালি মধ্যবিত্ত নিজেকে একজন প্রতিভাবান আর্কিটেক্ট বলে মনে করেন এবং নিজের বাড়িটিকে নিজে ডিজাইন করাকে তাঁর ফান্ডামেন্টাল অধিকার বলে মনে করেন। কিছু-কিছু ব্যতিক্রম ইদানিং দেখা যাচ্ছে—যেমন কলকাতার উপকণ্ঠে সল্টলেকের বিধাননগরীতে। কিন্তু সেখানেও একজন গৃহস্বামীও স্থপতিকে স্বীকৃতি দেননি তাঁর নামটিকে বাড়ির কোথাও লিখে রেখে। ফরাসিরা এবিষয়ে অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। শত-শত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন, শুধু পয়সাতেই সৃষ্টিশীল মানুষের হৃদয়পূর্ণ হয় না, তাঁদের বাড়তি প্রয়োজন স্বীকৃতির এবং তারিফের।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়লো, বাঙালিদের মতন ফরাসিদেরও একসময় সময়জ্ঞানের অভাব ছিল। নির্ধারিত সময়ের একঘণ্টা

পরে হাজির হওয়াটা কলকাতার অনেকের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু আমার গৃহস্বামী আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, ফরাসিরা এখন ঘড়িকে পুজো করতে আরম্ভ করেছে। ঠিক সময়ে পৌঁছনোটা এখানে ভীষণ প্রয়োজনীয়। গৃহস্বামীর সংযোজন : ফরাসিরা আড্ডাবাজ, কুঁড়ে, পলিটিক্সপ্রিয় যেমন আমরা বাঙালিরা। কিন্তু নতুন ফ্রান্স ওই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেভাবে মুছে ফেলেছে তাতে শেষ পর্যন্ত ধ্রুপদী স্বভাবগুলো নিজের চোখে দেখতে হলে বাঙালিদের দেখতে হবে।

এদিকে বাঙালিরা সত্যিই বিশিষ্ট—কৈ হ্যায় ইংরেজ সায়েবের স্বভাবচরিত্রি এখন কলকাতার 'সাহেব' কোম্পানিগুলো ছাড়া যেমন কোথাও নেই, তেমনি আদ্যিকালের আসলি ফরাসি মেজাজের শেষ পীঠস্থান এই কলকাতা।

মিছরিদা একবার নিউইয়র্ক থেকে ভায়া প্যারিস কলকাতায় ফিরে এসে রসিকতা করেছিলেন, "বড্ড দুঃসময় রে! নিজের চোখে দেখে এলুম : ফরাসিরা ইংরেজ হবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে ; ইংরেজরা আমেরিকান হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, আর মার্কিনিরা জাপানি হবার জন্যে যথাসর্বস্ব পণ করে বসে আছে। আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ জাপানিদের মধ্যে কোনও রকমে কিছু ভারতীয় ভাইরাস ঢুকিয়ে দেওয়া! নাহলে শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতে মাত্র দুটো সভ্যতা থাকবে জাপানি আর জার্মান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৫ সালে শেষ হয়নি ; কেবল প্রথম ইনিংসে জাপান ও জার্মানি ফলো অন করেছিল। সেকেন্ড ইনিংসে ওরা দুনিয়ার প্রায় সবক'টা উইকেট টপাটপ নিয়ে বসে আছে, লাস্ট উইকেটে দাঁড়িয়ে আমেরিকা ঠক ঠক করে কাঁপছে, খেলা শেষ হলো বলে!"

এসব চিন্তা যথাসময়ে বিস্তারিতভাবে করা যাবে। এই মুহূর্তে আমি জ্যাক বেনোয়ার কথা ভাবছি। জ্যাক বেনোয়া এখন একটি অখ্যাত নাম ; কিন্তু এমন একদিন আসতে পারে যেদিন তাঁর নাম জানবে না এমন কোনও লোক হয়তো পৃথিবীতে থাকবে না।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্স, নব-নব চিন্তাধারার পবিত্র তীর্থভূমি। জ্যাক বেনোয়া এই মুহূর্তে যে স্বপ্ন দেখছেন তার জন্যেও ফরাসিদেশ হয়তো একদিন সমগ্র মানবসমাজের অভিনন্দন লাভ করবে। নব-নব চিন্তার জন্মদাত্রী ফ্রান্সের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই শতাব্দীর শুরুতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন : "লন্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট ; নেই সে ফরাসি মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসি মানুষ।...এ অদ্ভুত ফরাসি চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন...এরা যা করে তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জার্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক, বা সমাজনীতিতেই হোক।"

জ্যাক বেনোয়া এখনও জগদ্বিখ্যাত হননি। বিশ্বের সংবাদপত্র শিরোনামে তাঁর

নামও ওঠেনি; কিন্তু যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তা একদিন সমস্ত বিশ্বের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

বলা বাহুল্য, জ্যাক বেনোয়া একজন ব্যবসাদার। ফরাসি সমাজের আর এক বৈশিষ্ট্য এখানকার কোটিপতিদের মধ্যেও নানা উদ্ভট চিন্তার উদয় হয় এবং বিপুল উদ্যমে সেই সব আপাত অসম্ভব ভাবনাকে সম্ভব করে তোলার জন্যে তাঁরা তৎপর হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে আমাদের দেশের ধনকুবেরদের সঙ্গে ফরাসি ধনীদের অনেক পার্থক্য।

জ্যাক বেনোয়ার নাম আমার কানে পৌঁছনোর কথা নয়। ব্যাপারটা আকস্মিক। একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকানে ঢুকেছিলাম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যের প্রকাশ এদেশে অতুলনীয়। তার ছাপ রয়েছে মুদিখানার দোকানে, মনিহারি দোকানে, এমনকি ডাইংক্লিনিং-এ। মনিহারি দোকানে ঢুকে যখন এঁদের সাজানোর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করছি তখন হঠাৎ নজরে পড়লো একটি চমৎকার পোস্টার। পোস্টারের ভাষা ফরাসি। সুতরাং অক্ষরগুলি পাঠযোগ্য হলেও তার অর্থ আমার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো কয়েকটি পরিচিত সংস্কৃত শব্দ যেন পোস্টারে উঁকি মারছে। আমার সন্দেহ অমূলক নয়। প্রাচীন একটি ভারতীয় উদ্ধৃতিই এই পোস্টারের মর্মবাণী। দোকানদার বললেন, "বিভিন্ন কোম্পানি আমাদের কাছে শুভেচ্ছাপত্র পাঠায়। এটি বিশেষ ভাল লাগায় দোকানে টাঙিয়ে রেখেছি।"

যে-কোম্পানি এই অভিনব শুভেচ্ছাপত্র পত্র পাঠিয়েছে তার নামও জানা গেলো।

এই নাম শুনেই, আমার গৃহস্বামী বললেন, এই কোম্পানি তাঁর বিশেষ পরিচিত। কোম্পানিটি ফরাসি মাপে তেমন বড় না হলেও ভারতীয় মাপে নেহাত ছোট নয়—বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ একশ কোটি টাকা। একশ কোটি টাকার বিক্রির কোম্পানি আমাদের দেশে শতখানেকও নেই।

পৃথিবীতে এতো জিনিস থাকতে প্রাচীন ভারতের বাণী ফরাসী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা ভাবতে কিছু অবাক লাগছিল। এই বাণীটি আবার সামান্য একজন দোকানদারের এতো ভাল লাগবে যে তিনি এটা দোকানে সাজিয়ে রাখবেন এটাও আশ্চর্য ব্যাপার।

এই কোম্পানির নাম বেনোয়া এস এ। কোম্পানি মনোমোহন প্যাকিং-এ বাদাম এবং শুকনো ফলের ব্যবসা করেন। যে কোনও দোকানে ঢুকলেই শেলফে বেনোয়া প্যাকিং দেখা যাবে। স্রেফ বাদাম বেচেই ১০০ কোটি টাকা করা এদেশে এমন কোনও ব্যাপারই নয়।

বেনোয়া লোকটি হয় অসাধারণ, না হয় ছিটগ্রস্ত, বললেন ওঁরই পরিচিত এক

ভদ্রলোক। ডেমোক্র্যাসির দ্বিতীয়পর্ব নিয়ে ওঁর মাথায় কী সব উদ্ভট পরিকল্পনা আছে বলেও জানা গেলো।

তারপর ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে যা শুনলাম তাতে আমার কৌতূহল শতগুণ বেড়ে গেলো। জ্যাক বেনোয়া তাঁর কোম্পানিতে শ্রমিকদের নিয়ে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন তার কোনও তুলনা আমার জানা নেই।

জ্যাক বেনোয়া একজন মোটামুটি সফল ব্যবসায়ী, কিন্তু তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষা আমার মতন একজন বঙ্গসন্তানের এমন কৌতূহল উদ্রেক করছে দেখে ভদ্রলোক নিজেই বিস্মিত।

বিস্মিত হবার মতনই কথা, কারণ জ্যাক বেনোয়া তাঁর কর্মচারীদের এমন কিছু অধিকার দিয়েছেন যা কস্মিনকালে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। এই কোম্পানির বিশিষ্টতা, এখানের কোম্পানির বড় কর্তাকে শ্রমিকরা প্রতি বছর ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে থাকেন। এই আশ্চর্য ক্ষমতা কোম্পানির মালিক জ্যাক বেনোয়া নিজেই কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রতি বছরেই কোম্পানির প্রধান হিসেবে ভোটে দাঁড়াতে হয় এবং যদি প্রয়োজনীয় ভোট না পান তা হলে তাঁকে সরে যেতে হবে। এই ব্যবস্থার নড়নচড়ন সম্ভব নয়, কারণ শ্রমিকদের এই অধিকার লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে, কোম্পানির সংবিধান পরিবর্তন করাও শ্রমিকদের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয়।

ম্যানেজমেন্টের জগতে জ্যাক বেনোয়াকে লেনিনের মতন একজন বিপ্লবী বলা চলতে পারে। পৃথিবীর কোনও কোম্পানির কর্ণধার এই ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। অথচ নতুন চিন্তার জন্মভূমি ফ্রান্সে একজন মানুষ এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজে নেমেছেন।

জানাশোনা এক বন্ধুকে ইংলন্ডে ফোন করলাম। তিনি তো সোজা বলেই বসলেন, "বদ্ধ পাগল নিশ্চয়! পাগলের দেশে পাগলরা পাত্তা পায় অনেক সময়!"

আমি বললাম, "রাজার রাজ্যে যখন কেউ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখলো এবং বললো কোনও প্রজা ভোটের জোরে রাজশক্তিতে আরোহণ করবে তখন সেটাও তো এক ধরনের পাগলামি মনে করেছিল পৃথিবীর অনেকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে তা তো সম্ভব হলো।"

বন্ধুবর ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত এক কোম্পানির সেজ সায়েব। আমাকে পাত্তা দিলেন না। টেলিফোনে বললেন, "পাগল ফরাসিদের হাতে কর্তৃত্ব চলে গেলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না। ওয়ার্কারের ভোট না পেলে টাটা কোম্পানির রুসি মোদী, রিলায়েন্সের ধীরুভাই আম্বানি, হিন্দুস্থান লিভারের সুষীমমুকুল দত্ত, আই-টি-সি-র সপ্রুকে পোস্ট থেকে সরে যেতে হবে এটা কল্পনাও করা যায় না। ওয়ার্কাররাও এটা চাইবে না, কারণ এর অর্থ নৈরাজ্য!"

আমি বললাম, "একটু ধৈর্য ধরুন না, মিস্টার রায়। ব্যাপারটা আমি একটু খতিয়ে দেখে যাই।"

মিস্টার রায় ইংলিশ চ্যানেলের ওপার থেকে বললেন, "এমনিতেই ভারতবর্ষের কলকারখানায় হাজার রকমের অসুবিধে ওয়ার্কারদের নিয়ে, ইউনিয়নের মাথায় আবার নতুন রোগ ঢুকিয়ে দেবেন না। শুনুন, শংকরবাবু, কোম্পানির কর্তা নির্বাচন করার অধিকার তাঁদের, যাঁরা গাঁটের কড়ি খরচ করে কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যাঁরা অংশীদার। লাঙল যার জমি তার যেমন, টাকা যাঁর কোম্পানির পরিচালক নির্বাচনের অধিকার তাঁর।"

মিস্টার রায় এতোই বিরক্ত হলেন যে বললেন, "ফ্রান্সে অনেক কিছু দেখার এবং শোনার আছে। লুভে যান, কাফেতে যান, আইফেল টাওয়ারে চড়ুন, ফরাসি সুন্দরীদের দেহতত্ত্ব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন, ফরাসি চিত্রশিল্পীদের কাজকর্ম দেখুন। কোনও পাগলের পিছনে ছুটে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না।"

ওঁর কথায় একটু ঝাঁঝ ছিল, তাই আমার ঝোঁকও নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঢলে পড়লো। আমি ভাবলাম, আইফেল টাওয়ারে না চড়লেও দুনিয়ার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, লাখে-লাখে ভারতীয় ইতিমধ্যেই ওই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ; কিন্তু জ্যাক বেনোয়াকে এখনও বোধহয় কেউ দেখেনি। ব্যাপারটা ভালভাবে জানতেই হবে।

তারপরেই একটা খবরে একটু দমে গেলাম। ইচ্ছে করলেই জ্যাক বেনোয়ার সঙ্গে দেখা হয় না। কারণ তাঁর কোম্পানির কর্মকেন্দ্র প্যারিসে নয়, দক্ষিণপূর্ব ফ্রান্সে। লিয়ঁ বলে বিখ্যাত এক ফরাসি জনপদের খুব কাছে।

কিন্তু পরের দিনই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। মঁসিয়ে জ্যাক বেনোয়া কোনও এক কাজে প্যারিসে আসছেন এবং কাজের মধ্যে কোনও এক সময় আমার সঙ্গে কথা বলবেন। জ্যাক বেনোয়া নাকি নিজেই আশ্চর্য হয়েছেন কিছুটা, যে তাঁর মতন একজন সামান্য দু'তিন মিলিয়ন ফ্রাঁর ব্যবসায়ী সম্বন্ধে একজন ভারতীয় লেখক কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

প্যারিসের রাস্তা ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ইংরেজ, ভারতীয় এবং ফরাসির জাতীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দর মজার কথাগুলো মনে পড়ে গেলো। ছাত্রাবস্থায় হাঁদুদার চাপে প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। "যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে ; কেবল গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসেব চাইবে। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন, রাজাকে মেরে ফেললে। হিন্দু বলছে, আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা।...ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ ; তা ছাড়া যা কর, চুপ

করে আছি। লাথি মারো, কালো বলো, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না ; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। আর ফরাসি জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা। করভারে পিষে দাও কথা নেই, দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই ; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর কেউ হাত দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাত উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে।”

কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পারে না, এইটাই বিবেকানন্দের মতে ফরাসি চরিত্রের মূলমন্ত্র। জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্যশাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার—এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

এই ক'দিনেই ফরাসি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। কোথায় যেন আমাদের সঙ্গে হুবহু মিল রয়ে গিয়েছে। ফরাসিদের দেখে আমরা শিখেছি, না আমাদের দেখে হাল আমলের ফরাসিরা শিখছে তা খুঁজে বের করতে পারলে মন্দ হতো না।

এবিষয়ে কিছু ছবি আপনাদের সামনে যথাশীঘ্র সম্ভব পেশ করা যাবে। ফরাসিদের ইউরোপের বাঙালি বলা হবে, না বাঙালিকে ইন্ডিয়ার ফরাসি টাইটেল দেওয়া হবে তা আপনারাই স্থির করবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে জ্যাক বেনোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে দ্রুত পদচারণা করা যাক।

বলা বাহুল্য, খুব জোরে পদচালনা সম্ভব নয়, কারণ ফরাসি ফুটপাথের প্রায় সবটাই আবর্জনায় ভরে রয়েছে। গত কয়েক দিন প্যারিসের সাফাইকারীরা কর্মবিরতি পালন করছেন। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এঁদের পাঞ্জার লড়াই শুরু হয়েছে। পথচারী নাগরিকরা স্বভাবতই বেশ উঁচু গলায় তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করতে যখন দ্বিধাবোধ করছেন না, তখন বঙ্গসন্তান আমি মনে বল পাচ্ছি। আমার হীনমন্যতা কমে যাচ্ছে—শুধু কলকাতা নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরেও জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত হতে চলেছে জঞ্জালের স্তূপে। শুধু একটা ব্যাপারে তারিফ না করে উপায় নেই। ফরাসিদের জঞ্জালেও সৌন্দর্যসুষমা রয়েছে ; জঞ্জালকেও এরা উলঙ্গ রাখে না। সারি-সারি দৃষ্টিনন্দন কালো পলিথিন ব্যাগের ভিড় দেখে ভারত বাংলাদেশের নাগরিকরা ভুল বুঝে বলতে পারেন যে রাস্তায় কোনও মেলা বসতে চলেছে—দোকানিরা তাই নিজেদের বস্তাগুলো রাস্তায় রেখেছেন পসরা সাজাবার জন্যে।

রু বেনার্ডের ২৬ নম্বর বাড়িটার সামনে এসে পড়েছি। এই বাড়িটা অত্যাধুনিক এবং দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু আধুনিকতার দম্ভ দেখাবার উপায় নেই ফরাসি দেশে—কালকা যোগীকে পাত্তা দেবার মেজাজ ফরাসিদের নেই। অনেকগুলো ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ির মধ্যে ২৬ নম্বর যেন একটু কিন্তু-কিন্তু করে নিজের

আধুনিকতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। উঠতি বড়লোকের বেয়াদপিতে আমাদের কলকাতায় এখন উল্টো পরিস্থিতি। মডার্ন স্টাইলের বাড়িগুলোর মধ্যে ওই সব সম্পত্তির মালিকদের দুর্বিনীত ভাব প্রকট হয়ে রয়েছে ; এদের পাশে খানদানি অট্টালিকাগুলি কোনও অপরাধ না করেই সারাক্ষণ সিঁটিয়ে রয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করার ব্যাপারে আমাদের যে জাতীয় সুনাম আছে তা আমাদের আধুনিক নগরস্থাপত্যে মোটেই প্রতিফলিত নয়।

রু বেনার্ডের তিনতলায় এক আধুনিক মিটিং রুমে জ্যাক বেনোয়ার সঙ্গে আমার যখন দেখা হলো তখন তিনি এক মহিলার সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করছেন। এই এক ফরাসি সৌজন্য যা ধাতস্থ হতে বাঙালি গৃহস্থর বেশ সময় লেগে যাবে। সকালবেলায় আপিসে ঢুকে, হ্যালো, বড় জোর গুড মর্নিং বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! কিন্তু তা হলে ফরাসি হবার প্রয়োজন কী রইলো? গালে গাল ঠেকিয়ে প্রত্যেক ফরাসি সুন্দরীর সঙ্গে-সঙ্গে চুকচুক শব্দ করতে-করতে ফরাসিদের জাতীয়শক্তি কতটা ব্যয়িত হয় তা একমাত্র জার্মান বা ইংরেজরা বলতে পারবেন। আমার এক বাঙালি বন্ধু প্রথম দিনে আমার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, ভয় পাবেন না, ভিরমি খাবেন না, ভুল বুঝবেন না, এর মধ্যে লালসা নেই, রমণী লোলুপতা নেই—স্রেফ আছে শিষ্টাচার। একমাত্রই সৌজন্য বিনিময়। ভাল করে ড্রিলটা লক্ষ্য করুন, রমণীর ঠোঁটে কেউ ঠোঁট দিচ্ছে না—ওটা ওঁর মনের মানুষটির জন্যে রিজার্ভড। স্রেফ একটু আলতো গাল ঘসাঘসি এবং সেই সঙ্গে ফল্স্ চুকচুক আওয়াজ। নিতান্তই ইনোসেন্ট সৌজন্য বিনিময়রীতি যার থেকে দাড়ি কামাবার ব্লেড কোম্পানি, পারফিউম কোম্পানি এবং মাউথওয়াশ কোম্পানি কোটি-কোটি ফ্রাঁ ফায়দা লুটছে। পশ্চিমের সব জাত এই সৌজন্য বিনিময় পদ্ধতি ত্যাগ করেছে, কিন্তু ফরাসিরা অটল। রাজনীতিতে ফরাসি যত লিবারেল, রীতিনীতিতে ফরাসি তত রক্ষণশীল।

জ্যাক বেনোয়াকে হঠাৎ দেখলে একজন দীর্ঘদেহী অতীব সুদর্শন ফিল্মস্টার বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। যাঁর সঙ্গে চম্বন বিনিময় চলছিল তিনি এক ইংরেজ নন্দিনী, স্বজাতির বেনিয়াগিরিতে তিতাবিরক্ত হয়ে অনেক কালচার্ড ইংরেজের মতন ফরাসি দেশে স্বেচ্ছানির্বাসিতা হয়েছেন। প্যারিসের জীবিকা ও জীবন দুই-ই ইংরেজকে টানে যদিও কোথাও তার স্বীকৃতি নেই। এবারে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। শুধু ইংরেজ এবং আমেরিকান নয়, কিছু জার্মানও নিজের জার্মানত্বে ক্লান্ত হয়ে ফরাসি দেশে হাজির হচ্ছেন নূতনত্বের সন্ধানে। ইউরোপের মহামিলন আর বেশি দূরে নয়, দু-তিন বছর পরে আরও কত আজব ঘটনা ঘটবে তার ঠিক নেই। বহু শতাব্দীর ইতিহাস থেকে সমুচিত শিক্ষা লাভ করে পৃথিবীর মানুষ এখন সমস্ত প্রাচীর ভেঙে ফেলে কাছাকাছি আসবার জন্যে

অধৈর্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় আমরা। আমরা ঠিক সেই সময় কাছের মানুষকে দূরে ঠেলে দেবার জন্যে কাঁটাতারের বেড়া, ইটের দেওয়াল তুলছি সর্বত্র। অতি প্রাচীন সভ্যতা হওয়ার জন্যেই বোধহয় আমাদের ক্লান্তি কাটেনি, দীর্ঘ রাত্রির শেষেও আমরা সেই রোগে ভুগছি যা হরলিকস্ কোম্পানি একসময় 'প্রত্যুষের দুর্বলতা' বলে বিজ্ঞাপন করতো। যা আমাদের ঘাটতি তাও ওই কোম্পানির নতুন বিজ্ঞাপনমালায় সোচ্চার। এর নাম : প্রাণের স্পন্দন।

মধুরস্বভাবা ও নম্র ইংরেজ সুন্দরীটিই আমার প্রধান নির্ভর। কারণ জ্যাক বেনোয়া একবর্ণ ইংরেজি জানেন না, আর আমিও একমাত্র মঁসিয়ে শব্দটি ছাড়া কোনও ফরাসি শব্দ না জেনেই খোদ প্যারিসে পদার্পণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছি। এমন হঠকারিতা, যতদূর জানি, আমার কোনও পূর্বসুরিই দেখাতে সাহস পাননি, এমনকি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও নয়। তাঁর যে ফরাসি ভাষায় কিছুটা এলেম ছিল তা দু-একখানা বই থেকেই বুঝতে পারা যায়।

ইংরেজ ললনাই আমাদের যোগসূত্র রচনা করলেন। জীবনে এই প্রথম দোভাষীর মাধ্যমে কারও সঙ্গে বিস্তারিত কথাবার্তার সুযোগ হলো। পরিস্থিতিটা মোটেই ভাল নয়, কারণ সময় অনেক বেশি লাগে এবং আলোচনার প্রবাহ থমকে দাঁড়ায় মাঝপথে হঠাৎ কোনও প্রশ্ন করার সুযোগও পাওয়া যায় না। কিন্তু মনের মিল থাকলে কোনও দূরত্বই যে দূরত্ব নয় তা বোঝা গেলো।

মোটামুটি গোড়ার কথাগুলো এই রকম। জ্যাক বেনোয়া নিজেই তাঁর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় কুড়ি বছর ধরে কোম্পানি চলছে। জ্যাকের বয়স এখন ৪৭। কোম্পানিতে শ' দুয়েক কর্মী পাকাপাকিভাবে কাজ করেন। কর্মীদের গড় বয়স ৩২। "অর্থাৎ আমার কর্মীদের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে," বললেন জ্যাক বেনোয়া। তারপর রসিকতা করে করলেন, "আমার কর্মীদের বলি, কোম্পানিকে হতে হবে ভুবনবিদিত ফরাসি টি জি ভি ট্রেনের মতো—প্রচণ্ড দ্রুতগতি এবং যেখানে-সেখানে থামাথামি নেই।"

জ্যাক বেনোয়ার কথাবার্তা খোলামেলা। বললেন "কোনও ঢাক-ঢাক গুড় গুড় নেই, আমি প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বাধ্য হয়ে এই কোম্পানি শুরু করেছিলাম।" এখন জ্যাকের কি সম্পত্তি আছে, রোজগার কত তা শ্রমিকরা জানেন। জ্যাক ওঁদের বলেছেন, "আমার একটা বাড়ি আছে, একটা বোট আছে, আমার বাৎসরিক রোজগার দশ লক্ষ ফ্রাঁ, তার মধ্যে আমি ট্যাক্সো দিয়েছি তিন লাখ ষাট হাজার ফ্রাঁ।"

বেনোয়া কোম্পানির ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। ওখানে কারখানায় কর্মীরা জানতে পারেন এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত কোম্পানির মোট কত বিক্রি হয়েছে। বাজার কেমন।

জ্যাক বললেন, "গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমি অনেকে ভাবনা-চিন্তা করেছি। আমরা রাজনৈতিক ডেমোক্র্যাসিতে অনেকটা সফল হয়েছি, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যে এখন ক্রীতদাসত্ব চলছে।"

"ক্রীতদাসত্ব কথাটা বড় শক্ত কথা, মঁসিয়ে বেনোয়া।"

"আমি ভেবে-চিন্তেই স্লেভারি কথাটা ব্যবহার করেছি, মঁসিয়ে শংকর। কর্মক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাসি নেই। শ্রমিকরা ঠিক দুশো বছর আগের ক্রীতদাসদের মতন—একটা খামার বাড়ি বিক্রি হলে স্লেভরাও হাতবদল হতো। এখনও ফরাসি দেশে এবং অন্যত্র সেই অবস্থা। একটা কোম্পানি বিক্রি হলে সেই সঙ্গে কর্মীরাও বিক্রি হয়ে যায়, তাদের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।"

আমার দিকে হাত নেড়ে জ্যাক বেনোয়া বললেন, "শুনুন, আমি কমিউনিস্ট নই, বিপ্লবী নই, আমি বিশ্বাস করি ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা না থাকলে জীবন অচল হবে, কিন্তু আমি জাত ডেমোক্র্যাট। আমি বুঝতে পারি কোম্পানিগুলোতে যতক্ষণ ডেমোক্র্যাসি না আসছে ততক্ষণ মানুষ তার আত্মমর্যাদা পাবে না। শ্রমিকদের হাতে কোনও শক্তিই নেই। ওদের আছে কেবল গোলমাল করবার ক্ষমতা—ধর্মঘট করার অধিকার ছাড়া আর কোনও অধিকারই ওরা এখনও পায়নি।"

'আপনি কি আবার নতুন শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে কল-কারখানাগুলোকে বন্ধ করাতে চান?"

"মোটেই না, মঁসিয়ে। আপনি আমাকে অন্যের মতন ভুল বুঝবেন না। আমি একজন মালিক হিসেবে বলছি, কোম্পানিতে প্রকৃত ডেমোক্র্যাসি এলে সবারই মঙ্গল হবে।"

"মঁশিয়ে বেনোয়া, আমি যে-রাজ্য থেকে এসেছি, সেখানে শ্রমিক-মালিক বনিবনার অভাবে অর্থনীতিতে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখলেই আঁতকেই উঠি। আমাদের ওখান থেকে ওই সময় মালিকরা তাঁদের পুঁজিপাতি নিয়ে সরে পড়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি।"

হাসলেন মঁশিয়ে বেনোয়া। "প্রকৃত ডেমোক্র্যাসি থাকলে এসব ঘটনার সুযোগই আসতো না। শুনুন মঁশিয়ে, সমাজই একটা কোম্পানিকে সব দেয়। জনগণ শেয়ারহোল্ডার হিসেবে টাকা বিনিয়োগ করে কোম্পানি গঠন করে, আবার জনগণেরই আর এক অংশ কর্মী হিসেবে যোগ দিয়ে তাঁদের শ্রম বিনিয়োগ করে। একটা ছাড়া অপরটার কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে যাঁরা টাকা বিনিয়োগ করেছে তাঁদের হাতেই সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। শ্রমিকরা একেবারে সে যুগের ক্রীতদাসের মতন রয়ে গিয়েছে।"

জ্যাক বেনোয়া যে ইনডাসট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসির স্বপ্ন দেখছেন সেখানে

মালিকানা এবং শক্তির মধ্যে একটু দূরত্ব থাকবে। "আমি দেখাতে চাই, কেবল টাকা থাকলেই শক্তি অর্জন উচিত নয়। শক্তিমান হওয়ার জন্যে কাজের লোক হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখবেন, অর্থের ডিকটেটরশিপ রাজনৈতিক ডিকটেটরশিপের থেকে কম খারাপ নয়। বহু ভাল কোম্পানি এদের হাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

'মঁশিয়ে, আপনার চিন্তা-ভাবনাটা আরও পরিষ্কার করে বলুন," আমি অনুরোধ করি।

জ্যাক বেনোয়া বেশ উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলেন, "আমি নিজে ব্যবসা চালাই, সমস্যাগুলো আমার হাড়ে-হাড়ে জানা আছে। আমি মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধাবার জন্যে গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখি না। কিন্তু আমি চাই কলকারখানায় গণতন্ত্র আসুক। কর্মীরা যেন জমিদারের প্রজার মতন পদানত না থাকেন, তাঁরা নাগরিকত্বের সম্মান লাভ করুন। আমরা যেমন বিশ্বাস করি মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা রয়েছে, তেমন আমি প্রমাণ করতে চাই যে সারাক্ষণ পুঁজি এবং প্রকৃত শক্তির গাঁটছড়া না বেঁধেও এই সমাজে সাফল্য লাভ করা যায়।"

জ্যাক বেনোয়া এরপর আরও কিছু কথা বললেন। "আমি এই কোম্পানির অন্যতম মালিক এবং বড় কর্তা। আমার ২২ বছর বয়সের ছেলে আছে। সে যদি এই কোম্পানিতে ঢুকতে চায় তা হলে তাকে কর্মীদের আশীর্বাদ নিয়েই ঢুকতে হবে। স্রেফ পারিবারিক বিনিয়োগের জোরে ঢোকা যাবে না। আমি কোম্পানির কর্মীদের লিখিত সংবিধান দিয়ে দিয়েছি। তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের নাগরিক, সিটিজানস অফ অ্যান এন্টারপ্রাইজ। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট দিয়ে তাঁরা ঠিক করেন আমি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা থাকবো কি না। যাঁরা এক বছর এই কোম্পানিতে কাজ করেন তাঁদের সবার ভোট আছে, শুধু আমি ছাড়া।"

"মঁসিয়ে, এবার আপনার গণতন্ত্রের একটু নমুনা দিন।"

জ্যাক বেনোয়া জানালেন, "সমস্ত সংবিধানের মতন, আমাদের সংবিধানেরও একটা মুখবন্ধ আছে। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, এই কোম্পানি হলো, মাইনেকরা কর্মী-নাগরিকদের প্রতিষ্ঠান। যার উদ্দেশ্য : ন্যায্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ। এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হলো সাম্য, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মর্যাদা। প্রতিষ্ঠানের শক্তি থাকবে একজন কর্মকর্তার ওপর যিনি নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।"

ব্যাপারটা কীভাবে হয়?

জ্যাক বেনোয়া উত্তর দিলেন, "খুব সহজ পদ্ধতি। প্রত্যেক কর্মীর শূন্য থেকে দশ পয়েন্ট পর্যন্ত ভোট দেবার অধিকার আছে। তিনি শূন্য দিতে পারেন, এক

দিতে পারেন, দুই দিতে পারেন, আবার দশ দিতে পারেন। আমাকে অন্তত অর্ধেকের বেশি পয়েন্ট পেতে হবে। না-হলে আমার পদে থাকবার অধিকার রইলো না। অর্থাৎ দুশোজন কর্মীর মোট ২০০০ পয়েন্ট, আমাকে অন্তত ১০০১ পয়েন্ট পেতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে কোম্পানির আগের বছরের আর্থিক ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যায় ; তখন একদিন ব্যালটে ভোট হয়।

"ভাববেন না, সবাই আমাকে খুব পছন্দ করে এবং ভোটটা প্রহসন মাত্র। আগে দশের মধ্যে আট পর্যন্ত পেয়েছি। এখন ৬-এর মতন পয়েন্ট পাই। একবার আরও কমে গিয়েছিল, সেবার কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকরা এবং আমি নিজে ২০% মাইনে কম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাজারে লড়বার জন্যে ওই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, তবে কাউকে চলে যেতে বলিনি। তবু ৫-এর সামান্য বেশি ভোট পেয়ছিলাম।"

"যদি আপনি ৫-এর কম ভোট পান তখন কী হবে?"

"সব ব্যবস্থাই সংবিধানে করা রয়েছে। শ্রমিকরা নতুন ক্যান্ডিডেট দিতে পারেন, মালিকপক্ষও দিতে পারেন। এবারে ভোটের বিশেষত্ব হলো, যাঁরা টাকা বিনিয়োগ করেছেন তাঁরাও ভোট দেবেন। তাঁদের ভোটের সংখ্যা শ্রমিকদের সমান। এবং যিনি ভোটে জিততে চান তাঁকে অন্তত ৭৫% ভোট পেতে হবে। যদি কেউ এই ভোট না পান আবার ভোট হবে এবং এইভাবে ভোটের পর ভোট চলবে, ততক্ষণ পুরনো কর্মকর্তা কাজ চালিয়ে যাবেন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "ভোটের জন্যে আপনি কি প্রচার চালান?"

"আমার বিরুদ্ধে প্রচার চলে। আমি প্রচার চালাতে পারি, কিন্তু চালাই না। সত্যি কথা বলতে কী, সারা বছর ধরেই এই ভোটের কথা ভেবে আমাকে কাজকর্ম করতে হয়।"

"শুধু বড় কর্তার জন্যেই ভোট?"

"না, বড়-বড় ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারদের সম্বন্ধেও ওই ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা ভোট দেন। কিন্তু তাঁরা কম ভোট পেলেও কাজে থেকে যান, বড় কর্তা ছাড়া আর কেউ তাঁদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। যদিও হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা যায়।"

"তা হলে, এই বাৎসরিক ভোটের হাঙ্গামা বাধিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তিনি অপ্রিয় কাজ করতে পারবেন না।"

জ্যাক বেনোয়া একমত হলেন না। বললেন, "বরং উল্টো। কর্মকর্তা শক্তিমান না হলে কোনও কোম্পানি চলতে পারে না, কিন্তু তার পিছনে নাগরিকদের আস্থা থাকলে তিনি আরও শক্তি পাবেন। এই ধরনের গণতন্ত্রে আরও দুটি সুবিধা হয়।

নেতৃত্ব দেবার মতন আত্মবল আছে এমন লোক উপরে থাকবেন। এবং তিনি ডিকটেটর-এর মতন ব্যবহার না করে সব সময় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইবেন, তাঁদের বোঝাতে চাইবেন কেন একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই ধরনের মানুষ খরিদ্দারের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে এবং দুনিয়ার অন্য সবাইয়ের সঙ্গেও ভাল যোগাযোগ রাখতে পারবেন, ফলে কোম্পানি আরও সফল হবে।"

"আপনার এই যুগান্তকারী ভাবনা-চিন্তা কি অন্য কোম্পানির মালিকরা গ্রহণ করেছেন?"

"না, তাঁরা নেননি। বরং অনেকেই একে বিপজ্জনক মনে করেন। এঁদের সাহস নেই।"

"খুব বড় কোম্পানিতে এই গণতন্ত্র কি সম্ভব?"

জ্যাক বেনোয়া এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। "খুব বড় কোম্পানিতে এই গণতন্ত্র আরও সুফল দেবে।"

"এই রকম আশ্চর্য চিন্তা যাকে বেনোয়া সিস্টেম বলা হচ্ছে, কী করে আপনার মাথায় এলো?"

এই প্রশ্নে সাতচল্লিশ বছরের জ্যাক বেনোয়া গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'দেখুন, আমি সাধারণ ঘরের ছেলে। আমার বাবা সামান্য মুদি ছিলেন। ওই মুদির দোকানে আমি ও আমার বোন প্যাকিং-এর কাজ করেছি এবং খরিদ্দারের বাড়িতে গিয়ে মাসকাবারি ডেলিভারি দিয়ে এসেছি। তারপর আমি সামান্য সেলসম্যানের চাকরি নিয়েছি। দোকানে-দোকানে ঘুরে আমি হোলসেল রেটে খাবারের প্যাকেট বিক্রি করেছি। ভালই করছিলাম। কিন্তু সেই কোম্পানি হঠাৎ বিক্রি হয়ে গেলো। নতুন মালিক বলা নেই, কওয়া নেই, আমাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার মনে হলো, শিল্প-বাণিজ্যে আমরা তো ক্রীতদাসেরও অধম! সেই সময়ে কী করব, কী করব ভাবছি। কিছু দোকানদার ভালবাসতেন। তাঁরা বললেন, "নিজে কিছু একটা আরম্ভ করো, আমরা যতটা পারি সাহায্য করব। টাকাকড়ি ছিল না, তাই আমার বউকে সঙ্গী করে ভাজা বাদামের ব্যবসা শুরু করলাম। এখনও সেই বাদামওয়ালাই রয়ে গিয়েছি। কর্মীদের আমি মর্যাদা দিতে চাই, কাজের কোনও ক্ষতি না-করেই। আপনি ক্রীতদাসত্বের ইতিহাস পড়ে দেখুন—মর্যাদাহীন মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পৃথিবী যে দিন সেটা বুঝল সে দিন থেকেই ক্রীতদাসত্ব উঠে গেলো।"

এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে রয়েছেন জ্যাক বেনোয়া। কেউ-কেউ তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে, ভাবে পাগল। কিন্তু কিছু এসে যায় না তাঁর। জ্যাক বেনোয়া নিশ্চিত যে একদিন সমস্ত পৃথিবীর কল-কারখানায় প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

জ্যাক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুদূর ভারতবর্ষ থেকে এসে আপনি আমার কথাগুলো যে রকম মন দিয়ে শুনলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। দুর্মুখরা কী বললো তাতে আমার কিছু এসে যায় না। দেখুন, রাজতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্র নিয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে—রাজা ছাড়া যে রাজ্য চলতে পারে কেউ ভাবতেই চায়নি। ২০০ বছর আগে ক্রীতদাসপ্রথা নিয়ে একই ব্যাপার—লোকে ওই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ভেবেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও মেয়েদের ভোটাধিকার থাকবে না এইটাই নর্মাল বলে ভেবেছে মানুষ। আপনি পূর্ব ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। একনায়কত্ব থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে চলে আসছে। অবশিষ্ট বিশ্বকেও গণতান্ত্রিক চেতনা রাজনীতি থেকে কল-কারখানায় ছড়িয়ে দিতে হবে।"

একটু থামলেন। জ্যাক বেনোয়া। অদ্ভুত মানুষটি কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "এমন একদিন পৃথিবীতে নিশ্চয় আসবে যখন মানুষ বিশ্বাসই করতে পারবে না কোনও এক সময়ে কোম্পানির কর্মীরা শুধু মাইনেই পেত, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনও গণতান্ত্রিক মর্যাদা ছিল না।"

জ্যাক বেনোয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। আমার ইংরেজ দোভাষিণী চুপি-চুপি বললেন, "আমি ইতিহাস পড়ে দেখেছি ছিটিয়াল ফরাসিকে কখনও অবহেলা করে লাভ নেই। ওরা যা ভাবে তা অনেক সময় হয়েও যায়, সেই বাস্তিল ধ্বংসের দিন থেকে।"

বিদায় নেবার আগে জ্যাক বেনোয়া দোকানে-দোকানে যে ভারতীয় শুভেচ্ছাপত্র পাঠিয়েছেন তার কথা তুললাম।

মিষ্টি হেসে জ্যাক বেনোয়া রসিকতা করলেন : "ভাগ্যিস পোস্টারে ব্রহ্মা প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, তাই আপনার সঙ্গে দেখা হলো!"

তারপর জ্যাক বেনোয়া গম্ভীর হয়ে উঠলেন, "পোস্টারের কথাগুলো কিছু দিন থেকেই আমাকে নাড়া দিচ্ছিল। আমি গণতন্ত্রের যে স্বপ্ন দেখছি তাও প্রাচীন ভারতের শাশ্বত বাণীর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। শুনুন, ওই পোস্টারে কী বলা হয়েছে। এক সময় মানুষও দেবতা ছিল। কিন্তু মানুষ দেবত্বের এমন অপব্যবহার শুরু করলো যে স্বয়ং ব্রহ্মা স্থির করলেন দেবত্বকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন যে মানুষ কিছুতেই তা খুঁজে পাবে না।

"স্বর্গের দেবতাদের গোপন বৈঠক হলো। দেবতারা প্রস্তাব দিলেন, দেবত্বকে পৃথিবীর মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা হোক। পিতামহ ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, ভরসা নেই। মানুষ একদিন হারানো দেবত্বকে ঠিক খুঁড়ে বার করে ফেলবে। দেবতারা আবার পরামর্শ করে বললেন, "দেবত্বকে গভীর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক।

পিতামহ ব্রহ্মা তবুও একমত হলেন না। মানুষ একদিন সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে দেবত্বকে উদ্ধার করে ফেলবে।

"অবশেষে ব্রহ্মা বললেন, দেবত্বকে মানুষের গভীরেই লুকিয়ে রেখে দাও। কারণ মানুষ কখনও ওইখানে দেবত্বের অনুসন্ধান করবে না।

"সেই সময় থেকেই অস্থির মানুষ দেবত্বকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে—সে পর্বতের শিখরে অনুসন্ধান করেছে, সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে এমন এক বিরল শক্তির জন্যে যা তার নিজের মধ্যেই রয়েছে।"

জ্যাক বেনোয়া ধরেই নিয়েছেন, যতদিন কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে এবং শ্রমিকরা তাদের আস্থাভাজন কাউকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বে নির্বাচন করতে পারবেন না ততদিন মানুষ তার আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে না।

"মনে রাখবেন মঁসিয়ে আমরা ফরাসিরা চাকুরে জাত হয়ে উঠেছি। প্রতি দশ জন কর্মক্ষম ফরাসির মধ্যে এখন সাত জনই চাকরি করে কলে-কারখানায় রেস্তোরাঁয় দোকানে। আর আপনি নিশ্চয় জানেন দশ জনের মধ্যে একজন কাজ না পেয়ে বেকার বসে থাকে। এই বেকার সমস্যা কমতির দিকে নেই।"

জ্যাক বেনোয়া একজন সমঝদার শ্রোতা পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। তিনি আরও বললেন, "এই দেশের মানুষ কী করে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন, যদি না কর্মক্ষেত্রে তাঁরা মানুষের মতন সম্মান পান?"

২৬ নম্বর রু বেনার্ডের অফিসঘরে বসে একশ কোটি টাকার শুকনো ফলের কোম্পানির মালিক আরও যেসব খবর দিয়েছিলেন তার কিছু নমুনা শুনুন।

ওঁর বিশেষ ইচ্ছে একবার কোনও ভারতীয় ঋষির আশ্রমে কয়েকটি দিন কাটিয়ে আসবেন। হয়তো প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা তাঁকে আরও মনোবল দেবে তাঁর নব গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে।

কিন্তু জ্যাক বেনোয়া নিজের ধর্ম থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। একজন ধর্মপরায়ণ রোমান ক্যাথলিক বলতে যা বোঝায় তা তিনি। পেট্রন কথাটার মানে ফরাসিতে পৃষ্ঠপোষক নয়। ফরাসি পাত্রনা শব্দটার অর্থ নিয়োগকর্তা বা মালিক। প্রতিষ্ঠানের মালিকরা যখন জ্যাক বেনোয়ার ডেমোক্র্যাসিকে কোনওরকম পাত্তা দিতে উৎসাহী নন তখন জ্যাক বেনোয়া একবার রোমান ক্যাথলিক বিশপদের প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফরাসি ধর্মগুরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার নানাদিক দিয়ে আকর্ষক। তার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেলো না।

বেনোয়া : প্রভু, আমি ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। আমার ধারণা যা আমি করতে চলেছি তা এক ধরনের বিপ্লব। বাইবেলে যীশুও ওই একই কথা বলেছেন—

মানুষের মর্যাদা প্রয়োজন, 'লাভ দাই নেবার'—প্রতিবেশীকে ভালোবাসো। কিন্তু কোম্পানিতে এখনও ক্রীতদাস প্রথা চালু রয়েছে। কর্মীদের যেহেতু কোনও ক্ষমতা নেই সেইহেতু তারা অর্থের ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে। তাদের বাক স্বাধীনতাও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, পৃথিবীর কোথাও শ্রমিকদের মানুষ বলে ভাবা হয় না।

কার্ডিনাল মৃদু হাসলেন। তিনি মুখ না খুললেও কী ভাবছেন তা বোঝা যাচ্ছে। "বেনোয়া পাগল। কী সব আজব স্বপ্ন দেখছে মানুষটা।"

বেনোয়া : সামান্য অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে এই এতো বছর ধরে আমি যা বুঝেছি তা হলো : শুধু দান করলেই সেবা করা হয় না। দানটা সবচেয়ে সহজ পথ। কর্মীদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার মতন। আমি যদি ন্যূনতম মাইনে মাসে চল্লিশ হাজার টাকাও করে নিই তাতে প্রধান সমস্যাগুলোর কোনও বিহিত হচ্ছে না। কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে আমার পার্থক্য আছে জেনেও যদি আমি তাকে সমান বলে স্বীকৃতি দিই, তাকে যদি মর্যাদার অধিকার দিই সেটা হবে পাকা কাজ। আমি সেই চেষ্টাই করছি প্রভু।

কার্ডিনাল এবার ভাবেভঙ্গিতে বোঝালেন, বেনোয়া যা করছেন তাতে তাঁর অসম্মতি নেই।

বেনোয়া : আমি জানি কালা ক্রীতদাস চার্চ অনেক দিন চোখ বন্ধ করে ছিল। ক্রীতদাস-পরিবৃত শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা চার্চে প্রার্থনার জন্যে আসতেন, তবু কোনও দিন চার্চ কোনও কথা বলেনি। অতীতে যা হয়েছিল এখন আবার তার পুনরাবৃত্তি কেন হবে? এখন চার্চ কেন নীরব থাকবে? আপনারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিন। কোম্পানিগুলোতে মানুষ শৃঙ্খলিত হয়ে রয়েছে। আমরা তাদের মানুষ হিসেবে সম্মান দিচ্ছি না।

কার্ডিনাল : চার্চের ভূমিকা তো এখন কেউ স্বীকার করতে চাইছে না। আমরা যখন সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে মুখ খুলতে চাই, কাজের মানুষদের মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে চাই, তখন ওঁরা বলেন, 'আপনাদের এ ব্যাপার মন্তব্য করার এক্তিয়ার নেই ; আপনারা এ-বিষয়ে কিছুই জানেন না।' একজন মালিক হিসেবে আপনি যে ভাষায় কথা বলেন তা শুনে আমার খুব আনন্দ হলো। কিন্তু একজন যাজক হিসেবে আমি যদি এর অর্ধেক বলতাম তা হলে ওঁরা বিরূপ হয়ে চিৎকার করতেন আমি দিবাস্বপ্ন দেখেছি, আমার পা মাটিতে নেই...এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো এই ব্যাপারে সব সত্যের মুখোমুখি হই না, একজন মালিক এই সমস্যার যতটা জানেন আমি তার কিছুই জানি না।

চার্চের অবশ্যই সামাজিক চিন্তা আছে। তা বার বার বলাও হয়ে থাকে। বক্তব্যটা এই রকম : মানুষকে কাজ করতেই হবে। কিন্তু সবার ওপরে যখন মানুষ

সত্য তখন কাজটা মানুষের জন্যে, কাজের জন্যে মানুষ নয়। সুতরাং মানুষের যেন স্বাধীনতা থাকে, তবেই সে দায়িত্ববোধসম্পন্ন কাজের মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। আমাদের বর্তমান পোপ এ-ব্যাপারে অনেকবার মুখ খুলেছেন। উনি পোলান্ডের মানুষ ; যাজক হবার আগে চার বছর কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন। আপনি যা করতে চাইছেন চার্চও অনেকদিন তাই বলে আসছে। আপনার মধ্যে খ্রিস্ট্রীয় চিন্তাধারা রয়েছে। আমরা বলে যাচ্ছি, কিন্তু কারুর কানে ওসব কথা পৌঁছয় না।

বেনোয়া এখন অভিভূত, চার্চ থেকে তা হলে কোনও বাধা নেই। ভরসা পেয়ে তিনি নিজের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা শুরু করলেন। তাঁর গণতান্ত্রিক স্বপ্ন খুব সহজ জিনিস নয়—শেয়ারহোল্ডার এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রকৃত শক্তি সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

খুশি মনে কার্ডিনাল বললেন : যদি আপনার কোম্পানি ঠিক মতন চলে, তা হলে আমি চাইব আপনার স্বপ্নকে সবাই গ্রহণ করুক, কারণ আপনার চিন্তায় মহত্ত্বের ইঙ্গিত রয়েছে।

বেনোয়া : যদি আমার কোম্পানি ঠিক মতন না চলে তার মানেই যে আমার স্বপ্ন ভুল তা ঠিক নয়, প্রভু।

কার্ডিনাল : আপনার পথ অনুসরণ করতে গিয়ে কোম্পানিগুলি যদি লাটে ওঠে সেটা ঠিক হবে না, বেনোয়া। ওই ধরনের খ্রিস্টীয় বীরত্ব দেখিয়ে কী লাভ?

মালিক ও শ্রমিকের ভূমিকা ক্রমশ বদলাবদলি হতে চলেছে। দু' পক্ষের চরিত্র দু' রকম। যাদের টাকা খাটছে তারা হিসেবি, ঠাণ্ডা মাথা, চারদিকে তাদের কড়া অথচ সূক্ষ্ম নজর। অন্য পক্ষ একটু রগচটা, হুড়ুমদুড়ুম বেপরোয়া কাজ করে বসে। কথাবার্তার মারপ্যাঁচ বোঝে না। তবু দু' পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ কমে আসবে। দু' পক্ষের মধ্যে কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সমঝোতা আসবে।

জ্যাক বেনোয়া এবারে খ্রিস্টান মালিকদের সমালোচনা করলেন। এঁরা উন্নাসিক, কোনও ব্যাপারেই এঁদের বিশ্বাস নেই, কোনওরকম পরিবর্তন তাঁরা মানতে রাজি নন। বেনোয়া এবার সবিনয়ে উল্লেখ করলেন, বিশপদের সভাপতি হিসেবে কার্ডিনাল নিজেও নির্বাচিত হয়েছেন।

কার্ডিনাল : যত মতবাদ আছে তার মধ্যে ডেমোক্র্যাসির দোষ সবচেয়ে কম। কিন্তু গণতন্ত্র নিখুঁত নয়।

বেনোয়া : অর্থই সব অনর্থের মূল, প্রভু। টাকাই সব কিছু উল্টেপাল্টে দেয়।

কার্ডিনাল : টাকা ছাড়া এ যুগে কিছুই নেই। টাকার পিছনে রয়েছে মানুষ এবং তার সীমাহীন ক্ষমতার লোভ। রাজনীতির পিছনেও ক্ষমতার লোভ,

ব্যবসা-বাণিজ্যের পিছনেও ক্ষমতার লোভ। এফিসিয়েন্সির নামে লোভ, বাস্তবতার নামে লোভের রাজত্ব চলেছে দুনিয়ায়।

কার্ডিনালের আশীর্বাদ নিয়েই বেনোয়া সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস নিজের লাভের জন্য লড়াই করার আগে প্রত্যক্ষ দায়িত্ববোধসম্পন্ন মালিককে মানুষের মর্যাদার জন্যেও লড়াই করতে হবে।

জ্যাক বেনোয়া তো ট্রেন ধরার জন্য প্যারিসের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও রাস্তায় বেরোলাম ফরাসি দেশের শ্রমিকদের সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর জোগাড়ের জন্যে।

প্যারিসের মেট্রো নাকি খুবই সহজ—গাঁয়ের আনাড়িরাও এক ঝলকে সব বুঝতে পারে। হয়তো তাই—কিন্তু একা বেরুতে আমার এখনও সাহস হয়নি। ফরাসি ভাষার 'ফ'-ও বুঝি না। মেট্রোতে ঢুকতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়।

এই হারিয়ে যাওয়ার ভীতিটা যে সম্পূর্ণ অমূলক নয় তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। তাতে আমাকে যদি নেহাতই গাঁইয়া মনে হয় তাতেও ক্ষতি নেই।

মিছরিদাই এদেশে আসার আগে আমাকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। "কখনও নিজেকে বেশি চালাক ভাববি না। তোকে মনে রাখতে হবে, রোজ কলকাতায় যাতায়াত করলেও তুই কলকাতিয়া নস। তুই মফস্বলের মানুষ, তোর নিবাস হাওড়া-শিবপুর, তার আগে জীবন কাটিয়েছিস হাওড়া কাসুন্দেতে, যেখানে পুরোপুরি স্মার্ট হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তোর বাড়তি দোষ রয়েছে। তোর জন্ম বনগাঁয়ে। পথের পাঁচালীর দেশ হতে পারে। কিন্তু শহরে ভূমিষ্ঠ না হলে কিছুতেই পুরো শহুরে হওয়া যায় না। এর জন্যে তোকে আর একবার কলকাতায় জন্মাতে হবে।"

মিছরিদা আঁতে ঘা দিয়েছিলেন, কিন্তু বোধহয় খুব মিথ্যে বলেননি। যদিও আমার একটু গর্ব ছিল, পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলির তালিকায় কলকাতায় স্থান প্যারিসের আগে এবং ওই শহরটা আমি মোটামুটি চিনি।

"ওরে মূর্খ, কলকাতা সম্বন্ধে গ্যাজর-গ্যাজর করে কতকগুলো বই লিখেছিস বলেই, কলকাতাকে ঠিক মতন চিনেছিস এই দম্ভ রাখিস না। ওয়ান্স এ মফস্বল ম্যান অলওয়েজ এ মফস্বল ম্যান।"

"মিছরিদা বড় শহরের তালিকায় কলকাতা দশ নম্বর, আর প্যারিস ষোলো।"

মিছরিদার উত্তর : "ওসব আমারও জানা আছে। পৃথিবীর প্রথম পাঁচটা শহর হলো : টোকিও, নিউইয়র্ক সিটি, সাওপালো, ওসাকা, মেক্সিকো সিটি। এর পর রয়েছে : লস্ এঞ্জেলস, সাংঘাই, লন্ডন, বোম্বাই। এর পর কলকাতা। তার পরে

বুয়োনেস এয়ারেস, রায়ো ডি জেনারিও, বেজিং, সিওল, কায়রো ও প্যারিস।"

"মিছরিদা, আমেরিকার বড়-বড় শহরগুলো চষে বেড়িয়ে আপনি আর কাসুন্ডিয়ান নন, একেবারে বিশ্বনাগরিক হয়ে উঠেছেন।"

"ওসব বাজে কথা ছাড়। সাইজে বড় হওয়াটাই সব সময় বড় কথা নয়। নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলেসের আমেরিকানরাও প্যারিসে এসে ট্যারা হয়ে যায়। মফস্বলের লোকের মতন নিজেকে গুটিয়ে ফেলে। তাই তোকে সময় থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি।"

সাবধান করে দেওয়ার নামে মিছরিদা যা বললেন তা হলো হারিয়ে যাওয়ার ভয়।

"মিছরিদা, ঠিকানা হারানো নয়। মানুষ প্যারিসে বোধহয় নিজেকেই হারিয়ে ফেলে—কোথায় যেন একটা বই পড়েছিলাম : নিজেরে হারিয়ে খুঁজি।"

"ওরে মূর্খ, নিজেকে হারানোর বয়স তোর-আমার অনেকদিন কেটে গিয়েছে— লোটাকম্বল নিয়ে কাশীবাসের ঘণ্টা বাজলো বলে। আমি প্যারিসে ঠিকানা হারানোর ভয়ের কথা বলছি। শোন, কলকাতার এক ইয়ং সায়েন্টিস্টের কাণ্ডকারখানা। প্যারিসে গিয়েছিলেন এক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে পেপার পড়তে। চার দিনের কনফারেন্স। তোর মতনই ওঁর ফরাসি না জেনে ফ্রান্স যাবার দুঃসাহস। পৌঁছলেন ওখানে ঠিক মতন। আন্তর্জাতিক সেমিনারের কর্তৃপক্ষ এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে গেলেন, এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করলেন। মেদিনীপুরি এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে শেষ দিনে মিটিং থেকে ড্রপ দিয়ে একটু ঘুরে-ফিরে প্যারিস শহর বেড়াতে বেরুলেন। নিজের কাগজপত্তর সব অন্য বন্ধুদের জিম্মায় দিয়েছেন। অনেকক্ষণ ঘুরে-ফিরে যখন খুব ক্লান্ত হয়ে থাকার জায়গায় ফেরার ইচ্ছে হলো তখনই শুরু হলো মুশকিল। ওখানকার বাড়িগুলো সব একই রকম দেখতে। শত চেষ্টা করেও নিজেদের বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে পকেটমারের ভয়ে পকেটে বেশি পয়সাও রাখা হয়নি। সব ইন্ডিয়া থেকে আসা অন্য বন্ধুদের হেপাজতে রয়েছে।"

"তারপর?" আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞেস করি।

"খুবই কেলেঙ্কারিয়াস অবস্থা, দুই হারিয়ে-যাওয়া বৈজ্ঞানিকের চোখে প্রায় জল। পরের দিন সকালে ওরলি এয়ারপোর্ট থেকে দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু কিছুতেই বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তখন কী হলো?"

"প্যারিস তখন ওদের ব্রহ্মতালুতে উঠে গিয়েছে। যতো লোকের সঙ্গে কথা বলতে যায় সবাই পাত্তা না দিয়ে চলে যায়। ফরাসি না জেনে ইংরেজি ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোনো জাত-ফরাসি বরদাস্ত করবে না। এদিকে পকেটে

পয়সাও নেই, সব খরচ হয়ে গিয়েছে। রাত অনেক হয়ে গেলো। একা হলে বৈজ্ঞানিকের তো হার্টফেল করতো। দু'জন বলে মনের দুঃখে শোন নদীর ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। দুটি পুরুষমানুষকে একটু অন্ধকারে একসঙ্গে নিরিবিলিতে বসে থাকতে দেখলে প্যারিসের পুলিশ আবার অন্য সন্দেহ করে বসে, যদিও পুরুষে-পুরুষে ভাব-ভালোবাসা সাধারণ ফরাসিরা উদারভাবেই মেনে নেয়, অনেক বড়-বড় লোক বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বুক ফুলিয়ে 'ঘরসংসার' করেন, কেউ আপত্তি তোলে না।"

"তারপর?" আমি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছি।

মিছরিদা বললেন, "পুলিশে এসে শাসাল। ভাবল ড্রাগ ইত্যাদি বেচাকেনার তালে আছে। বললে, সুড়সুড় করে বাড়ি চলে যাও, রাত শেষ হতে দেরি নেই। বাড়ি তো যেতে চায় এরা, কিন্তু যাবে কী করে? ঠিকানা পর্যন্ত কাছে নেই—সব হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে, যা বন্ধুদের কাছে রয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু বাহাদুর বটে প্যারিসের পুলিশ। ওই পুলিশের কী করে ইংরেজরা বদনাম দেয় জানি না! ওয়ার্লডের বেস্ট বলতে পারিস্। পুলিশ ইংরিজী বুঝলো। হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক শুধু বলতে পারলেন কোন কনফারেন্সে তিনি প্যারিসে এসেছেন এবং কোথায় সেই কনফারেন্স হচ্ছিলো। পুলিশ অসাধ্য সাধন করলো। প্রথমে ওই কনফারেন্স যে হল-এ হয়েছে সেখানকার কেয়ারটেকারের পাত্তা করে, কনফারেন্সের অর্গানাইজিং প্রেসিডেন্টকে ফোন করলো। দু'জন কলকাতার সায়েনটিস্ট হারিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের বাসস্থান খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রেসিডেন্ট বললেন, পাঁচ-ছ'টা জায়গায় অতিথিদের রাখা হয়েছে, কাকে কোথায় জায়গা দেওয়া হয়েছে আমি বলতে পারবো না। তবে কিছুক্ষণ সময় দাও, আমি ফোনে খবরাখবর করি। সেই রাতদুপুরে প্রেসিডেন্ট মহোদয় আরও কয়েকজন কর্মকর্তাকে জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে আবার ফোন করলেন এবং ঠিকানা খুঁজে দিলেন। পুলিশ তখন দু'জনকে সেখানে নিয়ে গেলো। এ-যাত্রায় প্রাণে বাঁচলো কলকাতা আর মেদিনীপুরের ছেলে।" আমি তখনই অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছি। মিছরিদা বললেন, "সবচেয়ে যা লজ্জার ব্যাপার বাসস্থানটা খুবই কাছাকাছি। যেখানে সারারাত কেটেছে তার কয়েক পায়ের মধ্যে। কিন্তু বাড়িগুলো সব একরকম দেখতে তাই চিনতে পারা যায়নি।"

মিছরিদা বকুনি দিলেন। "হাসিস না। তোরও প্যারিসে এই দুর্গতি হতে পারে। কিন্তু যাতে না হয়, তার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করছি।"

"মাদুলি দিচ্ছেন, না কোনও পাথর, মিছরিদা?"

"মাদুলিও না, পাথরও না।" মিছরিদা ছোট্ট ছাপানো কার্ড দিলেন। "এর নাম প্যারিস কার্ড। আমেরিকান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যায়। এখানে

ফরাসিতে লেখা আছে, আমি হারিয়ে গিয়েছি, এখনই সাহায্য করুন। প্যারিস পৌঁছেই এতে বাসস্থানের ঠিকানা এবং টেলিফোন লিখে রাখবি।"

"কিন্তু দু'খানা কার্ড কেন, মিছরিদা?"

"ওরে মূর্খ, একখানা মানি ব্যাগে রাখবি, আর একখানা বুক পকেটে। প্যারিসে এখনও পকেটমারের অভাব নেই। টুরিস্ট সিজনে সমস্ত ইউরোপের পকেটমাররা পাসপোর্ট এবং ভিসা করিয়ে প্লেনের টিকিট কেটে প্যারিসে হাজির হয়। যদি তোর মানিব্যাগ সায়েব পকেটমারের কারসাজিতে গায়েব হয় তা হলেও যাতে জলে না পড়িস তার জন্যে এই স্পেশাল হাওড়ীয় দূরদৃষ্টি।"

মিছরিদার এই প্যানিক কার্ড পকেটে রেখেও ভয় যাচ্ছিল না। মানসচক্ষে দেখছি, পথ হারিয়ে নদীর ধারে মুখ শুকনো করে একলা বসে আছি। ওই হারিয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিক এখন কলকাতার নামী লোক। না-হারিয়ে অক্ষত অবস্থায় ফরাসী দেশ থেকে স্বদেশে ফিরলেই মিছরিদা ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন।

কিন্তু আপাতত আমার দুশ্চিন্তা লাঘবের জন্যে আমার আশ্রয়দাতা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

আমি একজন সঙ্গী পেয়েছি। বাইশ-তেইশ বছরের এই ছেলেটিকে পথের সঙ্গী পেয়ে আমি যেন চাঁদ হাতে পেলাম।

এই ছেলেটির নাম ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের দেশ ঢাকা। ইব্রাহিম বললো, "আপনার কোনও চিন্তা নেই। যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাবো আপনাকে।"

আমি আবার পথে নেমে এসেছি। আমার খুব ভাল লাগছে। বললাম, "ভাই ইব্রাহিম, বাংলাভাষায় কথা বলতে-বলতে ফরাসি দেশের রাজধানী ঘুরে বেড়াতে পারবো এ তো কল্পনা করিনি।"

"আমাকে আপনি ডালিমও বলতে পারেন। ওটা আমার ডাকনাম। আমার বোনের নাম বন্যা। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে জানলে ও খুব খুশি হবে, বিশ্বাসই করবে না। আপনাকে দিয়ে একটা সই করিয়ে নেবো। যখন দেশে যাবো তখন বন্যাকে দেবো।"

"আমি সই দেবার মতন কেউকেটা নই, ইব্রাহিম। আমার সঙ্গে বাংলা বই নেই, থাকলে তোমাকে একটা দিতাম।"

ডালিম হাসলো। "আমি শুনলাম, আপনি যেখানেই যান সেখানকার সম্বন্ধে লেখেন। বাঙালিদের আপনি খুঁজে-খুঁজে বের করেন।"

"বের না করে উপায় থাকে না, ইব্রাহিম। আমি তো বাঙালি ছাড়া কারও ভিতরে ঢুকতে পারি না। তাই কোনও অচেনা দেশে গেলে, স্থানীয় বাঙালিদের

চোখেই সভ্যতাটাকে বুঝবার চেষ্টা করি।”

ইব্রাহিম এবার একটু যেন গর্বিত হয়ে উঠলো। “জানেন পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে বাঙালি নেই। আপনার কোথাও কোনও অসুবিধে হবে না। আপনাকে সাহায্য না করলে তো আমাদেরই ক্ষতি।”

আমি বললাম, “বিদেশের বাঙালিরা ভীষণ দয়ালু, ইব্রাহিম। তারা মুহূর্তে পরকে আপন করে নেয়। বাঙালিদের সাফল্য দেখলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়। আর বাঙালিদের দুঃখ দেখলে, বিশেষ করে বিদেশে দুঃখ দেখলে, মনটা টনটন করে।”

ইব্রাহিম উত্তর দিলো, “চার বছর ধরে কোনও বাংলা বই পড়িনি, বাংলা ম্যাগাজিন দেখিনি। সঙ্গে দু'একটা বাংলা গানের ক্যাসেট আছে, তাই শুনি।”

প্যারিসের রাজপথ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। “ফরাসি দেশ দেখলে মাথা ঘুরে যায় ইব্রাহিম। আর্ট, কালচার, সাহিত্যকে এরা কোন স্তরে নিয়ে গিয়েছে।”

ইব্রাহিম প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু বললো, “আমরাও কম যাই না, স্যর। বাংলাদেশ এমব্যাসিতে রসিদ সায়েব আমাকে বলেছিলেন, বাংলা ভাষার পোজিসন ফরাসি ভাষার ওপরে। আমাদের এগারো কোটি আর আপনাদের সাত কোটি, আঠারো কোটি লোকের ভাষা। ফ্রান্সে তো মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি লোক আছে।”

“আমরা যে ভীষণ গরিব, ইব্রাহিম। আমাদের লোকরা নিজেদের নামই সই করতে পারে না, যদিও তাদের মুখের ভাষা বাংলা।”

“এরকম থাকবে না, স্যর। আপনি দেখবেন। আমরা সব ব্যাপারে একদিন ওয়ার্লডের টপে উঠে যাবো।”

“তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তাই যেন হয়। আপাতত আমরা তো সব ব্যাপারে একেবারে তলায়।”

ইব্রাহিম যেন প্যারিস শহরটাকে বেশ ভালভাবেই চিনে ফেলেছে। “এই শহর দেখে এখন আমার কোনও ভয় হয় না স্যর। আপনিও দু' একদিনের মধ্যে বুঝে ফেলবেন। শহরটা এতোই সহজ যে এখানে হারানো অসম্ভব। এখানে মুশকিল অন্য, স্যর। সেটা হলো পয়সা। যার পয়সা নেই সে সারাক্ষণই হারিয়ে যাচ্ছে।”

ইব্রাহিম ছেলেটি বয়সের তুলনায় একটু রোগা। রং বেশ ফরসা। অনেক ফরাসির তুলনায় ইব্রহিমের চামড়া সাদা।

প্যারিসে রাজপথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম, “ইব্রাহিম, তুমি কী করে এই শহরে এলে?”

ইব্রাহিম হাসলো। “সে অনেক গল্প, স্যর। আপনার সময় হলে বলব। এখন

চলুন—মেট্রোতে ঢুকে পড়া যাক। মেট্রোটা একবার সড়গড় হয়ে গেলে সমস্ত প্যারিস শহরটাই আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেলো।"

আমি ভিড়ের মধ্যে ইব্রাহিমকে হারাতে চাই না। ওর হাতটা ধরেই মানুষের স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম প্যারিস-মেট্রোতে প্রবেশের জন্যে।

প্যারিস-মেট্রোর সিঁড়ি ধরে ফরাসি দেশের ভূগর্ভে প্রবেশের পথে ইব্রাহিম সস্নেহে আমার হাতটা ধরে রাখলো যাতে ভিড়ের চাপে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে না যাই। আমার মনে পড়ছে কলকাতার কথা। গঙ্গাসাগর মেলার সময় উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য তীর্থযাত্রীরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার আশঙ্কায় গাঁটছড়া দিয়ে মহানগরীর রাজপথে ঘুরে বেড়ান। অনেকে তাই দেখে হাসেন, আর দু-তিনবার দুনিয়া প্রদক্ষিণ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্যারিস নগরীতে এসে আমি গ্রামের তীর্থযাত্রীদের উদ্বেগ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছি।

একটু লজ্জা যে লাগছিল না তা নয়। কিন্তু কমবয়সী ইব্রাহিম আমাকে মনোবল দিলো, "গোড়ার দিকে এমন হয়, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। বাঙালিদের ঠেকিয়ে রাখা অত সহজ নয়। দু'দিন পরে আপনি নিজেই কত লোককে প্যারিসের রাজপথ চেনাবেন।"

ইব্রাহিম বোধ হয় জানে না, আমি মাত্র ক'দিনের জন্যে প্রবাসী হয়ে এসেছি। দু'দিন পরে অন্য লোকের পথপ্রদর্শক হবার সময় যখন আসবে তখন আমি ব্যাক টু আমার আদরের ধন হাওড়া-শিবপুরে।

ইব্রাহিম অফিস থেকেই কয়েকটা মেট্রো রেল কুপন নিয়ে এসেছে। তার একটা যেমনি মেশিনের সামনে ধরলাম অমনি চোঁ করে টেনে নিলো, ইব্রাহিম সিগন্যাল দিলো এখনই টার্নস্টাইলে মৃদু চাপ দিয়ে এগিয়ে যান। আমি মেট্রোতে ঢুকে পড়েছি।

প্যারিসের মেট্রোতেও শত-শত বিজ্ঞাপন আছে, যেমন আছে আমাদের জনপ্রিয় রেল স্টেশনগুলোতে। কিন্তু সৌন্দর্যে আকাশ-পাতাল তফাত। রেলস্টেশনে, রাজপথে আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনগুলো ক্রমশই বীভৎস হয়ে উঠেছে। বিগত হিসেবে আমাদের সৌন্দর্য চেতনা যে লুপ্ত হতে চলেছে তার নানা প্রমাণ রয়েছে এই সব বিজ্ঞাপনি হোর্ডিং-এ। আর প্যারিস-মেট্রোর বিজ্ঞাপনগুলো যেন আর্ট এগজিবিশনের সাজানো ছবি। সাধে কি আর সমস্ত দুনিয়া ডিজাইনিং-এর ব্যাপারে ফরাসিদের গুরু বলে মেনে নিয়েছে। এখানকার এক ভদ্রলোক এই শতকের ডিজাইনিং বিপ্লব শুরু করার আগে ঘোষণা করলেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, অসুন্দরকে বিক্রি করা যায় না—আগলিনেস ক্যান নট্ বি সোল্ড।

একটি হোর্ডিং-এর দিকে ইব্রাহিম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কোনও ফরাসি সুন্দরী শাড়ি পরে এক আশ্চর্য মায়ামোহ সৃষ্টি করেছে। না, শাড়ি নয়, শাড়ির মতন ড্রেস, যা শাড়ির ভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। নতুন ফ্যাশন শো সম্পর্কে ঘোষণা। ইব্রাহিম বললো, "সায়েবকে বলবেন, আপনাকে ঐ এগজিবিশনে নিয়ে যাবেন।" ইব্রাহিম ভারত ভূখণ্ডের অনেক খবরাখবর রাখে। বললো, "আমাদের দেশেও তো ধুতি "সালোয়ার বেরিয়েছে যা ঠিক ধুতির স্টাইলে তৈরি। তেমনি শাড়ি-ফ্রক। দেখবেন, একদিন দুনিয়ার সমস্ত মেমসয়েব এই শাড়ি পরবে"—ইব্রাহিমের ভবিষ্যদ্বাণী।

ইব্রাহিম নিজের জীবনের কথা কিছু বলতে চাইছিল না। প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে যা-দু-একটা কথা বললো তাতে আন্দাজ করা গেলো সে ভাগ্যসন্ধানে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। এপারের বাঙালিরা যখন অ্যাডভেঞ্চার বর্জন করে অতিমাত্রায় হিসেবী হয়ে পড়েছে তখন ওপারের বাঙালিরা ঘরছাড়া দিক্‌হারা হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। পৃথিবীর এমন দেশ পাবেন না যেখানে বাঙলাদেশিরা ভাগ্যসন্ধানে হাজির হচ্ছে না। এদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেই, সঙ্গতি নেই। পাসপোর্ট আছে, কিন্তু ভিসা নেই। তবু এরা বিশ্ববিজয়ের নেশায় মাতোয়ারা। বাঙালির ঘরকুনো অপবাদটা যে নেহাতই মিথ্যা তা যে কোনও দেশের ইমিগ্রেশন পুলিশ প্রকাশ্যে স্বীকার করবে।

এই বাঙালি কেন স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমাতে উৎসুক তা আন্দাজ করা শক্ত।

ইমিগ্রেশন পুলিশ বলবে দারিদ্র। কিন্তু এদের থেকে অনেক দরিদ্র এপার বাংলায় আছে তারা বেরুতে চায় না। তা ছাড়া ইব্রাহিমের কথাই ধরা যাক, সে নিতান্ত গরিব নয়। ওর বাবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিসার। ঢাকায় নিজেদের বাড়ি আছে। তবু ইব্রাহিম ছোট বয়স থেকেই দেশ ছাড়ার জন্যে অস্থির। বাংলাদেশের এই বিশ্বস্বপ্নের পিছনে রয়েছে হাজার-হাজার বাংলাদেশির প্রবাসসাফল্য। কপর্দকহীন অবস্থায় দেশছাড়া হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এই বাঙালি। পথের ক্লান্তিতে অনেকে নিশ্চিহ্ন হলেও কেউ-কেউ সাফল্যের সন্ধান পেয়েছে। এই বাঙালি এখন নিউ ইয়র্কে, শিকাগোয়, বোস্টনে দোকান চালায়, এই বাঙালি লন্ডনে বার্মিংহামে রেস্তোরাঁর মালিক। এই বাঙালি খুদে শিল্পপতি হয়ে মার্ক অ্যান্ড স্পেনসারে শার্টপ্যান্ট সরবরাহ করে।

বিশ্বসন্ধানী বাঙালির দুঃখেরও অন্ত নেই। ঘরছাড়া হয়ে সে প্রায়ই দিক্‌হারা। প্রায়ই সে অন্য দেশে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। ইউরোপ-আমেরিকার বিমানবন্দরে সে সবচেয়ে সন্দেহভাজন। পকেটে পয়সা এবং পাসপোর্ট ভিসার ছাপ থাকলেও সে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় অকারণে,

তাকে দূরে ঠেলতে পারলেই বিদেশি পুলিশের আনন্দ। ইমিগ্রেশন অফিসারদের ভয়ে এই বাঙালি সদাসন্ত্রস্ত, তার প্রায়ই থাকার জায়গা নেই। এমন জায়গা আছে যেখানে একই ঘরে বারোজন বাঙালি বিভিন্ন সময়ে ঘুমোয়, কেউ সকালে, কেউ রাত্রে। হঠাৎ শিফ্‌ট পাল্টাপাল্টি হলে তাদের শোবার তো দূরের কথা বসবার জায়গা থাকে না। সেই ঘরের মালিককে ফরাসি দেশে বলা হয়, 'ঘুমের দোকানদার', স্লিপ মার্চেন্ট। বিদেশিদের গোরু-ঘোড়ার মতন রেখেই এরা ধনী হয়। হতভাগা এই বাঙালির জীবনযাত্রা নিয়ে বই লেখার সময় হয়েছে। কোনও উদ্যোগী তরুণ লেখক সরেজমিনে তদন্ত করে বই লিখলে তা হবে আমাদের সাহিত্যে মহামূল্য সংযোজন। দরিদ্র বাঙালির বিশ্বপরিক্রমা এই শতাব্দীর বাঙালির নতুন বৈশিষ্ট্য—এদের না-দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'লিখে দিলো বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে'!

এই বাঙালির দুঃখ অনেক। সে প্রায় বিদেশে কোনও কাজ পায় না পেলেও, সে হয় শোষণের শিকার, কখনও প্রবাসী স্বদেশবাসীর, কখনও নিষ্করুণ নির্লজ্জ বিদেশির। সমৃদ্ধ দেশগুলির অর্থনীতিতে ঘরছাড়া প্রবাসী শ্রমজীবীর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু অপ্রিয় কথা যথাসময়ে বলতেই হবে।

এই মুহূর্তে ইব্রাহিমের মুখের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। ইব্রাহিমের মা সম্প্রতি গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু স্বদেশে একদিনের জন্যে ফিরবার সাহস নেই তার—হয়তো এদেশে ফিরে আসবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হবে। বিদেশের আইনকানুন মেনে চলতে গিয়ে হতভাগা বাঙালিকে যে কত অন্যায়ই মেনে নিতে হয়। মানুষের ওপর এই ধরনের অত্যাচার চলতো ক্রীতদাসত্বের যুগে। এখন দাসপ্রথা নেই, কিন্তু ঘরছাড়া শ্রমজীবীর দুঃখের অবসান হয়নি, বরং তার সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই দুর্ভাগার জন্যে পৃথিবীর কোথাও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই—ন্যায়াধীশের চোখে সে আইনভঙ্গকারী বিদেশি, তার জন্য কে চিন্তা করবে?

ইব্রাহিম কেমন করে সাগর ও পর্বতমালা পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে ফরাসি সীমানা অতিক্রম করে এদেশে প্রবেশ করেছিল তা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর বিষয়বস্তু হতে পারে। এই কাহিনীতে লোভী ট্রাভেল এজেন্ট, বেপরোয়া ট্রাক ড্রাইভার, বোম্বেটে জাহাজিদের ভূমিকা আছে। যাই হোক ইব্রাহিম যথাসর্বস্ব অপরকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এদেশের পথে-পথে ঘুরেছে। কোথাও আশ্রয় জোটাতে পারেনি। অনাহারে একদিন ছোট এক শহরের ফুটপাতের রাত কাটিয়েছে ইব্রাহিম। ইউরোপের কোনও দেশে পথে রাত কাটানো ভয়াবহ ব্যাপার। ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব ছিল না। সমস্ত রাত পথে কাটিয়ে ভোরবেলায় ভাগ্যের দেবতা প্রসন্ন হলেন। যে জানলার তলায় ইব্রাহিম আশ্রয়

নিয়েছিল সেই জানলা খুলতে গিয়ে এক বৃদ্ধা ফরাসিনী পথহারা এক কুমারকে দেখলেন। ছুটে বেরিয়ে এসে ইব্রাহিমকে পরম স্নেহে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গরম দুধ ও রুটি খেতে দিলেন। বললেন, আমার টয়লেট ব্যবহার করোগে যাও।

বৃদ্ধার অনেক অভিমান। ইব্রাহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, "গত রাত্রে ওখানে না শুয়ে আমাকে ডাকলে না কেন?"

ইব্রাহিমের চোখে জল। অজানা বিদেশিকে মানুষ সন্দেহ করে, কোন স্পর্ধায় সে রাতের আশ্রয় চাইবে?

এই বৃদ্ধা সন্তানের স্নেহে আশ্রয় দিলেন ইব্রাহিমকে। পুলিশের চোখ থেকে লুকিয়ে রাখলেন। পনেরো দিনের নিরন্তর সেবায় দুর্বল বিদেশিকে চাঙ্গা করে তুললেন। পরে সামান্য কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। দিলেন কিছু অর্থ। অনেকটা রূপকথার মতন—পৃথিবী এখনও সম্পূর্ণ প্রীতিহীন মরুভূমি হয়নি। এখনও এখানে যা ভালবাসা আছে তা আমাদের কল্পনার অতীত।

ইব্রাহিম কিন্তু শুধু আশ্রয় পাবার জন্যে বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেয়নি। সে ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায়। সে ধনী হতে চায়। সে ছুটতে চায় প্যারিসের দিকে।

প্যারিসে সে একজন বাঙালাদেশিকে চিনতো, যার একটা ঘর আছে। এই ঘরের পুরো ভাড়াটাই দেশি ভাইটি ইব্রাহিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। তারপর চাপালো গৃহভৃত্যের দায়িত্ব। অর্থাৎ সমস্ত দিন, প্রয়োজনে সমস্ত রাত এখানে-ওখানে দিন-মজুরি করো, যথাসর্বস্ব বাড়িওয়ালাকে দাও এবং তার সেবাযত্ন করো। অথচ পালাবার উপায়ও নেই—কারণ বাড়িওয়ালা পুলিশকে খবর দেবে। বেআইনি বিদেশি অনুপ্রবেশরীদের ধরতে পারলে সব দেশের পুলিশের মতন ফরাসি পুলিশেরও সবিশেষ আনন্দ।

এর পরেও নানা দুঃখের কাহিনী। এক দেশি ভাইয়ের আশ্রয় থেকে পালিয়ে অন্যত্র আর এক দেশি ভাইয়ের আশ্রয়ে গমন। ইব্রাহিম বললো, "দেশের লোকের পাল্লায় পড়লেই ওরা আপনাকে চাকর করে রাখবে। কিন্তু চাকর হবার জন্যে তো ঘর ছেড়ে এদেশে আসিনি, স্যর।"

যাই হোক, কয়েক বছর পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, এক সহৃদয় ফরাসির চেষ্টায় কোনওরকমে পুলিশের ভয় কেটেছে। তারপর এক বাঙালি বউদির দয়ায় একটা চাকরি পাওয়া গিয়েছে। অফিসের মেসেঞ্জার বয়ের কাজ। এখন ইব্রাহিম কিছুটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এখন ওর আশ্রয়ে দু'জন বাংলাদেশি ছোকরা বসবাস করে। ওদের পুলিশি হাঙ্গামা কাটেনি। তাই প্রকাশ্য চাকরি জোটে না। এখনও দু-একটা বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করছে। আর একজন রেস্তোরাঁয় ফুল বেচে। এ-এক সুন্দর জীবিকা। সঙ্গিনী নিয়ে ফরাসী

মঁসিয়ে রেস্তোরাঁয় অথবা কাফেতে আসন গ্রহণ করলেই ফুলওয়ালা সামনে হাজির হবে। চোস্ত ফরাসিতে সে বলবে, মঁসিয়ে এই মহিলার যোগ্য হবার জন্যে আমার ফুলরা ছটফট করছে। ওরা বুঝতে চাইছে, কে কার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করবে। মঁসিয়ে ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। তিনি সঙ্গিনীকে অনুরোধ করবেন, পছন্দমতন ফুল তুলে নিতে। ফুল গছিয়ে, ফ্রাঁ পকেটে পুরে ফুলওয়ালা এবার ছুটবে অন্য অতিথির সন্ধানে।

ফরাসি দেশে ফুলের বিশেষ সম্মান, তাই ফুল হাতে ভিক্ষে করলেও তার সমস্ত অপরাধ মার্জনা পায়। বিদেশি ফুলওয়ালাকে ফরাসি রেস্তোরাঁ-মালিক মেনে নিয়েছে এর জন্যে যে এখন কোনও জাত-ফরাসি ওই কাজে তেমন আগ্রহ দেখায় না। তার সময়ের দাম এতোই বেশি যে এই কাজ পড়তায় আসে না।

কিন্তু ইব্রাহিমের অন্য ধারণা। সে জানালো, "ফুলের ব্যবসায় খুব লাভ স্যর। কোনওরকমে ছ-সাতটা খদ্দের ধরতে পারলেই আপনার হিল্লে হয়ে গেলো। দশটা বেচলে তো কথাই নেই। শুধু আপনাকে লোকের মন বুঝে কথা বলতে হবে। সায়েব হয়তো আপনাকে প্রথমে পাত্তা দিতে চাইবে না। আপনাকে তখন মেমসায়বের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে হবে। মর্ত্যের এই অপ্সরীর কি ফুল ছাড়া মানায়? যার জন্যে এই ফুলের জন্ম, তার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও যেতে ফুলের খুব কষ্ট হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। যত রূপের প্রশংসা হবে যত বলা হবে ফুলের চেয়ে সুন্দরী এই মেমসায়েব, তত সায়েবের মন গলবে। মেমের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যেই তো ওঁকে রেস্তোরাঁয় আনা।'

অনেক বাংলাদেশি প্যারিসের রাস্তায় ফেরিওয়ালার কাজ করে। প্রধান বিক্রি নানা বিচিত্র সাইজের বেলুন। পরিশ্রমী বাঙলাদেশি চাকরি পেলেও দুটো বাড়তি ফ্রাঁর জন্যে রবিবারে ফেরিওয়ালা হয়। তবে এখানে চাকরি জোটানো বেশ শক্ত কাজ। জুটলেও সেই সব চাকরি, যা করতে ফরাসি নাগরিকদের মন ভরে না। বেকার বসে থাকলেও জাত-ফরাসি সাফাইওয়ালা হতে রাজি নয়—তাই প্যারিস পরিষ্কার রাখার কাজটা প্রায় অন্যের হাতে চলে গিয়েছিল। এখন সরকার উঠেপড়ে লেগেছেন যাতে ফরাসি স্বনির্ভর হয়ে নিজের ময়লা নিজেই পরিষ্কার করতে পারে। এ-বিষয়ে কলকাতার বাঙালির সঙ্গে প্যারিসের ফরাসির কোন অমিল নেই। যতদূর জানা যায় কলকাতা সাফাই রাখার কাজে একজনও বঙ্গ সন্তানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বেকারের তালিকা যতই দীর্ঘ হোক এ-কাজ কেউ করতে রাজি নয়।

ইব্রাহিম বললো, "দেখুন না, ফরাসিদের চাকরি দিতে গিয়ে প্যারিস শহরটা কী রকম নোংরা হয়ে গেলো। পাবলিকেরও কত অসুবিধে হচ্ছে। আগে ভোরবেলায় সব কিছু সাফাই হয়ে যেতো, পথঘাট জঞ্জালমুক্ত হয়ে ঝক্‌ঝক্

তক্‌তক্ করতো। এখন কোন ফরাসি রাতের অন্ধকার থাকতে উঠে ময়লা পরিষ্কার করবে? সাফাইওয়ালাও দশটা-পাঁচটা চাকরি চাইছে, তাতে জঞ্জালে শহর ডুবলে ডুবুক।"

ফরাসি সাফাইওয়ালা নিতান্তই বাবুমশাই। সে ঝাঁটা হাতে শহর পরিষ্কার করবে না। তার জন্যে কত রকমের যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে। সেই সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নিয়ে গাড়ির মধ্যে বসে জঞ্জাল পরিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ফরাসি দেশে। যতদিন বিদেশিরা এই কাজে ছিল ততদিন এই সব যন্ত্র নিয়ে কারও তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

ইব্রাহিম বললো, "কিন্তু আমরা কথা তুলি না, স্যর। বলবার মুখ নেই। দেশে আমাদের যে কি হাল তা সায়েবরা ভালই জানেন। ওঁরা তো বলছেনই, আমরা তো তোমাদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসিনি। যাও না বাবা সুড়সুড় করে নিজের দেশে ফিরে, আমরা আমাদের ঘরসংসার সামলে নেবো। একটা গভরমেন্ট এসেছিল তারা তো ফরেনারের নামে চটা। একবার চেষ্টা করলো ফরেনারকে দেশছাড়া করতে। যে-বিদেশি দেশ ছাড়তে রাজি হবে তাকে নগদ দশ হাজার ফ্রাঁ দেওয়া হবে। অনেকে চলে গেলো, সামান্য ক'একটা ফ্রাঁয়ের লোভে। এখন আর টাকা দেয় না, কিন্তু অবস্থা এমন করে রেখেছে যে ভাল কাজ বিদেশির হাতে নেই, যদি-না আপনি বিজনেস করেন। সবচেয়ে ভাল বিজনেস, সবজির দোকান। আপনি ভাবতে পারবেন না কত লাভ!" মনে হলো, ইব্রাহিমের স্বপ্ন, সুযোগ পেলে এমন একটা দোকানের মালিক হওয়া।

ইব্রাহিম এবার বললো, "এঁদের দোষ দেবো না স্যর। এঁরা যা টাকা দেন তা আমাদের কোনজন নিজের দেশে পেতো? এঁরা যে সবাইকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না, এই যথেষ্ট।"

ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার কথাতে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক হাসলেন, এঁর কাছেই এসেছি শ্রমিকসংবাদ সংগ্রহের জন্যে। ভদ্রলোক এ-বিষয়ে অনেক খবরাখবর রাখেন। বললেন, "ঘাড় ধাক্কা দেওয়া অত সহজ নয়, মঁসিয়ে। আমেরিকার অর্থনীতি যেমন ইমিগ্রান্টদের সস্তা শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ইউরোপেও তাই। তফাত এই যে, এক প্রজন্ম পরে ইমিগ্রান্ট আমেরিকান নতুন দেশের প্রধান ধারার সঙ্গে মিশে যায়, ইউরোপে তা হয় না। এখানে তেলে-জলে মিশ খায় না। আগে ক্রীতদাসদের ওপর নির্ভরতা ছিল সেই নির্ভরতা এসেছে ভিন দেশের সস্তা শ্রমিকের ওপর। এরা এযুগের নবক্রীতদাস। তফাতর মধ্যে এদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা হয়নি। এরা এসেছে নিজেদের উচ্চাভিলাষে, এরা কঠোর শ্রমে ভাগ্য পাল্টাতে চায়। কেউ-কেউ পারে, বেশির ভাগই পারে না। কিন্তু যারা পারে না তাদের কথা সবাই ভুলে যায়।"

বিদেশিদের সম্বন্ধে যা খবর সংগ্রহ করা গেলো তা মোটামুটি আমার ধারণার সঙ্গে মিলে গেলো। কাজের জন্য দেশ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হলে মার্কিন দেশই আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। প্রথমে একটু কষ্ট দিয়ে তারপর দূরকে আপন করে নিতে ঐ দেশ এখনও তুলনাহীন। শোনা যায়, গত দুই দশকে মার্কিন দেশ যত বিদেশিকে গ্রহণ করেছে বাকি পৃথিবী একসঙ্গে করলেও তার সংখ্যা সমান হয় না। অন্য দেশ বোকামি করে শুধু সস্তা শ্রমিক নিয়েছে, কিন্তু দূরদর্শী আমেরিকান তুলে নিয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ ও প্রতিভাধরদেরও। ফলে আমেরিকার জনশক্তি ক্রমশই সমৃদ্ধ হচ্ছে। আর জার্মানি তো হয়ে উঠেছে বুড়োদের দেশ।

কিন্তু কিছু ভুল ধারণাও ভাঙলো। যেমন, ফ্রান্স এক সময় নিজের দেশের লোকসংখ্যার গণনায় আমেরিকার থেকেও বেশি বিদেশিকে নিজের দেশে গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়াকে আমরা ইমিগ্রান্টের দেশ বলে জানি। যা জানি না, অস্ট্রেলিয়া এবং ফ্রান্স দু'জনেই সমানসংখ্যক বিদেশিকে এখনও পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছে। এই সংখ্যা হলো এক কোটি। সাড়ে পাঁচ কোটি জনসংখ্যার দেশ ফ্রান্সে বর্তমানে বিদেশির সংখ্যা ৫৫ লাখের মতন—অর্থাৎ প্রতি দশ জনে একজন। এদের মধ্যে অন্তত লাখ পনেরোর বসবাস প্যারিসে। এই হিসাবের মধ্যে গোপনে বেআইনিভাবে ঢুকে পড়া বিদেশির সংখ্যা নেই। অনেকের ধারণা, এদের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ।

ফরাসি দেশের বিদেশি শ্রমিকদের মোটমুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—কালা, আরব এবং সাদা। কালার সংখ্যা সাত লাখের মতন। এঁদের অনেকেই এসেছেন আগেকার ফরাসি কলোনি থেকে, বিশেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে সুনাম—পর্তুগিজদের—এঁদের সংখ্যা দশলাখের মতন। এই সঙ্গে রয়েছে ইতালীয় ও স্পানিয়ার্ড। একটা হিসেব অনুযায়ী ইতালীয়র সংখ্যা লাখ পাঁচেক এবং স্পানিয়ার্ড লাখ চারেক। সে তুলনায় আলজেরীয়র সংখ্যা লাখ আষ্টেক। মরক্কো থেকে এসেছে লাখ পাঁচেক এবং টিউনেসিয়া থেকে লাখ দুয়েক।

পর্তুগিজ শ্রমিকদের বাজার দর বেশি—এঁরা নাকি ভীষণ পরিশ্রমী এবং চমৎকার ব্যবহার করেন। বদনাম আছে সিসিলিয়ানদের, ফরাসিরা এদের তেমন পছন্দ করে না। বিদেশিদের বিরুদ্ধে সাধারণ ফরাসি, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর নানা অভিযোগ। বিদেশিরা নাকি বাজার খারাপ করে দিচ্ছে এবং স্থানীয় লোকদের চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। কালাদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা আরও বেশি। এদের নাকি এত বেশি বংশবৃদ্ধি হচ্ছে যা জাত-ফরাসিকে কোনও দিন বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই ধরনের অভিযোগ দু-একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের দেশের সর্বত্র শুনতে পাবেন। এদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যাও নাকি

বেশি। ড্রাগ-চালানিতেও নাকি এদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। এরা নাকি এইডস্ রোগও ছড়াচ্ছে। খুসওয়াস্ত সিং-এর রচনায় পড়েছিলাম, জার্মানিতে তুরস্কের শ্রমিক সম্পর্কেও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে। একটি সস্তা রসিকতা : একজন টার্ক আত্মহত্যা করে কিভাবে? খুবই সহজে : নিজের বগল শুঁকে। ইঙ্গিতটা হলো : এরা ভীষণ নোংরা এবং এদের শরীরে নক্কারজনক দুর্গন্ধ। ফরাসি দেশেও গুজব : আরবদের রকমসকম বোঝা দায়। এরা নিজেদের বাথরুমে ভেড়া কাটে। বহিরাগতদের বিরুদ্ধে মতবাদ গড়ে তুলতে ফরাসিরা যে শিবসেনা স্টাইলের ন্যাশনাল ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা জঁ লপেঁ। এঁর শ্লোগান হলো—'ওদের দেশে ফেরত পাঠাও'। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়। বিদেশি শ্রমিকদের সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করতে ফরাসিদের কোনও সঙ্কোচ নেই।

বিদেশি শ্রমিকদের ব্যাপারে জার্মানরা অবশ্য ফরাসিদের থেকে অনেক হুঁশিয়ার। কাউকেই ওখানে বেশি দিন থাকতে দেওয়া হয় না। ফলে দশ বছর জার্মানিতে আছে এমন বিদেশি শ্রমিকদের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু ফরাসি দেশের বিদেশি শ্রমিকদের বেশির ভাগই বহু বছর ধরে ওদেশে রয়েছে। কিন্তু বিদেশি শ্রমিকদের ফরাসি দেশে কোনও রাজনৈতিক অধিকার নেই। বিদেশি শ্রমিকদের অনেকেই নিঃসঙ্গ—এঁদের স্ত্রীরা নিজের দেশে পড়ে থাকেন।

নর্থ আফ্রিকার প্রবাসী শ্রমিকদের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা নিয়ে কিছু ভাল কাজ হয়েছে ফরাসি দেশে। সংসার থেকে দূরে থাকলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তা খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়েছে। বিদেশিদের এক শ্রেণীর ধারণা, সপ্তাহে অন্তত একবার শরীরকে বীর্যমুক্ত না করলে গুরুতর অসুখ হতে পারে। ফলে রূপোপজীবিনীদের পোয়াবারো এবং সেই সঙ্গে যৌনব্যাধির অবাধ প্রসার। প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ আফ্রিকান প্রায়ই তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কোনও একসময়ে এরা নিজেদেরই ঘেন্না করতে শুরু করে। একজন আলজেরিয়ান শ্রমিক সাক্ষাৎকারে বলেছে, "পৃথিবীতে যত মানুষ আছে আমি সবার শেষে। আমি সব ব্যাপারেই লাস্ট।"

ফ্রান্সের এক বিখ্যাত কাগজে মন্তব্য করা হয়েছে, একই প্রজন্মে বিদেশি শ্রমিকদের দুঃখ শেষ হচ্ছে না। এরা মাইনে কম পায়, সবচেয়ে বাজে কাজগুলো করে। এরা যখন দলবদ্ধভাবে কোনো বড় প্রকল্পে নিযুক্ত হয় তখন এদের দুঃখ দেখবার কেউ নেই। এদের যেখানে রাখা হয় সেখানে কলঘর থাকে না, না থাকে কোনও ক্যানটিন। এদের ছেলেদেরও তেমন ভাগ্যপরিবর্তন হবে না এই কারণে যে এরা ইস্কুলে তেমন সুবিধে করতে পারে না। নিরক্ষর অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী ইস্কুল ছেড়ে চলে আসে। পাঁচ জনের মধ্যে মাত্র একজন পাশ করে

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসে।

বিদেশি শ্রমিকদের সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি লিখেছেন, "কোনও বিদেশি শ্রমিককে ফরাসি দেশে কাজ করতে হলে খুবই মোটা চামড়ার হতে হবে।" শুনুন এক স্পানিয়ার্ড শ্রমিকের কথা। ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনের সময় তাঁকে ছোট্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আরও কুড়িজনকে একই সঙ্গে উলঙ্গ হতে বলা হলো। এই শ্রমিকটি আর একজন বৃদ্ধের মুখচোখ দেখেছিলেন। নিজের সন্তানের সঙ্গে উলঙ্গ হবার লজ্জা ও অপমান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। প্রতিবাদ করেও কোনও ফল হয়নি। এই ভদ্রলোকের সেই সময় জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

এই স্পানিয়ার্ডের মতে ফরাসি দেশে শ্রমিকের সঙ্গে তার উপরওয়ালার সম্পর্ক প্রায় মিলিটারি মেজাজের। শ্রমিকের কাছে ফোরম্যান হলেন সাক্ষাৎ দেবতা। এঁকে গুডমর্নিং জানানোটাও শ্রমিকের পক্ষে স্পর্ধার ব্যাপার। এই শ্রমিকটির অভিজ্ঞতা শোনবার মতন। যা মাইনে তার অর্ধেকেরও বেশি চলে যায় বাড়ি ভাড়ায়। সুতরাং ওভার টাইম না-করলে পেট চলে না। প্রতিবেশীরাও ঘৃণা করে এই বিদেশি শ্রমিককে। ওঁদের ধারণা, এরা ভীষণ আওয়াজ করে, শান্তভাবে থাকতে জানে না। বিদেশি শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যেও ঐক্য নেই—সারাক্ষণ একে অপরের ক্ষতি করতে প্রস্তুত। তবু অভিযোগ নেই : শোষণ করবার জন্যেই তো বিদেশি শ্রমিককে ইমপোর্ট করা হয়েছে। তাকে ক্রীতদাসের মতন রাখা হবে না তো কাকে রাখা হবে?

বিদেশিরাও স্বীকার করে নেয়, দুটো পয়সা কামাবার জন্যে তারা দেশ ছেড়ে এসেছে। তাই যৎসামান্য খরচ করে দুটো পয়সা জমাতে চায় দেশে পাঠাবার জন্যে। এর জন্যে কোনও কষ্টই কষ্ট নয়। এদের মন পড়ে থাকে নিজের দেশে—অনেকে ব্যাগ পর্যন্ত সারাক্ষণ তৈরি রাখে, যেন যে-কোন মুহূর্তেই এদেশে ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। এদের ভীষণ ভয় একাকিত্বের, তাই মাইনে কম পেলেও এমন জায়গায় কাজ করতে চায় যেখানে আরও দুজন দেশের লোক আছে।

যেসব বিদেশি মেয়ে কোনওরকমে ফরাসি দেশে চলে আসে তাদের অবস্থা আরও খারাপ। এঁদের বেশির ভাগই ঝি-গিরি করে। ফরাসি দেশে বাড়ির কাজের লোকের বেশ চাহিদা আছে। এদের সংখ্যা অন্তত দশ লাখ। গৃহপরিচারিকাদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়েও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতায় ফরসি কর্তা ও গিন্নি কতখানি বিশ্বাসী তা গৃহপরিচারিকার থেকে ভাল কেউ জানে না।

একজন বিদেশিনী পরিচারিকার অভিযোগ : আমাকে অনেক মিষ্টি কথা বলে কাজে নেওয়া হলো, কিন্তু বাড়ির গিন্নি ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করতে দেবে

না। হাতে কাপড় কাচার সময় আমাকে রবার গ্লাভ্‌স পরতে দেবে না, ওতে নাকি গিন্নির দামি লিনেনের ক্ষতি হবে। প্রতিবাদেরও উপায় নেই। গিন্নি চ্যাটাং চ্যাটাং করে শুনিয়ে দেবেন, এই বিদেশিগুলো তো নিজের দেশে থাকলে না-খেয়ে মরতো। আমরা কাজ দিচ্ছি বলে ওদের তো চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যত অবিচার অন্যায় থাকুক, বিদেশিনী পরিচারিকা ঝামেলায় যেতে চায় না। সে অল্পে সন্তুষ্ট—মনিব একটু মিষ্টি ব্যবহার করলে এবং দু-একটা পুরনো জামা-কাপড় পরতে দিলেই সে সন্তুষ্ট। যদি বাড়ির গিন্নি রেডিও শুনতে দিলেন তা হলে তো কথাই নেই।

পরিচারিকাকে মারধরও একেবারে উঠে যায়নি। অনেক বাড়িতে দু'সেট থালাবাসন থাকে—এক সেট কর্তা, গিন্নি ও ছেলেপুলের জন্যে এবং অন্য সেট কুকুর এবং পরিচারিকার জন্যে। এদের প্রায়ই এটিকেট মেনে চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু নিজেরা যা এটিকেট দেখান তা বলার নয়। বিশেষত কিছু বৃদ্ধা। এঁরা কাজের লোকের সামনেই বেমালুম উলঙ্গ হয়ে জামাকাপড় পাল্টান, একটা লোক যে সামনে রয়েছে তা হিসাবের মধ্যেই নেন না। অনেক সময় লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় পরিচারিকার—কর্তাগিন্নির শয়নকক্ষের মেঝেতে পড়ে থাকে ব্যবহৃত কনডোম, টয়লেটে স্যানিটারি টাওয়েল, নোংরা অন্তর্বাস। কুকুর কোথাও নোংরা কাজ করলে তা পরিষ্কারের জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে ডাক পড়ে পরিচারিকার।

বিদেশিকে নতুন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীর ভূমিকায় দেখতে পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলি ইদানিং যে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তা সমাজতত্ত্ববিদদের অজানা নয়। ফরাসি সংবাদপত্রের লেখকরা অবশ্যই এ-বিষয়ে লিখতে পিছপাও নন, তাতে যতই অখুশি হোন কিছু পাঠক। একজন লেখক তো সোজাসুজি বলেছেন : আমদানি করা এই শ্রমিকরা বংশপরম্পরায় এ-দেশের নোংরা ও কম মাইনের কাজগুলো করে যেতে বাধ্য হবে, কারণ এদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া শিখতে পারবে না। এঁদের একজনের মন্তব্য : একসময় কলোনিগুলোতে মানুষকে গাধার খাটুনি খাটানো হতো। কলোনি হাতছাড়া হবার পরে বুদ্ধিমান ফরাসি নিজের দেশে শ্রমিক আমদানির ব্যবস্থা করেছে তার হয়ে খাটবার জন্যে।

আমার মনে পড়লো, বাংলাদেশি ইব্রহিম আমার জন্যে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে আমাকে আবার ছাব্বিশ নম্বর রু বেনার্ডে ফিরিয়ে নেবার জন্যে।

ফেরার পথে ইব্রাহিমের মতামত জানবার চেষ্টা করেছিলাম। ইব্রাহিমের কোনও অভিযোগ নেই। সে বললো, "যতই বলুন স্যর, নিজের দেশের থেকে খারাপ লোক আমি কোথাও দেখিনি। বিদেশে এসেছি। একটু বেশি কাজ না দিলে এরা কেন আমাকে রাখবে? কষ্ট হবে জেনেই তো আমি ঘর ছাড়া হয়েছি।"

প্যারিসের রাজপথ ধরে বাংলাদেশি তরুণ ইব্রাহিমের সঙ্গে আমি হেঁটে চলেছি। কিছুক্ষণ আগে বিদেশি শ্রমিকদের সম্পর্কে যা শুনে এসেছি তা আমার ভাল লাগেনি। নিজের দেশে কষ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু সব কিছু খবর না-নিয়ে বিদেশে রুজিরোজগারের জন্যে রওনা দেওয়া কিন্তু সুখের নয়। এই ইব্রাহিমের জন্যে এদেশে কত দুঃখ জড়ো হয়ে আছে তা কে জানে? ইব্রাহিম আমার কাছে একজন বাঙালি, কিন্তু এখানে নিতান্তই একজন বহিরাগত। অন্যদিকে যতই সুসভ্য হোক জাতিবিদ্বেষের দাঁত কড়মড় করতে ফরাসিরা এখন ইউরোপের কারও থেকে কমতি নয়।

ইব্রাহিম এইসব ব্যাপারে আমার থেকে অনেক শক্ত। সে বললো, "সব কিছু হিসেব-নিকেশ করে, পাঁজি দেখে, হাওয়া-আপিসে খোঁজখবর নিয়ে ঘরছাড়া হওয়া যায় না স্যর। যাদের পায়ে সর্ষে লেগেছে তারা ঠিক বেরিয়ে পড়বে কপালে দুঃখ আছে জেনেও। আসলে দুঃখটা বেশি দিন থাকে না। যেসব দেশের ছেলে ফরাসি পুলিশের ভয়ে বেড়াল ছানার মতন লুকিয়ে থাকতো তারা এখন দুটো কামাচ্ছে, স্যর। আমাদের দেশের গরমেন্টও ভাল। তারা ঘরের ছেলেকে কখনই পুরোপুরি ঘরছাড়া করতে চায় না। তাই দু'খানা পাশপোর্ট রাখতে দেয়—একখানা বাংলাদেশের, আর একটা নতুন দেশের। আপনারা ইন্ডিয়ান, অনেক অসুবিধে। আপনাদের ওখানে ডবল নাগরিকত্ব চলে না। একখানা পাশপোর্ট না-ছাড়লে অন্য পোশপোর্ট বারণ।"

দ্বৈত নাগরিকত্বের ব্যাপারটা কিছু কানে এসেছে আমার। বললাম, "নানারকম মত আছে ইব্রাহিম। একই সঙ্গে দু'দেশের প্রতি আনুগত্য সম্ভব কি না।"

ইব্রাহিম আমার সঙ্গে একমত হলো না। "যারা ওইসব কথা বলে তারা নিশ্চয় কখনও বিদেশে নিজের লোকের দুঃখ দেখেনি। ওদের কি মেয়ে নেই, স্যর? প্রত্যেক বাঙালি মেয়েরই তো দুটো পাশপোর্ট—একটা বাপের বাড়ির, আর একটা শ্বশুর বাড়ির। কোনও অসুবিধে হয় না তো।"

এবার আমি নয়নাভিরাম মহানগরী প্যারিসের গায়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। প্রশস্ত রাজপথ, সীমাহীন প্রাসাদমালা, সংখ্যাহীন মোটর গাড়ির সুবিন্যস্ত প্রবাহ

দেখে আমার আর এক মহানগরীর কথা মনে পড়ছে। এক কোটি মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় কলকাতাও একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশা ছিল আমাদের। কিন্তু সেখানে জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আরবান ডিজাস্টার-এর আর এক নাম কলকাতা। যেখানে চ্যাটার্জি আছে, মুখার্জি আছে, ব্যানার্জি আছে, কিন্তু এনার্জি নেই। সেখানে ট্রাফিক ছাড়া সব কিছুই নড়বড়ে। তবু সেখান ছেড়ে কোথাও এসে আমাদের পক্ষে পুরো সুখ পাওয়া সম্ভব নয়—সব সময় মনে পড়ে যায় কলকাতার কথা। প্রশ্ন ওঠে, সব কিছু থেকেও কলকাতা কেন এমনভাবে পিছিয়ে পড়লো?

এতো দুঃখের মধ্যেও যার রক্তের মধ্যে কলকাতা আছে সে দুনিয়ার কোথাও একাত্মবোধ করতে পারে না। কোনও সুখেই সে সুখ পায় না। সব সময় তার কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়।

না, কলকাতার নিন্দে করবো না। বালাই ষাট। জীবসহস্র! কলকাতা একদিন যে জেগে উঠবে এবং নিজেকে খুঁজে পেয়ে আবার গৌরবময়ী হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শুধু এই মুহূর্তে কোথাও গেলে মন খারাপ হয়ে ওঠে। সারাক্ষণ প্রশ্ন ওঠে কলকাতাতেও কত ব্যবসা আছে, বাণিজ্য আছে, মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি আছে। তবু আমরা কেন অন্যের মতো হয়ে উঠলাম না? কোথায় আমাদের দোষ হলো?

অকস্মাৎ প্যারিসের রাজপথে মেঘের মধ্যে ভরসা দেখা দিচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখানে যেন পথ অবরুদ্ধ হতে চলেছে।

হ্যাঁ! কলকাতায় আমরা যাকে জ্যাম বলি তাই জমাট হয়েছে পারি মহানগরীতে। দূর থেকে এবার যা দেখছি তা এই মহানগরীর সঙ্গে আমার একাত্মতা সৃষ্টি করছে। মিছিল আসছে।

আমি চোখটা একটু রগড়ে নিলাম। আমাদের কলকাতায় যেমন মিছিল বেরোয় একেবারে ঠিক একই ধরনের ব্যাপার। সায়েব পুলিশ যেন একটু দিশেহারা।

আমার বলতে ইচ্ছে করলো, এসব সামলানো তোমাদের কম্মো নয়! কলকাতায় গিয়ে যে কোনও পুলিশ সার্জেন্টের পায়ের তলায় পড়ে থাকো, সব শিখিয়ে দেবে। ধৈর্যের পরীক্ষায় কলকাতার পুলিশ দুনিয়ার এক নম্বর। বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভের মাপজোক করতে গিয়ে কলকাতা পুলিশের হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেলো। গড়ের মাঠে স্পেশাল অনুষ্ঠান করে এই বাহিনীর প্রত্যেককে দেশিকোত্তম উপাধি দেওয়া উচিত।

প্যারিসের পুলিশ নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরিতে এই সব বিদ্যা নিশ্চয়ই জানত। কিন্তু এখন কি ওসব কাজ সায়েবদের মনে আছে?

ইব্রাহিম বললো, "শ্রমিক ইউনিয়ন রাস্তায় নেমে পড়েছে, স্যর।"

আমি খুব ভরসা পাচ্ছি। লম্বা মিছিল এই মুহূর্তে সচল নেই। শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। প্যারিসের বিক্ষোভকারীদের স্বাস্থ্য কলকাতার বিক্ষোভকারীদের থেকে অনেক ভাল মনে হলো। কিন্তু আওয়াজ একটু মিহি। যা ভাল লাগলো তা হলো ফেস্টুন, ব্যানার ইত্যাদি। ফরাসিরা যখন বিক্ষোভ করে তখন তার মধ্যেও আর্ট থাকে। কতকগুলো পোস্টার তো এতোই সুন্দর যে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টে রাখ যায়। আমাদের কলকাতাতেও ইদানিং পোস্টার শিল্পের বেশ উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে বামপন্থী দলগুলির। আমার এক বন্ধুর মতে এই শিল্পকর্মের জন্যে পুরস্কার থাকলে প্রথম হতো এস ইউ সি, দ্বিতীয় সি পি আই, তৃতীয় সি পি এম। কংগ্রেস এ-বিষয়ে বেশ পিছিয়ে আছে, যদিও তার স্থান বি জে পি-র আগে। হিন্দিবলয়ে এখনও আর্টের ছোঁয়া তেমন লাগেনি।

ফরাসি শ্রমিকদের বিক্ষোভ দেখছি দু'চোখ ভরে। ট্রাফিক বিভ্রাটও আমাকে কিছুটা ভরসা দিচ্ছে।

ইব্রাহিম হঠাৎ কিছু ভিতরের খবর দিলো। "যারা বেশি চিৎকার করে তারা কম কামড়ায়, স্যর।"

ইব্রাহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। "আমি ঠিক বলছি, স্যর। ফরাসিদের বদনাম আছে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই মিছিলের আওয়াজ তোলাই সার। ধর্মঘট এদেশে ভীষণ কমে গিয়েছে। ওয়ার্কারদের সেই সংগঠন শক্তি নেই।"

"তুমি কব্জির জোরের কথা বলছ?"

"কব্জির জোর নয়, স্যর। ধর্মঘট করতে হলে ট্যাকের জোর চাই। ইউনিয়ন তহবিলে অনেক টাকা থাকা প্রয়োজন। ফরাসি শ্রমিক এখন ইংরেজের থেকে, আমেরিকানের থেকে অনেক কম কাজ বন্ধ করে।"

ইব্রাহিমের সঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে যথাসময়ে একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়েছিলাম।

এই ভদ্রলোক আমাদের দেশের খবরাখবরও রাখেন। বললেন, "বিদেশে আমরা মহাত্মা গান্ধীকে স্টাডি করছি। আর আপনারা সত্যাগ্রহ ত্যাগ করছেন।"

"মিছিল, বিক্ষোভ এসব তো ফরাসি দেশ থেকেই একদিন গিয়েছিল, শুনেছি।"

"কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নন-ভায়োলেন্ট আন্দোলন এখন দুনিয়ার লোকের বিস্ময়। ওঁর অনশনগুলো সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

আমি লজ্জা পেলাম। এ-ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। আমি শুধু জানি,

গান্ধী অনশন করলেই দেশময় হৈ-চৈ পড়ে যেতো, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা থেকে ছুটে যেতেন বাপুজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কমলালেবুর রস খেয়ে অনশন ভঙ্গের সময় বিধান রায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

এই ভদ্রলোক এবার প্রশ্ন করলেন, "মঁসিয়ে আপনাদের দেশে একটা নতুন অস্ত্র বেরিয়েছে। রিলে অনশন। ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন?"

আমার অবস্থা কাহিল। আমাদের দেশের অনেক খবর পৃথিবীর বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের অজান্তেই পৌঁছে যায়। গণ অনশন এঁরা বুঝতে পারেন, কিন্তু রিলে অনশনটা বোঝা একটু শক্ত।

ইব্রাহিম বললো, "উদ্দেশ্যটা হলো, কারও ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। টানা অনশন করাটা খুব ঝুঁকির ব্যাপার—তাই রিলে অনশন। অর্থাৎ মণ্ডপে বসে কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকা।"

এই জানাশোনা ভদ্রলোকটি অনেক সময় দিলেন আমাকে। বললেন, ফরাসি শ্রমিকদের সম্বন্ধে যা জানতে চান তা প্রশ্ন করতে পারেন। আমার সাধ্যমত খবরাখবর দেবো।

ভদ্রলোক যা বললেন তাতে মনে হলো আমাদের সঙ্গে ফরাসিদের অনেক মিল। ফরাসিরা এখন লাগাতার ধর্মঘট তেমন পছন্দ করে না। সে চায় টোকেন স্ট্রাইক—যাতে হাঙ্গামা কম, নিরাপত্তা বেশি। বড়জোর সকলের একদিনের মাইনে কাটা গেলো, কিংবা একদিনের ছুটি।

ফরাসিরা পৃথিবীর অন্যতম ধনী। জাতীয় আয়ের হিসেবে ইউরোপে জার্মানির পরেই তার সমৃদ্ধি—ইংরেজ তার পিছনে পড়ে রয়েছে এ খবর আমরা ভারতবর্ষে বসে বুঝতে পারি না। কিন্তু জার্মান অথবা ইংরেজ শ্রমিকদের তুলনায় ফরাসি শ্রমিকদের রুজিরোজগার কম। কারখানায় ফরাসি অফিসারের দাপট অনেক বেশি। এই লোকটিকে ফরাসি শ্রমিক ভীষণ অপছন্দ করে। অথচ এই পদের সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ শ্রমিকের ওপর নজরদারি করার জন্যে ফরাসি শিল্পপতিরা যখন খরচ বাড়াচ্ছেন তখন জার্মান শিল্পপতিরা ওই খাতে খরচ কমাচ্ছেন। জার্মান শ্রমিক বিক্ষোভ কম দেখায়, কিন্তু দাবি-দাওয়া ভালই বাগিয়ে নেয়। ইংরেজ শ্রমিকও এই বিদ্যাটি ফরাসি শ্রমিকের থেকে ভাল আয়ত্ত করেছে। ফরাসি দেশে এখন দু'জন শ্রমিক কাজ করে এবং একজন তাদের বলে দেয় কেমন করে কাজ করতে হবে। আমাদের এখানে বোধহয় অবস্থা আরও খারাপ। যত লোকে কাজ করে খবরদারি করার লোক তার থেকে অনেক বেশি।

স্বদেশে আমাদের শ্রমিকরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে টাকা বাড়িয়ে নিতে হয় তা সব সময় জানেন না, ফলে বদনামের ভাগি হলেও আসল

ব্যাপারে এঁরা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

জার্মান ও ইংরেজ শ্রমিক নিজেদের পেশা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন করে। আর আমাদের সঙ্গে ফরাসিদের মিল দু'দেশেরই রাজনীতির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ানের অচ্ছেদ্য গাঁটছড়া।

আমাদের এখানে যেমন সিটু, ইনটাক। ফরাসি দেশে তেমনি সিজিটি ও সিএফডিটি। সিজিটি-র সদস্যসংখ্যা বিশাল। এঁরা কমুনিস্ট দরদী। এঁদের লক্ষ্য পুঁজিবাদের বিলোপ, শ্রেণীসংগ্রামে এঁদের বিশ্বাস। কোনওরকম সমঝোতায় এঁদের আস্থা নেই। কিন্তু যারা এঁদের পছন্দ করেন না তাঁরা বলেন ওসব মিটিংকা বুলি। এখন বিপ্লব নয়, সভ্যদের দুটো বাড়তি ফ্রাঁ মালিকের কাছ থেকে পাইয়ে দেওয়াটাই ওঁরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সি এফ ডি টি অনেকটা আই এন টি ইউ সি-র মতন। এঁদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। কিন্তু নীতির কচকচিতে মালিকের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁদের তেমন বিশ্বাস নেই। গায়ে-গতরে খাটা শ্রমিক ছাড়াও এঁদের সভ্য হচ্ছেন সাদা কলারের কর্মী, যেমন অফিসের ক্লার্ক। সবচেয়ে যা আশ্চর্য, পুঁজিবাদের ধ্বংস না চাইলেও অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এঁদের কাজকর্মে বেশি অস্বস্তি বোধ করেন। একথা বোধহয় অজানা নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কমুনিস্টদের সঙ্গে আলাপ-আলাচনা করাটা অনেক সহজসাধ্য বলে মনে করেন অন্য কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়নের তুলনায়।

ফরাসি শ্রমিক কিন্তু ক্রমশই রাজনীতিবিদদের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন। তৃতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এফ-৩) কমুনিস্টবিরোধী। এঁরা শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা পছন্দ করেন না।

ব্যাপারটা যাই হোক, অবাক হবার মতন খবর হলো ফরাসি শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এখন কোনও ইউনিয়নেই যোগ দেয় না। ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যের অনুপাত ইউরোপের সব দেশের মধ্যে ফরাসি দেশে সবচেয়ে কম। এ-ব্যাপারে আমেরিকা পর্যন্ত ফরাসি শ্রমিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। এই অবস্থা আরও শ্রমিক ওই সব হাঙ্গামায় জড়াতে চাইছে না। প্রয়োজনের সময় ফরাসি শ্রমিক কোনও একটি ট্রেড ইউনিয়নকে সমর্থন করে। ইউনিয়নের প্রধান নির্ভর কম মাইনের অদক্ষ শ্রমিক ও টেমপোরারি শ্রমিক।

ফরাসি অফিসারদের মানসিকতা সম্বন্ধে কিছু নমুনা পাওয়া গেলো। এঁদের ধারণা, তদারকি ছাড়া কোনও ভাল কাজ সম্ভব নয়। যিনি উপরওয়ালা তিনিই ঝুঁকি নিতে পারেন যা শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রমিক ও উপরওয়ালা কখনই সমান হবে না। তবে শ্রমিক যাতে সুখী থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে। তার পাওনাগণ্ডা থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই

প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেকটা কোম্পানিই হলো খরিদ্দারের রক্ষিতার মতন—তাঁর মন জুগিয়ে চলতেই হবে।

এক ভদ্রলোক তো সোজাসুজি বলেছেন, শ্রমিকের ভালবাসার পাত্র হওয়া উপরওয়ালার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যদি সম্মান পান তা হলেই যথেষ্ট।

কর্মক্ষেত্রে ফরাসিদের তাই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, যারা উপরওয়ালা হয়ে হুকুম করতে ভালবাসে। দুই, যারা উপরওয়ালাকে অপছন্দ করে এবং তার সঙ্গে লড়ে যেতে চায়। এবং তিন, যারা সমস্ত ব্যাপারটাই অপছন্দ করে, এর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশেও কিন্তু শ্রেণীভেদের জয়জয়কার। শোনা যায়, এমন ইস্কুলও আছে যেখানে মাস্টারমশাইদের জন্যে তিন রকমের ডাইনিং রুম আছে। যাঁদের উঁচু ডিগ্রি আছে তাঁরা অর্ডিনারি ডিগ্রিহোল্ডারদের সঙ্গে একাসনে বসতে আগ্রহী নন। আবার যাঁদের ডিগ্রি নেই তাঁদের সঙ্গে ডিগ্রিহোল্ডাররা বসতে যাবেন কেন? আমার এতো দিন ধারণা ছিল জাতিভেদপ্রথাকে কর্মক্ষেত্রে টেনে নিতে আমরাই তুলনীহীন। আমাদের অফিসে বেয়ারা ও বাবুদের কলঘর অনেক সময় আলাদা। অফিসাররা যান আরেক কলঘরে। আবার জেনারেল ম্যানেজাররা যান অন্য কলঘরে। তাঁদের আবার প্রবেশ নিষেধ খোদ বড়সায়েবের কলঘরে।

সাম্য-মৈত্রীর দেশে শ্রমিক ও উপরওয়ালার মানসিক দূরত্ব কিন্তু কম নয়। ১৮৫১ সালে একজন ফরাসি বলছেন, ফরাসি শ্রমিক যে-সুখ ভোগ করছে রাজা আগামেমনন তাঁর জীবনকালে এই সুখ পাননি। আবার উইলসনের বিখ্যাত বইতে পড়েছি, ইউরোপের শ্রমিকদের সেদিন পর্যন্ত পাঁউরুটি ছাড়া কিছুই মিলতো না। আলু পর্যন্ত ছিল বিলাসিতা। শ্রমিকের তখনকার স্বপ্ন মাসে এক-আধ দিন পাঁউরুটিতে একটু মাখন লাগানো। ভাগ্যবান বলতে বোঝাতো তাকে, যে রুটির দু'দিকে মাখন লাগাতে পারে।

ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন তো শ্রমিকের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে ঘোষণা করলেন, যে বৈজ্ঞানিক মাখনের কমদামী বিকল্প আবিষ্কার করতে পারবে তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেকেই জানেন না, এই পুরস্কারের লোভে একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক দরিদ্র ফরাসির জন্যে মার্জেরিন আবিষ্কার করেন। এই নকল মাখনের ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাবার সুযোগ পাননি তৃতীয় নেপোলিয়ন। তাঁর গবেষণাগারে শতাব্দীর শেষ দিকে বৈজ্ঞানিক মেজ মুরিয়ে যে আবিষ্কার করলেন ফরাসিরা তার ফায়দা তুলতে পারলো না। মেজ মুরিয়ের কাছ থেকে জলের দামে রহস্যটা শিখে নিয়ে ওলন্দাজরা বড়লোক হয়ে উঠলেন। এঁরাই হলেন উইনিলিভার কোম্পানির অন্যতম স্তম্ভ জুরগেন। পরে এই মার্জেরিন নবকলেবরে আমাদের দেশে হাজির হলো—আমরা একে বনস্পতি বলে জানি,

যার বিখ্যাত ব্যবসায়িক নাম দালদা।

আমার পরিচিত ভদ্রলোকটি যেসব খবরাখবর দিলেন তাতে মনে হলো রাজনীতি গন্ধে শ্রমিকদের আগ্রহ কমছে। এদের ক্যানটিনে গেলেই নাকি ব্যাপারটা বোঝা যায়। ফরাসিরা কথা বলতে, গল্প করতে ভালবাসে। কিন্তু ক্যানটিনে এখন রাজনীতির আলোচনা অতিসামান্য। লোকের মনোহরণ করে রেখেছে সঙ্গীতের তারকারা, খেলোয়াড়রা। কর্মীদের যত আগ্রহ বাজি ধরায়, নাচায়, প্রেম করায় এবং গানে। শ্রমিকের প্রিয় বিষয় প্রমোশন সম্পর্কে আলোচনা। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শুধু পরিশ্রমে উন্নতি করা যায় তা কেউ এখন বিশ্বাস করে না। প্রমোশনের অর্ধেকই নাকি তৈলায়ন থেকে, যার পশ্চিমী প্রতিশব্দ হলো 'মাখনের নিপুণ প্রয়োগ'।

ফরাসি শ্রমিকের কয়েকটি অনবদ্য ছবি আমার সামনে ধরা পড়েছে। এই সব মানুষ অবশ্যই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে। ধরুন তার নাম জঁ। জঁ-এর চাকরি নেই। কিছুদিন আগে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সে ২৯ দিন অনশন করেছে। কিন্তু কারও টনক নড়েনি। শুধু একজন সমাজসেবক এসে তাকে ৩০০ ফ্রাঁ এবং দু'খানা ফুড পার্সেলের কুপন দিয়ে যায়। জঁ-এর জন্ম প্যারিসের দরিদ্রতম অঞ্চলে। বাবা দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করতেন সংসার চালানোর জন্যে। ছেলেরা রোজ খেতে পেলেও বাবা-মায়ের প্রাত্যহিক অন্ন জুটতো না। সে পড়াশোনায় ভাল নয়, কিন্তু তবু সে কর্মকার হতে চায় না। তার স্বপ্ন সে ইস্কুল মাস্টার হবে। প্যারিসের এক বাজারে পার্টটাইম কুলির কাজ করে জঁ কলেজে পড়ার টাকা জোগাড় করতো। কিন্তু তেমন ফল হলো না। এর পর যেতে হলো আবশ্যিক মিলিটারি সার্ভিসে। সেখানে মাতলামোর জন্যে জেল হলো। পরে একটা কাজ মিললো। এই সময় প্রেম ও বিবাহ। কিন্তু এক বছর পরেই বিয়ে ভাঙলো। স্বামীর ঘর ছেড়ে যাবার সময় বউটি সমস্ত ফার্নিচার পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়। জঁ-এর মতে ডাইভোর্স হচ্ছে এক ধরনের মৃত্যু।

জঁয়ের চাকরি গেলো। দু'মাস বেকার থাকার পরে একটা কোম্পানিতে কাজ মিললো। সেখানে মাটির তলায় অন্ধকার অফিস ঘরে সারাক্ষণ থাকতে হতো। কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে জঁ বেঁকে বসলো। আরও কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে দিলো—আলোর দাবিতে। এবারের ধর্মঘট টাকার অভাবে ভেঙে গেলো। চাকরি গেলো জঁয়ের।

এই সময় একটি টাইপিস্ট মেয়ের সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ। কিছুদিন একটা নতুন কাজ শেখার চেষ্টা করল জঁ—কিন্তু আবার পরীক্ষায় ফেল।

এবার একজন পরামর্শ দিলো মর্শাইতে যাও, ওখানে চাকরি পাওয়া সহজ। জঁ পত্রপাঠ ওই শহরে হাজির। কিন্তু ওখানেও চাকরির অবস্থা কাহিল। অনেক

কষ্টে একটা এক্স-রে ক্লিনিকে চাকরি মিললো। ভালই চলছিল, কিন্তু মাস কয়েক পরে ক্লিনিক ওকে বরখাস্ত করল। কেন তা জানা গেলো না।

এর পরে সাতচল্লিশটা জায়গায় চাকরির আবেদন করেছে জঁ। কিন্তু কেউ তাকে নেবে না। এতো আবেদন ডাকে পাঠাবার সঙ্গতি পর্যন্ত তার নেই। এবার বাধ্য হয়ে তরিতরকারি বেচবার সিদ্ধান্ত নিলো জঁ। কিন্তু এর জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি কেনার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স। বহু তদ্বির করেছে জঁ, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

জঁ থাকে মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টারে। সেখানেও ভাড়া দেয় না সে। দেবে কোথা থেকে?

সর্বত্র তার বদনাম। কেউ জঁকে আর সুযোগ দিতে চায় না। এই ধরনের লোকেরা নাকি বিপ্লবের হুমকি দেয়, কিন্তু আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ। চরম কিছু করা নাকি এদের ধাতে নেই।

জঁ এবং একজন বন্ধু অনশনে নামলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। বন্ধুটি একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলো, কিন্তু কোনও ফল হলো না। কেউ জঁকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

জঁ বলেছে, যদি বেপরোয়া গুলি চালিয়ে কিছু লোককে খুন করা যেতো তা হলে হয়তো লোকের নজর আনা যেতো। কিন্তু ওসব হাঙ্গামায় যাবার ইচ্ছে নেই। এখন জঁয়ের ধারণা, জেলখানাই সবচেয়ে ভাল জায়গা। ওখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে, খাওয়া জুটবে। জামাকাপড়ও নিয়মিত ধোলাই হবে।

মার্শাই শহরকে ঘেন্না করে জঁ। সে বুঝে উঠতে পারছে না এখন কী করবে।

এই ছবিটি আমি মুদ্রিত অবস্থায় পেলাম। পশ্চিমের সমাজতাত্ত্বিকরা গভীর ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার ছবি সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। এই সব প্রতিবেদন প্রায়ই সাহিত্যে রসাশ্রিত।

জ্যাক ফ্রিমন্টিয়ার নামে একজন ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক হতাশাগ্রস্ত ব্যর্থ শ্রমিকের জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে মনোগ্রাহী রিপোর্ট পেশ করেছেন। সেই সব মানুষের কথা, অর্থ যাদের 'নপুংসক' বানিয়েছে। যারা কংক্রিটের ছোট-ছোট খাঁচায় বন্দীর মতন জীবন কাটায়। কখন তারা ঘুমোবে, কখন তারা খেলা করবে এসব ঠিক হয় কারখানার প্রয়োজনমতো। নিজেদের আত্মসম্মানও তারা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে, কারণ হুকুম তামিল করে উপরওয়ালাকে মান্য করার জন্য নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করা হয় এদের ওপর।

এই সব সমীক্ষায় আর একজন খুদে ফরাসি শ্রমিক নেতার কথা পড়েছি। এই ভদ্রলোকের মা তিনবার বিয়ে করেছিলেন, প্রতি বিয়ে থেকেই সন্তান হয়েছে। মায়ের সম্বন্ধে ঘৃণা। কারণ তিনি নাকি থ্রি-ইন-ওয়ান—বার-এর কর্মী, পার্ট টাইম

বেশ্যা এবং রাঁধুনী। এক ভাই পাঁড় মাতাল। আর এক ভাই একটি মেয়ের গর্ভ করে জেল খেটেছে। এই ভদ্রলোক ১৫ বছর বয়স থেকে শ্রমিক হয়েছেন। পরে ট্রেনিং নিয়ে দক্ষ শ্রমিক হয়েছেন। ইচ্ছে করলেই প্রমোশন নিতে পারতেন। কিন্তু অফিসার হবার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই ওঁর মধ্যে। সারাক্ষণ তিনি শ্রমিকদের মধ্যে থাকেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন করেন। পাগল এই ভদ্রলোক শ্রমিকদের মধ্যে থাকবার জন্যে—প্রমোশন নেননি, বাড়ি কেনেননি, গাড়ি কিনতেও নারাজ। এই জন্যে তাঁর স্ত্রীর ভীষণ দুঃখ। বিশেষ করে একটা গাড়ির দিকে স্ত্রীর খুব ঝোঁক।

এই ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই চিন্তিত নন। ওঁর ধারণা বউ একদিন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এবং বুঝে-শুনে খোদ বিপ্লবকেই বাড়িতে ডেকে আনবে।

আমার মনে হলো কর্মজীবনে এই দেশেও এমন কয়েকজন শ্রমিক নেতাকে দেখেছি যাঁরা একই ত্যাগ করেছেন হাসিমুখে। সুযোগ পেয়েও প্রমোশন নেননি স্রেফ ইউনিয়নের সভ্য থাকার জন্যে।

কলকারখানার কথা যখন উঠছেই তখন ফরাসি মানুষদের সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক্।

ফরাসি শ্রমজীবী এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কথা যতই সংগ্রহ করছি ততই আমার নিজের দেশের কথা মনে পড়ছে। ফরাসিদের সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই আমাদের মিল আশ্চর্যজনক। যেমন ধরুন ছুটির প্রতি টান—এ-ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ ইস্কুলের ছাত্রদের থেকেও যেন বেশি। ফরাসিরা তো সমস্ত পৃথিবীকে 'ফ্রেঞ্চ লিভ' বলে একটি অভিনব শব্দ উপহার দিয়েছে, যা আমাদের দেশের সমস্ত কর্মচারী ভালভাবেই জানেন।

আচমকা ছুটির ব্যাপারে একটু পরেই আসা যাবে। তার আগে শ্রমিক নেতাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা হয়ে যাক। স্বদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় শ্রমজীবী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এঁদের কয়েকজনের আদর্শবোধ ও ত্যাগ আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁরা আজও আমার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন। হাতের গোড়ায় অসংখ্য সুযোগ ও প্রলোভন অবহেলা করে তাঁরা দুঃখের জীবন বেছে নিয়েছেন। এঁদের সামলাতে গিয়ে অশেষ মূল্য দিয়েছেন এঁদের মা, অথবা স্ত্রী। তবু অপবাদের বোঝা কমেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গ্ল্যামার ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবে যে গ্ল্যামার আছে, তার শতাংশের একাংশ নেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে, এখানে কোনো ত্যাগও নেই, আছে কেবল গোপন স্বার্থ এবং অসততা। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যে অসৎ লোক নেই তা নয়। জনসভায় বড়-বড় বুলি এবং গোপনে শ্রমিকের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেবার দৃষ্টান্ত

অনেক। সে-সব প্রকাশিত হতো যদি এদেশের কারখানার ম্যানেজাররা তাঁদের স্মৃতিকথা লিখতেন। কিন্তু শ্রদ্ধা করবার মতন, ভালবাসার মতন মানুষ বেশ কিছু দেখেছি। মনে হয়েছে, এঁরা যদি কখনও কোম্পানির সীমিত সমস্যায় সারাক্ষণ জড়িয়ে না পড়ে আরও বড় কিছু ব্যাপারে সময় দিতেন তা হলে এ দেশের জনজীবন আরও সমৃদ্ধ হতো।

কারখানায় কাজ করে যাঁরা শ্রমিকের নেতৃত্ব দেন তাঁদের দুঃখের কথা এ দেশে এখনও বিস্তারিতভাবে লেখা হয়নি। এই বিষয়ে, সাধারণ পাঠক-পাঠিকাও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা সিনেমা ও টি ভি-র পর্দায় দু'একটি খল এবং দুমুখো নেতা অথবা স্বার্থপর মালিকের কারসাজি দেখেই সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানবিক সমস্যা এখনও আমাদের সাহিত্যে প্রতিফলিত হলো না।

ফরাসি ভাষা জানা না থাকায় ও দেশের সাহিত্যে এই বিষয়ের প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু বলবার এক্তিয়ার আমার নেই। কিন্তু যা হাতের গোড়ায় আছে তা হলো বিভিন্ন সমীক্ষা। আছে ছোট-ছোট লেখায় কর্মীদের নানা অন্তরঙ্গ চিত্র। যেমন ধরুন বার্নার্ড-এর কথা।

বার্নার্ডের বাবা ছিলেন খনি শ্রমিক। তাঁর নটি ছেলে মেয়ে। ছোটবেলায় বার্নার্ডের স্বপ্ন ছিল সে ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করবে। বিকেলে পড়াশোনা চালাতে-চালাতে বার্নার্ড কারখানায় কাজ নেয়। অবশেষে তার জীবনে মস্ত পরিবর্তন এলো। নতুন ডিপ্লোমার জোরে সে কারখানায় সুপারভাইজার হতে পারতো। কিন্তু লোককে হুকুম করার কাজে অরুচি ধরে গিয়েছে বার্নার্ডের। প্রমোশন না নিয়ে সে সামান্য ইলেকট্রিসিয়ান থেকে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিয়ানের ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। ডিউটিতে এক মিনিট বসার উপায় থাকে না। ডিউটির সময়েরও কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। মর্নিং শিফটে যেতে হলে সকাল সাড়ে চারটেয় ঘুম থেকে উঠতে হয়। রাত ডিউটি হলে দুপুরেও ঘুম আসে না এই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের।

বার্নার্ড কমুনিস্ট। নেতা হিসেবে কারখানার ডিউটির সময় একটু কম—কিন্তু বাকি একভাগ সময়ে ইউনিয়নের কাজ করতে হয়। কিন্তু তাতে চলে না। তাই বাড়তি কুড়ি-একুশ ঘণ্টা সময় সপ্তাহে দিতে হয় বার্নার্ডের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ছাড়া কোনও ব্যাপারেই বার্নার্ডের আগ্রহ নেই। সে প্রমোশন চায় না, বড়লোক হতে চায় না। মানুষের ওপর অর্ডার চালানো নিতান্তই অপছন্দ। বার্নার্ডের স্ত্রী একটু আলাদা ধরনের। স্বামীর রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর কোনও বিরূপ ধারণা নেই। "কিন্তু আমাকে ভাবতে হয়

সংসারের কথা, ছেলেমেয়েদের কথা।”

বলা বাহুল্য, বার্নার্ডের স্ত্রীও দীর্ঘদিন কারখানায় কাজ করেছেন। যেমন কাজ করেছেন আমাদের দেশের অনেক বামপন্থী নেতার স্ত্রীরা। স্বামীরা আন্দোলন করেছেন, কখন তাঁরা জেলে যাবেন, কখন পলাতক হবেন ঠিক নেই। এই অবস্থায় সামান্য একটা চাকরি অবলম্বন করে সংসার সামলেছেন স্ত্রীরা। আমি একজন বিখ্যাত শ্রমিকনেতার কথা জানি, তাঁর স্ত্রী সারাজীবন স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্টগিরি করে সংসার চালিয়েছেন। আরও কয়েকজনকে জানি যাঁরা মাস্টারি করে, আধবেলা খেয়ে সংসারের ঘানি টেনেছেন। তারপর আবার জেলে স্বামীকে দেখতে গিয়েছেন। এঁরা পিছনে না থাকলে অনেক আদর্শই বিকশিত হতে পারতো না, অথচ এঁদের ত্যাগের কথা কোথাও লেখা থাকে না।

বার্নার্ডের স্ত্রীর কাছে থেকে জানা যায়, নতুন জায়গায় কাজ করতে এসে প্রথমে তাঁরা বাড়ি ভাড়া করতে পারেননি। ফলে তাঁরা শহরতলির প্রান্তে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। সেখানে জল বা পায়খানা কিছুই ছিল না। এর পরে এঁরা মিউনিসিপ্যাল কোয়ার্টারে জায়গা পান। সরকারি আবাসনে ফরাসির মন নেই। এই আবাসনকে ফরাসিরা কেন জঘন্যতম বস্তির মতন মনে করে তা নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আন্দাজ করি, কংক্রিটের জঙ্গলে স্বাধীন ফরাসিমন বিকশিত হয় না। তার সারাক্ষণ ভয়, ছেলেমেয়েরা মানুষ হবে না। বিদেশি ওয়ার্কার থেকে ব্যক্তিজীবনে শতহস্ত দূরে থাকতে চায় জাত-ফরাসি।

এই পরিবেশে লড়াই করে অবশেষে বার্নার্ডের স্ত্রী অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলেছেন। তিনি কিছু টাকা জমা দিয়ে কিস্তিবন্দিতে একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়েছেন। তাঁর কথা, “এবার সব দুঃখ সহ্য করবার শক্তি আমার থাকবে—কারণ ছেলেমেয়েরা সুস্থ পরিবেশে মানুষ হবে।”

কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী এই বাড়িতে একটা ক্রেশ চালাচ্ছেন। কর্মীমায়েরা সেখানে তাদের ছেলেমেয়ে রেখে কারখানায় যান। বাড়ির কিস্তির টাকা শোধ করবার জন্যে বহু বছর তাঁরা ছুটি নিয়ে বাইরে যান না।

এই বাড়ি নিয়ে বার্নার্ডের বেশ অস্বস্তি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া আর কোনও কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। যদিও ফরাসি শ্রমিকরা এখন নিজেদের বাড়ি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ধার নিয়ে জমিজমার ব্যবস্থা করে মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যে আমাদের শ্রমিক ও ফরাসি শ্রমিকের মানসিকতায় কোনও পার্থক্য নেই। যদিও কট্টর ফরাসি শ্রমিকনেতারা সন্দেহ করছেন, শ্রমিকের পায়ে চেন পরিয়ে রাখার জন্যেই কিস্তিতে বাড়ি বেচার টোপ দেওয়া হয়েছে। স্রেফ বাড়ির কিস্তি দিতে না-পারার আশঙ্কায় শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে যাবে না। এবং সুপারভাইজারকে সন্তুষ্ট রেখে ওভারটাইমের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।

দেনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়াটা শ্রমিকের পক্ষে ভাল নয় বলে মনে করে বার্নার্ড। তার ধারণা, মেশিনের সুবিধের দিকেই মালিকের সমস্ত নজর, মানুষের সুবিধের জন্যে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তারপর চাকরির অনিশ্চয়তা। বাজারে যতই প্রতিযোগিতা বাড়ছে ততই কলকারখানা বন্ধ হবার সম্ভাবনা বাড়ছে। প্রোডাকটিভিটির নাম করে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে খুব আনন্দ পায় দুনিয়ার মালিক।

বার্নার্ডের স্ত্রী অবশ্য রসিকতা করেন, "সুপারভাইজারের সঙ্গে, ম্যানেজারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ভীষণ সুখ পায় আমার স্বামী।"

বার্নার্ড প্রতিবাদ করেন না। সে বলে, "যখন ম্যানেজারের সঙ্গে তর্কাতর্কি করি, তখন মনে করি ওঁর থেকে কোনো অংশে কম যাই না আমি। যদিও ওঁদের ধারণা, ওয়ার্কার মানেই মূর্খ, আমাদের ঘটে কোনও বুদ্ধি নেই।" বার্নার্ড স্বীকার করে, আরও একধরনের ম্যানেজার আছেন এঁরা ইউনিয়নের নেতাদের খাটো মনে করেন না। এঁদের সামলানো অবশ্য আরও শক্ত কাজ, কারণ এঁদের হাত দিয়ে কিছু গলতে চায় না। বার্নার্ড চায় কলকারখানাগুলো ক্রমশ সরকারের আওতায় চলে আসুক। তা হলে আর কিছু না হোক চাকরির নিরাপত্তা বাড়বে।

নিজের দেশেও আমি এই ধরনের কথা শুনেছি। ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের স্ত্রীরা হাসিমুখে স্বীকার করেছেন, ম্যানেজারের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে স্বামীরা ভীষণ সুখ পান। নিজেদের চাকরিতে উন্নতি করার কোনও ইচ্ছা নেই এঁদের অনেকের, শ্রমিকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে চিরকালের গাঁটছড়া বেঁধেই এঁদের পরিতৃপ্তি।

অশেষ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও ফরাসির কাজে অনীহা সমস্ত পৃথিবীর রসরসিকতার কারণ হয়ে রয়েছে। একজন ফরাসি ম্যানেজার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, এদেশে ছুটি বেড়েই চলেছে। ১৯৩৬ সালে ফরাসি শ্রমিক বছরে দু' সপ্তাহ সবেতন ছুটির অধিকার পায়। ১৯৫৬ সালে এটা তিন সপ্তাহ হলো এবং ১৯৮১-তে পাঁচ সপ্তাহ।

এর ওপরে আছে লং উইকএন্ডের ধাক্কা। যদি বৃহস্পতি অথবা মঙ্গলবারে কোনও সরকারি ছুটির দিন পড়লো তো আর কথাই নেই। শুক্র অথবা সোমবার ডুব মেরে লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করে নেবে ফরাসি।

বিনা নোটিশে আচমকা ছুটি নেবার বিশ্ববিশ্রুত নাম ফ্রেঞ্চ লিভ। যদিও আমার এক ফরাসি বন্ধু অভিধান ইত্যাদি নিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, শ্রমিকদের নামে মিথ্যা বদনাম রটানো হয়েছে। আচমকা ছুটি নেওয়ার সঙ্গে এই শব্দের নাকি কোনও সম্পর্ক নেই। শব্দটা এসেছে ফরাসি সৈন্যবাহিনী থেকে। ফরাসি সৈন্যরা যখন একের পর এক দেশ জয় করছে, তখন নতুন দেশের

দোকানে অথবা কারও বাড়িতে গিয়ে দাম না দিয়ে অথবা অনুমতি না নিয়ে জিনিসপত্র তুলে নেওয়ায় এঁরা বিশেষ পটু ছিলেন। সেই থেকে ফ্রেঞ্চ লিভ।

আমার মন ভরলো না দেখে মঁসিয়েমশাই আবার অভিধান উল্টোলেন। তারপর বললেন, ফরাসি বুর্জোয়ার বদনামটা ওয়ার্কারের ঘাড়ে চাপিয়েছে দুষ্টজনরা। কোথাও নিমন্ত্রিত হলে খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথিকে গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়। এইটাই দুনিয়ার রীতি। ফরাসি এই রীতিতে বিশ্বাস করতো না, টুক করে সবার অলক্ষ্যে উধাও হয়ে যাবার অভ্যেস ছিল। তাই ফরাসি বিদায় বা ফ্রেঞ্চ লিভ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি শব্দ মনে পড়ে গেলো। ফ্রেঞ্চ কিস্। ফরাসি চুম্বনে অপরপক্ষের মুখের মধ্যে জিভ গুঁজে দেওয়া হয়। আমার বন্ধু মঁসিয়ে তীব্র আপত্তি জানালেন। এই রকম কোনও রীতিতে তাঁরা অভ্যস্ত নন। এসব ইংরেজের অপপ্রচার। ফরাসিও প্রতিশোধ নিয়েছে। নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পাওনাদারকে ফরাসি ভাষায় 'ইংলিশম্যান' বলা হয়।

ফরাসি মধ্যাহ্নভোজনও একসময় দুনিয়ার অপবাদ কুড়িয়েছে। টিফিনের নাম করে ফরাসিরা দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত অফিস থেকে উধাও। এই সময় কলকাতার কিছু অফিসের মতন ফরাসির কাজে রুচি থাকে না। কিন্তু এখন সে অবস্থা পাল্টেছে—প্যারিসের সব অফিসেই এখন ঝটপট লাঞ্চ। আধঘণ্টার মধ্যে মুখে কিছু খাবার গুঁজে এক কাপ কফি পান করে পারির ফরাসি এখন কাজে মন দেয়।

কিন্তু আগস্ট মাসে এই ফরাসি আবার ছুটির হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওই সময় কাজে মন থাকে না সাচ্চা ফরাসির। সারা বছরের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি দেহ ও মন থেকে মুছে ফেলবার জন্যে জাত-ফরাসি এই সময় বেপরোয়া। শুধু কোর্ট কাছারি অফিস নয়, দোকানপাট এমনকি রেস্তোরাঁ পর্যন্ত ঝাঁপ ফেলে দেয় ছুটির সন্ধানে।

আগস্ট মাসে প্যারিসের অবস্থা কী রকম হয় সে-বিষয়ে একজন আমেরিকান রসিক কিছু দিন আগে চমৎকার ছবি এঁকেছেন। বলা বাহুল্য, ফরাসি-মার্কিনি ভালবাসা-ঘৃণার ইতিহাস দুশো বছরের ওপর। আমেরিকান কিছু দিনের জন্যে প্যারিসপ্রবাসী না হলে মনে সুখ পান না, আর জাত-ফরাসি যতক্ষণ না আমেরিকান প্রশস্তি লাভ করেন ততক্ষণ অতৃপ্ত থেকে যান।

আমেরিকানের চোখে আগস্ট মাসের প্যারিস অনেকটা এই রকম : সকলেই জানেন আগস্ট মাসে প্যারিসের প্রত্যেকটি ফরাসি ছুটিতে চলে যায়, ৩১শে জুলাই একবার আসুক অমনি, সমস্ত দোকানে লোহার ঝাঁপ নেমে আসবে। ইলেকট্রিসিয়ান, কলের মিস্ত্রি, মোটর গাড়ির মেকানিক সবাই যন্ত্রপাতি

গুটিয়ে বাক্সে পুরে ফেলবে। কলকারখানা, অফিস, কাছারি, সরকারি অফিস, ডাইং ক্লিনিং সব এক মাসের জন্যে বন্ধ হবে।

সেপ্টেম্বরে প্যারিসিয়ান যখন শহরে ফিরে আসে তখন বেশ কিছু বিদেশির কঙ্কাল দেখতে পায়। এঁদের অবস্থা দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এঁরা বন্ধ রুটির দোকান, ওষুধের দোকান অথবা লন্ড্রিতে ঢোকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

খুবই দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে রয়েছে সেই বিদেশি ভদ্রলোক যাঁকে পাওয়া গিয়েছিল বিখ্যাত এক রেস্তোরাঁর সামনে, এঁর ডান হাতে রয়েছে অর্ধেক চিবানো ডাইনার্স ক্রেডিট কার্ড।

আর এক মহিলার দেহ তাঁর ফ্ল্যাটে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। ওঁর মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায় এক কলের মিস্ত্রির টেলিফোন নম্বর। স্পষ্টই বোঝা যায় যে একমাস ধরে এই মহিলা তাঁর কল সারিয়ে দেবার জন্যে মিস্ত্রির খোঁজ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঘরে জল এতোই বেড়ে যায় যে তিনি টেলিফোনের নাগাল পাননি। পুলিশ অবশ্য বলেছে, ফোন হাতের গোড়ায় থাকলেও কোনও লাভ হতো না, কারণ ওই মিস্ত্রি তখন প্যারিস থেকে অনেক দূরে ব্রিটানিতে ছুটি উপভোগ করছেন।

একজন ট্যুরিস্টের গাড়ি প্যারিসের বিখ্যাত রাজপথে বিগড়ে যায়। ইনি গাড়ি থেকে না-নেমে অটোমোবাইল ক্লাবের সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। স্বভাবতই কেউ সাহায্য করতে আসেনি এবং স্রেফ জলের অভাবে এই ভদ্রলোক স্টিয়ারিং-এ হাত রেখেই মরে পড়ে থাকেন।

সমস্ত লন্ড্রি বন্ধ থাকায় আর একজন ট্যুরিস্ট নিজের শার্ট কাচবার জন্যে এক লন্ড্রির তালা ভেঙে ফেলেন। ভেবেছিলেন ওয়াশিং মেশিনে নিজেই জামা কেচে নেবেন। কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ে এখন কুড়ি বছরের জন্যে ফরাসি শ্রীঘরে বসবাস করছেন।

ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে লড়াই হয়। ফলে চারজন নিহত এবং ছত্রিশজন আহত। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ট্যাক্সিতে সমস্ত বিদেশি হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন।

অবস্থা আয়ত্তে আনবার জন্যে কিছু বিদেশি একবার আন্তর্জাতিক রেড-ক্রশের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। কারণ আন্তর্জাতিক রেড-ক্রশ ওই আবেদন ফরাসি রেড-ক্রশের কাছে পাঠিয়ে দেন, অথচ সকলেই জানেন এই সময়ে ওই প্রতিষ্ঠানের সবাই ছুটি নেন।

'সোসাইটি অফ পিপ্‌লস স্টাক ইন প্যারিস ইন আগস্ট' (Sopsipia) বলে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান ছুটির সময় প্রাণ ধারণের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা করছেন।

বিভিন্ন আমেরিকান কোম্পানি এঁদের সাহায্য করছেন। যেমন প্যান অ্যাম

বিমান প্রতিষ্ঠান একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পুরস্কার বিজয়িনীকে সাহায্য করবার জন্যে উইক এন্ডে একজন কলের মিস্ত্রিকে আমেরিকা থেকে প্যারিসে পাঠানো হবে। টি-ডবলু-এ পিছিয়ে নেই। প্রথম পুরস্কার একটা নোংরা সুট প্যারিস থেকে নিউইয়র্কে এনে কাচিয়ে ফেরত পাঠানো হবে।

রসিক লেখক লিখছেন : এবার আগস্ট মাসে প্যারিসে রিপোর্ট করবার মতন অনেক কিছু ঘটবে। আমার ওই সব দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও ওই সময় ছুটিতে যাচ্ছি।

বাংলাদেশি ইব্রাহিমকে বললাম, "আমি তো সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্যারিসে হাজির হয়েছি। এমন প্রাণবন্ত নগরী কি সত্যিই আগস্ট মাসে ছুটিতে চলে যায়?"

ইব্রাহিম প্রতিবাদ জানালো। সে-ও শুনেছে, যারা ইংরিজী ভাষায় কথা বলে তারা ফরাসিদের পছন্দ করে না। ইব্রাহিম বললো, "এই তো আমরা সবাই প্যারিসে ছিলাম আগস্ট মাসে। কিছু লোক ছুটিতে যায়। তা যাবে না কেন! সারা বছরই কি মানুষকে খেটে মরতে হবে?"

ইব্রাহিম এবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। সে এবার আমাকে ছাব্বিশ নম্বর রু বেনার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। রাজপথের মিছিলে ফরাসি বিক্ষোভকারীদের স্লোগান শুনতে-শুনতে আমি বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি।

আর সময় নষ্ট না করে প্যারিসের মেট্রোয় প্রবেশ করা গেলো এবং আধঘণ্টা পরেই আমরা ছাব্বিশ নম্বরে ফিরে এসেছি।

শাইনিং কোম্পানির সুন্দরী রিসেপশনিস্ট আমাকে ইংরিজী প্রথায় শুভ অপরাহ্ণ জানালো এবং এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে শাইনিং কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টর জেনারেলের ঘরে পৌঁছে দিলো।

এদেশে যাঁদের এম-ডি অথবা বড়াসাব বলা হয় ফরাসি দেশে তাঁরাই প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ডিরেক্টর জেনারেল।

প্রেসিডেন্টসায়েব এই মুহূর্তে ঘরে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাঁর সুদর্শনা মধুরভাষিণী ব্যক্তিগত সচিব ক্যারোলিন এগিয়ে এলো। ক্যারোলিন অতি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। সুন্দরী অথচ কাজপাগল এমন বহু মেয়ে রয়েছে এই শহরে।

ক্যারোলিন শুধু ফরাসি ভাষায় দক্ষ তা নয়—ইংরিজী ভাষাটা সে চমৎকার রপ্ত করেছে। ক্যারোলিন বলে, "আমাদের কোম্পানির যা কাজ তাতে ইংরিজী জানা ছাড়া উপায় নেই। প্রেসিডেন্টের সারাক্ষণ লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো থেকে ফোন আসে। ইংরিজী না জানলে ওরা

আমাদের কাজ দেবে মনে করো তুমি?”

আমার ধারণা ছিল, ইংরিজীর ওপর ফরাসির জাতক্রোধ। ইংলন্ডের এতো কাছে থেকেও ফরাসি ইচ্ছে করেই রানির ভাষাটা শেখে না। ক্যারোলিন আমার ভুল ভেঙে দিয়েছিল। সে বলেছিল, “তুমি অনেক দিন আগেকার সব কথা বলছো। ইংরিজীটা যে দুনিয়ার বিজনেসের ভাষা, তা ফরাসি, জার্মান, জাপানিজ সবাই বুঝে নিয়েছে এবং মেনে নিয়েছে। কত ফরাসি যে এখন ইংরিজী শিখেছে তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ক্যারোলিন ইংরিজীতে খুব উৎসাহী। সে-ই আমাকে খবর দিলো, ফ্রান্সের সরকারি ইস্কুলে এখন একটা বিদেশি ভাষা শিখতেই হয়। হয় জার্মান না-হয় ইংরিজী শেখার সুবিধে রয়েছে। কিন্তু শতকরা পঁচাশিজন ফরাসি ছেলেমেয়ে ইংরিজীর ক্লাসে যোগ দিচ্ছে।”

ক্যারোলিন অনেক ইংরিজী বই পড়ে। সেই সঙ্গে ইংরিজী ম্যাগাজিন। কোথায় সে পড়েছে, দু'হাজার সাল নাগাদ ইংরিজী ভাষা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে একশো কোটি লোক এই ভাষা রপ্ত করেছে, কিন্তু আগামী দশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়াবে দেড়শো কোটিতে।

তবে ফরাসি ভাষায় যে সুখ তা ইংরিজীতে নেই। ইংরিজী উচ্চারণ কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বাহাত্তরটা দেশে ইংরিজীর সরকারি সম্মান। ক্যারোলিন জানে, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে ইংরিজী অবশ্যপাঠ্য হয়ে গিয়েছে। ডাচ্‌রা তো ইংরিজীকে প্রায় দ্বিতীয় ভাষা করে তুলেছে। ইউরোপে ইংলন্ডের বাইরে হল্যান্ডেই ইংরিজীর সর্বাধিক প্রতাপ। ক্যারোলিন খবর দিলো, একমাত্র টোকিও শহরে ১৩০০ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ স্কুল আছে। এই সংখ্যা প্রতিমাসে বাড়ছে।

ক্যারোলিন শুনেছে, আন্তর্জাতিক টেলিফোনে যত কথাবার্তা হয় তার শতকরা ৮৫ ভাগ ইংরিজীতে। বিখ্যাত ফরাসি কোম্পানি সি জি এস ইতিমধ্যেই ইংরিজীতে কাজকর্ম চালাচ্ছে। জগদ্বিখ্যাত ফরাসি টেলিযোগাযোগ কোম্পানি অ্যালকোটেল-এর প্যারিস সদর দপ্তরে ফোন করলে ইংরিজীতে উত্তর দেওয়া হয়। “অ্যালকোটেল, গুডমর্নিং।” একজন আমেরিকান লেখক অবশ্য রসিকতা করেছেন, যখন ফরাসিরা ভাষা সম্বন্ধে নরম হয় তখন জানতে হবে ভীষণ কিছু একটা ঘটেছে।

ক্যারোলিন বললো, “আজ খুব খাটাখাটনি হয়েছে মনে হচ্ছে! মুখ শুকিয়ে গিয়েছে তোমার।”

আমি বললাম, “আজ মিছিলের পাল্লায় পড়েছিলুম, ক্যারোলিন।”

ক্যারোলিন সঙ্গে-সঙ্গে উধাও হলো এবং দু'মিনিটের মধ্যে এককাপ গরম

কফি নিয়ে ফিরে এলো।

প্যারিসের অফিসে সায়েবের অতিথিদের কফি বিতরণের দায়িত্ব সেক্রেটারির। আতিথেয়তার অঙ্গ হিসেবে এটা দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যারোলিন কফির কাপ নামিয়ে দিয়ে জানালো, মঁসিয়ে সেনগুপ্ত অনেকক্ষণ ধরে আমার খোঁজ নিচ্ছিলেন। একটা ফোন কল পেয়ে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরবেন আধঘণ্টার মধ্যে।

এই সময়ে আমার দেখা শোনার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ক্যারোলিনের। ক্যারোলিন জানতে চায়, আমি ক্ষুধার্ত বোধ করছি কি না। তা হলে ফ্রিজ থেকে এখনই কিছু খাবার বের করে দেবে। ওখানে নেসলের চকোলেট আছে, বি-এস-এন কোম্পানির বিস্কুট আছে, জ্যাক বেনোয়ার বাদাম আছে। দেশের জন্যে মন কেমন করলে ক্যারোলিন আমাকে কাজু বাদামের প্যাকেট দিতে পারে, যা ভারতবর্ষ থেকে জ্যাক বেনোয়া এদেশে আমদানি করেছে।

আমি কোনও কিছুতেই উৎসাহ দেখাচ্ছি না বলে চিন্তিত হয়ে উঠলো ক্যারোলিন। ভারী স্নেহপ্রবণ মেয়েটি। ক্যারোলিন বললো, “আমি তোমাকে দানোনে কোম্পানির ইয়োগার্টও দিতে পারি। মঁসিয়ে সেনগুপ্তের ফেভারিট। তুমি তো জানো, মঁসিয়ে সেনগুপ্ত এই দই-এর প্যাকেট নতুনভাবে ডিজাইন করে দিয়েছেন।”

ক্যারোলিন জানালো, যে সব খাবার সে তার অফিস ঘরে আলমারিতে রেখে দিয়েছে তার সমস্ত প্যাকেজিং-ই এই অফিসে তৈরি হয়েছে।

আমার আপত্তি টিকলো না। ক্যারোলিন নিজেই মস্ত এক চকোলেট বার আমার সামনে হাজির করলো। এবং আমার অস্বস্তি কাটাবার জন্যে নিজেও চকোলেটের একটা টুকরো মুখে পুরে দিলো। তারপর বললো, “কাল তোমাকে ড্রিংকিং চকোলেট খাওয়াবো। তুমি নিশ্চয় জানো, নেপোলিয়ন সকালে কফির বদলে পছন্দ করতেন হট চকোলেট। এবং ভলটেয়ার সকাল পাঁচটা থেকে দুপুর তিনটের মধ্যে বারো কাপ চকোলেট পান করতেন। সাধে কি আর ভলটেয়ার ৮৪ বছর বেঁচেছিলেন!”

ক্যারোলিন যেন দশভুজা। দর্শনার্থীদের আপ্যায়িত করছে, টেলিফোনে সর্বত্র ইংরিজী এবং ফরাসিতে কথা বলছে। অফিসের কর্মীদের নানা নির্দেশ দিচ্ছে, মাঝে-মাঝে কমপিউটার কিবোর্ড পিয়ানোর মতন টিপে যাচ্ছে, চিঠি ছাপছে। তার মুহূর্তের ছুটি নেই। এরই মধ্যে সারাক্ষণ নিজেকে এমন ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট রেখেছে, মনে হবে এ-মেয়ে সারাক্ষণই সৌন্দর্য সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকে আর কিছু করে না। একালের ফরাসি তরুণীরা সবদিকে অসামান্যা—তারা রাঁধেও

বটে, চুলও বাঁধে। সেই সঙ্গে রুজিরোজগার করে। এরা যেখানে থাকে সেখানে সবকিছু ঝক-ঝক করে। সাধে কি আর ফরাসি-তরুণীর ভুবনবিদিত সুনাম।

আমি সোফায় বসে-বসে যতই ক্যারোলিনকে দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। যেন মূর্তিমতী মাদমাজোল এফিসিয়েন্সি। অফিসের কাজকর্ম ছাড়া আর কোনো ভাবনা যে এই রমণীর মনের মধ্যে থাকতে পারে তা বিশ্বাস হয় না। এই ব্যাপারে ফরাসি রমণী আমাদের মিস ব্যানার্জি অথবা মিসেস ঘোষ থেকে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। আমাদের মেয়েরাও ঘরের বাইরে বেরুচ্ছে কর্মসন্ধানে, প্রফেসনালিজমের কথা উঠছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুরো কাজ শুরু হয়নি, অনেক মেয়ের মন পড়ে থাকে অন্যত্র। ভাবটা এই যে, কর্মক্ষেত্রটা মেয়েদের স্বাভাবিক ক্ষেত্র নয়, বিশেষ কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকলে এঁরা কেউ এখানে আসতেন না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পার্শি মহিলা কিন্তু অনেকদিন এই দ্বিধা কাটিয়ে অফিসকে ঘরের মতন করে নিয়েছেন, ফলে চাকরির বাজারে ডিসুজা কিংবা বাটলিওয়ালাদের বেজায় সুনাম। ব্যানার্জি, চ্যাটার্জিরা যত দ্রুত প্রফেসনালিজমের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন ততই ভাল।

ক্যারোলিন যখন টেলিফোন করে তখন তার টাইপিং কাজ বন্ধ থাকে না। টেলিফোনে এমন ব্যবস্থা আছে যে রিসিভার ধরতে হয় না। কথা বলতে-বলতে ক্যারোলিন তাই হাতে অন্য কাজ করে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে ক্যারোলিন জানালো, "মঁসিয়ে মুখার্জি, আপনার বন্ধু এখন তিন মাইল দূরে রয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে ফিরছেন।"

"তুমি কি স্যাটেলাইটে মঁসিয়ে সেনগুপ্তকে অনুসরণ করছো ক্যারোলিন?"

ক্যারোলিন হাসলো। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। "সেনগুপ্তর গাড়িতেই টেলিফোন রয়েছে। ক্যালকাটায় নিশ্চয় এই ফোন চালু হয়েছ।"

আমি বাললাম, "আমাদের শহরে টেলিফোনের খুবই দুর্নাম। দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আমরা গলদঘর্ম। আমাদের শহরে কারও-কারও বাড়িতে তারবিহীন টেলিফোন দেখেছি, কিন্তু গাড়িতে ফোন দেখিনি।"

ক্যারোলিন একটু অবাক হলো। "গাড়িটাও তো অফিস। ওখানে কেন টেলিফোন থাকবে না? সেনগুপ্ত তো সারাক্ষণই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওঁর গাড়িতে ফোন না থাকলে কেমন করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো।"

বোঝা যাচ্ছে ক্যারোলিন গাড়িতে ফোন বসিয়েই সন্তুষ্ট নয়। সে এখন গাড়িতে ফ্যাক্স মেশিনও বসাতে চায়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোন নম্বর ডায়াল করে যে-কোনও কাগজ সেনগুপ্তের হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। ক্যারোলিনের দায়িত্ব কমে যাবে।

এসব জিনিস আমরা যারা কলকাতা থেকে এসেছি তাদের না শোনাই ভাল।

এই তো একটু আগে রাস্তায় বিক্ষোভ ও মিছিল দেখে প্যারিস নগরীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে শুরু করেছি, ঠিক সেই সময় ইলেকট্রনিক যুগের বিস্ময়গুলো এমনভাবে ব্যবহার করে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করা কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মঁসিয়ে সেনগুপ্ত এই সময় চা-কফি কী খান?"

ক্যারোলিন চোখ বড়-বড় করে বললো, "চা-কফি কিছুতেই টান নেই, ওঁর মন পড়ে থাকে কাজে এবং কমিউনিকেশনে। লোকের সঙ্গে যোগাযাগ রাখবার জন্যে সারাক্ষণ ছট্‌ফট্ করেন। ওঁর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি হলো ওঁর নিজস্ব টেলিফোন বইটা।"

ক্যারোলিন এবার একটু নিজেকে ফিটফাট করে নেবার জন্যে প্রসাধন বক্স খুলে বসলো। আর আমি মঁসিয়ে সেনগুপ্তর ঘরে বসে আকাশপাতাল ভাবতে শুরু করলাম।

ভাগ্যের মধুর পরিহাসে আচমকা আমি হাওড়া-শিবপুর থেকে এই প্যারিস মহানগরীতে হাজির হায়েছি।

এর আগে দু'দুবার মার্কিন মুলুকে যাবার পথে পারি নগরীতে পদার্পণের সুযোগ এসেছিল। মূল লক্ষ্যস্থানে পৌঁছবার পথে বাড়তি এক-একটি দেশ ঝটিতি দর্শনের এই সুযোগ করে দেন সদাশয় বিমান কোম্পানিরা। তাঁরা এমনভাবে ভ্রমণ তালিকা করেন যে মাঝপথে কোনও একটি দেশে একদিন বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সেই সময়ে যাত্রীর দেখভালের দায়িত্ব অবশ্যই বিমান কোম্পানির। বাড়তি খরচ ছাড়াই মাঝপথে একাধিক দেশদর্শন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অনাথদা আমাকে দু'বারই এই সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসি দেশ দেখার সৎপরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আর এক পরামর্শদাতা জগন্নাথ বলেছিল, "আজেবাজে লেকজার্নি নিয়ে নিজের ভ্রমণভাগ্যটা নষ্ট করবি না। প্রতিবারে এক-একটা দেশ দেখবি। চোখ দুটো হলেও মাথা তো একটা, সুতরাং কত আর মনে রাখতে পারবি? তা ছাড়া প্রতি দেশেই এতো কিছু বোঝবার আছে যে একাধিক দেশে পরের পর গেলে মাথা গোলমাল হতে বাধ্য।"

জগন্নাথ দু-একবার দেশ ভ্রমণ করে এসেছে ব্যবসায়িক সূত্রে। সে আরও বলেছিল, "মাল বেচা এক জিনিস আর কিছু দেখে অথবা শুনে সুখ পাওয়া অন্য

জিনিস। যে দেশের ভাষা জানিস না, সে দেশে গিয়ে কোনও সুখ নেই।”

আমি নিজেও ভাষার এই দূরত্ব সম্পর্কে সজাগ। ইংরেজী যেখানে চালু সেখানে গিয়ে যে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করা যায় তা অন্য কোথাও মেলা ভার। জগন্নাথ বলেছিল, “দুনিয়ায় অন্তত বারোটা দেশ আছে যেখানে ইংরিজী ভাষার রাজকীয় প্রতাপ। সেগুলো দেখতে-দেখতেই তো হেদিয়ে যাবি। তার সঙ্গে যোগ কর বাংলাদেশ— তোর মতো লেখকের হোল লাইফের খোরাক জুটে যাবে। কোন দুঃখে তুই পরের জিভে ঝাল খেতে যাবি?”

কিন্তু কী ছিল বিধাতার মনে, কিছুদিন আগে এক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে সম্বিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ হলো। বিদেশে নয়, আমাদের এই কলকাতা শহরেই ভরদুপুর বেলায় আচমকা সম্বিৎ এসেছিল আমার কাছে। এমন প্রাণবন্ত পুরুষ বাঙালিদের মধ্যেও বিরল। মানুষকে ভালবাসার জালে জড়িয়ে ফেলবার জন্যেই যেন ওর জন্ম। কয়েক মিনিটে সম্বিৎ আমাকে আপন করে নিলো, মনে হলো কত দিন ধরে ওকে চিনি।

সম্বিতের পারিবারিক নিবাস বাংলাদশে। কিন্তু তার জন্ম কাঁচরাপাড়ার কাছে এক জবরদখল রিফিউজি কলোনিতে। কিন্তু আপাতত সে প্যারিস প্রবাসী। সেখানে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোনো কাজকর্মে সে জড়িত আছে এমন এক অস্পষ্ট ধারণা আমার হয়েছিল সম্বিতের প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে গিয়ে।

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে সম্বিতের প্রদর্শনীতে আমি দ্বিতীয়বার যাবার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি এবং সেই সময় লক্ষ্য করেছিলাম তার আপনজনদের প্রতি টান। ইউরোপে কর্মসূত্রে বসবাস মানেই তো সায়েব হয়ে যাওয়া। কিন্তু সম্বিৎ সম্পূর্ণ আলাদা। ওর মন পড়ে রয়েছে দেশের শহিদনগর কলোনির আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেনগুপ্ত পরিবারের স্বজনদের প্রতি তার নাড়ির টান। এঁরা প্রায় কেউই তেমন কেষ্টবিষ্টু নন, বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনসংগ্রামের মেঘ এঁদের জীবনে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু সম্বিৎ এদের জন্য সদাব্যস্ত। যৌথ পরিবারের প্রতি এই অনুরাগ আমাকে অভিভূত করে, কারণ আমি জানি এই সব টান আর থাকবার কথা নয়। বাঙালির জীবনযাত্রা নতুন পথে মোড় নিচ্ছে—সেখানে পুরনো দিনের অনেক আকর্ষণীয় আচরণ অনুপস্থিত থাকবে।

জীবনসংগ্রামে সাফল্য যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে তেমন অনেক সময় মানুষকে কাছেও টেনে আনে। সম্বিৎ যে অবশ্যই দ্বিতীয়টির একটি নিদর্শন তা আমি দূর থেকেই আন্দাজ করতে পারছিলাম।

তারপর একদিন গ্র্যান্ড হোটেলের একটা ঘরে সম্বিতের গল্পটা ভালভাবে শুনেছিলাম। এই গল্পটাই আমি লিখে ফেলেছিলাম, যেভাবে লিখেছিলাম ঠিক

সেইভাবেই এখানে উপস্থাপিত করছি, সম্বিতকে আপনাদের চেনা হয়ে যাবে। লেখাটার নাম দিয়েছিলাম 'প্যারিস বিজয়ী এক বাঙালি'।

'চোখ রাঙিয়ে, বকুনি দিয়ে, মাথায় গাট্টা মেরে বাঙালি জাতকে এখন আর তোলা যাবে না বোধ হয়। বরং ওদের বলুন, তোমরাও অমৃতের সন্তান, একবার তেড়ে-ফুঁড়ে জেগে উঠলে কেউ তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। চোখে স্বপ্ন, মনে ইচ্ছে, ঘটে কিছুটা বুদ্ধি থাকলে এবং গতরে জং না ধরলে এখনও অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা যায়।'

ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের ২৪৮ নম্বর ঘরে বসে যে এই কথাগুলো বলছিল সেই আটত্রিশ বছরের ছোট্টখাট্ট মানুষটির দিকে আমি প্রবল বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। সম্বিৎ যা বললো তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যারা বেপরোয়া সংগ্রামে চালিয়ে যায় তারাই আমার হিরো। এমনই একজন নায়কের সন্ধানে আমি ছুটে এসেছি পাঁচতারা হোটেলে।

ফরাসি দেশ থেকে সম্বিৎ কলকাতায় এসেছিল মাত্র তিন দিনের জন্যে—উদ্দেশ্য ফরাসি এক টিভি প্রতিষ্ঠানকে কলকাতা সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করা এবং কাঁচড়াপাড়া শহিদনগরে রাত্রিবাস করে পুরনো কিছু স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়া। 'ভার সহ্য করতে না পেরে যে-মাতৃভূমি সন্তানকে কোল থেকে নামিয়ে দূরে ঠেলে দেয় ; কিছুদিন পরে দূর থেকে সেই মা আবার টানে, ভীষণভাবে টানে। দেশের প্রতি অনাবাসীর এই আকর্ষণ আপনার সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে,' সম্বিৎ বলছিল নিজের কপালের চুলগুলো সরাতে-সরাতে।

আপাতত বলে রাখা প্রয়োজন, সম্বিৎ-এর খ্যাতি এখন বিশ্বব্যাপী। ফরাসিদের সৌন্দর্যবোধ ভুবনবিদিত। ডিজাইনিং-এর মক্কা বলতে প্যারিস-এর স্বীকৃতি এখন সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। লন্ডন, জুরিখ, নিউ ইয়র্ক, টোকিওর বিশ্বজয়ী শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা নিরন্তর ছুটে আসেন প্যারিসে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন ঘটিয়ে শিল্প সুষমায় ভরা প্যাকেজিং-এর উদ্ভাবনে, উন্নততর ডিজাইনিং-এর সন্ধানে। পৃথিবীর দিকে-দিকে জীবনযাত্রার মান কত উন্নত হচ্ছে, ততই সমাদর হচ্ছে শিল্পসুষমার—এই সৌন্দর্যবোধের জয়যাত্রা শুধু আর্ট গ্যালারিতেই বন্দী থাকছে না, তা ছড়িয়ে পড়ছে কলে-কারখানায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের আবরণীতে। নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের পরশ লেগেছে ভোগ্যপণ্যের ডিপার্টমেন্ট স্টোর্সে। যা কিছু করো তা সুন্দরভাবে করো, এই দর্শন পৃথিবীর সফল দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসনলাভ করেছে। আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রির আইনস্টাইন বিখ্যাত রেমন্ড লুই বেশ কিছুদিন আগেই বিশ্ববিজয়ী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন : সুন্দরকে হাটেবাজারেও সুপ্রতিষ্ঠিত করো ; কারণ

কদর্যতাকে কখনই বিক্রি করা যায় না—'আগলিনেস ক্যান নেভার বি সোল্ড!'

প্যারিসের পাঁচ ছ'টি প্রতিষ্ঠান যে ডিজাইনিং-এর বিশ্বকেন্দ্র তা আমাদের অজ্ঞাত নয়, যা আমাদের অজানা তা হলো, এই ধরনের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার আমাদের এই কলকাতার ছেলে সম্বিৎ সেনগুপ্ত। তার কোম্পানির নাম শাইনিং—গত বছর কাজের পরিমাণ দশ কোটি টাকার ওপরে। এই বছরে শাইনিং-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে লন্ডন, নিউইয়র্ক ও রোমে। দুই মহাদেশে কাজের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে কুড়ি মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ছত্রিশ কোটি টাকা। সম্বিৎ সেনগুপ্তর কাছে যাঁরা ডিজাইনিং পরামর্শ নিতে আসেন তার মধ্যে রয়েছে বাঘা-বাঘা মার্কিন জাপানি, ইতালীয়, সুইস ও ফরাসি কোম্পানি। এ বিষয়ে যথাসময়ে আরও কিছু আলোকপাত করা যাবে। প্রাচুর্যের মধ্যেও কদর্যতা এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও সৌন্দর্য থাকতে পারে কেন, এবং এ-বিষয়ে সম্বিৎ-এর মতামত কী তাও যথাসময়ে জানা যাবে। কিন্তু আপাতত এই অভাগা বাঙালি জীবনে ফিরে আসি।

নানাভাবে শুরু করা যেতে পারে। কলকাতার বিজনেসে আমরা যখন টুকলিফাইং-এ মাস্টার হয়ে উঠছি, দুনিয়ার বিখ্যাত মোড়ক ও নাম আমরা যখন নির্লজ্জের মতন বেমালুম আত্মসাৎ করছি, বিলিতি নাম ও ফরাসি মায়ামোহ সৃষ্টি না করলে আমাদের বিস্কুট, লজেন্স, সাবান, শ্যাম্পু যখন বিক্রি হবে না মনে করছি, তখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিস্কুট কোম্পানি বি এস এন যে ব্র্যান্ড নেম-এ গত মাসে সমস্ত ফ্রান্সে বাজিমাৎ করেছে তার নাম 'মুক্তি'। সামনের মাসেই 'মুক্তি' ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ইউরোপে। বাজারে নামবার সময়ে বি এস এন কোম্পানি সকৃতজ্ঞভাবে নিবেদন করেছে, একটি বাংলা শব্দ থেকে এই বিস্কুটের অনুপ্রেরণা, আর মোড়কে ছাপা হয়েছে বাঙালি সম্বিৎ-এর আঁকা একটি ছবি। 'মুক্তি' এখন লক্ষ-লক্ষ প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। বি এস এন কোম্পানির ডিজাইনিং সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ হচ্ছে সম্বিৎ।

বিশ্ববিখ্যাত বি এস এন কোম্পানি সম্প্রতি ভারতবিখ্যাত এক বিস্কুট কোম্পানির অন্যতম মালিক হয়েছেন। বি এস এন-এর কর্ণধার এন্টনি রিবু সম্প্রতি ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। ভারতীয় কোম্পানির প্রত্যাশা ফরাসি কোম্পানির সংস্পর্শে, মোড়কে, উৎপাদনে, নতুন পণ্য নির্বাচনে নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে। ইউরোপ, আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়া ঘুরে 'মুক্তি' যদি শেষ পর্যন্ত ভায়া বোম্বাই কলকাতায় ফিরে আসে তা হলেও অবাক হবার কিছুই নেই।

সম্বিৎ-এর গল্পটা 'ইচ্ছাপূরণ' বক্স অফিস চলচ্চিত্রকেও হার মানায়। গল্পটা কি বাস্তবধর্মী বলে মনে হবে কারুর? একটি ছেলেকে মনে আনুন যে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো পায়নি। চৈতন্যের উদয় হয়েছিল

কাঁচড়াপাড়া থেকে কয়েক মাইল দূরে এক উদ্বাস্তু কলোনির ছিটেবেড়ার ঘরে। কলোনির নাম শহিদনগর। বাবার কোনও দায়িত্ববোধ নেই সংসারের প্রতি—সারাক্ষণ কম্যুনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করেন। প্রায়ই পুলিশ আসে, জেলে নিয়ে যায়। মা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন কর্মহীন যুবককে, চালাঘরে থাকতে হবে জেনেও। আই-এ পাশের সার্টিফিকেট ছিল। সংসারের হাল ধরবার জন্যে স্থানীয় 'হোগলা' ইস্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি নিয়েছিলেন। মাস্টারি ছাড়াও রয়েছে সংসারের কাজকর্ম। জেলে গিয়ে স্বামীর খোঁজখবর নেওয়া। এসব পাঁচ ও ছয় দশকের কথা। সম্বিৎ-এর জন্ম ১৯৫২ সালে।

সূর্য ওঠার আগে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে দেখে সম্বিৎ-এর ভীষণ কষ্ট হতো। কিছুটা রাগ হতো বাবার ওপর। অন্য সবার বাবার মতন তিনি কেন রোজগার করেন না? রাজনীতি কি না করলেই নয়? মায়ের একমাত্র স্বপ্ন সম্বিৎ একদিন বড় হয়ে মায়ের সব দুঃখ দূর করবে।

এতো কষ্টের মধ্যেও মা বসতেন সম্বিৎকে পড়াতে। কিন্তু সম্বিৎ-এর মন ছবি আঁকার দিকে। অন্য বাঙালি মা হলে ছেলেকে বকাবকি করতেন, কিন্তু এই মা কোনো ব্যাপারেই সন্তানকে নিরুৎসাহ করতেন না।

সম্বিৎ-এর যখন ১৭ বছর বয়স তখন ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মা কাঁচড়াপাড়া থেকে নৈহাটি মিত্তির পাড়ায় চলে এলেন একটা ছোট্ট ইস্কুল স্থাপনের জন্যে যাতে কিছু রোজগার বাড়ে। অনেক কষ্টে এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির সামান্য একটু অংশ ভাড়া পেলেন ওই পরিবারের করুণাবশত।

ছেলেটির জীবনে সেই প্রথম আলো এলো। এর আগে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় পড়াশোনার সৌভাগ্য হয়নি। নৈহাটি থেকে কাঁচড়াপাড়ায় প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে যাওয়া—এবং ওখান থেকেই ইস্কুল ফাইনাল পাশ ১৯৬৮ সালে।

অঙ্কে সম্বিৎ চিরকালই খারাপ। সেই সময় আর্ট স্কুলে পড়ার ইচ্ছা, যা নিম্নবিত্ত পরিবারে তখন প্রায় 'ক্রিমিনাল' বাসনা! সমাজেও অনেক যন্ত্রণা। ইস্কুলের ছেলেরা ব্যঙ্গ করতো, তোর বাবাকে জেলে নিয়ে গিয়েছে। 'রাজবন্দী' ব্যাপারটা তখনও বুঝতাম না—ওটা যে লজ্জা করার ব্যাপার নয় তা জানতে পেরেছিলাম এক পাঁউরুটি ব্রান্ড দেখে যার নাম ছিল 'রাজবন্দী বাটার ব্রেড'।

দোটানায় পড়ে গিয়েছিল সম্বিৎ। মা চাইছেন জীবনে বড় হও, বাবা চাইছেন, দেশপ্রেমী হও। বাবাকে কখনও হিরো মনে হতো, কখনও সমস্ত শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যেত। মনে হতো, দেশপ্রেম নামক ফুর্তির নামে বাবা তাঁর স্ত্রীকে শারিরীক কষ্ট দিচ্ছে, নির্মমভাবে 'নেগলেক্ট' করছে।

এই পরিস্থিতিতে আবার শিল্পী হবার পাগলামো। নিজের গয়না বেচে মা কিন্তু ছেলেকে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে পাঠালেন। মায়ের কিন্ডারগার্টেন ইস্কুল তখন একটু চলমান হয়েছে। বাবাও হোমিওপ্যাথি ডাক্তারিতে মন দিয়েছেন। এই আর্ট কলেজে পড়বার জন্যে মা আমাকে প্রতিমাসে কীভাবে পঞ্চাশ টাকা দিতেন তা আমি জানি না।

সম্বিৎ-এর ঘুরে বেড়ানোর শখ ছিল—মাঝে-মাঝে চন্দননগরে হাজির হতো। ওইখানেই ফরাসি সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের সৃষ্টি। ফরাসি শিল্প সম্পর্কে শ্রদ্ধা বাড়লো আমেরিকান লাইব্রেরির বই ঘেঁটে। সেই সময় আবার নেপোলিয়নের একটা বাংলা জীবনী হাতে এলো। সেটা পড়ে মাথা ঘুরে গেলো—ফরাসি দেশটা দেখার জন্যে মনটা আইঢাই করতে লাগলো। দু'বছর ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে কাটিয়ে অবশেষে গভরমেন্ট আর্ট কলেজে স্থান পাওয়া গেলো। মায়ের খরচ আরও বেড়েছে, তখন ছেলের হস্টেল খরচও দিতে হচ্ছে তাঁকে। এই সময় অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের সঙ্গে একবার ঠোকাঠুকি। বিখ্যাত এক বিদেশী শিল্পীর মৃত্যুতে সম্বিৎ ছাত্রদের পক্ষ থেকে ছুটি চাইতে গেলো। চিন্তামণি বললেন, কারও মৃত্যুতে ইউরোপে ছুটি হয় না। কথাটা মোটেই ভাল লাগলো না—আমরা ঘেরাও করলাম অধ্যক্ষকে। পরে অবশ্য হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি উনি একটুও বাড়িয়ে বলেননি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদু যখন মারা গেলেন তখন আমি প্যারিসের এক ছাপাখানার কর্মী—ছুটি হলো না।'

চিন্তামণিকে অসাধারণ শিক্ষক বলে মনে করে সম্বিৎ। ছবি আঁকার কারিগরি ছাড়াও দর্শন ও জীবনবোধটা মাথায় ঢুকিয়ে দিতেন। একবার সম্বিৎ হঠাৎ চিন্তামণিকে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'স্যার, আমি কি বিদেশে যাবো?' চিন্তামণির উত্তরটি অসাধারণ যা সম্বিৎ আজও মনে রেখেছে। 'আমি যাবার জন্যে জোর করবো না। চান্স পেলে চলে যাবে, তবে ফিরবে না। মনে রেখো কলেজের পরীক্ষায় না বসলেও জীবনে কিছু এসে যায় না।'

১৯৬৯ সাল থেকে আর একটা কারণে সম্বিৎ-এর খরচ বেড়ে গিয়েছিল। তিন বছর ধরে প্রতি মাসে সে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রিস, আমেরিকায় অন্তত কুড়ি টাকার চিঠি লিখতো। মায়ের বাড়তি টাকা খরচ হতো, কিন্তু কোনো সাফল্য আসতো না। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো, একই মাসে তিনখানা ভাল চিঠি তিন জায়গা থেকে এলো—তার মধ্যে একটি ফরাসি দেশে ছবি আঁকা শেখার সুযোগ। অতএব ১৯৭৩ সালে মায়ের হাতের শেষ দুটি সোনার বালা বিক্রি করে বিদেশে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা।

সিনেমার বক্স অফিস সম্পর্কে চিন্তা করলে চিত্রনাট্যে একটু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। আফশোসের কারণ নেই—এতো দুঃখের মধ্যেও একটি সমান্তরাল

প্রেমকাহিনী আছে। বাঙালি পরিবেশে এটি ওপরতলার গৃহস্বামীর মেয়ের সঙ্গে হলেই স্বাভাবিক হয়। এ-ক্ষেত্রেও তাই। নায়িকার নাম কাকলি, সুদর্শনা, সুগায়িকা, সুরুচিসম্পন্না এবং যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। সিনেমা গল্পের মতন ব্যাপারটা গোপনে-গোপনেই এগিয়েছে, প্রেমের প্রকাশটা ছিল ভীষণ চাপা। জড়িয়ে পড়াটা যেন নায়ক-নায়িকার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অমোঘ ভাগ্যচক্রের নির্দেশে!

বেকার অথচ উচ্চাকাঙক্ষী যুবকের অসময়ে বিবাহ! দায়িত্বশীল পরিবারে অকল্পনীয়। সেই সঙ্গে মায়ের দুঃখের স্মৃতি—ঘরের বউকে আমি কিছুতেই কষ্টের কর্মজীবনে পাঠাবো না। সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেও সম্বিৎ মেয়েদের কষ্ট দেখতে পারে না।

স্ট্যান্ডার্ড চিত্রনাট্য অনুযায়ী প্রথমে রেজিস্ট্রি আপিসে বিবাহ। হঠাৎ এক শিল্পী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদহের এক রেজিস্ট্রি আপিসে হাজির হওয়া এবং খাতায়-কলমে বিয়েটা সেরে নেওয়া।

দেশ ছাড়ার আগে মাকে খবরটা দিয়েছিল সম্বিৎ। তিনি খুব কষ্ট পেলেন, কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। সমাজের চোখে দায়িত্বহীন বাউণ্ডুলে, কোথায় মায়ের দুঃখ দূর করবে, না বাড়িওয়ালার মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করা, মায়ের গয়না বেচে খেয়াল খুশি মতন বিদেশে পাড়ি দেওয়া। কাকলি সব মেনে নিলো।

এরপরেই তো বিদেশে শুটিং করার বহু আকাঙিক্ষত সুযোগ! কিন্তু আর্টিস্ট সম্বিৎ সেনগুপ্ত তখন এক ফরাসি ছাপাখানায় সুইপার। নোংরা ঝাঁট দিয়ে এক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখা এবং রাস্তায় গারবেজ গাড়িতে তুলে দিয়ে আসা। খুব কষ্ট লাগতো—তাই জর্জ পম্পিদুর মৃত্যুদিনটা মনে আছে ভালভাবে। ছাপাখানা বন্ধ হলো না—কিন্তু কবরের দিনে ময়লা-গাড়ি আসবে না, তাই নোংরা বোঝা নিয়ে রাস্তায় বেরুতে হলো না।

এই ছাপাখানায় বাড়তি কাজ জুটলো মেশিনের তেলকালি মোছার। এরপরেই লিথোগ্রাফিতে হাতে কলমে শিক্ষা। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণের ব্যাপারে ফরাসিদের খ্যাতি ভুবনবিদিত। তখন সম্বিৎকে ইস্কুল ও ছাপাখানায় দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হতো। মালিক এক্সপ্লয়েট করেছে, কিন্তু কাজও শিখিয়েছে। মাঝে-মাঝে ছাত্র সম্বিৎ-এর আঁকা ছবি বিক্রি করিয়ে দিয়েছে। মালিক জ্যাক গোর্দর ছাপাখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সম্বিৎ-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এখনও অটুট। 'ভদ্রলোক চান্স না দিলে ফরাসি দেশে পা ফেলতে পারতাম না।' সম্বিৎ-এর অভিমত।

ইতিমধ্যে কাকলি প্যারিসে হাজির হয়েছে। মাসিক রোজগার মাত্র ৫০০ ফ্রাঁ,

তার মধ্যে ঘরভাড়া ৩০০ ফ্রাঁ। ২০০ ফ্রাঁতে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। তার ওপর সিনেমার গতিশীলতা বজায় রাখবার জন্যেই যেন কাকলি সন্তানসম্ভবা।

ছেলে হলো—বাড়তি রোজগার দরকার। কিন্তু গোর্দ সায়েবের ছাপাখানা লালবাতি জ্বাললো। কাজ চলে গেলো। আর্ট ইস্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়েছে সবে। সম্বিৎ তখন পেটের দায়ে ছোট্ট একটা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে গিয়ে হামলা করলো। আর্ট ডিরেক্টরকে বললো, 'কিছু কাজ না-দিলে আমি এখান থেকে যাবোই না!' তিন মাসে সকলের হৃদয়ের জয় করলো সম্বিৎ। অমানুষিক পরিশ্রম করে, দীর্ঘ সময় বাড়তি খেটে প্রমাণ করে দিলো সে 'হার্ড ওয়ার্কার'।

কিন্তু এই সময় আবার বিপদ ঘনিয়ে এলো। ফরাসি দেশে বসবাসের অনুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। পুলিশের নির্দেশ : ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাও। একজন অপরিচিতা মহিলার দয়ায় কীভাবে সেই ঘোর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলো, তা প্রায় গল্পের মতন। গ্র্যান্ড হোটেলে আমার সঙ্গে আলোচনার সময় সম্বিৎ বলল, 'যাবার সময় মনে করিয়ে দেবেন, ঘটনাটা বলবো। কথাটা ভাবলে, আমার মুড নষ্ট হয়ে যায়। ভদ্রমহিলাকে খুঁজে বের করবার কত চেষ্টা করলাম।'

তা হলে শেষ পর্যন্ত চমৎকার একটা সিনেমার গল্প পাওয়া যাচ্ছে! যে-নায়ক জবরদখল কলোনির ছিটেবেড়ার বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো পায়নি সে-ই প্যারিসের বিখ্যাত ডিজাইনিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সাফল্যের অধিকারী হয়েছে।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসি ছাপাখানার সুইপার বিজ্ঞাপন এজেন্সির খ্যাতনামা আর্ট ডিরেক্টর হয়েছে, মাসিক মাইনে দ্বিগুণিত হতে-হতে সুখের মুখ দেখলো। এই পর্বে দু-একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতীক চিহ্ন এঁকে সম্বিৎ-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু মাঝে-মাঝে ক্লান্তি আসে। সম্বিৎ-এর মনে হলো, বিজ্ঞাপন এজেন্সির বিজ্ঞাপনচিত্র অঙ্কন করে মন ভরছে না। কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সাদামাটা বিজ্ঞাপনের কাজে হয়তো অর্থ আছে, কিন্তু উত্তেজনা নেই। ১২০০০ ফ্রাঁর চাকরি ছেড়ে এক ডিজাইন কোম্পানিতে চাকরি নিলো অর্ধেক মাইনেতে নতুন কাজ শেখার জন্যে। সেই সঙ্গে চললো বিপণন সংক্রান্ত পড়াশোনা, ইউরোপীয় মিউজিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান। গায়করা কী করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটায় তা সম্বিৎ গভীরভাবে লক্ষ্য করলো নিজের কাজের সুবিধার জন্যে।

সম্বিৎ-এর মনের মধ্যে তখন বিপণন সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্র চলছে কোম্পানির আইডেনটিটি এবং প্রোডাক্ট আইডেনটিটির বিচিত্র অনুসন্ধান। বিখ্যাত কোম্পানির কর্ণধাররা বিশ্বব্যাপী খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই দুর্লভ শিল্পীকে

যে একটা সাবান, সেন্ট বা বিস্কুটের বাক্সকে এমন বিশেষত্ব দেবে—যা প্রোডাক্টের ব্যক্তিত্বকে নিঃশব্দে প্রতিফলিত করবে এবং খরিদ্দারের মন জয় করবে।

ব্যাপারটা আমার মাথায় তেমন ঢুকতে চাইছিল না। সম্বিৎ মনে করিয়ে দিলো, জীবনযাত্রার উন্নয়নের সঙ্গে পশ্চিমী দেশের মানুষ সৌন্দর্যপূজারী হয়ে উঠেছে, ভোগ্যপণ্যেও তারা আর্টের প্রতিফলন চাইছে। কোনও-কোনও অঞ্চলে এটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য—যেমন ফ্রান্স ও জাপান। জাপানে খাবার শুধু ভাল হলে হবে না, তা দৃষ্টিনন্দন হওয়া প্রয়োজন। যেমন জাপানি নুড্‌লের আকার দেখলে মনে হবে পূজার ধূপকাঠি। জাপানিরা খালি হাতে কারও বাড়িতে যায় না। নিমন্ত্রিত হলেই কিছু খাদ্যবস্তু উপহার নিয়ে আসে। সামান্য দামের খাদ্যবস্তুতে তাই দৃষ্টিনন্দন হতে হয়, যাতে এই সব প্যাকেট দিয়ে ঘর সাজালেও ঘরটি অভিনব সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। জাপানিরাও ফ্রান্সে আসে ডিজাইনের পাঠ নিতে। জাপানি দরজি কেনজু এসেছিলেন ফরাসি মড্ ডিজাইন শিখতে। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরলেন না, দোকান করলেন প্যারিসে—ইউরোপিয়ান স্টাইলের মধ্যে জাপানিভাব উঁকি মারছে। সারা পৃথিবীতে ধন্য-ধন্য পড়ে গেলো।

বি এস এন কোম্পানির সর্বেসর্বা রিবু সায়েব সম্প্রতি ভারতবর্ষে বলেছেন, তাঁর খুব ইচ্ছে তাঁদের জগদ্বিখ্যাত 'ডানোনে' ইয়োগার্ট দিল্লিতে চালু করা। ডানোনে সম্বন্ধে মজার কথা শোনা যায় সম্বিৎ-এর কাছে। ইতালির বিখ্যাত দইওয়ালা ছয় ছেলেমেয়ের ইংরিজী আদ্যক্ষর দিয়ে 'ডানোনে' নামটি তৈরি করেছিলেন। এই কোম্পানি পরে বি এস এন কিনে নেয়। দই-পাগল ফরাসিদের জন্যে সর্বশেষ ডানোনে উপহার 'বায়ো' ইয়োগার্ট যা সুখাদ্যকে সুখাদ্য আবার বিশেষ এক ব্যাকটিরিয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ। ফরাসি শরীরের এই বিশেষ প্রবণতার সংবাদটি মনে রেখেই বায়োর সৃষ্টি। এতো দিন পর্যন্ত পশ্চিমের সমস্ত দই প্যাকেটের রঙ ছিল সাদা—সম্বিৎ সেনগুপ্ত সবুজ রঙের আমদানি করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো। সুপার মার্কেটে শত-শত দই প্যাকের মধ্যে 'বায়ো' দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তার বিক্রি আকাশচুম্বী। সবচেয়ে যা আশ্চর্য, কমবয়সী পুরুষ ও রমণীদের মনে দই সম্বন্ধে যে অনীহা ছিল তা ধুয়েমুছে যাচ্ছে—সব বয়সী সায়েব-মেমদের মনে এখন বায়োর সমাদর। প্যারিসের কোনো সংসারে এমন ফ্রিজ নেই যেখানে বায়ো শোভা পাচ্ছে না।

ডিজাইনিং জগতে বায়োর অভূতপূর্ব সাফল্য ইউরোপীয় বিপণনক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে। প্রশ্ন করলাম, "মার্কিন মুলুকের খবর কী?"

মৃদু হেসে সম্বিৎ বললো, "দৃষ্টিনন্দন প্যাকেজিং ডিজাইনে আমেরিকানরা একটু পিছিয়ে আছেন। মোটা-মোটা অক্ষরে নাম ছাপিয়ে দিলেই প্যাকেজিং ডিজাইন হয় না ক্রমশই বুঝতে পারছেন তাঁরা। এবং মার্কেটিং কর্তারা এখন ছুটে

আসছেন প্যারিসে। জাপানিরাও আসছেন বিপুল উদ্যমে। জাপানিরা এখন পারফিউম ব্যবসায় নামতে চাইছেন। বহুমূল্যবান মদিরা ও পারফিউম আধারের ভাস্কর্য সম্বিৎ-এর আর একটি বিশেষত্ব। শিশি দেখে মনে পড়ে যাবে জগদ্বিখ্যাত ভাস্করদের। এই বছরে যে কয়েকটি নামি পারফিউম নতুন আধারে বাজারে নামবে তার অনেকগুলিই সম্বিৎ-এর তৈরি।"

জাপানে এখন নাকি পারফিউমের বেজায় কদর। বারো কোটি লোকের দেশ, কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তম পারফিউম মার্কেট। বিদেশ থেকে প্রাণ খুলে কিছু আমদানি করতে জাপানিদের বোধহয় ধাতে সহ্য হয় না ; তাই দু-একটি বিখ্যাত ফরাসি পারফিউম ব্র্যান্ড যেমন 'কোতি' জাপানিরা কিনে নিয়েছেন। নতুনভাবে বিপণনের কথা ভাবা হচ্ছে।

প্রতীকচিহ্ন বা কর্পোরেট আইডেনটিটি সম্বন্ধে কথা হলো। বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি কম নয় সম্বিৎ-এর। বললো, "এমন কিছু প্রয়োজন যা প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, এমনকি প্রত্যেক দেশের পরিচয়কে অনন্যতা দেয়। এই পরিচয়ন অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি বিদেশের একটা হাইপার মার্কেটের কথা ভেবে দেখুন। অন্তত দশ হাজার স্কোয়ার মিটার জুড়ে প্রায় দেড়লাখ বিভিন্ন ব্র্যান্ড সেখানে নীরবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। চোখের দেখায় হাজার বিশেক লোক প্রতিদিন এর মধ্য থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস নির্বাচন করছে। ফলে এখানে রঙের এবং মোড়কের ছবির বিশেষ গুরুত্ব থেকে যাচ্ছে।"

কোন জিনিসের কী রঙ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রঙ দেখামাত্রই খরিদ্দারের অজান্তেই তার মনের মধ্যে কিছু বাণী পৌঁছে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্যাকেট ও বোতলের আকার। যেমন ধরুন বিখ্যাত কোকাকোলার বোতল ও নামের অলঙ্কার। নামটির আর্টওয়ার্ক করেছিলেন আদি মালিকের অ্যাকাউন্টেন্ট মিস্টার পেসবার্টন। ওঁর হাতের লেখা ভাল ছিল, কিন্তু পরিচয়টা অনন্য করবার জন্যে Coca-Cola-র 'C' অক্ষরই বড় করে দিলেন।

কোকাকোলা কোম্পানির মালিকানা খুব কম দামে ১৯২০-তে হাতবদল হয়। ১৯২৫ থেকে ওঁদের জয়যাত্রা শুরু এবং ১৯৩০ নাগাদ পৃথিবীর ১২৮টা দেশে কোকাকোলা চালু হয়ে যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে নিজেদের পরিচয়কে শক্ত করার জন্যে অন্তত ১৩ রকম বোতল ওঁরা বাজারে ছাড়েন, কোনোটাই বেশিদিন থাকেনি। ১৯৩৫-এ বিখ্যাত ফরাসি ডিজাইনার রেমন্ড লুইকে কোকাকোলা কোম্পানি অনুরোধ করলেন একটা বোতল করে দেবার জন্যে। দীর্ঘকাল কাজ করে রেমন্ড লুই বললেন, "তোমাদের নতুন কোনও ডিজাইন প্রয়োজন নেই, ১৯১৩ সালে যে বোতলটা ডিজাইন হয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষের মনে লাগেনি সেইটাই রেকমেন্ড করছি।" এই বোতলে নারী শরীরের

ইঙ্গিত রয়েছে যা সফ্‌ট ড্রিংকের ধর্মকে অটুট রাখছে। তখন এই বোতল নতুন করে বিশ্ববিজয় করলো। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে লিপিনকট অ্যান্ড মার্গারিস আবার কোকাকোলার ব্রান্ড আইডেনটিটি খতিয়ে দেখলেন এবং বললেন, একটা উজ্জ্বল রঙের সান্নিধ্য প্রয়োজন। লাল রঙ মানুষকে উত্তেজিত করে দেয় ; কিন্তু একা সিংহাসনে বসা যায় না, যদি-না একটা প্রজা থাকে। তাই লালের সঙ্গে এলো সাদা। ঢেউ খেলানো লাল রেখা হলো আনন্দের প্রতীক। এইভাবে তৈরি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে পরিচিত কর্পোরেট আইডেনটিটি।

রঙের রহস্য অপার। পশ্চিম দেশে সবুজ রঙ নাকি দর্শককে মনে করিয়ে দেয় এখানে সেবা পাবেন। নীল হচ্ছে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের ইঙ্গিতবাহক—পৃথিবীর সর্বত্র অফিসের ড্রেস তাই নীল। হাল্কা নীল হচ্ছে একটু কঠোরতা লাঘব।—আমোদপ্রমোদের ইঙ্গিত। টার্কোয়িজ ব্লু নীরবতা ও শান্তির প্রতীক। বিশ্বব্যাপী কালো রঙ ডিপ্লোম্যাসির প্রতীক—উচ্চতম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ছবি যদি টিভিতে দেখেন তা হলে লক্ষ্য করবেন রাষ্ট্রদূতরা সবাই কালো রঙের গাড়ি থেকে নামছেন। লাল আবার মনে করিয়ে দেবার, সাবধান করিয়ে দেবার রঙ। কোন রঙ থেকে কোন বিশেষ বাণী আসে তা এক অপার রহস্য, কোটি-কোটি ডলার খরচ করে ডিজাইনাররা তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতীক চিহ্নের কথা উঠতে সম্বিৎ মনে করিয়ে দিলো, এটা যুদ্ধোত্তর পশ্চিমের বিজ্ঞাপন বিলাসিতা নয়। ইতিহাসের শুরু থেকেই প্রতীকচিহ্নের ইঙ্গিত পাবেন। ধরুন মোহেঞ্জদারো হরপ্পা সিলমোহরের কথা। চলে আসুন পরের যুগে—ইজিপ্ট-এর কথা স্মরণে এলেই আপনার কেন পিরামিডের কথা মনে পড়ে? পৃথিবীর অন্যতম সফল জাতীয় প্রতীকচিহ্ন। তেমনি ভারতবর্ষের তাজমহল—ছবি দেখলেই ইন্ডিয়ার কথা মনে পড়বে। ১৮৮৯ সালে আইফেল টাওয়ার তৈরি হলো—সেই সঙ্গে ফরাসি দেশের প্রতীক। মার্কিনদেশের প্রতীক স্ট্যাচু অব লিবার্টিও ফরাসিদের তৈরি। বিগবেন ঘড়ির ছবি মানেই লন্ডন শহর, কুতব মিনার চিহ্ন মানেই দিল্লি, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং মানেই নিউ ইয়র্ক, গোল্ডেন গেট ব্রিজ মানেই সানফ্রানসিসকো। কলকাতার প্রতীক কখনও মনুমেন্ট, কখনও হাওড়া ব্রিজ।

কোম্পানি অথবা প্রোডাক্ট-এর মতন দেশের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যায়। 'মেড ইন জাপান' কথাটার আগে মানে ছিল সস্তা এবং বাজে। এখন কথাটার কী সম্মান তা পৃথিবীর সবাই জানে। বহু চেষ্টা করে ওই ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। গত কয়েক দশকে নতুনভাবে তৈরি হয়েছে 'মেড ইন ইতালি' ও 'মেড ইন ফ্রান্স' ভাবমূর্তি। গল্প আছে, কাজ করতে-করতে একটা স্ক্রু যদি বেগড়বাই করতে লাগলো তা হলে জার্মান শ্রমিক বলে উঠবে, এটা নিশ্চয় জার্মানিতে তৈরি নয়।

ফরাসি দেশে এই কাণ্ড ঘটলে ফরাসি শ্রমিক বলে উঠবে, ওটা নিশ্চয় ফ্রান্সে তৈরি। সেই নেতিবাচক ভাবমূর্তি এখন আর নেই। ফরাসিরা শিল্পে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে অসাধারণ এগিয়ে গিয়েছে। অনেক বিষয়ে তারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

'মেড ইন ইন্ডিয়া' ভাবমূর্তিটা ফরাসি দেশে কেমন তা জিজ্ঞেস করতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল। সম্বিৎ বললো, "মেড ইন ইন্ডিয়া জিনিসের ইমেজ উজ্জ্বল করবার জন্যে আমাদের একটু সচেষ্ট হতে হবে, সবাই মিলে লেগে পড়লে ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তবে মেড ইন ইন্ডিয়া মানুষদের সম্বন্ধে ফরাসিরা কৌতূহলী। ওদের ধারণা, শ্রেষ্ঠ ভারতীয়রা ভীষণ ফিলজফিক্যাল এবং চিন্তাশীল। এরা স্বল্পে সন্তুষ্ট, সবসময় খুশি এবং অতিথিপরায়ণ। ভারতের শিক্ষিত লোকদের সম্মান তাই যথেষ্ট। মুশকিল হলো খবরের কাগজ—সাংঘাতিক দারিদ্র্যের ভাবমূর্তিটা ভারতবর্ষের ক্ষতি করছে। আর কলকাতা তো ডিজাস্টার সিটি।"

"ভারতীয় ডিজাইনের কিন্তু অপার সম্ভাবনা। পৃথিবীর সেরা ডিজাইনাররা ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। ফরাসি ডিজাইনাররা স্বীকার করেন, শাড়ির মতন ফেমিনিন ড্রেস পৃথিবীতে নেই। পাঁচ মিটার কাপড়কে প্রতিবার না-জড়িয়ে হুট করে শাড়ি পরে ফেলবার একটা পথ যদি বের করা যায় তা হলে শাড়ি বিশ্বজয় করবে। এখন শাড়ি পরতে দশ মিনিট লেগে যায়, এটাকে যে করেই হোক তিন মিনিটে নামিয়ে আনতে হবে। সেই সঙ্গে এমন একটা পরার স্টাইল বের করতে হবে যাতে মোটর সাইকেল চালনায় বা সাংঘাতিক স্পিডে মেট্রোতে ছুটতে অসুবিধা হবে না।"

সম্বিৎ বললো, "জেনে রাখুন আমাদের মেয়েদের সৌন্দর্যবোধ তুলনাহীন। দেখুন, মেমরা সাজগোজ করে ঠোঁটে লিপস্টিক দেবে। ভারতীয় মেয়েরা কপালে টিপ পরবে—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই থাকবে। দেখুন একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট অব বিউটি চাই। যেমন দেবী দুর্গার ত্রিনয়ন। প্রথম নজর পড়ে কপালে, দু'টি ভ্রূর ঠিক মাঝখানে। ওইটাই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ কর্পোরেট আইডেনটিটি। আমাদের মেয়েদের 'সেন্স অব ব্যালান্স' (যাকে সৌন্দর্যের ভারসাম্য বোধ বলতে পারেন) তুলনাহীন। ফরাসি মেয়েরা এখন গহনা পরছে—কিন্তু ফরাসি সুন্দরীর দু'কানে দু'রকম দুল। কখনও স্রেফ এক কানে। অথচ এই মেমসাহেবই কিছুতে দু'পায়ের দু'রকমে জুতো পরবে না। ভারতীয় মেয়েদের নাকের নোলকের দিকে নজর রাখুন—শীঘ্রই যদি এই নোলকে বিশ্বজয় করে তা হলে কিছু বলবার নেই।"

শাড়ির কথায় ফিরে এলো সম্বিৎ। শাড়ির সেক্সুয়াল অ্যাপিল খুবই

আকর্ষণীয়—ওই-যে ব্লাউজের তলায় একটু পেট বেরিয়ে থাকা, ওটা পশ্চিমী দুনিয়াকে একদিন বিমোহিত করবে। ফরাসি রমণী স্তন অনাবৃত রাখবে, কিন্তু মরে গেলেও পেট দেখানো চলবে না। আমরা সুন্দরী রমণী দেখলে বলি, আহা কী সুন্দর মুখ। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সৌন্দর্যচেতনার কেন্দ্রমূলে রয়েছে রমণীর স্তন ও নিতম্ব। নিতম্বের 'কনট্যুর' মোহময় করে তোলবার জন্যে পশ্চিমী পোশাক ডিজাইনারদের যত সাধনা। ওরা সুন্দরী মহিলা দেখলে বলবে, "আহা কী সুন্দর নিতম্ব।"

বিভিন্ন দেশের কর্পোরেট আইডেনটিটির কথা স্বভাবতই উঠলো। সম্বিৎ বললো, "পণ্যের বাজারে রাশিয়ান ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়—কোনও ব্র্যান্ড-ভ্যালু নেই। যেমন ধরুন রাশিয়ান লাডা গাড়ি—খুব মজবুত, ফ্রান্সে এই গাড়ির যা দাম তার থেকে ফরাসি গাড়ি রেনল্টের দাম বেশি। কিন্তু একজন ফরাসি টাকা থাকলে লাডার বদলে রেনল্ট কিনবে। ভারতবর্ষেরও একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিদেশের বাজারে তৈরি করবার সময় এসেছে। 'মেড ইন ইন্ডিয়া' কথাটার যেন একটা বিশেষ সমাদর থাকে। এর জন্যে জাতীয় স্তরে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। রপ্তানি বাজারে জানুয়ারিতে খুব ভাল মাল সাপ্লাই করে ক্রমশ নামতে-নামতে ডিসেম্বর খুব খারাপ মাল সরবরাহ করলে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবেই। তার থেকে মাঝামাঝি স্ট্যান্ডার্ড-এর—যার মান সব মাসে সমান থাকবে তা সারাবছর সরবরাহ করা ভাল। কোয়ালিটির আচমকা উত্থানপতন বিদেশিদের ভাবিয়ে তোলে এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।"

এবার কথা উঠলো চিরদুঃখিনী বাংলার। সম্বিৎ বললো, "বাংলার নতুন কর্পোরেট আইডেনটিটি এখনই গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমরা নিজেদের সীমাহীন শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তেমন সচেতন নই। এই ধরুন পাট। পাটের সঙ্গে পৃথিবীর সেরা ডিজাইনারদের যুক্ত করে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুন এক ফ্যাশান 'ক্রেজ' তৈরি করতে পারি যার থেকে কোটি-কোটি ডলার আসবে। তেমনি আমাদের কুমোর—যাকে আমরা ভাঁড় বলে অবহেলা করি, তাকে একটু শিল্পসম্মত করে আমরা পটারিতে বিশ্ববিজয় করতে পারি। তেমনি ধরুন সিল্ক ; এর অনন্ত সম্ভাবনা। আমাদের সবই আছে, নেই শুধু স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ব্যবসায়িক বুদ্ধি। জাপানিদের একটু ভাল করে দেখুন—সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। জাপানিরা সুপারম্যান নয়—আমাদের মতনই দোষেগুণে মানুষ। ওরা কখনও টেকনলজির দম্ভ করে না—কিন্তু লোকে কী চায় তা খুঁজে বের করে। তারপর যা করে তা নিখুঁতভাবে করে এবং তার সঙ্গে একটু সৌন্দর্যের আবরণ এঁকে দেয়।"

সম্বিৎ বললো, "আমাদের সৌন্দর্যচেতনাও গর্বের। কিন্তু পাকেচক্রে পড়ে

আমাদের ব্যক্তিজীবনের নান্দনিকতা সমাজজীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে না। আমাদের কলকারখানার উৎপাদন কদর্যতায় ভরা—শিল্পের সঙ্গে সুষমার সমন্বয় ঘটানোর কোনও বড় রকম চেষ্টা এখনও হয়নি।”

সম্বিৎ-এর বলার অধিকার আছে। কারণ পশ্চিমের সৌন্দর্যসাধনায় সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার প্রতিষ্ঠিত ‘শাইনিং’ বিশ্বের বাজারে একটা বিশিষ্ট নাম। সম্বিৎ বললো, “গুণের সমাদরে ফরাসিরা কারও পিছনে নয়। পশ্চিমী ভাবনাচিন্তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার মিলনে যদি সুফল পাওয়া যায় তা হলে তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।”

“এই ‘মুক্তি’ বিস্কুটের কথাই ধরুন। এর মোড়কে যে ছবিটা আছে এটি আমি ১৯৭৬ সালে এক স্মরণীয় দিনে এঁকেছিলাম। মনে আছে? আপনাকে বলছিলাম, আচমকা নোটিশ পেলাম দু'দিনের মধ্যে ফরাসি দেশে বসবাসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে, চলে যেতে হবে। সবে যখন জীবনের মেঘ কাটতে শুরু করেছে, সেই সময় স্ত্রী ও নবজাত সন্তান নিয়ে কী বিপদ! সিকিউরিটি পুলিশের আপিসে গিয়ে কাউন্টারে এক পুলিশকে কত বোঝালাম। একটা পথ বাতলে দেবার অনুরোধ করলাম— কোনও ফল হলো না। বললাম, আমার স্ত্রী ও সন্তানের মুখ চেয়ে কিছু করো— পুলিশ অটল। শেষে হতাশ হয়ে যখন বেরিয়ে আসছি, তখন গেটের কাছে দেখলাম পাশের কাউন্টারের মহিলা পুলিশটি নিজের সিট থেকে উঠে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, তোমার আবেদন-নিবেদন আমার কানে আসছিল। তুমি এ-দেশে থেকে যেতে চাও, অথচ পথ খুঁজে পাচ্ছ না। তোমার ছেলে কোথায় জন্মেছে? আমি বললাম, ফ্রান্সেই। মহিলা বললো, তা হলে চিন্তা কোরো না। তোমার আবেদনে এই ব্যাপারটা লিখে ওই পুলিশকে দাও। দেখি ও কেমন করে তোমাকে এই দেশে থেকে তাড়ায়। মহিলার নাম জিজ্ঞেস করলাম, বললো না। উপদেশে কিন্তু অব্যর্থ ফল হলো—আমি নবজাত সন্তানের অধিকারে ফরাসিদেশে থেকে যাবার অধিকার পেলাম। তারপর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কতবার ওই মহিলার কথা ভেবেছি, কত খোঁজ করেছি, কিন্তু দেখা পাইনি। বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েই একটা ছবি এঁকে ফেলেছিলাম—নাম দিয়েছিলাম মুক্তি। সেই ছবিটাই ঘুরে-ফিরে এখন ‘মুক্তি’-র মোড়কে ফিরে এলো। জীবনে যত মোড়কের ডিজাইন করেছি তার মধ্যে এইটাই এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে প্রিয়—এর সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত বন্ধনের ছায়া আছে।”

“দেশে ফিরবার ইচ্ছে আছে?” এই প্রশ্নের উত্তরে সম্বিৎ বললো, “ওই যে মাস্টারমশাই বলেছিলেন, একবার বাইরে গেলে দূর থেকে ভালবাসবে, কিন্তু ফিরবে না।”

দেশের ছেলেদের কাছে সম্বিৎ-এর একটাই বলবার আছে। “যা কিছু করবে

তা খুব ভাল করে করবে। আমি তো ঠোঙাওয়ালা ছাড়া কিছুই নই, কিন্তু দুনিয়ার হাটে ভাল ঠোঙাওয়ালারাও সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।”

আমার লেখা প্রকাশিত হবার পরেও বিদেশে সম্বিতের সাফল্য আরও বেড়েছে। সারা বিশ্বের জগদ্বিখ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বিতের গুণমুগ্ধ। জনগণের মন জয় করার জন্য যখনই কোনও নতুন প্রোডাক্টের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় তখনই মোড়ক ও আধার পরিকল্পনার জন্য ডাক পড়ে সম্বিতের। তাই প্যারিসে সংসারী হলেও সম্বিৎ প্রায় নিত্যযাত্রীর মতন ঘুরে বেড়ায় রোম, জুরিখ, এথেন্স, ব্রাসেলস, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো। সম্বিৎকে দেখা যায় টোকিও এবং ওসাকায়। সম্বিতের শিল্পপ্রতিভায় সৃষ্টি হয় নতুন সব প্রসাধনীর আবরণ, পারফিউমের আধার, জগদ্বিখ্যাত সাবানের মোড়ক, পানীয়ের প্যাকেজিং।

শুধু শিল্পীমন থাকলেই ডিজাইনিং-এর সম্রাট হওয়া যায় না। এর সঙ্গে প্রয়োজন হয় দেশবিদেশের খরিদ্দারের মানসিকতা বুঝবার দুর্লভ দূরদৃষ্টি। বাণিজ্যের সঙ্গে কলাসরস্বতীর সহমর্মিতায় গড়ে ওঠে নতুন সৃষ্টি যা একালের কনজিউমার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

খরিদ্দারের মনোহরণের এই আন্তর্জাতিক সংগ্রামে ফরাসিদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে জগদ্বিখ্যাত কোম্পানিগুলির কোনও রকম দ্বিধা নেই ; তাই ডিজাইনিং-এর বিশ্বকেন্দ্র হয়ে উঠেছে প্যারিস।

সম্বিতের প্রতিষ্ঠিত শাইনিং কোম্পানির সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ইংলন্ডে, স্পেনে এবং আমেরিকায়। এই কোম্পানিতে দেশবিদেশের কৃতবিদ্য পুরুষ ও মহিলারা কাজ করেন। এঁদের কারও বিশেষত্ব গ্রাফিক আর্টসে, কারও খোদাইয়ের কাজে, কারও অত্যাধুনিক বিপণনবিজ্ঞানে, কারও বা মনস্তত্ত্বে। একা শিল্পীর পক্ষে কনজিউমারের সতত পরিবর্তনশীল মানসিকতার খবরাখবর রাখা সম্ভব নয়, তাই গড়ে উঠেছে টিমওয়ার্ক। যেখানে শিল্প, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব এবং প্রযুক্তিবিদ্যা একত্রে সন্ধান করছে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করার রহস্যকে।

ডিজাইনিং-এর এই ধরনের কাজকর্ম এখনও আমাদের দেশে শুরু হয়নি। যদিও সম্বিতের মতে এ বিষয়েও যুগযুগান্ত ধরে ধারাবাহিকতা রয়েছে ভারতবর্ষের। বিদেশের বিখ্যাত কোম্পানিরা এদেশে সাগরপারের ডিজাইনিং আমদানি করে কাজ সারছেন। স্থানীয় ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠান স্বদেশের বিশেষত্বকে সন্ধান না করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের বাজারে রয়েছে ডিজাইনিং-এর বিশৃঙ্খলা, যেমন একদিন ছিল আমেরিকায়। তারপর একদিন আমেরিকায় হাজির হলেন এক ফরাসি শিল্পী, পকেটে তাঁর মাত্র কয়েকটা ডলার। নিউ ইয়র্কের একটা সস্তা অ্যাপার্টমেন্ট-ঘরে বসে সেই ভদ্রলোক দ্বিতীয়

এক ফরাসি বিপ্লবের সূচনা করলেন, যার নাম ডিজাইনিং বিপ্লব এবং যার প্রভাব পড়েছে সমস্ত দুনিয়ায়। সেই ফরাসির নাম রেমন্ড লুই।

এর কথায় যথাসময়ে আসা যাবে। মোড়কের মাধ্যমেও যে বিশ্ববিজয় সম্ভব তা কেমন করে এই বিংশ শতাব্দীতে প্রমাণিত হলো তা জেনে রাখা মন্দ নয়। তবে একা আমেরিকানের পক্ষে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা সম্ভব ছিল না, এর জন্যে প্রয়োজন ছিল ফরাসি শিল্পবোধের, ফরাসি সৌন্দর্যচেতনার। আমার এক বন্ধু রসিকতা করেছিলেন, ফরাসি হলো শশার মতন। শশা সব কিছু হজম করিয়ে দেয় কিন্তু হজম হয় না। ফরাসি সব কিছু পাল্টে দেয়, কিন্তু নিজে পাল্টায় না।

সম্বিৎ এখন সব অর্থেই সফল। সে এখন বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী, প্রখ্যাত এক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। সেখানে পঞ্চাশের অধিক কর্মী। কিন্তু সম্বিতের মন পড়ে আছে স্বদেশের মাটিতে। জন্মভূমির সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকার যে ব্যাকুলতা ওর মধ্যে দেখেছি তা আমাকে অভিভূত করেছিল। জন্মভূমির কোনও দোষ খুঁজে পায় না সম্বিৎ। অস্বাভাবিক দারিদ্র্যই আমাদের দুর্বল ও পঙ্গু করে রেখেছে বলে সম্বিতের বিশ্বাস। এই দারিদ্র্য কিছুটা দূর হলেই বাঙালি মনের দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে বাঙালি এবং তার সহজাত প্রতিভা, যা বহু অর্থেই তুলনাহীন, তা আবার বিকশিত হয়ে উঠবে।

সম্বিতের এই আশাবাদী মন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পশ্চিমী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পরেও সম্বিতের নিশ্চিত ধারণা বাঙালির সৃজনীশক্তি একদিন বিশ্ববিজয় করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। বাঙালির সাহিত্য, বাঙালির সঙ্গীত, বাঙালির চিত্রকলা একদিন কেন যে জগৎসভায় স্বীকৃতি লাভ করবে না তা সে বুঝতে পারে না।

সম্বিতের এই সব কথা মিটিং কা বুলি না। সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ভারতবর্ষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা বিশ্বের মনোহরণের যোগ্য, শুধু প্রয়োজন তার যথাযোগ্য বিপণনের। বর্তমান বিশ্ব কোনও কিছুকেই আপনা-আপনি গ্রহণ করে না, প্রয়োজন হয় প্রচেষ্টার। এমনকি ভগবান যিশুর বাণীকে গ্রহণ করানোর জন্য প্রচারে নামতে হয়। কলিকালে প্রাচরই ধর্ম, কীর্তনই স্বাভাবিক। মার্কেটিং-এর প্রচেষ্টা ছাড়া স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁর দীপ্তি হারিয়ে ফেলতে পারেন।

সম্বিৎ আরও বলেছিল, পশ্চিমী জগতে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা আছে। আজ যে রাজা, প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর স্রোতে ভেসে গিয়ে সে কাল ফকির হতে পারে। কিন্তু গুণের সমাদর করতে, নতুন ভাবনা-চিন্তাকে স্বাগত জানাতে পশ্চিমী দুনিয়া আজও তুলনাহীন।"

জীবনে সাফল্য লাভ করলে মানুষ কিছু বিলাসিতার আশ্রয় নেয়। সম্বিতের বিলাসিতা ওদেশের সঙ্গীত, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখা। আরও একটি বিলাসিতা আছে তার আন্তর্জাতিক টেলিফোনের মাধ্যমে দেশের মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলা।

এই টেলিফোনযন্ত্রটি মানব ইতিহাসে যে ছবি এনে দিয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা আজও সম্পূর্ণ অবহিত হইনি। দূরত্ব মুছে গিয়েছে মানুষের মন থেকে। প্রবাসের যন্ত্রণা প্রশমিত হয়েছে অনেকটা। অসাধ্য সাধন করেছে, এই দূরভাষ-যন্ত্র। পশ্চিমের অনাবাসী ভারতীয় এই যন্ত্রের সম্যক সদ্ব্যবহার করে, যদিও তার জন্য অর্থব্যয় হয়। ইংলন্ডের এক কৃতী বাঙালি বৈজ্ঞানিকের কথা জানি যিনি প্রতিদিন সকালে সল্টলেকে তাঁর মাকে ফোন করতেন। (সম্প্রতি তিনি মাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন।) মায়ের ভীষণ দুঃখ ছেলেকে দূরদেশে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনা অনেকটা কমে গিয়েছে এই টেলিফোনের মাধ্যমে। তিনি প্রতিদিন জানতে পারেন ছেলে রাত্রে কী দিয়ে ভাত খেয়েছে, নাতির শরীর কেমন, ছেলে কোথায় ট্যুরে যাচ্ছে, বউমা কী নতুন জামাকাপড় কিনলেন, ছোট নাতনি সকালে কী দুষ্টুমি করেছে। ওপারের কৃতী ছেলে জানতে পারেন কলকাতায় ঠাণ্ডা কেমন, বৃষ্টি হলো কিনা, কতক্ষণ রাত্রে লোডশেডিং ছিল, আলুর দর কত, পটল উঠেছে কিনা, ট্যাংরা মাছ পাওয়া যাচ্ছে কি না, বাড়ির কাজের মেয়েটি কাল উপস্থিত ছিল কি না।

সম্বিৎ আরও একটু এগিয়ে গিয়েছে। মা-বাবা ছাড়াও সে যাদের পছন্দ করে, ভালবাসে তাদেরও মাঝে-মাঝে ফোন করে। এই সব কল আসে এখানকার রাত সাড়ে দশটা এগারোটায়। সম্বিত তখনও প্যারিসের শাইনিং অফিসে কাজ করছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি ভুলবার জন্যে সে দেশে ফোন করে। আন্তর্জাতিক টেলিফোন প্রতিমিনিটে মিটার ওঠে—ভারতীয় হিসেবে খরচ অনেক। তাই বেশি কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, সারাক্ষণ মন খচখচ করে, বিল বাড়ছে। আমার কথাবার্তায় ব্যস্ততা প্রকাশিত হয়। ইচ্ছে হয় ওকে বলি টেলিফোনটা শুধু জরুরি কাজের জন্যে সুতরাং চটপটে সেরে নিচ্ছি।

পৃথিবীর আরেক প্রান্তে বসে সম্বিৎ সব বুঝতে পারে, হাজার হোক

শহিদনগরের স্মৃতি তো মন থেকে মুছে যায়নি। সম্বিৎ অনুরোধ করে, দাদা আমার তো এইটুকু বিলাসিতা। পেটের দায়ে জন্মস্থান থেকে কত দূরে পড়ে রয়েছি। ভগবান এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি উপহার দিয়েছেন। প্রিয়জনদের গলার স্বর শুনবার জন্যে আমার মন আনচান করে। ইচ্ছে করে কাজকর্ম শেষ করে প্রতি সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় ফিরে যাই প্রিয়জনদের মাঝে কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এখনও তার ব্যবস্থা করেনি। তাই টেলিফোনে একটু কথা বলা। আমার হাতের গোড়াতেই আমার প্রিয়জনরা রয়েছেন ভাবলে খুব ভরসা পাই, দাদা।

সম্বিৎ এদেশের মানুষের অবস্থা জানে। তাই কখনও প্রত্যাশা করে না তাঁরা পাল্টা ফোন করবেন। তাই নিজেই ফোন করার দায়িত্বটা নেয়। এবং সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে এদিক থেকে কোনও উদ্বেগের চিহ্ন থাকলে সবিনয়ে জানায় প্রবাসের নির্বাসন যন্ত্রটা দূর করার এই সুযোগ থেকে আমরা যেন তাকে বঞ্চিত না করি। আমি আপত্তি করি না, যদিও সম্বিতের মধ্যে উদ্বেগ থাকে বেশি রাত্রে এই ফোন-কলে আমি বিরক্ত হই কি না।

সেবার রাত এগারোটায় এমন ফোন বাজলো। প্রথমে বিপ বিপ আওয়াজ। আমি আন্দাজ করতে পারি ওদিকে হয় আমেরিকা, কানাডা, ইংলন্ড অথবা ফ্রান্স। অচিরেই সম্বিতের স্বর ভেসে আসে। বিজ্ঞান সত্যিই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। জন গ্রাহাম বেল যুগ যুগ জিও। সমগ্র মানবসমাজের চিরপ্রণম্য তুমি।

অন্য এক মহাদেশ থেকে সম্বিৎ জানালো, "আজ মাথায় একটা বদ খেয়াল চাপলো। কথায় বলে—উঠলো বাই তো কটক যাই। সেই অনুযায়ী একটা কাজ করে ফেলেছি। কুরিয়ার মাধ্যমে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছি। আপনি বোধহয় কালই জানতে পারবেন। আর কিছু এখন বলবো না, আগামী কাল রাত্রে আবার কথা হবে।"

নাটক নভেল লিখলে সম্বিৎ খারাপ করতো না। কারণ সাসপেন্স তৈরি করতে সে রীতিমত দক্ষ।

পরের দিন কুরিয়ার হাজির। এই কুরিয়ার সংস্থাগুলিও ইদানিং কালের এক বিস্ময়। সমস্ত দুনিয়াকে এরা এক সূত্রে গেঁথে ফেলেছে। যেখানে ইচ্ছে এদের মাধ্যমে চিঠিপত্র, প্যাকেট পাঠানো যায়। পোস্টাপিসের মর্জির ওপর নির্ভর করে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয় না। দুনিয়ার সর্বত্র দূত পাঠাবার যে-অধিকার বিগতযুগে সসাগরা সাম্রাজ্যের সম্রাটরা উপভোগ করতেন তা এখন সাধারণ মানুষেরও আয়ত্তে এসেছে এই কুরিয়ার কোম্পানিগুলির মাধ্যমে। বিশ্বের মানচিত্র খুলে সেখানে দূত পাঠাবার ইচ্ছে তা ঠিক করুন এবং কুরিয়ার কোম্পানিকে সেই দায়িত্ব দিন। অবিশ্বাস্য নিপুণতায় এঁরা এই কাজ সম্পন্ন করবেন অথচ খরচটা রাজকীয় হবে না।

প্যারিসের কুরিয়ার আমাকে যে মোড়কটি উপহার দিলো তা খুলে আমি তাজ্জব। তার মধ্যে একটি এরোপ্লেনের টিকিট, কলকাতা থেকে প্যারিস এবং প্যারিস থেকে কলকাতা। এবং সেই সঙ্গে একটা অঙ্গিকারপত্র—যার ইংরিজী নাম স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট।

প্যারিস প্রবাসী সম্বিৎ সেনগুপ্ত আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ফরাসি দেশে এবং অতিথির সব আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই চিঠির জোরে ফরাসি দেশে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া নাকি খুবই সহজ হবে।

এখানেই শেষ নয়। ফরাসি দূতাবাস থেকে খবর এলো মঁসিয়ে সেনগুপ্ত টেলেক্স মাধ্যমে ওখানেও খবর পাঠিয়েছেন এবং আমার পরিচয় দিয়েছেন। ফরাসি বুরোক্রাটের যত দোষই থাক শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সম্পর্কে তার মনে এখনও বিশিষ্ট ধারণা আছে, সেখানে একটু বাড়তি সৌজন্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

আচমকা এই প্যাকেট পেয়ে আমি দিশাহারা হয়ে উঠলাম। সারাজীবনে এই রকম অবস্থায় কখনও পড়িনি। সম্বিতের পাঠানো প্যারিসের প্যাকেটখানা নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

কোথাও যাবার আগে পত্রালাপ হয়, কথাবার্তা হয় নানা সন্দেহের প্রশমন হয়, তারপর দু'পক্ষ সম্মত হন, দিনক্ষণ দেখা হয়, তারপর টিকিট আসে, বিদেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র ভিক্ষা চাইতে হয়। লাখ কথার কমে যেমন বিয়ে হয় না তেমন বিদেশ পরিভ্রমণও হয় না।

এর আগে দু'বার মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছি। কোনওরকম তদ্বির না-করেই হঠাৎ এই নিমন্ত্রণপত্র হাজির হয়েছে বাড়িতে। প্রথম চিঠি এসেছিল ১৯৬৭ সালে। সে কী উত্তেজনা—জীবনে প্রথম বিদেশ দেখার অপ্রত্যাশিত সুযোগ। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবল দুশ্চিন্তা। আমার মা তখনও বেঁচে রয়েছেন। তাঁর নির্দেশ, যাঁরা অতিথেয়তা গ্রহণ করবে, তাঁর কাছে প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। যে-নিমন্ত্রণ প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে লজ্জা অথবা দ্বিধা আছে, তা গ্রহণ করা উচিত নয়, যতই তা আকর্ষণীয় হোক।

মনে আছে, সাতষট্টির সেই সময় মার্কিন দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নানা সন্দেহ। বিশেষ করে হাওড়ার যে-অঞ্চলে থাকি সেখানে সি-আই-এর দালাল থেকে ঘৃণ্য কোনও গালাগালি হয় না। এই নিয়ে দেওয়ালে-দেওয়ালে কালো কালিতে লিখন। সংবাদপত্র জগতে আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি বললেন, ডজন-ডজন নেমন্তন্ন আসে এই রকম। কত লোক টুক করে চলে যাচ্ছেন কাউকে কিছু না-বলে। ফিরে এসে তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী ভাবমূর্তি মোটেই বদলাচ্ছেন না। কয়েকজনের নাম করলেন আমার বন্ধু। প্রকাশ্যে মার্কিন পুঁজিবাদের মুণ্ডুপাত করছেন অথচ মার্কিনি ফাউন্ডেশন অথবা সরকারের

পয়সায় বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন, এই সব লেখায় সমালোচনা আছে, কিন্তু কোথাও স্বীকৃতি নেই কার অর্থানুকূল্যে সেই ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু আমার মাতৃআদেশ অন্য রকম। প্রথমেই প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতে হবে কে তোমাকে পাথেয় জুগিয়েছে, কারা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম আমার মায়ের কাছে অকল্পনীয়—বনগ্রামের কাছে নকফুল নামক এক অখ্যাত গ্রাম থেকে এই মূল্যবোধ নিয়ে আমার মা একদিন কলকাতা শহরে এসেছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করার সুযোগও তাঁর আসেনি, কিন্তু কিছু বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল অনড়। আর আমি তো সব ব্যাপারেই মাতৃ-মুখাপেক্ষী—দুনিয়ার লোকের হাততালি আমার কাছে নিরর্থক যদি মায়ের কাছে আমি কোনওভাবে ছোট হয়ে যাই।

এই অবস্থায় ইউ-এস-আই-এস এক সায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হাল্কা করে দিয়েছিলেন। "এই নিমন্ত্রণের পিছনে কোনও প্রত্যাশা নেই, কোনও অদৃশ্য সুতোও নেই যার সাহায্যে আপনাকে টানা যেতে পারে। খোলামেলা দেশ আমেরিকা, আপনি নিজের খুশি মতন ঘুরে বেড়ান, যা কিছু ইচ্ছে দেখুন। নিন্দে করবেন, না প্রশংসা করবেন তা আপনার ইচ্ছে।" ভদ্রলোক আরও বলেছিলেন, "আপনাকে কিছু লিখতে হবে এমন কোনও প্রত্যাশাও নেই। কতজন তো আমাদের দেশে যাচ্ছেন প্রতি বছরে, তাঁদের অনেকেরই সোনার কলম আছে, কিন্তু ক'খানা প্রবন্ধ বা বই বেরুচ্ছে? ও-বিষয়ে সায়েবরা 'কিছুই না-চাইতে' অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।"

এই সব দ্বিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত প্যান আমেরিকান প্লেনের টিকিট কাটাতে প্রায় এক বছর লেগে গিয়েছিল। আর ক'দিন দেরি হলেই, যাওয়া অসম্ভব হতো, কারণ যে সরকারি বাজেটে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা তার মেয়াদ শেষ হতে মাত্র কয়েক দিন অবশিষ্ট ছিল।

আরও একবার বিদেশ গিয়েছিলাম ক্লিভল্যান্ডের বেঙ্গল আসোসিয়েশনের নিমন্ত্রণে। সেবার কর্মকর্তারা এখানকার এক বন্ধুর মাধ্যমে আগাম খবর দিয়ে মার্কিন দেশ থেকে ফোন করেছিলেন। সে এক বিচিত্র ফোন ব্যবস্থা। একাধিক লোক মহাসমুদ্রের ওপার থেকে একই সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। পরে শুনেছিলাম, এর নাম কনফারেন্স লাইন—খরিদ্দারের সুবিধার জন্যে পশ্চিম দেশের টেলিফোন কোম্পানি যে কোনও অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে রাজি আছেন, যা এদেশে এখনও অকল্পনীয়।

বিদেশে বহুজনের সঙ্গে একত্রে কথা কইবার পর চিঠি এলো এবং তারপর টিকিটের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু এবার বিনা মেঘে বৃষ্টি। কোনও আগাম হুঁশিয়ারি নেই, প্রথমেই হাতের গোড়ায় টিকিট।

অথচ মিছরিদার কথা তো এই লেখার গোড়াতেই বলেছি। বিদেশে যেতে হলে আমার উদ্বেগ কীরকম বাড়ে, মন কেমন অশান্ত হয়ে ওঠে, তা আমার ভ্রমণসঙ্গী মিছরিদার অজানা নয়। তার ওপর মিছরিদা জানেন, বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশ ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা এক জিনিস নয়। প্রথমটিতে বহুজনে আনন্দ পায়, না হলে টুরিজিম ইনডাসট্রি এইভাবে বেড়ে উঠতো না। দ্বিতীয়টিতে কেবলই উদ্বেগ এবং উত্তেজনা, পাঠকের সামনে পরীক্ষায় বসতে হবে স্মরণে থাকলে কোন মানুষের মনে সুখ থাকে? মিছরিদা, এও শুনেছেন, শেষবারে আমি নায়াগ্রা প্রপাতে পিকনিকের সুযোগ গ্রহণ না-করে সেই সময়ে টরন্টোয় একজন অভিনব ভারতীয়কে দেখতে গিয়েছিলাম।

খুশি হননি মিছরিদা। বলেছিলেন, "নিষ্ঠার নাম করে তুই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিস—তোর কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে। দুনিয়ার কোথাও গিয়ে তুই সুখ পাবি না, সারাক্ষণ তুই নোটবই খুলে পয়েন্ট লিখে নিতে ব্যস্ত থাকবি। আর বাঙালির পোড়া কপাল বটে। তোদের মতন লোকের জিভে ঝাল খেয়ে তাঁদের দেশভ্রমণের আনন্দ মেটাতে হয়।"

এরপর মিছরিদা যে আমার হস্তরেখা বিচার করেছিলেন তাও বলছি। বিদেশ ভ্রমণের রেখাগুলো হাত থেকে শেষ পর্যন্ত মুছে গিয়েছে জেনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আমাকে আর জেট এরোপ্লেনের সরু সিটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে পায়ে ঝিন-ঝিন ধরাতে হবে না, আমাকে বুকপকেট চেপে ধরে আধঘণ্টা অন্তর দেখতে হবে না, পাশপোর্ট ও রিটার্ন টিকিট যথাস্থানে আছে কি না। বিদেশে পাশপোর্ট হারানোর চেয়ে দুর্ভাগ্য যে আর কিছুই নেই, তা মিছরিদাই আমাকে পইপই করে শিখিয়েছেন। দুনিয়ার সায়েবরাও এই ব্যাপারে চালাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর পকেটে রেস্ত রেখে পকেটমারের কাজকর্মে সহযোগিতা করেন না। এখন তাঁরা টিপিক্যাল বোস্টমের মতন গলায় একটা থলে ঝুলিয়েছেন—সেখানে মালার বদলে পাশপোর্ট, টিকিট, ট্রাভলার্স চেক এবং কাঁচা পয়সা! আমি মরে গেলেও ওরকম বোস্টম হতে পারবো না। এবং কৃষ্ণের ইচ্ছায় তার প্রয়োজনও হবে না, কারণ মিছরিদা নিজেই জানিয়েছেন, বিদেশযাত্রার দাগগুলো সব মুছে গিয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিমান টিকিটের প্রহসন কেন? ঈশ্বর কি আমাকে একটু খেলিয়ে দেখতে চান? আমার মা যাকে বলতেন ; কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কী?

কিন্তু অনেক রাতে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। এখানে মধ্যরাত হলেও প্যারিসে তখন সন্ধে। প্যারিস অন্য কোনও ব্যাপার না-হলেও অন্তত ঘড়িতে সারাক্ষণ কলকাতা থেকে পিছিয়ে থাকে।

বিঁপ বিঁপ ফরাসি বিদেশসঞ্চার নিগমের এই রহস্যময় শব্দটা আমার অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

সম্বিতের স্বর : হ্যালো, কলকাতা। ঠোঙাওয়ালা স্পিকিং।

আমার উত্তর : হ্যালো শহিদনগর! কেমন আছো? ফরাসি বিপ্লবে আমাদের আর আগ্রহ নেই ; আমরা এখন ফরাসি পারফিউমে মাতোয়ারা হতে চাই।

সুরসিক সম্বিৎ সেনগুপ্তর উত্তর : ফরাসিরা তাদের বিপ্লব এক্সপোর্ট করতে পারেনি, প্যাকেজিং-এর নজর দেয়নি বলে। কিন্তু পারফিউম ও ওয়াইন-এর ব্যাপারে সে ভুল করেনি, তাই ও দুটো দুনিয়ার মনোহরণ করেছে, শংকরদা।

"শোনা, সম্বিৎ, তোমার পাঠানো মোড়ক খুলে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছি।"

সম্বিৎ শুধু শিল্পী নয়, সে ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রবিশারদও বটে। দুনিয়ার বিজনেস ইস্কুল থেকে তার নেমন্তন্ন আসে বিপণনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সম্বিৎ বললো, "শুনুন দাদা, টেলিফোনে বললে বা চিঠিতে নেমন্তন্ন করলে আপনি হয়তো বুঝতেন না, আমি কতখানি সিরিয়াস। তাই আগে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে পরে নেমন্তন্ন করছি। আজ জানতে চাই, আপনি কবে প্যারিসে নামছেন। এই অধম এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবে।"

আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। "টেলিফোনেই তোমার হাত ধরছি ভাই, আমাকে আর প্রলোভনে ফেলো না। আমার হাতের সব বিদেশযাত্রার দাগ লাইফবয় সাবানে মুছে ফেলে আমি এখন শান্তিতে রয়েছি। পাসপোর্টের ভার আমি সহ্য করতে পারি না।"

মোক্ষম লোভ দেখালো সম্বিৎ। "এখানে লেখার যে-সব জিনিস আপনি পাবেন। আপনার হয়ে ভাবতে গিয়ে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

লেখার জিনিসের সন্ধান পেলেই লেখকের অবস্থা পেটুক ব্রাহ্মণের মতন হয়ে ওঠে। শুকনো জিভ হঠাৎ সজল হয়ে ওঠে। আমার এক কাকিমা, সুখাদ্য সাজিয়ে, মজা করার জন্যে বলতেন, মেঝেতে জোরে ফুঁ দাও। দেখি কার কার পেটে খিদে মুখে লাজ। এই মুহূর্তে আমার অবস্থা অবশ্য উল্টো। আমার জিভে জল, কিন্তু পেটে আলসার। লেখার লোভে দেশ ছাড়া হয়ে তারপর গতরে সহ্য হয় না। মনটা উড়ু উড়ু করে, কিন্তু শরীরটা ঘরকুনো। কোনও প্রলোভনই তার কাছে প্রচণ্ড নয়।

আমি বললাম, "সম্বিৎ বিশ্বাস করা যায় না, এযুগে এমন হতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় নয়। তুমি বিদেশে অনেক কষ্ট করেছো তখন আমরা কেউ তোমার জন্যে কুটোটি নাড়িনি। আর এখন তুমি আমাকে সুযোগ দেবার জন্যে নিজের খরচে টিকিট পাঠাচ্ছো।"

খুব লজ্জা পেলো সম্বিৎ। "বিদেশে য়ার কুটো তাকেই নাড়তে হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার একবার ফরাসি দেশ দেখে যাওয়া উচিত।"

আমি মাথা চুলকোলাম। "সম্বিৎ, বাজার ভাল নয়। ফরাসি দেশ দেখতে হলে যে মেজাজ প্রয়োজন তা আমার নেই। আমি হালে পানি পাবো না, সম্বিৎ।"

"এ এক অদ্ভুত দেশ, শংকরদা। যে-চোখে দেখবেন সেরকম প্রতিফলন পাবেন। এ-দেশের বৈচিত্র্য আপনাকে অবাক করে দেবে!"

"সম্বিৎ, আমাকে লোভ দেখিও না। সেই আদ্যিকাল থেকে ইংরেজের পরেই যদি কোনও জাতকে বাঙালি খাতির করে থাকে সে হলো ফরাসি। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ সবাই ফরাসি বলতে 'ইগনোরান্ট'! সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তো জাতটাকে বুঝবার জন্যে হাজার কাজের মধ্যে হুট করে ফরাসি শিখে ফেললেন। ঝটপট চিঠি লিখতেন ফরাসি ভাষায় বিশ শতকের শুরুতে।"

"আসুন আপনি ফরাসি দেশে। যে-রাস্তায় বিবেকানন্দ থাকতেন সে-রাস্তায় আপনাকে নিয়ে যাবো। আপনি তো শিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের জায়গাটা দেখে এসেছেন। এবার ওটাও দেখুন।"

আমি তবুও নরম হচ্ছি না। আসলে ভয় ভাঙছে না আমার। বিবেকানন্দ যে-বাড়িটাতে থাকতেন সেটি ১৯০০ সালেই নড়বড়ে ছিল। পাঁচতলায় আশ্রয় পেয়েছিলেন এক গেরস্ত ফরাসি লেখকের নিমন্ত্রণে, কিন্তু সেখানে লিফট ছিল না। অসুস্থ শরীর নিয়েই ভদ্রলোককে ওই পাঁচতলা সিঁড়ি ভাঙতে হতো। যদি সে-বাড়ি এখনও টিকে থাকে এবং যদি আমার সাধ হয়, সম্বিৎকে অনুরোধ করতে পারি এবং সে নিশ্চয়ই এক-আধটা ছবি তুলে আমাকে পাঠাবে। ওঁর অন্য একটা ঠিকানা সেই ছাত্রাবস্থা থেকে আমার মুখস্থ : ৬ নম্বর প্লেস দ্য এতাত ইউনি। ফরাসি জিহ্বায় ঠিকানাটা কেমনভাবে উচ্চারিত হয় তা অবশ্য ভগবানই জানেন।

এই ঠিকানা সম্বন্ধে এখনই কোনও কথা বলছি না। কারণ, মুহূর্তে মুহূর্তে সিমুলিয়া গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধিৎসা অনেকের রসিকতার কারণ হয়ে ওঠে। হয়তো সমস্ত ইস্কুল-জীবনটা বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত হবার ফলেই আমার এই দোষ। যদিও আমি বলি, উনি আমার পাড়ার লোক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দ। বার্মামুলুক থেকে ফিরে কলকাতায় বসতি না করে অপরাজেয় কথাশিল্পী বাসা নিয়েছিলেন বাজে-শিবপুরে। আর এখন থেকে একশো বছর আগে ইচ্ছে করলেই দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি, কোথাও জমি কিনতে পারতেন বিবেকানন্দ, কিন্তু তিনি পছন্দ করে মঠ স্থাপন করলেন হাওড়া, বেলুড়ে।

সম্বিতের সাগরপারের টেলিফোন বিল বাড়ছে। কিন্তু সে কথা বলেই

চলেছে। আমি আরও মাথা ঘামালাম। তারপর সভয়ে বললাম, "দ্যাখো সম্বিৎ, বাংলা সংস্কৃতির রুই-কাতলারা সবাই ফরাসি দেশে গিয়েছেন এবং অনেক কিছু লিখে ফেলেছেন। সুনীতি চাটুজ্যে, অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে শুরু করে একালের সতীনাথ ভাদুড়ি পর্যন্ত। আর্টিস্টদের তো কথাই নেই—কলকাতার প্রায় সব শিল্পী প্যারিসের নাড়িনক্ষত্র জেনে বসে আছেন। ওখানে নাক গলালে আমার নাকটাই খোয়া যাবে। দাঁত এক আধটা গেলে ক্ষতি নেই, কানও দুটো আছে, একটা কাটা গেলে সামলে নেওয়া যাবে, কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট নাক? ভগবান কার্পণ্য করে একটাই দিয়েছেন, তাও সাইজে ভীষণ ছোট।"

সম্বিৎ বললো, "টিকিট যখন গিয়েছে, তখন আপনি আসছেনই। প্রথম ধাক্কাটা একটু সামলে উঠুন, আবার আমি ফোন করবো, দু-তিন দিন পরে।"

পরের দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। কর্মক্ষেত্রে নিজের ঘরে বসে আছি। হঠাৎ নিজের ডান হাতের চেটোতে তাকালাম। বিদেশভ্রমণের রেখাটা কোথায় থাকে তা মিছরিদা চিনিয়ে দিয়েছিলেন। শেষবার বিদেশে পাড়ি দেবার সময় যে-দাগটা স্পষ্ট ছিল, সেটা সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত, এই মনোভাব যখন আসছে, তখন বেয়ারা মিশ্রজি খবর দিলেন এক দক্ষিণী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

অপরিচিত এই ভদ্রলোক সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে আমরা সামনে হাজির হলেন। বললেন, "আপনার বন্ধু কৃষ্ণমূর্তির কাছে আপনার কথা শুনেছি। আমি বোম্বাইতে ভবিষ্যৎ গণনার কাজ করি। কলকাতার এক খ্যাতনামা চা-বাগান মালিকের নিমন্ত্রণে এখানে হঠাৎ এসেছি। তখন কৃষ্ণমূর্তি আপনার কথা বললেন।"

এই ভদ্রলোক ইংরিজী জানেন না। হিন্দিও জানেন না। সংস্কৃতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হন, যদিও দু'একটি দক্ষিণী ভাষা নিশ্চয় তাঁর আয়ত্তে। কলকাতায় কী কী দেখা উচিত তা বন্ধুকে বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, প্রয়োজন হলে আমার বাড়িতে তিনি আতিথ্য নিতে পারেন।

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সবিনয়ে জানালেন, এবারে তাঁর অশ্রয়স্থল জুটে গিয়েছে। তিনি কেবল শহরটা একটু ভালভাবে দেখতে পেলেই সন্তুষ্ট। সেই রকম ব্যবস্থা করা গেলো। নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ অফিসে চা পর্যন্ত খেলেন না। যাবার সময় বললেন, "আপনি তো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করলেন না।"

আমি বললাম, "ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবসময় ভীত হয়ে রয়েছি। তাই কৌতূহল দেখাতে সাহস হয় না। যা হবার তা তো হবেই।"

ব্রাহ্মণ সস্নেহে আমার জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করলেন। তারপর আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেমন আমি চেয়ে থাকি কোনও বিচিত্র মানুষের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে।

ব্রাহ্মণ এবার আমাকে তাজ্জব করলেন, "তুমি কি বিদেশে যাওয়ার কোনও সুযোগ পেয়েছো? যদি না পেয়ে থাকো তা হলে দু'একদিনের মধ্যে পাবে।"

লোকটা বলে কী? আমার সঙ্গে সম্বিতের কথাবার্তার খবর আমার স্ত্রী ছাড়া এখনও কেউ জানে না।

দক্ষিণী গণক বললেন, "একজন পরপুত্র তোমার আসঙ্গ কামনা করছে। সে তোমার প্রকৃত অনুরাগী।"

দক্ষিণী গণকঠাকুর আমাকে তাজ্জব করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। যাবার আগে বললেন, "তোমার কোনও উপায় নেই, তুমি বিদেশে যাচ্ছোই।"

পরপুত্রটি প্যারিস থেকে ক'দিন পরে আবার আমাকে ফোন করলো। আমি যে ফরাসি দেশে আসছি তা সম্বিৎ ধরেই নিয়েছে। সাধে কি আর দুনিয়া ওকে গ্রহণ করেছে—নিজের ভাবনা-চিন্তা অপরকে বিপণন করার ব্যাপারে ওর তুলনাহীন প্রতিভা। কাঁচড়াপাড়ার হোগলাবস্তিতে কেমন করে এমন বিশ্বজয়ী মার্কেটিং প্রতিভার উন্মেষ হলো তা সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। একেবারে গেঁয়ো জায়গাতেও যখন পুরোপুরি আধুনিকতার আকস্মিক জন্ম হয়, তখন নিশ্চয় বিশেষ কোনও কারণ থাকে যা খালি চোখে দেখা যায় না।

গণকঠাকুরের কথা সম্বিৎকে বলতে সঙ্কোচ হলো। আমি শুধু জানতে চাইলাম, ভাষা না জেনে কোনও দেশে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ কি না?

সম্বিৎ বললো, "আপনিও যেমন! ফ্রম শহিদনগর ভায়া নৈহাটি আমি কী করে এদেশে চলে এলাম? আমি কি জানতাম ফরাসি? সম্বল ছিল একখানা ডিক্সনারি। এখন তো আরও বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে. লিঙ্গুয়াফোন কোম্পানি চমৎকার সব ক্যাসেট বের করেছে বিদেশিদের ফরাসি শেখাবার জন্যে। বি-বি-সি-ও ইংরেজকে ফরাসি শেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। কী সব বই ছেপে বের করেছে। এসবের দৌলতে ফরাসি এখন বিদেশি ট্যুরিস্টের জলভাত। আমি ওসব পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিদেশি ট্যুরিস্ট ও বিদেশি লেখক যে এক নয় তা কেমন করে বোঝাবো সম্বিৎকে। ট্যুরিস্ট যায় নিজেকে আনন্দ দিতে, আর অভাগা লেখককে যেতে হয় অপরকে আনন্দ দিতে। একজনের চোখ ও কান-এর মাধ্যমে অনেক মানুষ দেখতে চাইবে, শুনতে চাইবে।

সম্বিৎ বললো, "আপনি অযথা ভয় পাবেন না। ভাষা জেনে তো আপনি দু'একটা দেশকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এবার অন্য পথ ধরুন। এখানে একজন মস্ত ফিল্ম ডিরেক্টর ছিলেন, যাঁর ছবিতে কোনও ডায়ালগ থাকতো

না—সেই সায়লেন্ট যুগের চলচ্চিত্রের মতন। অদ্ভুত সব অনুভূতি তিনি স্রেফ চোখের মাধ্যমেই সৃষ্টি করে থাকেন, শব্দের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। আপনি এদেশের পেইন্টিং-এর কথা ভাবুন। সেখানেও তো শব্দের কোনও ভূমিকা নেই—তবেই তো তার বিশ্বজনীনতা। আপনারও অন্য ধরনের একটু মহড়া হয়ে যাবে। স্রেফ চোখ দিয়েই আপনি একটা দেশ দেখে যাবেন।"

কিন্তু তাতে বোকা বনবার সম্ভাবনা খুব বেশি। পড়তে এবং লিখতে না জানলে কোনও সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশ করা যায় না। অক্ষরই তো এ যুগের মানুষকে উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি।

সম্বিতের লাইন কেটে গেলো। আমি ছুটলাম মিছরিদা সন্দর্শনে। মিছরিদা সম্প্রতি গেঁটে বাতে ভুগছেন। তাই সহজেই পাওয়া গেলো তাঁকে।

সব শুনে মিছরিদা বললেন, "এই রোগ আমাকে পেড়ে ফেলেছে। যে ঠ্যাং দুটো দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে তা এখন শোওয়ার ঘর থেকে কলঘরে পর্যন্ত যেতে আপত্তি করে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকতে-থাকতে ঘুরে নে, শ্রীহরি যখন সুযোগ দিচ্ছেন।"

তারপর মিছরিদার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা। "গেঁটে বাত শুধু পায়েই ধরে না, অনেক লেখকের মনেও ধরে, তখন পুরনো ভাবনা-চিন্তার এক পা এগোবার শক্তি থাকে না। এই অবস্থা হবার আগে যতটা পারিস বুঝে নে।"

মিছরিদা বললেন, "আমি তোর মতন অকাট মুখ্যু নেই। বাংলা ছাড়াও সংস্কৃতটা শিখেছি, ইংরিজীটাও শিখেছি ভায়ের বউয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। চায়ের দোকান এবং সিনেমা থেকে হিন্দিটাও পিকআপ করেছি। আর ডিক্সনারির মাধ্যমে ফরাসিটাও সম্পূর্ণ অজানা নেই। বড্ড গোলমেলে ভাষা—ইংরিজী যে দিকে যাবে ঠিক তার উল্টো দিকে যাবার জন্যে ফরাসি ভাষা সবসময় ছটফট করছে।

ব্যাখ্যা দিলেন মিছরিদা। নিজের পা দুটো একটু ছড়িয়ে বললেন, "এই যে আমার রোগ হয়েছে গেঁটে বাত—এর ইংরিজী নাম গাউট। সেই না খবর পেয়ে ফরাসি ভাষায় 'গাউট'-এর অর্থ হয়ে গেলো সুরুচি, সুস্বাদ। ব্যাপারটা বুঝে দ্যাখ। একই শব্দ শুনে ইংরেজ কঁকিয়ে উঠে কষ্ট পাবে, আর ফরাসির জিভ সজল হয়ে উঠবে—তারিয়ে-তারিয়ে খাবার জন্যে ফরাসি অধীর হয়ে উঠবে।"

মিছরিদা বললেন, "এই যে তুই ফরাসি না জেনে ফরাসি দেশে যাচ্ছিস, এটা শাপে বর। এই যে আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে নর্মান্ডিতে নেমে পড়েছিল তা কি ফরাসি ভাষা জেনে?"

আরও একটা কথা বললেন মিছরিদা। "যে-দেশের অর্ধেকের ওপর লোক

লিখতে পড়তে জানে না সে-দেশের লেখকের অন্তত একবার এমন জায়গায় নির্বাসিত হওয়া উচিত যেখানকার ভাষা তার জানা নেই। তবেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারা যাবে লেখাপড়া না-শেখার যন্ত্রণা।"

মিছরিদা বললেন, "বোকার মতন ওই দেশের সব কিছু দেখে আয়, তারপর বইয়ের নাম দিতে পারিস নিরক্ষরের বিদেশভ্রমণ। কিংবা অশিক্ষিতের আত্মকথা। এদেশে না-চললেও ফরেনে ভাল সুযোগ পেয়ে যাবি। আমেরিকানরা আজকাল ওই ধরনের বিষয় পছন্দ করে—যার মধ্য সারপ্রাইজ নেই তাকে সায়েবরা আজকাল প্রাইজ দেয় না।"

আরও ভরসা পাওয়া গেলো মিছরিদার কাছ থেকে। বললেন, "আমেরিকায় আমার ভাইয়ের মেমবউকে তো দেখেছিস তুই। যার ছেলের পৈতে আমি নিজে বসে দিয়ে এলাম সেবার। আমার ভাইবউ সেবার একা-একা ফ্রান্স ঘুরে এসেছে। আমি সব ব্যাপার শুনেছি ওর কাছ থেকে। পকেটে যদি রেস্ত থাকে তা হলে স্রেফ দুটো ফরাসি শব্দ জানলেই যথেষ্ট। মুখস্থ করে নে। প্রথমটা হলো মঁজুর—যদি ভুলে যাবার আশঙ্কা থাকে তা হলে আওড়ে নে। মঞ্জুর, মঞ্জুর। আর একটা কথা খুব সোজা—ওলালা। মনে ফুর্তি হলেই ওদেশে সঙ্গে-সঙ্গে আওড়াবি—ওলালা! প্রত্যেক জাতের এক একটা মুদ্রা দোষ থাকে—আমাদের দেশের মেয়েদের যেমন 'ওমাগো' ফরাসীদের তেমন ওলালা।"

এবার রসিকতা ত্যাগ করলেন মিছরিদা। বললেন, "এতো ভালবেসে যখন কেউ তোকে নিয়ে যেতে চাইছে তখন ঘুরে আয়। কত ভাগ্য করে জন্মেছিস তা বুঝে নিয়ে ভগবানকে পেন্নাম কর। আর যে লোক তোকে নিয়ে যাচ্ছে সে-ই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে, চড়ায় আটকে পড়বি না।"

আরও কিছুক্ষণ ভাবলেন মিছরিদা। তারপর বললেন, "তোর তো একটা পুরনো লোক না-পেলে নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়। আমি দেখি যদি পাঁচুর পাত্তা করতে পারি।"

এই ভদ্রলোকটি কে হতে পারেন আমি ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারছিলাম না। মিছরিদা মন্তব্য করলেন, "আমাদের পাঁচু, পাঁচুগোপাল। একই ইস্কুলের ছাত্র। শুনেছি ফরাসি দেশেই বসবাস করছে। এখন মঁসিয়ে পেঁসো-টেসো কিছু একটা হয়েছে।"

ভাবতে বারণ করলেন মিছরিদা। "ভেবে কিসসু হয় না—ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। এই যেমন পাঁচু করেছিল। ইংরিজীটা কিছুতেই সামলাতে পারতো না পাঁচু, তুই নিশ্চয় শুনেছিস। শেষ পর্যন্ত পাঁচু মনের দুঃখের চন্দননগরে গিয়ে ফরাসি শিখলো। স্রেফ ইংরেজ এবং ইংরিজীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে। ইংরেজ যে হঠাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে এদশে থেকে চলে যাবে তা বুঝতে পারেনি পাঁচু।

ইংরেজরা যাবার সময় ইন্ডিয়ার সর্বনাশ করে গেলো, অ্যাকর্ডিং টু পাঁচু। ইংরিজী ভাষাটা গছিয়ে দিয়ে গেলো। চিরকালের জন্যে। ফলে ইংরিজী গ্রামারের দাসত্ব করতে হবে আমাদের হাজার-হাজার বছর ধরে। মনের দুঃখে পাঁচু দেশ ত্যাগ করলো। প্রথমে গিয়েছিল জার্মানিতে। সেখান থেকে কী করে পাঁচু ফরাসি দেশে গিয়েছিল তা মিছরিদার জানা নেই। কিন্তু আশ্বাস দিলেন, "আমি খোঁজখবর নিয়ে রাখবো। পাঁচুর ঠিকানাটা আমি তোকে দিয়ে দেবো। তুই এখন দুর্গা নাম করে ভিসাটা করিয়ে ফেল। আর একদিন আসিস, যাবার দিনটা পাঁজি দেখে ঠিক করে দেবো। ম্লেচ্ছ সংসর্গে আবার কখন তোর সুফল হতে পারে তা হিসেব করে দেখে রাখবো।"

মিছরিদার বেতো পা আলতোভাবে স্পর্শ করে আমি কাসুন্দে থেকে শিবপুরের পথে রওনা দিলাম।

শ্রীহরি শরণম্! সেপ্টেম্বরের এক অপরাহ্নে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়া গেলো। হাওড়া থেকে গন্তব্যস্থল অবশ্যই প্যারিস।

সামান্য কিছু সমস্যা ছিল, যেমন পাথেয়। পকেটে কিছু ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে পথ হয়ে উঠতে পারে দুঃস্বপ্ন। এই সমস্যা মেটাবার জন্যেই সরকার করেছেন ব্যবস্থা, যার জনপ্রিয় নাম এফ-টি-এস। অর্থাৎ যাঁরা তিন বছর বিদেশে যাননি তাঁরা ইচ্ছে করলে আগাম অনুমতি ছাড়াই পঁচিশ ডলার ক্রয় করতে পারেন কোনও ব্যাংক থেকে। সেই সঙ্গে এয়ারপোর্টে বিদেশ যাত্রার টিকিট দেখিয়ে আরও কুড়ি ডলার। ষাটের দশকে এর পরিমাণ ছিল আট ডলার। তখন অর্ধভুক্ত ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থ চলে যাচ্ছে বিদেশ থেকে খাবার আমদানি করতে। ওই সময়ে কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে হয়েছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম মধ্যবিত্ত ইমিগ্রেশন। আমেরিকা হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত করায় বেরিয়ে পড়েছিলেন অনেক ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ নতুন দেশে ভাগ্য সন্ধানে। এঁরাই একালের সকল এন-আর-আই যার বাংলা নাম অনাবাসী। হিন্দিতে রসিকতা : ভারত সে ভাগা ভারতবাসী। ইংরিজীতে : যখন ভাল মেজাজ তখন নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান। যখন মেজাজ তিক্ত তখন নট রিকয়ার্ড ইন্ডিয়ান—অপ্রয়োজনীয় ভারতবাসী! প্রবাসে এঁদের সাফল্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি, বাঙালিরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন।

এঁদের অনেকেই এখন নিজেকে আট ডলারের ভারতবাসী বা এইট-ডলারের ইন্ডিয়ান বলে থাকেন, কারণ ওই আট ডলার সম্বল করেই তখন তাঁরা দেশছাড়া হয়েছিলেন।

এঁদের অনেকেই ভারতভক্ত—নাড়ির টান রয়ে গিয়েছে পুরো। দেশের জন্যে এঁদের চোখে জলও দেখেছি। আবার ভারতকে ভুলবার চেষ্টাও দেখেছি। এক ভদ্রলোককে জানি যিনি দেশ সম্পর্কে এতোই ক্ষুব্ধ যে মানি অর্ডারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ওই আট ডলার ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এফ-টি-এসের পাঁচশ ডলার থাকলে ভরসা হয় কিছুটা। কিন্তু আমার চিন্তা বাড়লো শেষ মুহূর্তে। কারণ বিদেশ থেকে টিকিট উপহার এলে এই সুবিধা দেওয়া হয় না। সরকারি মতে এই সব ভাগ্যবানদের জন্যে কুড়ি ডলারই যথেষ্ট, যা দিয়ে সুদূরপথে কয়েক কাপ কফিও কেনা যায় না।

কিন্তু অত ভাবলে তো দেশ ভ্রমণ হয় না। বাই যখন উঠেছে তখন বেরিয়ে পড়ো। আগে লোকে কটক যেতো পাটনা যেতো। এখন যায় ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা প্যারিস।

সম্বিৎ আমার মন জানে। দমদম এয়ারপোর্টে বিমান কোম্পানির কাউন্টারে শুনলাম আমার নামে প্যারিস থেকে ফোন এসেছিল—সব ঠিক আছে। সম্বিতের ব্যবস্থাই আলাদা, তুলো দিয়ে মুড়ে এক সময় যেমন কলকাতা বাজারে আঙুর আসতো সেইভাবে পথের ক্লান্তি থেকে তোমাকে দূরে রাখতে চায়। জয় হোক এই পরপুত্রের। আমি দেখেছি, পর যখন আপন হয় তখন তার তুলনা থাকে না। আমার মা বলতেন, পরের দয়াতেই তুই জীবনে দাঁড়িয়ে গেলি। কথাটা মিথ্যে নয়, পরের ভালবাসাতেই বারবার আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আমার আর কোনও প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়।

এবার চলেছি বাংলাদেশ বিমানে। পৃথিবীর একমাত্র আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স যার প্রতিটি বিমানে বাংলা লেখা আছে। প্রত্যেক বাঙালির পক্ষে পরম গর্বের কথা। বাংলাদেশ বিমানের ভাবমূর্তি কিন্তু এখনও তেমন উজ্জ্বল নয়। দু'একজন আমার নির্বাচন সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এঁরা যে ভুল তা যথাসময়ে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিমানের পরিচ্ছন্নতা, নিপুণতা, অতিথিপরায়ণতা ও আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রত্যেক বাঙালির অন্তত একবার এই বিমানে পরিভ্রমণ করা উচিত বলে মনে করি। প্রবাসের আকাশে বাঙালির সান্নিধ্য, বাঙালির কণ্ঠস্বর এবং বাংলাভাষায় ঘোষণা আমাকে রোমান্টিক করে তোলে। বিশ্বসংসারে একমাত্র বাংলাদেশ বিমান-ই আমাদের মান রক্ষা করে চলেছে।

কলকাতা থেকে সোজা পশ্চিমমুখো না হয়ে প্রথমে পুবমুখো ঢাকা।

ওইখানেই এরোপ্লেন বদল। ঢাকা আমি কখনও দেখিনি। তাই মনের মধ্যে অস্থিরতা—যদিও এই দেখা হবে একপলকের।

মাঝপথের গল্পে জড়িয়ে পড়ার সময় নেই এবারের লেখায়। শুধু বলি, আমার সিটের পাশেই বসেছিলেন, এক সন্ন্যাসী। ভারতীয় সন্ন্যাসীসঙ্ঘে যোগ দিলেও তিনি একজন বিদেশি। জন্ম মধ্যপ্রাচ্যে শিক্ষা ইউরোপে। সন্ন্যাসী-জীবনের পূর্বেই তিনি এম-ডি হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী রসিকতা করলেন, "বাংলা বুঝি, কিন্তু বলতে পারি না। পারবো কী করে? যতক্ষণ থাকি আমাকে দিয়ে ডাক্তুরি করিয়ে নেয়, ফলে ভাষা শিক্ষার সময় পাই না।"

ডাক্তার স্বামীজির সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তার মধ্যে একটা বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং নোটবইতে লিখে নিয়েছিলাম। স্বামীজি বলেছিলেন : "আমার ভয় হয় আমেরিকান সভ্যতা পৃথিবীর অন্য সভ্যতার মতন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। ওরা ভীষণ ভায়োলেন্ট। ওরা নিজেরাই না একদিন নিজেদের ধ্বংস করে বসে।"

ঋষিবাক্য কোথাও লিপিবদ্ধ থাক। একমাত্র সময়ই প্রমাণ করবে কোথাও কোনও দূরদৃষ্টি ছিল কি না।

স্বামীজি আমাকে দু'একটা কুইজ-এ ফেলেছিলেন। বেশ মজা পেয়েছিলাম, কারণ এঁর সাধারণ জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশি। জিজ্ঞেস করেছিলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির কোন শহরে বোমা ফেলা হয়নি?" আমি ব্যর্থ হওয়ায় স্বামীজিই উত্তর দিয়েছিলেন ; বিশ্ববিদ্যালয় নগরী হাডেলবার্গ। স্বামীজি আরও একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন ; যেখানে শীত ও গরম কোনওটাই খুব বেশি নয় সেখানেই সভ্যতা বিকশিত হয়েছে ; মিশর, ভারতবর্ষ, চীন। আরও বলেছিলেন, ভারতের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের, ইউরোপের হাজার তিনেক বছরের সে তুলনায় আমেরিকা কাল-কা যোগী!

জার্মানদের সম্বন্ধে ওঁর মতামত জানতে চাইলাম। বললেন, "নিজেদের ওপর জার্মানদের অবিশ্বাস্য কনফিডেন্স। ঔদ্ধত্য একটু বেশি আছে। কিন্তু কাউকে গ্রহণ করলে জার্মানের বন্ধুবাৎসল্য তুলনাহীন।"

ঢাকা শহরে নির্ধারিত সময়ের একটু বেশি কাটিয়ে আবার উড্ডীন হওয়া গেলো। এবং এথেন্সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ডি-সি টেন বিমান অবশেষে প্যারিসের পথে রওনা দিলো। ডি-সি টেনের তেমন নামডাক ভারতবর্ষে পৌঁছায়নি—আমরা বোয়িং ও এয়ারবাসে মুগ্ধ হয়ে আছি। কিন্তু ডি-সি টেন বেশ সুন্দর বিমান বলে মনে হলো। সবচেয়ে যা ভাল লাগলো তা হলো পরিচ্ছন্নতা, এমনকি টয়লেট পর্যন্ত। ডি-সি টেন ঝকঝক করছে, যেন সদ্য কাজে লাগানো হয়েছে। বাঙালিরা অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন এই দু'টি বদনাম থেকে মুক্তি পাবার

একটা উদাহরণ খুঁজে পাওয়া গেলো।

বিমানবালিকার নামটি ভাল লাগলো—অধরা। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন চমৎকার বাংলায় ককপিট থেকে ঘোষণা করলেন, আমরা এখন ২৮,০০০ ফুট ওপরে আছি, কিন্তু আমাদের নজর আরও উঁচুতে। আমরা শীঘ্রই ৩৫,০০০ ফুট ওপরে উঠবো। বিমান ৫৫০ মাইল বেগে লক্ষ্যস্থানের দিকে ছুটে চলেছে। আরও জানালেন, প্যারিসের আকাশ এই মুহূর্তে মেঘাচ্ছন্ন।

ব্যাপারটা ভাল লাগলো না—প্রথম পদার্পণে পৃথিবীর সবচেয়ে গর্বিতা নগরীর মুখ কে মেঘাচ্ছন্ন দেখতে চায়? ডাক্তার স্বামীজি আমার সঙ্গে একমত হলেন না। বললেন, "প্রথমে গোমড়া মুখ দেখা ভাল। তোমার বিদায়ের দিন প্যারিসের আকাশ ঝলমল করবে তুমি দেখে নিও। আমি যতবার প্যারিসে এসেছি ততবার এই কাণ্ড হয়েছে। এই প্যারিসেই আমি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রথম খোঁজখবর পেয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি একদিন আমি সন্ন্যাসীর গৈরিক পরবার সৌভাগ্য অর্জন করবো। এই প্যারিসেই আমার দ্বিতীয় জীবনের শুরু বলতে পারো। আমার খুব আনন্দ, অনেক দিন পরে আমি আবার প্যারিসে ফিরে যেতে পারছি। এখনে বলে, নিজের শহরের পর পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দ্বিতীয় শহর হলো এই প্যারি—কথাটা মিথ্যে নয়। তুমি খুঁজে বের করো কেন একে মানবতীর্থ বলা হয়।"

ডাক্তার স্বামীজির কথা থেকেই বইয়ের নামটা আগাম মনে এসে গেলো। পকেটের নোট বই খুলে লিখে নিলাম, মানুষের মহাতীর্থ অথবা মানবসাগর তীরে। গত কয়েকশ' বছরে পৃথিবীতে এমন কোনও মহামানব জন্মগ্রহণ করেননি যাঁর পদধূলিতে এই নগরী পবিত্র হয়ে ওঠেনি। প্যারিসকে বাদ দিয়ে একালের মানুষের কোনও ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। মহামানবের সাগরতীরে কথাটা রবীন্দ্রনাথ অবিস্মরণীয় করে গিয়েছেন। কিন্তু প্যারিস যেন আরও এক পা এগিয়ে রয়েছে—মহামানবের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভূমিকাকেও স্বীকার করে নিয়েছে এই মহানগরী। মানবসাগর তীর তাই আমার কাছে মহামানবের সাগর তীর অপেক্ষা আকর্ষণজনক।

মনের মধ্যে আশঙ্কাও জাগছে। দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভা যে মহানগরীকে পরম বিস্ময়ে অবলোকন করেও পরিপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননিসে নগরীতে আমার মতন একজন সাধারণ মানুষের কী করার থাকতে পারে? ঠিক সেই সময় ছেলেবেলায় পড়া ছোট্ট একটা বাংলা কবিতার লাইন মনে পড়ে গেলো—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে!

ইতিমধ্যে প্লেনের জানালা থেকে সমস্ত নগরী দৃশ্যময় হয়ে উঠেছে। কোনও অপরিচিত শহরের বিমানবন্দরে অবতরণের আগে আমার কেমন রোমাঞ্চ বোধ

হয়। জানালা দিয়ে প্যারির সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ে শিহরণের সৃষ্টি হলো শরীরে।

আমি মনে-মনে বললাম, শুভদৃষ্টির মুহূর্তে আমি তো তোমার মুখের দিকে সোজাসুজি চাইতে পারবো না। তোমার অতীত, মানব ইতিহাস তোমার ভূমিকা তো আমার অজানা নয়। তবু নিজের মতন করে তোমাকে খুঁজে পেতে হবে আমাকে আর একবার, যেমন তোমাকে বারবার নিজের চোখে আবিষ্কারের জন্যে ছুটে আসে লক্ষ-লক্ষ মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

আমার সমস্ত আশঙ্কা ও দ্বিধা কিন্তু কেটে গিয়েছে। দীন যখন দূর তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়ে তখন তো তার কোনও আশঙ্কা থাকে না, থাকে কেবল বিস্ময়। থাকে দু'চোখ ভরে দেখার আনন্দ। কিন্তু থাকে না রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশের কোনও ক্ষুধা বা বাসনা। অর্থাৎ প্যারি নগরী, আমি হাওড়ায় কাসুন্দের চোখই তোমাকে দেখবো, তোমাকে নতুন করে আবিষ্কারও করার কোনও দুর্মতি আমার নেই।

অতএব এসো, হে অসামান্যা, অন্তত কয়েক দিনের জন্যে এই আগন্তুকের হৃদয়াসনে বসবাস করো। আমাকে গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই ; আমি তোমাকে কয়েকদিন, মাত্র কয়েকদিন, আমার চোখের আলোতে দেখতে চাই, অন্য এক ভাগ্যহীন দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই দৃষ্টিকোণের স্থিরতা দিতে আর একজন মানুষ শহিদনগর রাজধানি থেকে তোমার নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এয়াপোর্টে এতোক্ষণ নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বিমান থেকে বেরিয়ে ফরাসি দেশের সিমেন্ট স্পর্শ করা গেলো। মাটি স্পর্শ করার সুযোগ এখন পৃথিবীর প্রায় সব বিমানবন্দর থেকেই লোপ পেতে বসেছে। বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে টারম্যাকে নেমে আসার মধ্যে বেশ নাটকীয়তা ছিল। এখন সিঁড়ি ভাঙার বালাই নেই। সিঁড়ির বদলে একটা যন্ত্রচালিত বারান্দা এগিয়ে আসে কোন অদৃশ্য নির্দেশে বিমানের দ্বারটিকে ফরাসি প্রথায় চুম্বন করতে। তারপর দু'জনে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়। সেই সুযোগে শুরু হয় যাত্রীদের নিষ্ক্রমণ। বাংলাদেশ বিমানটির যাত্রা শেষ হয়নি, প্যারিস স্পর্শ করে এখনই তাকে ছুটতে হবে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে লন্ডনে। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ যাত্রীর টান লন্ডনেই ; তাই প্লেন খালি হলো না।

পকেটে পাসপোর্টটি স্পর্শ করে, বিমানবালিকার দেওয়া এমবার্কেশন ফর্মটি হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে আসা গেলো।

মিছরিদা টিপ্‌স্‌ দিয়েছিলেন, এই পর্যায়ে একটু গতর খাটাবি। কচ্ছপের মতন

থপথপ করে না এগিয়ে একটু রেস দিবি,—না-দৌড় স্টাইল। লোকে যেন বুঝতে না পারে তুই ইচ্ছে করে অন্যকে পিছনে ফেলে ছুট্ দিচ্ছিস। কিন্তু এই দৌড় খুব প্রয়োজনীয়, ইমিগ্রেশন কাউন্টারের লাইনে ভাল পোজিশন পেয়ে যাবি, যদিও প্রথম শ্রেণী ও বিজনেস ক্লাসের যাত্রীরা তোর সামনে থাকবে। (বাংলাদেশিরা সুরসিক, বিমানের উচ্চশ্রেণীর নাম দিয়েছেন 'রজনীগন্ধা' শ্রেণী।) নিষ্ক্রমণের লাইনের ব্যাপারে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ রহস্যটা বুঝে গিয়েছেন। তাই উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরা প্রথমেই বিমান ত্যাগ করার সুযোগ পান। তাঁরা বেরুলে তবে ইকনমি ক্লাসের যাত্রীদের সুযোগ—পুরাকালে স্টিমার যুগে এই যাত্রীদেরই বোধহয়, ডেকযাত্রী বলা হতো, যার বর্ণনা রয়েছে আমার হৃদয়েশ্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনায়।

মার্কিন দেশের বিমানবন্দরগুলি অসভ্য রকমের বড়। এক-একখানা শহর যেন বিমানবন্দরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ'দেড়েক গেট যেন ডাল-ভাত। আকারটা কেমন তা বোঝাবার জন্যে বলা যায় শ'দেড়েক কলকাতা এয়ারপোর্ট ওখানে ঢুকে যাবে। মার্কিন দেশে বিমানযাত্রীর সংখ্যাও অবিশ্বাস্য। ট্যুরিস্টের শহর বলে প্যারিসের বদনাম হয়, কিন্তু নিউইয়র্ক কম বিদেশিকে প্রতিদিন টানে না। ট্যুরিস্ট ট্রাফিক থেকে আমেরিকা টু পাইস কামায়, কিন্তু গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্সের মতন বিদেশযাত্রীর ডলারের জন্য আঁকুপাঁকু করে না। একই নীতি অনুসরণ করে ব্রিটেন—কে কার কাছ থেকে এই বিদ্যেটি শিখেছে তা অবশ্য বলা শক্ত।

বিদেশের যাত্রীস্রোতকে সময় মতন সামাল দিতে গিয়ে মার্কিনী বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ বেসামাল। এক-একসময় দীর্ঘ সময় লেগে যায় ; যাত্রীদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। ইমিগ্রেশন পুলিশের মুখ দেখবার জন্যে কারও সময় বাজেট করা থাকে না, মানুষ এসেছে দেশ দেখতে।

এবার এরোপ্লেনেই ম্যাগাজিনে পড়লাম, সমস্যা লাঘব করার জন্যে মার্কিনিরা মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। ও-জাতের মস্ত গুণ সমস্যা খুঁজে পেলে বুনো মোষের গোঁ-তে সমস্যাকে টুঁ মেরে কাত করে ফেলবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবে। মার্কিন বিমানবন্দরে বিদেশির অপেক্ষাসময় লাঘবের জন্যে মার্কিনি পুলিশ এখন নাকি লন্ডনের বিমানবন্দরে চলে আসছেন। যাত্রীরা বিমানে ওঠার সময়েই বিমান থেকে বিদায় নেবার কাজকর্মগুলো সেরে ফেলা হচ্ছে। ফলে যে একবার বিমানে ঢুকতে পেলো তার আর বেরুবার হাঙ্গামা নেই। ম্যাগাজিনে পড়লাম এই ব্যবস্থায় অনেক কষ্ট লাঘব হচ্ছে ; কারণ সদাব্যস্ত মার্কিন বন্দরে অনেক সময় মিনিটে-মিনিটে দানবাকৃতি পেটমোটা জেট নামতে আরম্ভ করে। সে দৃশ্য দেখলে মনে হয় দুনিয়ার সমস্ত জেটবিমানের একটামাত্র লক্ষ্যস্থল

আছে, তার নাম আমেরিকা।

প্রায় একই দৃশ্য ইউরোপের ফ্রাঙ্কফুর্টে লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভোরবেলায় গড়িয়াহাট মার্কেটের মতন লোক গিজগিজ করছে। জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তোমরা পথে বেরিয়ে পড়েছো! তোমাদের কি ঘরে সুখ নেই? মনের ভাব না লুকিয়ে বলে ফেলা ভাল, ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর আমার ভাল লাগেনি। দুনিয়ার ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারকে যেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে জড়ো করা হয়েছে। স্রেফ এক জাহাজ থেকে নেমে আরেক জাহাজে চড়বার জন্যেই মানুষ ছোটাছুটি করছে। রেলের কর্মজীবনে মোকামাঘাটে, সকরিগলি ঘাটে এই ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করেছি।

প্যারিসের যে-বন্দরে অবতরণ করেছি তার নাম ওরলি। চার্লস দ্য গ্যল এয়ারপোর্ট নির্মাণের পর ওরলি তার ইজ্জত হারিয়েছে। ওরলির বর্তমান অবস্থা বাদশা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে প্রথমা রানির যেমন অবস্থা হয়। খাতায় কলমে খাতির আছে, কিন্তু কোথায় যেন কিছু হারিয়েছে।

আন্দাজ করতে পারি চার্লস দ্য গ্যল বিমানবন্দর আকারে ও বিন্যাসে আরও বিশাল ও আধুনিক। এয়ারপোর্ট স্থাপত্যে ফরাসি নাকি তুলনাহীন—আগামীদিনে পৃথিবীর এয়ারপোর্টগুলো কেমন হবে তা নাকি ফরাসির মাথা থেকে বেরুবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। ওরলি বিমানবন্দরে ভবিষ্যৎগন্ধী তেমন কোনোও সঙ্কেত নেই। আকারও তেমন বিশাল নয়, যদিও অনভিজ্ঞ বঙ্গসন্তানের ভিরমি লাগবার পক্ষ যথেষ্ট। এয়ারপোর্টের করিডর ধরে হাঁটতে-হাঁটতে হাওড়া-শিবপুরের মানুষটিকে আমি উৎসাহ জোগাচ্ছি, "তুমিও বা কম যাও কি? তোমার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক শাখার কর্মীরা বিমানের অভাবে মাছি তাড়ালেও একদিন কলকাতা তিলোত্তমা হবে। সব দুঃখ ঘুচে যাবে—একখানার বদলে অন্তত একশখানা গেট হবে ওখানেও।" বিমানবন্দরে যে অবস্থাই হোক, জনসংখ্যায় কলকাতা এখনও প্যারিসের দাদা (দিদি?)। দুনিয়ার বৃহত্তম শহরের লিস্টিতে কলকাতা এখনও প্যারিসের ওপরে, অথচ আমাদের মাত্র তিনশ বছরের ইতিহাস। জোব চার্নক যুগ যুগ জিও, ইংরেজের পো এখানে অন্তত ফরাসির ওপর এক হাত নিয়েছে।

জনসংখ্যায় প্যারিসের ওপরে কলকাতার টেক্কা দেওয়ার ব্যাপারে আমার গর্বের বেলুন অবশ্য প্যারিস প্রবাসের কালেই চুপসে গিয়েছিল। ওখানে এক কাগজে পড়েছিলাম, ঢাউস-ঢাউস শহর তৈরিতে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহেবদের অরুচি ধরে গিয়েছে। দুনিয়ার বিশিষ্ট শহরগুলির তালিকা এখন তৈরি হয় লোকসংখ্যা অনুযায়ী নয়, লোকের ট্যাঁকে কত পয়সা আছে তার হিসেবে। ট্যাঁকের পয়সা এবং রুজি-রোজগারের হিসেব উঠলে আমরা কলকাত্তাইয়ারা

অবশ্য গোহারান হেরে যাবো, দুনিয়ার দুশো বিত্তবান শহরের তালিকাতেও আমাদের নাম থাকবে না। আসলে আমরা কেবল সংখ্যায় বেড়ে চলেছি, সামর্থ্যে নয়, সমৃদ্ধিতে নয়। স্রেফ লোকগণনার জোরে টাউন থেকে সিটি, সিটি থেকে মেট্রোপলিটান, মেট্রোপলিটান থেকে মেগাপলিস-এর তালিকায় নাম লিখিয়ে কোনো লাভ নেই।

ওরলির যাত্রীস্রোতে গা ভাসিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার খেয়াল হয়নি বৃহৎ শহর হওয়াটা এখন আর গৌরবজনক নয়। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র গ্রামবাসীরা যেসময় শহরমুখো হচ্ছে ঠিক সেই সময় নগরজীবনে ক্লান্ত অথচ কৃতী মানুষরা ইউরোপ আমেরিকার শহর ছেড়ে গ্রামমুখো হচ্ছেন। জনসংখ্যায় ফুলে ফেঁপে উঠছে দরিদ্র দেশের শহরগুলো। কিন্তু ধনী দেশের শহরগুলো তাদের আয়তন আর বাড়াবে না।

অর্থাৎ নাগরিক বিপর্যয়ের বলি হতে চলেছে অনগ্রসর দেশের মানুষরা। হিসেবটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। আমি যখন ইস্কুল ছেড়ে, কলেজকে নমস্কার করে হাইকোর্টে বাবুগিরি শুরু করেছি সেই পঞ্চাশের দশকে পৃথিবীর প্রথম দশটা শহরের পাঁচটা ছিল ইউরোপ ও আমেরিকায়। দু'হাজার সালে তালিকায় মাত্র একটি পশ্চিমী শহর থাকবে। তার নাম নিউইয়র্ক। দু'হাজার সালে পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় শহর হবে মেক্সিকো সিটি ও সাওপালো, ব্রাজিল। সোজাসুজি স্বীকার করে নেওয়া ভাল এই তালিকায় নাম ওঠানোটা এখন আর বিশিষ্টতা নয়, বরং এক ধরনের ব্যর্থতা। একবিংশ শতাব্দীর সম্মানিত শহরগুলো বৃহত্তম হবে না, কিন্তু বিত্তবান হবে।

দুর্জনরা ইতিমধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন উনিশ শতকের শেষের দিকের গোটাকয়েক আবিষ্কারের ভিত্তিভূমিতে এখনকার শহরগুলো গড়ে উঠেছিল। এই আবিষ্কারগুলো হলো—প্লামবিং, ইলেকট্রিক বাল্‌ব, লিফট, স্টিল ফ্রেমের বাড়ি, মোটরগাড়ি, টেলিফোন এবং সাবওয়ে। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৩—এই সতেরো বছরের মধ্যে সব ক'টি আবিষ্কৃত হয়। উনিশ শতকের এই সব টেকনোলজি একশ বছর আমাদের সেবা করেছে, আর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ফরাসি দেশের অন্দরমহলে প্রবেশ পথে লাইন। মিছরিদা আরও কত জনকে গোপন পরামর্শ দিয়েছেন কে জানে—আমার থেকেও দ্রুতগতিতে বেশ কয়েকজন যাত্রী ইমিগ্রেশন পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ফরাসি পুলিশে রমণীরাও রয়েছেন। যদিও এই ভূমিকায় মেয়েদের দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। মেয়েদের অন্য ভাবমূর্তি রয়েছে বিশ্বসংসারে—তারা কোন দুঃখে অপ্রিয় কাজ করে পাপের ভাগী হবে? এগারো

ঘণ্টা শূন্যে ভাসমান থাকা একটা গোবেচারা মানুষকে কোন মেয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বলবে, তুমি এদেশে ঢোকার অযোগ্য। তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও।

লাইনে দঁাড়িয়ে আছি তো আছিই। অথবা আমার ধৈর্য কম। ইমিগ্রেশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার অস্বস্তি হয়, মনে হয় বেঁচে থাক আমার ভারতমাতা। কোন দুঃখে আমি অন্য দেশের ভোঁদকা পুলিশের দয়ার পাত্র হবো?

লাইন টুকটাক করে এগোচ্ছে। দুটি কাউন্টারে কাজ হচ্ছে—একটিতে পুলিশদা, আরেকটিতে পুলিশদি। পুলিশদিকে একটু বেশি কাজের মনে হচ্ছে—তাঁর বগলের তলা দিয়েই বেশি লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু ইন্ডিয়া নয় দুনিয়ার সর্বত্রই তা হলে মেয়েদের জয়জয়কার। ঘরসংসার সামলে কর্মক্ষেত্রে এসেও তারা পুরুষকে টেক্কা দিচ্ছে। দুনিয়াটা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মেয়েদের করায়ত্ত হবে এমন ভবিষ্যৎবাণী করে রাখা যাক।

আমার মনে এখন নানা সন্দেহ। পুলিশদা অথবা পুলিশ দিদিমণি কি ফরাসি ছাড়া অন্য কোনোও ভাষায় কথা বলবে না? তা হলে আমরাও বদলা নেবো। কলকাতা এয়ারপোর্টের কাউন্টারে গুঁফো ভোজপুরি কনস্টেবল ছাড়া কিছুই রাখা হবে না ফরাসি যাত্রীদের জন্যে। পরমুহূর্তেই আমার বোকামি ভাঙলো। কষ্ট পাবে নিরীহ ফরাসি, এখানকার পুলিশদার গায়ে একটি ফোস্কাও পড়বে না।

পুলিশদির কাজের গতি একটু শ্লথ হয়ে পড়েছে। মেয়েদের এই মুশকিল, একটু প্রশংসা পেলেই এফিসিয়েন্সি কমে যায়। দুনিয়ার হাটে টিকে থাকতে হলে প্রশংসা হজম করতে শিখতে হবে মেয়েদের।

দিদিমণির দিকে দূর থেকে একটু স্পেশাল নজর দিলাম লাইন থেকে সামান্য সরে এসে। ওখানে এক বঙ্গসন্তান বিপদে পড়েছে। তার হাতে একটি বাদ্যযন্ত্র। মনে হচ্ছে বাউল। তার সমস্যা গুরুতর মনে হচ্ছে। একজন ফরাসি জামাইবাবু সঙ্গে ছিলেন, তিনি চোস্ত ফরাসিতে এই গায়কের বক্তব্যটা দিদিমণিকে বোঝাতে শুরু করেছেন। জামাইবাবু বলছি এই জন্যে যে ফরাসি যুবকটির স্ত্রী বঙ্গ ললনা—তিনি সুদর্শনা, সুমধুরভাষিণী। দুটি ফরাসি নাগরিকের জন্মদাত্রী। পথেই সামান্য পরিচয় হয়েছিল। ইনি একজন শিল্পী এবং সুগায়িকাও বটে। ফরাসি রুচিবান তা এই পাত্রী নির্বাচনেই প্রমাণ করে দিয়েছেন জামাইবাবু। আরও একটি কারণে জামাইবাবু বলছি। আমি যখন কোট প্যান্ট পরে সাহেব সেজেছি বিদেশের প্রয়োজনে তখন কোট প্যান্ট গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে ফরাসি জামাইবাবু বিমানবিহারী হয়েছেন।

ফরাসি ভাষায় যখন তর্কযুদ্ধ চলেছে তখন আমার মনে পড়লো সম্প্রতি পড়া একটি বইয়ের কথা। ফরাসি সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করছেন,

পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলি আইনের মাধ্যমে সাদা-কালো, পুরুষ ও নারী, কিংবা ধর্মীয় বৈষম্য ক্রমশই কমিয়ে এনে সুসভ্য হবার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময় প্রত্যেক দেশের আইন নির্লজ্জভাবে বিদেশির প্রতি অনীহা দেখাচ্ছে। বিজ্ঞান মানুষকে যত কাছে টানছে, রাষ্ট্রীয় আইনকানুন তত বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। সার্বভৌমত্বের নামে এই সব পাঁচিল তোলার সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হচ্ছে। কিন্তু যুক্তি যতই নিখুঁত হোক, মোদ্দা ব্যাপারটা হলো, পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রায় সব দেশেই ওভারটাইম খাটছে।

জামাইবাবু অবশেষে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাউল বাঙালি শ্যালকটিকে এ-যাত্রায় পার করালেন।

আমার কপালে পুলিশ দিদিমণি নেই। পুলিশদা আমাকে ডাকলেন—দ্রুত আমার পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে নিলেন, কলকাতার ফরাসি কনসালের ছাপমারা ভিসাও দেখলেন। কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করে আমি জেনে গিয়েছি ভিসার রবার স্ট্যাম্প থাকলেই দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে এমন কোনও দিব্যি কাটা নেই। সবটাই নির্ভর করে এয়ারপোর্টের পুলিশদার ওপরে।

পুলিশদা জিজ্ঞেস করলেন, এখানে চলবে কী করে? লজ্জায় কুড়ি ডলারের কথা তুললাম না। বুক ফুলিয়ে, সম্বিতের সম্মতিপত্রটি বের করে দিলাম। স্পনসরশিপ পত্রটি পুলিশদাকে খুব খুশি করলো না। দেশে ট্যুরিস্ট এলো অথচ কোনও ফরেন এক্সচেঞ্জ আদায় হলো না। দুঃখ হয় বৈকি, আমি ইমিগ্রেশন পুলিশ হলে আমারও কষ্ট হতো।

পুলিশদা বিড়বিড় করলেন, চিঠিটা কয়েক মাস পুরনো হয়ে গিয়েছে। দোষটা আমারই, পুলিশদা। সম্বিৎ চিঠি পাঠিয়ে টিকিট পাঠিয়ে অনেকবার তাগাদা দিয়েছে। আমার গতর নড়েনি। গেঁতো বলতে পারো, কুঁড়ে বলতে পারো, সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না বলতে পারো। না বাবা, ইনডিসিশনের কথা তুলবো না। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার অপরাধে ফরাসিরা একদিন এই শহরে নিজের রাজাকেই কোতল করেছিল। আবার সেই কোতলের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব চালিয়েছে দুনিয়ার সর্বত্র, যাতে দুনিয়ায় ফরাসির ইজ্জতের আঁচ ঝিমিয়ে না যায়। ঠিকমতন বিজ্ঞাপন করতে পারলে খুনোখুনি, মুণ্ডু কাটাকাটিও ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হয়ে ওঠে আমাদের এই বিংশ শতাব্দীতে।

পুলিশদা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন, কী করা হবে? স্রেফ বলে দিলাম, রুজি-রোজগার ছাড়া সবই একটু-আধটু করা যেতে পারে। আপাতত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে একটু ঘুমোতে চাই মঁসিয়ে। সুরসিক পুলিশদা ছেড়ে দিলেন এবং বিদায় নেবার সময় বললেন, "আমি জানি প্যারিস দেখলে তুমি

ঘুমোতে চাইবে না, মঁসিয়ে।”

আমি মিষ্টি হাসলাম। ফরাসির ভুবনবিদিত রসিকতার নমুনা পাওয়া গেলো। আমি এবার সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দেশে একজন মুক্ত ভারতীয় নাগরিক। ফরাসি আইন অনুযায়ী সাম্য আমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু অবশ্যই মৈত্রী প্রত্যাশী আমি।

প্রিয়জনদের অভ্যর্থনা করার জন্যে বহু মানুষ ইমিগ্রেশন কাউন্টারের বাইরে রেলিঙের ধারে ভিড় করে রয়েছেন। আমার চোখ বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে সম্বিতের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় সম্বিৎ? তার টিকিটি দেখা যাচ্ছে না।

সম্বিৎ তা হলে কি এলো না? বঙ্গ সম্মেলনে আমেরিকায় গিয়ে আমার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দরে আনোয়ার করিম চৌধুরির আসবার কথা ছিল, আসেনি। ওহায়োর ক্লিভল্যান্ড বিমানবন্দরে সম্মেলনের কর্মকর্তাদের আসার কথা ছিল, কিন্তু কেউ ছিলেন না। পরে জানা গিয়েছিল, দিনক্ষণ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। কিন্তু এবারে তো তা হবার কথা নয়। সম্বিৎ তো ঢাকা বিমানবন্দরেও টেলিফোনে আমার খোঁজখবর নিয়েছে। তা হলে কী হতে পারে? আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কথা শুনেছি বিমানে বসেই। তা হলে কি প্যারিসে দুর্যোগ নেমেছে?

না অন্য কিছু? আমার শরীর হিম হয়ে যাবার অবস্থা। সম্বিৎকে না পেলে এখন কুড়ি ডলারে কী কী করা যাবে তা ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

আমি দেখলাম, বাউল ছেলেটি একতারা হাতে আমার দিকে হাত নেড়ে তড়তড় করে মনের আনন্দে বেরিয়ে গেলো। আমার এখন কর্তব্য কী? ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। মুখুজ্যের পো, ওঠো, জাগো।

পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা ভাবতে শুরু করার সময় এসেছে।

ডাক্তার সন্ন্যাসী মহারাজকে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি। আকাশপথে মহারাজ সস্নেহে তাঁর আশ্রমে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভাবছি আপাতত ওঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করবো। সৌভাগ্যবশত আরও একজন গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ওঁকে নিতে এসেছেন। মিশনের কেন্দ্রটি যে শহর থেকে একটু দূরে তা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। দমদমে আর একজন সন্ন্যাসী ওঁকে তুলে দিতে এসে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন পথে ওঁর দায়িত্ব নিতে। আমি বীরদর্পে সম্মতি জানিয়েছিলাম। ডাক্তার মহারাজ সমস্ত পথে আমার কোনও সাহায্য নেননি, শুধু অনুরোধ করেছিলেন, ওঁর পাশের সিটে বসতে এবং সম্ভব হলে দেখতে যাতে কোনও মহিলার সিট না পড়ে তার ঠিক পাশাপাশি। সে দায়িত্ব ঢাকায় প্লেন বদলের সময় সহজেই পালন করা গিয়েছিল। এখন আমার দায়দায়িত্ব না ওঁকে

নিতে হয়। অথচ সন্ন্যাসী মানুষ, আমি জানি ওঁর কাছেও মাত্র কুড়ি ডলার আছে। পয়সার দিকে নজর থাকলে চিকিৎসক বিদেশির পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব হতো না।

আমার অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী মহারাজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন, "সব কিছুই ভালর জন্যই হয়। তা ছাড়া ইন্ডিয়ানদের রক্তে কষ্ট সহিষ্ণুতা আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে। না-হলে স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন? ওঁকে রিসিভ করার জন্যে মার্কিনদেশের জাহাজঘাটে কে এসেছিলেন?"

কিন্তু এখন তো এই সব দুঃসাহসের গল্প শোনার সময় নয়। এখন শরীরটা চাইছে গৃহকোণের আশ্রয়।

ঠিক সেই সময়ে মনে হলো এক সুসজ্জিতা ফরাসি সুন্দরী আমার দিকে মধুদৃষ্টি হানছে। দীর্ঘদেহিনী এই সুন্দরী কোন দুঃখে আমার সম্বন্ধে আগ্রহী হতে যাবে? এসব হয়ে থাকে আষাঢ়ে সিনেমা স্টোরিতে। স্রেফ এক পলকের দেখায় অভাবিত বন্ধুত্ব এবং অপ্রত্যাশিত আশ্রয়। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় অবশ্য অনেক সময় অঘটন ঘটে থাকে, যেমন ট্রেনের সহযাত্রী হিসেবে অধ্যাপক রাইটকে পেয়ে বিবেকানন্দ সবিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি কস্মিনকালে কোনও ফরাসির সান্নিধ্যে আসিনি। আমাদের প্রজন্মের ইন্ডিয়ান মোল্লাদের দৌড় ইংরেজ রূপী মসজিদ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ না ঘুমিয়ে হয়তো আমার মতিভ্রম হতে চলেছে, তাই দিবাস্বপ্ন (স্যরি, সান্ধ্যস্বপ্ন!) দেখছি এক ফরাসি তরুণী আমার দিকেই তাকাচ্ছে।

ফরাসি তরুণী যা করলো তাতে আমার মাথা আরও ঘুরতে লাগলো। একটু এগিয়ে এসে মিষ্টি বাংলায় সুতনুকা বললো, "নমস্কার। আমি একজন ফরাসি মেয়ে। আপনি কি লেখক শংকর?"

গায়ে চিমটি কাটলাম। এ কি মায়া? না মতিভ্রম। প্রবল আনন্দে আমি বললাম, "আমি ভাবতে পারছি না। আপনি দেবীর মতন আমার সামনে হাজির হয়েছেন।"

মেয়েটি হঠাৎ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে আমার কোনও কথাই তার মগজে প্রবেশ করছে না।

আমি এবার শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার পরিচয়?"

এবারে আরও জটিলতা! খাঁটি ফরাসিতে মেয়েটি কী সব বলে গেলো যা আমার বুদ্ধির আগোচর। এবার ফরাসি সুন্দরীর হুঁশ হলো ফরাসির 'য' অক্ষর আমার কাছে গোমাংসবৎ। বেশ লজ্জা পেয়ে গিয়েছে ফরাসি ললনা। সে লিপস্টিকে-রাঙা ঠোঁট দু'টি বিকশিত করলো, দন্তকৌমুদী ঝকঝক করে উঠলো। চোখ দু'টিও বিস্ফারিত হলো। এবার ইংরিজীতে সে বললো, "মঁসিয়ে, আমার

বাংলার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছে, আমি তোমার কোনও কথা বুঝতে পারছি না। তবে আমি তোমার উপন্যাসের কমলা বউদি এবং সোমনাথ ব্যানার্জির কথা জানি। তোমার 'জন-অরণ্য'র ব্যাপারটা আমার জানা আছে।"

এখন এই অবস্থায় কে সাহিত্য আলোচনায় লিপ্ত হতে চায়? ওদিকে স্বামীজিও আমাকে দূর থেকে ডাকছেন। এই পরিস্থিতির নাম করা যেতে পারে সন্ন্যাসী ও সুন্দরী। আমি কার ওপর নির্ভর করবো তা মুহূর্তের মধ্যে স্থির না করলে দু'জনেই হাতছাড়া হতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি অথৈ জলে।

যে-মেয়ে একটু আগে চমৎকার বাংলা বললো, সে কেন আর বাংলা ভাঁষার ঝক্কি নিতে চাইছে না? ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে হয়ে উঠছে, অথবা জেটভ্রমণে সাধারণত যে বুদ্ধিবৈকল্য ঘটে থাকে আমি তার বলি হয়েছি। আমার উপস্থিতবুদ্ধির ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বিকল।

মেয়েটি বোধহয় আরও নাটকীয় অভিনয়ের জন্যে ট্রেনিংপ্রাপ্তা হয়েছিল। কারণ সরলা বঙ্গবালিকার মতন সে এবার স্বীকার করলো, "মঁসিয়ে, আমি অনেক কষ্টে, অনেক রিহার্সল দিয়ে ওই বাংলা কথাগুলো আয়ত্ত করেছি। মঁসিয়ে সেনগুপ্তার অফিসে কাজ করে আমাদের সবায়ের আরও বাংলা শেখার ইচ্ছা ও কৌতূহল আছে, কিন্তু এখনও শেখা হয়ে ওঠেনি।"

তা হলে মঁসিয়ে সেনগুপ্তর একটা হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। অতএব আমি পুরোপুরি জলে পড়িনি। শুধু প্রমাণ হচ্ছে মঁসিয়ে সেনগুপ্ত ব্যস্ত মানুষ, বিজনেসের তাগিদে হাওড়া-বন্ধুদের এই অভাজনকে অভ্যর্থনা জানাতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

আমার মনোভাব বুঝে হাঁহাঁ করে উঠলো ফরাসি তরুণী। "আমরা এদেশে সারপ্রাইজে বিশ্বাস করি। তোমাকে কী ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে সে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে আমাদের অফিসে ঘন-ঘন মিটিং চলেছে। এই দেখো না, স্টুডিওতে তোমার জন্যে বিশেষ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।"

এবার মহিলার হাতে সুদৃশ্য একটি প্লাকার্ড নজরে পড়লো, যেখানে ইংরিজীতে লেখা আছে ; মঁসিয়ে শংকর, কমলা বউদি সোমনাথের জন্যে চা তৈরি করে অপেক্ষা করছেন।

ফরাসি সুন্দরী এবার কী এক ইঙ্গিত করলেন, এবং হঠাৎ ম্যাজিকের মতন সম্বিৎ ও তার স্ত্রী কাকলিকে পাদপ্রদীপের সামনে দেখা গেলো। আমি সম্বিতের বাবা ও মাকেও এবার দেখতে পেলাম। শুনেছিলাম, এঁরাও অনাবাসী ভারতীয় হয়ে ইদানিং প্যারিসপ্রবাসী হয়েছেন।

সম্বিতের বাবা বললেন, "দেখুন না ওদের দুষ্টুমি। আমি বলেছিলাম, একটা মানুষ কত দূর থেকে জ্বলেপুড়ে আসছেন, তাঁর সঙ্গে রসিকতা কোরো না।

শুনলো না। ওর অফিসের কর্মীরাও বললো, অমন একজন লোক আসছেন, তাঁর জন্যে একটু বিশেষ ব্যবস্থা করতেই হবে।"

ফরাসি সুন্দরীও এতোক্ষণে হাসিতে যোগ দিয়েছে, সেই সঙ্গে সম্বিতের ছেলে সৈকত, যে এখন হাইস্কুলে পড়ছে।

হালে পানি পেয়ে আমার বাঙালি বিক্রম এবার ফিরে আসছে। সদর্পে চারদিকে জমিদারি স্টাইলে তাকিয়ে নিচ্ছি। আমার তল্পিতল্পা অন্য মানুষ বহন করুক। কয়েকজন সায়েব-মেম আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে। বুঝছে কোনও একজন কেষ্টবিষ্টু নিশ্চয়ই ফরাসি ভূমিতে পদার্পণ করেছেন এবং ভক্তপরিবৃত অবস্থায় বিমানবন্দর পরিত্যাগ করছেন। শুধু গলায় একটা মস্ত গাঁদাফুলের মালা থাকলে আমার রাজকীয় ভাবটা পরিপূর্ণ হতো।

সম্বিতের বসবাস প্যারিসের অভিজাত অঞ্চলে। কলকাতা দিল্লি বোম্বাইতে যে যত নতুন ফ্ল্যাটে বসবাস করে তার তত বাহাদুরি। প্যারিস একেবারে উল্টোপথে। দেড়শো দুশো বছরের পুরনো বাড়ি এখানে ডালভাত। দুনিয়ার মধ্যে প্যারিই বোধহয় একমাত্র শহর যেখানে আকাশচুম্বী স্কাই স্ক্র্যাপারের বর্বরতা মেনে নেওয়া হয়নি। ফরাসি এখনও কংক্রিটের ফ্ল্যাটবাড়িকে বস্তিবাড়ি বলে মনে করে—বম্বেতে বসবাস করে জাত-ফরাসি কখনও সুখ পাবে না। ফরাসির বাড়িগুলো বাইরে থেকে সেকেলে হয়ে রয়েছে, কিন্তু যত পুরনো তত খানদান। ফরাসির আধুনিকতা অন্দরমহলে, বহিরঙ্গ সে-ইতিহাসকে সম্মান করে চলেছে।

প্যারিসে যেসব পুরনো বাড়ি জাঁকিয়ে বসে আছে, অন্য যে কোনও শহরে প্রপার্টি ডেভালপাররা সেসব কোনকালে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে ফেলতো। প্যারিসে কিন্তু তা আদৌ সম্ভব নয়—ইতিহাসের গায়ে কেউ আঁচড়টি পর্যন্ত কাটলে ফরাসি সরকার তার ওপর নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সম্বিতের বাড়িটা বোম্বাই এবং দিল্লির পরিমাপে তাই একটু নিরেস, অনকটা কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির মতন। কিন্তু ফরাসি পরিমাপে এইখানে বসবাসই সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন। রাস্তার নামকরণেও প্যারিস তুলনাহীন। গত এক হাজার বছরে মানুষের ইতিহাসের প্রায় সমস্ত কেষ্টবিষ্টুর

নাম প্যারিসের স্ট্রিট-ডিরেকটরিতে ঢুকে গিয়েছে। সাধুসন্ত থেকে রাজা মহারাজা জেনারেল সাহিত্যিক শিল্পী সবাই স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছেন, আমাদের মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত। সম্বিৎ যে রাস্তাটিতে থাকে তার নাম হয়েছে এক ফরাসি স্বদেশপ্রেমীর নামে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানের সঙ্গে লড়ে অসাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন এই মানুষটি।

সম্বিতের বাড়ির লিফট রীতিমত পুরোনো—অনেকটা কলকাতায় রাজভবনের ঐতিহাসিক লিফটের মতন। এই লিফটের খানদান আছে ফরাসির কাছে, গতি যত শ্লথ ইজ্জত তত বেশি! এই লিফট একটু মেজাজিও বটে। নতুন অতিথিকে দেখে বোধহয় তেমন সন্তুষ্ট হলো না, কিছুতেই গতর নেড়ে উঠতে চাইলো না। অনেক সাধ্যসাধনা করে বোতাম টিপে যখন ফরাসি লিফটের সহযোগিতা পাওয়া গেলো না তখন সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছি। অমনি ফরাসি লিফট সচল হয়ে প্রমাণ করলো লিফটের শরীর ঠিক আছে, আপত্তি কেবল যাত্রীতে। এবার সম্বিতের বাবা লিফটটাকে আবার নামিয়ে এনে আমাকে ফিরে আসতে আহ্বান করলেন। আমিও বোকার মতন ফিরে এলাম। আমাকে দেখে লিফট আবার নট নড়নচড়ন, কিছুতেই তার মানভঞ্জন করা গেলো না। আমি আবার সিঁড়ি ধরলাম। বলাবাহুল্য লিফট পরমুহূর্তেই সচল হয়ে নিজের ডিউটিতে মনঃসংযোগ করলো।

অন্দরমহলে ঢুকে মনে হলো না বিদেশে এসেছি। ঠিক যেন হাওড়াতেই বসে আছি।

সম্বিতের বৈঠকখানা ঘরে এখন শহিদনগর এবং হাওড়া-শিবপুরের মহামিলন। বাইরে বোধহয় বৃষ্টি নেমেছে, কিন্তু আমরা বিচলিত নই—যে বৃষ্টি আমরা শহিদনগর, নৈহাটি, কাসুন্দিয়া ও শিবপুরে দেখেছি সেই বৃষ্টিই প্যারিসে তার গাঁয়ের লোকদের দেখতে এসেছে। বৃষ্টির অনেক সুবিধে, পাসপোর্ট লাগে না, ভিসা লাগে না, স্পন্সর লাগে না, এরোপ্লেনের টিকিট লাগে না, ইমিগ্রেশন পুলিশের রবার স্ট্যাম্প লাগে না—দুনিয়ার সর্বত্র তার অবাধগতি। একদিন সমস্ত মানবসমাজ হয়তো একই স্বাধীনতা পাবে—বিজ্ঞান ও ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদে সমস্ত দূরত্ব ঘুচে যাবে।

সম্বিতের বাবার দিকে আমি তাকাচ্ছি, এই ভদ্রলোককে আমার কখনও দেখা হয়নি। শুধু শুনেছি, রাজনীতির তাগিদে জেলে আনাগোনা করতে করতেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছেন, সংসারে থেকেও অনেকটা সন্ন্যাসীর মতন অবস্থান। অথচ এই লোকই একদিন প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এক পরিবারের বিদুষী মহিলাকে, যিনি হাসিমুখে পরিবারের সব দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়ে দেবী দশভুজার মতন দারিদ্র্যরূপী মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রাম

করেছেন। সেই সংসারে শুধু স্বামী ও সন্তান ছিল না, ছিল শাশুড়ির এবং স্বামীর কিছু আত্মীয়স্বজন। দীর্ঘ এই সংসার প্রায়ই বাঙালির সংসারে ব্যর্থতা ডেকে আনে, পরিণতিটা যে বিয়োগান্ত হবে তা ধরেই নেওয়া হয়। তাই আমাদের সাহিত্যে, আমাদের নাটকে, আমাদের চলচ্চিত্রের প্রায়-সব পরিণতিই বিয়োগান্ত।

কিন্তু আমার চোখের সামনে ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। এই তো প্যারিসের অভিজাত অঞ্চলে একটি সুখী, সফল, সার্থক রিফিউজি পরিবার। সম্বিতের বাবা প্যারিসে এসেছিলেন, চোখের চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ফরাসিরা যে সম্প্রতি অভাবনীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে তা আমাদের কানে এখনও পৌঁছয়নি। সারা ইউরোপে ফরাসি ডাক্তারের এখন প্রবল প্রতিপত্তি। সম্বিতের বাবা বললেন, "চোখটা যে ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি। বিজ্ঞানের কী অভাবনীয় অগ্রগতি। আমার অপারেশন হলো অথচ রোগীর শরীরে ডাক্তার ছুরি বসালো না। কাটাকুটি তো দূরের কথা, আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না সার্জেন। যন্ত্রের মাধ্যমে লেজার রশ্মি পাঠিয়ে কয়েক মুহূর্তে অপারেশন শেষ হলো, আমি মন্ত্রবলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। এবার আমি ঘরমুখো হতে চাই।"

সম্বিতের বাবা আরও বললেন, "আপনারা আমাদের দেশের মানুষকে বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে অনুপ্রাণিত করুন।" তিনি বলতে চাইলেন, একালের মানুষের মুক্তি ধর্মে নয়, রাজনীতিতে নয়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে। জাতির সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভা যদি টেকনলজিতে এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের দিকে প্রবাহিত হয় তা হলে হয়তো আমাদের দারিদ্র্য ঘুচবে, আমাদের কষ্ট কমবে এবং স্বভাবতই বহু মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে। বিজ্ঞান এই যুগে মানুষকে যা দিতে পারে আর কেউ পারে না। মানুষ যত বিপন্ন যত দরিদ্র তত প্রয়োজন বিজ্ঞানের মন্ত্রকে। বিজ্ঞান এখন আর ধনী দেশের ক্রীতদাস নয়, সমগ্র মানবসমাজের জীবন দেবতা।

সম্বিতের মায়ের দিকে তাকালাম। কে বলবে এই মানুষটি প্রায় চার দশক ধরে নিজেকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত রেখে সংসারের জন্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাভিক্ষা করে এসেছেন? এই জননীই তো বঙ্গজননী, এর প্রতিমা গড়েই তো পূজা করা হয় মন্দিরে-মন্দিরে। এই মায়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার ফোনে কথা হয়েছে, পত্রালাপ হয়েছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হয়নি।

সম্বিতের মা ইতিমধ্যেই ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বললেন, "চমৎকার মানুষ এরা। এদের আপন করে নিতে তোমারও কোনও কষ্ট হবে না, বাবা। এদেরও দুঃখ আছে, এদেরও অনেক কষ্ট আছে, যেমন আছে শহিদনগরে, নৈহাটিতে। আমি তো দেশের সঙ্গে কোনও তফাত দেখলাম না। আমাকে বাবা, একবার এ-পাড়ায় ফুলওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়ছিল, কত রকমের গল্পগুজব হতো। আমাকে নেমন্তন্ন করেছে কফি খেতে। আমরা তো কাল চলে যাচ্ছি।”

আমি বললাম, “আপনি কি এ-দেশেই বসবাস করবেন?”

হাসলেন সম্বিতের মা। “আমার বউমা তো তাই চাইছে। এদেশে দীর্ঘদিন থাকার অনুমতিও রয়েছে। কিন্তু আমি বাবা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।”

শুনলাম, শিক্ষিকা জীবন থেকে সম্বিতের মা সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। এবার তিনি নৈহাটি থেকে কিছু পেনসন পাবেন। ‘সম্বিৎ আমাদের কোনও অভাব রাখেনি। তবু স্কুল-টিচারের পেনসনটা বেশ ভাল লাগে। আমি কয়েক হাজার টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডও পেয়েছি। একটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি, সম্বিৎকে নমিনি করেছি, ওকে কাগজগুলো দেখাতে গেলাম ও নজরই দিলো না।” মা বোধ হয় খেয়াল করতে পারছেন না, তাঁর ছেলে (গহনা বিক্রি করে যাকে তিনি প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন) সে এখন সফল অনাবাসী—সে এখন জার্মান গাড়িতে ঘুরে বেড়ায়, তার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বহু বিদেশি চাকরি করে।

সম্বিৎ এই সাফল্যকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে নিতে সমর্থ হয়েছে, যা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সাফল্য প্রায়ই মানুষকে তার অতীত থেকে এবং অতীতের পরিচিতজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর্থিক বৈষম্য এবং কাজের অত্যধিক চাপ এবং নতুন মানসিকতা এই দূরত্বের সৃষ্টি করে। অনেকের কর্তব্যবোধ অবশ্য সজাগ থাকে, তাই অতীতের প্রিয়জনদের জন্য আর্থিক দাক্ষিণ্য তাঁরা দেখান কিন্তু কিছু টাকা বা উপহার পাঠিয়েই যেখানে দায় শেষ হয় সেখানে সম্পর্কের উষ্ণতা থাকে না। আমি দেখেছি অনেক সময় এর থেকে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অতীতের প্রিয়জনরা প্রায়ই কড়ি দিয়ে কেনা হতে ভালবাসেন না, তাঁদের সফল প্রিয়জনদের কাছ থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা করেন।

সম্বিৎ সেদিক দিয়ে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রম। কারণ ইউরোপ আমেরিকার বাঘা-বাঘা বিজনেস এগজিকিউটিভের সঙ্গে মার্কেটিং সম্পর্কে জটিলতম আলাপ-আলোচনায় জয়ী হয়েও সে নিজের বাড়িতে শহিদনগরের মানসিকতায় ফিরে যেতে ভালবাসে। প্রতিদিনের এই ঘরে ফেরাটুকুই ওর বিলাসিতা। সেই সময় তার জীবনের সবচেয়ে বড় নায়িকা তার নব্বুই বছরের ঠাকুমা, বহু কষ্ট ও বহু শোক সহ্য করে যিনি শহিদনগরের কলোনিতে এখনও বসবাস করেন। সম্বিতের আরেক হিরোইন অবশ্যই তার মা, তিনি তার বান্ধবীও বটে। দু'জনের মধ্যে গল্পগুজব মন দিয়ে শোনার মতন। আত্মীয়দের দৈনন্দিন খবরাখবর সংগ্রহ করে, এঁদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করে সে সুখ পায়। সম্বিৎ বলে, এর মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই। তার সৃষ্টিশীলতার পক্ষে এই নাড়ির টান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নিজের শিকড়কে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বিদেশে কোনও ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় না। নিজের জন্মগত স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়েও বিদেশের বৈশিষ্ট্যকে যে হজম করতে পারে তারই বিজয়ী হবার সম্ভাবনা আজকের ডিজাইনিং রঙ্গমঞ্চে। যে দু'একজন জাপানি প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের সাফল্যের রহস্য ওইখানেই। একই পথ অনুসরণ করেছিলেন একালের সবচেয়ে বিখ্যাত ডিজাইনিং গুরু রেমন্ড লুই যিনি ফরাসি দেশ ত্যাগ করে মার্কিন প্রবাসী হয়েও তাঁর ফরাসিত্ব বিসর্জন দেননি। একজন প্রবাসীর চোখেই তিনি নতুন বিশ্বের শিল্পকে ফরাসি সৌন্দর্যসুষমায় ভরে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

শহিদনগর কলোনির সেনগুপ্ত পরিবারকে কার্পেটে মোড়া প্যারিসের শীততাপনিয়ন্ত্রিত ড্রয়িংরুমে বসিয়ে আমি স্নানপর্বটা সেরে নিতে চললাম। সেকালের বড়লোকদের বাড়ি, কিন্তু পরিকল্পনা দেখলেই বোঝা যায় ফরাসিরা বাঙালির মতনই কখনও কলঘরের দিকে নজর দেয়নি। অনেক ফরাসি বাড়িতে তো বাথরুমের ব্যবস্থাই ছিল না। স্নানের ব্যাপারে যে দেশের যত অনীহা সে দেশের পারফিউমারি ব্যবসা তত রমরমা। আরও একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গেলো, ফরাসি এখনও সাবেকি বাঙালির মতন স্নানঘরে এবং টয়লেটের একীকরণ পছন্দ করে না। দু'টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ফরাসিকে সুখ দেয়। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো ঘরের লাগোয়া অথবা ঘরের ভিতরে কলঘর ফরাসির প্রিয় নয়।

অপ্রিয় সত্যটা হলো, স্নানটা ইউরোপীয় স্বভাবের পরিপন্থী ছিল। এই সেদিনও ইউরোপীয়দের বিশ্বাস ছিল রোজ স্নান করলে কঠিন ব্যামো অনিবার্য। এহেন সায়েবকে পরিচ্ছন্নতার প্রথম বাণী শোনালো ভারতবর্ষ। নেপোলিয়ান বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটন নিত্যস্নানের স্বভাবটি ভারতবর্ষ থেকে ইংলন্ডে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে তা ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের সাবান কোম্পানিগুলোর ভারতবর্ষের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

স্নান সেরে শরীর ঠাণ্ডা করে পিত্ত প্রশমনের জন্য চা সহযোগে কিছু জলযোগ করা গেলো। সম্বিতের মা বললে, "আমার বউমা কীরকম ওয়ার্ল্ড ক্লাশ রাঁধুনি তার প্রমাণ তুমি পাবে। ফ্রান্স এবং ইন্ডিয়া যদি কোথাও সমান সম্মানে মুখোমুখি হতে পারে তা হলো কাকলির রান্নাঘরে।"

আমি বললাম, "পৃথিবীর ইতিহাসে বার-বার প্রমাণিত হয়েছে যে সংহতির সূচনা হতে পারে কেবলমাত্র রান্নাঘরে (এবং বেডরুমে!)। খেলার মাঠে, জনসভায়, সেমিনারে ওসব কাজ হয় না মোটেই। বরং প্রতিযোগিতার গরমে প্রায়ই দূরত্ব বাড়তে থাকে। রসনাই মানুষের হৃদয়ে পৌঁছনোর সহজতম পথ।"

সম্বিতের বাবা তাঁর জবরদখল কলোনির স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি।

প্যারিসে বসেও তিনি দুঃখ করলেন, লেডি মাউন্টব্যাটেনের প্রভাবে জওহরলাল নেহরু বাংলা ভাগ করে দিলেন, গণভোটের ব্যবস্থা নিলেন না। তাঁর ধারণা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এখনও প্রবহমান রয়েছে, নতুন ভারত এখনও জন্মায়নি। স্বাধীনতার স্বাদ কেবল রাজধানীর কর্তাব্যক্তিরা পেয়েছে, ভারতের জনগণ এখনও সেই অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত।

সম্বিতের বাবা বললেন, "এখানকার কাগজগুলো মন দিয়ে পড়বেন, অন্তত ইংরিজী ফিনানসিয়াল টাইমস। এখন ইংলন্ড ও ফরাসিদের মধ্যে অঘোষিত এক যুদ্ধ চলেছে, এর নাম ভেড়ার যুদ্ধ, ল্যাম্ব ওয়্যার।"

এখনকার ভয়ঙ্করতম যুদ্ধগুলো আর রণক্ষেত্রে হয় না প্রায় সবই বাজারের যুদ্ধ। কে কোন দেশকে কী মাল গছাবে তার সংগ্রাম। যেমন ইংলন্ড ফ্রান্সকে ভেড়া পাঠাচ্ছে সস্তায়। ফরাসি চাষা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না, তাই মেজাজ স্বভাবতই সপ্তমে উঠেছে। ভেড়ার গাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কয়েক শ' ভেড়া গাড়ির মধ্যে জ্যান্ত রোস্ট হয়েছে। ইংরেজও ভেড়ার এই অনাদর সহ্য করবে না। তারা ভাবছে সুপারমার্কেটে ফরাসি জিনিস বর্জন করবে কি না। স্বদেশি যুগে ইন্ডিয়ানের বিদেশি বর্জন নীতি এখন দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোনও আশাপ্রদ ঘটনা নজরে পড়েছে কিনা?"

সম্বিতের বাবা উত্তর দিলেন, "জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং এই সব এশিয়ান টাইগাররা প্রাচ্যের মুখ রক্ষা করছে। ওইসব দেশ থেকে তরিতরকারি এবং ফল পর্যন্ত আসছে প্যারিসের বাজারে। অনুপস্থিত কেবল ইন্ডিয়া। কারণ কী তা আমি জানি না।"

সম্বিতের বাবা বললেন, "অনেক যুদ্ধ এবং লোকক্ষয়ের পর ইউরোপের চৈতন্যোদয় হয়েছে। সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে কীভাবে মিলেমিশে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় তা এরা অনেক মাথা খাটিয়ে বের করে ফেলেছে। এদের জয় অবশ্যম্ভাবী, এরা ভবিষ্যৎকে নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। ভেড়ার যুদ্ধেরও একটা মিটমাট হয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "আমরাও তো প্ল্যানিং করছি দেশের উন্নতির জন্যে।"

সম্বিতের বাবা উত্তর দিলেন, "কিছু মনে করবেন না, ছোট মুখে বড় কথা। আমাদের দেশের প্ল্যানিং হলো গোবি মরুভূমিতে কয়েক ঘটি জল ঢালার প্রচেষ্টা— যত টাকা ঢালা প্রয়োজন তার সহস্রাংশের একাংশও আমরাও নিয়োগ করছি না। আর একটা চিন্তার কারণ, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে দুনিয়ার লোকের ধারণা হতে চলেছে, প্ল্যানিং ইকনমি মাত্রই বোধহয় বোগাস ইকনমি।"

আরও কথা হতো কিন্তু সম্বিতের স্নেহপ্রবণ মা বললেন, "তোমার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। আমরা বুড়োবুড়িরা তো আগামীকালই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি, তুমি যখন এদেশ দেখে কলকাতায় আসবে তখন কথা হবে।"

বিশ্রামের প্রস্তাবটা মন্দ লাগছিল না। অনেক পথ তো পেরিয়ে আসা গিয়েছে। আমার হাতের ঘড়িতে ভারতীয় সময় অনুযায়ী এখন মধ্যরজনী সুতরাং একটু নিদ্রাসুখ মন্দ কী?

কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে গৃহকর্ত্রী কাকলি একটু মুচকি হাসলো। এই স্নেহময়ী যে আমার প্রতি বিরূপ হতে পারে তা আমার কল্পনাতীত। সে সোজাসুজি জানিয়ে দিলো, "যে-লোকের পাল্লায় আপনি পড়েছেন তাতে অনেক কষ্টই পাবেন। আপনার রাতের ঘুম পর্যন্ত কেড়ে নেবে।"

"মানে?"

সম্বিতের গৃহিণী বললো, "সম্বিতের কোনও নজর থাকে না ঘড়ির দিকে। সারা দিন অফিসের কাজ করবে তারপর সন্ধেবেলায় আপনাকে প্যারিস দেখানোর নাম করে নিজে প্যারিস দেখতে বেরুবে। তারপর ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে অফিসের কাজকর্ম শুরু করে দেবে।"

সম্বিৎ বললো, "প্যারিসের স্বভাবই এই। দুনিয়ার মানুষের চোখের ঘুম কেড়ে নেবার জন্যেই তো প্যারিসের জন্ম হয়েছে।"

কাকলি সস্নেহে বললো, "আপনাকে বলে দিচ্ছি, আপনি নিজের মতন চলতে লজ্জা পাবেন না, ও আপনাকে যাই বলুক।"

সম্বিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "প্রথম দিনেই এই সময় ঘুমোতে গেলে প্যারিসের অপমান। আমরা দু'জন এখনই একটু বেরুবো। প্যারিসের সঙ্গে শিবপুরের শুভদৃষ্টিটা আজই সেরে ফেলা দরকার।"

সম্বিতের বাবা ও মা দু'জনেই মৃদু হাসলেন। "আমরা বুড়োবুড়ি ভাতডাল খেয়ে একটু গড়িয়ে নেবো। কাল আমাদের জন্যে রয়েছে দীর্ঘ বিমানভ্রমণ।"

সম্বিৎ এবার গৃহিণীকে তাগাদা দিলো, "দেরি কোরো না, খেতে দাও। আমরাই পৃথিবীর একমাত্র বোকা যারা ঘরের খেয়ে প্যারিসের দোকান দেখতে বেরুচ্ছি।"

অবাক কাণ্ড। আমার সাতান্ন বছরের পুরনো হাড়ে যৌবনের হাওয়া লেগেছে। জেটক্লান্তি ডোন্টকেয়ার করে আমি এখনই সম্বিতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে প্রস্তুত।

পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হউক বাঙালির নাম। যে প্যারিস আমাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছে তাই দেখতে বেরিয়ে পড়েছি।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, গ্রাম দেখতে হয় দিনে আর শহর দেখতে হয় রেতে। সূর্য না ডুবলে শহরের প্রকৃত চেকনাই বেরোয় না।

শহিদনগর ও হাওড়া যে-বাহনটিকে ভর করেছে তার নাম মার্সেডিজ বেন্‌জ, সমস্ত দুনিয়ার সম্মানিত জার্মান গাড়ি। অমন যে ফরাসি, যার জার্মান বিরক্তি ভুবনবিদিত, সেও তার তার রাজপথে মার্সেডিজকে খাতির করে। সম্বিৎ রসিকতা করলো, "শহিদনগরে জন্মালে কী হয়, নজরটা ছিল খানদানি, তাই পলিসিটাও ছিল মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার, থাকি তো পারি, চড়ি তো মার্সেডিজ।" যতদিন মার্সেডিজ কেনবার মতন সামর্থ্য না হয়েছে সম্বিৎ ততদিন গাড়ির মালিক হয়নি।

শিবরাম চক্রবর্তীর দুই অবিস্মরণীয় হাসির চরিত্র ছিল—হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন। এরা দু'জনে কলকাতা শহর ঘুরে দেখতে গিয়ে অনেক হাস্যকর হাঙ্গামায় পড়েছিল। আমার মনে হলো শহিদনগর ও হাওড়ার হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটি প্যারিস দেখতে বেরিয়েছে। কিন্তু সে কথা বলবার উপায় নেই, কারণ সম্বিৎ প্যারিস শহরটাকে তার হাতের চেটোর মতন চেনে। প্যারিসের রাজপথ ধরে সে নির্ভাবনায় এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। যেতে-যেতে সে ধারাবিবরণী দিচ্ছে। কয়েক ডজন ফরাসি নাম আমার কানে ধাক্কা দিয়ে সরে গেলো। এই শহরকে আজ শুধু চোখের-দেখা দেখা, এর অন্তরে এখনি প্রবেশ করা যাবে না। সম্বিৎ বললো, "সারা জীবন থাকলেও প্যারিসকে ঠিক চেনা যায় না।"

চেনা আলোকমালায় যে প্যারিস আমরা দেখছি সেখানে এই মুহূর্তে হাজার-হাজার ট্যুরিস্টের ভিড়। আমেরিকান, ইংরেজ, জার্মান সবাই ফরাসিদের নিন্দে করবে কিন্তু প্যারিসে না এসে পারবে না। তাই এই নগরীতে কত যে হোটেল আছে তা কেউ জানে না।

সম্বিৎ বললো, "বাড়িতে অনেক বই আছে, পড়ে নেবেন। সেই সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় চারশ বছর প্যারিস দুনিয়ার রাজধানী হয়ে বসে আছে।

এখানে প্রতি পদে-পদে ইতিহাসের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি হবে আপনার। প্যারিসের ক্ষতি করতেও যারা আসে তারাও এই শহরের মোহিনীমায়ার প্রেমে পড়ে যায়।"

আমি ইতিমধ্যেই কিছু বই হজম করেছি। বিশেষ করে ইংরেজ ও আমেরিকানদের লেখা যাঁদের ফরাসি প্রীতি সন্দেহজনক। আমি বললাম, "জানো, সিভিলাইজেশন শব্দটির উৎপত্তি এই ফরাসি দেশে। আদিতে এর নাকি অর্থ ছিল বর্বরতা থেকে বেরিয়ে আসা, আর্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং মনুষ্যত্বে উন্নীত হওয়া।"

ভিকটর হুগো তারই রেশ ধরে বলেছিলেন, "ফ্রান্স তুমি না থাকলে পৃথিবী ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে।" আমার হঠাৎ মনে হলো এই কথা তো আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও খাটে। আমাদের এক বাঙালির পো তো বিদেশে বসেই ঘোষণা করেছিলেন, ইন্ডিয়া না বাঁচলে কে বাঁচবে? ইন্ডিয়া বেঁচে থাকলে কে মরবে? এখন অবশ্য দুনিয়ার লোক এ-কথা আর বিশ্বাস করবে না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও ব্যাপারেই একালের ভারতবর্ষ কোনও বিশেষত্ব দেখাতে পারেনি। দুনিয়ার প্রতি ছ'জন মানুষের একজন ভারতীয়, তবু ভারত-সভ্যতার মর্মবাণী পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

সম্বিৎ বললো, "বইতে পড়েছি ফরাসিরা একসময় ভীষণ উদ্ধত ছিল। গুস্তভ ফ্লবেয়ার বলেছিলেন, "ফরাসিরাই হচ্ছে দুনিয়ার এক নম্বর।"

সম্বিৎ যা বললো না ফরাসি কবিদের ধারণা ছিল, ফরাসিকেই ঈশ্বর সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। আর এই সেদিনও ফরাসি সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে দ্য গল বললেন, "ফ্রান্সই হলো পৃথিবীর আলো। পৃথিবীতে এমন জায়গা নেই যেখানে মানুষ কোনও না কোনও সময়ে ফ্রন্সের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে তার বক্তব্য শোনবার জন্যে। ফ্রান্স হওয়াটাই মস্ত এক দায়িত্বের ব্যাপার।"

ইংরেজ সায়েবদের দুঃখ, দ্য গ্যল তাঁর জাতভাইদের মাথা গরম করে গিয়েছেন চিরতরে। তিনি বলেছেন, ফরাসিরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচেয়ে ইমপর্টান্ট। এই রকম একটা ভুল ধারণা কোনোসময় বাঙালিদের মধ্যেও ঢুকে গিয়েছিল।

গাড়ি চালাতে-চালাতে সম্বিৎ বললো, "দ্য গল নিজের জাত সম্বন্ধে আড়ালে যা বলতেন তাও ইদানিং ফাঁস হয়ে গিয়েছে। তিনি বলতেন, ফরাসিরা হলো ভেড়া। কিন্তু জনসমক্ষে ছিল তাঁর অন্য সুর।"

আমি বললাম, ইংরেজ ও আমেরিকানরা চান্স পেলেই নিন্দা করেছে ফরাসির। এখনও তারা মুখ বন্ধ করেনি। তাদের কয়েকটা বক্তব্য : ফরাসিরা পরস্পর-বিরোধী কাজে দক্ষ। মুখে তাদের শান্তির বাণী, কিন্তু বিদেশে অস্ত্র বিক্রি করার ব্যবসায়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার পরেই তার স্থান। সাম্য মৈত্রী

স্বাধীনতার দেশ সুযোগ পেলেই বহু কলোনি কব্জা করে নির্লজ্জভাবে শোষণ চালিয়েছে। তবু, যারা জোটনিরপেক্ষ হবার স্বপ্ন দেখে তারা ফ্রান্সের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখায় ফরাসি দুনিয়ার মাস্টারমশাই! দুই বিদ্যমান পক্ষের সঙ্গেই চমৎকার সম্পর্ক রাখতে পারে ফ্রান্স। দৃষ্টান্ত ইরানের আয়াতোল্লা খোমেইনি প্যারিসের উপকণ্ঠে নির্বাসিত জীবন কাটাতে-কাটাতে ইরানের বিপ্লবে ইন্ধন জুগিয়েছেন। আবার ইরানের শা যখন গদিচ্যুত হলেন তখন তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন।

আর একজন আমেরিকান লিখেছেন, হেরে গিয়েও কী করে জিততে হয় তার কৌশল ফরাসির মতন কেউ জানে না। ওয়াটারলু থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানির সঙ্গে আঁতাত তার বড় প্রমাণ। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে, যেখানে নেপোলিয়ন নির্বাসিত অবস্থায় শেষজীবন কাটালেন, চার মাইল লম্বা পাথরের দেওয়াল ঘেরা এক ফরাসি অঞ্চল আছে। ১৮৪০ সালে নেপোলিয়নের দেহাবশেষ যখন ফরাসি দেশে পাঠানো হলো তখন ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়া ওই নির্বাসনপুরীকে ফরাসি সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন!

আর একজন আমেরিকান সাহস করে ফরাসি ভাষার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তিনি লিখছেন, স্বদেশে সাড়ে পাঁচ কোটির বাইরে দুনিয়াতে দশ কোটি লোকও ফরাসি জানে না, অথচ ইংরিজী জানে ১০০ কোটি লোক। সংখ্যার হিসেবে ফরাসির কোনও প্রতিপত্তিই নেই। ম্যান্ডারিন চাইনিজ ভাষা জানে ৮০ কোটি লোক। তারপর রয়েছে স্প্যানিশ, হিন্দি, আরবি, বাংলা, রাশিয়ান। দুনিয়ায় যত লোক ভাল ফরাসি ভাষা জানে তার থেকে বেশি লোক ভাল জার্মান জানে। তবু ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরঁ সগর্বে বলেন, আমরা যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা একদিন সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতি হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রাখে।

আরও বিপজ্জনক একজন মার্কিনি লেখকের ধারণা, নিজের দেশে সাড়ে পাঁচ কোটি ফরাসি, আর দুনিয়ার সমস্ত হিসেব নিলে বড় জোর আরও লাখ পনেরো। এর মধ্যে দু'লাখের বসবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং সমসংখ্যায় খোদ জার্মানিতে।

সংখ্যায় মাত্র সাত কোটি হলে কী হয়, তোকিয়াভেলি লিখেছেন, "ইউরোপের সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ হলো এই ফ্রান্স। একে কখনও তারিফ করতে হয়, কখনও ঘৃণা করতে হয়। এই দেশর জন্যে কখনও ভয়, কখনও অনুকম্পা, কখনও উদাসীনতা জমে ওঠে।"

সম্বিৎ একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, মুহূর্তের অসাবধানতায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ড্রাইভার হিসেবে ফরাসির তেমন সুনাম নেই বিশ্বসভায়। আমি বললাম, 'দু'দিনের জন্যে এসে তো এ জাতের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবো না। কিন্তু এটা কি সত্য, ফরাসি সবসময় কারও নিন্দে করতে চায়? হয় অফিসের কর্তা,

কিংবা কাজ, কিংবা সরকার, কিংবা পুঁজিবাদী কাউকে? বাঙালির মতন ফরাসিও কখনও নিজের ভুল খুঁজে পায় না, সব সময় দোষটা কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।"

গাড়ির চালক আপত্তি করলো। "ফরাসি আজকাল রীতিমত আত্মসমালোচনা করে। তবে একেবারে বাঙালির মতন, বাইরের কেউ নিন্দে করলে তার আঁতে লেগে যায়। আপনি যাই বলুন, বাঙালির মতন আত্মসমালোচনা দুনিয়ায় কেউই করে না। ব্যাপারটা আত্মনিগ্রহের পর্যায়ে চলে গিয়ে জাতের ক্ষতি করেছে। বাঙালিকে আর নিজেকে আঘাত করতে দেবেন না। এখন প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের, যা ফরাসিরা পেয়েছে দ্য গলের কাছ থেকে এবং ইদানিং মিতেরঁর কাছ থেকে। সংখ্যাতে যতই কম হোক, ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির জয়জয়কার কিন্তু সারা বিশ্বে। আপনি মিতেরঁর ব্রাজিল ভ্রমণের গল্প শুনেছেন? আকাদেমি ব্রাসিলেরাতে বক্তৃতা দেবার সময় দোভাষী নিয়ে যাওয়ায় ওদের খুব অভিমান হয়। অপমানিত বোধ করে একজন আকাদেমি সভ্য বলেন, ফরাসি প্রেসিডেন্টের জানা উচিত ছিল, প্রত্যেকটি সংস্কৃতিবান লোক বাল্য বয়স থেকেই ফরাসি শেখে।"

যাই হোক, জগৎ-সভ্যতার নাভিকেন্দ্র বলতে এখনও বহু মানুষ ফরাসিকেই যখন মেনে নেয় তখন আমাদের আপত্তি কী? ইংরেজ আমাদের যা জ্বালিয়েছে তার শতাংশের একাংশ যন্ত্রণা ফরাসি আমাদের দেয়নি। সুতরাং জয় হোক ফরাসি, জয় হোক প্যারি নগরীর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে এই শহরকে রক্ষা করে ফরাসি সাময়িকভাবে নিজেদের মুখে চুনকালি মাখালেও আখেরে মানবসমাজের মহা উপকার করে গিয়েছে। হাজার বছরের ইতিহাস অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে।

একজন বেপরোয়া ও বেহিসেবি ট্যাক্সি-চালকের গোঁত্তা থেকে নিজের গাড়িকে সুনিপুণভাবে বাঁচিয়ে সম্বিৎ রসিকতা করলো, "এখানে দীর্ঘদিন থেকে গিয়ে আপনার গবেষণা করা উচিত। আমার স্থির বিশ্বাস, ইতিহাসের কোনো এক অনালোকিত অধ্যায়ে বাঙালিরা ফরাসি দেশে বসবাস করেছিল। না হলে বাঙালি ও ফরাসির এমন চরিত্রগত মিল কীভাবে হয়?"

যেমন ধরা যাক বকবকানি। অহেতুক বকতে এবং গালগল্প করতে বাঙালি এবং ফরাসি উভয়েই পটু। এই অভ্যাস ফরাসি হাসপাতালের নার্সদের মধ্যেও সংক্রামিত। একজন রোগী রাত সাড়ে-তিনটের সময় দুই ফরাসি নার্সের গালগল্পে ঘুম ভেঙে অস্থির হয়ে উঠলেন। যখন তিনি ওই দুই মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, অমনি ওঁরা বললেন, "আমরা কাজের কথা আলোচনা করছি। এই সব আলোচনা বন্ধ হলে তোমাদের চিকিৎসা কীভাবে হবে মঁসিয়ে?"

ফরাসি ভব্যতা এখনও দুনিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মেক-আপে সুসজ্জিতা

মহিলাদের তোয়াজ করার জন্য যত শব্দ ফরাসি ভাষায় আছে দুনিয়ার সমস্ত ভাষা একত্র করলেও তার অর্ধেক পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই ফরাসিই মেট্রোতে বৃদ্ধাদের সঙ্গে দুর্বিনীত ব্যবহার করে, বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না দেখেও সীট ছাড়বার সৌজন্য দেখান না।

কথায় আছে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে ইংরেজ তার স্বাভাবিক সৌজন্যে নিজেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়। ফরাসি আপনার পাও মাড়াবে আবার কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করবে।

খরিদ্দার লক্ষ্মী, এই প্রবাদে ফরাসি-দোকানদার বিশ্বাস করে না। জিনিস বিক্রি করেই খরিদ্দারকে উদ্ধার করছে এমনভাব আজকাল অনেক দোকানে দেখা যায়। কলকাতায় এই বদনাম এতদিন কিছু বাঙালি দোকানদারের ছিল। এখন উত্তর ভারতীয়দের মধ্যেও এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু কিছু হিন্দুস্থানি দোকান মালিকের কমবয়সী ছেলে ইয়ারবন্ধু নিয়ে গল্পগুজবে এমনই মগ্ন থাকে যে খরিদ্দারের কথা আর মনেই পড়ে না।

এবার শুনুন ফরাসি পুলিশের গায়ে হাওয়া লাগানোর গল্প। চরিত্রগুলোকে যদি স্বদেশেও আপনি দেখে থাকেন তা হলে আশ্চর্য হবার নয়। ব্যাংক ম্যানেজারের পেটে গুলি মেরে টাকা লুঠ করে ডাকাত এক মহিলার গাড়িতে তড়াং করে উঠে পড়ে তাঁকে গাড়ি চালাতে বাধ্য করলো। বেশ কিছু দূরে গিয়ে গাড়ি ট্রাফিক জ্যামে পড়লো। তখন ডাকাত ওই মহিলাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলো। ভদ্রমহিলা ছুটতে-ছুটতে কাছের এক থানায় গেলেন। কর্তব্যরত পুলিশ সব শুনে মহিলাকে বললো, ডাকাতি যদি বুলেভার্ড ভোলতেয়ারে হয়ে থাকে তা হলে যেতে হবে অন্য এক থানায়। ভদ্রমহিলা হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, আপনি চেষ্টা করলে এখনও ডাকাতকে ধরতে পারেন। পুলিশ ঠাণ্ডাভাবে উত্তর দিলো, মহাশয়া ওটা এই থানার কাজ নয়।

জার্মান ও ফরাসি বিদেশে কাজ করতে গেলে জার্মান অপ্রিয় হয়ে ওঠে আর ফরাসির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। কারণ স্থানীয় কর্মীদের জার্মান বলে, তাড়াতাড়ি করুন, আমি কীভাবে কাজ করছি দেখে হাত চালান। ফরাসি ওই হাঙ্গামায় যায় না। সে নাকি বলে, আপনার নিজের মতন আপনি চলুন, তা হলেই আমাদের সঙ্গে আপনাদের কোনও পার্থক্য থাকবে না।

সম্বিৎ বললো, "এসব অন্য যুগের ফরাসিদের গল্প, শংকরদা। দুনিয়ার সব জাত একসময় ফরাসিদের ওপর এক হাত নিয়েছে। ফরাসিরাও নিজেদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। কাজের সময় জার্মান শ্রমিক যদি দেখে একটা স্ক্রু ঠিক মতন লাগছে না তা হলে বলবে, ওটা নিশ্চয় জার্মানিতে তৈরি নয়। ফরাসি

শ্রমিক ওই রকম খারাপ স্ক্রু দেখলে বলবে, এটা নিশ্চয় ফ্রান্সে তৈরি। এই অবস্থা পেরিয়ে এসেছে ফরাসিরা। এখন ভাল জিনিস তৈরির ব্যাপারে ফরাসির ইজ্জত প্রায় জার্মানের তুল্য। ফরাসিরা যেভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে এই ক'বছরে নিজেদের ভাবমূর্তি পাল্টে ফেললো তা লক্ষ্য করলে আপনিও দেশে ফিরে গিয়ে বলতে পারবেন বাঙালিরা ইচ্ছে করলে দু'তিন বছরে নিজেদের সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই রকম অসম্ভব সম্ভব হয়েছে ইউরোপের আরও দু'টি দেশে। ইতালি ও স্পেনে।" স্পেনের তৈরি জিনিসের গুণগত উৎকর্ষ এখন জার্মানকেও ভাবিয়ে তুলছে।

আমি বললাম, "আরও এক ব্যাপারে ফরাসির বদনাম আছে বাঙালির মতন। এরা দু'জনেই ঘড়ির চোখ রাঙানি তোয়াক্কা করে না। ফরাসি দেশে গ্রিনউইচের মতন জায়গা নেই, লন্ডনের বিগ বেনের মতন ঘড়িও নেই। নোতরদাম গির্জায় এখনও সময় সঙ্কেত হয় ঘণ্টা বাজিয়ে। ফরাসি টিভি প্রোগ্রামের শুরু দেখেও নাকি সময় মেলানো যায় না। কারণ বিজ্ঞাপন যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণে খবর অথবা প্রোগ্রাম শুরু করায় ফরাসি দূরদর্শন বিশ্বাস করে না।"

সম্বিৎ হাসলো। সময়ের শাসনকে নতুন যুগের ফরাসি স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে, শংকরদা। এবার তো কলকাতায় গিয়ে দেখলাম বাঙালিরাও সময় সম্পর্কে বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে। তিন চার ঘণ্টার ফারাক এখন কলকাতার দশ পনেরো মিনিটে নেমে এসেছে। রাস্তাঘাটের আর একটু উন্নতি হলে জ্যাম একটু কমলে কলকাতার বাঙালিরা আরও সময়ানুবর্তি হয়ে উঠবে। কলকাতার লোকের সময়জ্ঞান যে খুব খারাপ নয় তা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে হলে আপনাকে লখনউ যেতে হবে। শুনেছি চন্দ্রসূর্য ছাড়া আর কিছুই ওখানে সময়ের শাসন মেনে চলে না।

প্যারিসের ভূগোল এখনও আমার আয়ত্ত হয়নি। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ঠিক হিসেবে আসছে না। আসলে, শহরের ম্যাপ একটা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে যা বুঝেছি শহরের বুকের মধ্য দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে। যদিও নদীটা আমাদের কলকাতার ভাগীরথীর তুলনায় কিছু নয়। এই নদীর ওপর ব্রিজগুলো ধরে আমাদের গাড়ি একাধিকবার এপার-পার করলো। লেফট্ ব্যাঙ্ক রাইট ব্যাঙ্ক কথাগুলো আমার কানে এলো, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সড়গড় হচ্ছে না। না হওয়াই ভাল, কারণ এই প্যারিসের বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে অনেকবার হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে আবার শোনবার জন্যে পাঠকের কোনও ব্যস্ততা নেই। আমাকে নতুন এক প্যারির সন্ধান করতে হবে যা বাঙালি পাঠকের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবে অথচ তার কাজে লাগবে।

একটা ব্রিজ পেরোবার সময় হঠাৎ যেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দেখা পেলাম—যাকে কয়েক বছর আগে দেখেছিলাম নিউইয়র্কের প্রবেশ পথে। অসামান্য সুন্দর

অথচ বিশাল এই শিল্পকর্ম মার্কিন দেশের প্রতীকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। আমি যখন মার্কিন দেশে ছিলাম তখন চাঁদা তুলে মূর্তির সংস্কার চলছে। কী বিরাট অথচ কী অসামান্য সুষমামণ্ডিত এই শিল্পকর্ম। এই স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি যে ফরাসি শিল্পীর সৃষ্টি এবং ফরাসি দেশে খণ্ডে-খণ্ডে তৈরি হয়ে জাহাজযোগে তা যে আটলান্টিকের অপর পারে পাঠানো হয়েছিল তা আমার অজানা নয়। মার্কিন জাতের কাছে ফরাসিরা এমন একটি প্রীতি উপহার দিয়েছে যা কোনও দিনই তাদের পক্ষে ভোলা সম্ভব হবে না।

গাড়ি থামলো। প্যারিসের স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকে ভাল করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেলো।

দু'নম্বরি এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কথা আমার অজানা ছিল না। সম্বিৎ বললো, "এইটাকেই এক নম্বর বলুন না—এই ফরাসি দেশেই তৈরি। আকারে একটু ছোট এই যা।" আমেরিকায় স্ট্যাচুর খরচ বহন করেছিল ফরাসিরা, আর ফরাসি দেশের এই স্ট্যাচুটি হলো আমেরিকানদের উপহার।

শোনা যায় ফরাসি স্ট্যাচুর উন্মোচনের দিন মুখটা অন্যদিকে ছিল যাতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এবং অভ্যাগতদের অসুবিধা না হয়। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মূর্তি কোনমুখো দাঁড়িয়ে থাকবে, বেদির উচ্চতা কতটা হবে, কোথা থেকে কীভাবে আলো পড়বে এসব ফরাসির কাছে ভীষণ ব্যাপার। ফরাসি এবিষয়ে মাথা ঘামায়। মূর্তির পাদদেশে কী পরিচয় লেখা হবে সে-বিষয়ে ইংরেজ অবশ্য দুনিয়ার সেরা। মূর্তির পরিচয়ে বেশি লেখা-লেখিতে ফরাসি বিশ্বাস করে না, তার ধারণা দুনিয়ার লোক নিজের প্রয়োজনেই স্ট্যাচুর নায়ক সম্বন্ধে সব খবরাখবর সংগ্রহ করে নেবে। তবে ফরাসি শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য বা বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেয় না, যেমন দিতে পারি আমরা। যে-মন্ত্রী শিল্পকর্ম উন্মোচন করলেন তাঁর নামটা কুৎসিত আকারে চিরকালের জন্যে গ্রানাইট বিজ্ঞাপিত করা ফরাসি স্বভাবের বিরুদ্ধে।

প্যারিসের বিভিন্ন পথ ধরে গাড়ি চালিয়ে এবং ধারাবিবরণী শুনে আমার মনের মধ্যে এই শহরের একটা কোলাজ তৈরি হচ্ছে। ছবিটা বুকের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। এর আগে নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, সানফ্রানসিসকো, টরন্টো, লন্ডন দেখেছি। এই সব শহরের ঐশ্বর্য অভ্যাগতর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে ; প্যারিস সেদিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। প্যারিসকে পর মনে হয় না—বড়লোকের রাজপ্রাসাদ দেখতে এসেছি এই অনুভূতি হয় না, যেন মানুষের তীর্থক্ষেত্রে এসেছি। মন্দিরের সঙ্গে ধনীর প্রাসাদের যে পার্থক্য। মন্দির নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু পরের সম্পদ বলেও মনে হয় না। এই প্যারিস প্রকৃত অর্থেই নরদেবতার মহাতীর্থ।

নিজের স্বার্থে সব কিছু করেও ফরাসি কেমন করে তার সমস্ত আনন্দ ও যন্ত্রণাকে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়স্পন্দনে রূপান্তরিত করলো তা জানবার সাধ হয়। এমনই তো হওয়া উচিত ছিল দেশে-দেশে, কিন্তু প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই তা হয় না। মানুষের মহাতীর্থ হিসেবে লন্ডনও তো কম নয়, কিন্তু সেখানে এই অনুভূতি আসে না কেন? আসলে ইংরেজ তার ব্যবসায়ী চরিত্র ত্যাগ করে জাতে ওঠার জন্যে কখনও মাথা ঘামায়নি। তাই দোল দুর্গোৎসব নাটমন্দির প্রতিষ্ঠায় সে কার্পণ্য করেছে তার সমৃদ্ধির কালে। তারপর অবশ্য রয়েছে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইংরেজ সভ্যতার ধারাবাহিকতা পৃথিবীর চোখের সামনে থেকে অনেকটা মুছে গিয়েছে।

সম্বিৎ এই দেশে আসবার অনেক আগেই ফরাসি সভ্যতার প্রেমে পড়েছিল। প্যারিসে আসবার মুরোদ নেই তো কী হয়েছে? চলো চন্দননগর। তখনকার দিনে এক টাকা পকেটে থাকলেই হলো। সম্বিৎ বললো, "দোকানদার, ট্যাক্সিওয়ালা, হোটেলওয়ালা আপনাকে যতই জ্বালাক ফরাসিরা আপনার মন জুড়িয়ে দেবে। আপনি একবার আমাদের দেশের মন্দিরগুলোর কথা ভাবুন। ভিখিরি, পকেটমার এবং কিছু পাণ্ডার অত্যাচার থাকলেও দেবতার গর্ভগৃহে এসে আপনি সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান না?"

সম্বিৎ বললো, "ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, নেপোলিয়নের জীবন কাহিনী আমি দুপুরের টিফিন না খেয়ে সেই পয়সায় কলকাতায় বই কিনেছি। আমার মনে হয়েছে বাহাদুর এই ফরাসিরা। ব্যক্তির যন্ত্রণাকে দেশের দুঃখে এবং দেশের দুঃখকে পৃথিবীর যন্ত্রণায় পর্যবসিত করার বিরল শক্তি এদের মধ্যে ছিল। তাই ফরাসি বিপ্লব শুধু ফরাসির বিপ্লব থাকেনি—সমস্ত মানবসমাজ এই ঘটনাকে তাদের নিজস্ব বিপ্লব বলে গ্রহণ করছে।"

প্যারিস কি রাতেই বেশি জেগে ওঠে? চারদিক আলোয় আলো। এই মহানগরে যেন নিত্য দেওয়ালি। এক সময় জগদ্বিখ্যাত লাইট কোম্পানিতে কাজ করেছি। লাইটিং ব্যাপারটা কত কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ তা আমার অজানা নয়। যতদূর মনে পড়ছে এই ফরাসি দেশেই দীর্ঘ গবেষণার পর আজকের টিউবলাইট আবিষ্কৃত হয়েছিল। আমি কয়েক জায়গায় দাঁড়িয়ে পথের, প্রাসাদের এবং পার্কের আলোকসজ্জা লক্ষ্য করলাম—আলোকশিল্পে প্যারিস যে দুনিয়ার সেরা তা স্বীকার করে নিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হলো না। আলোকে প্রভুর মতন বা ভৃত্যের মতন ব্যবহার করেনি প্যারিস; আলোকে সে দিতে চেয়েছে প্রেয়সীর ভূমিকা। তাই প্যারিসের আলোকমালা এতো কোমল এবং অনুভূতিময়, এতো মধুর প্যারিসের আলো মানুষকে চোখ রাঙায় না, জো হুজুর করে পায়ে লুটিয়েও

পড়ে না, কিন্তু মধুর আলিঙ্গনের নিমন্ত্রণ জানায়—যা সমস্ত চিত্তকে নতুন এক উপলব্ধির স্বর্গলোকে পৌঁছে দেয়।

প্যারিসের অফিস লাইটিং স্বতন্ত্র। আলো নিয়ে ওরা নানা খেলা করে। আলো মনের মতন না হলে ফরাসি কাজে সুখ পাবে না। দেখা গিয়েছে, ভাল আলো হলে ডিজাইনিংও ভাল হয়।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি ফরাসি দেশে কারও পছন্দ নয়। আবার আমাদের দেশের মতন বছরে একদিন বাড়িটাকে আলোয় আলো করে তারপর সারা বছর মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে থাকাও ফরাসির পছন্দ নয়। তাই ঐতিহাসিক সৌধমালাকে আলোকিত রাখার জন্য ফরাসি পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। ফরাসি বিশ্বাস করে ধারাবাহিকতায়, ধারাবাহিকতার অভাব থেকেই বিপ্লবের সূচনা হয়, একথা সে হাড়ে-হাড়ে জানে।

আমরা একটা কাফেতে এসে বসেছি। কাফেতে শক্ত পানীয় পাওয়া যায়, কফিও পাওয়া যায়। ফরাসির কাফেপ্রীতির খবর দুনিয়ার প্রত্যেকের কাছে বহুদিন আগেই পৌঁছে গিয়েছে। এখানেও আলোকের অন্য প্রয়োগ! হঠাৎ ঢুকলে মনে হয় লোডশেডিং চলেছে। চোখটা ক্রমশ কম আলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এর নাম অন্তরঙ্গ আলো। ইনটিমেট লাইটিং-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যতদূর স্মরণ হচ্ছে এই ফরাসি দেশেই শুরু। আমাদের কাছে যেমন মন্দির বা ঠাকুর ঘর, ফরাসির কাছে তেমন এই কাফে। ইংরেজের পাবকে সুঁড়িখানা মনে হয়, কিন্তু ফরাসি তার কাফেকে অনেক সুসভ্য করে রেখেছে। যে-মাতলামোর মধ্যে আর্ট নেই তা ফরাসির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

ফরাসি কফির যে পাত্রটি সামনে এলো তা আকারে ছোট। এতো ছোট কাপে চা অথবা কফি খেয়ে আমার মন ভরে না। ফলে আর এক পাত্র অর্ডার দেওয়া গেলো। কফি পান করতে-করতে হঠাৎ কাচের দরজায় একটি ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হলো।

অবাক হবার কারণ আর কিছু নয়, ছবিটি একটি ভারতীয় মহিলার। এই মহিলাকে সন্ন্যাসিনী মনে হচ্ছে না। নিতান্তই ভারতীয় গৃহবধূ—সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে।

এমন সাহেবি জায়গায় একজন ভারতীয় মহিলার ছবি দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম। ইনি এখানে কেমন করে হাজির হলেন তা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না। কফির কাপ সামনে রেখে আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

রমণী শরীরের সৌন্দর্য তারিফ করতে যে—ফরাসি সদাতৎপর ও চঞ্চল, সে কেন এই বেঢপ ভারতীয় রমণীর ছবিটিকে এমন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে?

রঙিন ছবিটিকে আরও খুঁটিয়ে দেখা গেলো। ফরাসি পরিমাপে তো বটেই, ভারতীয় স্নেহময়ীদের তুলনাতেও ওই মহিলা বিপুলাঙ্গিনী। মুখে একটু চাপা নেপালি ভাব। বর্ণ গৌরী, যদিও উজ্জ্বল গৌরী বলা চলে না। বয়স যে পঞ্চাশ পেরিয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা চলে। সবচেয়ে আকর্ষণ করছে সিঁথির চওড়া সিঁদুর।

ইচ্ছে থাকলেই পথ খুঁজে পাওয়া যায়। প্যারিসের কফি ও পেসট্রি আমার নজর কাড়ছে না আর, আমি জানতে চাইছি কে এই মহিলা, কেন তিনি এখানে এইভাবে প্রতিষ্ঠিতা হলেন? আমার আন্দাজ মিলে গেলো। দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা গেলো। তিনি খবর পেয়ে আমাদের সান্নিধ্য দিতে টেবিলে এলেন।

"ইন্ডিয়া?" ফরাসি সাহেব খুব খুশি হলেন। জানালেন ওইটাই তাঁর "দ্বিতীয় মাতৃভূমি।"

"বম্বে?" আমার নিবাস বম্বে নয় জেনেও সাহেব হতাশ হলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "পুনে?"

রজনীশের দৌলতে পুনে এখন পৃথিবীর বহু জনপদে কিছু সুনাম, কিছু দুর্নাম এবং কিছু কৌতূহলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

ম্যানেজার সাহেব জানালেন, প্রথম সুযোগেই তিনি পুনে চলে যাবেন এবং কিছু দিন ওখানে থাকবেন।

"সাইটসিয়িং?" আমি বোকার মতন জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম। ফরাসি সাহেব হাসলেন, এবং আমার ফরাসি ভাষায় অজ্ঞতা আগাম ক্ষমা করে দিয়ে ইংরিজীতে কথা বললেন।

"নো নো। সাইট এই প্যারি শহরে অসংখ্য আছে, সমস্ত জীবন ধরে দেখলেও দ্রষ্টব্য শেষ করা যাবে না, মঁসিয়েজি!" ফরাসিকে 'জ' উচ্চারণ করতে একটু যেন কষ্ট করতে হলো। সাহেব জানালেন, "আমি যাবো মনের জন্যে, নিজেকে আবিষ্কার করতে। এই যে প্যারি শহর দেখছো এটা এতো বড় শহর যে এখানে মানুষ হারিয়ে যায়, নিজেকেই খুঁজে পায় না।"

বললাম, "আমি কলকাতা থেকে এসেছি।" সাহেব দমলেন না, জানালেন তিনি 'শারুলতা' দেখেছেন বাই 'রে', ফরাসি বোধ হয় 'চ' উচ্চারণ করতে শেখে না, যদিও জিভ-এর সব রকম সদ্ব্যবহারে ফরাসিই যে দুনিয়ার এক নম্বর তা ইংরেজ, জার্মান, আমেরিকান সবাই স্বীকার করে নিয়েছে।

পুনে কিছুতেই কলকাতা থেকে বেশি দূর হতে পারে না। এই ভেবে সাহেব বেশ সুখী হলেন।

সাহেব জানালেন, রজনীশে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। "মঁসিয়েজি, সেক্সের

মধ্য দিয়ে নিজেকে সন্ধান করতে গিয়েই তো আমরা বহু বছর নষ্ট করেছি। ব্যাপারটা আমাদের থেকে ভাল কেউ জানে না। আমরা কেন এর জন্যে ইন্ডিয়াতে যাবো?"

ছবির এই সীমন্তিনীকে আমি জানি না শুনে সাহেব বেশ অবাক হলেন। "রোমের লোকরাই পোপ সম্বন্ধে সবচেয়ে আগ্রহী!"

সাহেব বললেন, "ইনিই নির্মলাদেবী, আমাদের মাতাজি। অদ্ভুত সৌন্দর্যময়ী না?"

সাহেবের হলো কী! এই থলথলে, ওভারওয়েট বিগতযৌবনা মহিলাকে সুন্দরী বলছেন!

"মঁসিয়ে, নিতম্ব ও স্তনে যদি প্রকৃত সৌন্দর্য থাকতো তা হলে তো আমাদের কাউকে দুনিয়া তোলপাড় করতে হতো না। সৌন্দর্য থাকে হৃদয়ের মধ্যে, তারপর পারফিউমের মতন তার আঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে মুখে এবং দৃষ্টিতে। ভারতীয় চোখ দিয়ে মাতাজির সেই সৌন্দর্য তোমরা কত সহজে দেখতে পাও, তোমরা সত্যিই ভাগ্যবান।"

আমাদের টেবিলের পাশে এক টিপিক্যাল ফরাসি সুন্দরী তাঁর অতিমাত্রায় শাসিত শরীর নিয়ে মদিরা পান করছিলেন। সম্বিৎ ফিস-ফিস করে বললো, "অভিজাত বংশের মেয়ে। মাপজোক অনুযায়ী এঁদের শরীরে স্ট্যাটিসটিকাল সৌন্দর্য আছে, কিন্তু প্রাণহীন। চেহারাটা দেখুন, মনে হবে মমি।"

সাহেব জানালেন, "কিছুদিন আগে আমি নির্মলা মাতাজির খবর পেয়েছি। আমি ওঁর সভায় গিয়েছিলাম মনে নানা সন্দেহ নিয়ে। আমি কাফেতে কাজ করি, হাজার রকম মানুষের সঙ্গে কাজ কারবার, লোক চিনতে একটুও কষ্ট হয় না।"

সাহেব দুড়ুম করে তাঁর মানিব্যাগ বের করলেন। বেরিয়ে এলো নির্মলা দেবীর একটা রঙিন ছবি। সাহেব ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজগৎ সম্পর্কে খবরাখবর ভালই রাখেন। তাঁর মন্তব্য, "মাতাজি নিজেই বলেন, তিনি সন্ন্যাসিনী নন। তিনি একজন গৃহবধূ।"

নির্মলা দেবীর কপালের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। সায়েব বললেন, "এই ব্লাড পেন্টিং আমার ভীষণ ভাল লাগে।"

আমি সাহেবকে বোঝালাম, "রক্তের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। এই লাল হলো বিবাহের চিহ্ন, মহিলার যে স্বামী বর্তমান রয়েছেন তার ইঙ্গিত।" সাহেবের সাধ সমস্ত বিশ্বের মহিলারা এই সিঁদুরচিহ্ন গ্রহণ করুক। সাহেব বললেন, "আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এই নির্মলা দেবী। পৃথিবীর কঠিনতম প্রশ্নগুলো একেবারে সহজ করে উত্তর দেবার দুর্লভ ক্ষমতা রাখেন। আমাদের ভুল ধারণা ছিল, সংসার ত্যাগ না

করলে আজন্ম অবিবাহিত না থাকলে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না ভারতবর্ষে। কিন্তু এখন আমি জানি অনেক গ্রেট সাধক সাধারণ মানুষের মতন সংসারাশ্রমে জীবন যাপন করেও সত্যকে উপলব্ধি করেছেন।"

নির্মলা দেবীর ভক্ত সংখ্যা ফরাসি দেশে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ফরাসিরা আমেরিকানদের মতন বোকা নয় যে ওং ভোং করবে তারই পায়ের তলায় বসে পড়ে সে ঠকতে প্রস্তুত নয়। "আমরা জানি ইন্ডিয়াতে যেমন মহান সাধকসাধিকার জন্ম হচ্ছে তেমন চোররাও সক্রিয় হয়ে উঠছে। আমরা এও জানি, কিছু চোর আছে বলে সব সাধুকেই চোর দায়ে ধরা পড়তে হবে এমন কোনও কথা নেই।"

নির্মলা দেবীর সভায় শত-শত ফরাসির ভিড় হয়। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁরা বিশেষ এক অনুভূতির অংশীদার হন। "আমাদের অনেকের চোখ খুলে গিয়েছে, মঁসিয়ে। আমরা ভারতবর্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমাদের তপ্ত শরীরকে অধ্যাত্ম অনুভূতির শাওয়ারে স্নান করিয়ে নেবার জন্যে।"

আমার কৌতূহল বাড়ছে। আধুনিক কালে আমরা যে ভারতবর্ষ তৈরি করেছি তার সম্বন্ধে করুণা ছাড়া কিছুই নেই সমস্ত পৃথিবীর। এই ভারতবর্ষ আছে কি নেই তাই স্মরণে থাকে না বিশ্ববাসীর। বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে আমাদের এই ভারতবর্ষের কোনও উপস্থিতি নেই বিশ্বসভায়। কিন্তু যে-ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পশ্চিমী মানুষের এখনও সীমাহীন কৌতূহল তা হলো আধ্যাত্মিকতায় মোড়া শাশ্বত ভারতবর্ষ। এখনও মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাতে পারে।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমী জগতের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খ্রিস্টধর্মের প্রভাব ক্রমশই কমতির দিকে। লোকে খাতায় কলমে চার্চের আওতায় থাকলেও পশ্চিমের প্রাণবন্ত মানুষের অনেককে আজকের চার্চ সেই উষ্ণ স্পর্শ দিতে সক্ষম হচ্ছে না যা-একসময়ে সমগ্র দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছিল।

তার ওপর, সাফল্য যতই বাড়ছে, বিজ্ঞান যতই দিগ্বিজয় করছে, ততই পশ্চিমী মানুষের নিঃসঙ্গতা বাড়ছে, ঘরে থেকেও মানুষ নিজেকে ঘরছাড়া মনে করছে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে পশ্চিমের প্রাণশক্তি তো চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। তাই দিকে-দিকে সন্ধান চলেছে নতুন পথের। এই সন্ধানী মনের নজর রয়েছে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে। মুক্তির নাম করে, শান্তির নাম করে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের আদর্শহীন প্রতিনিধিরা বিদেশে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন, মানুষকে সাঙ্ঘাতিক বিপদের পথে ঠেলে দিয়েছেন, তবু কৌতূহল কমেনি। ভারতীয় গুরু আজও ভারতীয় রাজনৈতিক নেতা, ভারতীয় বিজ্ঞানী, ভারতীয় শিল্পী, ভারতীয় বিজনেসম্যান, ভারতীয় লেখকের থেকে অপেক্ষা পশ্চিমী মনের সহস্রগুণ

কৌতূহল ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন।

কাফের সাহেব বললেন, "প্যারিসের শত-শত দোকানে তুমি নির্মলা দেবীর পোস্টার দেখতে পাবে।" এবার আমি যদি আরও দশ দিন আগে ওঁর কাছে খোঁজখবর করতাম।

দশ দিন আগে আমি তো ফরাসিদেশের 'ফ' জানি না, আমি তখনও ডুবে আছি হাওড়ায়। দুনিয়া ওই শহরকে খরচের খাতায় লিখে দিলেও পবিত্র স্থান, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিশ্বকেন্দ্র। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ দুনিয়া চষে বেড়াবার পর এই হাওড়াকেই নির্বাচন করলেন এবং হাওড়া কোর্টের রেজিস্ট্রি আপিসে এসে জমি কিনলেন।

কাফের ফরাসি সাহেব হাওড়ার নাম শোনেননি, কিন্তু পিলখানার কথা পড়েছেন ডোমিনিক ল্যাপিয়ের-এর 'সিটি অফ জয়' বইতে। কিন্তু এই পিলখানা যে হাওড়ায় তা ওঁর জানা নেই। সাহেবের সব আগ্রহ পুনেতে, কারণ মাতাজি নির্মলা দেবীর ওইটাই কর্মকেন্দ্র।

নির্মলা দেবী সম্বন্ধে সাহেব যা খবরাখবর দিলেন, এ গ্রেট সোল, যার আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় একটি মহান আত্মা। আরে বাপু, সব আত্মাই তো মহান, ওখানে সবাই ফাইভ স্টার, ওখানে কেউ অর্ডিনারি নয়। সাহেব বলতে চাইছেন, নির্মলা দেবী ভাল মানুষ।

তা মাতাজি নিজে কী বলতে চাইছেন? আমি এই ধরনের মানুষ সম্পর্কে কৌতূহলীও বটে, আবার ভীতও বটে। গোড়ার দিকে এদের অনেকের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু তারপরেই ভক্তপরিবৃত হয়ে এঁরা নিজেদের গুণগুলো বিসর্জন দিয়ে দেবতা অথবা দেবী হবার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে ওঠেন। ভক্তরা এঁদের মধ্যে মানবিক শক্তির প্রকাশ না দেখে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখতে আরম্ভ করেন। আশ্রম গড়ে ওঠে, দর্শনার্থীর ভিড় বাড়ে এবং আদি ভক্তদের এক আধজন গুরুজির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে বেড়ে ওঠেন। তারপর শুরু হয় দলাদলি এবং কখনও খুনোখুনি পর্যন্ত। যখন বিদেশি ভক্তরা দলে-দলে জড়ো হন তখন সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ বিদেশিরা ভক্ত হিসেবে তুলনাহীন হলেও সঙ্ঘগুরুর ভূমিকায় প্রায়ই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। গুরু হওয়া যে সহজ নয় তা ঠিক মতন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সেই সব প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করা প্রয়োজন যেখানে ভারতীয় গুরুর দেহাবসানের পর বিদেশি ভক্তদের কেউ গুরুর প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েছেন। কেন এমন হয়ে থাকে তা আমার এখনও জানা নেই। কিন্তু এমন যে হয়ে থাকে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের বিদেশি কেন্দ্রগুলির প্রধানরা যে এখনও প্রায়ই স্বদেশ থেকে প্রেরিত হন তা খুবই পরিণত বুদ্ধির নিদর্শন।

কাফের সাহেব আমাকে মাতাজি সম্বন্ধে যা বললেন তা মোটামুটি এই রকম। মাতাজি দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় মানবশরীরে কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের এক সহজ ও নিরাপদ পথ আবিষ্কার করেছেন। এতো দিন পর্যন্ত সবার ধারণা ছিল, দীর্ঘদিনের দুরূহ সাধনায় একমাত্র সংসারবৈরাগী সাধকরাই এই দুর্লভ অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারেন। মাতাজি আবিষ্কৃত এই পথটির নাম সহজ যোগ। ফরাসি সাহেব এই 'সহজ' শব্দটির সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন।

কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের ব্যাপারটা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। আমাদের বিবেকানন্দ ইস্কুলে ছাত্রাবস্থায় কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের "স্বামীজির জীবনকথা" পড়ানো হতো। বইটি অসাধারণ দক্ষতায় পড়াতেন আমাদের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, যাঁকে আড়ালে আমরা হাঁদুদা বা হাঁদ্দা বলে ডাকতাম। মনে আছে, ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি এঁকে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ির রহস্যটা তিনি বুঝিয়েছিলেন। কুণ্ডলিনী শক্তি সাপের মতন নিদ্রিত রয়েছে মূলাধারচক্রে শিরদাঁড়ার শুরুতে শরীরের নিম্নাঙ্গে। সাধনার বলে অতি বিরলক্ষেত্রে এই নিদ্রিত সর্প উত্থিত হয়ে, শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে নানা চক্র ভেদ করে যখন ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শ করে তখনই শুরু হয় এক আশ্চর্য অনুভূতি। কুণ্ডলিনী জাগরণের অপার রহস্য নিয়ে বহু যুগ ধরে শত সহস্র বই লেখা হয়েছে। সংগৃহীত হয়েছে বহু সাধকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। সমস্ত জীবন সাধনা করে কুণ্ডলিনী সুপ্ত থেকেছে, আবার সামান্য সাধনায় দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এমন বিবরণ শুনেছি সেই সব মানুষের কাছে যাঁরা সাধুসঙ্গে আগ্রহী। সুষুম্নার নিদ্রিত সর্প সাধনপথে বিপথগামী হলে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে পারে এমন কথাও শুনেছি, এ ও শুনেছি যৌন উত্তেজনার পথে কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রচেষ্টায় বহু সাধক অধঃপতিত হয়েছেন।

ফরাসি সাহেব অনেক সংস্কৃত শব্দ আয়ত্ত করেছেন। ইংরিজীতে যখন বললেন 'থটলেস অ্যাওয়ারনেস' আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তখন তিনিই বললেন, "নির্বিকল্প সমাধি"। এঁর কাছে শুনলাম, মানবশরীরে বাহাত্তর হাজার নাড়ি আছে, তার মধ্যে মাত্র তিনটি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নিয়ে যুগযুগান্ত ধরে নানা অনুসন্ধান চলেছে। কুণ্ডলিনীরূপিণী যে মূলাধারচক্রে নিদ্রিত রয়েছে তার আকার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু ফরাসি সাহেব রীতিমত ওয়াকিবহাল। বললেন, "মাত্র সাড়ে তিন ইঞ্চি—কিন্তু এই সুপ্তসর্প জাগরিত হলে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা সহস্রপদ্মের মতো বিকশিত হয়।"

ফরাসি সত্যানুসন্ধানীরা এখন প্যারিসের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রিত সহজ যোগের সাধনা করে থাকেন। "এটি এতোই সহজ যে বিশ্বাসই হয় না," সাহেব বললেন, "আমরা অনেকে এই যোগ থেকে উপকৃত হচ্ছি।"

"উপকারটা কী?" আমি জানতে চাই।

"আনন্দ—এমন আনন্দ যা আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত ছিল। এবং আমরা তা পেয়েছি অত্যন্ত সহজ পথে। মাতাজি প্রথমে একদিন আমাদের পথ দেখিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন এবং আমাদের 'অঙ্কুরিত' করেছেন।"

অঙ্কুরিত শব্দটি অর্থবহ মনে হলো। সাহেব চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন, "সামান্য বীজের মধ্যেই তো বিশাল মহীরূহ সম্ভাবনা লুকোনো থাকে। সেই বীজকে ভূমিতে বপন করে অঙ্কুরিত করতে হয়। মাতাজি এই কাজটি অতি সহজে করে ফেলেন। এরপর সামান্য কয়েকদিনের প্রচেষ্টা যাঁরা সাধনপথে অভিজ্ঞ, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং অবশেষে নিজেই ওই পথে এগিয়ে যাওয়া।"

স্থানীয় গুরুর খবরাখবর করলাম। সাহেব জানালেন, "এই পথে অন্য গুরুর আর প্রয়োজন হয় না, মানুষ নিজেই নিজের পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারে।"

অনুসন্ধিৎসুর মধ্যে যখন বীজ অঙ্কুরিত করা হয় তখনও মাতাজি নির্মলা দেবীর নির্দেশ অতি সামান্য। তিনি বলেন, জুতো খুলে ফেলুন। শরীরে কোথাও কঠিন বন্ধন থাকলে তা আলগা করে নিন, এবার সম্ভব হলে সোজাভাবে মাটিতে বসে পড়ুন। যদি মাটিতে বসতে অসুবিধা হয় তা হলে চেয়ারেই বসুন।

তারপর মাতাজি সামান্য কয়েকটি কথা বলেন। 'ঈশ্বর মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। মানুষের মধ্যেই স্বর্গ, মানুষের মধ্যেই নরক। প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের শান্তির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—এই স্বাতন্ত্র্যবোধই পশ্চিমে মানুষের প্রশান্তি অপহরণ করছে। অথচ মানুষের সম্ভাবনার কোনও শেষ নেই। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হয়ে যখন বিশ্বশক্তির সঙ্গে মিলিত হতে চায় তখনই মানুষের বিকাশ ঘটে, শান্তচিত্ত হলে সমস্ত পৃথিবীকে নাট্যদর্শকের মতন উপভোগ করা যায়।"

এরপর নির্মলা দেবী আশ্বাস দেন, "হজম করা যদি সহজ হয়, নিশ্বাস নেওয়া যদি সহজ হয়, তা হলে যোগই বা কেন মানুষের পক্ষে সহজ হবে না? আপনারা নিজেদের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হোন, অন্তর থেকে শক্তিশালী হোন, তা হলেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটবে।"

বিদেশি শ্রোতাদের নির্মলা দেবী বলেন, "এবার পাপত্ব ভাব ত্যাগ করুন। আপনাদের যাজকরা যাই বলুন না কেন, কিছুতেই ভাববেন না আপনারা পাপী। মানুষ এমন কিছু অন্যায় করতে পারে না যার ক্ষমা নেই।"

কাফের সাহেব বললেন, "মাতাজির এই কথা আমার মধ্যে ম্যাজিকের মতন কাজ করেছিল।"

সহজ যোগীদের কাছে নির্মলা দেবীর দ্বিতীয় শর্ত, "যোগে বসবার আগে

অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো। অপরকে ক্ষমা না করে নিজের ওপর অত্যাচার চালাবেন না। কে বলে ক্ষমা করা মুশকিল? ক্ষমায় অক্ষম হলে তো নিজেরই অশান্তি। সবাইকে ক্ষমা করে ধীরে-ধীরে আনন্দের স্বর্গলোকে প্রবেশ করুন। আমরা সবাই আত্মোপলব্ধির যোগ্য, এই বিশ্বাস নিজের ওপর রাখুন। মনে রাখবেন, আমাদের সবার হৃদয়েই মহামানবতা বসবাস করছে।

"যতই দম্ভ থাকুক তকে আয়ত্তে আনুন। নিজেকে বিনম্র করে তুলুন। তারপর কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের আহ্বান জানান। জাগরণের পরে আপনি নিজেই অন্যের গুরু হতে পারেন।"

নির্মলা দেবীর এই সহজ কথাগুলি ফরাসিদের মনে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। ধীরে-ধীরে তিনি কয়েকটি সহজ যৌগিক পথ দেখিয়ে দেন। মাত্র মিনিট পনেরো সময় লাগে, কিন্তু শরীর ও মন শান্ত হয়ে যায়।

সাহেব এর পরে যা বললেন তা আমাকে আরও অবাক করে দিলো। মাতাজির ভক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন। বেশ কয়েকজন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন ভারতীয় নারীদের সঙ্গে। "আমাদের অনেকে সংস্কৃত শিখছে। অনেকে নির্মলা দেবীকে আনন্দ দেবার জন্যে তাঁর মাতৃভাষা মারাঠিও রপ্ত করেছে। আমরা দেখছি এই যোগের প্রভাবে আত্মবিশ্বাস ফিরে এলেও ঔদ্ধত্য কমে যায়। মানুষ নম্র হয়ে ওঠে, কাজে প্রচণ্ড উৎসাহ আসে।"

যা অসম্ভব ভেবেছিলাম, তা-ই শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। আমার মনের সাধ অপূর্ণ থাকেনি। দেশে-দেশে বন্দিতা মাতাজির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল যথা সময়ে।

নির্মলা দেবীর জন্ম ১৯২৩ সালে মহারাষ্ট্রের এক খ্রিস্টান পরিবারে, ছিন্দোয়ারায়। ওঁর বাবা শ্রীযুক্ত কে পি সালভে ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। মা ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত। এই মহিলার ছ' ছেলে, পাঁচ মেয়ে। বাবা কম বয়সে নির্মলাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং মহাত্মার আশ্রমে নির্মলা কয়েক বছর থেকে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি ওঁকে 'নেপালি' বলে ডাকতেন ওঁর চাপা নাকের জন্যে। নির্মলার এক ভাই কংগ্রেস নেতা, এন কে পি সালভে একসময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।

নির্মলা বললেন, "আমার এই যোগকে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে ভাবার প্রয়োজন নেই। যে যার ধর্মে থেকেই এর সুফল লাভ করতে পারেন। বরং এর প্রভাবে খ্রিস্টান আরও ভাল খ্রিস্টান হবে, হিন্দু আরও ভাল হিন্দু হবে।"

গান্ধীজির আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে নির্মলা দেবী পড়াশোনায় মন দেন

এবং আই এস সি পাশ করে যথাসময়ে ডাক্তার হবার বাসনায় মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। দু' বছর ডাক্তারি পড়ার পর পড়াশোনায় ইতি হলো। সংসারী হলেন নির্মলা দেবী। স্বামী শ্রী শ্রীবাস্তব ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাচের আই-এ-এস। ইনি একসময়ে প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি হয়েছিলেন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দেহাবসানের সময় তাসখন্দে উপস্থিত ছিলেন। এর পর তিনি ইউ এন ও-তে যোগ দেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সেক্রেটারি জেনারেল পদ অলঙ্কৃত করেন দীর্ঘ সময়ের জন্য।

শ্রীবাস্তবজির বিপুল সাফল্যের প্রমাণ, সম্প্রতি রানি এলিজাবেথ তাঁকে নাইটহুড দিয়েছেন। এই সম্মানিত নাইটহুড আর কোনও ভারতীয় পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই, যদিও পরাধীন অবস্থায় স্যর উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য ভারতীয়রা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আজও দুঃখ করেন, স্যর হওয়ার মধ্যে যে 'ধাক্কা এবং সুখ' ছিল তার অর্ধেকও নেই পদ্মশ্রী পদ্মভূষণে। কারণ এই ব্যাপারে আমরা ঠিক মনঃস্থির করে উঠতে পারিনি। কিছু একটা দিতে হয় তাই দেওয়া, অথচ জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা খেতাব নয়। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও ভুল বোঝাবুঝি কাটেনি—এইগুলি 'পুরস্কার', না 'সম্মান' তা প্রাপকরাও বুঝতে পারেন না। এই সব পদচিহ্ন নিজের লেটারহেডে ফলাও করে ছাপানোটাও নীতিবিরুদ্ধ কি না তা প্রাপক বা জনসাধারণের কারও স্পষ্ট জানা নেই।

নির্মলা দেবীর নিজের মুখেই শুনলাম, একজন আন্তর্জাতিক সিভিল সারভেন্টের স্ত্রী হিসেবে দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ানোর এবং পৃথিবীকে ভালভাবে দেখবার বিরল সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন। প্রবাসে সংসার পাতলেও দেশের অনুভূতি থেকে নির্মলা দেবী নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি, বরং ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ধারাবাহিকতা তাঁকে অকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রীয় সাধক জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম প্রমুখের জীবন ও সাধনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। নির্মলা দেবী বললেন, "ওই যে দু' বছর ডাক্তারি পড়েছিলাম তা সমস্ত জীবনে কাজে লেগে গিয়েছে। আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে এগোবার সময়ে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতাও সাহায্য করে।"

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় নির্মলা দেবীর সাফল্য কিন্তু বেশী দিনের নয়। বিশেষ কোনও গুরুর ওপর নির্ভর করা বিদেশে বসবাসের জন্য সম্ভব হয়নি। মাত্র সেদিন (৫ই মে ১৯৭০) কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের বিরল অভিজ্ঞতা তিনি অনুভব করলেন। এবং সেই থেকে সহজ পথে সহজ যোগী হবার ইচ্ছা জাগলো।

নির্মলা দেবী বললেন, "সংসারাশ্রমে থেকেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জন করা

সম্ভব। আমি নিজে গৃহবধূ, দুটি কন্যা-সন্তানের জননী। স্বামীর সাংসারিক দায়দায়িত্ব আমি কখনও অবহেলা করিনি। মেয়েদেরও মন দিয়ে মানুষ করেছি, তাদের বিবাহ দিয়েছি। দিদিমা হয়েছি। আমি রান্নাবান্না মন দিয়ে করেছি। শ্বশুরবাড়ির লোকদের ওপর আমার দায়দায়িত্ব সাধ্যমতন পালন করেছি। শ্বশুরবাড়িতে আমার বেশ সুনাম আছে বলাটা বোধ হয় অন্যায় হবে না। এরই মধ্যে আত্ম-অনুসন্ধান চালিয়ে গিয়েছি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে সত্যকে কিছুটা উপলব্ধি করেছি। আমার মনে হয়েছে এই পথ মোটেই দুর্লঙ্ঘ্য নয়, অতি সহজেই তা অতিক্রম করা যায় এবং মানুষকে তা জানানো উচিত। সেই কাজই সাধ্যমতন করে যাচ্ছি, গত কুড়ি বছর ধরে।"

নির্মলা দেবী বললেন, "আমি প্রতিষ্ঠান গড়ায় বিশ্বাস করি না। আমি গুরুগিরি করে পয়সাও রোজগার করি না, যা আমি জানি তা সবার মধ্যে বসে বলি। অনেকে ভরসা পায়।"

ফরাসি দেশে সহজ যোগের প্রচার সম্পর্কে কথা হলো। ইউরোপের মধ্যে ভিয়েনাতেই এই যোগের প্রসার হয়েছে সর্বাধিক, তার পরেই প্যারিস। এইখানেই নানা কেন্দ্রে সহজ যোগের চর্চা চলছে নিয়মিত। নির্মলা দেবীও ফ্রান্সে চলে আসেন বছরে তিন-চারবার।

ফরাসির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নির্মলা দেবী কিছু সরস মন্তব্য করলেন। "ফরাসিরা খুবই সুরুচিবোধসম্পন্ন, অত্যন্ত আর্টিস্টিক জাত। ওরা যা কিছু করে তা অন্যের থেকে একটু আলাদাভাবে করার চেষ্টা চালায়। এমনকি ওদের বথরুমগুলোও আলাদা ধরনের।"

এর পরের মন্তব্যটিও মনে রাখবার মতন। "ফরাসিরা অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং এই ইনডিভিজুয়ালিটি থেকেই এদের অনেক সমস্যা শুরু হয়। সাহিত্যকে এরা ব্যক্তিজীবনে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছে—মোপাসা, জোলার কাছ থেকে ওরা যা নিয়েছে তাতে ওরা আরও জ্বলেপুড়ে মরছে। ইদানিংকালে সার্ত্রের চিন্তাও ফরাসি মনের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে—ওঁর 'উইলপাওয়ার' বা ইচ্ছাশক্তি এবং ফ্রয়েডের 'সেক্সপাওয়ার' বা যৌনশক্তি ফরাসিকে দিকভ্রান্ত করেছে। ফ্রয়েডের বক্তব্যকে খোদ ভিয়েনাবাসীরা তেমন পাত্তা দেয়নি, কিন্তু ফরাসিরা ওঁকে মাথায় তুলেছে। ফরাসি ভুল করে মরালিটিকে এক ধরনের ইনহিবিশন বা মনস্তাত্ত্বিক বাধা মনে করেছে। সেই সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কিছুটা দুমুখো মূল্যবোধ— লোককে সব সময় পাপীতাপী বলা, আবার পাশাপাশি কিছু যাজকদের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে নানারকম মুখরোচক গালগল্প ছড়ানো। ফলে, কিছু লোক ভাবলো নৈতিকতার কোনও প্রয়োজন নেই।

"নৈতিক অধঃপতনের অনেক নমুনা ফরাসি দেশে পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু

কলেজের মেয়ে নাকি দামি হোটেলে ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করে না। ধনী আরব, ধনী আমেরিকান এদের শারীরিক সান্নিধ্যে উল্লসিত হয়। অনেক গ্রামে সন্ধ্যা সাতটায় কাউকে পাওয়া ভার। সাড়ে ছয়টা বাজলেই তাঁরা মদের বোতল নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। মাতাজি একবার প্রিয় ফরাসি ভক্তদের বলেছিলেন, "তোমাদের রকমসকম পাল্টানোর সময় এসেছে। যে-শহরে প্রত্যেক পাঁচটা ল্যাম্পপোস্ট অন্তর একজন বেশ্যা অপেক্ষা করে এবং প্রতি দশটা ল্যাম্পপোস্ট পর পর একটা সুঁড়িখানা জাঁকিয়ে বসে আছে, সেখানে মানুষ তার মূল্যবোধ ফিরে পাবে কী করে?"

একটা গোপন খবর পাওয়া গেলো। কিছু-কিছু প্রাচীন ধনী পরিবারে (এঁর মধ্যে নাকি কিছু ইহুদিও আছেন) ছেলে বায়োপ্রাপ্ত হলে অভিজ্ঞ কোনও বারবনিতাকে প্রাইভেট টিউটরের মতন নিয়োগ করা হয় ছেলেকে যৌনশিক্ষায় স্নাতক করে তোলবার জন্যে। হয়তো প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, কিন্তু 'যাহা রটে কিছু বটে' বলে একটা প্রবাদে দুনিয়ার মানুষ আস্থাশীল।

সুরসিকা মাতাজির মন্তব্য ; "ফরাসিদের মতন সৃষ্টিশীল মানুষ দুনিয়ার কোথাও নেই। কিন্তু সেক্সকে এরা বড় বেশি প্রশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার এই দেশে মানুষের ওপর ফ্যাশনেরও বড় বেশি অত্যাচার। সেই দিক থেকে 'অপ্রেসিভ' সমাজ বলা যায়। ফ্যাশনের ধারা যে-মুখো সে-মুখো মানুষ ছুটতে বাধ্য হয়। হঠাৎ যদি উঁচু হ্যাটের ধুয়ো উঠলো সবাই উঁচু টুপি পরতে লাগলো। চুলের স্টাইল যেমনি পাল্টানো অমনি তোমাকে ছাঁট ওইরকম করতে হবেই। স্কার্টের ঝুল যদি কমলো তোমাকেও ওই ধরনের স্কার্টের খরিদ্দার হতে হবে, তাতে যদি তোমার হাঁটবার অসুবিধে হয় তা হলেও। এই সব আজব স্টাইলের জন্ম হয় প্যারিস শহরে, তারপর তা ফরাসি দেশের সীমানা পেরিয়ে ফিনল্যান্ড পর্যন্ত চলে যায়। এমন জুতো হয়তো ফ্যাশন হলো যা পরলে হাঁটতে অসুবিধে হয়, শিরে টান ধরে। কিন্তু ঘাবড়াও মত, ওই পরে মেয়েমানুষকে ঘুরে বেড়াতে হবে, তাতে যদি ভেরিকোজ ভেনের যন্ত্রণা বাড়ে তা বাড়ুক।"

'কায়স্থ' কথাটির চমৎকার ব্যবহার করলেন নির্মলা দেবী। কায় মানে শরীর— এই শরীর সামলাতেই কায়েত ফরাসি সদাব্যস্ত। তবে হ্যাঁ, রান্নার শিল্পটা আয়ত্ত করেছে বটে। খাওয়া-দাওয়ার খানদান কাকে বলে ফরাসি তা জানে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলে কী অর্ডার দেবে তা ঠিক করতেই খানদান ফরাসি পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিয়ে নেয়।

নির্মলা দেবী বললেন, "দুনিয়ার ভারতীয়দের যতই বদনাম রটুক, আমাদের ঐতিহ্য আমাদের ভীষণ 'মাইল্ড' বা মৃদুস্বভাবের করে তোলে। আর পশ্চিমী সভ্যতা হলো অ্যাগ্রেসিভ—আক্রমণপ্রবণ। নিজের যা ভাল লাগে তা অপরকে

গেলাবার জন্যে পশ্চিমী মানুষ উঠে পড়ে লাগবে। আর শ্রদ্ধা জিনিসটা ওদের ঘটে নেই। ফ্রয়েড মাকে কী যে বলে বসলেন যে পশ্চিমের বারোটা বাজলো। আমরা মাতৃপূজারীর দেশ, আমরা বোনের ওপর মায়ের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতা দেখাতে পারি, আমরা ওই সব সম্পর্কের মধ্যে সেক্স নামক. পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাই না।

"আপনি প্যারিসের মেট্রো এবং বাসে একটু নজর করলেই কিছু সিজোফ্রেনিক দেখতে পাবেন। আপনার দুঃখ হবে, বাসে ট্রেনে নিঃসঙ্গ মানুষ মানসিক রোগের বলি হয়ে একলা-একলা বিড়-বিড় করে কথা বলছে।

"ভারতবর্ষের অ্যাধ্যাত্মিক শান্তি ফরাসিদের প্রয়োজন রয়েছে। এঁরা সহজ যে'গের ব্যবহার করেছেন ভালভাবে। কেউ-কেউ তাঁদের ছেলেমেয়েকে ভারতবর্ষের কোনও ইস্কুলে পড়াতে চাইছেন, কারণ ভারতীয় মূল্যবোধকে এঁরা নতুনভাবে আবিষ্কার করে গ্রহণ করতে চাইছেন।"

নির্মলা দেবীকে শেষ প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনি ফরাসি জাতকে ভালবাসেন, এই জাতকে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখছেন, এক কথায় এঁদের কী বলা যায়?"

একটু ভেবে নিয়ে নির্মলা দেবী উত্তর দিলেন, "গত শতাব্দীতে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার মানুষদের সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদারস অফ আমেরিকা বলে সম্বোধন করেছিলেন। ফরাসি দেশে আমার প্রথম সভায় আমি ওদের যা বলে সম্বোধন করেছিলাম তা হয়তো আপনার কাজে লাগতে পারে। আপনি ভিক্টর হুগোর বই নিশ্চয় পড়েছেন। উনিই ও-জাতের শ্রেষ্ঠ নামকরণ করে দিয়েছেন, আমি ব্যবহার করেছি। আপনিও ব্যবহার করতে পাবেন—লে মিজারেবল -ওই একটি কথায় ফরাসিদের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।" এই বলে নির্মলা দেবী হাসতে লাগলেন।

আমিও ঘড়ির দিকে তাকালাম। অনেক সময় কেটে গিয়েছে, এবার উঠে পড়া দরকার।

দু'একদিনের কসরতেই আমি যাকে বলে নাকি 'চোস্ত' প্যারিসিয়ান হয়ে উঠছি। প্যারিসের নাকি এইটাই ধর্ম—যে কোনও দূরত্বকে এই শহর হজম করে ফেলতে পারে। অনেকটা কামরূপ কামাখ্যার মোহিনীমায়ার মতন। দুনিয়ার কত

সেরা মানুষকে ভেড়া বানিয়ে প্যারিস যে নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি করে রেখেছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্যারিস যদি ঠিক করে কারও মাথা চিবোবে, ত[illegible]ার বাঁচার উপায় নেই।

প্যারিস যে মানুষের স্বভাব পাল্টে দেয় তা আমি নিজেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। যে আমি সাতান্ন বছর ধরে সকাল-সকাল বিছানায় গিয়ে সকাল-সকাল শয্যাত্যাগ করে স্বাস্থ্যবান ও বিচক্ষণ হবার স্বপ্ন দেখেছি সে-ও এখানে প্রায়-নিশাচর হয়ে উঠেছি। কিন্তু মজা এই যে রাতে অনেকক্ষণ ঘুরেছো বলে দিনে অনেকক্ষণ ঘুমোতে হবে এমন কোনও বন্ধন নেই প্যারি নগরীতে। সর্ব অর্থে মুক্তির স্বাদ পাবার মহানগরী এই প্যারি, শুধু পকেটে যেন কিছু পয়সা থাকে মঁশিয়ে মহাশয়!

এমন এক সময় ছিল যখন সস্তাগণ্ডার শহর ছিল এই নগরী—কম পয়সায় বোহেমিয়ান জীবনযাপনের মক্কা অথবা মথুরাপুরী বলা চলতে পারে। তাই হদো-হদো আমেরিকান, ইংরেজ নিজের দেশের জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে প্যারিসে স্বর্গসুখ লাভের আশায় ছুটে এসেছে। প্যারিসও সেই সময় একটু বোকাসোকা ছিল। চাইতো দুনিয়ায় ভদ্দরলোকেরা, শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা, দার্শনিকরা, বিপ্লবীরা এখানে আসুন, মানবতীর্থ হয়ে উঠুক এই মহানগরী। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের পর থেকে ফরাসি ক্রমশ চালাক হয়ে উঠেছে। ইদানিং কোনও ঝুটঝামেলায় যেতে চায় না ফরাসি নাগরিক। এখন ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর? ফরাসি এখন তাই চায় শাঁসালো বিদেশিকে—যার পকেটে সীমাহীন ডলার, মার্ক অথবা ইয়েনের গোল্ড ক্রেডিট কার্ড। সুযোগ বুঝে ফরাসি এখন প্যারিকে করে তুলেছে পৃথিবীর অন্যতম 'খরুচে' শহর—যেখানে কোনও কিছুই সস্তা নয়। কিন্তু প্যারিস ভাগ্যবান, বড়লোকদের শহর হয়েও তার 'জনতা' ভাবমূর্তিটি সাফল্যের সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে।

আমার আশ্রয়দাতা তার অথিতিকে নিশাচর বানালেও দুপুরে টোটো কোম্পানির ম্যানেজার হতে বাধা দেয়নি। যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয় তার জন্য আছে ইব্রাহিম, হাত বাড়ালেই বন্ধু। আরও আছে অপার স্বাধীনতা—যদি বাইরের কাউকে বন্ধু নির্বাচন করি তাতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ফরাসি পথপ্রদর্শিকার প্রলোভনও রয়েছে শাইনিং ডাকসাইটে সেক্রেটারি ক্যারোলিনের মধ্যে। সমস্ত কাজ ফেলে রেখে সে আমার সঙ্গে যে কোনো সময় বেরিয়ে পড়তে রাজি আছে। কিন্তু ক্যারোলিনের মুশকিল আমি আন্দাজ করতে পারি—পথে যা দেখি তা আমার কৌতূহলের উদ্রেক করে। অর্বাচীন বালকের মতো এতোই প্রশ্ন করি যে ক্যারোলিনের ইংরিজির ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়।

বেচারি হাঁপিয়ে ওঠে আমাকে সামলাতে। আমার ফরাসি জানা থাকলে তার কাজটা কত সহজ হতো ভেবে ক্যারোলিন হা-হুতাশ করে।

ক্যারোলিন বুঝতে পারে না, এই শহরের রাজপথে অবাক হবার মতন কী আছে? ওর ধারণা, প্যারিস একটা 'অর্দিনারি' সিটি। আমি কী করে এই সুন্দরীকে বোঝাই, 'অর্দিনারি' তো নয়ই 'সুপার একস্ট্রা-অর্ডিনারি' শহর বললেও প্যারিসের কিছুই বলা হলো না। প্যারিসে পথচারীদের চালচলন, দোকানের বাহার, বিজ্ঞাপনের কারিকুরি সবই আমাকে মুগ্ধ করছে।

আমার ধারণা হয়েছে, ফরাসি যা কিছু করে স্টাইলে করতে ভালবাসে। গত রাত্রেই একটা ভিডিও ছবি দেখেছি, গিলোটিনে মাথা কাটবার আগেও ফরাসি বধ্যভূমিতে চুল ছাঁটার ব্যবস্থা রেখেছিল। সম্রাট ষোড়শ লুই গিলোটিন হবার আগে ওই হেয়ার কাটিং থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, কিন্তু বিপ্লবী ফরাসি রাজি হয়নি। একটা সভ্যজাত খেপে উঠলে কতখানি বর্বর হয়ে উঠতে পারে তা জানতে হলে আরেকবার ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস টুক করে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। বাস্তিল ধ্বংসের দ্বিশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে চমৎকার সব বই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বেরিয়েছে।

এখন আমি যাঁর সঙ্গে পথে বেরিয়েছি তিনি পাঁচুদা। মিছরিদা বিমান-ডাকে তাঁর স্নেহের পাঁচুকে এস-ও-এস পাঠিয়েছিলেন, কাশুন্দের প্রাক্তন নাগরিক হিসেবে পাঁচুদা সাড়া না দিয়ে পারেননি, যদিও দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

"পাঁচুদা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি কেন?" এই সব প্রশ্ন করার ইচ্ছে থাকলেও করা হলো না। হাজার হোক পশ্চিমের লোকরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও মাথা গলানো পছন্দ করে না।

আর ওই সব পুরনো কুশুন্দি ঘেঁটেই বা কী লাভ? পাঁচুদা যে দেশের লোকের চিঠি পেয়ে আমার খবর করতে এসেছেন এইটাই না আমার সাত পুরুষের ভাগ্য। আমি শুধু জানি, পাঁচুদা এখানকার বঙ্গীয় সমাজে সুপরিচিত নন। স্বয়ং সম্বিৎ গৃহিণীও ওঁর খবর রাখে না যদিও সবাই স্বীকার করে কত বাঙালি এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সকলের পাত্তা জোগাড় করা সম্ভব নয়। বছরে একবার বাঙালিরা নিজেদের বাঙালি হিন্দুত্ব জাহির করবার জন্যে দুর্গাপূজার অয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখনও যারা নিজেদের টিকি দেখায় না তারা স্থানীয় বাঙালির খরচের খাতায় লেখা হয়ে যায়।

আসলে এমন দেশি ভাই বেশ কিছু রয়ে গিয়েছেন এই ফরাসি দেশে। তাঁরা বাঙালির সঙ্গে নিরন্তর আড্ডা মারার জন্যে অথবা প্রবাসী বাঙালির পলিটিক্স-এ অংশ নেবার জন্যে দেশ ছেড়ে অনাবাসী হয়নি। তা ছাড়া হাতে অত সময়

সবার নেই—বিদেশের পক্ষে ফরাসি দেশ যে সর্বসুখের আকর নয় তা তো এই নিবন্ধের পাঠকরা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। অনাবাসী ইন্ডিয়ানের পক্ষে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত ফারাক। এখানে যে বাঙালিদের তেমন চোখ ধাঁধানো সাফল্য নেই তা ইতিমধ্যেই আন্দাজ করতে পারছি। তাতে অবশ্য কী এসে যায়? দুনিয়ার সব প্রবাসীকেই যে কোটিপতি হতে হবে তার কী মানে আছে? দুনিয়ার সর্বত্র যে দু-একজন বঙ্গবাসীর খোঁজ পাওয়া যায় এইটাইতো তো যথেষ্ট।

আমি ভেবেছিলুম, পাঁচুদা আমাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাবেন। কিন্তু তা করলেন না। টেলিফোনে বললেন, মেট্রোর সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

পাঁচুদাকে চেনা যাবে কী করে? সেই কোন ছাত্রাবস্থায় ওঁকে দেখেছি অন্তত চল্লিশ বছর আগে। পাঁচুদা মোটেই চিন্তিত হলেন না। বললেন, "এখানে ক'টা ইন্ডিয়ান আছে যে চেনা যাবে না?" তারপর মোক্ষম মন্ত্র ছাড়লেন। "আমার কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি কাপড়ের ব্যাগ ঝুলবে, কমলালেবু রঙের" জয় হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, শুনেছি এই 'রাবীন্দ্রিক' স্টাইলের জনক কবি নন, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। এই শান্তিনিকেতনি ঝোলাই বিশ্বের দরবারে বাঙালিকে বিশিষ্টতা দিলো।

সময় সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। মেট্রোর প্রবেশপথে বিনা হাঙ্গামায় পাঁচুদাকে আবিষ্কার করা গেলো। এখন অপরাহ্নবেলা। এই সময় মেট্রোতে ভিড় যেন একটু কম। জয় হোক মেট্রোর—ফরাসি জাত এই এক দাবার চালে প্যারিসের পরিবহণ সমস্যার মোটামুটি সমাধান করে নিয়েছে। কলকাতায় আমাদের এই সুখ কবে হবে গো! কবে? সেই মাতৃক্রোড় থেকে শুনছি, কলকাতায় মেট্রো এলো বলে। তারপর খোঁড়াখুঁড়ি হলো—বছর কুড়ি ধরে ব্যান্ডেজবিহীন অবস্থায় কাটাছেঁড়া কলকাতা ভিখিরির মতন বিশ্বভুবনের ফুটপাতে পড়ে আছে এবং কাতরাচ্ছে। পাঁচুদা একেবারে পাল্টে গিয়েছেন। স্রেফ লাফ দিয়ে কৈশোর থেকে বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছেন। চল্লিশ বছর ধরে পাঁচুদার যে স্মৃতিটা মনের মধ্যে আঁকা ছিল তা এই প্যারিসের সেপ্টেম্বরে মুছে গেলো। পাঁচুদার রং টিপিক্যাল বেঙ্গলি ব্রাউন—বাঙালি বাদামী। লম্বায় বাঙালির তুলনায় একটু উঁচু। টিকলো নাক। চোখদুটো টানাটানা। শেষ যখন পাঁচুদাকে দেখেছি তখন যেন চাঁচাছোলা গাল ছিল, এখন একটু দাড়ি। কিন্তু মাথায় মরুভূমি। পাঁচুদার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে।

পাঁচুদা কাশুন্দের স্বাভাবিক রসবোধ হারায়নি। বললেন,—"তুই কি হেমিংওয়ের ভক্ত?"

অবশ্যই। তবে ওঁর লেখার, ওঁর জীবনযাত্রার নয়। গোটা চারেক স্ত্রী ম্যানেজ করেছিলেন ভদ্রলোক।

পাঁচুদা বললেন, "ওঁর দাড়িটা তো দুনিয়ার দাড়িওয়ালাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু ওটা স্টাইল নয়। রোদে ঘুরে-ঘুরে স্কিন ক্যানসার হয়েছিল, ব্লেডের ধকল সইতে না পেরে হেমিংওয়ে ওই স্টাইলের দাড়ি রেখেছিলেন। আমার স্কিন ক্যানসার নয়, ও রোগটা বাঙালিদের হয় না। কিন্তু ব্লেড চালালেই জ্বালা করতো, তাই দাড়ি রেখেছি।"

"আমাদেরও গাল জ্বালা করে, পাঁচুদা। কিন্তু তা চামড়ার দোষে নয়, ব্লেডের দোষে! স্বদেশিযুগে তিনটে আইটেম স্বদেশিয়ানার বাইরে রাখা উচিত ছিল—হুইস্কি, ফাউন্টেনপেন এবং ব্লেড। এই তিনটে তৈরি শিখতে ইন্ডিয়ানরা বোধহয় কোনওদিনই পারবে না।"

পাঁচুদা বকুনি লাগালেন, "এখানে এসব ব্যাপারে একদম মুখ খুলিস না। তোর প্রত্যেকটা কথা মেনে নেবার জন্যে বহু ইন্ডিয়ান এবং তাদের ফরাসি বউরা উঁচিয়ে বসে আছে। অথচ এই ফরাসি একদিন স্ট্রাইক করেছিল, ঢাকাই মসলিনের আমদানি বন্ধ করে ফরাসি তাঁতিকে বাঁচাও, ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

পাঁচুদা ও আমি মেট্রোতে চড়ে বসেছি। প্রতিটি ট্রেনেই দেওয়াল লিখন, যার নতুন নাম গ্রাফিত। মেট্রো কর্তৃপক্ষ হাহাকার করছেন, এই সব দেওয়াল লিখন থেকে গাড়িগুলোকে উদ্ধার করবার জন্যে নাকি কোটি-কোটি ফ্রাঁ বাজে খরচ হচ্ছে। কিন্তু ফরাসি বাউন্ডুলেদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেলো। এই সব ছোকরা এবং ছুকরিদের শিল্পবোধ বেশ উন্নত ধরনের। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা কমলে কলকাতার কিছু বাউন্ডুলেকে কলকাতা কর্পোরেশনের খরচায় এ-দেশের বাউণ্ডুলেদের কাছে ট্রেনিং-এ পাঠানো নিতান্তই জরুরি। কলকাতার দেওয়াল লিখনের সাম্প্রতিক অধঃপতন বাঙালির অবক্ষয়ের আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। নব্বুইয়ের দশকের বাঙালি যে নাচতে, গাইতে, ছবি আঁকতেও ভুলে যাচ্ছে তা কলকাতা শহরের হালচাল একটু সাবধানে নজর করলেই ধরা পড়ে যাচ্ছে।

পাঁচুদা বললেন, "প্যারিসের মেট্রোতে কলকাতার লোকাল ট্রেনের মতন ভিখিরি-গাইয়ে ওঠে। এখন একটু ভিড় কমের সময়। আজকাল ফরাসি ভিখিরিও প্রোডাকটিভিটি সচেতন হয়ে উঠেছে, যখন পড়তা কম তখন সে ভিক্ষের পরিশ্রম করবে না। তুই সকালের দিকে ট্রেনে ঘুরিস, ভাল লাগবে।"

এবার পাঁচুদা ও আমি মেট্রো থেকে বেরিয়ে এসেছি। কেন এই স্টেশনে নামলাম তা আমার জানা নেই। নিষ্কাম ভ্রমণ তো এই রকমই হওয়া উচিত।

কোথাও কোনও প্ল্যানিং নেই, যখন যা-খুশি করা।

কিন্তু পাঁচুদা বুদ্ধিমান লোক। বহুদিন দেশছাড়া হলেও হাওড়া-কাশুন্দের মানসিকতা বোঝেন। নিষ্কাম ভ্রমণের জন্যে এই অজানা দেশে আমি যে হাজির হইনি তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

"শঙ্করীপ্রসাদের মতন তোরও কি বিবেকানন্দ বাই আছে নাকি? তা হলে স্বামীজি কোন বাড়িতে কী করেছিলেন তা দেখিয়ে আনি।"

"না, পাঁচুদা বিবেকানন্দটা আমার বিজনেস নয়, যদিও আপনার মতন বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়েছি এবং কিছুদিন পড়িয়েওছি। আপনি ঠিক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে নেই, থাকলে ওই সব খোঁজখবর নিতেই ছুটতেন।"

"তোকেও তো করে খেতে হবে। আমি মিছরির কাছে শুনেছি, তুই নিজের দেশে পরকে এবং পরের দেশে নিজেকে খুঁজে বেড়াতে ভালবাসিস।"

কী আশ্চর্য! মিছরিদা, এই রকম লিখিতভাবে আমার ভাবমূর্তি কলুষিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন! স্বদেশে ফিরে গিয়েই ছেঁচোদাকে দিয়ে একখানা উকিলের চিঠি পাঠাবো মিছরিদাকে।

পাঁচুদা স্মৃতিসলিলে অবগাহন করতে চাইছেন। "মনে আছে তোর? শঙ্করীপ্রসাদ বাল্যকালে কেমন ল্যাকপেকে প্যাঙপেঙে ছিল! ও যে স্বামীজি সম্বন্ধে বস্তা-বস্তা লিখে ফেলবে তখন কে ভবেছিল? জানিস, এখনও হাওড়া খুরুটের বিবেকানন্দ ইস্কুলটা চোখের সামনে দেখতে পাই। সেবার বিবেকানন্দ জন্মদিনে স্বামীজির ভাই ভূপেন দত্ত এসেছিলেন। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলেন। আমার অবশ্য তখন ওদিকে নজর নেই—সমস্ত চিন্তা তখন বাড়তি কমলালেবু বাগাবার দিকে। গজেন, আমাদের বেয়ারা, প্রশ্রয় দিয়েছিল, সহযোগিতা করেছিল। তবেই-না টয়লেটের দরজা বন্ধ করে ওই লেবু খাওয়া গিয়েছিল।"

পাঁচুদা মনে-মনে হাওড়া পরিভ্রমণ করে পরমুহূর্তেই প্যারিসে ফিরে এলেন। আমার সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করে চমৎকার বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিলেন। "অল্প সময়ের মধ্যে তোকে এমন সব জিনিস দেখতে হবে যা আগে তেমন কারও নজর আসেনি। সেই সঙ্গে এমন জিনিস তোর দেখা প্রয়োজন যা ফরাসি চরিত্রের ওপর কিছু আলোকপাত করবে।"

লং লিভ, পাঁচুদা। হাজার হোক হাওড়া-কাশুন্দের লোক, ব্যাপারটা চমৎকার বুঝে গিয়েছেন।

পাঁচুদা বললেন, "এখনকার দু-একজন জাঁদরেল সমাজতাত্ত্বিক সন্দেহ করছেন, জাতীয় চরিত্র বলে আদৌ কিছু আছে কি না। এক-একটা দেশ সম্বন্ধে

এক-এক রকম ধারণা মানুষের হয়ে থাকে, কিন্তু তা সব মানুষের ক্ষেত্রে আদৌ খাটে না। এই ধর, জার্মানের কথা—প্রচণ্ড পরিশ্রমী, কাজে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে বলে দুনিয়াজোড়া সুনাম। অথচ আমার দুটো-তিনটে জার্মান বন্ধু আছে, কুঁড়ের রাজা। কোনও কিছুই ভাল ভাবে করবার আগ্রহ নেই তাদের। একজন লোকের রুমমেট হয়ে ছ'মাস কাটিয়েছি। সে নিজেই বলেছে, তুমি জার্মান আর আমি ফরাসি অথবা বাঙালি যা বলো। দুনিয়ার লোক কুৎসা রটায় ইংরেজ রাঁধতে জানে না। আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিল তার ফরাসি বউ রান্নার অ আ ক খ জানতো না, আর এই ইংরেজ সায়েব রাঁধতো চমৎকার। লোকে বলে ইহুদিরা ধান্দাবাজ। টাকাহি জীবনম্, টাকাহি পরমন্তপ। আমি এমন ইহুদি দেখেছি যে টাকার পিছনে ছোটেই না, কায়ক্লেশে এই প্যারিসে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে। লোকটার মধ্যে কোনও আর্থিক আগ্রহই নেই।"

ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে নিয়মকে, ইস্কুলে হাঁসুদা বলতেন, আমি মনে করিয়ে দিই পাঁচুদাকে।

"কিন্তু তুই ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে দ্যাখ—ব্যতিক্রম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। দুনিয়া ক্রমশ ফ্রুটজুস ককটেলের মতন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ফরাসি আর হানড্রেড পার্সেন্ট ফরাসি নেই, ওর মধ্যে জার্মান, ব্রিটিশ, ইতালিয়ান, আমেরিকান এমনকি আলজেরিয়ান, বাঙালি মেজাজ মিশে যাচ্ছে।"

পাঁচুদার অনুরোধ, "তোকে এই সব কথা মেনে নিতে বলছি না। মেনে নিলে ভ্রমণসাহিত্য থেকে রসরসিকতা উঠে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় রাখিস আর সম্ভব হলে দেশের লোকদের বলিস। বাঙালিদের মধ্যেও বা ক'জন বাঙালি আছে? বাঙালি-বপুর আড়ালে কোথাও জার্মান, কোথাও ইংরেজ, কোথাও পাঞ্জাবি কোথাও মাড়ওয়ারি অপারেট করছে। সেইটাই তো হওয়া উচিত, দুনিয়ার সব জাত পরস্পরের গুণগুলো গ্রহণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। ফলে দূরত্ব কমে যাচ্ছে। এই যে জাপানিদের দেখছিস। দেখবি দু'হাজার সন নাগাদ সমস্ত ইউরোপে জাপানিত্ব ঢুকে যাবে, আর ওই সময়ে এই জাপানও অনেকটা আমেরিকান অথবা ইউরোপিয়ান হয়ে উঠবে।"

"জাতীয় দোষগুলোর কী হবে পাঁচুদা? আগে তো বলতো একশ ভাল আমের মধ্যে একটা পচা আম থাকলেও সঙ্গগুণে পচা আম ভাল হয় না, বরং বাকি আমে পচন শুরু হয়।"

পাঁচুদা হাসলেন, "হাওড়াতে তোরা বড্ড হতাশায় ভুগিস। তুই যা বলেছিস এসব ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা। এ-যুগে পৃথিবীর অনেক জাত অন্যের গুণগুলো গ্রহণ করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই জাতীয় চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে, তাতে কিছু হাসির লেখক ছাড়া দুনিয়ার কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।"

আপনি বলছেন, "এইভাবে প্রয়োজনের প্রেশারকুকারে সেদ্ধ হয়ে মনুষ ক্রমশ নিখিল মানবতার দিকে এগিয়ে যাবে?"

"হতে বাধ্য, ভায়া," পাঁচুদা আমার পিঠে হাত রাখলেন। "একসময় মার্কিন দেশকে মেল্টিং পট বলা হতো। এখন সারা দুনিয়াটাই ওইরকম হতে চলেছে। চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ সব এক হাঁড়িতে সেদ্ধ হয়ে গেলে এক বিচিত্র খিঁচুড়িতে পরিণত হচ্ছে। জাতীয় বিশেষত্বটা এখন একটু ঘিয়ের মতন স্রেফ ফ্লেভারের জন্যে ওপরের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

"এসব কী বলছেন, পাঁচুদা! তা হলে লেখকের তো দেশ ভ্রমণের কোনো মানেই থাকবে না।"

পাঁচুদা শোনালেন : "বহুদিন প্রবাসে পরবাস করে বুঝলাম অতীতের দিকে অতিমাত্রায় মুখ ঘুরিয়ে যে-জাত যত বেশি বসে থাকে তার কপালে তত দুঃখ। তার প্রগতি তত শ্লথ। দুনিয়া এখন নতুনভাবে বিকশিত হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে, সবার নজর ভবিষ্যতের দিকে। ইউরোপে এখন কেবল দুটো শব্দ—টুডে অ্যান্ড টুমরো। তাই লাল রাশিয়া গেরুয়া রামকৃষ্ণ মিশনকে ডাকছে, ক্ষত্রিয় জার্মানি বৈশ্য ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে, আর্টের সমঝদার ফরাসি ইলেকট্রনিককে ঈশ্বররূপে পুজো করতে চাইছে। বৈশ্য আমেরিকা গবেষণাগারে সরস্বতীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে ব্রাহ্মণ হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।"

ঠিক কথাই বলছেন বোধহয় পাঁচুদা। আমাদের দেশের অবস্থাটা দ্রুত মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল। পৃথিবী যতই অতীতের ভুলভ্রান্তি ভুলে নতুন কিছু করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে আমরা ততই অতীতের কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বের করছি। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে কোন জাত কার ওপর কী অন্যায় করেছিল তার খতিয়ান বের করে সুদসমেত উসুল চাইছি, ঘড়ির কাঁটাকে আমরা জোর করে পেছনে ঠেলতে বদ্ধপরিকর। ভবিষ্যতে আমাদের রুচি নেই, ভরসা নেই। আমরা অতীতের সাড়ে তিন গণ্ডার হিসেব নিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

পাঁচুদা অতটা নিরাশ হতে প্রস্তুত নন। বললেন, "বই-টই পড়া কি কমে গিয়েছে দেশে? ইদানিং যেসব বইপত্তর বেরুচ্ছে তার খোঁজখবর করলে দুনিয়ার খবর তো জানা হয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।"

আমি বললাম, "জওহরলাল, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীর নাম ভাঙিয়ে আর কতদিন চলবে জানি না। আমাদের আন্তর্জাতিক চেতনা কমে যাচ্ছে পাঁচুদা। আমরা বইটই না ঘেঁটে ভিডিও ছবির খপ্পরে পড়েছি। অমিতাভ বচ্চন, শ্রীদেবী, এন-টি-আর যা ভাবছে না তা সমস্ত জাতটাও ভাবতে রাজি নয়।"

"খবরের কাগজগুলো কী করছে?" জানতে আগ্রহী পাঁচুদা।

"আমাদের মতন আমাদের কাগজগুলোও কূপমণ্ডুক হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার বস্তাপচা নেতিবাচক খবরগুলো ওখানে জায়গা পায়, কিন্তু এক-একটা জাত কীভাবে নিজেকে পুনর্গঠিত করতে পারে তার বৃত্তান্ত নেই। এই-যে কমন মার্কেটের নামে ইউরোপে মহাবিপ্লবের সূচনা হয়েছে তার সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মানুষের স্পষ্ট কোনও ধারণাই নেই। ফলে প্রত্যেকেই চাইছে রাজ্যে রাজ্যে আরও প্রাচীর উঠুক, এ-জেলার লোক যেন অন্য জেলায় কাজ না পায়। ভারতবর্ষের কৃষিজমি যেমন আলে-ভরা, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনও তেমন বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতার দেওয়ালে বোঝাই হয়ে উঠছে। এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন জোগাচ্ছে নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত সমাজ—পৃথিবীর বর্তমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে নিজের শিক্ষা নির্ধারিত করার মতন সাধারণ বুদ্ধি আমরা হারাতে বসেছি, পাঁচুদা। এক হাজার বছর হুটোপুটি করে বিশ্ব যে সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ইতিহাসের ডাস্টবিনে ফেলে দিতে চলেছে আমরা সেইগুলো ঘরে তুলে আনবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠছি।"

পাঁচুদা আবার বললেন, "হ্যাঁ রে, দেশের লোকরা কি বই-টই পড়া কমিয়ে দিচ্ছে?"

বলতে লজ্জা হলো, "বই পড়ার কোনও সুযোগই নেই আমাদের শহরে। এক কোটি লোকের শহর কলকাতা, কিন্তু হাতে দেবার মতন আধুনিক ইংরিজি বই পাওয়া যায় মাত্র দু'টি বিদেশি রাজ্যের লাইব্রেরিতে। আর কিছু জায়গায় বস্তাপচা ম্যানেজমেন্টের বই কিংবা ইংলিশ মোহন সিরিজের নভেল। সমস্ত হাওড়া শহরে, আধুনিক জ্ঞানের বই তো দূরের কথা, একখানা হাল আমলের এনসাইক্লোপিডিয়া নেই কোনও লাইব্রেরিতে। অথচ আমাদের কাগজে অর্থমন্ত্রীর, সংস্কৃতি মন্ত্রীর, গ্রন্থাগারমন্ত্রীর ছবি নিয়মিত বেরোয়।"

পাঁচুদা বললেন, "তোকে দু-একটা মজার জিনিস দেখাই।"

এদিক-ওদিক হাঁটতে-হাঁটতে পরের পর কয়েকটা বইয়ের দোকান দেখা গেলো। পাঁচুদা বললেন, "বই পড়তে পেলে ফরাসি আর কিছুই চায় না। এখানে এমন দোকান আছে যেখানে শনিবারে এক লাখ লোক যায়, তুই শুনেছিস নিশ্চয়। অথচ ক'টা লোক আছে এই দেশে? সাড়ে পাঁচ কোটি মাত্র।"

একটা দোকানে ঢুকে পড়েছি আমরা। গাদাগাদা বইতে ঠাসা দোকান। আমার পোড়া কপাল, সবই ফরাসি ভাষায়। অথচ পৃথিবীর বাঙালি সংখ্যা ফরাসির প্রায় চার গুণ।

দোকানে হঠাৎ একটু উত্তেজনা দেখা দিলো। দু-একজন মহিলা ভয় পেয়ে একটু সরে দাঁড়ালেন। সত্যিই ক্রাইসিস! একটা আন্ডার-উইয়ার পরা নোংরা লোক ভিতরে ঢুকে পড়ে খোদ মহিলা ম্যানেজারের কাছে চলে গিয়েছে।

লোকটার গায়ে যা দুর্গন্ধ তাতে অন্নপ্রাশনের ভাত বমি হয়ে যাবার আশঙ্কা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, লোকটা মারধোর না শুরু করে!

পাঁচুদা মোটেই উদ্বিগ্ন হলেন না। ফিস্‌ফিস্ করে পরামর্শ দিলেন, "কোনো চিন্তা নেই, ব্যাপারটা শুধু দেখে যা।"

পাগল লোকটা খান চারেক বই পছন্দ করে সেগুলো অতি সাবধানে একটা ঠোঙায় পুরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলো। দোকানের মেমসায়েব ম্যানেজারকেও বিশেষ বিচলিত দেখালো না।

পাঁচুদা এবার ব্যাপারটা বোঝালেন। "এই পাগলটির বাতিক বই পড়া। দোকানে-দোকানে গিয়ে বই সংগ্রহ করে, তারপর রাস্তায় বসে সারাদিন বই পড়ে দোকান বন্ধ হয়ে যাবার আগে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। দোকানদার সব জানে, তাই পাগলকে খুব ঘাটায় না।"

ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু পাঁচুদার সঙ্গে বেরিয়ে এসে দেখলাম, ফরাসি পাগল ফুটপাতের এক কোণে বসে পড়ে আপন মনে বই পড়ে যাচ্ছে। মনে হলো ফুটপাতেই এঁর বসবাস। জ্ঞানগম্যি সব হারিয়েও বই পড়ার নেশাটা এই পাগলের এখনও ছুটে যায়নি।

আমি লোকটিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলাম। দুনিয়ার অনেক জায়গায় পাগলকে আমি ভিক্ষে চাইতে, খাবার চাইতে দেখেছি। কিন্তু বই চাইতে এবং পড়তে এই প্রথম দেখলাম।

পাঁচুদার সংযোজন : "ধৈর্য থাকলে তুই এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পারিস, বই পড়া শেষ করে পাগল ওই বই ফেরত দিয়ে আসবে।"

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। পাগলও ফরাসি দেশে বই পড়ে! আর আমাদের দেশে যা অবস্থা হচ্ছে তাতে কিছু দিনের মধ্যে পাগল ছাড়া আর কেউ বই পড়বে না। চিন্তার সেই তুষারযুগের নাম হবে ভিডিও যুগ বা টিভি যুগ।

এই পাগলের প্রিয় বিষয় কী কী তা জানবার কৌতূহল ছিল। কিন্তু ফরাসি ভাষা তো আমার জানা নেই। পাঁচুদা আমার কাজে লাগবার জন্যে একটু এগিয়ে গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, "সাবজেক্টটা বলবো তোকে? তুই হাসবি। পাগল সেলফ-হেল্পের বই পড়ছে—কী করে আত্মোন্নয়ন করা যায় তার বই!"

জাত হিসেবে ফরাসিরা আমার কাছে ভীষণ সম্মানিত হয়ে উঠছে। এ-দেশে পাগলেরও বিশেষ রুচি আছে।

আমরা প্যারিসের অভিজাত অঞ্চলের পথ ধরে হেঁটে চলেছি। দুনিয়ার বড়লোকদের এখানে বাজার করতে আসা ছাড়া উপায় কী? কী সব দোকানের বাহার! কী সব মনোমোহিনী নাম! কী তার ঝলমলে ভাব। আর যেসব বালিকা

সেখানে কর্মরতা তাদের কথা কী বলবো। প্রত্যেক মহিলা যেন ফিল্মের উঠতি তারকা। দুনিয়ার যেখানে যত সুন্দরী জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সবাই যেন এই অঞ্চলের ফরাসি দোকানে সেলস্ উয়োম্যানের চাকরি নিয়েছে।

পাঁচুদা বললেন, "দোকানগুলো মন দিয়ে দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারবি, হাওড়ায় কালীবাবুর বাজারের দোকানগুলো কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় তারও আইডিয়া পাবি।"

"না, পাঁচুদা। আমি দোকানদারি শিখতে প্যারিসে আসিনি, আমি ফরাসি জাতটাকে চোখে দেখতে এসেছি। আমি এ-জাতের ফুটো খোঁজবার জন্যে পাগলের পিছু নিলাম কিন্তু ক্লিন বোলড আউট হলাম। এখন আমাকে ফরাসিদের কিছু ব্যর্থতা, কিছু ত্রুটি খুঁজে বের করতেই হবে। এ-জাতের কিছু অভাব অনটন আছে। দুঃখ আছে, অপ্রাপ্তির বেদনা আছে তার খোঁজখবর একটু-আধটু তো চাই।"

পাঁচুদা স্পিকটি নট! ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। বললুম, "ল্যাপিয়ের বলে ফরাসি লেখক আমাদের সর্বনাশ করে এসেছে। সিটি অফ জয় বলে বইতে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে। আমাদেরও একটু-আধটু বদলা নিতেই হবে মা শীতলা যখন এই প্যারিসে আমাকে পাঠিয়েছেনই।"

ভাগ্য অকস্মাৎ সুপ্রসন্ন হলো। সাধে কি আর ফরাসির চিরশত্রু ইংরেজ বলেছে, ইচ্ছে থাকলেই পথ বেরিয়ে পড়ে।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মস্ত লাইন পড়েছে প্যারিসের রাস্তায়। যেমন লাইন পড়ে কলকাতায় কেরোসিনের জন্যে। যেমন লাইন পড়ে হাওড়ায় কলের জলের জন্যে। যেমন লাইন পড়তো পাঁউরুটির জন্যে আমাদের কৈশোরে, যৌবনে, এমনকি ক'বছর আগে যখন আমেরিকায় যাচ্ছি তখনও।

জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় মা হাজার হাত কালী, জয় জননী শীতলা। আমি ফরাসিদের প্যারি নগরীতেও লাইন খুঁজে পেয়েছি। এঁকে বেঁকে পাক খেয়ে লাইন প্রায় কয়েকশ গজ পেরিয়ে গিয়েছে।

চুলোয় যাক আইফেল টাওয়ার, চুলোয় যাক নেপোলিয়নের সমাধি, মাথায় থাক জর্জ পম্পিদু সেন্টার, কোন দুঃখে ফরাসিও আমাদের মতন মুখ বুজে লাইন মেরেছে তা আমি জানতে চাই এবং বাঙালি পাঠকের কাছে তা ফাঁস করতে চাই।

দোকানের সামনের লম্বা লাইন দেখতে আমার আগ্রহ লক্ষ্য করে স্বয়ং পাঁচুদা আমাকে মৃদু বকুনি লাগালেন, “কিউ দেখতে কেউ প্যারিসে আসে না শংকর।”

কিন্তু যার যা স্বভাব! কী করবেন আমার আন্তর্জাতিক গাইড? লম্বা লাইনটাই আমার মনে লেগে গিয়েছে, সায়েবদের অন্য অনেক আদিখ্যেতার লম্বা বিবরণী তো কত জায়গায় পড়েছি।

আমার মনে এই মুহূর্তে স্ফূর্তির হাওয়া। বললাম, “পাঁচুদা যুগ যুগ জিও। সেবারে কলকাতায় যে-লাইন দেখেছি তা এরকমই লম্বা উঃ, রুটি-রুটি করে সমস্ত জাতের লাইফটা ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছিল।”

পাঁচুদা বোধহয় ইন্ডিয়া এবং ফ্রান্সের টানাপোড়েনে আটকে গিয়েছেন, কাকে রেখে কাকে দেখেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

“পাঁচুদা আপনি মুখে কুলুপ লাগিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দেশের লোককে বিদেশে ঠিকমতন গাইড করুন। আপনি তো আমার থেকে কয়েকবছরের বড়, আমি যেসব সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পৈতৃক শরীর রক্ষে করে বেঁচে থেকেছি আপনিও সেইসব সময় দেখেছেন। মন্বন্তর, খরা, পাঁউরুটির লাইনের কথা মনে পড়ে না?”

পুরনোদিনের প্রসঙ্গ তোলায় পাঁচুদা একটু নরম হলেন। নস্টালজিয়া এমন জিনিস যে পাথরও তলতল করে। পাঁচুদা বললেন, “হাওড়ায় খুরুট রোডে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির সামনে আমাদের সবেধন নীলমণি পাঁউরুটির দোকানটা ছিল—কালিকা স্টোর্স।”

“এই তো, পথে আসুন দাদা। কালিকা স্টোর্সের অনেক পাঁউরুটি আমার এই বডিতেও সমাধিস্থ হয়ে আছে, পাঁচুদা।”

পাঁচুদা বললেন, “যুদ্ধের আগে...”

“কোন যুদ্ধ?”

“ওরে যুদ্ধ আমাদের প্রজন্মের পৃথিবীর মানুষের কাছে একটাই হয়েছে তার নাম সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার। ওটাকেই আমরা ‘যুদ্ধ’ বলি, আর সব ওর কাছে হাতাহাতি। তা যা বলছিলাম, যুদ্ধের শুরুতেও ছিল তিনরকমের রুটির চয়েস—ফারপো, গ্রেট ইস্টার্ন আর রাজবন্দী। কালিকাতে ফারপো পাওয়া

যেতো। আহা, কী সে সাজানোর কায়দা—যেন আর্ট গ্যালারিতে ছবি টাঙানো রয়েছে। ফারপোরও কত বৈচিত্র্য—মিল্ক ব্রেড এবং আর একটা ছিল কিসমিস দেওয়া রুটি, সেটা বিহারী চকোত্তিদের বাড়িতে যেতো।"

এইসব কথা বলতে-বলতেই পাঁচুদা আমাকে নিয়ে সট করে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "এটাও হাওড়ার লোকদের পুরনো অভ্যাস। লাইন দেখলেই, কেন লাইন, কীসের লাইন খবর না-নিয়েই প্রথমে একটা ভাল পোজিসন নিয়ে নাও। বেশি ভাবনা-চিন্তা করতে গেলেই সুবর্ণ সুযোগ ফস্কে যেতে পারতো ওই যুদ্ধের সময়। তখন সবই তো লাইন, সবই তো কন্ট্রোল। অনেকেই তো কাঁধের ঝুলিতে র‍্যাশন কার্ডখানা এখনকার পাশপোর্ট বা ক্রেডিট কার্ডের মতন সারাক্ষণ বয়ে বেড়াতেন। আমরা অতোটা চালু ছিলাম না। লাইনে নিজের জায়গার দখলটা প্রতিষ্ঠা করে খোঁজ নিয়ে জানলাম হয়তো বেবি ফুড দিচ্ছে, কিংবা কাপড়। তখন ছুটলাম বাড়ি থেকে পয়সা আনতে। ট্যাকে পয়সা থাকলেই যে জিনিসপত্তর হয় না এই নির্মম সত্যটুকু আমরা ওই সময় বুঝেছিলুম। বাড়ি থেকে গদাইলস্করি চালে ফিরে এসেও দেখতাম লাইন মাত্র দু'গজ এগিয়েছে। তখনকার দিনে দোকানদাররা ভাল কোনও মাল এলেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যেতো, খদ্দের দেখলেই চোঁয়া ঢেকুর তুলতো।"

আমাদের ফরাসি লাইন কিন্তু মোটেই নড়ছে না। আমরা দু'জন হাওড়া-কাশুন্দের অ্যামবাসাডার মনের সুখে বাংলায় বকবক করে যাচ্ছি। ফরাসি সায়েবরাও মুখ বন্ধ করে নেই, আমাদের সামনেই দুটো মেয়ে হুড়মুড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

লাইনটা যে কীসের তা এখনও বলা হয়নি। পাঁচুদাই ফাঁস করলেন, রুটির লাইন।

জয়বাবা ফেলুনাথ। তা হলে এখনও বিধির বিধান বলে একটা কিছু আছে, আমাদের দেশে এখন রুটির লাইন উঠে গিয়েছে, কিন্তু প্যারিসে এই লাইন জেঁকে বসছে। অথচ এরাই তো দোলদুর্গোৎসব করে ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী পালন করলো এই সেদিন। টু হানড্রেড ইয়ার্স তা হলে গোল্লায় গিয়েছে, রুটির লড়াই থেকে ফরাসি এক পা এগোতে পারেনি। বদনাম হয় কেবল ইন্ডিয়ার, পাকিস্তানের, বাংলাদেশের। আমাদেরও একদিন মান ইজ্জত হবে, আমরাও একদিন কলকারখানায় আমাদের উপমহাদেশ ভরিয়ে ফেলবো, আমরাও একদিন সাউথ এশিয়া কমনমার্কেট গড়ে তুলবো, যা হবে লোকসংখ্যায় দুনিয়ার এক নম্বর বাজার। জাপানি, জার্মান, ফরাসি, মার্কিন সবাই এই বাজারে নাক গলাবার জন্যে আমাদের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে, তখন মন দিয়ে ইতিহাস-ফিতিয়াস পুনরায় লেখানো যাবে।

পাঁচুদা বললেন, "ওরে অকারণে পুলকিত হওয়াটা বাঙালির জাতীয় দোষ। আগে ব্যাপারটা মগজে ঢোকা, তারপর নাচানাচি মাতামাতি কর। ইয়েস, স্বীকার করতেই হচ্ছে প্যারিসে এখনও রুটির লাইন পড়ে। অবশ্যই পড়ে, কিন্তু তা বাধ্য হয়ে নয়, স্রেফ লোকের মর্জি অনুযায়ী।"

এ আবার কী তত্ত্ব নিবেদন করলেন, পাঁচুদা? তা হলে, আমাদের গরমেন্টও বলবে, কেরোসিনের লাইনটা লোকের মর্জি অনুযায়ী, হ্যারিকেন জ্বালিয়ে গিন্নির সঙ্গে ডিনার খাবার সাধ জেগেছে, তাই দোকানের সামনে ক্যানেস্তারা হাতে লাইন!

পাঁচুদা এবারে বকুনি লাগালেন। ফরাসি সায়েবরা নাকি রুটির ব্যাপারে ভীষণ স্পর্শকাতর। রুটি নিয়ে ফরাসির টিকি ধরে টানাটানির চেষ্টা করছি শুনলে এখনও মারদাঙ্গা হয়ে যেতে পারে। পাঁচুদা বললেন, "মফস্বলে থেকে থেকে তোদের বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। তিলকে তাল করতে চাইছিস তুই, একটা ফর্সা জাতের মুখে কালি মাখাবার জন্যে। ব্যাপারটা বোঝ।"

পাঁচুদা আমার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলেন। লাইন পড়েছে প্যারি মহানগরীতে। রুটির লাইনই বটে। "কিন্তু স্রেফ রুটিওয়ালাকে ভালবেসে। এই দোকানদারের নাম পোয়ালাঁ। হাজারখানেক বেকারি আছে প্যারি নগরীতে, কিন্তু পোয়ালাঁ বেশি নেই। এই দোকানের রুটি খাবার জন্যে রসিক ফরাসি এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারে, আতলান্তিকের দলায় ডুব দিতে পারে, জাঙিয়া পরে ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার দিতে পারে। পোয়ালাঁ ইজ পোয়ালাঁ, বুঝলি। যেমন ছিল আমাদের কালীবাবুর বাজারে সুরেন তেলির দোকানের সামনে লাইন। তেলেভাজার দোকান আছে দেড়শ, কিন্তু সুরেন তেলি একজনই। যেমন গল্প লেখক তোদের মতন ডজন-ডজন, কিন্তু শরৎ চাটুজ্যে একজনই।"

ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সারাজীবন ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আমি বুঝে গিয়েছি, লাইনের শেষে (সায়েবরা যাকে লেজের শেষ বলেন) দাঁড়ালে মানসিক নিরাপত্তা বোধের অভাব হয়। মিছিলের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার।

পাঁচুদাকে জিগ্যেস করলাম, এই অসময়ে লাইন মারবার এতো লোক প্যারি মহানগরীতে কেমন করে পাওয়া যায়? পাঁচুদা সোজা জানিয়ে দিলেন, পোয়ালাঁর পাঁউরুটি উপভোগ করার জন্যে ফরাসি চাকরিতে যে-কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি, যেমন একসময়ে ম্যাটিনি শোতে উত্তম-সুচিত্রাকে রূপালি পর্দায় দেখবার জন্যে কলকাতার অফিস কর্মচারীরা চেয়ার ছেড়ে হলের সামনে লাইন দিতো।

এদিকে পোয়ালাঁর লাইন একটুও নড়ছে না। দোকানে হঠাৎ কর্মবিরতি ঘটলো নাকি? না, নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঁউরুটির স্টক শেষ?

পাঁচুদা আশ্বাস দিলেন, ধৈর্যহারা হলে পৃথিবীতে ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। অত সময়ের অভাব হলে, ক'গজ দূরেই তো আরও রুটির দোকান রয়েছে, রুটির তো অভাব নেই। তারপর বোঝালেন, পাঁজি দেখে ঘড়ি দেখে পাঁউরুটি উপভোগ করে এখানকার রসিকজন। ঠিক সাড়ে-তিনটার সময় যে পাঁউরুটি বেকারি থেকে বেরুবে তার স্বাদ অন্যরকম। এর জন্যেই স্পেশাল অপেক্ষা। কেউ-কেউ সকাল আটটার স্বাদটা পছন্দ করে, তারা ঐ সময় সমস্ত কাজ ফেলে এখানে ছুটে আসে।

এখানকার লোকজন রসিক, ব্যাপারটা জানে। তাই তিনটে কুড়ি মিনিটে কেউ সাড়ে-তিনটের পোয়ালাঁর জন্যে ছটফট করে না। বরং আগেকার তৈরি রুটি গছাতে গেলে কেউ নেবে না। দু'ঘণ্টা আগের তৈরি রুটি জিভে ঠেকাবার জন্যে চাকরি রিস্ক করে পোয়ালাঁর দোকানে লাইন দেয় না।

বাঙালি কেরানির মানসিকতায় আমি প্রশ্ন করি, "অফিস পালিয়ে যদি কেউ ধরা পড়ে যায়?"

"ধরলে তো ওর ম্যানেজার ধরবে। তিনিও তো এখানে লাইন মেরেছেন। পোয়ালাঁর এই লাইনে বড়সায়েব থেকে বেয়ারা সবাইকে দাঁড়াতে হয়—দ্য গ্রেট লেভেলার না কি একটা যে বলে ইংরেজ সায়েবরা।"

আমার ঠিক সামনে ফরাসি যুবক-যুবতী সময় নষ্ট করছে না। তারা ঐ সময়ে একটু প্রেমপর্ব সেরে নিচ্ছে। যদিও ফরাসি এখনও নরনারীর প্রেমের প্রকাশে ইংরেজ অথবা আমেরিকানের থেকে অনেক সাবধানী। লন্ডনে দেখেছি একজোড়া যুবক-যুবতী জেব্রা ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে এমন বিদায়চুম্বনে আবদ্ধ যে ট্রাফিক আটকে গিয়েছে। ড্রাইভারদের আপত্তি আলিঙ্গনে অথবা চুম্বনে নয়, আপত্তি ট্রফিকে গাড়ি আটকানোয়।

ভয়ে লাইনের পিছনে তাকাতে পারছি না, সাতান্ন বছর বয়সে আবার কী দেখে লজ্জা পাবো? কিন্তু পাঁচুদা সিগন্যাল দিলেন। তাকিয়ে দেখি, ফরাসি যুবতী মন দিয়ে দোমিনিক ল্যাপিয়রের 'সিটি অফ জয়' পড়ছে। মলাটখানা আমার চেনা হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবলাম, এই ফরাসি সুন্দরী এই মুহূর্তে হাওড়ার পিলখানা পরিভ্রমণ করছে, আর আমি পিলখানার আশেপাশে অর্ধশতাব্দী বসবাস করে এই মুহূর্তে প্যারিস দর্শন করছি।

পাঁউরুটির দোকান সম্পর্কে পাঁচুদা কিছু তথ্য দিলেন। বিশ্ববিখ্যাত এই রুটির পিছনে রয়েছে লায়োনেল পোয়ালাঁর নাম। এঁর এক ভাইয়েরও পাঁউরুটি আছে যাঁর নাম ম্যাক্স। প্যারিসের রসিকজনরা এঁর কথা বেশি তোলেন না। যেমন

আমাদের কলকাতায় ভীমচন্দ্র নাগ এবং “তস্য ভ্রাতা” শ্রীনাথ নাগ।

কী এক দুর্মতি হয়েছিল। আজ আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্যারিস দেখতে বেরিয়েছি। লাইনের অনেকের নজর আমার দিকে পড়ছে। দুই ফরাসি সুন্দরী লাইনের নিরাপত্তা রক্ষা করে আমার কাছে এলেন ক্লোজ অ্যাঙ্গেলে ভিউ নিতে। তারপর মিষ্টি মন্তব্য করলেন, “শাড়ি!”

আ মলো যা! কোন দুঃখে শাড়ি চড়বে বাঙালি পুরুষের অঙ্গে? কিন্তু মেমসায়েবদের ধারণা হয়েছে লম্বা বস্ত্রখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে এলেই তার নাম শাড়ি, ধুতির হয়ে প্রচারে নামবার বিশ্বসংসারে কেউ নেই। অমন যে অমন স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও বেদান্ত প্রচার করলেন, গৈরিক প্রচার করলেন, ভারতের সীতাসাবিত্রী প্রচার করলেন, কিন্তু একবার ভুলেও ধুতির জয়গান করলেন না।

“মেমসায়েব, কোনও পুরুষ শাড়ি পরেছে বলাটা অসম্মান, তার পুরুষকারের প্রতিই অনাস্থা প্রকাশ করা।”

পাঁচুদা দুষ্টুমি করে আমার বাংলা কথাগুলো অনুবাদ করে দিলেন, ফলে হাসির হুল্লোড় উঠলো।

“এই বাঙালিটি পিকুলিয়র। আইফেল টাওয়ারে না উঠে পাঁউরুটির দোকান দেখতে এসেছে,” হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন পাঁচুদা।

ফরাসি সুন্দরীরা আমাকে প্রশ্রয় দিলেন, “ঠিকই করেছো। পোয়ালাঁ কোন অংশে আইফেল টাওয়ারের থেকে কম? তাছাড়া আইফেল টাওয়ার স্রেফ চোখকে তৃপ্তি দেয়, কিন্তু পোয়ালাঁর রুটি দেখে সুখ, আদর করে সুখ, জিভে ঠেকিয়ে সুখ এবং গলা দিয়ে নামাবার পর সমস্ত শরীরে সুখ। আইফেল টাওয়ার তুমি চাটতে পারবে না, চিবোতে পারবে না, মঁসিয়ে। তুমি ঠিকই করেছো এখানে এসে।”

দিদিমণিদের শরীরে স্নেহপদার্থ নেই কিন্তু মনে স্নেহ রয়েছে। সস্নেহে বললেন, “আমরা জানি নিউইয়র্কে এবং টোকিওতে এমন রসিক আছেন যাঁরা পোয়ালাঁর রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেন, প্রতিদিন প্যারিস থেকে এরোপ্লেনে এই রুটি ওখানে চলে যায়, খরচ যতই পড়ুক। দুনিয়ার রসিকজনেরা যা পছন্দ তা অর্ডার করে, খরচের তোয়াক্কা করাটা ভদ্রলোকের কাজ নয়। কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে কোনও লোককে আমরা কখনও লাইনে দাঁড়াতে দেখিনি।”

তার মানে, দিদিমণিরা, তোমরা প্রায়ই এই পোয়ালাঁর দোকানে লাইন মারো, তোমাদের চাকরিতে মন নেই। ডলপুতুলের মতন দেখতে বলে অফিসের কেউ কিছু বলতে ভরসা পায় না তোমাদের।

মুচকি হাসলেন দুই ফরাসি দিদিমণি। পাঁচুদা কাঁচা কাশুন্দের বাংলায় বললেন, “আসলে এঁরা বউদি, কিন্তু দেখলে স্রেফ আইবুড়ো দিদিমণি মনে হয়।

এ-জাতের ধর্মই এই—বসন্তকাল ছাড়া আর কোনো ঋতুকে পাত্তা দিতে চায় না। 'যৌবন যৌবন' করেই শরীর ও মনকে মাতোয়ারা রেখে দিয়েছে।"

এদেশে আসবার পথে এরোপ্লেনে কে যেন বলেছিল, মনের দুঃখে ইউরোপের মেয়েরা সাজুগুজু ছেড়ে দিয়েছে। স্বদেশি যুগে যেমন বিদেশি বস্ত্র আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তেমনি এখানকার মেয়েরা ব্রা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু আমার নতুন পরিচিত দিদিমণিদের দেখে তা মনে হলো না। এই রুটির লাইনে দাঁড়ানো, এখানেও স্টাইল, এখানেও ফ্যাশন শো, যা ইন্ডিয়ার যে-কোনও শহরে ইংলিশ ইস্কুলে পড়া মেয়েদের মর্মবেদনার কারণ হয়ে উঠবে।

ইতিমধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় ধুতি-পাঞ্জাবি সম্পর্কে প্রেস কনফারেন্স চালিয়ে যাচ্ছি আমি।

রোগা মোটা সব সাইজের পুরুষের জন্যে ধুতির সাইজ এক শুনে কৌতূহলী ফরাসি একটু অবাক হলো। 'শ্যারি' সম্পর্কেও নানাবিধ প্রশ্ন। ওই বস্ত্রটি পরতে কত সময় লাগে এবং যাতে মাঝপথে খুলে না যায় সে সম্পর্কে কীসব এমার্জেন্সি ব্যবস্থা নেওয়া আছে তা মেমসায়েবরা জানতে আগ্রহী। একজন পুরুষ তো ট্রেড ইউনিয়ন প্রশ্ন তুললেন, "তা হলে দরজিদের কোনও ভূমিকা নেই তোমাদের অর্থনীতিতে?"

পাঁচুদা তাল বুঝে প্রশ্নটা আমার দিকেই ঠেলে দিলেন। মাথা চুলকে বললাম, "শ্রেষ্ঠ দরজিরা তাঁতির ভূমিকায় সমাজের সম্মান লাভ করবেন। এমন শাড়িও আছে যা তৈরি করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। এরজন্যে সমঝদার হতে হয়, মঁসিয়ে। এই যে আমাদের দেশে আর্টিস্টের সংখ্যা কম তার কারণ সেরা আর্টিস্টরা মেয়েদের সর্বাঙ্গসুন্দরী করবার কাজে তাঁতের সামনে সারাক্ষণ মেতে রয়েছেন।" পাঁচুদা এবার কায়দা করে জুড়ে দিলেন, "আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মেয়েই এক একটি চলমান আর্ট এগজিবিশন। এই শিল্পপ্রদর্শনী কিছুটা ছবি, কিছুটা ভাস্কর্য।"

এই শুনে মঁসিয়েদের তো চোখ ট্যারা। মাটি নরম বুঝে ছাড়লাম, "আমাদের মেয়েরা যখন রণক্ষেত্রে নেমেছে তখনও তাদের সাজগোজের বহর শুনলে তোমরা ভিরমি খাবে। প্রাচীন বইতে লাইনের পর লাইন রণরঙ্গিণীর প্রতিটি অঙ্গের ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে।" বেরসিক সায়েব এবার নোটবই খুলে বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করে বসলেন, ঘাবড়ে গিয়ে পাঁচুদা বাংলায় আমাকে ভর্ৎসনা করলেন "কেন ওই সব বই-ফইয়ের কথা তুলতে গেলি?"

ঘাবড়াও মাত, ভগবানের নাম করে বলে দাও শ্রী শ্রী চণ্ডী। ওখানে মায়ের যুদ্ধযাত্রার ডেসক্রিপসন পড়ে নিক নেপোলিয়নের বংশধররা।

না, মা চণ্ডী কখনও ফরাসিদের ওপর কৃপাবর্ষণ করবেন না। অতগুলো

বুড়োদামড়া 'চ' উচ্চারণ করতে পারলো না, শুধু 'শ্যান্ডি শ্যান্ডি' করছে।

একজন ফরাসি মজা পেয়ে গিয়েছে। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসলো, "তোমাদের দেশে নাকি মেয়েদের কদর নেই? সেদিন কাগজে পড়লাম।"

পাঁচুদা আবার ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে বললেন, "এমন একটা উত্তর দে যাতে দেশের মুখ রক্ষে হয়! আমি বাংলায় পাঁচুদাকে আশ্বাস দিলাম, "ঘাবড়াইয়ে মত। মা সরস্বতী পরীক্ষার সময় মুখে ঠিক ভাষা জুগিয়ে দেবেন।"

আক্রমণই শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা, পড়িয়েছিলেন ইস্কুলের গঙ্গাধরবাবু স্যর। "দেখো মা চণ্ডী," এই বলে ফরাসিকে অ্যাটাক করলাম আচমকা। বললুম, "মঁশিয়ে মশাই, আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড খারাপ তা স্মরণে রেখেই বলা যেতে পারে তোমাদের মতন খারাপ নয়। তোমরা মেয়েমানুষকে পুড়িয়ে মেরেছো, লোকজন ডেকে অসহায় মেয়েমানুষের মুণ্ড কেটে নিয়ে নাচানাচি করেছো—আমাদের হিসট্রিতে ওসব কারবার নেই।"

ফরাসিরা এখনও রসবোধ হারায়নি। চটলো না, বরং একটু হাসাহাসি করলো।

পাঁচুদা ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, "হিন্দুর হাঁড়ি, মুসলমানের ধর্ম, ইংরেজের ছাতি এবং ফরাসির রুটি—ভীষণ স্পর্শকাতর জায়গা। ওখানে হাত পড়লেই গোলমালের আশঙ্কা। ওই যে বিপ্লবের সময় ফরাসি সম্রাজ্ঞীর মাথা কাটা গেলো, তিনি ফরাসির রুটিতে হাত দিয়ে ফেলেছিলেন, উনিই তো বলেছিলেন, রুটির বদলে কেন কেক খাচ্ছে না ওরা।"

"পাঁচুদা, আপনি সত্যিই ফরাসি বনে গিয়েছেন। একজন দুর্বল অসহায় বিধবা মহিলার শিরচ্ছেদ আপনি সমর্থনের চেষ্টা করছেন।"

চুপ করে গেলেন পাঁচুদা। তারপর বললেন, "বুভুক্ষু প্রজারা যখন বলছে আমরা রুটি খেতে পাচ্ছি না, তখন কেউ বলে ওরা কেক খাচ্ছে না কেন? তোর জেনে রাখা ভাল, সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের কেক-পেস্ট্রি তৈরির জন্যে ছ'শ জন রাঁধুনি ছিল।"

"একটু সামলে পাঁচুদা। এই গতকালই কোথায় পড়লাম, সম্রাট গৃহিণী অত অজ্ঞ ছিল না। ঐ সময় প্যারিসের রুটিতে প্রায়ই টোকো গন্ধ হচ্ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভদ্রমহিলা কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু মেয়েমানুষের মুণ্ডু নিয়েই ফরাসির রাগ গেলো না, দু'শ বছর পরেও তার ডাক নাম দেওয়া হয়েছে—মারি হেয়াই ডোন্ট দে ইট কেক আঁতোনায়েত।"

নেতিয়ে পড়া লাইনে হঠাৎ যেন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি লায়োনেল পোয়ালাঁর টাটকা রুটি উনুন থেকে বেরিয়ে এসেছে?

উঁহু, অনেক সবুর না করলে পোয়ালাঁর মেওয়া ফলে না। এইরকম লাইন আমি কলকাতার বিধান সরনীতে কপিলা আশ্রমের সামনে জুন মাসের সন্ধেবেলায় দেখেছি। ওখানে সরবতের কনট্রোল, মাথাপিছু এক গেলাস। যত বড় কোটিপতিই হও তুমি, পয়সা ঢাললেই অঢেল সরবত তোমার কপালে নেই। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অআকখ কলকাতার লোকরাও শিখছে, পাঁচুদা।

এক ইংরেজ ছোকরা তার বান্ধবীকে নিয়ে লাইনে যোগ দিয়েছে। আমার ভুল ভাঙলো। ধারণা ছিল, ইংরেজরাই এই ব্রেড পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে। পাঁচুদা ফোঁস করে উঠলেন। "খাবার ব্যাপারে ইংরেজ জানে কী? ওদের কাছে রসনার ব্যাপারে কিসসু শেখবার নেই।" নতুন আলোকপাত করলেন পাঁচুদা এবার। "ওরা বিভিন্ন মাংসের নাম পর্যন্ত ইংরেজিতে করার মুরোদ রাখেনি, সব ধার করেছে এই ফরাসি দেশ থেকে?"

"মানে?"

"মানে খুব সোজা। গোরু (কাউ), বাছুর (কাফ), শুয়োর (পিগ), ভেড়া (শিপ)— জন্তুগুলোর ইংরিজি নাম আছে। গোরুর মাংস বলতে 'বিফ', বাছুরের মাংস বলতে 'ভিল', শুয়োরের মাংস বলতে 'পর্ক', ভেড়ার মাংস বলতে 'মাটন'—সবক'টাই ফরাসি থেকে ইংরেজের গ্যাঁড়া মারা।"

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। পোয়ালাঁর লাইনে যখন বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছে তখন ইংরেজকে উসকে দিয়ে দেখা যাক না। কিন্তু এই ইংরেজের ইংরেজত্ব যেতে বসেছে। সে ভাষার ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলো। এঁর বগলদাবায় যে প্রেমিকাটি তিনি মিটি-মিটি হাসছেন। ইনি যে ইংরেজললনা নন তা চমৎকার ইংরিজিতে জানিয়ে দিলেন। থাকেন লন্ডনে। হবু স্বামীটিকে একটু সভ্য করে করে তোলবার জন্যে প্যারিসে বাপের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এই মেয়ে ইংরেজের হয়ে লড়ে গেলেন। একেই বলে প্রেমে পড়লে মেয়েমানুষ আর নির্ভরযোগ্য থাকে না। সুন্দরী ফরাসিনী হবুস্বামীর হয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। "ইতিহাসের রসিকতা এক একসময় মারাত্মক হয়ে ওঠে, মহাশয়। তুমি খোঁজ নিলে জানতে পারবে ফরাসিদের জনপ্রিয়তম ডিশ হলো—রোস্ট করা বিফ যার নাম স্টেক এবং চিপস অর্থাৎ আলুভাজা। ফরাসির তথাকথিত এই জাতীয় খাবারটি কিন্তু ইংরেজের উপহার!"

ইংরেজ সায়েব বেজায় খুশি, কিন্তু পাঁচুদা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। "প্রেমে অন্ধ হলে মেয়েমানুষের মাথার ঠিক থাকে না, পিতৃকুলের সব গোপনীয়তা ফাঁস করে দিতেও তার দ্বিধা নেই।"

একবার সামনে, আর একবার পিছনে তাকানো গেলো। আমরা লাইনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছি, সামনে যত লোক, পিছনে তত লোক। স্বদেশে কেরোসিন

এবং অমিতাভ বচ্চনের ছবির জন্যে আমরা এই ধরনের লাইন দিতে পারি কিন্তু পাঁউরুটির জন্যে কিছুতেই নয়।

"পাঁচুদা, হাড়ে যে দুব্বো গজিয়ে গেলো।"

"ভাল জিনিসের জন্যে ধৈর্য প্রয়োজন, ব্রাদার। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে হরিদাস পাল পর্যন্ত সবাই এই কথা বলে গিয়েছেন।"

কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা হলে বোঝা যেতো! স্রেফ পাঁউরুটির জন্যে। আমরা তো আর মন্বন্তরের যুগে বসবাস করছি না। এক আমেরিকান চাষাই পয়সা ফেললে দুনিয়ার সমস্ত বুভুক্ষুর জন্য লড়ে যাবে, তাকে এত গম সরবরাহ করবে যে পেট ফুলে ফেঁপে উঠবে।

পাঁচুদা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "গমের চাষ একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবিকা, যেটা আমেরিকান শিখতে পারে, কিন্তু পাঁউরুটির সে কী জানে? পাঁউরুটি তৈরি হচ্ছে শিল্পকর্ম, আর্টের এভারেস্ট শিখরে ওঠার মতন। লায়োনেল পোয়ালাঁ হচ্ছে ফরাসির জাতীয় সম্পদ, এঁকে ভাঙিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাবার কম চেষ্টা হয়নি। কিন্তু লায়োনেল পোয়ালাঁ নট নড়ন চড়ন নট কিছু—জেনুইন রুটির স্বাদ যদি পেতে চাও এসো প্যারিসে, প্রয়োজনে লাইন মারো আমার দোকানের সামনে।"

পাঁচুদা আমাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। হঠাৎ বললেন, "রুটি কথাটা ভারতবর্ষের নিজস্ব। কিন্তু এই পাঁউরুটি কথাটা বাঙালিদের নয়, এটা ফরাসিদের দান।"

পাঁচুদা ব্যাখ্যা করলেন, "সম্বিতের বাড়ি গিয়ে ফরাসি অভিধানটা দেখিস। প্যাঁ মানে ব্রেড—ওটাই জিভে পাউ হয়েছে। পর্তুগীজরাও কোনও সময়ে শব্দটা হজম করেছিল—ওদের চন্দ্রবিন্দু রপ্ত হয় না, তাই 'পাও' বলে।"

হঠাৎ লাইনে আনন্দের হিল্লোল উঠলো। এক ফরাসিনীকে একটি ট্রে হাতে লাইনের সামনে আসতে দেখা গেলো। তা হলে পোয়ালাঁর প্যাঁ এতোক্ষণে প্রস্তুত।

পাঁচুদা ভুল সংশোধন করে দিলেন। "ধৈর্য ধরো, যুবক। এখনই এমন একটি মধুর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে যা একমাত্র ফরাসি দেশেই সম্ভব।"

অগত্যা আমাকে অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে পরবর্তী ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করতে হলো। প্যারিসের প্যাঁ কি দিল্লিকা লাড্ডুর মতন? যে খেয়েছে সে পস্তেছে, যে না খেয়েছে সেও পস্তেছে।

ধন্যি তুমি ফরাসি জাত! তোমার ছিরি চরণে শত-শত পেন্নাম। দুনিয়াকে তুমি কত জিনিস হাতে ধরে শিখিয়েছো। দোকানদারিতে কে বলে তুমি নিরেস?

এই তো চোখের সামনে যা দেখছি তার তুলনা নেই—লে জবাব!

লংলিভ মঁশিয়ে লায়োনেল পোয়ালাঁ। সাধে কি আর বেকারিতে তোমার দুনিয়া জোড়া সুনাম! শুধু একজোড়া সুদক্ষ হাত থাকলে মহান ব্রেডমেকার হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে মেগা সাইজের একখানা হৃদয় থাকা চাই। খরিদ্দারের সঙ্গে সহমর্মিতা। যারা এই দোকানের সামনে ভক্তি-অবনত চিত্তে লাইন মেরেছে তারা তো শুধু খরিদ্দার নয়, তারা তীর্থযাত্রী।

এই সামান্য সত্যটুকু পোয়ালাঁর অজানা নয়, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা। এক ফরাসি সুন্দরী লাইনের অপেক্ষমান আন্তর্জাতিক মানবতার প্রত্যেকটি প্রতিনিধির হাতে মিষ্টি বিতরণ করছেন। পেসট্রির হরির লুট বলা চলতে পারে, ধৈর্যের পরীক্ষায় সামান্য একটু মিষ্টতা আনবার জন্যে।

"এইরকম সৌজন্য দেখেছিস কোথাও?" কলকাতার কপিলাশ্রমেও এই দয়ার প্রকাশ নেই স্বীকার করতে হলো।

আমার হাতেও একটুকরো মিষ্টান্ন পৌঁছলো। ইংরেজ অনুরাগিনী ফরাসি সুন্দরী আমাকে বললেন, "কোনও লজ্জা নেই, টুপ্ করে মুখে ফেলে দাও। পেসট্রি ছাড়া প্যারিসে দিনযাপনের কোনও অর্থ হয় না—এ ডে ইন প্যারিস উইদাউট এ পেসট্রি ইজ এ ডে নট ওয়ার্থ লিভিং।"

পাঁচুদাও পোয়ালাঁর 'পেসাদ' উপভোগ করছেন। বললেন, "মাখন হয়তো বেশি খায় না, কিন্তু মিষ্টি খাবার কোনও প্রাইজ থাকলে প্যারিস ও কলকাতা ব্র্যাকেটে ফার্স্ট প্রাইজ পেতো। প্রেতের মতন রোগা-রোগা ফরাসি সুন্দরী তিন-চারটে দেসার্ট গিলে ফেলবে বিনা অনুশোচনায়। ফরাসি বিজনেসমেন লাঞ্চে বিজনেস নিয়ে আলোচনা না-করে বিতর্ক চালাবে মিষ্টি নিয়ে। একদিন তোকে স্তোর-এর দোকানে নিয়ে যাবো, আইফেল টাওয়ারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর পেসট্রি শেফ ১৮৩০ সালে এই দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিতে পারে দিল্লির ঘন্টেওয়ালা, যারা সেই মোগল আমল থেকে রাজধানীর লোকদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।"

পাঁচুদার মিষ্টি দাঁত। মিষ্টান্নপ্রেমী বলা চলতে পারে। বললেন, "প্যারিসে এমন দোকান আছে, যেখানে আগাম খবর দিলে তোর মুখের আদলে আসিক্রিম করে দেবে। একটু খরচ পড়বে। কম খরচে সব সময় রয়েছে ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ আইসক্রিম। টেবিলে বসে তারিয়ে-তারিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্টের মাথা খাও। খুব পছন্দ হলে বিদেশ থেকে অর্ডার পাঠাও, ফরাসি প্রেসিডেন্টের মুণ্ডু সরবরাহ করা হবে সযত্নে।

বিদেশি মুদ্রা আহরণ হলে ফরাসি যে সবরকম জাতীয় অভিমান ত্যাগ করতে প্রস্তুত তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাচ্ছে।

পোয়ালাঁর পাঁউরুটির কথা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে গিয়ে পাঁচুদা আমাকে মিষ্টান্নের অমরাবতীতে নিয়ে চলেছেন। বললেন, "সরবত শব্দটা এখানেও পাবি। সরবত এখানে রসিকদের প্রিয়। আর আইসক্রিমের অমরাবতী এই প্যারিস। বাকি দুনিয়া এর তুলনায় বন্য বর্বর, আসিক্রিমের 'আ' পর্যন্ত ভালভাবে শেখেনি। চল, এখানকার লাইন শেষ করে বার্তিলোঁতে। ওখানেও ধৈর্য ধরতে হবে, লম্বা লাইন। মেনু দেখবার জন্যে অধৈর্য মানুষ লাইন ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে আসে, মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায় এমন অবস্থা! লাইন ভেঙে মেনুর দিকে নজর না দিয়েও উপায় নেই—অন্তত ষাট রকমের আইসক্রিম। তোর সময় এলে তখন মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলে লাইনের অন্য লোকরা আবার ফরাসি বিপ্লব বাধিয়ে দেবে, সুতরাং লাইনে অপেক্ষা করতে-করতেই মনঃস্থির হয়ে যাওয়া চাই।"

পাঁচুদার পরামর্শ : "ওদের পাইনঅ্যাপেল আইসক্রিম না টেস্ট করে প্যারিস ত্যাগ করার কোনও মানে হয় না। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ফরাসিরা আনারসের খবরই রাখতো না। অমন যে অমন সম্রাট চতুর্দশ লুই, ওঁর জিভ ছড়ে গেলো আনারস আস্বাদ করতে গিয়ে সম্রাটকে ব্যথা দেওয়ার অপরাধ আনারসের নয়, দোষ ফরাসির—আনারসের খোসা ছাড়িয়ে কী করে খেতে হয় তা ওদের জানা ছিল না।"

বিনা পয়সার পেসট্রি বেমালুম হজম করে ফেলেছে লাইনের পুরুষ ও মহিলারা। এই এক চমৎকার দিক ফরাসির। খোলামেলা জাত—মেয়েরা পর্যন্ত রাস্তায় বেরিয়ে নোলা লুকিয়ে রাখে না, যা প্রাণ চায় তাই পুরুষ মানুষের সামনে খেয়ে ফেলতে লজ্জা পায় না। তবেই না বীরপ্রসবিনী হতে পেরেছে ফরাসি জননী।

গরম পাঁউরুটির মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। একজন ফরাসি ভদ্রলোক হাসিমুখে বীরবিক্রমে কয়েকটা রুটি বুকে জড়িয়ে ধরে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুটি বইবারও একটা বিশিষ্ট স্টাইল বের করেছে রুচিমান ফরাসি।

না মশাই, আমাদের কালিকা স্টোর্সের পাঁউরুটির সঙ্গে এই ফরাসি রুটির কোনও সাদৃশ্য নেই। ফরাসি রুটির সাইজ বেঢপ—খাবার জন্যে, না লোকের সঙ্গে লেঠালেঠি করার জন্যে এই রুটির জন্ম তা বলা শক্ত। এ রুটি কলকাতার পুলিশ বোধহয় কোনোদিন অ্যালাউ করবে না, কারণ খুনোখুনি বাড়তে পারে, যেমন কলকাতা পুলিশ পৃথিবীর একমাত্র পুলিশ যার সোডার বোতলে জাতক্রোধ। সোডার বোতলকে দাঙ্গার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার মানব ইতিহাসে বাঙালির বিশিষ্ট অবদান।

পাঁচুদা বললেন, "মনে রাখবি, ফরাসি এই রুটির নাম বাগেত। এর সাইজ প্রায় লেডিজ ছাতার মতন। এক আমেরিকান সায়েব লিখেছে, ইংরেজের কাছে

ছাতি যা ফরাসির কাছে রুটি তা। দুটিই ইংরেজ ও ফরাসির রোদে জলে নিত্যসঙ্গী। মাথা বাঁচানো ছাড়াও ছাতার যেমন অসংখ্য অন্য ব্যবহার আছে, ফরাসি রুটিরও তাই। এই রুটি নেড়ে তুমি প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারো। বাস থেকে নামবার সময় এই রুটি দিয়ে অন্য যাত্রীদের গোঁত্তা মারতে পারো পথ ছেড়ে দেবার জন্যে, অথবা টেবিল থেকে বেড়াল তাড়াতে পারো, কিংবা ফরাসি প্রেসিডেন্টের গাড়ি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তখন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পারো।”

পোয়ালাঁর দোকানে আরও লম্বা ও সরু একরকম রুটি আছে যার নাম ফিসেল। এই রুটি দিয়ে ট্যাক্সি থেকে নতুন আগন্তুককে তুমি প্যারিসের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখাতে পারো। ফিসেল-এর অর্থ সুতো, আর বাগেত মানে লাঠি। এই বাগেতকে অনেকে রাইফেলের বাঁটের মতন বহন করে। বাগেতের এক অংশ থাকে হাতে আরেক অংশ কাঁধে। আমেরিকান সায়েব বলছেন, রাস্তায় অফিসের কর্তা বা নিজের গিন্নির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এই বাগেতকে রাইফেল মনে করে মিলিটারি কায়দায় সম্মান দেখানো যায়। আবার শরীরে ব্যথা থাকলে এই বাগেত হতে পারে অসুস্থ মানুষের যষ্টি।

আরও এক বীভৎস-দর্শন ফরাসি রুটি আছে—ব্যাতার। এই বেঁটে মোটা রুটিকে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করা যায়। বেশি রাতে রাস্তায় গুণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষার পক্ষেও এই স্পেশাল রুটি অসাধারণ।

আরও এক বিশাল সাইজের রুটি আছে যার নাম গ্রস প্যাঁ বা বড় রুটি। বড় পরিবারের মায়েরাই এই রুটি কিনে থাকেন। এর সাইজ এমনই বেঢপ যে পরিবারের সবক'টি বালক-বালিকাকেই পাঠাতে হয় দোকানে এবং তারা একে মইয়ের মতন বয়ে নিয়ে আসে।

এরপর আমেরিকান লেখক নিষ্ঠুর রসিকতা করেছেন ফরাসি রুটিওয়ালা সম্পর্কে। এঁরা নাকি কয়েকবারেই ভেবেছেন, আমেরিকানদের মতন স্লাইস রুটি তৈরি করলে কেমন হয়? কিন্তু যেহেতু স্রেফ খেয়ে ফেলা ছাড়া স্লাইস ব্রেডের অন্য কোনও ব্যবহার সম্ভব নয় সেহেতু ফরাসিরা এই রুটি গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি।

আমেরিকান হাস্যরসিক সুযোগ পেয়ে এক হাত নিয়েছেন ফরাসি রুটিওয়ালাকে। তিনি মিসেস মার্গারেট রাডকিন নাম্নী এক আমেরিকান কোম্পানির কর্ণধারকে খাড়া করেছেন, যিনি ফরাসি রুটির রহস্য আবিষ্কারের জন্য গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে নিয়মিত প্যারিসে আসছেন। বলা বাহুল্য, মিসেস রাডকিন মার্কিন দেশের সবচেয়ে বড় রুটি কোম্পানির মালিক।

মিসেস রাডকিন বলেছেন, ফরাসি রুটির রহস্য হলো ক্রাস্ট অথবা ছিলকের মচমচে ভাব। টাটকা রুটি উপভোগের জন্যে ফরাসি দিনে তিনবার রুটির দোকানে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু আমেরিকান সপ্তাহের রুটি একবার কিনে ফ্রিজে পুরে রাখে। ফরাসি রুটির জন্যে যারা পাগল তারা আসলে ওই ছিলকের জন্যে পাগল। চোখ, নাক ও জিভ তিনের তৃপ্তি এই ছিলকে থেকে।

মিসেস রাডকিন জানিয়েছেন, মোড়ক ছাড়া কোনও রুটি আমেরিকায় বিক্রি করা যায় না। ফরাসি ব্রেডে মোড়ক থাকে না। মোড়কের মধ্যে পুরলেই রুটির ছিলকে ভিজে নরম হয়ে যায়। সুতরাং আমেরিকা কোনও দিনই ফরাসি রুটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

পাঁচুদা বললেন, "ব্যাপারটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। অমন যে অমন পোয়ালাঁ তাঁর দোকানেও মোড়ক নেই পাঁউরুটির। ফরাসিদের গর্ব, রুটিতে স্নেহজাত পদার্থ থাকে না, ফলে তাজা অবস্থায় চমৎকার খেতে হলেও বেশিক্ষণ ভাল থাকে না। একদিনের পুরনো রুটি প্যারিসের ভিখিরিও খেতে চাইবে না।"

আমাদের সামনের সায়েব বললেন, "রুটি তৈরি অত সহজ নয়। আমি রুটি মুখে দিয়েই বলে দেবো কাঠের আগুনে তৈরি না গ্যাসের আগুনে, দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।"

রুটির রহস্য বুঝতে হলে অন্তত তিরিশ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। চিজ দিয়ে রুটি খাও, মাখন দিয়ে রুটি খাও, এমনকি স্রেফ রুটি দিয়ে রুটি খাও। তাজা ভাবটা উপভোগ করার জন্যে প্যারিসের সমঝদার ফরাসি পোয়ালাঁর দোকান থেকে ফিরবার পথেই রুটি সাবাড় করে ফেলে। অনেকে আবার এমন রসিক যে আজেবাজে দোকানের রুটি মুখে তুলতে পারেন না। এঁরা কোনও রেস্তোরাঁয় ডিনার করতে গেলে জিজ্ঞেস করেন কোন বেকারির রুটি সার্ভ করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে এঁরা থলিতে তাঁদের প্রিয় কোম্পানির রুটি নিয়ে যান।

পাঁচুদা বললেন, "ফরাসি রুটিওয়ালাকে সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর মতন বসবাস করতে হয়। স্ত্রীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে প্যারিসের রুটিওয়ালা ভগবান বুদ্ধের মতন মধ্যরজনীতে শয্যা ত্যাগ করে চলে আসেন বেকারির ওভেনে অগ্নিসংযোগ করতে। সেই সঙ্গে শুরু হয় ময়দার মনোহরণের প্রচেষ্টা। ময়দার মেজাজ ভীষণ পাল্টায় সুন্দরী মেয়েদের মতন। তাকে মেখে বেকিং-এর উপযোগী করে তুলতে অনেক প্রচেষ্টা চালাতে হয় রুটিওয়ালাকে। ঠিকমতন মণ্ড তৈরি না হলেই রুটির মধ্যে বড়-বড় গর্ত হবে না, ছিলকে সোনালি রং নেবে না, খরিদ্দার মুখে দিয়েই বুঝবে ব্রাহ্মমুহূর্তে রুটিওয়ালার পরিবেশ ও মেজাজ কোনওটাই আদর্শ পর্যায়ে ছিল না। তাই পোয়ালাঁর রুটিও রোজ একরকম হয়

না—যেমন সমস্ত দিন এক ধরনের নয়। কখনও ঝক্ঝকে, কখনও মেঘলা, কখনও গ্রীষ্ম, কখনও শীত।"

এবার অবাক কাণ্ড। লাইনের সামনের এক ভদ্রলোক দোকান থেকে বেরিয়ে আমার হাতে একখানা বাগেত ঠেকিয়ে দিলেন প্রীতি উপহার হিসেবে। বললেন, তিনি ইন্ডিয়াতে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং আমাদের চাপাটি খেয়েছেন এবং কিছুটা উপভোগ করেছেন।

এমন প্রীতির উপহার ফরাসিই দিতে পারে অচেনা ট্যুরিস্টকে। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে ওই বাগেতের অর্ধেক সানন্দে চিবোতে লাগলাম। পাঁচুদা টিপস দিলেন, যেভাবে দেশে আখ খেতিস সেইভাবে চিবিয়ে যা, রস পাবি।

বুঝলাম, এই রসসৃষ্টির জন্যে ফরাসি রুটিওয়ালাকে সংসারসুখ বর্জন করতে হয়েছে। বউকে নিয়ে সারারাত ঘুমোবার তাগিদ থাকলে আর যাই হোক ফরাসি রুটিওয়ালা হওয়া যায় না। আধুনিক ফরাসির মন বউয়ের দিকে, রুটির দিকে নয়, তাই রুটিওয়ালার ছেলে আর রুটিওয়ালা হতে চাইছে না, ক্রমশ একটা দুর্লভ আর্ট ফরাসিদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

এই অবস্থা যাতে অবধারিত না হয় তার জন্যে ফরাসি দেশে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠছে। রুটিওয়ালার কাজকে রোমান্টিক তোলবার জন্যে বিভিন্ন রকমের প্রচার চালানো হচ্ছে। কিছু সুফল পাওয়া গিয়েছে, নতুন এক প্রজন্মের রুটিওয়ালা তৈরি হচ্ছে যারা পিতৃপুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করতে আগ্রহী নয়।

লাইনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাঁচুদা আরও যা সব কথা বলে গেলেন তাতে আমি তাজ্জব! রুটি নিয়েও যে মোটকা-মোটকা গবেষণা-পুস্তক রচনা হয়েছে এবং রুটিওয়ালার মিউজিয়াম যে প্যারিসের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান তা আমার জানা হয়ে গেলো।

পাঁচুদা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি। প্রশ্ন করতে বলে ফেললাম, "আমাদের কলকাতায় ময়রাদের মিউজিয়াম অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে, পাঁচুদা। সিঙারা, জিলিপি, গজা, সন্দেশ, রসগোল্লার ঐতিহাসিক বিবর্তন, কোন সময়ে কী যন্ত্র কী ছাঁচ প্রযুক্তি নিয়োগ করা হয়েছে তা ভাবীকালের মানুষদের জন্যে সংরক্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রুচিমান ফরাসি যদি লায়োনেল পোয়ালাঁর ছবি সংগ্রহশালায় টাঙিয়ে রাখতে পারে তা হলে আমাদের নবীনচন্দ্র দাস, ভীমচন্দ্র নাগ, দ্বারিক ঘোষ, নকুড়চন্দ্র নন্দী, গাঙ্গুরাম চৌরাসিয়া কী দোষ করলেন? যে-দেশের মিষ্টান্নকাররা রসস্রষ্টার স্বীকৃতি পান না সে জাত অবশ্যই অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে।"

রুটি সংক্রান্ত আলোচনায় সানন্দে যোগ দিলেন ওই ইংরেজ পুঙ্গব ও তার ফরাসি বান্ধবী। ফরাসি ললনার প্রশ্ন : "তোমাদের দেশে রুটি পাওয়া যায় কিনা

এবং রুটিওয়ালার সামাজিক সম্মান কীরকম?"

শুন বরনারী! তোমরা যখন অশিক্ষিত বর্বর ছিলে, যখন তোমরা গম যব সেদ্ধ করে স্রেফ মাড় খেতে (যার নাম গ্রুয়েল), তখন আমরা ইন্ডিয়াতে লুচি, পরোটা, চাপাটি, তন্দুরি উপভোগ করছি প্রাণভরে। গমের ভদ্রোচিত ব্যবহারের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা তোমরা করোনি, হয়েছিল মেক্সিকোতে এবং এই অধমের জন্মভূমিতে। পৃথিবীকে ভারতবর্ষের প্রীতি উপহার চাপাটি, আর মিশরীয় দিয়েছে ব্রেড। প্রভু যীশুর জন্মাবার ছাব্বিশশো বছর আগে মিশরীয়রা অন্তত পঞ্চাশ রকমের ব্রেড বানাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে। ওভেন নামক চুল্লির জন্মদাতা এই মিশরীয়। তবে কেকের জন্ম গ্রিসে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে রোমেও রুটিওয়ালা ছিল না। এই সময় এক পাউন্ড ওজনের পাঁউরুটির জন্ম হলো। অলস রোমক সুন্দরীরা হেঁসেলের হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে রুটিওয়ালার দোকানে যাওয়া শুরু করলো। মুক্তি পাবার পরে রোমের ক্রীতদাসরা এই রুটিওয়ালার কাজ করতো।

আরও চারশো বছর পরে রুটিওয়ালা জাতে উঠলো। তখন সে অনেকটা গভরমেন্ট সার্ভেন্টের মতন হয়ে উঠেছে। সরকার তার ওপর অনেক নিয়মকানুন, অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজ সায়েব রুটির ইতিহাসে মজা পাচ্ছেন। আর তার সঙ্গিনীটি বললেন, "তোমরা নাকি এখনও চাপাটি তৈরির দৈনন্দিন যন্ত্রণা থেকে মেয়েদের মুক্তি দাওনি?"

পাঁচুদার সুপ্ত জাতীয়তাবোধ হঠাৎ জেগে উঠলো। বললেন, "কলকাতায় আলিপুরের বড়লোকরা ইদানিং বাড়িতেই পাঁউরুটি বানাচ্ছেন শুনেছি। কিন্তু ইন্ডিয়ান চাপাটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। স্বয়ং পোয়ালাঁ সায়েব কিছুদিন আগে আমেরিকান মেয়েদের পাঁউরুটি তৈরি শেখাতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচদিনের ধৈর্য লাগে ঘরে পাঁউরুটি তৈরি করতে। চাপাটির ওসব হাঙ্গামা নেই। আগুন যদি থাকে পনেরো মিনিটেই কেল্লা ফতে।"

মেমসায়েব বেশ শিক্ষিতা। ব্যাখ্যা চাইলেন। আর পাঁচুদা নিবেদন করলেন তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা। ভারতীয় রমণীদের দূরদৃষ্টি অনেক বেশি, তাঁরা কখনওই চাপাটি তৈরির দায়িত্বটা বাইরের দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেননি। আর ফরাসি মহিলারা ১৭৭০ সাল নাগাদ বাড়িতে রুটি তৈরির পাট চুকিয়ে পুরোপুরি রুটিওয়ালার খপ্পরে পড়লেন। তখনকার রুটির ওজন ছিল পাঁচ পাউন্ড। বড়-বড় সংসারে প্রতিবেলায় একখানা করে রুটি দরকার হতো, আর এই রুটি বাড়িতে স্টক করে রাখা সম্ভব নয়, তাই প্রতিদিন রুটিওয়ালা দয়া না করলে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। ভারতীয় গৃহিণী অনেক

বেশি বিচক্ষণ, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তিনি দু'মুঠো গম তুলে রেখেছেন, কয়েকদিন চালিয়ে দেবার মতন সঞ্চয় তাঁর আছে।

ইতিহাসের নানা ধাক্কা খেয়ে ফরাসি হয়ে উঠলো রুটি সম্পর্কে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর। রুটি হয়ে উঠলো জীবনযাত্রার প্রতীক। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যেও টুক করে কখন রুটি ঢুকে পড়লো। তাঁর তিনটি দায়িত্ব : প্রজারা রুটি পাচ্ছে কিনা দেখা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেশের সীমান্তরক্ষা করা এবং বংশধর সৃষ্টি করা। পাঁচুদা এর পরবর্তী ইতিহাস চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ১৭৮৮ সালের ১৩ই জুলাই প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে মধ্য ফ্রান্সে শস্যের ভয়াবহ ক্ষতি হলো। ঠিক দুর্ভিক্ষ বলা চলে না, তবে তার ছোট বোন অনটন। চার পাউন্ডের রুটি তখন ফরাসি শ্রমজীবীর প্রধান খাদ্য। কয়েক মাসে দাম চার থেকে আটে উঠলো। চারজনের পরিবারে প্রতিদিন অন্তত দু'টি রুটি প্রয়োজন যার দাম ১৬। এই সময় একজন রাজমিস্ত্রির দৈনিক আয় মাত্র ২০। ফলে চার্চের সামনে রুটির দোকানে লম্বা লাইন। ঠিক সেই সময় সস্তা ইংলিশ ম্যানের চাপে অনেক ফরাসি কারখানায় তালা ঝুলতে আরম্ভ করলো, নিদেনপক্ষে ছাঁটাই।

এই সময় আবার নদী জমে বরফ। বাইরে থেকে খাবার আনাও কঠিন। পোলান্ডের গম যখন হাজির হলো তা তখন খারাপ হয়ে দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে। হলুদ আটায় টোকো গন্ধ—এবং তার তৈরি পাঁউরুটি ফরাসি জাতের মেজাজ খাপ্পা করে তুললো।

ঠিক এই সময়ে নুনের ওপর ট্যাক্সো। অথচ সামান্য নুন না হলে গরিব ফরাসির চলে কী করে? বেআইনি নুনের প্যাকেট ধরবার জন্যে সরকারি লোকেরা তখন বাড়িতে-বাড়িতে আচমকা তল্লাসি চালাচ্ছে, একটু সন্দেহ হলেই দীর্ঘদিনের হাজতবাস।

ইতিমধ্যে প্যারিসের রুটির দাম ৮ থেকে ১২ এবং ১২ থেকে ১৫ তে উঠেছে। ২৭ জন রুটিওয়ালার এই সময় ফাইন হলো বেশি দামে রুটি বিক্রির জন্যে। রুটিওয়ালারাও বেঁকে বসলো ন্যায্য দামে গম না দিলে আমরা কী করে রুটির দাম কমাবো? খবরের কাগজে বেরুলো অসহায় ফরাসির দিনমজুর শার্ট খুলে দিয়ে বদলে রুটি নিচ্ছে। একখানা রুটির জন্যে এক মহিলা তাঁর অন্তর্বাস খুলে দিয়ে এলেন।

সেই সময় রুটি নিয়ে গুজব রটতে লাগলো। এক ফরাসি কারখানার মালিক হঠাৎ দাবি করে বসলেন রুটির ওপর সবরকম বিধিনিষেদ তুলে নেওয়া হোক, যাতে অনেকেই এই ব্যবসায় নামতে পারে। সরল মনে তিনি আশাপ্রকাশ করলেন, এর ফলে রুটির দাম কমবে। এবং রুটিই যখন দেশের অর্থনীতির বনিয়াদ তখন রুটির দাম কমলে মজুরির হার কমবে এবং তার ফলে অন্য

জিনিসপত্তরের দাম কমে যাবে।

কিন্তু শ্রমিকদের কাছে খবরটা বিকৃতভাবে পৌঁছলো। তারা শুনলো রুটির দাম যখন আকাশ-ছোঁয়া তখন কয়েকজন মালিক তাদের মাইনে আরও কমাবার চেষ্টা করছেন।

ফলে রাস্তা ব্যারিকেড। প্যারিসে শ্রমিক বিক্ষোভ এবং মালিকের কারখানা ও বাড়ি ঘেরাও।

"পাঁচুদা, এ যে আমাদের দেশের হাল আমলের গল্প মনে হচ্ছে।"

আরও একটু শুনিয়ে দিলেন পাঁচুদা। অবরোধ তুলতে পুলিশ এলো। কিন্তু পারলো না। ইতিমধ্যে কিছু শ্রমিক রেগে মালিকের বাড়ি লুঠ এবং ভাঙচুর শুরু করেছে। তখন মিলিটারি এলো, প্যারিসের রাস্তায় শ্রমিকের ওপর গুলি চললো। তার আগে মিলিটারিও ইটপাটকেল খেয়েছে। হতের সংখ্যা কারও মতে ২৫, কারও মতে ৯০০। আহত অন্তত ৩০০।

লুট করার সময়ে হাতেনাতে কয়েকজন শ্রমিক ধরা পড়লো মিলিটারির হাতে। একজনের বিচার হলো সঙ্গে-সঙ্গে। রাস্তায় প্যারেড করিয়ে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হলো। আরও পাঁচজনের বিচার হবে, কিন্তু এই পাঁচজনকে প্রথম জনের ফাঁসি দেখতে বাধ্য করা হলো। এদের মধ্যেও চারজনের ঝটপট ফাঁসি হলো, একজন কোনোক্রমে বেঁচে গেলো। মালিকের ধরাধরিতে।

উগ্রপন্থীরা গোপনে পুস্তিকা ছেপে রুটি সম্বন্ধে তাদের দাবি জানাতে লাগলো। রুটিই হচ্ছে এক নম্বর, এর একটা বিহিত চাই।

সরকারি আলোচনাসভার বাইরে শ্রমিকেরা অপেক্ষা করছে রুটি সমাচারের জন্যে। তারা জিজ্ঞেস করছে, "আমাদের রুটি সম্বন্ধে কর্তাব্যক্তিদের কি কোনও আগ্রহ আছে? মঁশিয়ে, ওরা কি রুটির দাম কমাবার কথা ভাবছেন? আমাদের অনেকেই দু'দিন কোনও রুটি সংগ্রহ করতে পারিনি।"

ঠিক সেই সময় রানির রুটির বদলে কেক সংক্রান্ত মন্তব্য সমস্ত প্যারিসে ছড়িয়ে পড়েছে। ৪ঠা জুন ১৭৮৯, বাস্তিল ধ্বংসের ক'দিন আগে, রাজার সাত বছরের ছেলে মারা গেলো। এই রাজকুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে ষাট হাজার লিরে রাজকোষ থেকে খরচের অনুমোদন হলো, রুটির দাম প্যারিসে তখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে। বাস্তিল ধ্বংসের তারিখ ১৪ জুলাই ১৭৮৯, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ গত দু'শো বছর ধরে মনে রেখেছে।

পাঁচুদা বললেন, "ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হিসেবে বাস্তিল ধ্বংসের দিনটাই ধরা হয়, কিন্তু ওই যে প্যারিসের শ্রমিক বিক্ষোভের কথাটা বললাম, ওটাও কম নয়। গুজবের সেখানে বড় একটা ভূমিকা ছিল। কারণ এখন প্রমাণিত হয়েছে ওই মালিক ভদ্রলোক মোটেই মাইনে কমাবার প্রস্তাব দেননি, বরং তিনি

চেয়েছিলেন রুটি তৈরিতে প্রতিযোগিতা আসুক, দাম কমুক। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো।”

পাঁচুদা জানালেন, ফরাসি বিপ্লবের দু'শো বছর পূর্তি উপলক্ষে নানা লেখা, নানা বই বেরুচ্ছে। একটা খবর হৈ চৈ ফেলেছে, ঐদিন সম্রাট ষোড়শ লুই তাঁর দিনপঞ্জিতে নাকি লিখেছিলেন, “কিছুই ঘটেনি।”

রাজাকে গদিচ্যুত করে জেলে পাঠিয়েই ফরাসির রাগ কমেনি। তাঁকে কোতলের হুকুম হলো। রাজা তিনদিন সময় ভিক্ষা করলেন। আবেদন না-মঞ্জুর হলো। রাজা মৃত্যুদণ্ডের সকালে একবার স্ত্রী ও পুত্রকে দেখতে চাইলেন। সে আবেদনেও কান দেওয়া হলো না। তারপর গাড়ি চড়িয়ে ভোরবেলায় প্যারিসের বধ্যভূমিতে যখন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন বিশ হাজার লোক রুটির প্রতিশোধ নেবার জন্যে রাজার মুণ্ডুচ্ছেদ দেখতে এসেছে। সমবেত জনতাকে মৃত্যুপথযাত্রী রাজা কিছু বলতে শুরু করলেন। ওই সব কথা যাতে কারও কানে না পৌঁছয় তার জন্যে ড্রাম বাজাবার নির্দেশ দেওয়া হলো। কয়েক মুহূর্তেই গিলোটিনে রাজার মুণ্ডু ছিন্ন করা হলো এবং সেই মুণ্ডু তুলে সমবেত জনতাকে দেখানো হলো। তারপর কী উল্লাস। ইস্কুলের ছেলেরা মাথার টুপি আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো। রাজার রক্তে কেউ-কেউ কাগজ ভিজিয়ে নিলো, কেউ ফাউন্টেন পেনে ভরে নিলো, কেউ জিভে দিয়ে চেখে নিলো। বললো, নোনতা। এদিকে জল্লাদ দুটো পয়সা কামাবার জন্যে রাজার কাপড়ের একটু অংশ কেটে তাতে রাজার চুল মুড়ে সুভেনির হিসেবে বিক্রি করতে লাগলো। মনে হলো মানুষ যেন মেলায় মজা করতে এসেছে।

আর যে-রানি ফরাসিকে রুটির বদলে কেক খেতে বলেছিলে তাঁর ওপরেও সে কী প্রতিহিংসা! একচল্লিশ জন মিথ্যে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে কত রকমের অভিযোগ আনা হলো তাঁর বিরুদ্ধে। মনে হবে পৃথিবীতে এমন ডাইনি কখনও জন্মায়নি। তাতেও রাগ কমলো না। রানির ছেলেকে দিয়ে জোর করে স্বীকারোক্তি পত্র লিখিয়ে বিচারকদের সামনে নিবেদন করা হলো। রানি নাকি ওই বালককে মৈথুন শিখিয়েছেন এবং মাতৃসহবাসে উত্তেজিত করেছেন। সময় এই সব অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু রানির প্রাণরক্ষা হয়নি।

কিন্তু চরম মুহূর্তেও সম্রাজ্ঞীর কি রাজকীয় বিশিষ্টতা। একটা শাদা ড্রেশ এবং প্লাম সু পরে রানি বধ্যভূমিতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। একটা খোলা গাড়িতে তাঁকে প্যারিস শহর ঘোরানো হলো, তাঁর স্বামীকে অন্তত একটা ঢাকা গাড়িতে শহর ঘোরানো হয়েছিল, এঁকে সে সুবিধাটুকুও দেওয়া হলো না। বিপ্লবীদের ঘৃণা কতখানি হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে। “এই মাদিকুত্তা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিজের গোমর দেখিয়ে গেলো। কিন্তু গিলোটিনে মাথা

ঢোকাবার পথে বেটির পা টলে উঠেছিল এবং হোঁচট খেয়েছিল। কী আনন্দ! নিজের চোখে দেখলাম **The head of the female veto separated from her fuckingtart's neck.**" এর অনুবাদ না করাই ভাল, ঘটনার দু'শো বছর পরে একটা জাত সম্পর্কে নতুনভাবে ঘৃণা তৈরি করে লাভ কী?

না, দু'শো বছর পরে তিলোত্তমা প্যারিসে এসে এই সব ঘটনা স্মরণ করার কোনও মানে হয় না। প্যারিস তো ওই সব বেমালুম হজম করে এখন আবার নিজেকে মোহিনী মায়ায় আচ্ছাদিত করেছে।

সুসংবাদ। আমাদের প্রতীক্ষাপর্ব শেষ। আমরা পোয়ালাঁর কাউন্টারে পৌঁছে গিয়েছি। পাঁচুদা অতি সামান্য দামে দু'খানা বাগেত কিনে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, অনেক রুটির গায়ে ময়দা লেগে রয়েছে। পাঁচুদা বললেন, "ওটা অসাবধানতা নয়, ওইটাই ফরাসি স্টাইল। রুটির দামও অন্য জিনিসের চেয়ে অনেক কম। ফরাসি সাবধান হয়ে গিয়েছে। রুটির দামটা ওই গিলোটিনের ভয়ে ভীষণ কম রেখেছে। প্রায় জলের দাম বলতে পারিস। যাতে কারও কিনতে কষ্ট না হয়। আর রুটির দোকানও হয়েছে শত-শত। ফরাসি এখন স্রেফ শখ করে তার প্রিয় পাঁউরুটির দোকানগুলোতে লাইন দিয়ে অন্য তৃপ্তি পায়।"

পোয়ালাঁর দোকান থেকে বেরিয়ে পাঁউরুটি হাতে আমরা আবার রাজপথ ধরে হাঁটছি। "যাবি নাকি বেকারি মিউজিয়ম দেখতে?" রুটিওয়ালাকেই যখন দেখলাম তখন আর রুটির মিউজিয়ম দেখে কী লাভ?

পাঁচুদা জানতে চাইলেন, "রাজা ও রানির কিছু দেখতে চাস?" আমার ঠিক রুচি হলো না। আমি প্যারিসের পথ ধরে যেতে-যেতে কেবল পাঁচুদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাতের অভাব, কাজের অভাব, শাসকের অবহেলা, অবিচার, অত্যাচার তো আমাদের দেশেও ছিল, তবু অমন কাণ্ড ঘটলো না কেন?"

মাথা চুলকে পাঁচুদা বললেন, "খুব শক্ত প্রশ্ন করেছিস। আমি তো বিপ্লব সম্বন্ধে অত পণ্ডিত না।" একটু থামলেন পাঁচুদা, তারপর উত্তর দিলেন, "শুধু অভাব থাকলেই বিস্ফোরণ হয় না। তার সঙ্গে চাই প্রচণ্ড রাগের মিশ্রণ। বিপ্লবের ফর্মুলাটা হলো হাঙ্গার প্লাস অ্যাঙ্গার, খিদে ও রাগের রাসায়নিক সংযোগ থেকেই বিপ্লবের উৎপত্তি।"

পোয়ালাঁর দোকান থেকে পর্যাপ্ত পাঁউরুটি সংগ্রহ করে আমি ও পাঁচুদা আবার প্যারিসের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছি। এখানকার পথ ঘাটের নামটাম এখনও আমার আয়ত্তে আসেনি—শ্যামবাজারের সঙ্গে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের কী তফাত তা আমার মস্তিষ্করূপ ঘটে কিছুতে প্রবেশ করছে না।

পাঁউরুটি বহন করছি বিশেষ এক ভঙ্গিতে—দুটি হাত প্রায় প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে রেখে আমাদের বাল্যবয়সে মেয়েরা এইভাবে ইস্কুলের বই বহন করতো। ছেলেরা বই রাখতো ডান হাতে অনেকটা বন্দুক ধরার স্টাইলে, আর মেয়েরা কেন দু'হাতে ওইভাবে বই বহন করতো তা মনস্তাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। তখনও অকালপক্ক কিছু ছেলের অভাব ছিল না, তারা প্রার্থনা করতো—হে ঈশ্বর, পরের জন্মে যেন গার্লস ইস্কুলের বই হয়ে জন্মাই। ফচকেমির অংশটা বাদ দিলে বলা যায়, মেয়েদের মধ্যে ছিল বেশি নিষ্ঠা, ইস্কুলে যাওয়াটা তারা মন্দিরে যাওয়ার মতনই মনে করতো, ছেলেরা তখনও এবং এখনও অনিচ্ছুক অবস্থায় বিদ্যাশ্রমে গমন করে। এখন স্বদেশে বই উঠেছে পিঠের ব্যাগে, ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য অন্তত একটা বিষয়ে কমে যাচ্ছে। আমরা যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছি সেখানে স্কুল ব্যাগ ছিল মস্ত এক বিলাসিতা, যা আমাদের প্রায় সব বন্ধুদের আয়ত্তের বাইরে।

মেয়েরা যেভাবে বই ধরতো প্যারিসে পাঁউরুটি পরিবহনে সেই স্টাইল অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমরা দু'জন এখন রুটি বুকে রেখে আলোচনা করছি অনাহার সম্পর্কে।

পাঁচুদা ইতিমধ্যেই বলেছেন, "হাঙ্গার থেকেই যতকিছু সামাজিক অসন্তোষের উৎপত্তি। কিন্তু একা হাঙ্গার বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না।"

বাঙালির ইতিহাসটাও চোখের সামনে দেখতে পেলাম। পাঁচুদাকে বললাম, "একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতন। রুটির দোকানে লাইন দিতে হচ্ছে এবং রুটির দাম বাড়ছে বলে ফরাসি ঝট করে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গেলো। অথচ প্রায় কাছাকাছি সময়ে বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হলো। স্রেফ অন্নের অভাবে এক কোটি লোক মারা গেলো, বাংলার জনসংখ্যা তিন কোটি থেকে কমে দু'কোটিতে দাঁড়ালো। অথচ বাঙালি কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানালো না।"

পাঁচুদা বললেন, "ব্যাপারটা আমার কথাটাই সাপোর্ট করছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে 'হাঙ্গার' থাকলেও 'অ্যাঙ্গার' ছিল না। এই এক কোটি লোকের অপমৃত্যু মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা, অথচ পৃথিবীর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এতো উত্তেজনা—১৯১৪-১৮-র সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে দু'পক্ষ মিলিয়ে এক কোটি লোকের প্রাণনাশ হয়েছিল।"

আমাকে উত্তর দিতে না দেখে পাঁচুদা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোর নিশ্চয় গলা শুকিয়েছে।"

শুনলেন না পাঁচুদা! জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন এক দোকানে কফি পানের জন্যে। এ এক অদ্ভুত দেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কফি খেলে এক রকম দাম, বসলে আর এক রকম। হয়তো শুতে চাইলে তারও ব্যবস্থা হবে আরও স্পেশাল দাম।

একটা পছন্দসই জায়গায় পাঁচুদা আমাকে বসালেন। আমিও পাঁচুদার সঙ্গে লড়ে যেতে রাজি আছি। পকেটে কুড়ি ডলার গজগজ করছে, একটা আধলা এখনও খরচ হয়নি। তা ছাড়া শহিদনগরের সম্বিতের কাণ্ডকারখানা আলাদা। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে আসামাত্রই হাতে কিছু নগদ ফ্রাঁ গুঁজে দিয়েছে। যাতে হাতখরচের জন্যে তার কাছে হাত পাততে না হয় নিয়ত। সম্বিৎ পয়সার অভাব কাকে বলে তা হাড়ে-হাড়ে জানে। আমিও জানতাম যৌবনে বাবার মৃত্যুর পরে বিরাট সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার যখন ঘাড়ে চেপেছিল। সম্বিৎ মুখে কিছু বললো না, কিছু ওর বোধহয় ধারণা বাল্যবয়স থেকেই প্রত্যেক মানুষের কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক প্রাইভেসি প্রয়োজন। প্রাইভেসিটা আর কিছুই নয়, কারুর কাছে জবাবদিহি না করে আমার খুশিমতন টুকটাক কিছু খরচ করার স্বাধীনতা। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত পরিবারেও আমরা সচেতন থাকি না, আমাদের বিধবা মা অথবা উপার্জনহীন পিতৃদেব সম্পর্কে।

কফির দোকানে বসে পাঁচুদা বললেন, "হাজার দশ বারো এইরকম দোকান আছে প্যারিসে। এখানে না এলে ফরাসির পেটের ভাত (স্যরি, পাঁউরুটি) হজম হবে না। প্রত্যেকটা দোকানের পিছনে মস্ত-মস্ত ইতিহাস—কোন দোকানের কোন চেয়ারে কোন বিশ্ববিখ্যাত লোক এসে বসতেন সব সযত্নে লিপিবদ্ধ করা আছে।"

এরপর পাঁচুদার ব্যাখ্যা—যদি তোর সাহিত্যে দুর্বলতা থাকে তা হলে তুই যেতে পারিস এমন দোকানে যেখানে ভোলতেয়ার দিনে চল্লিশ কাপ কফি উইথ চকোলেট পান করতেন। যদি তোর চিত্রকলায় আগ্রহ থাকে তা হলে চলে যা বুলেভার্ড সেট জার্মান কাফে দ্য ফ্লোর-এ। ওখানে প্রাত্যহিক খরিদ্দার ছিলেন পিকাসো। দরজা থেকে ঢোকবার পরে দোকানের দ্বিতীয় টেবিলটা দখল

করতেন পিকাসো—উনি অবশ্য কফির খরিদ্দার ছিলেন না, অর্ডার দিতেন মিনারেল ওয়াটারের। ওর ঠিক পাশেই আর এক কাফে আছে যেখানে জঁ পল সার্তারকে পাওয়া যেতো প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে-বারোটা।

"মানুষ এই জায়গায় আসে কিছু না-করবার জন্যে—ফর ডুইং নাথিং। একটু গলা ভেজানো। একটু আড্ডা, একটু পরচর্চা, প্রয়োজনে একটু প্রেম। তোর মনে হতে পারে কাফেতে এতো সময় কাটালে এঁরা কখন লিখেছেন? কখন ছবি এঁকেছেন? এটা সত্যিই ভাবার ব্যাপার, কারণ হাওড়া-কলকাতায় যারা চায়ের দেকানে আড্ডা জমিয়েছে তারা যত গর্জিয়েছে তত বর্ষায়নি।"

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁচুদার পরবর্তী মন্তব্য, "তোর মনে হচ্ছে সাহিত্যে, শিল্পে মন নেই! তুই পলিটিকসে ঢুকতে চাস? তা হলেও প্যারির কাফে ছাড়া তোর গতি নেই। তুই চল না রোতাস্ততে, বুলেভার্ড দ্য মোপারনে, ১০৫ নম্বর। এই দোকানে বসে ১৯১৫ সালে দু'জন রাশিয়ান ক্রিম কাফের অর্ডার দিতেন এবং চুপিচুপি বিপ্লবের শলাপরামর্শ করতেন। এদের নাম শুনে থাকবি—লেনিন এবং ট্রটস্কি!"

পাঁচুদা বললেন, "তোকে দু-একখানা বই ধার দেবো। প্যারিসের কোন খাবারের দোকানে কী ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তা তোর জানা হয়ে যাবে। এসব না জানলে প্যারিসে আসার কোনও মানে হয় না, যেমন সাঙ্গুভেলি এবং কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে না গেলে কলকাতা দেখাই হয় না। তোর জানতে ইচ্ছে করতে পারে নেপোলিয়ন কাফেতে আসতেন কি না? উত্তর : অবশ্যই আসতেন। ওঁর প্রিয় দোকান ছিল লা প্রোকোপ। দোকানটা এখনও আছে, প্যারিসের সব চেয়ে পুরনো কাফে, চলছে সেই ১৬৮৬ সাল থেকে। এইখানেই ছোকরা নেপোলিয়ন কফির বিল মেটাতে পারেননি। কিন্তু নো ছাড়! ওঁকে নিজের টুপিটি দোকানের মালিকের কাছে গচ্ছিত রেখে চলে আসতে হয়েছিল। এখনও হাজার-হাজার লোক ওই দোকানে আসে নেপোলিয়নের দেনা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে। বর্তমান মালিক সুযোগ বুঝে কাফেকে রেস্তোরাঁয় প্রমোশন দিয়েছেন। যাঁদের ধারণা কফির কাপে তুফান ওঠে না তাঁদের জন্যও খবর আছে। ফরাসি বাস্তিল ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বে সবচেয়ে গরম বক্তৃতাটি হয়েছিল এক কফির দোকানের সামনে—দোকানটির নাম কাফে দ্য ফয়।"

পাঁচুদা বললেন, "ফরাসি কাফের কোডগুলো জেনে নে। যে-টেবিলে চাদর পাতা রয়েছে সে-টেবিল একটু ভারী খাবারের জন্যে—অর্থাৎ কি না লাঞ্চ অথবা ডিনার।"

এখন তো ভারী খাবারের সময় নয়। কিন্তু পাঁচুদা মনে করিয়ে দিলেন, ভারী খাবারের জন্যে জাত ফরাসি সবসময় প্রস্তুত। গপাগপ খাওয়ার জন্যে কোনও

একটা ছুতো বের করে নেওয়া ফরাসি উদ্ভাবনী প্রতিভার পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। অতিমাত্রায় খাদ্য-আসক্তি ফরাসি জাতির দুর্বলতা বলে মনে হয়েছিল আমেরিকান আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনের। আতিথ্যের অবমাননা ইংরেজ-আমেরিকানের নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক। ইলেকট্রিক বাল্‌ব এবং ফোনোগ্রাফ আবিষ্কারের জন্য ফরাসিরা এই আমেরিকানকে এখন থেকে একশ বছর আগে প্রায় রাজসম্মান জানিয়েছিল। দু-একটা খানাপিনার ব্যবস্থাও হয়েছিল—যা ঘণ্টাচারেক ধরে চলেছিল। এডিসন লাঞ্চে উপস্থিতও থাকলেন অথচ পরে নিজের স্মৃতিকথায় ফরাসি নোলা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যও করলেন।

খানদান কাফের কিছু স্বধর্ম আছে। যত লোকই দাঁড়িয়ে থাকুক ওয়েটার কোনো খরিদ্দারকে উঠে যাও অথবা আরও অর্ডার দাও বলবে না। এক কাপ কফি নিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকতে পারা ফরাসির জন্মগত অধিকার।

শুনেছিলাম, আড্ডা মারার জন্যে মানুষ এখানে আসে। কিন্তু দেখলাম, বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা বই অথবা ম্যাগাজিন হাতে নিঃসঙ্গ বসে আছেন। একটা স্মরণীয় কোটেশন দিলেন পাঁচুদা : "জনসমুদ্রে নিঃসঙ্গতার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে অনেকে কাফেতে আসেন। ওখানে বসে-বসে পুরো একখানা বই লিখে ফেললেও দোকানদার তোকে ঘাঁটাবে না, বরং প্রশ্রয় দেবে। তেমন কপাল হলে দোকানদার তোর জন্যে টেবিলটা রিজার্ভ করে রাখবে।"

আরও একটা চমৎকার মন্তব্য পাঁচুদার শ্রীমুখনিঃসৃত হয়ে আমার নোটবুকে বন্দি হলো : "তোদের ধারণা এশিয়াতেই সূর্য উপাসনা হতো—কথাটা ঠিক নয়—দুনিয়াতে ফরাসির মতন সূর্য উপাসক আর কোথাও নেই। তাই রোদ পোয়াবার জন্যে, প্রাকৃতিক আলো পুরো উপভোগের জন্যে ফরাসি কাফে রাস্তার ফুটপাতে নেমে এসেছে।"

কফির মস্ত সমঝদার এই ফরাসি। কাফে নয়র বা কাফে এক্সপ্রেস হলো—কালো কফি। ইচ্ছে করলে ডাব্‌ল এক্সপ্রেস অর্ডার দেওয়া যায়। ডাবল হাফের মতন আছে কাফে সেরে—খুব কড়া, অথচ গরম জলের পরিমাণ অর্ধেক। আবার দুর্বল এক্সপ্রেসে আছে—সঙ্গে বাড়তি গরম জল কড়াকে নিজের মর্জি মতন নরম করার জন্যে। দুধ দিয়ে কফি খাবার বাতিক বাঙালির—সুতরাং তাকে চাইতে হবে কাফে ক্রিম। গ্র্যান্ড ক্রিম বললে হাজির হবে ডাবল এক্সপ্রেসো দুধসহ। ইদানিং আবার স্বাস্থ্যবাগিশদের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে 'ডেকা' যার অর্থ ক্যাফিনমুক্ত কফি।

"পাঁচুদা, আমাদের কলকাতা কফি হাউসে ইনফিউসন বলে একটা আইটেম আছে। জিনিসটা তেতো, কিন্তু দাম সবচেয়ে কম বলে অনেকেই আমরা পছন্দ করতে বাধ্য হতাম।"

ওই কথাটা এ-দোকানে মুখে না আনতে পরামর্শ দিলেন পাঁচুদা, ওয়েটার এখনই চা এনে হাজির করবে। হার্বাল টি যা কোনও ভদ্দরলোক বাঙালির পক্ষে গলায় চালান দেওয়া শক্ত ব্যাপার। বাতিকগ্রস্ত সায়েব-মেমদের জন্যেই 'হার্বাল টি' তৈরি হয়।

দু'পাত্র গ্র্যান্ড ক্রিম অর্ডার দেওয়া গেলো। কফি পাত্রের আকার ও পরিমাণের ব্যাপারে ফরাসিরা আতলান্তিকের অপরপারের আমেরিকানদের তুলনায় নিতান্তই অনুদার। হোমিওপ্যাথিক শিশির সাইজের কাপ—মিথ্যে এতো দিন হাওড়া স্টেশনের ভাঁড়ওয়ালাদের সাইজ ছোট করার জন্যে শাপশাপান্ত করেছি।

অথচ এই ফরাসিই মদের পরিমাপের ব্যাপারে খুবই উদার। এক গ্যালন ফরাসি পানীয় এক সিটিং-এ পান করে বসবেন এমন ফরাসির সংখ্যা এই নগরীতে সীমাহীন। কাফেতে কফির তুলনায় মদের আদর অনেক বেশি। মাথাপিছু মদ্য পানের তালিকায় ফরাসির স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। কোথায় যেন পড়েছিলাম দুনিয়ার এক নম্বর স্থানটি দখলে রয়েছে লাক্সেমবুর্গের নাগরিকদের। ফরাসির পরেই পর্তুগাল এবং স্পেন। জার্মান ও ইতালীয়রা আমেরিকানের থেকে এগিয়ে আছে এবং মার্কিনদের পরেই ইংরেজদের সুনাম শুঁড়ির কাছে।

সম্বিতের অফিসে কিছু পরিসংখ্যান নোটবইতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষ মাতাল হয় মানসিক চাপ অথবা নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচবার জন্যে। কিন্তু ফরাসি মদ খেতে শেখে বাপ-পিতামহের স্বভাব থেকে। মদ ছাড়া কোনও খাবারই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। দিনে অন্তত দু'লিটার রেড ওয়াইন সাবাড় করে এমন ফরাসির সংখ্যা দশ লাখের বেশি। এক লিটার ওয়াইন যাঁরা হজম করেন, তাঁরা তাঁদের পরিমিতিবোধের জন্যে ফরাসি নীতিবাগীশের প্রশংসা অর্জন করেন। এমন পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা কুড়ি লাখের ওপর। হাসপাতালে যত পুরুষ রোগী ভর্তি হয় তার অন্তত তিরিশভাগ পাঁড় মাতাল, যাদের ডাক্তারি নাম অ্যালকহলিক। ফরাসি দেশে যত মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয় তাদের বাপমায়ের শতকরা পঁচাত্তরজন পাঁড় মাতাল। যত আত্মহত্যা হয় তার চার ভাগের এক ভাগ, যত খুন খারাপি হয় তার অর্ধেক এই পাঁড় মাতালদের কাণ্ড। কিন্তু মদ্যপান নিবারণ সম্পর্কে বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর বা লোকশিক্ষায় ফরাসির তেমন উৎসাহ নেই। একটি কারণ—তিরিশ লাখ ফরাসির রুজি-রোজগার এই মদের ব্যবসা থেকে।

আমার ধারণা ছিল রেড ওয়াইন বেশ নরম জিনিস, হুইস্কির মতো শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় না। কিন্তু প্যারিসের কাফেতে বসে ভুল ভাঙলো। এই রেড ওয়াইন পাঁড় মাতালদের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। এর দাম ফলের রসের অর্ধেক। পাঁচুদা বললেন, "ফরাসি দেশে সস্তা মদের প্রচার কমানোর চেষ্টা চলছে, তবে

বিয়য়ের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বলাবাহুল্য সিরোসিস অব্ লিভার রোগে ফরাসি এখন দুনিয়াকে নের্তৃত্ব দিচ্ছে। মদে পচে যাওয়া লিভারের চিকিৎসা করতে-করতে ফরাসি হাসপাতালের ডাক্তাররা হিমসিম খান।"

তবু, মদ খেয়ো না এই প্রচার ফরাসি দেশে চালানো যাবে না। কিছু-কিছু প্রচারপত্র ইস্কুলে বিলি করা হয়েছিল, যাতে বলা হয় বেশি মদ খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। তার ধাক্কা সামলাতেই ফরাসি সরকার হেদিয়ে গেলেন, কারণ প্রতিবাদে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলো কিছু ফরাসি অঞ্চলে যেখানে ভাল মদ তৈরি হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে আঠারো বছর বয়সের কম ছেলেমেয়েদের বার অথবা রেস্তোরাঁয় মদ দেওয়া হয় না। রসিক ফরাসির ক্ষেত্রে প্যারিস শহরে এই বয়সসীমা ছিল মাত্র ১৪ বছর। যদি সঙ্গে কেউ থাকেন। একলা কাফেতে বসে মদ কেনার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে ফরাসিকে জন্মের পরে ১৬ বছর অপেক্ষা করতে হতো। তবে এক বিদেশি ভদ্রলোক লিখেছেন, এসব নিয়মের কড়াকড়ি ছিল না। কয়েক বছর আগে তিনি দেখেছিলেন দু-তিন বছরের শিশুকে ফরাসি বাবা-মা কাফেতে বসিয়ে নির্ভেজাল মদ দিচ্ছেন, পুরো এক পাত্র। ইদানিং আঠারো বছরের আইন ফরাসিরাও চালু করেছে, কিন্তু মদের সমঝদার কমছে না। কোথাও নতুন জনপদ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমেই দাবি ওঠে কাফে কোথায়? কয়েক বোতল মদ কাফেতে বসে সেবন না করলে কোনওরকম ফরাসি বাণিজ্যের কথা কিংবা কাজের কথা ফরাসি আলোচনা করতে পারে না। যেখানে মদ নেই সেখানে ফরাসি নেই। পরিস্থিতি এমনই গুরুতর যে একজন নিরুপায় ফরাসি শল্যচিকিৎসক শুঁড়িখানায় তাঁর চিকিৎসা কেন্দ্র খুলেছেন।

ফরাসি-মদ উৎপাদকরা ইদানিং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন, তার কারণ কমবয়সী ছেলেমেয়েরা ক্রমশই মদ্যপানের ওপর জোর দিচ্ছে এবং ওই খাতে বেশি খরচ করছে। জনসাধারণও বলছেন, ড্রাগে বেসামাল হওয়ার থেকে বরং মদে মাতোয়ারা হওয়া শরীর ও মনের পক্ষে অনেক ভাল।

আমাদের কফি এসে গিয়েছে। দোকানের মেনু কার্ডে ফরাসি কফির ইতিহাস লেখা রয়েছে। পাঁচুদা অনুবাদকের কাজ করলেন। আবার সেই সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের উপাখ্যান—ফরাসিরা ওই মহাপরাক্রমশালী নরপতির সময়ে জাতে উঠলো। সম্রাট কবে কী করেছিলেন, কী আস্বাদ করেছিলেন তা ফরাসি জাতের কণ্ঠস্থ। চতুর্দশ লুই ১৬৬৪ সালে প্রথম কফি পান করেছিলেন, কিন্তু খুব পছন্দ করেননি। আরও পাঁচ বছর পরে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত প্যারিসে কফিকে জাতে তুললেন। তাঁর পার্টিতে কফির স্বাদগ্রহণ করে ফরাসি অভিজাতরা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। অথচ মার্কিনি লেখক একশ বছর আগে লিখে গিয়েছেন—ইংরেজের চা, জার্মানদের বিয়র, স্প্যানিয়ার্ডের চকোলেট, তুর্কের

আফিম এবং ফরাসির কফি এক জিনিস।

কফিকে ফরাসি জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার কৃতিত্ব অর্জন প্যাস্কাল নামে এক আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকের। ১৬৭০ সালে প্যারিসের এক মেলায় উর্দিপরা ওয়েটাররা গরম কফি ফেরি করতে লাগলো। আমাদের 'চা-গারাম'-এর মতন এই সব ফেরিওয়ালাদের ডাক ছিল—কাফে, কাফে। ইদানীং আমাদের বিভিন্ন রেলস্টেশনে 'চা-গ্রাম'-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 'কা-ফি' ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ফরাসিরা যা করেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে আমাদের তিনশ বছর লেগে গেলো। মেলার পরে এই প্যাস্কাল সায়েব একটা কফি বুটিক খুললেন প্যারিসে, যার অনুপ্রেরণা এসেছিল কনস্ট্যানটিনোপোল থেকে। কিন্তু ওই দোকানের খরিদ্দারের ভিড় তেমন না থাকায় প্যাস্কালকে পাড়ায়-পাড়ায় গরম কফির ফেরিওয়ালা পাঠাতে হতো। কিছু দিনের মধ্যে প্যাস্কালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলো এক প্রতিবন্ধী ফরাসি যে অবিশ্বাস্য সস্তা দামে চিনি সমেত গরম কফি বিক্রি আরম্ভ করলো।

যথাসময়ে ফরাসি ডাক্তাররাও কফি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁরা কফির নানা গুণ সম্বন্ধে মোহিত হয়ে ঘোষণা করলেন, কফি খাও। কফিতে স্কার্ভি রোগ সারে, গেঁটে বাতে আরাম পাওয়া যায়। এমনকি স্মল পক্সেও সুফল পাওয়া যায়। আর গরম কফিতে গার্গল করলে গলার সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি। সর্দি কাশির উপশমে কফি তো অদ্বিতীয়। এইভাবে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের জোরে কফি পাত্তা পেলো ফরাসির মনে এবং ১৬৮৬ সালে প্যারিসে প্রথম কাফের দরজা খোলা হলো যার কথা আগেই বলেছি।

কাফেতে বসে কলকাতার কথা ভাবছি। দু'খানা কফি হাউস বাঙালিকে বাকসর্বস্ব ও অকর্মণ্য করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এমন একটা অপবাদ সর্বত্র রটানো হয়েছে। কফির জনপ্রিয়তা যতই বাড়তির দিকে হোক এই পানীয় এখনও বাঙালির হৃদয়ে স্থান পায়নি। আমাদের হৃদয়েশ্বর হয়ে বসে আছে চা। দুনিয়ার সেরা চা (যা দার্জিলিং নামে পরিচিত) যে পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয় তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। রুচিমান কলকাত্তাইয়া চায়ের রসিক। ঐ পানীয়কে বাঙালির থেকে ভাল কেউ বোঝে না এমন একটা গর্ব আমার মধ্যে বহুদিন লালিত হচ্ছিল।

পাঁচুদা আমার মনে দাগা দিলেন। বললেন, "আজ কফি খা আর একদিন টি সালোঁতে যাওয়া যাবে।"

"ঝেড়ে কাশুন, পাঁচুদা। সালোঁ তো ছবিটবি প্রদর্শনীর আর্টিস্টিক আঁতেল জায়গা।"

"চায়ের ব্যাপারটাও যে কম আর্টিস্টিক নয় তা তো বাঙালির মগজে ঢুকলো

না। ফতুয়ার পকেটে ওয়ার্লডের সেরা চা (দার্জিলিং) রেখেও বাঙালি তার কোনও ফয়দা তুলতে পারলো না।"

"কেন পাঁচুদা? আমরা তো ভাল চা ভালবাসি।"

"খাওয়াতে ভালবাসিস কি না সেইটাই এ যুগের প্রশ্ন। বিনা পয়সায় খাওয়াতে বলছি না, দুনিয়ার মানুষ গাঁটের কড়ি খরচ করে ভাল জিনিস ভালভাবে আস্বাদ করতে তৈরি। কলকাতায় কি একটা স্পেশাল চায়ের সালোঁ তৈরি হয়েছে যেখানে মানুষ চায়ের তারিফ করতে শিখবে? ভালর সঙ্গে মন্দর কি তফাত তা চিনতে শিখবে? আমি তো সেদিন এক ভদ্দরলোকের কাছে শুনে লজ্জায় মরে যাই যে কলকাতার পাঁচ তারা হোটেলে এখন টি ব্যাগে চা দিচ্ছে—যার সঙ্গে পাঁচনের কোনও তফাত নেই! এতো কষ্ট করে একজন বিদেশি কি কলকাতায় যাবে দার্জিলিং চা থেকে দূরে থাকতে এবং টি ব্যাগের সালসা খেতে? স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা জিনিস থাকবে না?"

পাঁচুদা বললেন, "চা কি করে খেতে হয় তা শিখতেও বাঙালিদের এই প্যারিসে ট্রেনিং নিতে আসতে হবে। কফির জয় জয়কার এখানে, কিন্তু আঁতেলরা মোটেই চা ভুলে যাননি। ১৯২০ সাল থেকে এখানে কিছু দোকানে চা ও নাচের ব্যবস্থা রয়েছে। ওখানে মন দেওয়া নেওয়ার পালা অভিনীত হতো একটু বেশি বয়সী কুমারী ও ছোকরা ফরাসির মধ্যে। যদিও দুষ্ট জনরা বলে, শুধুই নাচানাচি, তারপর সাবধানী ফরাসি যুবক শারীরিক সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে কেটে পড়তো মুক্তপুরুষ হিসেব।"

শুনলাম, সত্তরের দশক থেকে চায়ের রেনেসাঁ শুরু হয়েছে ফরাসি দেশে, টি সালোঁ জাতে উঠেছে। একটু শান্তিতে এক পট চা সেবনের সুখ উঁচুতলার ফরাসি বুঝতে শুরু করেছে।

ফরাসি যা কিছু করে তা স্টাইলে করে। এ-বিষয়ে পাঁচুদার কাছ থেকে আরও কিছু খবর সংগ্রহ করা গেলো। জাঁপল মেট্রো স্টেশনের কাছে একটা সালোঁ আছে যেখানে চা পানের এলাহি ব্যবস্থা। ওখানে কুড়িটা দেশের তিনশ রকমের চা মজুত রাখা হয়। সেই সঙ্গে দু'শ রকমের টিপট। দোকানে ঢুকতেই ঢাউস ডিক্সনারি সাইজের মেনু বুক দেওয়া হবে, যেখানে ওই তিনশ রকম চায়ের কোনটির কি বিশেষত্ব তা উপন্যাসের স্টাইলে লেখা আছে। যদি বাঁশ বনে ডোম কানা হয়, তা হলে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ছুটে আসবে অতিথিকে পথ দেখাতে এবং কোন চা পান করবেন তা নির্বাচনে সাহায্য করতে। চিন, জাপান, ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া এই সালোঁতে সুন্দরী ললনার মতন গুঁতোগুঁতি করছে ফরাসির মনোরঞ্জনের জন্যে। এক কাঁড়ি বিড়ি সিগ্রেট টানলে সূক্ষ্ম আঘ্রাণশক্তির বারোটা বেজে যায়, তাই এই দোকানে স্মোকারদের জন্যে আলাদা চত্বর। দোকানের

এক্সপার্ট, ডাক্তারের মতন অতিথির লাইফ হিসট্রি নিয়ে, কোথায় জন্মেছি ইত্যাদি খোঁজখবর নিয়ে চায়ের প্রেসক্রিপশন লিখবে। তারপর ঠিক হবে কোন টি-পটে নির্বাচিত চা সরবরাহ করা উচিত। পানের সঙ্গে অনুপানেরও পার্থক্য হবে, সে-সম্বন্ধেও বিদগ্ধ পরামর্শ পাওয়া যাবে জগদ্বিখ্যাত এই টি সালোঁতে।

“তা হলে দাঁড়াচ্ছে কি ব্যাপারটা?”

পাঁচুদা বললেন, “কলকাতায় তোরা কয়েকটা টি সালোঁ তৈরি কর—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুরুচিসম্পন্ন অথচ পকেট-কাটা ব্যাপার নয়। সেখানে দুনিয়ার যত রকমের চা পাওয়া যায় তার সংগ্রহ সাজিয়ে রাখ। তারপর ভাল করে মেনু বই তৈরি কর—সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে চা খেতেন, যে চা জলে ফেলে দেওয়ায় আমেরিকান স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, যে চা খেয়ে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিলেন, কিংবা যে চা খেয়ে ডিউক অফ ওয়েলিংটন ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছিলেন। একটা সেকশান রাখ—নাম দে ‘পথের পাঁচালি’। সেখানে ইন্ডিয়ার রাস্তায়-রাস্তায় যত রকমের চা কফি হয় তার নমুনা থাক। ওখানকার বিশেষ আকর্ষণ হবে ধাবা টি। তারপর থাকুক রেল স্টেশনের চা বিভাগ। কয়েক হাজার রেল স্টেশন আছে ইন্ডিয়ায় এবং প্রত্যেকটি স্টেশনে চায়ের স্বাদ আলাদা। ব্যান্ডেল স্টেশনেই তো সে যুগে দশ রকমের চা পাওয়া যেতো। তারপর পঞ্জাবি চা, গুজরাতি চা, ম্যাড্রাসি চা সব আলাদা-আলাদা সেকশন রাখ। সেই সঙ্গে থাক তিন হাজার রকমের খুরি ও ভাঁড়-এর এগজিবিশন যেখান থেকে ভাঁড় কিনে মানুষ সুভেনির হিসেবে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ড্রইং রুমে সাজিয়ে রাখবে। সেই সঙ্গে চলুক ভিডিও শো—কীভাবে বিভিন্ন রকমের চা তৈরি হয়। স্পেশাল আকর্ষণ হবে—বড়বাজারের চা, যা গজ ফুটের মাপে বিক্রি হয়—এক গজ চা, দেড় গজ চা। হৈচৈ পড়ে যাবে, দুনিয়ার মানুষ ছুটে আসবে। ফেরবার সময় আকাশছোঁয়া দামে কয়েক কেজি দার্জিলিং কিংবা আসাম চা না কিনে বাড়ি ফিরবার পথ পাবে না।”

মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আমার পাঁচুদা। এই সব আইডিয়া কোনও পঞ্জাবি অথবা রাজস্থানি পেলে কাজে লাগাতে পারতো। আমার কাছে অরণ্যে রোদন করছেন পাঁচুদা।

হঠাৎ পাঁচুদা জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁরে, নিজামের দোকানের সেই স্পেশাল চা এখনও পাওয়া যায়? টেবিলে একমিনিট থাকলে সোনালি সর পড়তে শুরু করতো। দেশ ছেড়ে চলে আসবার আগে ওইখানেই লাস্ট চা খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে রয়েছে। এখানে প্যারিসের প্রথম মসজিদের লাগোয়া একটা চায়ের দোকান আছে—লা মস্ক দ্য পারি। গিয়েছিলাম টেস্ট করতে, কিন্তু নিজামের চায়ের কাছে শিশু!”

আমি পাঁচুদার পরিকল্পনাগুলো ভুলতে পারছি না। কিন্তু কলকাতায় বা ঢাকায় এই সব বুদ্ধি কে কাজে লাগাবে? কলকাতায় যে যা করে তা বংশপরম্পরায় করে চলে। নূতনত্বের দিকে কারও ঝোঁক নেই। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে শিখছে না বলেই তো আমাদের কলকাতা মাত্র তিনশ বছরেই গলিত নখদন্তহীন হয়ে পড়ছে, আর হাজার-হাজার বছরের পুরনো ইউরোপীয় শহরগুলো অভিন্নযৌবনা হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসছে।

হঠাৎ বললাম, "পাঁচুদা, আপনি কলকাতায় ফিরে চলুন, প্রতিষ্ঠা করুন কলকাতায় প্রথম টি সালোঁ। উৎপাটিত হয়ে পুনরোপিত হলে বাঙালি ধানগাছের মতন তরতর করে বেড়ে ওঠে। আপনি কলকাতায় কিছুটা প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারবেন। অনাবাসী বাঙালিরা এখনও পর্যন্ত তাদের জন্মভূমির জন্যে কিছু করেনি। একটা হাসপাতাল, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটা নতুন ধরনের শিল্পোদ্যোগের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক নেই।"

পাঁচুদা আমার কথা শুনলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যেন কেমন হয়ে উঠলো। মনে হলো, কোনও গভীর যন্ত্রণা তিনি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

পাঁচুদার বেদনার্ত মুখখানা দেখে আমি লজ্জিত বোধ করলাম। কলকাতায় ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়ে আমি ওঁর কোনও দুর্বল স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছি।

প্রবাসের বেদনা পাঁচুদা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। আমি আন্দাজ করছি, এই দুনিয়ায় অনেক প্রবাসী বাঙালি আছেন যাঁরা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বিদেশে বসবাস করছেন। সাধ থাকলেও তাঁদের ফেরবার সাধ্য নেই। ফেরার পথে দুটি প্রধান বাধা : বিদেশে পিছুটান। গোড়ার দিকে খেয়ালের বশে বিদেশে মানুষ অনেক বেপরোয়া কাজ করে ফেলে, বিদেশিনীর সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ তার মধ্যে অন্যতম। তারপর মোহমুক্তি ঘটে কিন্তু কিছু করার উপায় থাকে না যা ভারতীয় মূল্যবোধে ধাক্কা না দেয়। দ্বিতীয় বাধা : বিদেশে একটু সাফল্য না এলেও স্বদেশে ফেরবার উপায় থাকে না অর্থনৈতিক কারণে। বিদেশে সামান্য কিছু কাজ করে প্রাণধারণ যতটা সহজ স্বদেশে ততটা নয়। অনাবাসী বাঙালি মুখে যাই বলুক, স্বদেশের জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কে তার মনে ভীতি জন্মে যায়। স্বদেশে রুজি রোজগার যে ভীষণ শক্ত ব্যাপার তা অনাবাসী ভারতীয়র থেকে বেশি কেউ জানে না।

বিদেশে সফল এক ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন, "স্বদেশের ব্যবসায়ীদের আমি নখের যোগ্য নই। হাজার রকম বাধাবিপত্তি পেরিয়ে প্রচণ্ড ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দেখিয়ে স্বদেশের যে বিজনেসম্যান সাফল্য অর্জন করেন আমি তাঁর কাছে শিশু।"

অনেক প্রবাসী চাকুরিজীবী প্রফেশনালের মুখেও সেই এক কথা। ভারতীয়

পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার জাঁতাকলে আমরা ছাতু হয়ে যাবো। বেঁচে থাক এই প্রবাস, এখানে অনেক সহজে সুখে থাকা যায়, যদিও জীবনযাত্রার গতি অনেক দ্রুত। সবচেয়ে দুঃখ তাঁদের যাঁরা দেশে ফিরবার জন্যে প্রচণ্ড আগ্রহী কিন্তু কিছুতেই তেমন সুযোগ বা সাহস পাচ্ছেন না। যাঁরা স্বদেশে তেমন সাফল্য অর্জন করেননি তাঁদের দুঃখ আরও বেশি। প্রবাসে যে যাবে সে-ই কোটিপতি হয়ে প্রচণ্ড সফল হবে এমন একটা প্রত্যাশা কোথা থেকে জেগে ওঠে তা ভগবান জানেন।

মোদ্দা কথাটা হলো, ওয়ান-ফর-ওয়ান আমেরিকা অথবা ইউরোপের কর্মীরা আট-দশগুণ সুখে আছেন ভারতবর্ষের কর্মীদের তুলনায়। একই পরিশ্রম করছেন ভারতবর্ষের নাপিত, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি কিংবা প্লাম্বার। কিন্তু এঁদের দৈনন্দিন আয় ওপারের একই ব্রাত্যজনের তুলনায় দশভাগের একভাগ নয়। একই সত্য ইস্কুল শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল ও ডাক্তার সম্পর্কে। একই সত্য ট্যাক্সি ড্রাইভার সম্পর্কে। যে-দামে এদেশে ড্রাইভার সমেত লাক্সারি ট্যাক্সি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ভাড়া পাওয়া যায় তা শুনলে ইংরেজ, আমেরিকান ও ফরাসি ড্রাইভার হার্টফেল করবে। অথচ ধৈর্য ও নৈপুণ্যে এদেশের ড্রাইভার যে দুনিয়ার সেরা তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কলকাতা বা বোম্বাইতে যে সাফল্যের সঙ্গে গাড়ি চালাতে পারে দিনের পর দিন তার কাছে অসাধ্য কোনও কাজ নেই এই পৃথিবীতে।

পাঁচুদার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, অনাবাসীকে সবসময় হিংসে করার কোনও মানে হয় না। যারা নিজের দেশে নিজের পছন্দমতন কাজকর্ম করে জীবন নির্বাহ করতে পারছে তারাও কম ভাগ্যবান নয়।

পাঁচুদা কেন এদেশের বাঙালি মহলে অজ্ঞাত, কেন বহুদিন হাওড়া-কাসুন্দে ভিজিট করেননি তা জানা প্রয়োজন। যা আমাকে আশ্চর্য করেছে, বহুদিন দেশ ছাড়া হয়েও দেশের অনেক খবরাখবর তাঁর আয়ত্তে। পাঁচুদা নিজেই বললেন, "এর জন্যে দায়ী আমাদের মিছরি। আমেরিকায় পুরুতগিরি করতে যাবার পথে দু'বার সে এখানে সময় কাটিয়ে গেলো। ওর সঙ্গে দু'ঘণ্টা বসলে দেশের কোনও খবর জানতে বাকি থাকে না। আমরা দু'জন টানা বারো ঘণ্টা আড্ডা দিতাম মিছরির হোটেলঘরে বসে। মিছরির সব ব্যবস্থাই পাকা—এরোপ্লেন কোম্পানির ওপর চাপ দিয়ে হোটেল খরচা আদায় করে নিয়েছিল।"

এর পরেও নিয়মিত পত্রালাপ আছে দু'জনের। পাঁচু-মিছরি পত্রালাপ টীকা-টিপ্পনী সহ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলে আমার এই বই লেখার বোধহয় প্রয়োজন থাকবে না। আমাদের এই দেশে অজানা-অচেনা কত সাহিত্য প্রতিভা যে এখনও বেঁচে রয়েছেন তা কারুর খেয়াল থাকে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবারে আমি আঁতকে উঠলাম। সম্বিতের বাড়িতে দু'-একজনের আসবার কথা। টোটো কোম্পানির মেম্বার হয়ে এই সব সামাজিকতার

কথা ভুলতে বসেছিলাম।

এই সব সাক্ষাৎকারের সুখ আমার, ঝক্কি সম্বিতের ও তার স্ত্রীর। এরা প্রথমেই আমাকে বলে দিয়েছে, "আপনি আমাদের বাড়িতে আছেন বলে আপনার কোনও বন্ধন নেই। আপনি যার সঙ্গে খুশি, যেখানে খুশি দেখাসাক্ষাৎ করবেন। আমাদের বাড়ির ঘরগুলো আপনার জন্যে রয়েছে। যাকে খুশি আপনি চায়ে, ব্রেকফাস্টে, লাঞ্চে, ডিনারে নেমন্তন্ন করতে পারেন।" অর্থাৎ প্যারিসে হোটেল দ্য শহিদনগরের টেমপোরারি মালিক আমি ; পাঁচতারা মেজাজে আমি যা-খুশি অর্ডার করতে পারি।

এই রকম সুবিধে পরের বাড়িতে উপভোগ করতে হলে ভাগ্য করে আসতে হয়। এ ছাড়া আছে একটি টেলিফোন—দুনিয়ার যাকে খুশি ডেকে যত খুশি কথা বলার ব্ল্যাঙ্ক চেক। জয় হোক গৃহস্বামীর এবং তাঁর ধৈর্যশীলা মেড-ইন-নৈহাটি সহধর্মিনীর। মেমসায়েব গিন্নি হলে এতোক্ষণে গাঁয়ের লোককে ভিটেমাটি ছাড়া হতে হতো। অতিথি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ, স্বদেশের এই সেকেলে বিশ্বাসটি বুকের মধ্যে নিয়েই শ্রীমতী কাকলি এদেশে এসেছে।

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। পরনির্ভরতা কমিয়ে আচমকা আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের চেষ্টায় লেখার বিষয়বস্তু ও চরিত্র সন্ধান করতে হবে। বাঙালি-কুঁড়েমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এখন আমাকে ইওরোপীয় তৎপরতা দেখাতে হবে এবং সেই সঙ্গে একটু অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই—এ-প্যারিসে বসেই তো কত সাহিত্যিক দুঃসাহসিক রচনা করে গিয়েছেন। এঁদের একজনের নাম হলো জুল ভার্ণ—তিনি তো দুনিয়া ভ্রমণ না করেই ঘরে বসে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ লিখে ফেললেন যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে মোহিত করলো। আমি অন্তত ওঁর থেকে একটু সরেস—ফরাসি বৃত্তান্ত লেখার জন্য গতর নাড়িয়ে অন্তত হাওড়া-শিবপুর থেকে প্যারিসে হাজির হয়েছি।

সম্বিতের স্ত্রী কাকলি আমাকে ভরসা দিয়েছে, "আপনার কোনও চিন্তা নেই। আমাদের এই পাড়ায় একলা ঘুরে বেড়ান, যা সব ঘটছে দেখুন, তাহলেই লেখার যথেষ্ট উপাদান পেয়ে যাবেন।" কাকলিকে বলেছি, না-পেলেও কিছু এসে যাবে না। ফরাসিরা তো যত দূর বুঝছি, বাইরের লোকের মতামত পছন্দ করে না, যদি-না তা প্রশস্তিমূলক হয়। ফরাসিকে যা কিছু গালিগালাজ তা ফরাসি নিজেই করবে, অন্য কেউ নয়। এ-ব্যাপারে আমরা বাঙালিরাও ফরাসি মনোবৃত্তির অধিকারী। বাঙালিকে যে গালাগালি করেছে তার ক্ষমা নেই। আর বাঙালিকে যে প্রশংসা করেছে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে বাঙালির মনে, বাঙালির সাহিত্যে।

পাঁচুদার সঙ্গে পথপরিক্রমায় মনে পড়লো কাকলি বলেছিল, দু'একজন পরিচিত লেখককে সে বিকেলে আসতে বলবে যাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি হয়তো কিছু চিন্তার খোরাক পাবো।

অথচ পাঁচুদা আমাকে ছাড়তে চাইছেন না। বললেন, "তোকে আরও দু' একটা স্পেশাল আইটেম দেখিয়ে দিই।"

পাঁচুদা নিজেই পথ বাতলে দিলেন। একটা দোকানে ঢুকে টেলিফোন ডায়াল করলেন। এখানকার টেলিফোন কলকাতার মতন নয়—ডায়াল করলেই নম্বর। পাঁচুদা কলকাতার অকর্মণ্যতা গায়ে মাখলেন না। বললেন, "এঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। ইউরোপের মধ্যে এই প্যারিসেই প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বসেছিল, সুতরাং এরা তো এগিয়ে থাকবেই। তা ছাড়া আমেরিকানের পরেই ফরাসিরা টেলিযোগাযোগের ব্যবসাটা খুব মন দিয়ে নিয়েছে, দুনিয়ার হাটে তাই ফরাসি টেলি কোম্পানিগুলোর নাম অনেক।"

পাঁচুদা যা ভেবেছিলেন তাই। টেলিফোনে কাকলি জানালো, যে বাঙালি মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় হবার কথা সে কাজে জড়িয়ে পড়েছে, আসতে পারছে না ওই সময়ে। অর্থাৎ আমি আরও খানিকটা সময় চরে খেতে পারি কাসুন্দের দেশওয়ালি দাদার সঙ্গে। সম্বিতের মস্ত এক ব্যবসায়িক মিটিং আছে, কখন সে হাল্কা হবে তা এখনও কাকলির জানা নেই। এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য একমাত্র সম্বিৎ-সহায়িকা ক্যারোলিনের কাছে পাওয়া যেতে পারে, ইচ্ছে করলে লাইন ট্রান্সফার করে দিতে পারে কাকলি। এও এক বিজ্ঞানের নতুন আশীর্বাদ। ইচ্ছে হলেই এক জায়গার টেলিফোন কল আরেক জায়গায় চালান করে দেওয়া যায়। ফলে অফিস সময়ের পরে সম্বিতের অনেক কল সোজা বাড়িতে চলে আসে ইলেকট্রিক বোতামের নির্দেশে। কিন্তু এখন আমি সম্বিৎকে জ্বালাতন করতে চাই না, স্বয়ং পাঁচুদা তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছেন।

পাঁচুদাও খুশি। বললেন, "আরও একটু চরে নে। যেসব কোশ্চেন অন্য কাউকে করতে লজ্জা পাবি তা আমার ওপর প্র্যাকটিশ কর।"

এই সুযোগ ছাড়া যায় না। সুতরাং আমি প্রশ্নোত্তরের মারফত ফরাসি রহস্যগুলো পরিষ্কার করে নিতে চাইলাম।

বললুম, "অনেক জায়গায় হোটেল দ্য অমুক নাম রয়েছে, কিন্তু হোটেল দেখতে পেলাম না, পাঁচুদা। আমি তো এক সময় চৌরঙ্গীর সাজাহান হোটেলকে জানতাম।"

"এ-হোটেল সে-হোটেল নয়, বাছা। সেকেলে বিলসবহুল বাড়িকেও এখানে হোটেল বলে। বাড়িগুলোর মস্ত বিরাট উঠোন বা চত্বর থাকে ভিতরের দিকে।"

পথ চলতে একটু অসাবধানী হয়ে উঠেছিলাম বোধ হয়, হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ার

অবস্থা। একটা মোটর সাইকেল ফুটপাতের ওপর দিয়ে চলেছে। লোকজন তাকে দেখে সরে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ নেই। এই ধরনের মাস্তান আজকাল কলকাতাতেও দেখা যাচ্ছে—মর্জিমফিক তারা ফুটপাত ধরেই মোটর সাইকেল চালাচ্ছে।

পাঁচুদা আমার ভুল ভাঙলেন। এই মোটর সাইকেলচালক মোটেই মাস্তান নয়, বরং সে এক গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। তবে কর্তব্যকর্মে যোগ দিতে সে একটু লেট করে ফেলেছে। একটু লজ্জা পেলেন পাঁচুদা, তারপর বললেন, "প্যারিসের নাগরিকদের জাতীয় আনন্দ হলো নিজের কুকুরকে জনগণের রাস্তায় নামিয়ে এনে নিত্যকর্মে উৎসাহ দেওয়া। অন্য দেশে এই কাজটি বেআইনি—কুকুর ভালবাসতে পারো, পুষতে পারো, কিন্তু রাস্তাগুলো কুকুরের টয়লেট হিসেবে তৈরি হয়নি। কিন্তু প্যারিসের ব্যাপারটা ঠিক হাওড়ার মতন। কুকুরের বিষ্ঠায় সমস্ত পথ বোঝাই—ওই জিনিসটি এড়িয়ে পথ চলতে হলে বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার এবং হাওড়া ও প্যারিস এই বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীকে টেকনিক্যাল নোহাউ দিতে পারে।"

পাঁচুদা বললেন, "প্যারিসের নাগরিককে চটানোর সব চেয়ে সহজ পথ হলো আদরের কুকুর অথবা বেড়াল সম্পর্কে কোনও অপ্রিয় মন্তব্য করা। যাঁরা ভোটের জন্য ঘোরেন তাঁরা এ-বিষয়ে খুবই সচেতন। প্যারিসের এক জনপ্রিয় মেয়র, তাঁর নাম শিরাক—ইনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্নও দেখেন। প্যারিসকে সৌন্দর্যময় করে তুলবার জন্যে এঁর দান অসামান্য। ইনিই প্যারিসের কুকুরদের স্বভাব চরিত্র জেনে ফুটপাত থেকে বিষ্ঠা তুলে নেবার এক কল তৈরি করিয়েছেন। মোটর সাইকেলে চড়ে ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে পথের যত সারমেয় বিষ্ঠা এই কলে টেনে নেওয়া যায়। লোকে রসিকতা করে নাম দিয়েছে—শিরাকেত। এই কলের ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়তে যাচ্ছিলাম। কুকুর এবং ট্যুরিস্টের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হলে প্যারিসের নাগরিক কাকে পছন্দ করবে সে বিষয়ে যেন কারও কোনওরকম সন্দেহ না থাকে।

কুকুর-কলের ধাক্কা খেয়ে আমার রাগ হলো না, বরং ঝাঁকুনিতে মাথায় নতুন চিন্তা তলা থেকে ওপরে উঠে এলো। যদি কোনও দিন ঈশ্বর মুখ তুলে তাকান, কলকাতা-হাওড়ার মেয়রদের সঙ্গে প্যারিসের মেয়রের যদি ভাব-ভালবাসা হয় তা হলে এই যন্ত্র কয়েকটা উপহার প্রার্থনা করা যায় কলকাতা এবং হাওড়া শহরের জন্যে। হাওড়া শহরে রাস্তায় কুকুরের ভোট থাকলে একটি পুরো লোকসভার আসন ওদের জন্যে নির্ধারিত হতো।

পাঁচুদা বললেন, "পাবলিক শৌচাগার সম্বন্ধেও কিছু সুবিধে চাওয়া যেতে পারে।" দুনিয়ার লোকদের ধারণা, ফরাসি আর যাই জানুক প্লাম্বিং জানে না।

ফলে ফরাসি বাড়ির কলঘরে সব সময় ক্রাইসিস। ওয়াস বেসিনের কল খুললে হয়তো বাথটবে হুড়-হুড় করে জল পড়তে লাগলো। মিনিমাম স্বাস্থ্য ও ম্যাক্সিমাম অসুবিধাকে নিশ্চিত করবার জন্যেই নাকি ফরাসি শৌচাগারের সৃষ্টি। ফ্লাশ টয়লেট বলতে বহুদিন প্যারিসে জলের ফ্লাশ বোঝাতো না—ফরাসি তখন অভ্যস্ত ছিল মাটির সঙ্গে ফ্লাশ অথবা মিশে যাওয়া কমোডের সঙ্গে যা অনেকটা আমাদের দিশি স্টাইল কমোডের মতন। চতুর ফরাসি কিন্তু এর বদনাম নিজের ঘাড়ে নেয়নি, নাম দিয়েছে টার্কিশ টয়লেট। অসহায় তুর্কদের নামে নিজেদের যে কোনও বদনাম চালান করে দিতে শুধু জার্মান নয় ফরাসিও বেশ তৎপর।

ফরাসি পাবলিক শৌচাগার নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার ট্যুরিস্ট মহলে এক সময় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ট্যুরিস্ট গাইডের লেখকরা এই সব শৌচাগারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—এখানে আলো খারাপ, দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার ছিটকিনি ভাঙা, টয়লেট পেপার উধাও। এক হাতে দরজা চেপে ধরে এমার্জেন্সি প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। সারাক্ষণ সঙ্গে টর্চ রাখতে হবে, সেই সঙ্গে চাই অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা ও বিপজ্জনকভাবে বেঁচে থাকবার বেপরোয়া মনোবৃত্তি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফরাসি শৌচাগার বা 'পিসো' ছিল দুনিয়ার দুর্নামের বিষয়। ঢালাই লোহার তৈরি এই জালি দেওয়া শৌচাগারে মানুষটির প্রায় সর্বাঙ্গ বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যেতো। এর আরেক নাম ভেসপাসিয়ান। অতি প্রাচীনকালে রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান নাকি এই ধরনের শৌচাগারের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। চান্স বুঝে অন্য রাজ্যের সম্রাটের নামে ফরাসি একটা খারাপ জিনিস চালু করে দিয়েছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে জানে ফরাসি জাত, তাই যথাসময়ে শৌচাগারেও হাই টেকনলজি আমদানি করেছে ফরাসি। এই দৃষ্টিনন্দন আধুনিক শৌচাগার প্যারিসের গর্ব। ইংরেজ হিংসেয় জ্বলে পুড়ে বলেছে এই ধরনের আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ফরাসিদের মানায় না! অ-ফরাসিসুলভ। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর প্রচণ্ড বেগে নানা ওষুধমিশ্রিত জলে এই টয়লেট অটোমেটিক পরিষ্কার হয়ে যায়। গেটের কাছে স্লটে মুদ্রা ঢুকিয়ে দরজা খুলতে হয়। এক কথায় চমৎকার। ইংরেজ পড়শির হিংসের আর একটি নমুনা : ঢালাও গুজব ছড়ানো হয়েছে এই আধুনিক টয়লেটে ঢুকে দমবন্ধ হয়ে একটি ছোট্ট মেয়ে মারা গিয়েছে, প্যারিসের রাস্তায় শৌচাগার ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও মাথায় এনো না।

আমার মাথায় অন্য চিন্তা। কলকাতার যে নরককুণ্ডগুলো সরকারীভাবে শৌচাগার বলে পরিচিত তার জায়গায় হাইটেক ফরাসি টয়লেট আনতে পারলে শহরে কলঙ্ক কিছুটা ঘুচতো।

আমরা আবার হেঁটে বেড়াচ্ছি উদ্দেশ্যহীনভাবে। "নিশ্চয় খিদে পাচ্ছে," পাঁচুদা মন্তব্য করলেন। "অদ্ভুত এই প্যারিস, এক পা হাঁটলেই এখানে খিদে পেতে বাধ্য। না-হলে ফরাসির জীবন বৃথা। বাঙালির মতন ফরাসিও খেয়ে এবং খাইয়ে ফতুর হতে বদ্ধপরিকর।"

একটা গল্প শোনালেন পাঁচুদা। কত দূর সত্য বলতে পারবো না। সামান্য পাঁউরুটির অভাবে ফরাসি-বিপ্লব ঘটে গেলো, সম্রাটকে গিলোটিনে চড়ানো হলো। কিন্তু এই সম্রাট ষোড়শ লুই যখন বিচারের জন্যে প্যারিসের বন্দিশালায় অপেক্ষা করছেন তখনও তাঁর খিদমত খাটবার জন্যে তিনটে রাঁধুনি, পিকদানি ধরবার জন্যে একটা চাকর। তিনজন ওয়েটার ও একজন স্টুয়ার্ড নিয়ে এলাহি ব্যবস্থা। বন্দি সম্রাটের ডিনার মেনু ছিল : তিন রকমের সুপ, চার রকমের মাছ, দুটো রোস্ট, পাঁচ রকমের সাইড ডিশ, ফল, চিজ, শ্যামপেন এবং আরও পাঁচ রকমের ওয়াইন। মাদাম দু বেরি বলে এক মহিলাও বিপ্লবের সময় প্যারিসের জেলে ছিলেন। কিন্তু জেলেও তিনবার পোশাক পাল্টাতেন এই সুন্দরী অভিজাত মহিলা।

আসলে ফরাসির খাবার ব্যাপারে হাত দেওয়া চলবে না কোনোক্রমে, তার স্টাইলেও বাঁকা নজর দেওয়া নিরাপদ নয়। ফরাসিরা সর্বভুক বলে শুনেছি—ঘোড়ার মাংসে পর্যন্ত আপত্তি নেই। কিন্তু এই ফরাসি সুযোগ পেলে চিড়িয়াখানার হাতি পর্যন্ত খেয়েছে তা জানা গেলো পাঁচুদার কাছ থেকে। এর মধ্যে একজন ছিলেন ফরাসি প্রাইমমিনিস্টার লিও গামবেতা। গত শতাব্দীর শেষদিকে প্রাশিয়ান সৈন্যরা যখন পাঁচ মাস ধরে প্যারিস অবরোধ করেছিল তখন শহরের ধনী-বুর্জোয়াদের সঙ্গে তিনিও হাতির মাংসের পিকনিক করে বেলুনে চড়ে শহর থেকে চম্পট দিয়েছিলেন।

আমি ব্যাপারটা চটপট নোটবুকে লিখে নিলাম—দুনিয়ার সর্বত্র তেমন খোঁজখবর না নিয়ে চাচা নেহরু অজস্র হাতি উপহার পাঠিয়েছিলেন। সেই সব ভারতীয় হাতি মানুষের নোলায় ছাই দিয়ে এখনও বেঁচেবত্তে আছে কি না তা খোঁজ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

পাঁচুদা বললেন, "চল, একটু চিজ চাখবি।"

চিজ কথাটা যে মোটেই ভাল অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না তা পাঁচুদার ভুলবার কথা নয়। না, বাঙালির 'চিজ' এবং ফরসির চিজ এক নয়। ফরাসি 'চিজ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ পনির—কিন্তু ওতে চিজের সৌন্দর্য আনা যায় না। ফরাসি যদি জানতে পারে বাঙালি ধূর্ত বদমায়েশকে 'চিজ' বলে তা হলে চিরকালের জন্যে ষোল কোটি বাঙালির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছেদ। দু'জাতের মধ্যে মুখ দেখাদেখি এখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছি। এক সময় এক ডাচ কোম্পানিতে কাজ করেছি। ওখানকার ওলন্দাজ সায়েবরা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, চিজের ব্যাপারে ডাচরাই দুনিয়ার সেরা। এই চিজ এবং টিউলিপ ফুল রপ্তানি করে তাঁরা কোনোক্রমে পৃথিবীর সুরুচি বাঁচিয়ে রেখেছেন।

পাঁচুদা বিরক্ত হলেন। তাঁর নিবেদন, চিজের ব্যাপারে ফরাসিই দুনিয়ার এক নম্বর, ডাচ এই ব্যাপারে ফরাসির কাছে শিশু। ডাচের আর এক নাম ইউরোপের মাড়ওয়ারি। হ্যাঁ, চিজের ব্যবসা করে ডাচ টুপাইস কামিয়েছে, কিন্তু চিজের অনন্তরহস্যে প্রবেশ করতে হলে ওই সায়েব মাড়ওয়ারিদের সাত জন্ম তপস্যা করতে হবে।

দুনিয়া যদি ফরাসির পিছনে না লাগতো তা হলে স্রেফ চিজ রপ্তানি করেই ফরাসি প্রতিবছর কয়েকশ বিলিয়ন ডলার কামাতে পারতো। কিন্তু ধুরন্ধর ডাচরা যে আমেরিকাকে কি বুঝিয়েছে! চিজ আমদানির ব্যাপারে মার্কিন দেশে খুব কড়াকড়ি। ট্যুরিস্ট আমেরিকান ইউরোপ থেকে ফেরবার সময় যে কিছু আসলি ফরাসি চিজ বাড়ি নিয়ে যাবে তার উপায় নেই—আমেরিকান এয়ারপোর্টেই ওসব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। পাস্তুরাইজ্‌ড দুধের চিজ না হলে আমেরিকানের স্বাস্থ্য নাকি গোল্লায় যাবে। আরে বাবা, পোকা কিলবিল করছে এমন চিজ খেয়েই তো ফরাসি বীররা ইউরোপকে বারবার নাস্তানাবুদ খাইয়েছে। আমেরিকানও কম নেমকহারাম নয়, ফরাসির অর্থ, অস্ত্র ও সৈন্যসাহায্য না পেলে এখনও ইউনিয়ন জ্যাকের তলায় দাঁড়িয়ে গড় সেভ দ্য কুইন গাইতে হতো। জর্জ ওয়াশিংটনকে ফাঁসিতে ঝুলতে হতো, না হয় বেপাত্তা হতে হতো আমাদের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতন।

পাঁচুদা বললেন, "চিজ জিনিসটা বাঙালির নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই যে বাঙালির মেয়েদের একটুতেই বমি হয়ে যাওয়ার টেনডেনসি! বলবে দুর্গন্ধ, বলবে পোকা কিলবিল করছে। কিন্তু একটু চেষ্টা-চরিত্তির করে চিজ খাওয়া প্র্যাকটিস করতে পারলে তুরীয় আনন্দ।"

আমি বললাম, "আমাদের দেশেও চিজ তৈরি হচ্ছে—টিনে বিক্রি হচ্ছে।"

বকুনি লাগালেন পাঁচুদা, "ওগুলোকে চিজ বলা মানে ফরাসি জাতটাকে অপমান করা। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি তোকে এমন দোকানে যেখানে অন্তত একশ তিরিশ রকম চিজ বিক্রি হয়—ছাগল দুধের চিজ, গাধার দুধের চিজ, এসব অনবদ্য সৃষ্টি। শুধু বাঘের দুধের চিজ পাবি না তুই, ওটা যদি সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্পের সঙ্গে স্টার্ট করতে পারিস তা হলে বাঙালিদের ইজ্জত বাড়বে। একশ গ্রাম বাঘ-চিজ এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্কে কিনতে রাজি আছেন এমন ফরাসি বড়লোক তোকে সাপ্লাই করবো।"

ফরাসি চিজের বৈচিত্র্য ইংরেজদের বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ফরাসিকে বেইজ্জত করবার জন্যে স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল বলে বসলেন, যে-জাত ৩২৫ রকমের চিজ তৈরি করে তাকে শাসন করা সহজ নয়। যে-জাত খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে দুনিয়াকে কিছু দেয়নি, বরং অপরের খাবারদাবার গায়ের জোরে কেড়ে খেয়েছে তার কাছ থেকে এরকম উক্তি অপ্রত্যাশিত নয়। নতুন ফ্রান্সের জনক দ্য গ্যলও ফরাসির চিজ বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং বলেছেন যেখানে ২৩০ রকমের চিজ পাওয়া যায় সেখানে ঐক্য বা সংহতি রক্ষা করা সহজ কাজ নয়।

আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম। দুই মহানায়ক দু'রকম পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। ৩২৫ রকম চিজ না ২৩০ রকম চিজ? কোনটা সত্যি? পাঁচুদা জানালেন, "বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—চিজ পাওয়া যায় দেড়শ থেকে দু'শ রকমের। তবে, আরও একশ ধরনের ছোটখাট রকমফের আছে।"

চিজের দোকানের রহস্য মোটামুটি বুঝে বাঙালিকে তা কিছু জানাতে গেলে আমাকে বাকি জীবনটাই ফরাসি চিজের দোকানে কাটাতে হবে। চিজ মানে শুধু জিভের স্বাদ নয়—নাকের জন্যে সুরভি, চোখের জন্যে চিজের রঙ, আকার ও বুনন। সাধে কি আর ফরাসিরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চিজ খেয়ে থাকে।

স্টোরে চিজ রাখলেই হলো না—দোকানের অন্ধকার গর্ভগৃহে টাটকা খড়ের ওপর চিজকে আরামে শুইয়ে রেখে কয়েক ঘণ্টা অন্তর মৃদু টোকা দিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুতে দিতে হয়। এর নাম 'লাভ ট্যাপ'। এই প্রেমের টোকা ছাড়া কোনও ফরাসি খাবার প্রাণবল্লভ হয়ে উঠতে চায় না, এমন কি ফরাসি পাঁউরুটিও। সৃষ্টিকালে একটু প্রেম না পেলে ওরা কেমন দরকচা মেরে যায় এবং গুণগ্রাহী ফরাসি তা জিভে ঠেকিয়েই বুঝতে পারে।

দু-এক রকম চিজ কিনে নিয়ে পার্কে এসে বসা গেলো। হাতে পায়ে ধরেছিলাম। পাঁচুদাকে, ফলে গাধা এবং ছাগল দুধ চিজের পরিবর্তে আমরা কিনেছি গাই গোরু ও ভেড়ার দুধের চিজ। হা ঈশ্বর! প্রথম চিজ পেটে চালান করতে গ্যাস মুখোশ প্রয়োজন—দুর্গন্ধে কলকাতার লাখো লোক ভিরমি খাবে। দ্বিতীয় চিজ ঠিক যেন কেরালায় তৈরি রবারের আঠা, সঙ্গে মেশানো হয়েছে দুর্গাপুরের কার্বন ব্ল্যাক। টানছি তো টানছিই—বেড়েই চলেছে। ইনি চিউইংগামের হাসি। বলা চলতে পারে এই চিজ সত্যিই একটা চিজ। এই অখাদ্যকে কেন্দ্র করে কোনোদিনই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

এই চিজ ও পড়ে থাকা রুটি আমি নিকটবর্তী লিটারবিনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। পাঁচুদা হাঁ হাঁ করে আমার ওপর ডাইভ মারলেন। বললেন, "সর্বনাশ হচ্ছিল এখনই। ফরাসি সব ফেলে দিতে রাজি আছে—সম্পত্তি, রাষ্ট্রসম্মান,

এমন কি শ্যামপেন। কিন্তু প্যাঁ ফেলে দেওয়া মহাপাতকের কাজ। রুটির দাম সবচেয়ে কম, কিন্তু ফরাসি মরে গেলেও খাওয়ার টেবিলে রুটি অভুক্ত রেখে নষ্ট করবে না। জাতীয় ট্যাবু বা অন্ধবিশ্বাস বলতে পারিস—কিন্তু ইতিহাসে বারবার রুটির মার খেয়ে ফরাসিরা রুটিকে দেবতা বানিয়ে ফেলেছে।"

অন্নব্রহ্মে ও প্যাঁ-দেবতার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই আবিষ্কার করে আমি আবার পড়ে থাকা ফরাসি পাঁউরুটি চিবোতে লাগলাম।

এবার ট্যাক্সিওয়ালার গল্প। ঘর ছেড়ে পথে বেরোলেই ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ হতে বাধ্য, পৃথিবীর বেশির ভাগ ভ্রমণকাহিনীতেই তাই ট্যাক্সিওয়ালার চরিত্র এসে যায়।

প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার দুর্নাম ভুবনবিদিত। স্রেফ ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় প্রকশিত ফরাসি ভ্রমণকাহিনী থেকে ট্যাক্সিকথা সংগ্রহ করলে একখানা ছোট সাইজের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সমস্যা এই মুহূর্তে অন্যরকম। প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা-বৃত্তান্ত লিখতে আমাকে কলকাতার এক ট্যাক্সিওয়ালার গল্প বলতে হবে, যিনি এখন প্যারিসপ্রবাসী।

পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার করজোড়ে নিবেদন, কলকাতার এই ট্যাক্সিড্রাইভারের কাহিনীকে আষাঢ়ে গল্প মনে করে বসবেন না। বম্বে অথবা বম্বে মার্কা বাংলা সিনেমায় প্রোডিউসারের নেকনজরে পড়বার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও যে আমার নেই তা প্রথমেই ঘোষণা করেছি, কেউ-কেউ ভাবতে পারেন কলকাতার এক ট্যাক্সিওয়ালা একদিন কলকাতার রাজপথে ট্যাক্সি চালাতে-চালাতে এক সুন্দরী বিদেশিনীর নজরে পড়লো এবং গল্পের ক্লাইম্যাক্সে প্যারিসের নাগরিক হলো—এটা সিনেমার জন্য আমার বানানো গল্প।

আমি ট্যাক্সিওয়ালার গল্প শুরু করবার আগে সোজাসুজি জানাতে চাই, মধুমঙ্গল বসু এখন আর ট্যাক্সিচালক নেই—প্যারিসের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ শিল্পপরিমণ্ডলে সে এখন একজন সম্ভাবনাময় শিল্পী। জয় হোক এই তরুণ চিত্রকরের, বিদেশের মাটিতে জয় হোক বাঙালি ট্যাক্সিওয়ালার। খোদ প্যারিসে যে ছবি এঁকে করে খায় সে আর যাই হোক সাধারণ মানুষ নয়, তার ঘটে ও পটে কিছু বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে।

সম্বিতের বাড়িতে বসেই মধুমঙ্গল বসুর সঙ্গে আলাপ হলো। অতি শান্ত স্বাভাবের চমৎকার এক তরুণ—কলকাতা যার জীবনে একদা বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মধুমঙ্গলের সঙ্গে দেখা না হলে আমার এই মানবতীর্থ পরিক্রমা অপূর্ণ থেকে যেতো।

মধুমঙ্গল বসু আমার অনুরোধে বেশ সকালে সম্বিতের ফ্ল্যাটে এসে গিয়েছে,

আমার ইচ্ছা ওর সঙ্গে সকালের জলখাবার খাওয়া। ইউরোপ যার নাম দিয়েছে ব্রেকফাস্ট বা উপবাসভঙ্গ।

সম্বিৎগৃহিণী কাকলি অবশ্য বলেছিল, "ডাকুন না ওকে ডিনারে।" বাড়তি একজন অতিথিকে বাড়িতে এনে ভুরি-ভোজনে আপ্যায়ন করতে কাকলির বিন্দুমাত্র অনাগ্রহ নেই। অতিথির অতিথিও যে সাক্ষাৎ দেবতা তা প্রায় দু'দশক বিদেশে বসবাস করেও নৈহাটির কাকলি এখনও বিশ্বাস করে। এই সব বাঙালির মেয়ে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এমন লক্ষ্মীস্বরূপাদের পেয়েও বাঙালি পুরুষ কেন যে দুনিয়ার এক নম্বর হয়ে উঠবে না তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। বাঙালি জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এই বাংলার মেয়ে—এরা যতদিন স্বধর্মে আছে ততদিন কারও বাবার সাধ্য নেই বাঙালি জাতের মূল্যবোধকে নষ্ট করে।

মধুমঙ্গল বসুর সঙ্গে অবশ্য সন্ধেবেলায় গেঁজানো যেতো কিন্তু শুনলাম এই তরুণ শিল্পী আজই চলে যাচ্ছে দক্ষিণ ফ্রান্সে—ওখানে কোনও এক ছোট্ট শহরে তার শিল্পপ্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। বুঝলাম, ছবিকে ভালবাসটা প্যারিসের একচেটিয়া নয়, শিল্প-সাহিত্য প্রীতি সমগ্র ফরাসি জাতের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ফরাসি দেশের গাঁয়ে-গঞ্জেও শিল্পীকে নিয়ে মাতামাতি এবং টানাটানি। আমাদের এখানে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে যখন বারাসত, বিরাটি, সাঁইথিয়া, সোনারপুর, কেষ্টনগর এবং কুলটিতে মাতামাতি শুরু হবে তখন বুঝতে হবে শিল্প এবার জাতের মজ্জায় প্রবেশ করেছে, ওটা আর লিপস্টিক নেই।

মধুমঙ্গল যখন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলো তখন আমি প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা সম্পর্কে খবরাখবর জোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছি। এর আগের দিন (অ্যাকাউন্ট পাঁচুদা) আমার প্যারিসে ট্যাক্সি চড়া হয়েছে। দু'জন ট্যাক্সিওয়ালা অবশ্য আমাদের ইঙ্গিত অবজ্ঞা করে কলা দেখিয়ে চলে গিয়েছে। এ বিষয়ে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা অবশ্য ওয়ার্লড রেকর্ড হোল্ডার—কে কখন তার যাত্রী হবে তা পুরোপুরি কলকাতার ট্যাক্সি চালকের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালার কর্কশ কথা শুনলে কে বলবে সুন্দরবনে মধু পাওয়া যায় এবং জন্মের পরে নবজাতকের মুখে একটু মধু দেওয়ার রীতি এখনও ভারতীয় সমাজে বর্জিত হয়নি।

প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের গাঁয়ে-গঞ্জের সেকেলে নাপিতের মতন—সারাক্ষণ গ্যাজগ্যাজ করতে ভালবাসে, যদিও তার কথাতে অভিনবত্ব আছে। এ-বিষয়ে বোধ হয় ঢাকার কুট্টিদের সঙ্গেও এদের তুলনা করা চলে। এদের নানা কথামৃত সংগ্রহ করে অবশ্য একটা চমৎকার বই বের করা যায়।

প্যারিসের ট্যাক্সি অবশ্যই কলকাতার কমরেডদের থেকে অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমাদের শহরের ট্যাক্সিতে এতো ময়লা কেন এবং কেন তা চালক

অথবা মালিকের আত্মসম্মানে আঘাত করে না তা একমাত্র বলতে পারবেন কল্যাণ ভদ্র মহাশয়। ট্যাক্সি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত এই ভদ্রলোক অবশ্য একবার দুঃখ করেছিলেন, ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে তিনি নিজেও বহুবার চালকের কাছে অপমানিত বা নিগৃহীত হয়েছেন। একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছিলেন, ট্যাক্সিচালকের পিছনে পুলিশ না লেলিয়ে উচিত ড্রাইভারদের শ্বশুরদের নিয়মিত ট্যাক্সি ধরতে পাঠানো। এঁরা অকারণে কষ্ট পেলে যদি ট্যাক্সিওয়ালার চক্ষুলজ্জা হয়।

প্যারিসের ট্যাক্সির আর একটা ব্যবস্থা অনুকরণের মতন। মিটারটি গাড়ির ভিতরে, ফলে সিটে বসেই কত ভাড়া উঠছে তা বুঝতে পারা যায়। শুনেছি, বাইরেও কী একটা ইঙ্গিত আছে যার থেকে বোঝা যায় ড্রাইভার কতক্ষণ ধরে ডিউটি করছে—দশঘণ্টার বেশি ডিউটি করা নিয়মবহির্ভূত, কারণ এরপর চালকের মেজাজ খারাপ হওয়া এবং পথের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কলকাতার শ্রেষ্ঠ ট্যাক্সিগুলো একসময় সর্দারজিদের অধীনে ছিল—ভোরবেলায় মালিকচালিত সর্দারজি ট্যাক্সি ছিল দুনিয়ার সেরা। যেমন পরিচ্ছন্নতা, তেমন ড্রাইভিং, তেমন ভদ্রতা। সর্দারজি সাধারণত কম কথা বলায় অভ্যস্ত, কিন্তু বাঙালির সঙ্গদোষে এঁরাও কিছুটা মুখর হতেন, খুব ভাল লাগতো। সেই সর্দারজিরা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন—বোধ হয় তাঁদের নজর ট্রাকের দিকে, ট্যাক্সির রোজগারে ওঁদের আর মন ভরে না।

এখনকার সেরা ট্যাক্সি বাঙালি মধ্যবিত্ত চালিত। ড্যাশবোর্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবী, কয়েকটি জবা ফুল, একটু ধূপ ধোঁয়া। হাতে সর্বাধিক প্রচরিত বাংলা সংবাদপত্র। এঁরাও নৈপুণ্যে ও ভদ্রতায় দুনিয়ার সেরা, কিন্তু এঁরা সংখ্যায় কম এবং ক্রমশ আরও কমতির দিকে। কলকাতার ট্যাক্সির নিম্নতম পর্যায় কিছু বিহারী ও উইপিওয়ালাদের হাতে—ট্যাক্সির সঙ্গে কর্পোরেশনের জঞ্জাল ফেলবার ট্রাকের যে কিছু পার্থক্য থাকা উচিত তা এঁদের অনেকেই মনে রাখেন না। লরি ড্রাইভারের ক্লিনার থেকে এঁরা ট্যাক্সিতে চলে আসেন বলেই বোধ হয় এঁদের মানসিকতা অন্যরকম। এঁদের কুশিক্ষা যে কিছু বেপরোয়া এবং বকাটে বাঙালি যুবক ড্রাইভারদের মধ্যে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বড়-বড় শহরের ট্যাক্সিওয়ালারা সেই শহরের ভাবমূর্তির স্রষ্টা, সুতরাং এদের নির্বাচনকালে দেখে নেওয়া উচিত এঁদের মানসিকতা কেমন। খিটখিটে বদমেজাজি আত্মসুখসর্বস্ব মানুষ যে-শহরে ট্যাক্সিকে কব্জা করে রেখেছে সে-শহরের সুনাম করানো স্বয়ং ডেভিড ওগিলভি সায়েবেরও সাধ্যের অতীত।

প্রথম যাত্রায় প্যারিসের ট্যাক্সিতে সামনের দিকে বসবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু

পাঁচুদা জানালেন সে-গুড়ে বালি। ওখানে কাউকে বসানো চালকের অভিপ্রেত নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে ট্যাক্সিতে চড়েছিলাম সেখানে একটি রাক্ষসসাইজের কুকুর—ড্রাইভারের পেয়ারের জীব। ট্যাক্সিওয়ালাকে কিছু বলা চলবে না—কারণ কেষ্টর এই জীবটি তার নিঃসঙ্গকর্মে সান্নিধ্য দিচ্ছে, আর ট্যাক্সিওয়ালা যদি একা মানুষ হয় তা হলে বাড়ির কুকুরকে কি বেবি ক্রেশে জমা দিয়ে আসবে? আরও একটি যুক্তি খাড়া করা হয়েছে—মঁশিয়ে, জানো না তো প্যারিসে কত কুজন ট্যাক্সি ভাড়া করে কুমতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের হাত থেকে চালককে কে বাঁচাবে?

পাঁচুদা ফিসফিস করে বললেন, "ড্রাইভারের পাশের ওই সিট খালি থাকলেও কেউ বসতে চায় না। প্যারিসে ওর নাম হচ্ছে যমের খপ্পরে পড়বার সিট—সিট অফ ডেথ। কিছু অঘটন ঘটলে ওই সিটের যাত্রীর ওপরেই ধকল পড়ে সব চেয়ে বেশি।

দেখলুম, ড্রাইভার নিজের মনেই গ্যাজর-গ্যাজর করে যাচ্ছেন। পাঁচুদা মাঝে-মাঝে ফরাসি ভাষায় তারিফ করছেন। এমনিতেই প্যারির লোকজন একটু দ্রুতগতিতে কথা বলে, ফরাসি ট্যাক্সিওয়ালার জিভে রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন লাগনো আছে। এর মধ্যে পাঁচুদা বলে ফেললেন, আমি একজন ভিনদেশী লেখক। আর যায় কোথায়। অমনি ড্রাইভার বললো, "দেখো তোমার পরবর্তী নভেলে এমন কোনও দৃশ্য এঁকো না যাতে ট্যাক্সিকে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওসব এখানে হয় না, প্রেম করতে মানুষ এখানে অত অধৈর্য হয়ে ওঠে না মঁসিয়ে—ওসব আমেরিকানদের মানায়।"

আমি নির্বাক। কিন্তু সুরসিক ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়বেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "প্যারিসের পটভূমিকায় তোমার নায়িকাটি কি 'নানা' না 'সুপারনানা'?" ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন পাঁচুদা। নানা মানে কমবয়সী মেয়ে, আর সুপারনানা হলেন অসামান্যা সুন্দরী যুবতী।

ট্যাক্সিওয়ালার এবারকার পরামর্শ—"সুপারনানাকে ইতালিয়ান কোরো, মঁসিয়ে। তিরিশ বছরের ট্যাক্সি চালানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওরকম প্রেম করতে দুনিয়ার কেউ পারে না।"

সেকি! আমার যে ধারণা ছিল, কামকলায় ফরাসিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ।

"ওসব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ব্যাপার, মঁসিয়ে। এখন ফরাসির সঙ্গে দুঁদে আমেরিকানের কোনও তফাত নেই। একমাত্র ইতালিয়ানরাই পৃথিবীতে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবে, তুমি দেখে নিয়ো মঁসিয়ে।"

ড্রাইভার সায়েব কি ইতালীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেছেন? না, তেমন কোনও অঘটন ঘটেনি। আমাদের বউদিটিও ফরাসি, তবে দক্ষিণের মেয়ে।

দক্ষিণীদের হাবভাব আদবকায়দা সবই যে আলাদা তা আমার মতন অজপাড়াগাঁইয়াও এই ক'দিনে জেনে গিয়েছি।

এবার ক্যাঁচ করে আওয়াজ হলো—আচমকা ব্রেক টিপতে হয়েছে ড্রাইভারকে। দু'চারটে ফরাসি গালাগলি বুলেটের মতন শ্রীমুখ নিঃসৃত হলো। এক ছোকরা নিজের স্টাইলে হেলতে দুলতে গদাইলস্করি চালে রাস্তা পার হচ্ছিল।

ড্রাইভারদা সোজাসুজি বললো, "জার্মানদের উচিত ছিল আরও কিছুদিন প্যারিসের কনট্রোলে থাকা—তা হলে এরা হয়তো মানুষ হতো।"

পাঁচুদা আমাকে বোঝালেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্যারিস অধিকার করে জার্মান সৈন্যরা যে-হুকুম প্রথমেই জারি করেছিল তা হলো যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হওয়া যাবে না। কোথা দিয়ে রাস্তা ক্রশ করা যবে তা চিহ্নিত করা হলো, প্যারিসের লোকরা সেই দুঃখ এখনও ভোলেনি—ফরাসির ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় এতো বড় হস্তক্ষেপ এর আগে কেউ করেনি।

পাঁচুদা বললেন, "তুই হয়তো শুনে থাকবি, প্যারিসের হাওয়া জার্মানির গায়েও লেগেছিল। এখান থেকে ফেরবার পথে প্যারিস ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন, অ্যাডলফ হিটলার। কিন্তু জার্মান জেনারেল ফন চোলটিৎজ ততক্ষণ প্যারির প্রেমে পড়ে গিয়েছেন, তিনি ফুয়েরারের সেই হুকুম তামিল করেননি। দু'বার পাকে চক্রে প্যারিস নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলো—প্রথমে যখন ফরাসি সরকার শত্রুর মোকাবিলা না করে প্যারিসকে খোলা শহর বলে ঘোষণা করলেন, আর দ্বিতীয়বার যখন জার্মান সেনানায়ক তাঁর কর্তার হুকুম অমান্য করার স্পর্ধা দেখালেন।"

ট্যাক্সির মিটার বোধ হয় গাড়ির থেকেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আন্দাজে মনে হলো, কলকাতার সব ট্যাক্সিওয়ালা এই লোভনীয় হারের কথা শুনলে কল্যাণ ভদ্রের মারফত ফরাসি নাগরিক হবার অ্যাপ্লিকেশন পাঠাবে।

কিন্তু সে-গুড়ে বালি, জানালেন পাঁচুদা। কত ফরাসির বাচ্চা এই লাইনে ঢুকবার জন্যে উঁচিয়ে বসে আছে, কিন্তু ইউনিয়ন কিছুতেই ট্যাক্সির সংখ্যা বাড়াতে দেবে না। পিক আওয়ারে প্যারিসে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না সত্যি কথা, কিন্তু মঁসিয়ে অন্য সময় যখন যাত্রীর জন্যে ওয়েট করে-করে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে যায় তখন কি আমাদের কফির দাম প্যাসেঞ্জারের পকেট থেকে আসে?

ইউনিয়ন প্রকাশ্যে যাই বলুক, প্যারিসে ট্যাক্সিতে টুপাইস আমদানি আছে, না-হলে ট্যাক্সির স্বত্ব অত মোটা দামে হাতবদল হয় কেন?

আমাদের ড্রাইভারদা এবার গর্ব করলেন, "দুনিয়ার মধ্যে প্যারির ট্যাক্সিই সেরা। পড়োনি তো লন্ডনের ডাকাতগুলোর খপ্পরে।" আমি চুপ করে থাকলাম।

লন্ডনে আমার অভিজ্ঞতা ততটা খারাপ নয়। সবচেয়ে ভাল ট্যাক্সি ওয়াশিংটনের—এই রকম সুসভ্য ও উদার ব্যবহার আমি আর কোথাও পাইনি। তার একটা কারণ, অনেক মার্কিন ছাত্র পার্টটাইম ট্যাক্সি চালিয়ে পড়ার খরচ তোলে। আমাদের কলকাতাতেও এমন ব্যবস্থা চালু করলে মন্দ হয় না। যাঁরা শখের ট্রাফিক ওয়ার্ডেন হন তাঁরাও যদি আদর্শ স্থাপনের জন্যে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার হন তা হলেও কলকাতার অনেক বদনাম ঘুচে যাবে।

সম্বিতের বাড়ির সামনে আমাকে নামিয়ে দিয়ে পাঁচুদা ট্যাক্সি নিয়ে এগিয়ে গেলেন, আমাকে তিনি ভাড়াটা মেটাবার সুযোগ দেবেন না। আমি বললাম, "আর এক কাপ কফি খেয়ে গেলে পারতেন—হাওড়া-কাসুন্দের না হোক কাঁচড়াপাড়ার স্বাদ পেতেন।" আসলে দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে খুব একটা আগ্রহী নন। কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি স্বদেশও স্বদেশবাসী থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেছেন।

মধুমঙ্গল বসুর মুখোমুখি হওয়া গেলো। একেবারে টিপিক্যাল গোবেচারি বাঙালি চেহারা। বেতের মতন মেদবিহীন অথচ নমনীয় শরীর—ইংরিজিতে যাকে 'শার্প' বা ধারালো বলে তেমন মুখশ্রী। এই ধরনের শরীর রাখার জন্যে প্রাচুর্যের দেশ পশ্চিমে অনেক সংযম দেখাতে হয়, অনেক কাঠখড় পুড়োতে হয়—শিয়ালদহ সেকশনের লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতন প্রতিদিন জগিং বা ছোটাছুটি প্রয়োজন হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত স্নেহপদার্থ দাহ করে শরীর সুশাসিত হয় নিশ্চয় এই প্রক্রিয়ায়, কিন্তু কোথায় যেন কাঠিন্য উঁকি মারে। আমরা যাকে বাংলা মায়ের শ্যামলশোভন লালিত্য বলি তা উধাও হয়। তেত্রিশ বছরের মধুমঙ্গলকে দেখলে মনে হয় বয়স সাতাশ-আঠাশের বেশি অবশ্যই নয়। একেবারে স্বাভাবিক শাসন ছাড়াই শরীর আয়ত্তে রয়েছে।

ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ এই মধুমঙ্গল। বাঙালিরা যে-সব বিশেষত্বর জন্য দুনিয়ার প্রিয় হয় তার সবই যেন ওর মধ্যে উপস্থিত। নিচু গলায়, নিশ্চিত অথচ বিনম্রভাবে কথা বলে মধুমঙ্গল। প্যারিস অথবা ফরাসি দেশ কলকাতার এই বাঙালিকে আশ্রয় দিলেও ঠিক বাগে আনতে পারেনি ; এই বঙ্গসন্তানকে পুরোপুরি হজম করতে ফরাসি সংস্কৃতির বেশ কিছু সময় লাগবে।

প্যারিসে ভারতীয় শিল্পীদের সংখ্যা তেমন নয়, বাঙালি আর্টিস্টের সংখ্যা আরও কম। এঁদের রমরমাও তেমন নয়। কিছু-কিছু শিল্পী বিদেশি জলপানি নিয়ে এখানে এসেছেন, কিছুদিন এখানে বসবাস করে দেশে ফিরে গিয়েছেন, স্বদেশে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন। এঁদের দু'একজনের সঙ্গে আমার সামান্য

পরিচয় হয়েছে। যেমন যোগেন চৌধুরী এবং প্রবীণতর পরিতোষ সেন। আসলে ফরাসি দেশে একবার ঢুঁ মেরে যাননি এমন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি অথবা ভারতীয় শিল্পীর সংখ্যা কম। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বসবাস এক জিনিস আর বিশ্বের এই শিল্পরাজধানীতে স্থায়ী ডেরা পাতা আর এক জিনিস। বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবাস করা এবং একই সঙ্গে স্বদেশে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখাও বেশ শক্ত। খুবই কম ভারতীয় শিল্পীর জীবনেই বিরল সৌভাগ্যের শিকে ছিঁড়েছে।

সম্বিৎ আমাকে মধুমঙ্গলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। এদেশের সম্ভাবনাময় বাঙালি শিল্পী বলে। না, কোনও স্কলারশিপের ওপর নির্ভর করে মধুমঙ্গল এখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে না। নিজের তুলির জোরেই সংসারযাত্রার বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এই বাঙালি শিল্পী জেনে খুব ভাল লাগলো। প্যারিস আর যাই হোক, ছবির ব্যাপারটা কয়েকশো বছর ধরে গুলে খেয়েছে। এখানে ছবি বেচে যে টিকে আছে তার মধ্যে কিছু পদার্থ থাকতেই হবে। ছবিতে খোদ ফরাসিকে ঠকানো আর বউবাজারের স্বর্ণবণিককে নকল সোনা গছানো একই ব্যাপার।

মিষ্টি হেসে শান্তস্বভাব মধুমঙ্গল সোফায় বসে পড়লো। ওর বাঙালি হাবভাব একেবারে পাল্টায়নি। এই বৈঠকখানা প্যারিসে না হয়ে শ্যামবাজার অথবা সাদার্ন অ্যাভিনিউতে হলেও কোন পার্থক্য হতো না।

মনে পড়লো, বছর তিরিশেক আগে আমাদের সলিলদা—বোম্বাইপ্রবাসী সলিল ঘোষ ফরাসি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন। সেখানে একটা বড় পরিচ্ছেদ ছিল প্যারিসের ভারতীয় শিল্পীদের সম্বন্ধে। সেখানে এক দোকানে 'মোফা' নামে এক দুধ-ছাড়া অত্যন্ত কড়া কফির নির্যাস পান করতে-করতে সলিলদা বহু ফরাসি শিল্পী ও প্রবাসীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। একটি 'ক্ল্যাসিক্যাল' ধরনের ফরাসি মেয়েকে পাশে বসতে দেখে সলিলদার মনে হয়েছিল প্রাচীন ইউরোপীয় চিত্রকলার কোনও প্রতিকৃতি। এই মেয়েটির মধ্যে ইন্দিয়েন সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগানো সলিলদার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সলিলদার তৎকালীন দুঃখ—ফরাসি চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এরা অন্যদের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ তো দূরের কথা নিজের বিষয়েও পারতপক্ষে কিছু বলতে চায় না। ওরা নিজেদের নিয়েই মশগুল। অন্য দেশ সম্বন্ধে জানবার এতটুকু আগ্রহ নেই। একজন ফরাসি রঙের মিস্ত্রি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল সেবারে সলিলদার ফরাসি ভ্রমণে।

ওই ভ্রমণকথায় সলিল ঘোষ কিকোমোতি নামে এক পার্শি শিল্পীর কথা বলেছিলেন। সুরসিক কিকোমোতি সলিলদাকে বলেছিলেন, "আমি যে এখানে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে আছি একথা বম্বেতে কাউকে বোলো না—তাহলে আমার

পাওনাদাররা চেপে ধরবে আমাকে টাকা ধার শোধ দেবার জন্যে।" কিকোর বাবা ছিলেন রেলওয়ে এঞ্জিন ড্রাইভার। পাশ্চাত্যে গিয়ে কিকো প্রাচ্যের চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পাশ্চাত্য ধরন পরিত্যাগ করে প্রাচ্যের রীতিপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

তিরিশ বছর পরে কিকোর সেই এতেলিয়রের কী অবস্থা তা জানতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের এই ভ্রমণে ওকাজ করা সোজা নয়। আমি ফরাসির শিল্পের দিকটা এবার এড়িয়ে যাবো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। সলিলদার ওই লেখাতেই শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণা রেড্ডি ও তাঁর আমেরিকান স্ত্রী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন সলিলদা। তারপরে শক্তি বর্মণ ইত্যাদির নাম যুক্ত হয়েছে। প্যারিসে থাকাকালীন ভারতীয় শিল্পী লক্ষ্মণ পাই-এর চিত্রপ্রদর্শনী দেখেছিলেন সলিল ঘোষ। যা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা হলো একজন শিল্পী এসে কিকোমোতিকে বললেন, "জার্মানি যাবার জন্যে তোমার কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিলাম তা কয়েকদিন বাদে শোধ দেবো। কোনও তাড়াতাড়ি নেই তো?" কিকোর উত্তর : না—আমার এখন টাকার প্রয়োজন নেই, উল্টে তোমার যদি প্রয়োজন হয় আরও নাও, আমার হাতে এখন অনেক টাকা এসেছে।" বন্ধুর দিকে নোটের বান্ডিলটা এমনভাবে কিকো এগিয়ে দিলো যেন ওটা কিছুই নয়। শিল্পীদের মধ্যে এই ধরনের প্রীতির সম্পর্ক দেখে বন্ধুবৎসল সলিলদা খুবই খুশি হয়েছিলেন।

আমি আবার বর্তমানে ফিরে এলাম। পঞ্চাশ পেরোলেই মানুষের এই রোগ ধরে, অতীতের পাল্লাটা ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠে। কবে কি দেখেছিলাম, পড়েছিলাম তা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

মধুমঙ্গলের সঙ্গে সহজেই আড্ডা জমে উঠলো। অচেনা মানুষকে আপন করে নেবার শক্তি আছে এই মানুষটির। আমাদের আলোচনা হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালাকে কেন্দ্র করে, আমি তখনও জানতাম না প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা সম্পর্কে গল্প করতে গিয়ে আমরা একজন কলকাতার ট্যাক্সিড্রাইভারকেও টেনে আনছি। মধুমঙ্গল-যে একদিন কলকাতায় ট্যাক্সি চালাতো তা কেমন করে বুঝবো? কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা যে বিধাতার রসিকতায় প্যারিসের শিল্পী হয়ে উঠবে এও তো এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ।

আমি বিভিন্ন সূত্র থেকে প্যারিসের ট্যাক্সিওয়লার কিছু ঘটনা সংগ্রহ করে ফেলেছি—ট্যাক্সিড্রাইভার বচনামৃত বলে যদি কোনও সংকলন প্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিই তখন কাজে লাগবে।

সম্বিৎ বললো, "টোকা দিয়ে কথা বলতে প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালা তুলনাহীন।" গত রবিবার ট্যাক্সি চড়েছিল সম্বিৎ। ড্রইভারের মেজাজ ভাল ছিল

না। সে বললো, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের কত তফাত। তুমি ছুটির দিনে মজা করবার জন্যে ট্যাক্সি ভাড়া করেছো, আর আমি ছুটির দিনে ডিউটি করছি।" সম্বিৎও ছাড়বার পাত্র নয়, বললো, "তুমি নিশ্চয় অন্য একদিন ছুটি উপভোগ করবে।" ট্যাক্সিওয়ালার উত্তর: "রবিবারে ছুটি আর অন্য একদিনের ছুটি যে এক নয় তা তোমার জানা উচিত।" সম্বিৎ বলেছিল, "তুমি তো আর পাঁচ জনের মতন 'পরের চাকরি' করো না, তুমি স্বাধীন ব্যবসায়ী।" ট্যাক্সিওয়ালা রেগে বলেছিল, "পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট অন্তর আমার মনিব পাল্টায়, তুমি ট্যাক্সিওয়ালার দুঃখ বুঝবে না।"

মধুমঙ্গল হাসছে। সে বললো, "প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, এখানে যা দাম। কে ওই সব গাড়িতে চড়বে?"

আমি নিজেও দূরদর্শী ভ্রাম্যমানের মতন আরও দু'খানা ট্যাক্সি-কাহিনী সংগ্রহ করে নোট বইতে বন্দি করে ফেলেছি।

এক আমেরিকান ভদ্রলোক দেখলেন প্যারিস ট্যাক্সির মাথায় 'ইন সার্ভিস' জ্বলছে, যার অর্থ ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভদ্রলোকের তাড়াতাড়ি ছিল, দরজা খুলে গাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। ট্যাক্সিওয়ালা যেমনি শুনলো যাত্রীটির গম্যস্থান বেশি দূরে নয়, অমনি বিগড়ে বসলো। বললো, "কী ভাবা হচ্ছে? আমার গাড়িতে ঢুকবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন নেই? এদেশটা কি আর রিপাবলিক নেই? যে-কেউ আমার গাড়িতে ঢুকে পড়ে আমাকে যা খুশি অর্ডার করতে পারে? খিদের সময় একটু খাওয়া-দাওয়া করার অধিকারও কি আমার নেই?" আমেরিকান যাত্রী স্থানীয় আইনকানুন জানেন, তাই ঘাবড়ালেন না। ট্যাক্সিওয়ালা রাগে গজ-গজ করতে করতে, গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললো, "তোমার বাড়িতে ডাইনিং রুমে আমি কি গটগট করে ঢুকে পড়ে, চেয়ারে বসে খেতে আরম্ভ করি? আমার উচিত ছিল, ট্যাক্সির দরজাটা লক করে রাখা। পরের বারে তোমাকে যখন রাস্তায় দেখতে পাবো তখন তাই করবো।"

আসলে প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার মেজাজ ঠিক কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের মতন। যখন আপনার সবেচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন ট্যাক্সি উধাও। এক সায়েবও দুঃখ করে লিখেছেন—দুপুর বারোটা থেকে দুটো এবং সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা প্যারিসে ট্যাক্সি ড্রাইভারের টিকি দেখতে পাওয়া ভাগ্য। ওই সময় ওঁরা খানাপিনায় ব্যস্ত থাকেন। প্যারিসেও একজন কল্যাণ ভদ্র আছেন। ওই মুখপাত্রটির বক্তব্য ; ওই সময় রাস্তায় এমন জ্যাম হয় যে ট্যাক্সি চালিয়ে লাভ হয় না। ওই সময় বাড়িতে বসে থাকা বেশি লাভজনক।

একজন আমেরিকান হাস্যরসিকের মন্তব্য প্যারিসেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে খোদ ফরাসি নাগরিকদের মধ্যে। এই ভদ্রলোক লিখেছেন, "নিউইয়র্ক, লন্ডন

ও পৃথিবীর অন্য শহরে ট্যাক্সিওয়ালা যাত্রীকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যায়, প্যারিসে উল্টো ব্যবস্থা। এখনে যাত্রীকে যেতে হয় ড্রাইভার যেদিকে যাচ্ছে—সেটা তার বাড়ি হতে পারে, রেস্তোরাঁ হতে পারে।"

আরও একটা মন্তব্য আমার ডাইরিতে বন্দি হয়েছে। খাঁটি ফরাসি হতে হলে কাউকে না কাউকে ঘেন্না করতে শিখতে হবে—হয় অফিসের বস, অথবা নিজের কাজ, অথবা সরকার, অথবা কোনও রাজনৈতিক দল, অথবা পুঁজিপতি। ট্যাক্সিওয়ালা থেকে আরম্ভ করে কোনও ফরাসি নিজের দোষ দেখতে পায় না, সব দোষ ও অপরাধ যে অন্য কারুর সে-বিষয়ে ফরাসি সব সময় নিঃসন্দেহ।

তাই কেউ যদি ফরাসির প্রশস্তি করে এবং বলে তোমরাই দুনিয়ার সেরা, সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তা হলে, এরা গর্বে কাঁদতে শুরু করে। এদের মনে থাকে না, প্রকাশ্যে ফরাসি জাতের সব চেয়ে প্রশস্তি যিনি ইদানিং কালে করেছেন সেই দ্য গ্যলও আড়ালে ফরাসিকে ভেড়ার জাত বলতেন।

"ইউরোপের সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট এবং সবচেয়ে ডেনজরাস জাত এই ফরাসি," বলেছিলেন এক ধুরন্ধর ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ। এরা কখনও প্রশংসার পাত্র, কখনও ঘৃণার, কখনও এদের দেখলে ভয় হয়, কখনও করুণা জন্মায়, কিন্তু কখনও এ-জাতকে অবহেলা করা নিরাপদ নয়।"

সম্বিতের স্ত্রী বললো, "প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালারাও তাই। কখনও-কখনও এরা এতো ভাল ব্যবহার করে যে অবাক হয়ে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে দামি জিনিস ভুলে ফেলে এসেছেন, খোঁজ করে বাড়িতে দিয়ে যাবে, একটা পয়সা টিপ্‌স নেবে না। বলবে, ওটাই তো আমার কাজ।"

মধুমঙ্গল আমাদের কথা শুনেছে। সে এবার হাসলো। ওর কাছেও যে কিছু নাটকীয় ঘটনা আছে তা আমি মধুমঙ্গলের মুখ দেখেই আন্দাজ করতে পারছি।

শিল্পী মধুমঙ্গল বসু চায়ের কাপে চুমুক দিলো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

মধুমঙ্গলের প্রতি আমার টান বেড়েছে। তার জীবন সম্বন্ধেও একটু বাড়তি কৌতূহলের উদ্রেক হচ্ছে। মধুমঙ্গল যে কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভার ছিল তা আমার মাথায় ঘুরছে। এই কঠিন সময়েও কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাও যে ইচ্ছা করলে প্যারিসের সম্মানিত শিল্পী হতে পারে তা অনেকটা গল্পের মতন মনে হচ্ছে। এই ধরনের মানুষদের খুঁজে বের করতে আমি দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় পাড়ি দিতে প্রস্তুত আছি।

ট্যাক্সি সম্বন্ধে আমরা যে রসরসিকতা করছি মধুমঙ্গল মাঝে-মাঝে তাতে যোগ দিচ্ছে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সে মুখ বুজে শুনছে এবং মুখের হাসি চাপছে। মধুমঙ্গল একবার বললো, "কলকাতায় সাতদিন সারাক্ষণ ট্যাক্সি চড়ে

আমি যেন একটা বই লিখবার চেষ্টা করি। সেই লেখায় দুনিয়ার অন্য শহরের ট্যাক্সিওয়ালার গল্পও এসে যেতে পারে।"

আমি বললাম, "বইতে পড়েছি দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ফরাসি দেশের সবরকম পরিবর্তন হলেও ট্যাক্সিওয়ালার স্বভাব পাল্টায়নি। অনেকের বিশ্বাস ট্যাক্সি দেখেই সেই শহরের চরিত্র বোঝা যায়। যেমন কলকাতা যে স্বভাবেই নোংরা এবং এখানকার শিল্পবাণিজ্য যে নড়বড় করছে তার স্পষ্ট ছায়া পড়েছে কলকাতার নোংরা ট্যাক্সিতে। বেশির ভাগ ট্যাক্সি যে কীভাবে চলমান রয়েছে তা যন্ত্রযুগের বিস্ময়। সে-তুলনায় টোকিওর ট্যাক্সির ধর্ম একেবারে অন্যরকম।

কোথায় পড়েছিলাম, দ্বিতীয় যুদ্ধের আগেই ১৯৩৭ সালে প্যারিসে তেরো হাজার ট্যাক্সি ছিল। প্রায় ওই সময়ে (১৯৩৫ সালে যখন আমার বয়স দু'বছর) তখন স্টিগমুলার নামে এক ইংরিজীভাষী সায়েব প্যারিসের ট্যাক্সিড্রাইভারের হাতে কীভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন তার চমৎকার ছবি এঁকেছেন। ব্যাপারটা এই রকম।

প্যারিসে কাজ উপলক্ষে বাড়িভাড়া নিয়েছিলেন এই ভদ্রলোক। সিনেমায় যাবার শখ হলো। হল্ থেকে বেরিয়ে দেখলেন বৃষ্টি হচ্ছে সামান্য। ওঁর বাসস্থান প্রায় হাঁটাপথ। বুলেভার্ড-এর শেষ দিকে হল্ থেকে বেরিয়ে দুটো রাস্তা পেরিয়ে তৃতীয় রাস্তায় ডানদিকে বেঁকে একটু গেলেই বাড়ি। যে-ট্যাক্সিতে ভদ্রলোক চড়লেন, তার চালক অত্যন্ত অভদ্র এবং বদমেজাজি।

সব বুঝেসুঝেও ড্রাইভার যখন প্রথম রাস্তাতেই বাঁক নিতে যাচ্ছে তখন যাত্রী হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "আরও দুটো রাস্তা পেরোতে হবে।" ড্রাইভার খুব চটিতং হয়ে পাশ কাটিয়ে আবার চলতে লাগলো। কিন্তু কানে বোধহয় কোনো কথা ঢোকাবে না, কারণ দ্বিতীয় রাস্তায় গিয়ে আবার মোড় নেওয়ার চেষ্টা হলো। যাত্রী আবার মনে করিয়ে দিলেন, এটা নয়, রাস্তার ডান দিকে। ড্রাইভার এবার ভীষণ বিরক্ত হয়ে এমনভাবে তাকালো যেন প্যাসেঞ্জারকে ভস্ম করে ফেলবে।

আবার ট্যাক্সি এগিয়ে চললো, কিন্তু তৃতীয় রাস্তা পেরিয়ে সোজা, কোন দুঃখে ট্যাক্সিওয়ালা ডান দিকে মোড় নেবে? আবার হাঁ হাঁ করে উঠলেন যাত্রী, এবার বিপজ্জনকভাবে ইউ টার্ন নিয়ে ড্রাইভার উল্টো চলতে আরম্ভ করলো এবং ফেলে আসা তৃতীয় রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়ে, মুখ লাল করে বললো, "নেমে যাও, এখনই নেমে যাও আমার গাড়ি থেকে। আমি তোমার মতন প্যাসেঞ্জার নেবো না কিছুতেই। তুমি তিনবার আমাকে ইডিয়েট ভেবেছো। তিনবার তুমি আমাকে অপমান করছো। আমার এই গাড়ি ফরেনারদের জন্যে নয়। উতার যাও, আভি!"

"এই বৃষ্টিতে আমি গাড়ি থেকে নামবো? ওই কাজটি আমি করছি না। তুমি

ভালভাবেই জানো, তিনবার কেন একবারও তোমাকে ইনসাল্ট করিনি আমি।"

"গেট আউট!" ড্রাইভার নাছোড়বান্দা। "তুমি আমাকে বার বার অপমান করেছো, তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবেই।"

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে যাত্রী বললেন, "আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না।"

ড্রইভার এবার ভয় দেখালো। "হয় গাড়ি ছাড়ো, না হলে থানায় নিয়ে যাবো তোমায়, সেখানে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করবো তোমার কাছ থেকে। অপমান করা তখন বেরিয়ে যাবে।"

"এই বৃষ্টিতে রাস্তায় নামা থেকে আমি বরং থানায় যাবো।"

অগত্যা থানায় গমন। যাত্রীর তেমন চিন্তা নেই, কারণ থানাটি পরিচিত, ওখানে কয়েকবার তিনি যাতায়াত করেছেন।

যাত্রীকে দেখে ছোটদারোগা বলে উঠলেন, "গুড আফটার নুন, মিস্টার...। কেমন আছেন? কী ব্যাপার? কী কাজে লাগতে পারি?"

ড্রাইভারের হুঙ্কার : 'উনি নয়, আমি থানায় এসেছি এই ফরেনারকে নিয়ে। তিনবার এমন ব্যবহার করেছে যেন আমি একটি ইডিয়ট। মঁসিয়ে, তিনবার আমি জঘন্যভাবে অপমানিত হয়েছি। আমি বিচার চাই, মঁসিয়ে।"

দারোগাবাবু গম্ভীরভাবে যাত্রীর বক্তব্য খাতায় লিখে ফেললেন। চমৎকার ওঁর হাতের লেখা। কেমনভাবে তিন-তিনবার ওঁকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে, প্রতিবার কীভাবে দাঁত খিঁচোনি হজম করতে হয়েছে। লেখবার সময় ড্রাইভার বাধা দিয়ে কিছু বলতে গিয়ে বকুনি খেলো দারোগাবাবুর কাছে।

এবার দারোগাবাবু বললেন, "বলো, তোমার বক্তব্য, যাতে আমি দু' পক্ষের অভিযোগ ডাইরিতে নোট করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।"

গ্রামোফোন রেকর্ডের মতন ড্রাইভার বলতে লাগলো, "তিনবার মঁসিয়ে, তিন-তিনবার আমাকে জঘন্যভাবে অপমান। তিনবার..."

দারোগাবাবু এবার ঠোঁট বেকিয়ে যাত্রীকে বললেন, "বোঝা যাচ্ছে আপনার ওপরেই অবিচার হয়েছে, আপনার কোনও চিন্তা নেই, এই ট্যাক্সি বিনাপয়সায় আপনাকে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। কিন্তু মঁসিয়ে, তার আগে দয়া করে আপনার আইডেনটিটি কার্ডটা একটু দেখতে হচ্ছে।"

যাত্রীর এবার চুপসে যাবার অবস্থা। আইডেনটিটি কার্ডটা বাড়িতে পড়ে রয়েছে। অথচ ফরাসি আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বিদেশিকে সবসময় পরিচয়পত্র বহন করতে হয়। এবার আমতা-আমতা করে যাত্রী বললেন, "ভীষণ বৃষ্টিতে মঁসিয়ে, পাছে ওই দামি কাগজপত্তর ভিজে চুপসে যায় তাই ওটা বাড়িতে রেখে এসেছি। আগামীকাল সকালে ওটা আপনাকে দেখিয়ে যেতে পারি।"

সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। ফরাসি দারোগাবাবু পাথরের মতন গম্ভীর মুখ করে বললেন, "এই অবস্থায় আমাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হচ্ছে, কালকে অবশ্যই আপনাকে থানায় আসতে হবে পরিচয়পত্র দেখাতে। বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আজ এ স্পেশাল কেস আমি ড্রাইভারকে অনুরোধ করছি আপনাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিতে, কিন্তু আপনাকে সমস্ত খরচ দিতে হবে, এমন কি এখানে আসবার এবং পুরো ওয়েটিং চার্জ।"

"তোমার ওয়েটিং মিটার চালু আছে তো!" দারোগা সায়েব ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন এবং ড্রাইভার জানালো, ওসব ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না।

বাড়ির সামনে এসে যাত্রী গুনে-গুনে ঠিক যা মিটার উঠেছে তা ট্যাক্সি ড্রইভারের হাতে তুলে দিলেন। তখন ড্রাইভার বললো, "মঁশিয়ে, গাড়িতে চড়বার সময় বলেছিলেন কিছু টিপস দেবেন, ওইটা বের করে ফেলুন। বিদায় নেবার সময় সম্পর্কটা মিষ্টি রাখতে হবে তো।"

মধুমঙ্গল বসু আমার কথা শুনে মন্তব্য করছে না, বরং মিষ্টি হাসছে। এবার তার গল্পটা বলে ফেলা যাক।

কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা ইচ্ছে করলে প্যারিসের উঠতি শিল্পী হতে পারেন। কলকাতায় যাঁরা ট্যাক্সি ব্যবহার করেন এবং ড্রাইভারকে হিসাবের মধ্যেই নেন না তাঁরাও যেন একটু সজাগ হন, আজ যিনি স্টিয়রিং-এ বসে একখানা পাঁচ টাকার নোটের জন্যে আপনার হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত রয়েছেন, তাঁর মধ্যেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে উঠবার। দুঃখের ব্যাপার বাঙালিদের মধ্যে যান্ত্রিক মনোভাবের অভাব—কলকব্জা দেখলেই মধ্যবিত্ত বাঙালি সিঁটিয়ে ওঠে। ভাবে কালিঝুলি মাখাটা শিক্ষিত লোকের কাজ নয়। ফলে ভাল বাঙালি ড্রাইভার কমতির দিকে—মোটরগাড়ি, ট্রাক, টেম্পো এখনও বাঙালির আয়ত্তের বাইরে, আর যারা তা আয়ত্ত করেছে তাদেরও মনে দুঃখ, ঠিক লাইনে আসা হয়নি।

মধুমঙ্গল বসুর সাফল্য প্রত্যেক বাঙালির জানা কর্তব্য। কাঁচড়াপাড়া শহিদনগর কলোনির এক রিফিউজি পরিবারের ছেলের প্যারিসবিজয়ের গল্প আপনারা শুনেছেন। এবার চলে আসা যাক কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরে বিজয়গড় কলোনিতে যাকে অনেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের প্রথম কলোনি বলে থাকেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এখানে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি ছিল এবং দেশবিভাগের পর ছিন্নমূল কিছু মানুষ এখানে রাতারাতি আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

এই দলেই ছিলেন ফরিদপুরের জীবনকৃষ্ণ বসু। জীবনকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী পুত্র ছাড়াও এই সংসারে ছিলেন মা ও বিধবা বোন। এই বোনের স্বামী সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গায় খুন হন।

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মধুমঙ্গল মেজ। ১৯৭৩ সালে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে অন্য অসংখ্য বাঙালির মতন মধুমঙ্গল তিন বছর বেকার বসে রইলো। যেখানে যত চেনাশোনা আছে সর্বত্র উমেদরি করেও কোনও চাকরির খোঁজ পাওয়া গেলো না। বাধ্য হয়ে নিজের পেট চালানোর জন্যে হাতিবাগানের বাজারে পুরনো জামাকাপড় বেচা শুরু করলো মধুমঙ্গল। "এই পুরনো জামাকাপড়ের বাজারটা একদিন দেখে আসবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন," মধুমঙ্গল বললো আমাকে।

মামার একটা দোকান ছিল। সেখানেও কিছুদিন হাত পাকালো মধুমঙ্গল কিন্তু অন্ন সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হলো না। তখন একজন মতলব দিলো, ড্রাইভিং শেখো। ড্রাইভিং শিখলে কলকাতা শহরে বসে থাকবার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং ড্রাইভিং শেখা শুরু করলো মধুমঙ্গল।

তারপর কোনও একসময় বিজয়গড় কলোনির মধুমঙ্গল কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার হলো। অপরের গাড়ি, মধুমঙ্গলের সময় ও গতর। "মিটার ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে কত লোককে যে নানাভাবে দেখেছি—কলকাতায় কত অন্ধকার গলি যে চেনা হয়ে গিয়েছে তা ভাবলে এখন অবাক লাগে, শংকরদা। কত ভাল লোকের দুষ্টু স্বভাব, কত খারাপ লোকের ভাল স্বভাব, তা লিখতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে। দুটো পয়সার জন্যে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে কত বুড়ো লোকের দুষ্টুমির সামনে চোখ বুজে থাকতে হয়েছে তা আপনাকে কি বলবো।"

"আবার চমৎকার লোক পেয়েছি। একবার এক মাড়ওয়ারি ভদ্রলোক এক অবাঙালি মহিলাকে নিয়ে ভিক্টেরিয়ার কাছে গাড়ি পার্ক করালেন। আমি ভাবলাম এই বলবে কিছুক্ষণের জন্যে গাড়ি ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকো, পাঁচটা টাকা বাড়তি পাবে। কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা ওসব কিছু বললেন না। সঙ্গীকে বললেন, ওকেও একটা ঠাণ্ডা পানীয় কিনে দাও, সারাদিন কাজ করে মুখ শুকিয়ে আছে। কিছুতেই শুনলেন না, হাতে একটা অরেঞ্জের বোতল গুঁজে দিলেন। ওঁরা আমার সমানেই একটু গল্প করে বাড়ি ফিরলেন।"

মধুমঙ্গল বললো, "আপনাদের হাওড়ায় বহুবার গিয়েছি গাড়ি নিয়ে। একবার এক ভদ্রলোক মিটার ডাউন করিয়ে জোর করে নিয়ে যেতে চাইলেন হাওড়া ব্রিজের তলায় ফুলের হোলসেল মার্কেটে। বললুম, ওখানে গাড়ি দাঁড় করানো যায় না, আপনি ফুল কিনে এনে কোনও গাড়ি ধরুন। লোকটা খাপ্পা হয়ে উঠে বললো, যাবে না মানে? তোমার বাপ যাবে! আমার জন্যে কোনও ট্রাফিক আইন নেই, পুলিশ কমিশনার আমার বন্ধু।

"কত লোক যে বড়-বড় লোকের সঙ্গে সম্পর্ক দেখিয়ে চোটপাট করে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কী বলবো আপনাকে।

"একবার আপনাদের হাওড়া থেকেই প্যাসেঞ্জার মিটার ডাউন করালো বালিগঞ্জে যাবার জন্যে। পুলিশের কোন ডেপুটি কমিশনারও নাকি ওঁর এক গেলাসের ইয়ার, ভীষণ তাড়াতাড়ি আছে। জোরজবরদস্তি করে কয়েক জায়গায় ওভারটেক করালো, লেন ব্রেক হলো, তারপর পড়লাম সার্জেন্টের খপ্পরে। ফাইন করে দিলো, আমার কোনও কথা শুনলো না। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো, মনে হলো কলকাতায় কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মানুষ বলে মনে করে না।

"কত লোক যে কলকাতায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে হর্ন দেওয়ার জন্যে হুকুম করে আপনাকে কী বলবো। যাত্রীরা বুঝতে চায় না, হর্ন বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয় না। অথচ এখানে দেখুন। লক্ষ-লক্ষ গাড়ি আছে, কিন্তু হর্ন বাজানো নেই। ফরাসিরা যখন রাস্তায় হর্ন বাজায় তখন বুঝবেন স্পেশাল একটা উৎসব হচ্ছে।

"একদিন রাত এগারোটার সময় কলকাতার তারাতলার ব্রিজের কাছে গোটা ছ'য়েক লোক গাড়িতে চেপে বসলো জোর করে। ব্যাপারটা ভাল মনে হলো না, বোধ হয় কোনও ডাকাতি অথবা খুনোখুনি ধান্ধা রয়েছে। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে এক ঠেকের কাছে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে চিৎকার শুরু করলাম। লোকগুলো পালালো। কিন্তু বলে গেলো, তোমাকে দেখে নেবো।

"পরের দিন আর এক প্যাসেঞ্জার গাড়িতে যা তা ব্যবহার করলো। খুব মনে লাগলো। এরা আমাকে মানুষ বলে মনে করে না। নিজের ওপর বিতৃষ্ণা এলো। ঠিক করলাম, কিছু একটা করতে হবে, এমন কিছু যা আমি ভালবাসি। ছবি আঁকলে কেমন হয়? এক সময় শখ করে পোটোদের আখড়ায় সরস্বতী ঠাকুর রং করেছি।

মধুমঙ্গলের এক বন্ধু বিয়ের কার্ড বিক্রি করতো, নাম গোপাল রায়। তাকেই বললো, চল দু'জনে ছবি আঁকা শেখা যাক। গোপাল জিজ্ঞেস করলো, পয়সা? "সপ্তাহে কয়েকদিন ট্যাক্সি চালাবো, আর কয়েকদিন আর্টিস্ট হবার সাধনা করবো। চল, কোথাও ভর্তি হওয়া যাক।"

প্রথমে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হলো মধুমঙ্গল। সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস। মাস ছয়েক ওখানে হাত পাকিয়ে, একটু ভরসা পেয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটলো মধুমঙ্গল। গরিবের ঘোড়া রোগ। ট্যাক্সিওয়ালার আর্টিস্ট হবার বাসনা বোধ হয় কুঁজোর চিত হয়ে শোবার সাধ থেকেও অযৌক্তিক। রবীন্দ্রভারতী নিলো না। বললো, তোমার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, হবে না।

"সেই সময় খবর এলো শিল্পী শুভাপ্রসন্নর কলেজ অফ ভিসুয়াল আর্টে ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। ওখানে পরীক্ষা দিলাম। তিনদিন পরে ফল বেরুবে, তারপর মৌখিক

পরীক্ষা। ঠিক করলাম, ফল যাই হোক, ওরাল টেস্টের সময় ওঁর পা জড়িয়ে ধরবো, বলবো আমি ট্যাক্সি চালাই, কিন্তু আপনার কাছে ছবি আঁকার সুযোগ একটা করে দিন।"

শুভাপ্রসন্ন সব শুনে বললেন, "তুমি ভর্তি হয়ে গেলে, নিয়মিত এসো।" প্যারিসের বৈঠকখানায় বসে মধুমঙ্গল আমাকে বললো, "আমি ওঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ, ওঁর জন্যে অন্ধকার থেকে আলোকে আসবার একটা সুযোগ গেলাম। ওঁর কাছে পেয়েছি অনেক।"

এরপর এক সময় ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজেও একটা সুযোগ করে নিয়েছে মধুমঙ্গল। ট্যাক্সি চালিয়ে রুজিরোজগার এবং সেই সঙ্গে চারুকলার শিক্ষা একই সঙ্গে চলেছে।

এবার ১৯৮৫ সাল। ডোমিনিক লাপিয়ের সম্বন্ধে কিছু নাক-উঁচু বাঙালির যতই রাগ থাক, মধুমঙ্গলের ওঁর কাছে থাকার কারণ আছে। ফরাসি ভাষায় কলকাতা হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো সিটি অফ জয়ের রিকশওয়ালা হাসারি পালের মাধ্যমে। প্যারিসে বসে সেই বই পড়লেন এক ফরাসি তরুণী এগজিকিউটিভ—জিসেল কিবিলার।

প্যারিসের এক বিখ্যাত কোম্পানির এই প্রতিভাময়ী তরুণী অফিসার ঠিক করলেন কলকাতায় দুর্গাপূজা দেখতে আসবেন। এলেন দেখতে। এবার এক মিটার-ট্যাক্সির যাত্রী তিনি এবং ড্রাইভার বলা বাহুল্য মধুমঙ্গল বসু।

না, ভাববেন না, আমি সিনেমার ইচ্ছা-পূরণের গল্প লিখতে বসেছি। ভাল ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে, ফরাসি যাত্রী কলকাতায় দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবার জন্যে এই ট্যাক্সির সঙ্গে একটা রফা করতে চাইলেন। পয়সা পেলে সব ট্যাক্সিওয়ালাই এইভাবে হোটেলের যাত্রীকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে তুলে নিতে রাজি আছে।

এই যাত্রী ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে বলে না। আর এই ড্রাইভার প্যারিসের ট্যাক্সিওয়ালার মতন কাঠগোঁয়ার বা অশিক্ষিত নয়। এর সঙ্গে আর্ট সম্বন্ধে কথা বলা যায় দেখে কুমারী জিসেল কিবিলার বিস্মিত হলেন।

ইতিমধ্যে কিছু খবরাখবর বিনিময় হয়েছে। মধুমঙ্গল জেনেছে, জিসেলের আদি দেশ আলসাস। এই ফরাসি পরিবারের জার্মান বিদ্বেষ রয়েছে। বাড়িতে জার্মান বলা নিষিদ্ধ। দোষ দেওয়া যায় না, জিসেলের ঠাকুর্দার চার ভাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের গুলিতে মারা যান। পরবর্তী সময়ে এই পরিবার প্যারিসে পালিয়ে আসে। জিসেলের বাল্যকাল খুব সুখের হয়নি। মাত্র তেরো বছর বয়সে মা মারা যান। শুরু হয় জীবনসংগ্রাম। বাবার ছিল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। ফলে সংসারে টাকার কষ্ট ছিল খুব। একসময় জিসেলকে গরিবদের আশ্রমেও আশ্রয় চাইতে হয়েছে। কখনও কেটেছে স্রেফ আলু সিদ্ধ খেয়ে। ষোলো বছর বয়সে চাকরির সন্ধানে বেরুতে হলো

জিসেলকে। কিন্তু জিসেল থেমে যায়নি। জীবনকে এবং পৃথিবীকে সে বুঝতে চেয়েছে। আর্টের সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

জিসেল নিজের চেষ্টায় আইনের ডিগ্রি নিয়েছে। কর্মজীবনে তার উন্নতি হয়েছে দ্রুত।

মধুমঙ্গলের জীবনটাও জিসেলের অজানা রইলো না। একসময় জিসেল ভরসা দিয়েছে, "আপনার দ্বিধার বা লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমরা পৃথিবীর দু'প্রান্তে মানুষ হয়েছি, কিন্তু আমাদের সংগ্রামটা একই। কোথায় যেন আপনার সঙ্গে আমার মিল খুঁজে পাচ্ছি।"

আরও একটা মিল পাওয়া গেলো। জিসেল ও মধুমঙ্গল দু'জনেই বাইসাইকেল থিফ নামে চলচ্চিত্র দেখেছে ও দু'জনেই অভিভূত হয়েছে।

ট্যাক্সিড্রাইভার ও ফরাসি যাত্রী কলকাতাতেও একটা ছবি দেখে ফেললো।

কয়েকদিন পর বিদায়ের মুহূর্ত আগত। ঐ ট্যাক্সিই মিটার নামিয়ে দমদমে এসেছে দূরদেশের যাত্রীকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবার জন্যে। কেমন যেন দ্বিধা লাগলো ড্রাইভারের। ভাবলো, এবার ভাড়াটা সে নেবে না, যদিও ট্যাক্সিড্রাইভারের পক্ষে এমন কাজ সুবিবেচনাপ্রসূত নয়।

ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকবার পথে ট্যাক্সিড্রাইভার লাগেজ নামিয়ে দিতে-দিতে যাত্রীকে বললো, সব কিছু গুনে নাও, বুঝে নাও, ভুল করে কিছু যেন ফেলে না যাও। কলকাতার অনেক বদনাম, আর যেন না বাড়ে।

ফরাসি দেশের তরুণী যাত্রী এবার কলকাতার ট্যাক্সিড্রাইভারের কাছে সরে এসে প্রশ্ন করলো, "তোমার প্যারিসে যেতে ইচ্ছে করে না?"

"আমার পয়সা নেই। কী করে যাবো?"

"আমি তোমাকে টিকিট পাঠিয়ে দেবো।"

যাবার আগে শেষ অনুরোধ : "তুমি পাশপোর্ট করাও।"

পরের বছর, ১৯৮৬ সালে চল্লিশ দিনের ভিসা নিয়ে কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালা মহিলা প্যাসেঞ্জারের অতিথি হয়ে প্যারিসে পদার্পণ করলো।

"খুব ভাল লেগে গেলো দেশটা, শংকরদা। আর্ট কালচার এদের রক্তে, এরা নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে শিল্পকে গ্রহণ করে, তার জন্যে বড়লোক হওয়ার, শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমি খবর পেলাম, এই প্যারিস শহরেই চল্লিশ হাজার শিল্পী আছে—দুনিয়ার এমন দেশ নেই যেখান থেকে শিল্পীরা এখানে ডেরা বাঁধেনি। অনেক ইণ্ডিয়ান শিল্পীরও খবর পেলাম—মধ্যপ্রদেশের এস আর রাজা, দিল্লির ধাওয়ান, কেরালার নারায়ণ আকিতম, বিশ্বনাথন, বাংলার শক্তি বর্মণ, অঞ্জু চৌধুরী, লক্ষ্মী দত্ত, শর্মিলা, বাংলাদেশের শাহাবুদ্দিন। শুনলাম এস আর রাজা

চল্লিশ বছর এখানে আছেন, ওঁর ফরাসি স্ত্রীর নাম মঞ্জিলা। এটা যে ফরাসি নাম হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

"এদেশের রীতিনীতি, সামাজিক কানুনও কিছু কিছু শিখলাম, শংকরদা। যেমন সাদা ওয়াইন ও রোজ ওয়াইন ঠাণ্ডা করে সার্ভ হয়, রেড ওয়াইনে ঠাণ্ডা দরকার হয় না। হোয়াইট ওয়াইন রাখা যায় না, এক বছরেই খেয়ে নিতে হয়, রেড ওয়াইন অনেকদিন রাখা চলে। আরও শিখলাম, খাওয়ার টেবিলে মেয়েদের আগে সার্ভ করতে হয়। কোনও বাড়িতে খেতে গেলে গৃহিণীর জন্যে উপহার নিয়ে যেতে হয়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যখন বেরুচ্ছে স্বামীকে দরজা খুলে দিতে হবে কিন্তু রেস্তোরাঁয় পুরুষ আগে ঢুকবে, পিছনে মেয়ে। বিল মেটাবার দায়িত্ব পুরুষের। আরও শিখলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় স্বামী আগে উঠবে, স্ত্রী পরে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় স্বামী পরে স্ত্রী আগে। জিসেল আমাকে বুঝিয়েছে, বোধ হয় মেয়েরা স্কার্ট পরে বলে এই ব্যবস্থা।"

মধুমঙ্গল বললো, "মাথা খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা, শংকরদা। খাবার অনুযায়ী ওয়াইন চয়েস করতে হয়। মাছের সঙ্গে সাদা ওয়াইন সব সময়, রেড চলবে না। মাংসের সঙ্গে রেড অথবা রোজ। ওয়াইন এটিকেটের খোঁজখবর করে যাবেন আপনি, সময় পেলে।

মধুমঙ্গল বললো, "আমার চোখ খুলে গেলো ওই ১৯৮৬ সালে। ছবির শিল্পীর পক্ষে আর্ট গ্যালারি ছাড়া জীবন অচল। প্যারিসে হাজার খানের গ্যালারি আছে শুনে আমি অবাক। তারপর আছে ছবির নিলাম। নিলাম দেখে আমি তাজ্জব। নিলামওয়ালারা তরুণ শিল্পীদের ছবিও নিলাম করে—ক্যাটালগ বের করে প্রথমে। তাতে ছবি ছাপানো হয়, নিলামের দিন ও সময় লেখা থাকে। একটা আন্দাজ দাম ঠিক হয়। কখনও শিল্পীও একটা সর্বনিম্ন দাম ঠিক করে দেন।

"ধরা যাক ইণ্ডিয়ার নতুন শিল্পী। নিলামের দিন চিৎকরা হবে—ভারতবর্ষের তরুণ শিল্পী, ভীষণ সম্ভাবনাময়। তিন হাজার ফ্রাঁ বলে চড়া গলায় ঘোষণা। যিনি চিৎকার করছেন তিনি ছাড়াও কোম্পানির দু'জন লোক থাকেন। ওঁরা তেড়ে ফুড়ে বলবেন ৩২০০ ফ্রাঁ। যদি খরিদ্দারদের মধ্যে দু'জন হাত তুললেন তা হলে বোঝা গেলো ছবি সম্পর্কে আগ্রহ আছে। ৩৪০০-৩৪০০ ; ৩৬০০-৩৬০০! তখনও যদি দু'জন দর্শক হাত তুলে রাখেন তাহলে ৩৮০০-৩৮০০। এবার একজন হয়তো হাত নামিয়ে নিলো তখন ৪০০০-ওয়ান, ৪০০০-টু, ৪০০০-থ্রি। সবশেষে হাতুড়ির বাড়ি। নিলামদার ওই চার হাজার ফ্রাঁর ৩৫% কেটে নেবে। বিক্রি না হলে শিল্পীকে কিছু দিতে হবে না। এইভাবে ছবি বেচে অনেক শিল্পী বেঁচে আছে, প্যারিসের মতন জায়গায়, দিনগুজরান করছে।"

প্যারিস-কলকাতার সেতুবন্ধনের গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। মধুমঙ্গল বসু

এবার একটু বিব্রত বোধ করছিল। তারপর বললো, "ওই ১৯৮৬ সালে প্যারিসে এসে জিসেলের অতিথি হিসেবে আমি এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেলাম। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ। কোনও কিছুর স্বপ্ন দেখা তো ট্যাক্সিড্রাইভারের পক্ষে অনুচিত।"

না, মধুমঙ্গলকে কিছু দাবি করতে হয়নি, ট্যাক্সিওয়ালার মতন প্রাপ্য চাইতেও হয়নি প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে। সময় হলে, ভাগ্যে থাকলে এখনও না-চাহিতে তারে পাওয়া যায়। কলকাতার বিজয়গড় কলোনির মধুমঙ্গল বসুকে প্রেম ও পরিণয়ের ইঙ্গিত ডাকসাইটে ফরাসি আন্তর্জাতিক কোম্পানির অফিসার জিসেলই দিয়েছিল। তারপর যথাসময়ে বিবাহ। মধুমঙ্গলের সন্ধানে জিসেল আরও কয়েকবার কলকাতায় এসেছে, উদ্বাস্তু কলোনির কঠিন জীবনযাত্রার অংশীদার হয়েছে সে। ইতিমধ্যে আর্টের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে মধুমঙ্গল বসুর। তারপর ট্যাক্সি মিটারের চারধার লালশালুতে চিরদিনের জন্যে মুড়ে দিয়ে ১৯৮৮ সাল থেকে প্যারিস-প্রবাসী হয়েছে আমাদের মধুমঙ্গল।

লাজুক মধুমঙ্গল আমাকে বললো, "জীবনের কাছে এমন প্রত্যাশা ছিল না, শংকরদা। এখন আমি ফুলটাইম আর্টিস্ট। সারাক্ষণ ছবি আঁকি, ছবির এগজিবিশনের জন্যে ফ্রান্সের ছোটবড় নানা জায়গাতেই ঘুরে বেড়াই। যাকে বিখ্যাত বলা যায় এমন লোক এখনও নই শংকরদা। আমি চেষ্টা করছি। নতুন কিছু করে নিজের কাছে নিজের মুখরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছি, শংকরদা। এখনও তেমন কিছু হয়নি, আমি নিজের পায়ে এই বিদেশে দাঁড়িয়ে আছি এই পর্যন্ত।"

প্যারিসের প্রবাসে মধুমঙ্গলের মতন মানুষকে আবিষ্কার করতে পেরে আমার ভীষণ ভাল লাগলো। মধুমঙ্গল যে একদিন বিখ্যাত হয়ে উঠবে এবং খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করবে এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমাদের কলকাতায় ফিরে এসে মধুমঙ্গল যদি কয়েকদিনের জন্যে একখানা হলুদ-কালো মিটার-ট্যাক্সি চালায় তাহলে কলকাতার ট্যাক্সির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং অনেক নিরাশ ভগ্নহৃদয় বাঙালি তাদের জীবনসংগ্রাম পূর্ণ উদ্যমে চালিয়ে যাবার উৎসাহ পাবে।

শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আমার অনেকদিনের পরিচিত। শিল্পী-মাত্রেরই প্যারিস সম্বন্ধে প্রচণ্ড দুর্বলতা থাকে। এঁদের অনেকেই এই নগরীকে তাদের দ্বিতীয় বাসস্থান মনে করেন। কলকাতা ছাড়বার আগে প্লেন ফেল হয়ে যাবার ভয়ে একরাত্রি আমাকে কলকাতার এয়ারপোর্ট হোটেলে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। দেশত্যাগী হবার আগে সেখানে শেষ যে চিঠিটা পেয়েছিলাম সেটা শুভাপ্রসন্নর। শুভাপ্রসন্ন মধুমঙ্গলের কথা বলেননি। কিন্তু বলেছিলেন, অন্য অনেক শহর শিল্পীকে সম্মান করে, কিন্তু একমাত্র প্যারিসই তাকে সীমাহীন প্রশ্রয় দেয়!

এই বৈশ্যতন্ত্রী-যুগে সর্বত্র যখন অর্থ ও ব্যবসায়িক সাফল্যের স্তুতি, প্যারিস তখনও বিজনেস এগজিকিউটিভকে খাতির করার মাঝে-মাঝে শিল্পীকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। প্যারিসে তাই শিল্পীর জন্যে স্পেশাল বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা। এতো কম খরচে এই ছোট বাড়িগুলো কর্তৃপক্ষ শিল্পীদের হাতে তুলে দেন, যা এ-যুগে অকল্পনীয়।

প্যারিসে একজন ভদ্রলোক বললেন, "নামকরা আর্টিস্টের নামকরা ছবি নিয়ে মাতামাতি করার শহর দুনিয়ায় অনেক পাবেন, কিন্তু কেউ আর্টকে জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে পারেনি। শুনুন, প্যারিসের আর এক কানুনের কথা। নতুন কোনও ফ্ল্যাটবাড়িতে যদি প্রচণ্ড ট্যাক্সো না দিতে চাও তা হলে প্রবেশপথে একটু আর্টকর্মের ব্যবস্থা করো! ফলে নতুন কোন শিল্পীর টুপাইস হলেও শহরটা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠলো।" এসব কথা কলকাতার কর্তাব্যক্তিদের কানে তুলে লাভ নেই। এঁরা নিজের অজান্তেই আর্ট ও আর্টিস্টের সঙ্গে হুন্দের মতন ব্যবহার করেন। এতো জঘন্য শিল্পকর্মকে এঁরা গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতায় হাজির করেছেন যে, রসিক লোককে আইলোশন লাগাতে হয় পনেরো মিনিট অন্তর। ইদানীং কিন্তু ঠোঁটের ভদ্রতা হচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ তেমন দেখা যাচ্ছে না। কলকাতায় যত ফ্ল্যাটবাড়ি হুড়মুড় করে উঠছে তার লাগোয়া যদি একটা আর্টের প্রদর্শন থাকতো তা হলে শহরটা কেমন হয়ে উঠতো একবার ভাবুন।

ফরাসি যে আর্টের প্রকৃত ভক্ত তার অন্য এক প্রমাণ প্যারিসে পেলুম। শুনলাম, বাস্তিল ধ্বংস ও ফরাসি বিপ্লবের প্রাণান্তকর বছরগুলিতে জীবনযাত্রা

ভয়ানকভাবে ব্যাহত হয়েছে, মানুষও বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু যা একবারও বন্ধ থাকেনি তা হলো শহরের বাৎসরিক আর্ট প্রদর্শনী। কিছু শিল্পীর মাথা গিলোটিনে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু তা তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে, খারাপ ছবি আঁকার জন্যে নয়। যত দুর্যোগই হোক, আমরা যেমন দুর্গাপূজা কালীপূজা বন্ধ রাখার কথা ভাবতে পারি না, প্যারিসের লোকের পক্ষে ছবির ব্যাপারে মাতোয়ারা না হওয়া তেমন চরম দুর্গতির দিনেও অসম্ভব।

বাঙালিকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চারুকলার সঙ্গে তার যোগাযোগ কখনই উষ্ণ হয়নি, ব্যাপারটা এখনও বড়লোকের বিলাস হয়ে রয়েছে। চিরকাল গরিবরাই যে যত মস্ত আর্টিস্ট হয়েছে তা আমাদের সাধারণ মানুষের খেয়াল থাকে না। চিত্রকে এড়িয়ে এই যে আমরা মারদাঙ্গা চলচ্চিত্রের অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠলাম এটা আমাদের ঐতিহাসিক দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

কলকাতা সম্বন্ধে বলা চলে, ফুটবলের ব্যাপারটা যার দখলে শহরটাও তার দখলে। তাই গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতা তার যথাসর্বস্ব নিয়োগ করেছে তিনটে ঢাউস সাইজের স্টেডিয়াম তৈরিতে, কিন্তু আর্টের পিছনে ঢালেনি একটি পয়সাও। না তৈরি হয়েছে পাতে দেওয়ার মতন আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার হল বা গ্রন্থাগার।

প্যারিসে একটা কথা শুনে মজা লাগলো, যে আর্ট কন্ট্রোল করে সে প্যারিসও কন্ট্রোল করে। কথাটা যে অতিশয়োক্তি নয় তার প্রমাণও দেওয়া যায় হাতে-হাতে। অন্য দেশে যখন বিক্ষোভ বা বিপ্লব হয় তখন জনসাধারণ পোস্টাপিস, টেলিফোন ভবন, বেতারকেন্দ্র ইত্যাদি দখলের চেষ্টা করে। ১৯৬৮ সালে পাঁচ লক্ষ ফরাসি ছাত্র ও শ্রমিক যখন সরকারের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে দ্য গ্যলের অবস্থা কাহিল করে তুললো তখন তারা ওই সব দখল করলো না—তারা দখল করলো নাট্যশালা, অপেরাকেন্দ্র, ডান্স হল, আর্ট মিউজিয়াম ইত্যাদি। বিক্ষোভ জানানোর সময়েও ফরাসি যে দুনিয়া থেকে আলাদা তা বুঝতে হলে প্যারিসে অন্তত একবার আসা প্রয়োজন।

ফরাসি আর্ট-প্রীতির আর এক প্রমাণ পিকাসো মিউজিয়াম ও তার অমূল্য সংগ্রহ। অন্য দেশ বহু চেষ্টায় গাঁটের কড়ি খরচ করে পিকাসো সংগ্রহ গড়ে তুলেছে, আর ফরাসি পিকাসোর মৃত্যুর পরে ডেথ ডিউটি হিসাবে আদায় করেছে সেই সব ছবি যা ওই শিল্পী জীবিতকালে বিক্রি করেননি, রেখেছিলেন নিজের জন্যে। অর্থাৎ পিকাসো যেসব সৃষ্টি প্রাণ থাকতে হাতছাড়া করেননি তা দেখতে হলে প্যারিস ছাড়া গতি নেই।

এই সব গল্প যাঁদের কাছে সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে আছেন পাঁচুদা ও জ্যাক গোর্দন সায়েব।

ফরাসি জ্যাক গোর্দনের চরিত্রটি আকর্ষণীয়। প্যারিসে পদার্পণ করেই এই মানুষটির খোঁজ করেছি আমি। এই ভদ্রলোক ছাপাখানার মালিক। এই ছাপাখানার বিশেষত্ব এখানে ছবি ছাপানো হয়, যার নাম লিথোগ্রাফি। ১৯৭৩ সালে একজন ভারতীয় ছাত্র ওঁকে ধরাধরি করেছিল যে-কোনও একটা চাকরির জন্যে। ছাত্রটি কিছু উপার্জন করে নিজের পড়াশোনা চলিয়ে যেতে চায়। পড়ার সঙ্গে কাজ, অথবা কাজের সঙ্গে পড়া ব্যাপারটা আতলান্তিকের ওপারে ডাল-ভাত হলেও ফরাসি দেশে তেমন জনপ্রিয় নয়।

জ্যাক গোর্দন অনুরোধ ঠেলতে না পেরে এই ছাত্রটিকে চাকরি দিলেন নিজের ছাপাখানায়। কাজ সুইপারের এবং জমাদার হিসাবে দৈনিক মজুরি পঁচিশ ফ্রাঁ—যার থেকে কম মাইনে দেওয়া ফরাসি দেশে প্রায় অসম্ভব। এই সুইপারের কাজ হলো: ছাপাখানার মেঝে পরিষ্কার করে যত জঞ্জাল আছে সংগ্রহ করে একটা ঠেলায় চড়িয়ে রাস্তার মোড়ে জঞ্জাল গাড়িতে তুলে দেওয়া।

এই ছাত্রটিই আমাদের সম্বিৎ সেনগুপ্ত তা পাঠককে বলে দেবার প্রয়োজন নেই। ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়েই সম্বিৎ এই সুইপার জীবনের কথা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিল। আমার মনে আছে, সম্বিতের খুব কষ্ট হলেও কোনও উপায় ছিল না। এই সঙ্গে রয়েছে একটি স্মৃতি। ফরাসি প্রেসিডেন্টের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে একদিন জঞ্জালগাড়ি আসবে না তা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেদিন সম্বিৎকে জঞ্জাল নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয়নি। তবে যেদিন ফরাসি প্রেসিডেন্ট মারা গেলেন সেদিন দুড়ুম করে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেলো না। ফরাসি এ-ব্যাপারে ভীষণ হুঁশিয়ার, ইচ্ছে হলেই দোকানপাট কলকারখানা বন্ধ করে বাড়ি যাওয়া যায় না। শিল্পযুগের মানসিকতা ওখানে জাঁকিয়ে বসেছে, আমাদের মতন কথায়-কথায় ছুটি চাওয়া ও পাওয়ার স্কুলের ছাত্র-মানসিকতা ওখান থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে।

ছাপাখনার সেই সুইপার নিজের সাধনায় অসম্ভবকে সম্ভব করে এখন বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়েছে, নিজের জন্যে সৃষ্টি করেছে জগৎজোড়া খ্যাতি। সামান্য কয়েক বছরের পরিশ্রম ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে।

সম্বিৎ কিন্তু কোনওরকম অভিমান ও অভিযোগ রাখেনি মনে, যদিও অনেকের ধারণা, ফরাসি ছাপাখানার মালিক তাকে অত্যন্ত কম পয়সায় শোষণ করেছেন, সম্বিৎ বলে, "গোর্দন সায়েবের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম : তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে কাজটি দিয়েছেন এমন সময় যখন আমার কাজ ছাড়া চলছিল না। দ্বিতীয় : মানুষটির কাছ থেকে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার পেয়েছি। এবং যথাসময়ে তিনি আমার দু-একটা ছবি বিক্রি করে বিদেশে

দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের সুবিধে করে দিয়েছেন। ফরাসি দেশে সুইপারেরও আর্টিস্ট হবার বাধা নেই। তৃতীয় : ওঁর ওখানে লিথোগ্রাফির কাজে হাত পাকাবার সুযোগ পাই। এই অমূল্য অভিজ্ঞতা আমার পরবর্তী প্রফেশনাল জীবনে খুব কাজে লেগেছে।"

কোম্পানির জমাদার হঠাৎ বিরাট সাফল্য অর্জন করে কেষ্টবিষ্টু হলে পুরনো মালিকের মনোভাব কেমন হয়? জানবার লোভ হলো আমার।

সম্বিৎ বললো, "সম্পর্ক বেশ মধুর আছে, শংকরদা। আমি এখনও যোগাযোগ রাখি, আর উনিও খুব খুশি যে, তাঁর একজন দিনমজুর কর্মচারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। তবে সম্পর্কের একটা স্বাভাবিকতা রয়েছে, উনিও গদগদ নন, আমিও ব্যাপারটা ভুলে যাবার জন্যে ব্যস্ত নই।"

এই জ্যাক গোর্দন সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মন আনচান করছে আমার। বিশেষ অসুবিধা হলো না।

সম্বিতের প্যারিস-সংসারটি ছড়ানো-ছেটানো। এক জায়গায় বিরাট অফিস তিনতলা জুড়ে। আর এক জায়গায় বাসা। ওই রাস্তার সামনেই সে দুটো ফ্ল্যাট কিনেছে—এখন সেটি বাসযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। আর আছে একটি স্টুডিও। এই ফ্ল্যাটটি চমৎকার। নিজের ব্যবসার চাপ ভুলে সম্বিৎ এখানে চলে আসে নিজেকে শিল্পসাধনায় ব্যস্ত রাখতে। এখানে অনেক সময় সারারাত ধরে ছবি আঁকে সম্বিৎ—বিশ্বভুবনের সঙ্গে তখন তার কোনও যোগসূত্র থাকে না। ছবি আঁকাটাই ওর আদি ধর্ম—ওর থেকে দূরে সরে আসা ওর পক্ষে পীড়াদায়ক হবে। একটা সুবিধে, এই চারটি কেন্দ্রই খুব কাছাকাছি, ১৪ নম্বর আরোঁদিসমের মধ্যে—প্রয়োজনে পায়ে হাঁটা যায়, প্যারিসের লোকেরা যাকে রসিকতা করে বলে বাস নাম্বার ইলেভেন!"

এই স্টুডিওতেই একদিন সকালে জ্যাক গোর্দন সায়েব উপস্থিত হলেন তাঁর পুরনো সুইপার কর্মচারীর খোঁজখবর করতে।

না, জ্যাক গোর্দন সংসারযাত্রায় তেমন সফল হতে পারেননি। বরং কিছুটা ব্যর্থতা এসেছে যে-ছাপাখানার মালিক ছিলেন সেটি চালানো সম্ভব হয়নি। ফলে জ্যাক গোর্দন এখন তাঁর দ্বিতীয় জীবিকাটিকে প্রথম পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি এখন আর্ট ডিলার বা চিত্র-ব্যবসায়ী।

ফরাসি জাতের সারল্য সম্পর্কে ইংরেজরা যতই তির্যক মন্তব্য করুক, এঁদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা সহজেই অন্যকে আপন করে নেয়। সমস্ত দূরত্ব ঘুচে যায়, যদি-না ফরাসি কাউকে সন্দেহ করে বসে। ফরাসি স্বভাবতই ইংরেজ ও জার্মানকে সন্দেহের চোখে দেখে—একজন তার জমি কেড়ে নেয়, আর একজন তার ব্যবসা কেড়ে নেয়। দুনিয়ার যে-প্রান্তেই ফরাসি গিয়েছে সেখানেই ইংরেজ

হাজির হয়েছে বাড়াভাতে ছাই দিতে। ফরাসিও তাল বুঝে উল্টো আক্রমণ চালিয়েছে। কখনও-কখনও মজার কথা শোনা যায়। যেমন এবার শুনলাম, "ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজরা ফরাসিকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু ইতিহাসে লেখা থাকবে ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক থেকে ফরাসি পতাকা বেশিদিন উড়েছে ভারতবর্ষে। ইউনিয়ন জ্যাক নেমেছে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭, আর চন্দননগরে ফরাসি পতাকা উড়েছে আরও কয়েক বছর। ইংরেজকে পালাতে হয়েছে অবস্থার চাপে পড়ে, ফরাসি ব্যবস্থা করেছে গণভোটের। যখন চন্দননগর ও পণ্ডিচেরির লোকেরা ভোটের বাক্সে নিজের ইচ্ছে প্রতিফলিত করেছে তখন ফরাসি সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে।

গোর্দন সায়েবটি বেশ ফিটফাট। সাধারণ উচ্চতা। দেখলে বিশ্বাস হয় না, বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই করছে।

গোর্দন সায়েব প্রথমে সম্বিতের আঁকা কয়েকখানা অয়েল ছবি মন দিয়ে দেখলেন। কাছ থেকে দেখলেন, দূর থেকে দেখলেন, কম আলোয় দেখলেন, সুইচ টিপে বেশি আলোয় দেখলেন। আর্ট ডিলারের ছবি দেখা অনেকটা আমাদের দেশের পাঁচ ছেলের মায়ের মেয়ে দেখার মতন। সম্ভব হলে, ছবির চরিত্রটিকে খালি পায়ে হাঁটতে বলবে আর্ট ডিলার! কয়েকটা ছবি গোর্দন সায়েবের মনে ধরলো মনে হচ্ছে। কারণ ফরাসি ভাষায় কী এক প্রস্তাব রাখলেন সম্বিতের কাছে। সম্বিৎ যা বললো তার অর্থ, স্বদেশে একটা প্রদর্শনী করার শখ অনেকদিনের। সেই জন্যে রাত জেগে সে কাজ করে যাচ্ছে, এই সব ছবি নিয়ে একবার কলকাতায় যেতে হবে, সম্ভব হলে বোম্বাই।

গোর্দন সায়েব বললেন, "দেশে যাবার জন্যে যদি মন হু হু করে থাকে তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু এই ছবি বেচবার জন্যে সম্বিতের প্যারিস ছাড়বার কোনও প্রয়োজন নেই।"

গোর্দন সায়েব আমাকে বললেন, "শুনেছি আপনার দেশের শিল্পীরা মাঝে-মাঝে এগজিবিশন করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই প্যারিস শহরে অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা ওসব হাঙ্গামায় কখনও যান না, কিন্তু তাঁদের ছবি বিক্রির বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। আর্ট গ্যালারির প্রতিনিধিরা আসেন নিয়মিত, পছন্দসই দাম দিয়ে তাঁরা ছবি নিয়ে চলে যান।"

গোর্দন সায়েব আমাদের গাড়ি চড়ালেন। তিনি সবে একটি নতুন গাড়ি কিনেছেন। সেটি খুশি মনে প্রাক্তন সুইপারকে দেখালেন, যে এখন মার্সেডিজ বেঞ্জ চড়ে। দু'জনে মিলে নতুন গাড়িটিকে নববধূর মতন কদর করলো, তারপর এদিক-ওদিক খুলে গাড়ির নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ হলো। গাড়িটি ফরাসি হলেও চড়ে বেশ সুখ।

গোর্দন সায়েব চমৎকার ড্রাইভ করেন। গাড়ি পশ্চিমের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মনে হয় যেন হাজার-হাজার বছর ধরে অটোমোবাইলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ইউরোপের, আমেরিকার। ফরাসি গাড়ির নিন্দেয় যাঁরা সবচেয়ে মুখর তাঁরা প্রায় সবাই ফরাসি। আত্মনিপীড়নে ফরাসির একমাত্র জুটি হবার ক্ষমতা রাখে বাঙালিরা—তারা নিজেদের মধ্যে আশাপ্রদ কিছুই দেখতে পায় না। আত্মনিগ্রহে ও আত্মসমালোচনা যে এক জিনিস নয় এবং একডোজ আত্মবিশ্বাস বুকের মধ্যে না-থাকলে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া যে কঠিন কাজ তা আমরা কবে বুঝবো গো, কবে?

সরু-সরু রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। পছন্দসই একটা দোকানের কাছাকাছি এসে গোর্দন সায়েব তাঁর গাড়িটাকে ফুটপাতের ওপর তুলে দিলেন।

না, ওই অবস্থায় গাড়ি ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। কাছেই একটা পার্কিং যন্ত্র রয়েছে। শুনলাম, ইউরোপের মধ্যে প্যারিসের নাগরিকরাই গাড়ি রাখার জন্যে রাস্তা ভাড়া দিতে সবচেয়ে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। যত রকমভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব, তা দিয়েছে। এমনকি জাল মুদ্রা ঢুকিয়ে মেশিনের বারোটাও বাজানো হয়েছে। পার্কিং লটের যন্ত্র ধ্বংস করে ফরাসি তার বিদ্রোহী মনোভাবকে সুড়সুড়ি দিয়েছে। কিন্তু সময় নিষ্ঠুরভাবে তার খেলা দেখিয়ে চলেছে। বুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত ইত্যাদির হাত থেকে বসুন্ধরা যাদের হাতে চলে যাচ্ছে তাদের আন্তর্জাতিক নাম Yuppi। এই ভাগ্যবান তরুণদলের ফরাসি সংস্করণ হল BCBG যার উচ্চারণ নাকি বেসেবেজে। এই উঠতি আন্তর্জাতিক তরুণদল পার্কিং লটে দুটো ফ্রাঁ খরচা করতে মোটেই অরাজি নয়। সুযোগ বুঝে প্যারিসের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনও গেঁড়ে বসছেন, যেখানে খুশি ঝটপট ওই যন্ত্র বসাচ্ছে, যদিও একদল তরুণ-তরুণী ওই যন্ত্রকে কলা দেখানোর জন্যে নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন।

আমরা একটি ছোট্ট কফির দোকানের চত্বরে এসে বসলাম। সত্যিকারের সূর্য পূজারির জাত এই ফরাসি, যদিও আমাদের মতন ওঁং জবাকুসুম...ইত্যাদি অংভং করে না। হাতের গোড়ায় সূর্য পেলে ফরাসি রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে আসতে রাজি। আমাদের দেশের মতন অঢেল সূর্যালোক পেলে ফরাসি বর্তে যেতো এবং তার পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতো। ফরাসির আর এক দুঃখ, বর্ষাকাল বলে খাতায়কলমে কোনও ঋতু নেই। সব ঋতুর মধ্যেই বোধ হয় বর্ষা একটু গোঁজা আছে—কিন্তু তাকে কোনও রাজত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে ফরাসির কাব্যে ও গানে বর্ষার কি গতি হয়েছে কে জানে? দেশের ভাষা না জেনে কোনও দেশে আসবার দুর্মতি হলে এই দুর্গতি হয়, কিছুতেই জাতের মর্মস্থলে

প্রবেশ করা যায় না।

কফির কাপ সামনে রেখে গোর্দন সায়েবের জীবনকাহিনী শোনা গেলো। ওঁর পড়াশোনা বেশিদূর নয়, ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। তারপর শুরু হয়েছে কর্মজীবন এক অফসেট ছাপাখানায়। এখানেই এক দুর্ঘটনায় আঙুল কেটে যায়, ফলে অফসেট প্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। ছোটবেলা থেকে ছবিতে আগ্রহ ছিল, তাই কাটা আঙুলের কথা ভেবে লিথোগ্রাফিক প্রেসের দিকে নজর পড়লো। এখানেও প্রথমে অন্য এক মালিকের কর্মচারী হিসাবে এবং পরে নিজেই মালিক হিসাবে। লিথোগ্রাফিতে প্যারিসের সুনাম সারা দুনিয়ায়। অরিজিন্যাল লিথোগ্রাফিক ছবির দাম দুনিয়ার হাটে বেশ। ১৭৫ কপির বেশি কখনও ছাপা হয় না। অনেক সময় শিল্পী নিজে প্রত্যেকটা ছবি আলাদা-আলাদা সই করে দেন।

গোর্দন সায়েবের ছাপাখানায় তাঁদের ছবির লিথোগ্রাফির তদারকি করতে কারা আসতেন শুনুন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং পিকাসো। আর আসতেন দালি ও জঁ ককতো। পিকাসোর এক একখানা লিথোগ্রাফিক ছবির দাম তখনই ছিল এক লাখ থেকে দেড় লাখ ফ্রাঁ। এঁরা নিজেরা কারখানায় বসে ছাপার তদারকি করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। একটা ছবির জন্যে চৌদ্দখানা পর্যন্ত প্লেট তৈরি করতে হতো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে।

শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় থেকে ছবির ব্যবসা শুরু ও সেই সঙ্গে লিথোগ্রাফি ছবির প্রকাশনা। আতেলিয়ো গোর্দনের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো অসলে, এথেন্স, ক্যালিফোর্নিয়া ও টোকিওতে। আর একজন বিখ্যাত শিল্পী টোনি আগস্তিনোর সঙ্গে গোর্দন সায়েবের নিবিড় পরিচয় হয় এবং এঁর ছেলে যথাসময়ে গোর্দনের ব্যবসার পার্টনার হন।

গোর্দন সায়েব ছবির ব্যবসার ভিতরকার খবরাখবর দিলেন। অনেক সময় গ্যালারির মালিক দাম দিয়ে ছবি কিনে নেন এবং পরে বাজার বুঝে নিজের সুবিধেমতন দাম ঠিক করে বিক্রি করেন। মাঝে-মাঝে স্রেফ ছবি রাখা হয় শিল্পীর অ্যাকাউন্টে—৫ থেকে ৫০ পার্সেন্ট কমিশনে পাওয়া যায় পরিস্থিতি অনুযায়ী। আর্ট ব্যবসায়ীদের মধ্যে নানা ধরনের স্পেশালাইজেশন আছে, এক একজন একটা বিষয়ে মাথা ঘামায়। গোর্দন সায়েবের কোম্পানির কাজ-কারবার জীবিত ফরাসি শিল্পীদের নিয়ে। ওঁর একজন শিল্পী ব্রায়ার—এঁর তেলরং ছবির দাম তিন লাখ ফ্রাঁয়ের মতন। সম্প্রতি ইনি দেহরক্ষা করায় গোর্দন সায়েব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর একজন শিল্পী—মন্তর। এঁর ছবির দাম ব্রায়ানের থেকে বেশি সাড়ে তিন লাখের মতন। জলরং ছবির দাম স্বভাবতই কম—ব্রায়ান পাওয়া যায় দেড় লাখে। ওয়াটার ও অয়েল মিলিয়ে মার্সেল মুলি যে কাজ করেন তার দাম এক লাখ। অনেক শিল্পী যত ছবি আঁকেন সব একটা গ্যালারিতে দিয়ে যান। যেমন

জঁ ক্রোদ পিকো। এঁর ছবি বিক্রি হয় ২৫০০০ ফ্রাঁতে।

যখন খারাপ সময় আসে তখন একলা আসে না। গোর্দন সায়েব জানালেন, ব্রায়ান যেদিন মারা গেলেন তার পরের দিন দেহরক্ষা করলেন টোনি আগস্তিনো।

গোর্দন সায়েবের দোকানের ছবির খরিদ্দার অনেকেই ফরাসি। জাপানিরা ইদানীং লিথোর ভক্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্পী কিকোমোতির লিথো এক সময় ভাল বিক্রি হতো। অন্য ভারতীয় বা বাঙালিদের তেমন বাজার নেই, মনে হলো। মোতির পুরো নাম কাইকোবাদ মোতিওয়ালা। সলিলদার কাছে শুনেছি, স্বাধীনতার কিছু আগে কিকো লন্ডনে আসেন। ওখান থেকে প্যারিসে—সেখানে বিখ্যাত ভাস্কর জাদ্‌কিনের সঙ্গে পরিচয় হয়। জাদ্‌কিন ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন ইংরেজ এচিং ও এনগ্রেভিং শিল্পী হেইটারের সঙ্গে। পয়সার অভাবে তিনি হেইটারের স্টুডিওতে কয়েক মাসের বেশি কাজ করতে পারেননি। পরে হেইটটার ওঁকে মনিটার হিসেবে ফিরিয়ে আনেন। এনগ্রেভিং-এর একটা প্লেট থেকে বহু রঙের প্রিন্ট করার পদ্ধতি কিকোর আবিষ্কার বলে শোনা যায়। পরে কিকোর সেঙ্গে হেইটারের মতবিরোধ ঘটে এবং কিকো আলাদা হয়ে গিয়ে নিজের স্টুডিও খোলেন, এ-কথাও শুনেছি সলিলদার কাছ থেকে।

প্যারিসের আর্টিস্ট-প্রীতির আর একটা গল্প সলিলদার কাছে শুনেছি। ওখানে আর্টিস্টকে সস্তায় লাঞ্চ ও ডিনার খাওয়ানোর জন্যে স্পেশাল রেস্তোরাঁ আছে। ওইসব জায়গায় ইচ্ছে করলেই ঢোকা যায় না। একজন খদ্দের শিল্পী বা আঁতালেকচুয়াল কিনা তার প্রমাণ দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করাতে হবে। এঁদের বাঁধা খদ্দের প্যারিসের বাউণ্ডুলে সমাজের লেখক ও শিল্পীরা। সলিলদা বলেছিলেন, প্রয়োজনে ওখানে ধারেও খাওয়া যায়, অন্তত সলিলদা যখন গিয়েছিলেন তখন ওঁর হোস্টের পকেটে পয়সা ছিল না, ধারেই খাইয়েছিলেন এবং তা নিয়ে ম্যানেজার বা ওয়েটার মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি। সলিলদার হোস্ট সেদিন শুধু ধারে খাওয়াননি, পরিচালিকাদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে, কারও গালটিপে, কাউকে আলিঙ্গন করে, যথেচ্ছভাবে চুম্বন ছড়িয়েছিলেন।

গোর্দন সায়েব আমাকে জানালেন, ছবির বাজারে তিনি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, অনেক রুইকাতলা আছেন তাঁর লাইনে। যেমন এতিয়েল সাসি, ম্যালাঙ্গ, গিলিয়ে। গোর্দন সায়েব বললেন, "সাড়ে তেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে ছবির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। ছবি আঁকতে যে জানি না তা নয়। কিন্তু আমি ওদিকে মন দিইনি। আর্টিস্টদের সঙ্গে মিশে, ছবি বিক্রি করেই আমার সুখ।"

গোর্দন সায়েব আর এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, "একটা ভরসার কথা, সমকালীন শিল্পীদের বাজারদর বেড়েই চলেছে।"

আর একটু ভুল ভাঙলেন গোর্দন সায়েব। ট্যুরিস্টরা তেমন ছবি কেনে না।

কিছু লোক আসেন স্রেফ ছবি কিনতে। তাঁরা সব খবরাখবর রাখেন এবং গোর্দন সায়েবের অফিসে যোগাযোগ করেন ফরাসি স্টাইলের ইমপ্রেসনিস্ট, এক্সপ্রেসনিস্ট, কিউবিক ও সুররিয়ালিস্ট ছবির জন্যে।

গোর্দন সায়েব জানালেন, ফরাসি দেশে শিল্পীকে কাফেতে যতখানি কুঁড়ে ও গা-এলিয়ে-দেওয়া মনে হয় এঁরা ততখানি নন। বছরে শতখানেক ছবি নামানো প্যারিসের শিল্পীদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। পিকো তো গোর্দন সায়েবকে বছরে অন্তত একশখানা ছবি সাপ্লাই করেন।

গোর্দন সায়েব বললেন "জাপানিরা এখন ছবির বড় খরিদ্দার হয়ে উঠছেন, কিন্তু আমেরিকা এখনও ছবির সেরা বাজার, বিশেষ করে নিউইয়র্ক। তবে ওখানে নাক-উঁচু সব শিল্পীরা বেশি দাম পাচ্ছেন। আমেরিকানরা ছবি কেনে খবরের কাগজের প্রচার দেখে, আর রসিক ফরাসি ছবি কেনে আঁকার গুণ দেখে।"

আমি জানতে চাইলাম, ছবির শিল্পীদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন কী করে?

গোর্দন সায়েব বললেন, 'এই বিজনেস অন্য দশটা ব্যবসার মতন নয়। শিল্পীরা ভীষণ স্পর্শকাতর। প্রতিদিনই কারুর না কারুর সঙ্গে ডিনারে অথবা ড্রিঙ্কে বসতে হয়। ওই সময় আর্ট মহলের নানা খবরাখবর পাওয়া যায়—কে ভাল কাজ করছে, কে ডুবে গিয়ে প্যারিস ছেড়ে পালাচ্ছে, কে পুরাতনের স্থান দখল করবার দুর্জয় বাসনা নিয়ে প্যারিসে নতুন হাজির হয়েছে।'

শহরে শিল্পীদের আসা যাওয়া লেগেই আছে এবং সেই সঙ্গে উত্থানপতন। তবে ফরাসি ঠেকে বুঝেছে, কোনও প্রতিভাবানকে সে আর না খেয়ে মরতে দেবে না। দুনিয়ার সব শিল্পীও জেনে গিয়েছে উত্থান-পতন যাই হোক প্যারিসই শিল্পীদের মহাতীর্থ।

জ্যাক গোর্দন অবশেষে ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "শিল্পীদের গল্প শুরু করলে এখানে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমাকে এখন যেতে হবে এক শিল্পীর কাছে। ওঁকে কিছু আগাম দিয়ে আসার কথা আছে সকাল সাড়ে এগারোটার মধ্যে। ভদ্রলোক আমার জন্যে একটা কাফেতে বসে থাকবেন। সঙ্গে কয়েকটা ছবিও থাকবে। আমি এবার চলি, না-হলে ওই লোকটা ভাববে আমার কথার ঠিক নেই। তুমি শুধু লিখো, তুলিতে ও রঙে যতই বেপরোয়াভাব থাক, প্যারিসের শিল্পীরা তাদের আর্টডিলারের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশই বিজনেসলাইক হয়ে উঠছেন। পনেরো মিনিটের বেশি দেরি করলে আমার বিজনেস হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।"

জ্যাক গোর্দন শুনলেন না। কাফেতে বিলটা ওঁর ছাপাখানার ভূতপূর্ব সুইপারকে দিতে দিলেন না। বিল চুকোতে-চুকোতে জ্যাক গোর্দন বললেন,"এই যে আমার ছাপাখানা উঠে গিয়েছে তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। আর্টের

বিজনেসে টাকা আছে, আর বাড়তি আছে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ, শিল্পের সঙ্গে সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকার রোমাঞ্চ। দুনিয়ার অন্য কোনও পেশা তোমাকে এই সুযোগ দেবে না। আমাকে কোটি টাকা দিলেও আমি আর ব্যবসা পাল্টাচ্ছি না।"

কাফে থেকে উঠে পড়ে সম্বিতের পুরনো মনিব মঁশিয়ে জ্যাক গোর্দন এবার তাঁর নতুন কেনা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

জাত শিল্পীকে ফরাসি যে প্রশ্রয় দেয় সে তো দুনিয়ার জানা কথা। কিন্তু আর্টিস্টের পরে কে?

এই প্রশ্নটা আমার মনে সুড়সুড় করছে। রাজনীতিবিদকে? মোটেই নয়। যারা ফরাসি গদিতে বসেছে তাদের মাথায় তুলতেও যতক্ষণ, তাদের মাথাটা নামিয়ে দিতেও ততক্ষণ। ফরাসি এখনও শাসককে সন্দেহের চোখে দেখে—সে নেপোলিয়নই হোক আর দ্য গ্যলই হোক।

পাঁচুদা বললেন, "আমি এদের ইতিহাস-টিতিহাস তেমন হজম করে উঠতে পারিনি, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে প্যারিসে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নামে একটা রাস্তাও নেই! বিশ্বাস হচ্ছিল না।" প্যারিসের গাইডবুক আনা হলো, ওখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সত্যিই অনুপস্থিত, যেমন অনুপস্থিত নতুন ফ্রান্সের জনক দ্য গ্যল, অথবা রাষ্ট্রপতি পম্পিদু।

এই একটা ব্যাপারে ইণ্ডিয়ার লোকদের কিছু শেখার আছে। রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে রাস্তা করা ফরাসি রুচিতে বাধে, যদিও অন্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে রাস্তা করতে ফরাসির আপত্তি নেই—তাই রাস্তা আছে জর্জ ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, ফ্রাঙ্কলিন, রুজভেল্ট, চার্চিল ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নাম। আর আছে অভূতপূর্ব ইতিহাসচেতনা—ফরাসি দেশের অনেক শহরেই একটি রাস্তার নাম ১১ নভেম্বর ১৯১৮। ঐদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হওয়ায় দুনিয়ার অন্য অনেক জাতের সঙ্গে ফরাসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল।

শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা ও দার্শনিকের নামে রাস্তা করতে প্যারিস অবশ্য সারাক্ষণ উঁচিয়ে আছে। ইবসেন থেকে বালজাক পর্যন্ত কেউ বাদ যাননি। লর্ড বায়রনের নামে রাস্তা আছে অথচ উইলিয়ম শেক্সপিয়রকে কোনও এক অজ্ঞাত

কারণে ফরাসি এখনও জাতে তোলেনি। দার্শনিক কার্ল মার্ক্স-এর নামাঙ্কিত রাস্তা রয়েছে, কিন্তু লেনিন ও স্তালিন ঢুকেছেন পিছনের দরজা দিয়ে, এঁদের নামে রাস্তা না থাকলেও স্তালিনগ্রাদ ও লেনিনগ্রাদ নামে রাস্তা আছে। ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী।

পাঁচুদা বললেন, "মুখুজ্যের মন অতি জটিল! তুই রাস্তার তালিকা দেখে একটা জাতের মনোবিশ্লেষণ করছিস! তবে বলে রাখি, এরা রাষ্ট্রপ্রধানদের হাস্যকর ডাকনাম দিয়ে স্বস্তি পায়। এক ফরাসি প্রেসিডেন্টের নাম ছিল 'পুপু' যা অনেকটা 'দুচ্ছাই'-এর মতন! প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বলা হতো 'পুরনো আলু' কেন আমি জানি না। ইতিহাসের আদি যুগ থেকে প্রত্যেক সম্রাট বা রাষ্ট্রপতির অন্তত একজন মন্ত্রী ছিলেন যাঁকে ডাউন করে ফরাসি সুখ পেয়েছে।

"এখনও ফরাসি প্রেসিডেন্টের সমালোচনা না করলে ফরাসির ভাত হজম হয় না। বলা হয়, যাঁরা অনেকেই এক একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার প্রথম অথচ, প্রধান অলিখিত উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠাতাকে ফ্রান্সের গদিতে বসানো। ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলা হয়ে থাকে, পাঁচটা গুণ না থাকলে এযুগে ফরাসি প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্ভব নয়। অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত উচ্চাশা, নতুন রাজনৈতিক দল 'আবিষ্কার' করার মতো উদ্ভাবনীশক্তি, রাজকীয় ব্যক্তিত্ব ও ঠাট, টেকো মাথা এবং বিশাল সাইজের নাক। দ্য গ্যল ও বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাকের সাইজ স্পেশাল। শিরাক নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর চান্স খুবই কম, কারণ—ওঁর প্রথম চারটে গুণ যথেষ্ট পরিমাণ থাকলেও, নাকের সাইজ বড় নয়!

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভক্তসংখ্যা যে এখনও অসংখ্য তা ওঁর সমাধিস্থল লে ইনভ্যালিডস-এর সামনে দর্শনার্থীর ভিড় দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু ফাজিল ফরাসি বলে, ভদ্রলোক ছিলেন আসলে মস্ত অভিনেতা, থিয়েটারের এক নম্বর লোক হতে পারতেন। এই থিয়েটারি কায়দায় উনি নিজের মাথায় নিজেই রাজমুকুট চড়িয়ে ছিলেন আর গোটা জাতটাকে খেপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন পৈতৃক প্রাণটা দেবার জন্য। নির্বাসনে যাবার সময় তিনি প্যারিসের জন্যে রেখে গেলেন বিরাট একটা গেট (আর্চ দ্য ট্রায়াম্প), নিজের সমাধিগৃহ, বিরাট জাতীয় দেনা এবং ভয়াবহ বস্তি (প্যারিসে তখন একটা ঘরে তিরিশজন ফরাসিকে শুতে হতো), আর সমর্থ পুরুষ মানুষের অভাব। বারো বছরে চল্লিশ হাজার লোককে লিজিয়ন দ্য অনার মেডেল বিলিয়ে তিনি তাতিয়ে গেলেন। মেডেলের ব্যাপারে ফরাসির দুর্বলতা খুবই বেশি।

যারা মাথায় মুকুট পরেছে অথবা গদিতে বসেছে মুকুট ছাড়াই তাদের প্রতি ফরাসির ঐতিহাসিক অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু জেনারেল? না, জেনারেলদের সম্পর্কেও হাজার-হাজার আষাঢ়ে গল্প মুখে-মুখে প্রচারিত

রয়েছে। কে কবে গোপনে কী কম্মো করে গিয়েছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। যে-সেনাধ্যক্ষকে ফরাসি একদিন হিরো বানিয়েছে, মার্শালের লাঠি হাতে ধরিয়ে মাথায় তুলেছে, পরে তাকেই ফাঁসিকাঠে তুলেছে। আবার দ্য গ্যলের কথাই ধরুন—জার্মানের হাত থেকে ফরাসিকে বাঁচাবার জন্যে অমন তেড়েফুঁড়ে লেগেছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু ১৯৬৮ সালে ছাত্র আন্দোলনে মুণ্ডুখানা যায়-যায় অবস্থা। অনেক অভিনয় করে চতুর্থ রিপাবলিকের অবসান ঘটিয়ে পঞ্চম রিপাবলিকের ঘোষণা করে ভদ্রলোক নিজের অবস্থা কোনওক্রমে সামলালেন।

আরও একটা কুকথা প্যারিসে কান পাতলে শোনা যাবে। এই শতাব্দীর স্মরণীয় ফটোগ্রাফ হলো দ্য গ্যল জার্মানিকে হটিয়ে মার্চ করে আর্চ দ্য ট্রায়াম্পকে পিছনে ফেলে প্যারিস দখল নিচ্ছেন। কিন্তু কিছু লোক চুপি-চুপি বলবে, লোককে যা বলা হয় না তা হলো এই স্টাইলের ছবি তোলার আগের দিনই আর এক জেনারেল প্যারিসে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁর নাম জেনারেল লে ক্লার্ক, এই কাজটা করে ভদ্রলোক সুবিবেচনার পরিচয় দেননি।

তা হলে কি শিল্পী ছাড়া প্যারিস কেবল সুন্দরীদের প্রশ্রয় দেয়? যাদের নাম 'চিক'। এই চিক বলতে ঠিক কী বোঝায় তা ফরাসি ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

না, সৌন্দর্যে ফরাসির মন গলানো সহজ নয়। রমণী-শরীরে সৌন্দর্য ঠিকমতন না-থাকলে ফরাসি অবশ্য কঠিন সব শব্দ ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। যেমন এই মহিলাকে দেখে জনৈক ফরাসির উক্তি—পাঁউরুটি কাটার পিঁড়ি। আমাকে বোঝানো হলো, স্তন তেমন বিকশিত নয় এমন মহিলা সম্বন্ধে ফরাসিরা ওই শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেন। আবার বিপুল-জঘনাদের বলা হয়ে থাকে—লে জাম্বো অথবা শুয়োরের মাংস। বিশাল সাইজের মহিলাদের ডাকনাম রাখা হয়—জামাকাপড় রাখা আলমারি। দীর্ঘ আকারের মহিলা হলেন 'ঘোটকী'। মহিলার রূপ চোখে না ধরলেই ফরাসি পুরুষ তার নাম দেবে 'কালো পুডিং' অথবা 'সসেজ'। সুদেহিনী চিক-এর শরীর বর্ণনায় ফরাসি যেসব শব্দ ব্যবহার করে তা বাংলাভাষায় অচল। যে মেয়ের সহজলভ্য বলে বদনাম আছে, ফরাসি তার নাম দেয় পাপোশ বা ডোরম্যাট।

পাঁচুদা আরও মনে করিয়ে দিলেন, সুন্দরীদের প্রতি ফরাসিদের যদি সত্যিই প্রশ্রয় থাকতো তা হলে বিপ্লবের নাম করে অত সুন্দরীর মুণ্ডচ্ছেদ হতো না। গিলোটিনে কয়েক হাজার মেয়েকে চালান করতে ফরাসির মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি।

তা হলে আর্টিস্টের পর কে রয়েছেন ফরাসি হৃদয়ে?

পাঁচুদা ভেবেচিন্তে বললেন, "কথাটা হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু পছন্দটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ফরাসি যদি সত্যি কাউকে প্রশ্রয় দেয় তার নাম কমেডিয়ান। এই কমেডিয়ান কথাটার বাংলা যদি কৌতুকশিল্পী করি তা হলেও সবটা বোঝানো হলো না। অর্থাৎ নবদ্বীপ হালদার, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী যদি কলকাতায় জীবনটা নষ্ট না করে কোনোরকমে প্যারিসে হাজির হতেন তা হলে অবশ্যই ওঁদের নামে রাস্তা হয়ে যেতো, জাতীয় হিরোর সম্মান লাভ করতেন প্রত্যেকে। যে-সাহিত্যিক হাসাতে পারে তাকে ফরাসি যত সম্মান করবে দুনিয়ার কেউ তা পারবে না। শিব্রাম চকরবোরতির উচিত ছিল ফরাসি দেশে হাজির হওয়া। শ'দেড়েক লিজিয়ন দ্য অনার পকেটে পুরে, কোটিপতি হয়ে, শতখানেক ভিলা এবং রেসিং কারের মালিক হতে পারতেন তিনি। অথচ এখানে কিছুই পেলেন না, সারাজীবন ট্রামে-বাসে ঘুরে মেসবাড়ির একটা ঘরে জীবন কাটাতে হলো। অর্থাৎ বাঙালিকে যে হাসাতে চেয়েছে, বাঙালি তাঁকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে, আর বাঙালিকে যে কাঁদিয়েছে বাঙালি সেই লেখক, অভিনেতা ও নেতাকে রাজা করেছে।"

ফরাসি জানে, হাসানো অত সোজা কাজ নয়। তাই নাট্যকার মলিয়ারের নামে প্যারিস শহরে একটা নয়, দুটো নয়, আধডজন রাস্তা। মলিয়ারের জীবন, তাঁর নাটক ও তাঁর রস-রসিকতার কথা যে জানে না সে আর যাই হোক ফরাসি নয়। দজ্জাল বউয়ের চাপে পড়ে মলিয়ার একবার কোথায় কীভাবে কেঁদেছিলেন সে নিয়ে এখনও ডজন-ডজন নাটক লেখা হচ্ছে এবং ফরাসি তা গোগ্রাসে গিলছে। সুনীতি চাটুজ্যে মশাই প্যারিসে ছুটেছিলেন ওই নাটক দেখতে।

ফরাসি-নিন্দুক এক বন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে যোগাযোগ করা গেলো। তিনি বললেন, "আঙ্কেল শ্যাম, মিস্টার জন বুল ও মঁশিয়ে ডুপঁর মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আঙ্কেল শ্যাম অর্থাৎ আমেরিকার মধ্যে একা মফস্বলি ভাব আছে, যদিও হাস্যরসিকের গলায় তিনি মালা পরান না। মিস্টার জন বুল, অর্থাৎ ইংরেজ, যতই গোমড়ামুখো হোন তিনি নিজের দুর্বলতা নিয়েও হাসাহাসি করতে পারেন। এই একটা গুণে ইংরেজের মুখ রক্ষা করেছে বিশ্বসভায়। মঁশিয়ে ডুপঁ, অর্থাৎ ফরাসি পছন্দ করেন ব্যঙ্গ, নিজের খরচে হাসাহাসি তাঁর পছন্দ নয়। নিজেকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার সবাইকে যদি তুলোধুনো করে দাও ফরাসি তোমাকে হিরো বানাবে।"

সাগরপারের বন্ধুটি বাঙালি। জিজ্ঞেস করলাম, "আর আমরা?"

একটুও ইতস্তত না করে তিনি বললেন, "ভজন ও কেত্তনে আমরা দুনিয়ার সেরা। আমরা যা পারি তা হলো চামচাগিরির হাস্যরস। সাধে কি আর গোপালভাঁড় আমাদের সর্বোত্তম রসিক! এখন ওই সাইজের ভাঁড় বাংলায় তৈরি

হয় না, ছোট-ছোট খুরিই আমাদের জাতীয় সম্পদ!"

পাঁচুদা শুনলেন, কিন্তু প্রথমে মন্তব্য করলেন না। পরে বললেন, "ভক্তিরসের সঙ্গে হাস্যরস মেশে না, এটাই সোজা কথা। বাঙালি কেবল ভাঁড়কে ভালবাসে এটা বোধহয় একটু অবিচার হয়ে যাচ্ছে।" কী ভেবে পাঁচুদা বললেন, "আর এক ধরনের হাসির খোরাক ছিল, কলকাতার শীতে সার্কাসের তাঁবুতে জোকার। সে কাউকে ব্যঙ্গ না করেই হাসাতে পারতো, যা দেখে ছোটরাও হাসতো।" এরপর পাঁচুদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "এদের কেন নাকচ্যাপ্টা চিনেম্যানের মতন দেখতে হতো বল তো?"

মাথা চুলকোলাম, কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। পাঁচুদাও একটু মাথা চুলকে নিলেন, তারপর বললেন, "বাঙালি-স্বভাবের সঙ্গে ওই জোকারের স্বভাবটা মিলতো না বলেই বোধ হয়। চিনেম্যানের মতন সাজগোজ করতে হয় স্রেফ শ্বাস উৎপাদনের জন্যে।"

সম্বিৎ বলেছিল, ফরাসি জীবনে রসিকতার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কঠিন ব্যবসায়িক পাওনাগণ্ডা আলোচনার সময়ে যে একটু হাসাবে তার জিতবার সম্ভাবনা বেশি। ফরাসি বাণিজ্যে, ফরাসি বিজ্ঞাপনে তাই রমণী শরীর এবং হিউমারের সমান প্রতিপত্তি। যেমন ধরুন, পকেটে কেনবার টাকা না নিয়ে স্রেফ শোকেসে জিনিসপত্তর দেখার ইংরিজি নাম 'উইনডো শপিং', কিন্তু ফরাসি যে শব্দটি ব্যবহার করে তার আক্ষরিক অর্থ হলো 'জিভ দিয়ে জানলা চাটা।'

সম্বিৎ আমাকে প্যারিসের একটা দোকান দেখিয়েছিল যেখানে গর্ভবতী মেয়েদের জিনিসপত্তর বিক্রি হয়, ফরাসি ছাড়া কে এই দোকানের নাম দিতে পারবে 'বেলুন'? বাতকম্ম এবং বিষ্ঠা ফরাসি কথাবার্তায় নাকি প্রায়ই এসে যায়, যেমন 'মাই শিট' কথাটা এক সময় রেলের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ফরাসি ছাড়া কে এক সুপ্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁর নাম দিতে সাহস করবে 'বাতকম্ম'? এতে ফরাসির ঘেন্না হয় না, মুখের হাসি চেপে সে জিজ্ঞেস করবে, এই নামের উৎপত্তি কেমন করে হলো। মালিক অথবা ম্যানেজার সঙ্গে -সঙ্গে ছাপানো লিটারেচার খরিদ্দারের হাতে গুঁজে দেবে, অমুক শতাব্দীতে ফরাসি শ্রমিকের খাবারে এমন সব জিনিস থাকতো যে বায়ুর প্রকোপ একটু বেশি হতো। সেই সময় অন্য মিস্ত্রিদের বিরক্তি উৎপাদন না করে শ্রমিক যাতে প্রকৃতির আহ্বান ছোট একটু সাড়া দিয়ে টুক করে ফিরে আসতে পারে তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট দেওয়াল থাকতো। এই রকম একটি ঐতিহাসিক দেওয়াল নাকি এই ঐতিহাসিক বাড়িতে এখনও সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে, সুতরাং...ফরাসি এতেই খুশি, দোকানের রমরমা অব্যাহত।

কাজে-কর্মেও একটু রসিকতা পছন্দ করে ফরাসি। অফিসের কর্তার সঙ্গেও

লিমিটেড ডোজে রসিকতা মাঝে-মধ্যে স্বাগত হয়। কর্তা যদি শোনেন যে তাঁর কোনও স্পেশাল নামকরণ হয়েছে তা হলে মোটেই রাগ করেন না। বড়-বড় ঐতিহাসিক বাড়ির সরকারি নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ফরাসি তাকে একটা উদ্ভট ডাকনামে চিনবে। এতো কোটি টাকা খরচ করে ফরাসি প্রেসিডেন্টের নামে তৈরি হলো জর্জ পম্পিদু সেন্টার। কিন্তু বিদেশি ছাড়া কেউ ওই নাম ব্যবহার করে না, ফরাসির কাছে ওটা হলো অন্য কী একটা। অর্থাৎ এতো কষ্ট করে কাউকে স্মরণীয় করে তুলবার চেষ্টা ফরাসি রসিকতার চোটে গোল্লায় গেলো।

ফরাসি দেশে যাঁরা দুর্জয় প্রতিপত্তি, সম্মান ও অর্থের অধিকারী তাঁরা হলেন ওখনকার ভানু ব্যানার্জি ও জহর রায়। আগে কলকাতার যে-কোনও গানের 'ফাংশনে' এই হাস্যরসিকদের বিশেষ একটা ভূমিকা থাকতো, এখন বাঙালি হাস্যরসকে জীবনের সবক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করেছে। মঞ্চে, পর্দায়, বইয়ের পাতায় আজ কোথাও হাস্যরসের স্থান নেই। কোনওরকমে সে টিমটিম করে জ্বলছে খবরের কাগজের পকেট কার্টুনে—তাও সুচিত্র ভারত নামক কার্টুন পত্রিকা আমরা কবে তুলে দিয়েছি, এবং পি-সি-এল, চণ্ডী লাহিড়ীরাও ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছেন, যদিও বোম্বাইয়ে আর কে লক্ষ্মণ এখনও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছেন।

ফরাসি হাস্যরসিকদের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন কোলুস। ইনি দেহত্যাগ করলেও ফরাসিরা সুযোগ পেলেই ভি-সি-আর-এ তাঁর হাস্যরস উপভোগ করেন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে কোলুস সাফল্যের শিখরে আরোহণ করেছিলেন লোককে হাসিয়ে। কোনও এক সময়ে তাঁর খাওয়াতে সঙ্গতি ছিল না, তাই সম্পত্তির বিশাল অংশ লোককে বিনাপয়সায় লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে রেখে গিয়েছেন। রেস্তোরাঁ অফ হার্ট না এই ধরনের কী নাম—এই রেস্তোরাঁর সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

কোলুসের হাস্যরস আমি উপভোগ করেছি—তার মধ্যে কোথাও এক বিশ্বমানবিকতার স্পর্শ আছে যা মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। একটা স্কেচ আমার খুব ভাল লেগেছিল, এক অতি গরিব অথচ আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ভদ্রলোক অর্থাভাবে রাস্তায় অন্যের গাড়িতে লিফট ভিক্ষা করলেন। গাড়িতে উঠে নিজের প্রেস্টিজ অক্ষুণ্ণ রেখে গাড়ির মালিকের কছে সিগারেট ও লাইটার চেয়ে নিলেন, লাঞ্চ খাওয়াতে বাধ্য করলেন, রাত্রে তাঁর বাড়িতে থাকার নেমন্তন্ন আদায় করলেন এবং উনি যেখানে যেতে চান সেখানে নামিয়ে দিতে রাজী করালেন গাড়ির মালিককে। এই হাসিতে ব্যঙ্গের জ্বালা নেই তেমন, কোথায় যেন আছে সেই উপলব্ধি যা চার্লি চ্যাপলিন এক সময় সমগ্র মানবসমাজকে উপহার দিয়েছিলেন।

ফরাসি হাস্যরসিকদের নিয়েই মস্ত মজার বই লিখে ফেলা যায়। ভাষাটা জানা থাকলে এঁদের সঙ্গে দেখা করা যেতো। কিন্তু সেরকম ফরাসি আয়ত্ত করা তো আমার পক্ষে এখনই সম্ভব নয়। কোলুস সম্পর্কে কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করা গিয়েছে। এই ভদ্রলোক জীবিতকালে তাঁর প্রোগ্রামে রাজনীতিবিদদের টুকরো-টুকরো করে ছাড়তেন এবং ভাঁড়ামির শেষ পর্যায়ে নিজেই প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। এমন ঘটনা ফরাসি দেশেই সম্ভব।

কোলুস একবার বলেছিলেন, রাজনীতিবিদদের নিয়ে তিনি হাসাহাসি করতেন না, যদি এঁদের রকমসকম দেখে তাঁর হাসি না আসতো। কোলুস বলতেন, প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে সরকার দাঁড়িয়ে থাকে, আর প্রতিষ্ঠানের কুশন হলো হিউমার। হাসি না থাকলে জীবন অসহনীয় হয়ে উঠতো। গ্রিকদের স্বর্ণযুগে দার্শনিকরা যে কাজ করতেন এখন সেই দায়িত্ব ফরাসি হাস্যরসিকদের ঘাড়ে চেপেছে।

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও ফরাসি হাস্যরসিকরা হাসাহাসি করেন। যেমন ধরুন, ফরাসি যে জাত হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তা ইউরোপের অনেকেই জানেন। একটি স্কেচে দেখানো হলো একটি বিখ্যাত ফরাসি স্বাস্থ্যনিবাস, যেখানে কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগীরা একটু বেশি ভিড় করেন। সেখানে এক ভদ্রলোক আর একজনকে জিজ্ঞেস করছেন, মঁশিয়ে টয়লেটটা কোন্‌দিকে বলবেন? লোকটি বললো, আমি জানি না, আমি মাত্র পনেরো দিন হলো এখানে এসেছি।

যেসব বিখ্যাত হাস্যরসিকের নাম প্যারিসের হাটেমাঠে ঘুরছে এবং যাঁরা চিত্রতারকাদের থেকে বেশি জনপ্রিয়তা উপভোগ করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, গায় লাক্স, গি বেদোস, ফিলিপ বুভার। ওখানকার, চণ্ডী লাহিড়ীদের মধ্যে আছেন ভেলিন্‌সকি।

বিয়ের সময় বর ও কন্যাপক্ষের উভয়েরই যেমন আলাদা নাপিত থাকে, এ-দেশে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীদের সার্পোটারদের মধ্যে থাকেন—একজন হাস্যরসিক। ফলে খেউড় বা কবির লড়াই বেশ জমে ওঠে এবং ভোটপর্বে মানুষ কিছুদিন ধরে বিমল আনন্দ উপভোগ করে।

ফিলিপ বুভারের অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা তাঁর সংখ্যাহীন রোলস, ক্যাডিলাক ইত্যাদির কথা ইউরোপের কারও অজানা নয়। ইনি বইও লিখেছেন অনেক, কিন্তু হতে কলম ধরেন না, ডিকটেট করেন। সংবাদপত্রেও তাঁর রচনার বিপুল চাহিদা। অর্ডার পেলে দশ-পনেরো মিনিট পরেই তিনি টেলিফোনে তাঁর রচনা ডিকটেট করে দেন সোজা সংবাদপত্রে অফিসে।

আর কে লক্ষ্মণের কার্টুনে যেমন একজন সাধারণ মানুষ সবসময় উপস্থিত

থাকেন, ফিলিপ বুভারেরও তাই। বুভার বলেন, "আমার কথায় ও কাজে মানুষ হাসে, কারণ আমি ওঁদের লোক। আমি নিজে একজন সাধারণ মানুষ। আমার বিদ্যে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত। আমি বেঁটে, দেখতে সুন্দর নই। আমি বিদেশে যাওয়া পছন্দ করি না। আমার প্রিয় খাবার স্টেক ও চিপস। আমি ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানি না, আমি বিদেশিদের তেমন পছন্দ করি না, কিন্তু স্বদেশে আমি মিলিটারির ও চার্চের সারাক্ষণ সমালোচনা করি। কারুর ওপর আমার বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই। আমি ট্যাক্সো দেওয়া অপছন্দ করি। সত্যি কথা বলতে কি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার ভরসা নেই।"

এই বুভার অঙ্কে ফেল করে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং জীবন শুরু করেছিলেন খবরের কাগজের অফিসে চাপরাশি হিসেবে।

বুভারের দুঃখ, আত্মোন্নতি করার ইচ্ছা ফরাসি দেশে ক্রমশই কমে আসছে। কি করে আরও উন্নত করবো এই না ভেবে কি করে নিজের সাফল্য লুকিয়ে রাখা যায় এ-বিষয়ে লোকে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে।

বুভার যখন টিভি-তে কাউকে সাক্ষাৎকার নেন তখন প্যারিসের লোক সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে সেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কত বিখ্যাত লোকের খ্যাতির ওয়াটারলুতে তিনি যে ওয়েলিংটনের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। তাঁর আর একটা কায়দা দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুখোমুখি বসিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া। এই অনুষ্ঠানকে বলা হতো 'তেলে বেগুনে'। কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী জিতলেন তা ঠিক করার দায়িত্ব দর্শকের।

বুভারের ধারণা, জীবনটা মোটেই মজার নয়। এর থেকে মজা নিংড়ে নিতে হলে দার্শনিকতা প্রয়োজন। বুভারের বিশ্বাস, সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও যথেষ্ট রসবোধ আছে। বুভারের আক্রমণ থেকে কারও রক্ষা নেই। যাঁদের হামবড়াভাব আছে তাঁদের চটিয়ে দিয়ে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রেস্টিজের বেলুন পাংচার করে দিয়ে প্রচণ্ড আনন্দ পান এই হাস্যরসিক। বেশির ভাগ লোকের পেটে এক রকম, মুখে আরেক রকম। পাদ্রিদের হিপোক্রিসিকে আক্রমণ করতে দ্বিধা নেই এই ভদ্রলোকের। ডাক্তারদেরও প্রায়ই এক হাত নেন। সাংবাদিকদের হিপোক্রিট বলেন বুভার। আর সকলের মাথায় রয়েছেন রাজনীতিবিদরা। এঁরা নাকি মিথ্যেবাদীর রাজা!

জর্জ ভেলিন্‌সকির কার্টুন অনেক সময় দু'টি গবেট থাকে। একজন গবেটের রাজা, আর একজন একটু নিরেস। একজন বলছে : রায়ট পুলিশ আর নাৎসি এক জিনিস নয়। পুলিশ নিজেদের কর্তব্য পালন করছে। দ্বিতীয়জন : ভদ্দরলোকদের ট্যাক্সোর পয়সায় জেলখানা চালু রয়েছে, হাজতকে হলিডেহোমের মতন চালানোর জন্যে ওঁরা টেক্সো দেন কি? প্রথম জন : জেলে

পাঠানোর ব্যাপারে আদালত মাঝে-মাঝে ভুল করেন না? দ্বিতীয় জন : হয়তো করেন। কিন্তু পথঘাট ক্রিমিন্যাল বোঝাই হয়ে থাকার চেয়ে জেলখানা নিরপরাধ লোকে ভরে থাকা অনেক নিরাপদ।

পাঁচুদার সঙ্গে আবার পথে বেরিয়েই ফরাসি রসিকতার নমুনা যে হাতে-হাতে পেয়ে যাবো তা আশা করিনি। আমার লোভ হয়েছিল মেট্রোতে কিছুক্ষণ প্রথমশ্রেণীতে পরিভ্রমণ করায়। এ আর এমনকি, পাঁচুদা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বড়লোকের দেশে এসে একটু বড়লোকির ওপর নজর না রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

যাঁরা প্যারিস মেট্রোতে প্রথমশ্রেণীর যাত্রী তাঁরা একটু বিশিষ্টতার জন্যেই বাড়তি খরচ করেন। যাত্রীদের ভাবভঙ্গি, বেশবাস, চালচলনে, একটু বিশিষ্টতা আছে, যদিও কমবয়সী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা এই শ্রেণীতে কম। পৃথিবীর সব দেশেই আর্থিক সচ্ছলতা বোধ হয় চল্লিশোত্তর পুরুষ ও মহিলাদের কব্জায়। মাথায় টাক পড়তে শুরু না করলে পকেটে টাকা আসে না, তেমন, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মেদের ডিপোজিট ও ব্যাঙ্ক ডিপোজিট একই সঙ্গে ফিক্সড হতে আরম্ভ করে।

আমি অতি সাবধানে এই বিশিষ্ট কমপার্টমেন্টের বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের লক্ষ্য করছি। এঁরা একটু গম্ভীর ধরনের, কথাও একটু কম বলেন। অনেকেই খবরের কাগজ অথবা বইতে মগ্ন। এঁদের জামাকাপড়ও যে একটু বেশি পরিপাটি তা বলাই বাহুল্য। এই যাত্রী-দলের মধ্যে আমিই একটু নিরেস। সাধারণত কালো চামড়ার বিদেশিকে এই কামরায় ভ্রমণ করতে দেখতে পাওয়া যায় না।

একটা স্টেশনে গাড়ি থামলো। কেউ নামলেন না। কিন্তু নতুন এক যাত্রীকে উঠতে দেখতে পেলাম। যাত্রীটি তরুণ—আঠাশ-উনত্রিশের বেশি বয়স হয়ে না। মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা। বলা বাহুল্য, কোট পরা এই ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারের গলায় টাই। কোটের রং একটু ছাই ধরনের, যা দুনিয়ায় অফিসপাড়ায় উঠতি ম্যানেজারদের মধ্যে জনপ্রিয়।

এই যাত্রী কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর টুপি খুলে মাথা নামিয়ে সবাইকে অভিনন্দন জানালেন। এই স্টাইলে বড়-বড় আর্টিস্টরা স্টেজে উপস্থিত হয়ে শো আরম্ভ করেন। লোকটি যে ভিখিরি তা তখনও আমি বুঝতে পারিনি। টুপি খুলতেই দেখা গেল মাথার সর্বোচ্চ প্রান্তে ছোট্ট একটু টাকা সাইজের টাক দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

এই ভিখিরি এবার আসর জমিয়ে তুললো। টুপিটি পরে নিয়ে, লোকটি অদ্ভুত এক স্টাইলে বলে উঠলো, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, তোমরা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী, আশা করি, সবার পকেটে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে। সত্যি কথা বলতে

কি দু-একজনের মুখ দেখে নানা সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কার টিকিট আছে, কার নেই খুঁজে বের করার ছোট কাজে আমি নেই।

ভদ্রতার খাতিরে ধরে নিচ্ছি তোমরা টপ বুর্জোয়া, ফার্স্ট ক্লাসে না চড়লে ইজ্জত থাকে না। এই যে আমি, আমারও একটা মিনিমাম স্টাণ্ডার্ড আছে। আমি কখনও ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া কাজ করি না, যাতে তোমাদের মুখ নষ্ট না হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে বড় লোক যখন ইজ্জত রাখতে চায় তখন সব জায়গায় ইজ্জত রাখতে চায়। তারা ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে, তাদের বউ ফার্স্ট ক্লাস, ছেলে ফার্স্ট ক্লাস, তাদের ভিখিরিও ফার্স্ট ক্লাস।

অনেক প্রাক্তন বড়লোককে পাশের বাড়ির লোককে ফুটুনি দেখানোর জন্যে ধার করে হলেও বেশি দামের পাঁউরুটি কিনে দেখিয়ে যাবে।

লোকটি এবার এক বয়স্কা মহিলা যাত্রীর কাছে এগিয়ে গেলো। বললো, এই যে সুন্দরী বুড়ি, কোন কোম্পানির টয়লেট পেপার কেনো বাড়ি জন্যে?

ভদ্রমহিলা রেগে টঙ। চুপ করে বসে আছেন। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী তখন মুখ টিপে হাসছে।

আর একজন লোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে, এই যে মঁশিয়ে। তোমার ফাউন্টেন পেনের খাপটা তো দেখছি দামি—'ডুপন্ট' লেখা আছে। কিন্তু তলাটা হয়তো আজেবাজে মাল। প্রেস্টিজ রাখার জন্যে করতে হয়েছে এমন ব্যবস্থা।

কিন্তু আমি ভীষণ স্ট্রিক্ট। আমার সব জিনিস ফার্স্ট ক্লাস, স্রেফ তোমাদের প্রেস্টিজ রাখবার জন্যে।

এক কোণে দুই বয়সী মহিলা বসে-বসে গল্প করছিলেন। ভিখিরিটা বলে উঠলো, "আমি লিখে দিতে পারি এরা কী আলোচনা করছে। একজন বলছে, ছেলে ওকে দেখতে আসে প্রতি শনিবারে, আর একজন মুখ বুজে যাচ্ছে। যদিও সে জানে ছেলে কোনও দিনই দেখতে আসে না। নিজের ফার্স্ট ক্লাস ইমেজ রাখার জন্যে ওই সব গল্প করছে। কিন্তু এদের মধ্যে কে বেশি বড়লোক তা বোঝা যাবে আমাকে কীভাবে ট্রিট করছে তারে ওপর।"

দুই বৃদ্ধা কটমট করে ভিখিরির দিকে তাকালেন।

ভিখিরি বলছে, পরের স্টেশন প্রায় এসে গেলো। যাঁদের ওখানে নামবার কথা তাঁরা নামবেন না, দুটো স্টেশন আরও চলুন, আমার কথাগুলো তো শেষ করবো।

হ্যাঁ, ভাল কথা। বড়লোক ইজ্জত রাখতে চায় তখন সব জায়গায় ইজ্জত রাখতে হয়। ভিখিরিকেও যখন পয়সা দেবে তখন দয়া করে ভেবেচিন্তে দিয়ো। ফার্স্ট ক্লাস ভিখিরিকে কয়েন দেওয়া যায় না, তাকে নোট দিতে হয়। যারা কয়েন নেয় সেই সব ভিখিরির পকেট ফুটো হয়ে যায়, তাতে প্যাসেঞ্জারদের ইজ্জত থাকে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, গরিবের ভিখিরি ভিক্ষে করে খাবার কিনবার জন্যে। কিন্তু বড়লোকের ভিখিরি হিসাবে আমার টাকার প্রয়োজন উইক এন্ডে একটু সমুদ্রের হাওয়া খেতে যাবো বলে। আমি যে গাড়িতে যাবো সেটা হলো জাগুয়ার। বুঝতেই পারছো, জাগুয়ার একটু বেশি তেল খায়। আমি ঘণ্টাখানক আজ ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্যে স্পেয়ার করবো। উইক এন্ড করার টাকা উঠে গেলেই আমি চলে যাবো, বেশি টাকা আমার দরকার নেই।

ভিখিরি এখন গতি বাড়িয়ে দিয়ে যাত্রীদের ওপর ঝুঁকে পড়ছে এবং অভিনয়ের ভঙ্গিতে সবার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ, একটা কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। গরিবের ভিখিরি সবার কাছে হাত পাতে, বড়লোকের ভিখিরির ইজ্জত আছে। এই দ্যাখো, আমার গায়ে দুর্গন্ধ নেই, আমাকে দামি পারফিউম মাখতে হয় বড়লোকদের নাকে অস্বস্তি না হয়। বড়লোকদের দামি বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে। দামি চাকর থাকে, দামি মিসট্রেস থাকে। তেমনি প্রয়োজন তাদের হাই স্ট্যান্ডার্ডের ভিখিরি।

হ্যাঁ ভাল কথা। আর একটা স্টেশন এসে গেলো। যাঁরা আমাকে কিছু দিতে পারবেন না বলে লজ্জা পাচ্ছেন তাঁরা ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে এই স্টেশনে নেমে যেতে পারেন। আমি লজ্জা পাবো না। অনেক বড়লোকের ওই রকম স্বভাব থাকে। গভর্নমেন্টকে এক পয়সা ইনকাম ট্যাক্সো দেবে না, ভিখিরিকেও পয়সা ঠেকাবে না।

ঠিক পরের স্টেশন পেরোতেই অভিভূত হয়ে লোকরা ওই ভিখিরিকে নোট দিতে আরম্ভ করলো। একটা কয়েন পড়াতে সেটা মেঝেতে ফেলে দিলো লোকটা ফরাসি নোট আজকাল বোধ হয় কুড়ি ফ্রাঁ কমে হয় না। অর্থাৎ ওই লোকটির নিম্নতম ভিক্ষে সত্তর টাকা।

লোকটা নামবার আগে বললো, "একটা ব্যাপার কিন্তু গ্যারাণ্টি। আমি তোমাদের নিজস্ব ভিখিরি, আমাকে কখনও লোয়ার ক্লাসে হাত পাততে দেখবে না। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। একটাই অনুরোধ, যখন পরের বার দেখা হবে তখন যেন এতো লেকচার দিতে না হয়, দেখা হলেই যেন নোটগুলি সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে।"

লোকটা অনেক টাকা তো পেলোই এবং যাবার সময় পুরো কমপার্টমেন্টে হাততালি পড়লো।

পাঁচুদা বললেন, "এই হলো ফরাসি দেশ। ভিক্ষেকেও আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে এরা তারিফ করবে এবং প্রাণভরে হাততালি দেবে শিল্পীকে। আর যে লোক ফরাসিকে হাসাতে পারে তার সাত খুন মাফ। সে যতই খোঁচা দিক, অপমান করুক, ইজ্জতে হাত দিক, ফরাসি তাকে মাথায় তুলে রাখবেই।"

পাঁচুদা আজ আমাকে নেপোলিয়নের সমাধি দেখাতে এনেছেন।

"বিদেশে এলে কয়েকটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখতেই হয়। যেমন কলকাতায় নবাগতরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর এবং কালীঘাট দেখে।" কিন্তু আমার ফরাসি-সময় র‍্যাশন করা। যা অনেক দেশোয়ালিই দেখে গিয়েছেন তা আবার দেখে আমি যে লেখায় ফয়দা তুলতে পারবো না তা পাঁচুদার অজ্ঞাত নয়। "তবু নেপোলিয়ন ইজ নেপোলিয়ন এ-কথা তোকে মনে রাখতে হবে, রাজপুরীতে এসে কেউ রাজদর্শন না করে যেতে পারে?"

আমার দুশ্চিন্তার কথা বললাম পাঁচুদাকে। "গত একশ নব্বুই বছরে স্রেফ নেপোলিয়নের ওপর দু'লাখ বই ফরাসি এবং ইংরিজিতে লেখা হয়েছে। সেখানে আর কেরামতি দেখিয়ে কী লাভ, পাঁচুদা। যদি স্বীকার করছি, বাঙালিদের বেশ দুর্বলতা আছে এই বেঁটে বীরটির ওপর, যাঁকে আমার এক ইংরেজ বিদ্বেষী দাদা বামনাবতার বলে সম্মান করতেন।"

যে মহাতীর্থ আমাদের লক্ষ্যস্থল তার নাম লে ইনভ্যালিড। লে লা দ্যা, কোথায় 'স'-এর উচ্চারণ আছে কোথায় নেই, কোথায় চন্দ্রবিন্দু আনতে হবে, কোথায় বিদায় করতে হবে এসব ঠিক করতে গেলে আমার আর প্যারিস দেখা হবে না। আমি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কাশুন্দের অরিজিন্যাল উচ্চারণে চলে গিয়েছি। ভুল ফরাসি উচ্চারণে লজ্জা বাঙালির নয়। লজ্জা আলিয়াঁস ফ্রাঁস-এর—এতো বছর কলকাতায় আপিস খুলেও ওঁরা বাঙালির মগজ ধোলাই করতে পারেননি কেন? ঠিক হ্যায়, যদ্দিন মিস্টার জন বুল দিল্লির চেয়ারে মোতায়েন ছিলেন তদ্দিন খাপ খোলা কঠিন ছিল, কিন্তু মঁশিয়েমশাই তারপরেও তো অর্ধশতাব্দী হতে চললো। আমাদের দুর্বলতা নিয়ে বেশি হাসাহাসি করলে বাঙালি চটিতং হয়ে ওঠে একথাও আলিয়াঁস ফ্রাঁস-এর কর্তাব্যক্তিদের জেনে রাখা ভাল। এই প্রতিশোধের মেজাজ থাকার ফলে আমরা ইদানীং ইংরেজের ভাষার টুয়েল্‌ভ-ও-ক্লক বাজিয়ে দিলাম উচ্চারণে, বানানে ও প্রয়োগে। পাঁচুদার ফরাসি বন্ধু রসিকতা করেছিলেন, 'ইংরেজ, ইতালিয়ান ও বেলজিয়ানরা অন্য দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠায় প্রভু যিশুর নামপ্রচারে, আর ফরাসি পাঠায় মাস্টারমশাই ফরাসি ভাষা প্রচারের জন্যে। আমাদের যতোটা বোকা ভাবা হয় আমার ততোটা

বোকা নই!"

আরও এক তর্কের বিষয় তোলা যেতে পারে। এতোকাল ইণ্ডিয়াতে রাজত্ব করেও চন্দননগর যখন ফরাসির কাছে 'সান্দারনগর' রয়ে গেলো তখন আমরা কেন লে লা নিয়ে লজ্জা পাবো? সুতরাং, ও লা লা!

নেপোলিয়নের সমাধিস্থল বাড়িটি বেশ জমকালো। শিব্রাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন ফরাসি দেশে এলে প্রশ্ন করতে পারতো, সমস্ত প্যারিস শহরটাই তো মিউজিয়ম এবং প্রদর্শনী করে রেখেছে! এখানে শোবার জায়গা কোথায়?

কথাটা মিথ্যে নয়। আরও একটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমার মাথায় উঁকি মারছে। ইনভ্যালিড মানে তো পঙ্গু, যে-রোগী উত্থানশক্তিরহিত। পৃথিবী কাঁপানো সেনানায়কের স্মৃতিসৌধ কেমন করে পঙ্গুভবন হতে পারে? পাঁচুদার মন্তব্য :

"ফরাসিদের ঐতিহাসিক চেতনা আছে। ধারাবাহিকতাকে ওরা সম্মান করে, ফলে আজ যা অন্ধভবন সময়ের চাপে পড়ে কাল তার নাম দৃষ্টিভবন করতে ফরাসি রাজি নয়। সুতরাং তোকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এই বাড়িটা নেপোলিয়নের জন্মের আগে থেকেই ছিল। অবশ্য মিলিটারির হাতেই ছিল, ওদের হাসপাতাল। গিয়েছিস কখনও কলকাতার মিলিটারি হাসপাতালে? শান্তির সময় শত-শত বেড খালি পড়ে থাকে। যখন যুদ্ধ বাধবে তখন রোগী গিজগিজ করবে। যুদ্ধ ঘোষণা করে তারপরে তো হাসপাতাল তৈরি করা যায় না। ফরাসি সৈনিকের হাসপাতালই পরে নেপোলিয়ন সৌধে পরিণত করা হয়েছে।"

এই সৌধে ঢোকবার জন্যে লাইন পড়েছে। গেটের সামনে বহু লোক। আগন্তুকদের অনেকেই ট্যাবা হয়ে সৌধের সোনার চুড়ো দেখছে। আমার বা পাঁচুদার ওই ব্যাপার নেই। আমরা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দেখেছি, যেখানে কয়েকশ কেজি সোনা আছে নিশ্চয়। আমি দিল্লিতেও বাংলাসায়েবের নামে স্বর্ণমন্দির দেখেছি। সোনা দেখে সোনার বাংলার ছেলেকে ভড়কে দেওয়া যায় না! কিন্তু জাপানি, জার্মান, আমেরিকান, এমনকি ইংরেজ ট্যুরিস্টও নেপোলিয়ন মন্দিরে সোনা দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছে। দু'একজন গাইড ফুটুনি দিচ্ছে, এই সোনার চকচকে ভাব বজায় রাখতে ফরাসিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, খরচ করতে হয় বহু লক্ষ ফ্রাঁ। ওসব কথা শুনিয়ো না আমাদের বাছাধন, সোনাপালিস যদি তোমাদের গতরে না পোশায় খবর দিও আমাদের বউবাজারের দোকানগুলোতে, ঝটিতি এসে কাজটা করে দিয়ে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেবে।

ফরাসি, তুমি আর একটা ভুল করে বসে আছো। তোমার সোনাদানায় আকৃষ্ট হয়ে দুনিয়ার লোক এখানে লাইন মারেনি, তারা এসেছে তোমাদের সোনার ছেলেটিকে শোওয়া অবস্থায় দেখতে। দুনিয়াটা সোডা ওয়াটারের বোতলের

মতন নেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন কয়েক বছরে। বাহান্ন বছরে মৃত্যু, তার মধ্যে শেষ সাড়ে সাত বছর ইংরেজের জেলখানায় বন্দীজীবন, সেন্ট হেলেনায়। ইংরেজ বীরোচিত কাজ করেনি। আলেকজাণ্ডার-পুরুর ঘটনা থেকে কোনও শিক্ষাই তুমি নাওনি বেনের পো। মানব ইতিহাসের বীরবিক্রমমাণিক্য বর্বর জার্মানের হাত থেকে জান বাঁচাবার জন্যে তোমার আতিথ্য চাইলেন, তুমি প্রথমে তাঁকে জাহাজে চড়িয়ে রাজকীয় খাতির করলে, মহাবীর নেপোলিয়ন ভাবলেন, তিনি ইংলণ্ডে চলেছেন শেষজীবনটা শান্তিতে অতিবাহিত করতে, আর তুমি ইংরেজ কিনা তোমার বন্দরে জাহাজ ভিড়তে দিলে না, বললে, যাও সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। ওখানে তুমি স্টেট গেস্ট নও—প্রিজনার অফ ওয়ার, যুদ্ধবন্দি।

"খল ইংরেজের কাণ্ডকারখানা ভাবা যায় না, পাঁচুদা। দুনিয়া যাঁকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছে, তাঁকে বন্দীদশায় এক অর্বাচীন নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সারাক্ষণ জেনারেল হিসেবে ডেকে গেলো ইচ্ছে করে। ভাবা যায় না।"

পাঁচুদা বললেন, "ওঁর ওপর ইংরেজ চটবে না তো কে চটবে? শুনেছি নেপোলিয়নের রমরমা অবস্থায় যে ক'টা ফরাসি অপেরা প্যারিসে প্রচণ্ড সফল হয়েছিল তার একটির নাম টিপু সুলতান। টিপু ইংরেজের হাড়ে দুব্বো গজাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল।"

ফরাসিরা দুশো বছর ধরে যাকে নিয়ে মাথা ঘামালো আমরা এখনও সেই টিপু সুলতানের ব্যাপারে তেমন কিছু করলাম না। টিপুর ব্যাপারে কলকাতারও যে একটা বিরাট ভূমিকা ছিল তা আমরা কেমন বেমালুম ভুলে বসে আছি।

এতো বড় লাইন প্যারিসে আর বোধ হয় কোথাও দেখা যায় না। পাঁচুদা বললেন, "লোকটার কেরামতি দ্যাখ। ১৮২১ সালে দেহ রেখেছেন আর এতোদিন পরে এই ১৯০০-তেও দুনিয়ার লোক গাঁটের কড়ি খরচ করে দেখতে এসেছে লোকটা সত্যিই মরেছে কি না? আর ফরাসিও কেমন ডাঁট দেখাচ্ছে দুনিয়াকে নেপোলিয়নের জন্যে, অথচ মানুষটা আসলে ইতালিয়ান, কোর্সিকার লোক। পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বানিয়ে নিতে ফরাসির তুলনা নেই—নেপোলিয়ন থেকে আরম্ভ করে পিকাসো পর্যন্ত অনেক নমুনা হাতের গোড়ায় পেয়ে যাবি।"

"পাঁচুদা, আমার কাশুন্দের পাঠক ওসব বিশ্বাস করবে না। ফরাসিত্ব বলতে দুনিয়া যা বোঝে তার শেকড়েই তো রয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।"

পাঁচুদা উত্তর দিলেন, "ইতিহাসে কত রকমের অঘটন ঘটে। প্যারিসের যে-কোনও স্কুলের ছাত্র বলে দেবে কোর্সিকাতে নেপোলিয়ন প্রথম ইতালিয় ভাষা শিখেছিলেন। ফ্রান্সের মিলিটারি স্কুলে ঢুকে তাঁর প্রথম কাজ হলো ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করা। তা যে-কোনও সিনেমাদর্শক তোকে বলে দেবে। তবু ফরাসি-

ফরাসি করেই লোকটা নির্বাসনে মারা গেলো—ফরাসি সভ্যতার এমনই মায়ামোহ।"

আমাদের লাইন যেরকম লম্বা তাতে ধৈর্যের অভাব থাকলে সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

পাঁচুদা বললেন, "এক একসময় মনে হয়, শরৎচন্দ্র একবার ফরাসি দেশে এলে নেপোলিয়নকে নিয়ে একটা ভাল গল্প উপন্যাস লিখে যেতে পারতেন।"

"এসব কী বলছেন, পাঁচুদা? শরৎচন্দ্র তো যুদ্ধবিগ্রহের ধারে কাছে যেতেন না, ওই সাবজেক্ট তো টলস্টয়ের, তিনি তো ওই বিষয়ে ওয়ার অ্যান্ড পিস নামে এক বিশাল মহাভারত লিখে গিয়েছেন।"

পাঁচুদা হাসলেন, "আমি একটা নতুন অ্যাঙ্গেলের কথা ভাবছি, যা শরৎবাবু এককথায় ধরে ফেলতেন। মা বাবা ভাইবোনের প্রতি ভালবাসার কথা বলছি। আট ভাইবোনের সংসারে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বোধহয় মেজদা ছিলেন। দাদা প্রচণ্ড সফল উকিল ডাক্তার বা গাইয়ে হলে অনেক সময় ভাইবোনের জন্যে সামান্য কিছু করেন এদেশে; কিন্তু এই মেজদাটি অন্য ভাইদের রাজা করে দিলেন। ভাবতে পারা যায়?"

আমি বললাম, "ঠিক বলেছেন, পাঁচুদা। আমি একসময় ডাচ কোম্পানিতে কাজ করতাম। ওখানে শুনেছি, নেপোলিয়নের ভাইয়ের রাজা হিসাবে খুব সুনাম হয়েছিল, এখনও গুড কিং লুই বা ওই ধরনের কি একটা বলে ডাচরা।"

পাঁচুদা বললেন, "বিপ্লবের পরে ফরাসি ওসব মানতে চায় না, কিন্তু বংশগুণ বলে একটা কথা আছে আমাদের হাওড়ায়। ছোটভাই অবশ্যই দাদা নেপোলিয়নকে মান্য করতো। কিন্তু ওলন্দাজের রাজা হয়ে সে নিজের প্রজার হয়ে লড়ে গেলো, অবশ্য রণক্ষেত্রে নয় দাদার আলোচনা কক্ষে।

"এই ভাইকেই ভালবেসে ডাচের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন মেজদা। লুইসের শরীর তেমন ভাল ছিল না, দু'টি হাতই কিছুটা অবশ ছিল, ফলে কব্জিতে রিবন দিয়ে কলম বেঁধে বেচারাকে চিঠি লিখতে হতো। মেজদা যখন রাজত্ব দিতে চাইছেন তখনও ভাইয়ের দ্বিধা। ডাচ আবহাওয়ায় শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে তো? মেজদা বকুনি লাগালেন, রাজপুত্র হিসাবে বেঁচে থাকার চেয়ে সিংহাসনে বসে মরাও ভাল।"

পাঁচুদা বললেন, "তোদের কোম্পানির ডাচসায়েবরা কেন লুই বোনাপার্টের ভক্ত তা নিশ্চয় তারা ফাঁস করেনি। ডাচের কৃপণ স্বভাব লক্ষ্য করে লুই নেপোলিয়ন খুব ভেবেচিন্তে সরকারি টাকা খরচ করতেন। আর মেজদাকে ধরাধরি করে ডাচদের আবশ্যিক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা রদ করে দিলেন। লুই নেপোলিয়ন দাদাকে লিখেছিলেন, এরা বেনের জাত,

ব্যবসাবাণিজ্য বোঝে। বড় জোর এরা কলকারখানা করতে পারে কিন্তু এরা ক্ষত্রিয় হবে কী করে?"

মেজদা অবশ্য ভাইকে বকুনিও লাগাতেন। লিখলেন, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ফরাসি ভাইটি আমার চিজের কারবারি ডাচ হয়ে গিয়েছে। ভাইও ছাড়বার পাত্র নয়, দাদাকে লিখলেন, হল্যান্ডের রাজার তাই তো হওয়া উচিত।

পাঁচুদা বললেন, "লোকে একটা ভাইকে নিয়ে হিমসিম খায়, আর নেপোলিয়ন সাত ভাইবোনকে মাথায় করে রেখেছিলেন। এদের সবাই যে মেজদার কথা শুনতো তা নয়। এক একজনকে শাস্তির ভয়ও দেখাতে হয়েছে। কিন্তু মোটের ওপর এমন ভ্রাতৃপ্রেম বাংলা গপ্পো ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি গত পাঁচশ বছরে। দাদা জোসেফ ছিলেন উকিল. শেষ পর্যন্ত হলেন স্পেনের রাজা। দ্বিতীয় ভাই লুসিয়েনকে মেজদা করেছিলেন মন্ত্রী। এর জন্যে রাজকন্যাও জোগাড় করছিলেন মেজদা, কিন্তু ছোকরা নিজেই বে-থা করে বসলো। সেজভাই হল্যাণ্ডের রাজা লুইয়ের কথা বলেছি। নেপোলিয়নের পতনের পরে ইতালিতে সাহিত্য রচনায় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। রাজসম্মান হারিয়েও কোনও দুঃখ ছিল না। ছোটভাই জেরোমকে নিয়েই নেপোলিয়ন সবচেয়ে হাঙ্গামায় পড়েছিলেন। আমেরিকায় পালিয়ে এক মিস প্যাটারসনকে প্রথমে বিয়ে করেছিলেন। ভাইয়ের ডাইভোর্স সহজসাধ্য করার জন্যে নেপোলিয়ন রাজকীয় অর্ডার ছেড়েছিলেন। তারপর বিয়ে দিলেন এক রাজকন্যের সঙ্গে। ভাইকে করেছিলেন ওয়েস্টফেলিয়ার রাজা, হাতখরচ পঞ্চাশ লাখ ফ্রাঁ। বড্ড সুখী এবং আমুদে মানুষ এই ভাইটি বেপরোয়া খরচ করতে এক্সপার্ট। ভাই কী করে আয় অনুযায়ী ব্যয় করতে শেখে এবং কেন ধার করা অন্যায় সে-সম্বন্ধে রণক্ষেত্রেও নেপোলিয়ন বসেও লম্বা-লম্বা চিঠি লিখতেন। তিনটি বোনও খুব আদরিনী—পলিন, এলিজা ও ক্যারোলিন। ক্যারোলিনকে নেপোলিয়ন বানিয়েছিলেন নেপলসের রানি। এলিজা হয়েছিলেন গ্র্যান্ড ডাচেস অফ টাসকানি।"

পাঁচুদার সোজা কথা, "নেপোলিয়নের যুদ্ধের হিসাব করতে গেলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়, আমি নেপোলিয়নের ভাইবোনের এবং মায়ের ব্যাপারটা স্টাডি করি এবং দুঃখ পাই এতো লোক ফরাসি দেশ বেড়িয়ে গেলো, শরৎ চাটুজ্যে একবার এলেন না কেন?"

"শরৎবাবু এলেও তো হাওড়া-শিবপুর থেকেই আসতেন, পাঁচুদা। হাওড়া-শিবপুর থেকেই তাঁর অনুগত ভক্ত এসেছে, তাকে কিছু উপাদান জুগিয়ে দেন।"

পাঁচুদা বললেন, "নেপোলিয়নকে ঠিকমতন বুঝতে গেলে ইংরেজের ওপর একটু বিরক্তি থাকা দরকার।"

"পাঁচুদা, ওই যে ইংলিশ জিনিস বর্জনের চেষ্টা করেছিলেন নেপোলিয়ন ওইটাই কি একশ বছর পর বঙ্গভঙ্গের সময় বিলিতি বর্জন ও স্বদেশি আন্দোলন হয়ে দাঁড়ালো।"

খুব প্রশংসা করলেন পাঁচুদা। কে বলে অনেকদিন শিবপুরের উনুনের ধোঁয়া খেলে বুদ্ধি কমে যায়?

'তুই তো জানিস। অনেকের ধারণা ওই যে ইউরোপের অনেক দেশকে ইংলণ্ডের জিনিস কিনতে দিলেন না ওইটাই নেপোলিয়নের কাল হলো। কয়েকশো বছরের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে পৃথিবীর নেতারা এখন বুঝেছেন—ভোগের বাপারে সাধারণ মানুষের কোনও আদর্শবাদ নেই—যা তাদের প্রাণ চাইছে তা কিনতে যে বাধা দেবে তার পতন অনিবার্য। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ তাই এখন পণ্যযুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে— ক্ষত্রিয়ের কাণ্ডকারখানায় তিতিবিরক্ত হয়ে যুদ্ধের দায়দায়িত্বও এখন বৈশ্যকে দিতে চাইছে দুনিয়ার সব দেশ।"

এ যুদ্ধও ভীষণ যুদ্ধ, সমস্ত দেশ যদি বৈশ্যের পিছনে না থাকে তা হলে সে-দেশ এই নতুন অর্থনৈতিক যুদ্ধে জিততে পারবে না।

পাঁচুদা এবার মজার খবর দিলেন। ইংলণ্ডের জিনিস অন্য দেশে বিক্রি বন্ধের ফরমান জারি করলেও নেপোলিয়ন যে ক্ষুর দিয়ে প্রতিদিন সকালে দাড়ি কামাতেন সেটি ছিল ব্রিটিশ। আমি বললাম, "আমাদের দেশের অনেক কট্টর স্বদেশিও নিজের হাতে সুতো তৈরি করে খাদি পরলেও স্বদেশি শেভিং ব্লেড ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।"

আমাদের সামনে দর্শনার্থীর লাইন এঁকেবেঁকে গিয়েছে। মনে হচ্ছে অ্যাদ্দিন পরেও দুনিয়ার লোকের নেপোলিয়ন সম্পর্কে কৌতূহল কমা তো দূরের কথা বেড়েই চলেছে।

আমি ভাবছি কলকাতার কথা। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার পর থেকেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাশে ওয়াটার্লু স্ট্রিটে যাতায়াত করছি। ওখানে ফরাসিভাষী এক বিদেশি ভদ্রলোক থাকতেন। ওয়াটার্লু যে বিলেতে নয় তা আমার অনেকদিন খেয়াল হয়নি। আমার এক বন্ধুর ধারণা ছিল, বৃষ্টির সময় ওই গলিতে জল জমে বলেই নাম ওয়াটার্লু। আর ছিলেন টেরুদা। বলতেন, "ব্রিটেনকে পেঁদিয়ে তুলোধোনা করেছে যে সে নিশ্চয় মহাবীর।" আমাদের লালুদা ছিলেন ইংরেজ ভক্ত, ওঁর মাতৃকুলে কে একজন রায়সায়ের খেতাব পেয়েছিলেন। লালুদা বলতেন, "ইংরেজকে প্রথম গাঁট্টা অনেকেই দিয়েছে, কিন্তু সামাল দিতে পারেনি কেউ। নেপোলিয়ানকে দ্যাখ, হিটলারকে দ্যাখ। মা ভবানী নিজেই যে ইংলন্ডেশ্বরী এমন গুজব ইংরেজ রাজত্বের শেষ পর্যায়েও কলকাতায় রীতিমত

চালু ছিল।”

আমাদের সামনে একদল বয়সিনী মার্কিনী মহিলা গাইডসহ এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা পয়সা না দিয়েও ওঁদের ইংরেজি কথা কিছু শুনে নিলুম। গাইড বলছে, সম্রাট নেপোলিয়নের খুব ভাল ধারণা ছিল মার্কিন দেশ সম্বন্ধে। খুব ইচ্ছে ছিল ওয়াটার্লু যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে জীবনটা ওখানে গিয়ে নতুনভাবে শুরু করবেন। কিন্তু পাকে চক্রে তা হলো না, যদিও ওঁর ভাইয়ের বংশধররা পরে ওখানে বসবাস শুরু করেন, ওঁদের মধ্যে এক-আধজন কেষ্টবিষ্টুও হয়েছিলেন।

খুব খুশি হলেন মার্কিনি বৃদ্ধারা, নেপোলিয়নের মত মহাবীরকে নিজের দেশে আশ্রয় দিতে ওঁদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, শুধু প্রশ্ন খরচের টাকাটা আসতো কোথা থেকে? গাইডটিও সুরসিকা। সে বললো, “মহাশয়রা ভুলে যাবেন না, প্রচুর লেখালিখি করেছেন নেপোলিয়ন তাঁর নির্বাসিত জীবনে। সে সব যদি আমেরিকায় বসে লিখতেন তাহলে তাঁর অর্থের অভাব হতো না।”

“নেপোলিয়ন আশা করি ইংরিজি জানতেন,” এক মহিলা ছন্দোপতন ঘটালেন। সুন্দরী গাইডটি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বললো, “দুঃখের বিষয় ওখানে একটু গোলমাল ছিল। ছাত্রজীবনে নেপোলিয়ন একবার ট্রাই নিয়েছিলেন ইংরিজি শিখতে। ব্যাপারটা এগোয়নি। তারপর সেন্ট হেলেনায় নির্বাসিত জীবনে উঠেপড়ে লেগেছিলেন ইংরিজি আয়ত্ত করতে। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন জমেনি।” ওঁর একখানা ইংরিজি চিঠি যা পাওয়া যায় তা পাতে দেবার মতন নয়। ন'মাসে ব্যর্থ সংগ্রাম করে মহাবীর নেপোলিয়ন ইংরিজি ল্যাঙ্গোয়েজের কাছে বিনা শর্তে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন।

এই মার্কিন ট্যুরিস্ট দল লাইনে দাঁড়াচ্ছেন না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পাঁচুদাকে লাইনে রেখে আমি ওঁদের সঙ্গ নিলাম।

গাইড বলছে, “এই হোটেল রয়াল ইনভ্যালিড চতুর্দশ লুইয়ের সময়কার এক অনবদ্য শিল্প-নিদর্শন। হাসপাতাল ছাড়াও এখানে দুটো চার্চ আছে। ওই চার্চের গম্বুজ তৈরি করতে তিরিশ বছর সময় লেগেছিল—ধর্মীয় আর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসি নিদর্শন এই বাড়িটা।”

১৪ই জুলাই ১৭৮৯ ফরাসি বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র এইটাই হওয়ার কথা ছিল। হাজার-হাজার ক্ষুধার্ত শ্রমিক প্রথমে এখানেই হাজির হয়েছিল এবং লুঠ করেছিল অস্ত্রাগার। তিরিশ হাজার রাইফেল নিজেদের আয়ত্তে এনেও জনতার মন খারাপ হয়ে গেলো। ফরাসি সম্রাটের কর্মচারীরা বুদ্ধি করে অস্ত্র এক জায়গায় এবং গোলাবারুদ আর এক জায়গায় রেখেছিল। খবর পাওয়া গেলো, প্রচুর গোলাবারুদ স্টক করা আছে বাস্তিল দুর্গে। তাই উন্মত্ত জনতা তখন ছুটল বাস্তিলের দিকে, ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটলো ওইখানেই।

তারপর দুশো বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কৌতূহলের অবসান হয়নি। আমেরিকান বৃদ্ধারা ছাত্রীসুলভ বিস্ময়ে গাইডের সমস্ত কথা হজম করছেন, কেউ-কেউ আবার সিগারেট বাক্সের মতন একটি টেপরেকর্ডারে তা লিপিবদ্ধ করছেন। কেউ-কেউ আরও এগিয়ে ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরায় সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের জন্যে সঞ্চয় করে নিচ্ছেন।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, "নেপোলিয়ন কতগুলো যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন?" চৌকস গাইড উত্তর দিলো, "মহাশয়া, অন্তত চল্লিশটা রোমাঞ্চকর যুদ্ধে শত্রু তাঁর কাছে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেছে।" এক মহিলা বললেন, "পুওর নেপোলিয়ন। সব ভাল যার শেষ ভাল এই কথাটা তাঁর জানা ছিল না। ওয়াটার্লুই সব কৃতিত্ব মুছে দিলো।"

গাউড বললো, "আপনারা তো জানেন, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হবার কয়েক দিন পরে সম্রাট নেপোলিয়ন ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে ধরা দিলেন। সাড়ে সাত বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত সেন্ট হেলেনায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।"

এক বৃদ্ধা নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁকে কি মার্ডার করা হয়েছিল?" গাইড উত্তর দিলো, "আপনারা বই পড়ে নিজের সিদ্ধান্তে আসবেন। সম্রাটের তাই ধারণা ছিল, অনেকের এখনও তাই ধারণা। কোনও বিষ ওঁকে নিয়মিত দেওয়া হতো—স্লো পয়জন। তবে ইংরেজের বইতে বলছে, তাঁর পেটে ক্যান্সার হয়েছিল। ময়না তদন্তের রিপোর্টেও তাই লেখা আছে।"

সেন্ট হেলেনা দ্বীপেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। তারপর বহু বছর পরে ১৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ সালে সম্রাট লুই ফিলিপের চেষ্টায় মৃত নেপোলিয়ন দেশে ফিরলেন। তাঁর বড় সাধ ছিল শ্যেন নদীর তীরে তাঁকে সমাহিত করা হবে।

আমার মনে হলো কোর্সিকার ছেলের রক্তে প্যারিসের হাওয়া ভালভাবেই প্রবেশ করেছিল। প্যারিসের লোকদের তিনি বেশ অপছন্দ করতেন। কিন্তু প্যারিসকে ভালবেসে ফেলেছিলেন নেপোলিয়ন। এ-বিষয়ে অনেকেই তাঁর পদানুসারী। কলকাতার দুষ্টু লোকদের ওপর তিতিবিরক্ত হয়েও অনেকে কলকাতা শহরকে না ভালবেসে থাকতে পারেন না।

গাইড বললো, "আর্চ দ্য ট্রায়াম্প পেরিয়ে, আলিসি প্রাসাদ অতিক্রম করে সম্রাটের দেহাবশেষ এই সৌধে আনা হলো। একটি বেদি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভাইকন্টি নামে স্থপতিকে। পরে তিনিই সম্রাটের মনুমেন্ট তৈরি করলেন কুড়ি বছর ধরে। লাল ও সবুজের অসামান্য সমারোহ, আপনাদের ভাল লাগবে।"

কিন্তু আমেরিকান ট্যুরিস্ট বাহিনীর বৃদ্ধারা ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। লাইনের

ব্যূহ ভেদ করে সম্রাটের কাছাকাছি পৌঁছতে সময় লাগবে। তাঁরা তাঁদের পরবর্তী 'স্কেডিউল' নাড়াচাড়া করতে রাজি নন। একজন মহিলা বলে গেলেন, "বাইরে থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন, সম্রাটকে আমরা বইয়ের ভিতর দিয়ে চিনে নেবো।"

পাঁচুদা আমাকে লাইনে আবার জায়গা করে দিলেন, তারপর বললেন, "ঠিক মতন নেপোলিয়নকে চিনতে গেলে আধডজন ভাষায় দু'লাখ বই হজম করতে হবে। দিনে পাঁচখানা বই পড়লেও কয়েকশ বছর বাঁচতে হবে এবং তদ্দিনে আরও কত বই বেরিয়ে যাবে কেউ জানে না।"

পাঁচুদার ধারণা : নেপোলিয়ন জিতলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতো। ইন্ডিয়া সম্বন্ধে ভদ্রলোকের খুব আগ্রহ ছিল। কারণ, নির্বাসিত জীবনেও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করছেন : ইংরেজের সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত টিকবে না, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই। নির্বাসনকালে একবার এক পার্সি চাকর নেবার চেষ্টা করেছিলেন নেপোলিয়ন, ইংরেজ সে-ব্যাপারেও জল ঘোল করার জন্যে পার্শিকে অ্যারেস্ট করে তাকে বরখাস্ত করেছিল।

সেন্ট হেলেনার গভর্নর লোকটি মোটেই সুবিধের ছিল না।

কলকাতায় আমরা ওয়েলিংটন দেখেছি, ওয়াটার্লু দেখেছি, কিন্তু মহাবীর নেপোলিয়নের নাম দেখিনি, কোনও এক বেরসিক সম্প্রতি ওয়াটার্লুর নাম কেটে সিরাজদৌল্লা সরণি বসিয়ে দিয়েছে, কোনও ইতিহাস চেতনা নেই, রসবোধও নেই।

আমি বললাম, "পাঁচুদা, বাঙালি কিন্তু মনে মনে নেপোলিয়নকে চিরদিন তারিফ করেছে। যাত্রায় নেপোলিয়নের বেশে অভিনেতা শান্তিগোলাপ হাজির হলেই প্রচণ্ড হাততালি পড়তো। আমাদের বাদলকাকুও ছিলেন প্রচণ্ড নেপোলিয়ন ভক্ত। ইংরেজের অফিসে টাইপিস্টের চাকরি করলেও ওঁর ঘরে নেপোলিয়নের ইংরিজি জীবনী ছিল, আর ছিল ফ্রেমে বাঁধানো নেপোলিয়নের ছবি। একসময়ে মহাত্মা গান্ধী, সি আর দাশ ও সুভাষ বোসের ছবির সঙ্গে এই ছবিও হাওড়ার দোকানে ফ্রেম করা অবস্থায় অঢেল বিক্রি হতো।"

পাঁচুদা বললেন, "ওই যে শান্তিগোপালের যাত্রার কথা বললি, নেপোলিয়ন বেঁচে থাকলে উনি নির্ঘাত প্রচুর আদর আপ্যায়ন পেতেন। অত বড় সেনানায়ক, জীবনের বেশির ভাগ সময় রণক্ষেত্রে কেটেছে কিন্তু যখন প্যারিসে থাকতেন তখন থিয়েটার, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্যের মধ্যে ডুবে যেতেন। বছরে গোটা কুড়ি অপেরা তিনি দেখবেনই। নেপোলিয়ন বলতেন, ফরাসি দেশের আত্মা হলো প্যারিস, আর প্যারিসের আত্মা হলো অপেরা। রাজকীয় ফতোয়া জারি করেছিলেন, বছরে অন্তত আটটা নতুন অপেরা প্রোডাকশন করতেই হবে।

মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গাইয়ে ও অভিনেতাদের। আর রোজগার বাড়াবার জন্যে চমৎকার একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা চিরকাল ফুকোটে অভিনয় দেখেছেন। নেপোলিয়ন এই ফ্রি পাশ বন্ধ করে দিলেন। বললেন, তুমি যেই হও বক্সের জন্যে ভাড়া দিতে হবে। ওঁর নিজের বক্সের জন্যেও বাৎসরিক কুড়ি হাজার ফ্রাঁ ভাড়া দেওয়া আরম্ভ করলেন।”

অভিনেতা ও গাইয়েদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সঙ্গেও নেপোলিয়ন জড়িয়ে থাকতেন। কে কি বিপদে পড়েছে জেনে তাকে উদ্ধার করতেন। নেপোলিয়ন আর একটি হুকুম দিলেন কমবয়সী ছেলেদের গলার স্বর অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অস্ত্রোপচারে তাদের নপুংসক করা হতো—এদের বলা হতো ক্যাসট্রাটো। নেপোলিয়নের আদেশে এই জঘন্য ব্যবস্থা ফ্রান্সে বন্ধ হলো। নেপোলিয়ন যাঁর গানের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন তাঁর নাম গিরোলামো ক্রেসেন্টি। একবার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নেপোলিয়ন তাঁর লোহার মুকুট এই শিল্পীর মাথায় পরিয়ে দিলেন। সেনাপতি মহলে চাপা অশান্তি শুরু হলো, কারণ এই দুর্লভ সম্মান যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যের জন্য ছাড়া আর কাউকে দেওয়া হয়নি। গিরোলামো তখন দুঃখে বলে উঠলেন, মনে রাখবেন এই অধমও আহত হয়েছে। গিরোলামো মনে করিয়ে দিলেন, তিনি একজন ক্যাসট্রাটো।

বিয়োগান্ত নাটকেরও মস্ত ভক্ত ছিলেন নেপোলিয়ন। অনেক থিয়েটারের দৃশ্য তাঁর মুখস্থ ছিল। একটা নাটক দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেটা বারাবার দেখবার সময় করে নিয়েছিলেন। এই নাটকের নাম ‘সিনা’। একজন ঐতিহাসিক হিসাব করে দেখিয়েছেন যে নেপোলিয়ন ওই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্তত ১৭৭টা ট্রাজেডি দেখেছিলেন।

“শুধু থিয়েটার নয়,” পাঁচুদা বললেন, “আর্টের সব দিকে তাঁর বিপুল আগ্রহ আজও ফরাসিকে বিস্মিত করে। যেমন ধরো, রণক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠাচ্ছেন, শুনলাম প্যারিসের লুভ্র মিউজিয়ম দর্শকদের জন্যে খুলতে সেদিন দেরি হয়েছে, এবং জনসাধারণের কষ্ট হয়েছে। মিউজিয়মের কিউরেটরকে বলো এরকম গাফিলতি যেন আর না হয়। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।”

পাঁচুদা বললেন, “সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলছি না বলে তুই যেন ভেবে বসিস না ও-ব্যাপারে নেপোলিয়নের আগ্রহ ছিল না। একটা মোক্ষম খবর তোকে শোনাবো, তোরা মনে সুখ পাবি।” এই বলে পাঁচুদা একটু সাসপেন্স সৃষ্টির জন্যে সময় নিলেন। একটা ছোট্ট কৌটো পকেট থেকে বের করে মুখে লবঙ্গ পুরলেন। আমাকেও দিলেন মুখে পুরবার জন্যে।

পাঁচুদা এবার বোমা ফাটালেন, “নেপোলিয়ন তো তোদের লাইনেরই লোক,

সাহিত্যিক হবার বাসনা ছিল।"

"পাঁচুদা, গল্পলেখকরা চিরকলই একটু ভীরু হয়, একমাত্র নজরুল ছাড়া কেউ মিলিটারি ইউনিফর্ম তো দূরের কথা পুলিশের টুপিও মাথায় দেয়নি। বাঙালিরা তা জানে, তাই বীররস আমাদের কাছে প্রত্যাশা করে না। যারা অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয় তাদের ওই যুদ্ধফুদ্ধ ধাতে সয় না, দুনিয়া তা জানে।"

পাঁচুদা আমাকে ফ্ল্যাট করে দিলেন। "নেপোলিয়ন নাকি গল্প লিখেছেন। ভীষণ প্রেমে পড়ে গিয়ে প্রেমের নায়িকাকে গল্পের নায়িকা করে তুললেন নেপোলিয়ন। এই গল্পের পাণ্ডুলিপির একটা অংশ অনেক দিন আগে ঐতিহাসিকদের হস্তগত হয়েছিল, কিন্তু বাকিটা না পাওয়ায় লোকে আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর অতি সম্প্রতি হৈ-চৈ কাণ্ড—মিস্টার নিগেল স্যামুয়েল নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক খোদ নেপোলিয়নের হস্তলিপিতে ক্লিসোঁ এট ইউজেনি গল্পের হারিয়ে যাওয়া অংশ পণ্ডিতদের দেখিয়েছেন। এই গল্পের অন্য অংশ ফরাসি দেশে নেই, আছে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ লাইব্রেরিতে।"

নেপোলিয়নের গ্রন্থপ্রীতি ফরাসি দেশের ছেলেমেয়েদের জানা। ছোটবেলা থেকেই বই পাগল ছিলেন। রণক্ষেত্রেও অবসরকালে বই পড়তেন ভদ্রলোক, বিশেষ করে উপন্যাস ও ইতিহাসের বই। যখন সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে গেলেন তখন ওখানেও দেড় হাজার বই, কিন্তু নেপোলিয়ন আবেদন করলে অন্তত ষাট হাজার বই সঙ্গে না থাকলে জীবন অচল। অসভ্য ইংরেজ এই আবেদনে সাড়া দেয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একখানা ফরাসি উপন্যাস বাঙালিকে মাতিয়েছিল। এই প্রেমের উপন্যাসের আগ্রহী পাঠকদের মধ্যে ছিলেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ। বইটির নাম পল ও বর্জিনিয়া। হঠাৎ এই ফরাসি বইয়ের কলকাতায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণ আমার অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু প্যারিসের লাইনে দাঁড়িয়ে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। এই নির্মল ও মধুর প্রেমের কাহিনী নির্বাসিত সম্রাটের মনোহরণ করেছিল। মরিশাস দ্বীপের পটভূমিতে পল ও বর্জিনিয়ার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের কাহিনী পড়তে পড়তে নেপোলিয়ন অসীম আনন্দ উপভোগ করতেন। নিঃসন্দেহে নির্বাসনজীবনে তাঁর প্রিয়তম বই পল ও বর্জিনিয়া।

সম্রাটের নির্বাসনজীবনের দিনপঞ্জি নিশ্চয় এই সময় বাঙালিকেও আকৃষ্ট করেছিল, ইংরেজের সুপরিকল্পিত চরিত্রহনন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও।

এই ইংরেজই দীর্ঘদিন ধরে নেপোলিয়নকে সমকামী বলে গুজব ছড়িয়েছিল। ব্যাপারটা যে মিথ্যা তা যথাসময়ে প্রমাণিত হয়েছে। নেপোলিয়নের জীবনের দুই নারী সম্বন্ধে আমরা জেনেছি ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে। প্রথম জন প্রাক্তন

বিধবা জোসেফিন, যিনি নিজেও ফরাসি বিপ্লবের সময় অনেক দিন কারাগারে ছিলেন, দ্বিতীয় জন অবশ্যই রাজকুমারী। সাফল্যের শিখরে আরোহণে করে, বংশধরের আকাঙক্ষায় জোসেফিনকে পরিত্যাগ করে রাজকুমারী মারি লুইজকে নেপোলিয়ন বিবাহ করলেন। বিবাহের এক বছরের মধ্যেই তিনি নেপোলিয়নকে পুত্র উপহার দিলেন। এখানে চালু গল্প, প্রসবকক্ষে নিয়ে যাবার সময় চিকিৎসকরা যখন জানতে চাইলেন, বিপদ উপস্থিত হলে তাঁরা জননী অথবা সন্তান কার জীবন রক্ষার চেষ্টা করবেন, তখন নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা করতে হবে। এই খবর শুনে পরে মারি লুইজ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। শোনা যায় এই তরুণী সম্রাজ্ঞী মোমবাতি না জ্বেলে ঘুমোতে পারতেন না, অন্ধকারকে ভীষণ ভয় ছিল তাঁর। আর নেপোলিয়ন ঘুটঘুটে অন্ধকার না হলে ঘুমোতে পারতেন না। ফলে দু'জনে আলাদা ঘরে শুতেন। নির্বাসনের সময়েও নেপোলিয়নের সঙ্গে ছিল সাতখানা ছবি—দুটো মারি লুইজের ও পাঁচখানা ছেলের।

বড়-বড় সংগ্রামের সময়েও ছোট-ছোট ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় বের করে নিতেন নেপোলিয়ন। রণক্ষেত্র থেকে তিনি ফরাসি মেয়েদের ইস্কুল তৈরির বিস্তারিত প্রস্তাব রচনা করে প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন। প্যারিসের রাস্তায় বাড়ির নম্বর কীভাবে হবে সে নিয়েও তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল—এই যে একদিকে জোড় সংখ্যার বাড়ি এবং অন্যদিকে বিজোড় সংখ্যার বাড়ি চিহ্নিত করার প্রথা তা নেপোলিয়নই শুরু করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়নের আগে প্যারিসের রাস্তায় বাড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন কাজ।

ইংরেজ বদনাম ছড়িয়েছে, নেপোলিয়ন নিজের প্রচারে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে, প্লেস দ্য কনকর্ডের নাম পাল্টে প্লেস দ্য নেপোলিয়ন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্যারিসের নাগরিকরা, নেপোলিয়ন রাজী হন নি, ভেটো দিয়ে ক্ষেত্রস্থান বন্ধ করেছিলেন।

এই সম্রাটের বেদনাময় নির্বাসিতজীবন আজও পৃথিবীর মানুষকে নাড়া দেয়। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ন সম্পর্কে কত বই যে লেখা হলো তার শেষ নেই, কিন্তু এখনও পাঠকের কৌতূহল কমেনি। তাঁর এক ভৃত্যের রোজনামচা এই এতো দিন পরে মাত্র সেদিন প্রকাশিত হয়ে হৈ-চৈ ফেলে দিলো। আরও কত অপ্রকাশিত তথ্য, রোজনামচা, চিঠি-পত্র এখনও এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে আছে তা আন্দাজ করা শক্ত।

নেপোলিয়ন ষাটটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং নির্বাসিতজীবনে এই সব যুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিকাহিনী লেখা শুরু করেন। সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের দিন কাটতো বাঁধা ছকে। ভোর ছ'টায় ভ্যালে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে।

ড্রেসিং গাউন এবং লাল মরক্কো চামড়ার চটি পরে তিনি চা ও কফি সেবন করবেন, তারপর দাড়ি কামাবেন। এর পর ওঁকে একটু শরীর দলাইমলাই করা হবে অডিকোলন সংযোগে এবং সম্রাট কিছুক্ষণ ঘোড়ায় চড়বেন। দশটায় বাগানে তাঁবুর নীচে বসে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। প্রথমে গরম স্যুপ। তাঁর প্রিয় স্যুপ দুধের মধ্যে ডিম। এর পর গ্রিল্‌ড অথবা রোস্ট মাংস। কিছু সবজি, রফফোর্ট চিজ ও কফি।

লাঞ্চের পরে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ডিকটেশনের মাধ্যমে বই লেখা। তারপরে দেড় ঘণ্টা বাথটবে শরীর ভেজানো ও সেই সঙ্গে বই পড়া। এর পর ঘোড়ায় একটু ঘুরে বেড়ানো। সন্ধ্যাবেলায় একটু কেতাদুরস্ত ব্যাপার। সবুজ উর্দি পরে বেয়ারা ঠিক আটটায় ঘোষণা করবে—ডিনার। নির্বাসনের চার বন্ধু এবং ওঁদের আত্মীয়া দুই মহিলা নিয়ে পাঁচ কোর্সের ডিনারে বসবেন সম্রাট। শেষ পর্যায় আসবে নীল রঙের ওপর সোনালি দাগ দেওয়া ছোট্ট কাপে কফি। কফি পাত্র নামিয়ে নেপোলিয়ন হঠাৎ বলে বসবেন, এবার তা হলে থিয়েটারে যাওয়া যাক। আজ আপনাদের কী পছন্দ—মিলনান্ত না বিয়োগান্ত নাটক?

কোথায় নাট্যশালা? বন্দীশালায়। আনন্দ প্রকাশ করা হতো নাটক পাঠ করে—বিশেষ করে মলিয়ারের রচনা। এগারোটা পর্যন্ত চলতো এই নাট্যপাঠ, এবারে সম্রাটের বিছানায় যাবার সময় সামান্য আলোতে তখনও বই পড়ে শোনানো হবে তাঁকে, যতক্ষণ-না তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। কখনও কখনও রাত তিনটেতে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতো ইঁদুরের উপদ্রবে। সম্রাটের শেষ আশ্রয়ে শত শত ইঁদুরকে ইংরেজ কেন প্রশ্রয় দিয়েছিল তা আজও জানা যায়নি।

কখনও-কখনও ছ' ঘণ্টা বই ডিকটেশন দিতেন নেপোলিয়ন, নাটক পাঠ চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। বিছানায় যাবার আগে সম্রাট তার সঙ্গীদের বলতেন, সময়ের সঙ্গে লড়াইয়ে আজও তা হলে জেতা গেলো।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন নেপোলিয়ন ইতিহাসের বই থেকে নানা বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে রাখতেন।

এই নেপোলিয়নকে নানাভাবে কাঠি দিতেন সেন্ট হেলেনার ইংরেজ গভর্নর লো। টাকা বাঁচাবার জন্যে খাওয়ার জিনিসপত্রের সরবরাহ কমিয়ে দিতেন এই ধূর্ত ইংরেজ এবং একবার নিজেই সেই খবরটা নেপোলিয়নকে দিতে এলেন। নেপোলিয়নের উত্তর: "আপনাকে খাওয়াতে বলছে কে? নীচেই তো পাহারাদার ইংরেজ সৈন্যদের ক্যাম্প রয়েছে, আমি ওখানে গিয়ে বলবো ইউরোপের বয়োজ্যেষ্ঠ সৈনিক আপনাদের মেসে আসবার অনুমতি ভিক্ষা করছে। আমি ওদের সঙ্গেই খাবো।"

ধূর্ত লো-র মন গলেনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল যে নির্বাসিত সম্রাট

একে-একে তাঁর রূপোর বাসনপত্র বেচে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর আগে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, "এবার আমাকে নিজের জামাকাপড় বিক্রি করতে হবে।"

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে আত্মসমর্পণের সময় নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আপনারা ভীষণ ভাগ্যবান জাত।" লো-এর হাতে নিগৃহীত হয়েও ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—ইউরোপের মধ্যে সবেচেয়ে সাহসী জাত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বন্ধেও প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি। তবে ইংরেজ যে হিংস্র জাত সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। নেপোলিয়ন বলতেন, "অষ্টম হেনরির কথা ভেবে দেখুন। যে দিন স্ত্রী অ্যান বলিনের শিরচ্ছেদ করালেন তার পরের দিনই বিবাহ করলেন লেডি সেমুরকে। ফ্রান্সে এ-কাজ কেউ করতে পারতো না। এমন কি সম্রাট নিরো পর্যন্ত না।"

ইংরেজ পুরুষের পাব-এ মদ্যপান আসক্তিও নেপোলিয়ন ভাল চোখে দেখেননি। "আমি যদি ইংরেজ মেয়ে হতাম তা হলে পুরুষমানুষের এই দু-তিন ঘণ্টা ধরে শুঁড়িখানায় মদ গেলা আমার মোটেই ভাল লাগতো না।"

নির্বাসিতজীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়েও সম্রাট নেপোলিয়ন খোলাখুলি কথা বলতেন। কী করে মাত্র ১৮ বছর বয়সে এক শীতের সন্ধ্যায় প্যারিসে এসে এক গণিকার সংসর্গে তাঁর কৌমার্য হরণ হয়। মেয়েটি প্রচণ্ড শীতে পথে দাঁড়িয়ে খরিদ্দারের জন্যে অপেক্ষা করছিল দেখে নেপোলিয়নের মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা জানেন এবং নেপোলিয়ন শেষ জীবনে নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনে সাতটি রমণীর কথা, তার মধ্যে দু'জন ছিলেন অভিনেত্রী। প্রিয় রমণীদের জন্যে বিশেষ নামকরণ করতে ভালবাসতেন নেপোলিয়ন। যাঁকে আমরা জোসেফিন বলে জানি তাঁর আসল নাম রোজ। অপরূপা অভিনেত্রী মাদময়জেল জর্জ-এর শরীর ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন নিজের ভৃত্যের হাতে। সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অভিনেত্রী এলেন রাজপ্রাসাদে, সমস্ত রাত্রিযাপন করলেন তাঁর সঙ্গে। নেপোলিয়ন তাঁর নতুন নাম দিলেন জর্জিনা। শোনা যায়, এই অভিনেত্রীর জন্যে নেপোলিয়ন নিজেই এক ধরনের ইলাসটিক গার্টার ডিজাইন করিয়েছিলেন যাতে জামাকাপড় খুলে শরীর অনাবৃত করে আবার পরতে বিশেষ অসুবিধা না হয়। প্রভাতে যুদ্ধযাত্রার সময় সমাগত, রণবীর নেপোলিয়ন এবার জর্জিনাকে আপ্যায়ন করলেন তাঁর প্রিয় গ্রন্থগারে। বিদায়ের মুহূর্তে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁর নোটের মোড়ক গুঁজে দিয়েছিলেন ব্রাউজের মধ্যে দুটি স্তনের মধ্যিখানে।

কিন্তু নির্বাসিত মৃত্যুপথযাত্রী সম্রাটের মনে ছিল অন্যায়বোধ—প্রথমা স্ত্রী জোসেফিনের প্রতি তিনি সুবিচার করেননি। পরিত্যক্তা জোসেফিন তাঁর অনেক

আগেই পরলোকগমন করেছেন ডিপথেরিয়া রোগে। এই অসাধারণ মহিলা ডাইভোর্সড হয়েও কিন্তু সম্রাটকে ভুলে যাননি—দ্বিতীয়া স্ত্রী যখন পুত্রসন্তানের মা হলো, প্যারিসে যখন শতাধিক তোপধ্বনি হলো তখন জোসেফিন অভিনন্দন জানিয়ে সম্রাটকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে মারি লুইজ সম্বন্ধে নেপোলিয়নের প্রচণ্ড দুর্বলতা। তাকে একবার দেখবার জন্যে কী আকুতি। এর জন্যেই নেপোলিয়ন মৃত্যুকালে নির্দেশ দিলেন। তাঁর হৃদয়যন্ত্রটি কেটে অ্যালকহলে ডুবিয়ে যেন স্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। নেপোলিয়নের মৃতদেহ থেকে এই হৃদয় কেটে আলাদা করা হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী তা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নি। এই রাজতনয়া তখন যে এক অসট্রিয়ান অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে প্রেমে ডগমগ তা নেপোলিয়ন বোধ হয় জানতেন না। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পরের বছরই মারি লুইজ আবার বিয়ে করেন এই একচোখ কানা ভদ্রলোককে। ইতিমধ্যেই নতুন প্রিয়তমের ঔরসে তিনি দুটি সন্তানের জননী হয়েছেন। তিন বছর পরে ১৮২৪ সালের শুভ ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি তৃতীয়বার বিবাহ করেন, এবং বেঁচে থাকেন আরও অনেক বছর। এই রমণীর মৃত্যু ভিয়েনায় ১৮৪৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর।

নেপোলিয়নের জীবনচর্চা করে বহু পণ্ডিত যে সারাজীবন অতিবাহিত করতে পেরেছেন তার একটা কারণ এই জীবনের নাটকীয়তা। এমন সংঘাত, এমন সাফল্য, এমন ব্যর্থতা, এমন প্রেম, এমন হৃদয়হীনতা একসঙ্গে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের জীবনে আর কখনও বোধহয় পাওয়া যাবে না।

আমি জানতাম না যে নেপোলিয়ন বাল্যবয়সে ইংরেজের নৌসেনায় শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করেছিলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে আবেদনপত্রের কোনও উত্তর আসেনি, এলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আমি জানতাম না, নেপোলিয়ন ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পূর্ববর্তী পর্বে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বিষপান করে। সে-প্রচেষ্টা অল্পের জন্যে সফল হয়নি। আমি জানতাম না, নেপোলিয়ন জীবনের শেষ পর্বে এলবা থেকে কাতর অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ডাইভোর্স করা স্ত্রী জোসেফিনকে চিঠি লিখবার জন্যে। অভিমানিনী জোসেফিন কোনও চিঠি পাঠাননি। আমি জানতাম না, এক পোলিশ অভিজাত মহিলার সঙ্গে গোপন সম্পর্কের ফল হিসাবে নেপোলিয়নের একটি জারজ পুত্রসন্তান ছিল। এই মহিলা কিন্তু চরম বিপদের সময়েও নেপোলিয়নকে অবহেলা করেননি এবং গোপনে তাঁর পুত্র সন্তানকে নিয়ে এলবা দ্বীপে নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমি জানতাম না, নেপোলিয়ন তাঁর আদরের বোন পলিনের জন্যে কোনও যোগ্য পাত্র জোগাড় করতে পারেননি এবং এই পলিন তাঁর দাদার সঙ্গে এলবা দ্বীপে দেখা করতে

এসেছিলেন। নেপোলিয়নের মা এলবাতে এসেছিলেন গোপনে নাম ভাঁড়িয়ে, মিসেস ডুপঁ এই ছদ্মনামে। নীচ ফরাসিরা প্যারিসে গুজব রটিয়েছিলেন বোন পলিনের সঙ্গে, নেপোলিয়নের অবৈধ সম্পর্ক আছে, যদিও পরে তা সত্য প্রমাণিত হয়নি।

নেপোলিয়নের সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি আইনের সংস্কার—তাঁর কোড নেপোলিয়ন পৃথিবীর সব দেশের আইনের ওপর কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরাসিরা প্রায় দু'শ বছর ধরে এই আইনকে মেনে চলেছে, অতি সম্প্রতি কিছু সংশোধন হয়েছে। আমার জানা ছিল না, নেপোলিয়ন আইন করেছিলেন কোনও বিবাহিত পুরুষ মিসট্রেস রেখেছেন প্রমাণিত হলে তাঁর অর্থ জরিমানা হবে। এই আইন সংশোধন করে পুরুষ ফরাসি সম্প্রতি নিশ্চিন্ত হয়েছে, কিন্তু বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ নাকি এখনও এই নিয়মের সংশোধন করেনি। ফলে সেখানে এখনও বিবাহিত অথচ অসংযমী পুরুষদের বিশেষ মনোকষ্ট।

নেপোলিয়ন ভীষণ হিসেবি মানুষ ছিলেন। সরকারী টাকা অপচয় তাঁর দু'চোখের বিষ ছিল। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ-এর যে রাজনীতি সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের বাজেটে চালু হয়েছে তা নেপোলিয়ন মনেপ্রাণে অপছন্দ করতেন। প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের চোখে কড়াক্রান্তির ভুল হিসেবও ধরা পড়ে যেতো। একবার বিখ্যাত এক সরকারি বিভাগের খরচ অনুমোদন করতে গিয়ে নেপোলিয়ন এক ফ্রাঁ পঁয়তাল্লিশ সেন্টের ভুল বের করে ফেললেন, তার পরেই স্থাপিত হলো সরকারি অডিট বিভাগ।

উৎসাহ না পেলে মানুষ যে উদ্যমী থাকে না তা জানতেন নেপোলিয়ন। কিন্তু অর্থই কি মানুষের একমাত্র ইনসেনটিভ? এ-বিষয়ে নেপোলিয়ন অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন, স্বীকৃতি এবং সম্মানেরও মস্ত ভূমিকা আছে মানবসংসারে। মানুষ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় তখন ক'টা টাকার জন্যে ওই ত্যাগ করে না নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দেশের সম্মান রক্ষার বৃহত্তর প্রশ্ন।

আবার ফিরে আসতে হচ্ছে নেপোলিয়নের অন্তিমপর্বে। সেন্ট হেলেনায় চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো। চিঠি লিখে তিনি একজন পাদ্রি এবং একজন ডাক্তারের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছিলেন। শেষ পর্বে নেপোলিয়নের ডাক্তার ভাগ্য ভাল ছিল না। শরীর খারাপ হওয়ায় একজন ইংরেজ ডাক্তার তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছিলেন এবং এই সৎ ইংরেজ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বন্দির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্যে এই ডাক্তারকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। নিচুমন ইংরেজ গভর্নরসায়েব ডাক্তারের কোর্টমার্শালের হুকুম দিলেন এবং যথাসময়ে

তার চাকরিটি গেলো।

ডাক্তারদের সম্বন্ধে নেপোলিয়নের কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য কলকাতায় আমার ডাক্তার বন্ধুদের জন্যে নোট করে নিয়েছিলাম। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, মৃত্যুটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু ধর্মযাজক এবং ডাক্তারদের জন্যেই মৃত্যু ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

নেপোলিয়ন তাঁর নির্বাসনের বন্ধুদের নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীতে প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ানরাই ডাক্তারের ব্যাপারে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিল। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তাকে বাড়ির বাইরে দাওয়ায় শুইয়ে দেওয়া হতো, যাতে পথচারীরা যাবার সময় তাকে দেখে কী রোগ হয়েছে সে-সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিতে পারেন। যাঁরা একই রোগে কষ্ট পেয়েছেন তাঁরা বলে যেতেন কীভাবে তাঁদের রোগ সেরেছিল। ফলে একজন ডাক্তারের মতামতের ওপর নির্ভর করে কাউকে ভুল চিকিৎসায় মরতে হতো না।

নেপোলিয়নের অন্তিমকালে বছরে হাজার ফ্রাঁ মাইনে দিয়ে যে দেশোয়ালি ডাক্তারকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে রাখা হয়েছিল তার ওপর সম্রাটের ছিল প্রচণ্ড বিরক্তি। ডাক্তারটি নাকি চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুই বুঝতো না। নেপোলিয়ন যে গুরুতর অসুখে ভুগছেন তাও এই ডাক্তার বিশ্বাস করতো না। নেপোলিয়নের তখন ধারণা তিনি পেটের ক্যানসার রোগে ভুগছেন এবং ইংরেজের ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। সে-সময় ধারণা ছিল ক্যানসার বংশানুক্রমিক ব্যাধি, ফলে নেপোলিয়নের সারাক্ষণ চিন্তা ছিল তাঁর শিশুপুত্রটি সম্বন্ধে। এই রাজকুমারও কি শেষ পর্যন্ত একই রোগের বলি হবে?

একবার নেপোলিয়ন খুব কষ্ট পাচ্ছেন। তখন দেশোয়ালি ডাক্তার এলো এবং তেমন কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করলো না। নেপোলিয়ন বললেন, "আমি আমার মৃত্যুকালীন উইল রচনা করছি, এই উইলে আমি ডাক্তারের জন্যে কুড়ি ফ্রাঁ রেখে যাবো।" যদি ডাক্তার সম্বন্ধে এই অভিযোগ তা হলে কুড়ি ফ্রাঁ বা রেখে যাওয়া কেন? নেপোলিয়ন বললেন, "ওই টাকায় ডাক্তার একটা দড়ি কিনে গলায় দড়ি দিতে পারবে।"

নেপোলিয়নের গল্প শেষ হবার নয়। পাঁচুদা মিনিটে-মিনিটে চমক দিয়ে যেতে পারেন।

আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমরা লাইন ধরে নিজের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। মাথা নিচু করে আমরা মহাবীর নেপোলিয়নের সমাধি কক্ষে ঢুকে পড়ে স্তম্ভটি প্রদক্ষিণ করলাম। সেন্ট হেলেনায় মৃত্যুর অনেক দিন পরে ইংরেজ নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর লোকটি সমাধিক্ষেত্র থেকে উঠে এসে বিশ্বসংসারকে আবার নাড়া দেবে না। এঁরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছেন, মৃত্যুকালে নেপোলিয়নের

আতঙ্ক ছিল নিষ্ঠুর ইংরেজ তাঁর দেহটা নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে ওখানেই পুঁতে রাখবে কারণ জীবিত নেপোলিয়ন থেকে মৃত নেপোলিয়ন কোনও অংশেই কম বিপজ্জনক নয়। কিন্তু সময় সব ব্যাপারে স্বস্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। ইংরেজরা অবশেষে ফরাসি জাতকে তাদের প্রিয় নেপোলিয়নকে ফেরত দিলো যাতে তাঁর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী শ্যেন নদীর ধারে চিরবিশ্রাম লাভ করতে পারেন।

কত দিন আগেকার সব কথা। আমাদের সামনেই দু'টি ইংরেজ ছেলেমেয়ে পরমবিস্ময়ে সম্রাট নেপোলিয়নের সমাধির দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম। তখন বিশেষ কাউকেই ওয়াটার্লু-বিজয়ী ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সমাধিক্ষেত্রে যেতে দেখিনি। ইতিহাসের এক রহস্যময় রসিকতায় পরাজিত সম্রাট নেপোলিয়নই বিশ্বের হৃদয়সিংহাসনে বসে রয়েছেন, যাঁরা তাঁকে হারিয়েছিলেন তাঁদের কোনও পাত্তাই নেই।

লে ইনভ্যালিড থেকে বেরুবার সময় পাঁচুদা বললেন, "এখানকার মিলিটারি মিউজিয়ম দেখবি নাকি?" আমি উৎসাহ দেখালাম না। পাঁচুদা বললেন "নির্বাসিত সম্রাট মানসচক্ষে ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়েছিলেন। সেন্ট হেলেনায় যখন তাঁকে খুব হেনস্থা করা হচ্ছে তখন দুঃখ করে নেপোলিয়ন ওখানকার গভর্নরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহারই করো মনে রেখো ইতিহাস তোমাদের মনে রাখবে না, আমি কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়ন হিসাবেই অনন্তকাল টিকে থাকবো।"

হে ঈশ্বর, ক্ষমা করো। প্যারিসের রাত্রিজীবন আমাকে টানছে। এই মানবসমুদ্রে এসে যে মানুষ আঠারো নম্বর আরোঁদিসাম অঞ্চলে একটু ঘুরে বেড়ালো না, একবার ঢুঁ মারলো না মোহময়ী নাইট ক্লাবে, তার মানবশরীর ধারণের কী প্রয়োজন? ইন্দ্রিয়জয়ীদের জন্যে তো রয়েছে হিমালয়ের গুহা এবং হরিদ্বার ও কঙ্খল। বাসনার বন্ধন যদি ছিন্ন না হয়ে থাকে তা হলে মন চলো প্যারিসের নিশিকেতনে। সমস্ত পৃথিবী ইতিমধ্যেই তার স্বাদ পেয়ে গিয়েছে।

দুনিয়ার মানুষের মনের ভিতরটা ফরাসির থেকে কেউ ভাল বোঝে না। সে জানে যেমন গোলাপজল ছিটিয়ে বিপ্লব হয় না তেমন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর

মানুষ প্রমোদে মন ঢেলে দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই প্যারিসের নৈশসদনগুলি হয়ে উঠেছে পুরুষ ও রমণীর লীলাক্ষেত্র। এখানে রাজার তনয় থেকে আরম্ভ করে কোটিপতি শ্রেষ্ঠীর নিত্য যাতায়াত। অমন যে অমন গোমড়ামুখো ইংরেজ, যে নিজের দুর্বলতাগুলোকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে ভালবাসে, সেও প্যারিসের মায়ামোহে পড়ে যায়। এই ইংরেজের মধ্যে খোঁজ করলে রাজপরিবারের সন্তানদেরও পাবেন—দু'জন তো প্যারিসের ইতিহাসে নামধাম লিখিয়ে ফেলেছেন। একজন রানি ভিক্টোরিয়ার ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস, যিনি পরে সপ্তম এডোয়ার্ড নামে ইংলন্ডেশ্বর হয়েছিলেন। ভারতসম্রাট হিসাবে তাঁর একটি ডাকনামও জুটেছিল—গাঁয়েগঞ্জে এখনও তাঁকে নেড়া রাজা বলে ডাকা হয়। আর একজন অষ্টম এডওয়ার্ড, প্রেমের টানে সিংহাসন ত্যাগ করে যিনি নতুন নামে ফরাসি দেশে এলেন নির্বাসিত জীবন যাপন করতে। এও এক ইতিহাসের রসিকতা। ফরাসীর নির্বাসন হয় ইংরেজের কাছে, আর ইংরেজের নির্বাসন হয় ফরাসি দেশে।

উদার গৃহস্বামী হিসাবে সম্বিৎ আমার জন্যে সব রকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিছুক্ষণের জন্যে সে আমাকে প্যারিসের নিষিদ্ধ অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল যে অভিজ্ঞতা রীতিমত অস্বস্তিকর। বিশেষ এই অঞ্চলে শত-শত 'সেক্স শো' নামক বস্তু জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে যত রকম ইলেকট্রনিক পদ্ধতি আছে তার সুনিপুণ ব্যবহার করছে। মনে হলো এই প্রদর্শনীগুলি অনেকটা ভিডিও পার্লারের মতন, যেখানে রমণীশরীর ও ভিডিও ছায়ার সহযোগিতায় ট্যুরিস্টের কষ্টার্জিত অর্থ হাতানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে শত-শত দোকান যার শোকেসে সেক্স সহায়ক নানা যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালসের বিপুল আয়োজন। কুখ্যাত এই পাড়ায় আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নানা মুদ্রিতপুস্তক—যা শুধু ফরাসি নয়, আরাবিক, ইংলিশ, চাইনিজ ও জাপানি ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। কে বলে পয়সা পেলে ফরাসি অন্যের ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহী হয় না? পথে ডজন-ডজন লোক যে-সব পুরুষ-মনোহারী পিকচার কার্ড বিক্রি করছে তার নাম কেমন করে ফ্রেঞ্চ পিকচার হলো তা আমার অজ্ঞাত। অথচ ফরাসির থেকে ক্লাসিক ছবি কে বেশি বোঝে?

পয়সার জন্যে ফরাসি পারে না এমন কাজ নেই, কারণ নিষিদ্ধপল্লীতে সমকামীদের জন্যেও স্পেশাল দোকান রয়েছে। প্রতি দোকানের শোকেসেই যা নজরে পড়লো তা হলো মোটা-মোটা চামড়ার কোমরবন্ধনী, হাতকড়া (যা আমাদের দেশে হ্যান্ডকাফ বলে পরিচিত) এবং চামড়ার চাবুক, যা একসময় দুর্দান্ত বাঙালি জমিদারদের হাতেও দেখা যেতো। এই সব যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া যাঁরা শরীরে পুলক বোধ করেন না তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হবার

কারণ আছে। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন মলমের সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে চামড়ার গগলস্ যা ইংরিজি কমিকসের জনপ্রিয় নায়কদের অনেকসময় পরতে দেখা যায়।

প্যারিসের আকাশ মেঘলা, বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তবু এ-পাড়ায় ভিড়ের কমতি নেই। শীর্ণকায়া মহিলা কিম্ভূতকিমাকার বেশবাস করে ছোট-ছোট গলির সামনে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার পাকড়ানোর চেষ্টা করছেন।

ফরাসি জাতের তো এখন অনেক পয়সা, তবু এই সব ব্যবসায়ে মেয়েদের কেন আসতে হয় তা জানতে আগ্রহ হয়। আমি এবার একটা ধাক্কা খেলাম। শুনলাম, জাত-ফরাসির এসবে তেমন আগ্রহ নেই। এই সব ব্যবসায়ের সিংহভাগ এখন বিদেশিদের কব্জায়, যারা এসেছে আরব দেশ থেকে অথবা সাগরপারের পুরনো ফরাসি সাম্রাজ্য থেকে।

একটা শহরে কত সেক্স শপ থাকতে পারে তা ভাববার কথা! অথচ রাস্তার নামটি এক খ্রিস্টান সন্তের নামে—সাঁ ডেনিস। স্বদেশের সিনেমা-রসিকরা শুনে কষ্ট পাবেন এ-পাড়ার জনপ্রিয় সেক্স শপের নাম সিনে ক্লাব। একেবারে রক্তমাংসের সেক্স থিয়েটারেরও ব্যবস্থা আছে বেশ কয়েকটি, একটির নাম থিয়েটার সেন্ট ডেনিস। অথবা, মাত্র কুড়ি ফ্রাঁতে খুপরিতে চোখ লাগিয়ে দেখো 'পিপ শো'। আছে অজস্র সিনে সেক্স শপ। নতুন একটি যন্ত্র বহু শো কেসে পাওয়া যাচ্ছে—নাম 'লাভ লাভ রিং'। হ্যান্ডবুকে মাত্র সাড়ে তিন শ ফ্রাঁ! একালের ফরাসি স্পেশালেইজেশনে বিশ্বাসী, তাই হেট্রো, হোমো এবং লেসবিয়নদরে জন্যে আলাদা-আলাদা পসরা খুলে বসে আছে প্যারিসের শ্রেষ্ঠীরা।

যে-মানুষটির নামাঙ্কিত রাস্তায় ফরাসি দুনিয়ার যৌন ক্ষুধার পসরা বসিয়েছে তিনি ছিলেন অকৃতদার। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর কোনও সময়ে রোম থেকে তিনি গ্যল দেশে এসেছিলেন আরও ছ'জন যাজকের সঙ্গে খ্রিস্টের মহিমা প্রচার করতে। যথাসময়ে তিনি প্যারিসের প্রথম বিশপ হন এবং সম্ভবত ২৫৮ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট ভ্যালোরিয়ানের নির্দেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফরাসি শহরে যে লোকগাথা আছে সে-অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হওয়ার পরে সেন্ট ডেনিসের মুণ্ডহীন দেহটি একজন অ্যানজেলের সাহায্যে হাঁটতে হাঁটতে বধ্যস্থল থেকে গির্জা পর্যন্ত গিয়েছিল। এই সন্ত সম্বন্ধে ধর্মীয় মহলে এখনও যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা থাকলেও রু সেন্ট ডেনিস ধরে হাঁটতে-হাঁটতে আপনার মনে হতে পারে এই সাধুটিকে আজও এখানে প্রতিদিন কোতল করা হচ্ছে।

কামদেহের পূজারতিতে প্যারিসে আরও বিশাল আয়োজন আছে। যাকে বলা হয় রাত্রিজীবন। যেমন লিডো, যেখানে উচ্চশ্রেণীর নৃত্য-গীতের মাধ্যমে বিনোদনের অঢেল ব্যবস্থা। আমাদের কলকাতাতেও একদিন সবচেয়ে অভিজাত

পানশালার নাম ছিল লিডো বার—ফারপোর সেই চিত্ত-চমৎকারী আনন্দশালায় একসময় এক বঙ্গললনা পাশ্চাত্য নৃত্য আয়ত্ত করে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু প্যারিসের লিডো ও কলকাতার লিডোর মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মুলাঁ রুজ নামটিও কলকাতায় অচেনা নয়। পার্ক স্ট্রিটে এক বাঙালি ভদ্রলোক তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর সাহায্যে এই রেস্তোরাঁ ও পানশালাটি সৃষ্টি করেছিলেন। 'চৌরঙ্গী' উপন্যাস রচনাপর্বে এই সব রেস্তোরাঁ ও বার-এর ইতিবৃত্ত আমার আয়ত্তে ছিল। কলকাতার মুলাঁ রুজ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারতাম আমার এক শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক অভিভাবকের কাছ থেকে, যিনি প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সায়েবপাড়ায় একমাত্র বাঙালি প্রতিষ্ঠান মুলাঁ রুজ তখন টিমটিম করে জ্বলছে এবং আমার অভিভাবকটি এটিকে প্রাণবন্ত রাখার জন্যে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

কলকাতার মুলাঁ রুজের প্রবেশ পথে একটা লাল উইণ্ডমিল বা হাওয়া কল ছিল। এই হাওয়া পথচারীদেরও দৃষ্টি হরণ করতো। মুলাঁ রুজ মানেই যে লাল হাওয়া কল তা জানতে আমাকে প্যারিসে আসতে হলো। যেসব ভারতসন্তান ও বাংলাদেশী প্যারিসে আসেন বংশানুক্রমে তাঁরা মুলাঁ রুজের দর্শক। অনেক ট্যুরের টিকিটেই মুলাঁ রুজের সঙ্গে আগাম ব্যবস্থায় পাকাপাকি সিট সংগৃহীত থাকে। এই প্রমোদকেন্দ্রের ডজনখানেক বিবরণ অন্তত বিভিন্ন সময়ে আমি বাংলা পত্রপত্রিকায় পাঠ করেছি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এই সব বিবরণীর লেখক ছিলেন পুরুষরা। পরে অবাক হয়ে আমি মহিলাদের রচনাও পাঠ করেছি, যাঁরা দুরুদুরু বক্ষে স্বামীকে চোখে-চোখে রাখবার জন্যে নাইটলাইফে তাঁর সঙ্গিনী হয়েছেন এবং অবশেষে লিপিবদ্ধ করেছেন মুলাঁ রুজের নিষিদ্ধ কাহিনী।

মুলাঁ রুজে সাম্প্রতিক যে সৃষ্টি দুনিয়ার আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছিল তার নাম 'মেয়ে মেয়ে মেয়ে'। পুরুষসমাজের পক্ষে পুলকিত হওয়ার মতনই নাম! এই শো প্রতিরাত্রে দু'বার হয়। এবং হল্‌টিতে কত লোককে একত্রে বসানো যায় তাও জেনে রাখা মন্দ নয়—বারোশ। অর্থাৎ পানীয় সহযোগে প্রতিদিন আড়াই হাজার অতিথির আপ্যায়ন। মুলাঁ রুজের জনপ্রিয়তা যে তুঙ্গে তার প্রমাণ শোয়ের আসন বোঝাই হতে আরম্ভ করে ছ'মাস আগে থেকে।

মুলাঁ রুজে অবশ্যই আমাকে যেতে হবে, কিন্তু অন্য কারণে দুনিয়া ঘুরে-ঘুরে অবশেষে আমি একটি দুর্লভ বাঙালি মানিকের খোঁজ পেয়েছি, যিনি দীর্ঘসময় ধরে আন্তর্জাতিক এই রঙ্গশালার সঙ্গে যুক্ত।

না, আমি লিডো যেতে চাই না, অপেরা যেতে চাই না, কিন্তু বাবলু মল্লিকের সন্ধানে মুলাঁ রুজে পা দিতেই হবে।

সম্বিৎ গৃহিণী কাকলির মুখে যেন একটু মৃদু হাসি দেখলাম। ওকে বোঝালাম, "ভেবো না প্যারিসে হাওড়ার দাদা শেষ পর্যন্ত মজলো!" রু সেন্ট ডেনিস থেকে কোনও শোতে না ঢুকে চলে এসেছি, কিন্তু মুলাঁ রুজ আমাকে টানছে। দুনিয়া-বিখ্যাত ওই প্রতিষ্ঠানে মেড-ইন-বেঙ্গল একজন শিল্পী বছরের পর বছর ধরে দর্শকদের মোহিত করছেন অথচ আমরা দেশে বসে তাঁর কথা জানি না এটা ভাল কথা নয়।

জানতে চাইলাম, মুলাঁ রুজ সপ্তাহে ক'দিন খোলা থাকে? শুনলাম, সপ্তাহে সাতদিন। বছরে তিনশ পঁয়ষট্টিদিন ওখানে সুর ও নৃত্যের অপ্সরাদের উৎসব। স্মরণীয় কালের মধ্যে একদিন মুলাঁ রুজের দরজা বন্ধ হয়েছিল, তার কারণ ওই দিন ওখানকার সমস্ত শিল্পীরা উড়ে গিয়েছিলেন ইংলন্ডের রানির আমন্ত্রণে তাঁর জন্যে একটি শো করতে।

এবার আমার মাথা ঘুরে যাবার পালা। গত দশ বছরে মুলাঁ রুজে সাত হাজারের বেশি শো হয়েছে, এবং কম পক্ষে সত্তর লক্ষ দর্শনার্থী পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে প্যারিসের এই আনন্দতীর্থে আমাদের বাবলু মল্লিকের শো দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং হাততালি দিয়েছেন।

আর কিছু দেখা না হোক বাবলু মল্লিককে একবার দেখতেই হবে আমাকে, না-হলে এই মানবসাগর পরিক্রমা অপূর্ণ থেকে যাবে।

সম্বিৎ আমার ব্যাপারটা বুঝেও মিটিমিটি হাসছে। আমাকে একটু উসকে দিচ্ছে। আমি বললাম, "সোজাসুজি একটা কথা বলে ফেলছি, দেশছাড়া হয়ে দুনিয়ার হাটে অনেক ভারতীয় এবং অনেক বাঙালি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যবসায়, পেশায়, চাকরিতে, অধ্যাপনায়, গবেষণায় তাঁরা নতুন-নতুন দেশে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন, কিন্তু একটা ব্যাপারে বিরাট শূন্যতা থেকে গিয়েছে। ভারতীয়রা এখনও শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীত, নৃত্যে দুনিয়ার কোথাও কল্কে পায়নি। একা জুবিন মেটাকে দেখিয়ে আমরা আর কতদিন চালাবো?"

সম্বিৎ স্বীকার করলো, ব্যাপারটা ভাববার কথা। আমি বললাম, "ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এটা তো মস্ত অভিযোগ। ইউরোপ-আমেরিকার আর্ট বাজারে এমন একজন প্রবাসী ভারতীয় শিল্পী নেই যাঁকে এক ডাকে সবাই চেনে। স্বদেশ থেকে দল নিয়ে এসে ভারতীয় নৃত্য অথবা সঙ্গীতকে জাতে তোলার চেষ্টা হয়েছে—উদয়শঙ্কর অথবা রবিশঙ্কর সাময়িক একটু নজর কেড়েছেন, কিন্তু এখানকার পরিমাপে তা সমুদ্রের একঘটি জলমাত্র। বিদেশি সাহিত্যেও প্রায় একই অবস্থা, যদিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক প্রবাসী ভারতীয়ের বংশধর নইপল ছোটখাট ব্যতিক্রম।"

ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব এখনও অসাধারণ। প্রভুপাদ

ভক্তিবেদান্ত তীর্থ থেকে আরম্ভ করে শ্রীচিন্ময় পর্যন্ত অনেক ভারতীয় আমাদের সময়কালেই তাঁদের অবিশ্বাস্য স্বীকৃতির চিহ্ন রেখে গেলেন এই দুনিয়ায়। ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর অবিশ্বাসী মানুষ এঁদের বিরুদ্ধে যাই বলুন, কোনও ব্যাপারেই ইউরোপ আমেরিকায় কল্কে পাওয়া সহজ কথা নয়। যাঁরা এই বিরল সম্মান লাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। মাপের দিক থেকে বলতে গেলে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা এ সি ভক্তিবেদান্ত তীর্থ যা করে গিয়েছেন তা অন্য সমস্ত ভারতীয় প্রচারকের থেকে বেশি। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও এমন বিপুল সাফল্য ও স্বীকৃতি বিদেশে অর্জন করেননি। অবশ্য স্বাস্থ্য ভেঙে পড়া এবং অকালমৃত্যু তাঁর পাশ্চাত্যে প্রচারে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। যদি আরও কিছুদিন তিনি বেঁচে থাকতেন তা হলে ফল হয়তো সুদূরপ্রসারী হতো।

মুলাঁ রুজের প্রসঙ্গে সাধকদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা শোভন নয়। কিন্তু প্যারিসে বসে যা আমাকে অবাক করে দিচ্ছে, বাবলু মল্লিকের মতো বিশিষ্টতা অন্তত গত অর্ধশতাব্দীতে কোনও ভারতীয়র ভাগ্যে জোটেনি। এই খবরটুকু আমাদের দেশে তেমনভাবে পৌঁছয়নি কেন? নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো, এবারের বিদেশ ভ্রমণ সম্পূর্ণ জলে গেলো না—অন্তত একজন কৃতি দেশোয়ালির খবর নিয়ে স্বদেশে ফেরা যাবে।

প্যারিসের বাঙালি সমাজে বাবলু মল্লিকের তেমন দোর্দণ্ড দাপট আছে মনে হচ্ছে না, যেমন নিউজার্সির বাঙালি মহলে শ্রীচিন্ময়ের কোনো পরিচিতি লক্ষ্য করিনি। অথচ নিউইয়র্ক শহরে বসেই তিনি হাজার-হাজার আমেরিকান ও বিদেশির হৃদয় জয় করছেন। এইটাই হয়তো স্বাভাবিক। গেঁয়ো যোগী আজও ভিখ পায় না যেমন পেতো না সেই আদ্যিকালে।

আরও খবর নেওয়া গেলো। মুলাঁ রুজে প্রতি শোয়ের পর দীর্ঘস্থায়ী হাততালি পান বাবলু মল্লিক। যদিও দর্শকদের সামনে তিনি থাকেন মাত্র ন'মিনিট। এই শোয়ের পর পৃথিবীর বড়-বড় লোকরা বাবলু মল্লিকের দর্শনপ্রার্থী হন। এঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা, জগদ্বিখ্যাত শিল্পপতি, খ্যাতনামা শিল্পী ও খেলোয়াড়রা। এঁরা সকলেই বাবলুর গুণগ্রাহী। অথচ আমরা জানি না, এই ছেলেটি ভবানীপুরে স্কুল ফাইনাল পাশ করে একদিন ভাগ্য সন্ধানে দেশ ছাড়া হয়েছিল অজানাকে জয় করার জন্যে। ভবানীপুরের এক আখড়া থেকে প্যারিসের মুলাঁ রুজ যত দূর মনে হয় আসলে ততটা দূর নয়।

বাবলু মল্লিক করেন কী? এই বাঙালি ভদ্রলোক নাচেন না, গান না, যন্ত্র বাজান না, এমনকি ম্যাজিকও দেখান না। কমেডিয়ান যাকে বলে তিনি তাও নন। এবং বড় এক নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে এবং আর একটি নৃত্যপর্ব শুরু হওয়ার মধ্যে মাত্র ন'মিনিটের জন্যে বাবলু মল্লিক স্টেজে আসেন খালি হাতে। তারপর একটা

আলোর সামনে স্রেফ আঙুল দিয়ে ছায়া সৃষ্টি করেন যা পর্দায় প্রতিফলিত হয়। আঙুলের কায়দায় তিনি অসাধারণ সব ছায়া সৃষ্টি করেন যা দর্শকদের মুগ্ধ করে। সংবাদপত্রে প্রশংসা বেরোয়, এই মানুষটির আঙুল কথা বলে। কেউ ওঁকে বলেন ছায়ামানুষ। অফিসিয়াল নাম হ্যান্ডশ্যাডোগ্রাফি—হস্তছায়া। সঙ্গীতের সঙ্গে শব্দটির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক না থাকলে ওঁকে বোধহয় ছায়ানট বলা চলতো।

যথার্থভাবেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাবলু মল্লিক বছরের পর বছর বিশ্ববিজয় করে চলেছেন শিল্পসঙ্গীতের মহাতীর্থ প্যারিসে। মাত্র ন'মিনিটের উপস্থিতি, কিন্তু তার মধ্যেই দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন পর্দায় প্রতিফলিত নানা জন্তু জানোয়ারের ছবি দেখে। ভেসে ওঠে আঙুলের কারসাজিতে বিভিন্ন কার্টুন এবং সবার শেষে সেই বিখ্যাত আইটেম যা দেখবার জন্যে দর্শকরা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন। আঙুলের ওপর আলো ফেলে বাবলু তৈরি করেন জগদ্বিখ্যাত মানুষদের প্রতিকৃতি—চার্চিল, স্টালিন, দ্য গ্যল, কিসিংগার থেকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত কেউ বাদ যায় না। সবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, কোনওরকম কাগজ বা বোর্ডের বাড়তি সাহায্য না নিয়ে কী করে মল্লিক এই সব অসম্ভব সম্ভব করেন তা কেউ বুঝতে পারেন না, সভাগৃহ তখন হাততালিতে ভেঙে পড়ে।

ওয়াকিবহাল মহলে টেলিফোন করলাম। যা খোঁজখবর পাওয়া গেলো হস্তছায়ার এই শিল্পটিতে বাবলু মল্লিক এক এবং অদ্বিতীয়। দুনিয়ার কোনও পেশাদারী রঙ্গশালায় তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ওঁর আগে এই ধরনের শো ছিল না, পরেও থাকবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় ভেল্কির মতন ব্যাপারটা ঘটে যায় এবং দর্শকরা অভিভূত হয়ে পড়েন। ব্যাপারটা নিতান্তই কঠিন, স্মরণে রাখা প্রয়োজন বাবলু মল্লিকের আবির্ভাব ঘটে সুর ও নৃত্যের উর্বশীদের বিশ্রামপর্বে—সেই সময় দর্শকের মন জয় করা যে দুরূহ কাজ তা 'চৌরঙ্গী' উপন্যাস রচনাপর্ব থেকে আমার বেশ ভালভাবে জানা আছে।

অতএব চলো মুলাঁ রুজ অথবা লাল হাওয়া কলে। তাতে যদি দেশে বদনাম ছড়ায়, একটু রসরসিকতা হয় আমাকে নিয়ে তা হোক। চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের জীবনযাত্রার সঙ্গে যার পরিচয় আছে তার কিবা ভয় মুলাঁ রুজে? আর অভিজ্ঞেরা জানেন, মুলাঁ রুজ রু সেন্ট ডেনিস-এর মতন বেলেল্লাপনার জায়গা নয়, ওখানে বিনোদনের সঙ্গে সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলে আসছে সেই ১৮৮৯ সন থেকে যখন মুলাঁ রুজের দরজা খুললো। ফরাসি ক্যান ক্যান নৃত্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয় মুলাঁ রুজের উল্লেখ না করে।

মুলাঁ রুজের শো সম্পর্কে কিছু খবরাখবর ইতিমধ্যেই জোগাড় করা গিয়েছে। প্যারিসের নাইট লাইফে পুরো একশ বছর ধরে এখানকার ফ্রাউ ফ্রাউ (যা অনেকটা চাউ চাউ-এর মতন শোনালেও, এক জিনিস নয়), ফ্রিলি পেটিকোট

এবং লুসিয়াস লাস্যময়ীরা দর্শকহৃদয়ে আগুন ধরিয়ে চলেছে। আমার মনে পড়লো এর নকলেই কলকাতায় একসময় লুসিয়াস (রসালো) লোলা হৈচৈ ফেলেছিল। মিস্তিগুয়ে, মরিস শেভালিয়র থেকে আরম্ভ করে মার্কিনি আগুন জোসেফিন বেকার পর্যন্ত অনেকেই এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। মার্কিন লেখক উইলিয়াম ফকনার তরুণ বয়সে মুলাঁ রুজ দর্শন করে মাকে চিঠি লিখেছিলেন—আমেরিকায় প্রত্যেকে বলবে জায়গাটা পাপের কেন্দ্র। কিন্তু এটা একটা সঙ্গীতশালাও বটে—যেখানে মেয়েরা কেবল লিপস্টিক অঙ্গে ধারণ করে মঞ্চে আসে। খোলা মাংস রমণী-শরীর অনেক দেখা যায়, কিন্তু এহ বাহ্য। এখানকার মিউজিক মোটেই অবহেলা করার নয়। একটি মেয়ের শরীরে সোনালি রঙের পেন্ট ছাড়া আর কোনও অবরণ নেই, কিন্তু যা ব্যালে দেখালো তা ভুলবার নয়। আর একটি মেয়ে, যার গলায় স্রেফ গোটা কুড়ি হার ছাড়া কিছু নেই সে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কমপোজার সাইবেলিয়াসের কবিতা পাঠ করলো—অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আমার কপাল যে প্রসন্ন নয় তা শেষ মুহূর্তে জানা গেলো। মুলাঁ রুজের আসন আমাদের আয়ত্তে, কিন্তু বাবলু মল্লিক কয়েকদিনের জন্যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তিনি প্যারিসে নেই।

আমি একটা জিনিস বার-বার দেখেছি যাঁকে মন থেকে চাইছি তাঁকে শেষ পর্যন্ত কোনও না কোনও ভাবে পাওয়া যায়। মুলাঁ রুজ এ-যাত্রায় আমার দৃষ্টির বাইরে থাকলেও বাবলু মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথা বলার সুযোগ হলো। এই আলাপনের বেশ কিছুটা টেলিফোনের মাধ্যমে। টেলিফোন যেভাবে দূরত্ব ঘুচিয়ে দিচ্ছে তাতে আগামী শতাব্দীতে হয়তো মানুষের মুখোমুখি বসে কথাবার্তা বলার প্রয়োজনই থাকবে না।

সম্বিৎ হাসলো। ওর ধারণা, মানুষকে কাছাকাছি বসিয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনের সঙ্গে কথা না বললে আমি শান্তি পাই না। মানুষের শরীরের দিকে তাকালে অবশ্যই আমি ভরসা পাই। চোখে দেখার পর কানে কথা শুনলে মানুষটা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। যে-মানুষ সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা জন্মায় না, ভালবাসা জন্মায় না তার সম্বন্ধে কেন জানি না লিখতে ইচ্ছে করে না। দুনিয়ার যত লোকের নামডাক আছে তাঁদের সবার সম্বন্ধে আমাকে লিখতে হবে এমন কোনো দিব্য নেই, পথে বেরিয়ে যা ভাল লাগে তা করার স্বাধীনতা আজকাল আমি বিশেষভাবে উপভোগ করি।

বাবলু মল্লিক মানুষটি জাতশিল্পী। এঁর আসল নাম প্রদীপ বসু মল্লিক, কিন্তু ভবানীপুর পাড়ার ডাকনামটাই বিশ্বময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছে। বাবলু মল্লিকের ছবি দেখে মনে হবে না লোকটির বয়স আটচল্লিশ এবং বিদেশের বহু ধকল ওঁর

মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। বয়সকে আয়ত্তে রাখার পিছনে হয়তো ভবানীপুরের আখড়ায় নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চার প্রভাব আছে। শরীরস্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবরাখবর রাখার অধিকার বাবলু জন্মসূত্রে পেয়েছেন—মায়ের দিক থেকে ওঁর এক দাদু হচ্ছেন বিখ্যাত যোগী বিষ্ণুচরণ ঘোষ। বিষ্ণুবাবুর ছেলেও জাপান ও আমেরিকায় যোগাসনের মাধ্যমে বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পারিবারিক সূত্র দিয়ে সঙ্গীতেও বাবলুর অধিকার—ওঁর এক জ্যাঠা ছিলেন বিখ্যাত কীর্তনিয়া, আর মামাতো ভাই স্বপন চৌধুরি, মার্কিন দেশ-প্রবাসী বিখ্যাত তবলিয়া। আর এক মামাতো ভাইয়ের শৌর্যকাহিনীর সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, ভারতীয় বিমানবাহিনীর তপন চৌধুরি। ১৯৬৫ সনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন। দক্ষিণ কলকাতায় এঁর স্মৃতি রক্ষার্থেই তপন থিয়েটারের সৃষ্টি। তপন চৌধুরির নাম উঠলো এই জন্যে যে তিনি একসময় বাবলুকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন যা ছাড়া বাবলুর শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সম্ভব হতো না।

বাবলু মল্লিকের বাবা ছিলেন চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান প্রখ্যাত নীতিন বসুর সহকারী। নীতিনবাবুর এক ভাই শখ করে ছায়ানাটক অভ্যাস করতেন। বাবলুর এক ভাই এবং বউদিও শখ করে এই ছায়া নিয়ে খেলা করতেন যার থেকে বাবলুর মনেও একটু কৌতূহল জাগে এবং মাঝে-মাঝে বিছানার চাদর টাঙিয়ে মোমবাতির সামনে হাত নিয়ে সে প্র্যাকটিস করতো। সেই সঙ্গে চলতো আখড়ায় স্বাস্থ্যচর্চা।

এই আখড়াই বাবলুর জীবনে বড় ভূমিকা গ্রহণ করলো, ওখানেই জার্মানি যাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলো বাবলু। ওখানে স্বাস্থ্যচর্চা করতেন এক ভদ্রলোক যাঁকে সবাই মামু বলে ডাকতো। এই মামুটি বিদেশে চাকরির জন্যে নিয়মিত আবেদন পাঠাতেন এক প্রফেশনাল জার্মান মহিলার মাধ্যমে যিনি পয়সার বিনিময়ে চাকরির আবেদনপত্র লিখে দিতেন। এই মামুই যেদিন বাবলুর মনের ইচ্ছের কথা জানতে পারলেন সেদিন একখানা চিঠি বাবলুকে দিলেন, বললেন, এই জার্মান কোম্পানি মেকানিক্যাল লাইনের লোক চাইছে। আমার আগ্রহ ইলেকট্রিক্যাল লাইনে। এস্যানেডের সেই জার্মান মহিলার মাধ্যমে আবেদন করা হলো এবং কী আশ্চর্য কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রদীপ বসু মল্লিকের নিয়োগপত্র এসে গেলো।

পাশপোর্ট জুটে গেলো সহজে, কারণ ভবানীপুরের আখড়ায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশ্বনাথ ব্যানার্জি নিয়মিত আসতেন। জাহাজের টিকিটের জন্য তখন সবাই হরি সিং-এ যেতো। সেখানে বাবার কাছে ধার করে কিছু টাকা আগাম জমা দিলো বাবলু। জার্মান ভিসার আবেদনও করা হলো।

নির্ধারিত দিনের মাসখানেক আগে বন্ধুদের কাছে বাবলুর ঘোষণা—আমি

জার্মানি যাচ্ছি। বন্ধুমহলে ইজ্জত বেড়ে গেলো। পাড়ার আর এক বন্ধু পীযূষ রায় বললো সেও জার্মানিতে একটা কাজ ম্যানেজ করেছে এবং এক সঙ্গে বিদেশে যাওয়া যাবে। কিন্তু বাবলুর বাবা বাকি জাহাজভাড়া দিতে পারলেন না। লজ্জার মাথা খেয়ে বাবলু চললো মামা রাম চৌধুরীর কাছে, যিনি পুলিশের তদানীন্তন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ছিলেন। রামবাবু প্রথমে খুব চেঁচালেন, পরে ভাগ্নেকে টাকাটা দিলেন।

জাহাজ ছাড়লো বোম্বাই থেকে। ওই জাহাজে চারজন বাঙালি ছিল, সবাই ভাগ্যসন্ধানে জার্মানি চলেছে। তেরো দিন সমুদ্রে কাটিয়ে বাবলুর খুব মন খারাপ, তারপর ইতালির জেনোয়া বন্দরে অবতরণ। ওখান থেকে ট্রেনে জার্মানির শহর ডার্টমন্ড, ওখানে বাবলু একেবারে নিঃসঙ্গ। সেদিন ছিল শনিবার, স্টেশনে তাকে নিতে কেউ আসেনি, তার ওপর জার্মান ভাষার ওপর কোনও দখল নেই। ওখানে ক্যাথলিক মিশনের সেবকরা রক্ষা করলেন। কাগজপত্তর দেখে ওঁরা কারখানায় ডিরেকটরকে ফোন করলেন। এই ভদ্রলোক বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে স্টেশনে এসে বাবলুকে এক হোটেলে তুলে দিয়ে গেলেন, বললেন, সোমবার আবার আসবেন।

প্রথম দিন খাওয়া হয় না এমন অবস্থা। কারণ সঙ্গে কোনও কাঁচা টাকা নেই, সম্বল সামান্য ট্রাভেলার্স চেক। এক ভদ্রলোক দয়া করে কুড়িটা মার্ক ধার দিলেন। সেই দিন কিছু আলুসেদ্ধ ও কোক খেয়ে প্রাণ রক্ষা হলো। বাবলুর সঙ্গে এক বাঙালি ভদ্রলোকের ঠিকানা ছিল। রবিবার সকাল দশটা নাগাদ তাঁর ঠিকানায় হাজির বাবলু। জানা ছিল না রবিবার এখানে সবাই অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোয়। বেল বাজাতে মিস্টার ভট্টাচার্য ঢুলুঢুলু চোখে দরজা খুলে বললেন, রাত সাড়ে চারটেয় উইক এন্ড করে ফিরেছি। আপনি এই সোফায় একটু ঘুমোন, বলে ভদ্রলোক আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। উঠলেন দেড়টায় সময়। লাঞ্চ খাওয়াবেন বলেছিলেন, কিন্তু লাঞ্চ মানে টোস্ট, ফল এবং চিজ। বাড়িতে আদরে মানুষ হওয়া বাঙালি বাবলুর চোখে এই খাবার দেখে জল। লাঞ্চ খেয়েই মিস্টার ভট্টাচার্য বললেন, আপনি আসবেন তা তো আগে ঠিক করা ছিল না, ফলে আমার বান্ধবীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা রয়েছে, আপনি আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হলো বাবলুর।

সোমবার থেকে কারখানায় শিক্ষানবিশ—মেকানিক্যাল কাজকর্ম। আট ন'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাঙালির প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্থা। এই কাজে কোনওরকম আগ্রহ পাচ্ছে না বাবলু মল্লিক। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

ছ'মাস মুখ বুজে দাসত্ব করার পরে অন্য এক শহরে শিক্ষানবিশি পাওয়া গেলো—নাম হামবুর্গ। দুর্ভাগ্যক্রমে এবারের কোম্পানির কাজ আরও

খারাপ—এঁরা জাহাজ তৈরি করেন। কাজের দুঃখ ভুলবার জন্যে বাবলু মল্লিক একটা অ্যাকর্ডিয়ন কিনে বসলো, ওইটা অভ্যাস করে কিছুটা শান্তি। বিদেশে আসাটাই ভুল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই।

পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিছু দয়ালু মানুষ থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা প্রায়ই মাতৃসমা। এমনই একজন, জার্মান মহিলা বাবলুর বাজনা শুনে বললেন তোমার প্রতিভা রয়েছে মনে হয়। তুমি সাউথের একটা মিউজিক স্কুলে চলে যাও, আমি যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। ওখানকার অ্যাডমিশন পরীক্ষায় পাশ করে বাবলু মল্লিক হাজির হলো ক্রসিনজেন শহরে যেখানে অন্য কোনও ভারতীয়ের বসবাস ছিল না। ওইখানেই শুরু হল সাধনা। কিন্তু এখানেও অসুবিধে। মিউজিক ইস্কুলে বাবলুকে শেখানো হচ্ছে কী করে মিউজিকের মাস্টারি করতে হয়, কিন্তু ওর ইচ্ছা নিজেই আর্টিস্ট হবে এবং শ্রোতাদের হৃদয় হরণ করবে।

এই সময় অনেক অনুষ্ঠান ও টিভি দেখে বাবলুর খেয়াল হলো, নানা দেশের মানুষ ইউরোপের গানবাজনার লাইনে অংশ নিচ্ছে, কিন্তু সেখানে ভারতীয়দের সামান্যতম ভূমিকাও নেই। কিন্তু পথ কোথায়? হতাশার মুহূর্তে বাবলুকে অনুপ্রেরণা দিলো মিহির সেনের জীবন। এই বাঙালি মধ্যবিত্ত বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে হঠাৎ ইংলিশ চ্যানেলকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করবার জন্যে। বার-বার ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে ভয় পায় না নতুন যুগের দুঃসাহসী বাঙালি। মিহির সেনের কাহিনী এই সময় কীভাবে সমস্ত জাতকে নীরবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা আমাদের সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে, যৌবনের নবনায়ক হিসাবে তাঁর ভূমিকা আজও আমাদের যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি।

অনেক রাত ধরে বাবলু নানা ভাবনায় ভুলে থাকতো। আর মাঝে-মাঝে মনে পড়তো ছায়া নিয়ে খেলার কথা। কিছু-কিছু অভ্যাস চালাতো মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘরের দেওয়ালে। তারপর মিউজিক ইস্কুলের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একদিন দুম করে বাবলু মল্লিক নেমে পড়লো। সবাই ভাবলো ছায়াখেলা আবার কী জিনিস! তবু ভদ্রতা করে ক'মিনিট সময় ওকে দেওয়া হলো। বাবলুর সেই অনুষ্ঠান দেখে অনেকেই কিন্তু মোহিত। গানবাজনার মধ্যে একটা নতুন ধরনের আনন্দের অনুভূতি। এবার ইস্কুলে প্রকৃত সম্মান অর্জন করলো বাবলু।

তারপর এক ভদ্রলোক বললেন, "তুমি স্থানীয় টিভি স্টেশনে চিঠি লেখো, ওরা নতুন ট্যালেন্টকে সুযোগ দেয়। ওখানে আবেদনপত্র গেলো এবং উত্তর এলো টেলিগ্রামে। টিভি কেন্দ্রে অর্ডিশন হলো এবং আশ্চর্য ব্যাপার, অনুষ্ঠানের সুযোগও এসে গেলো এবং সেই সঙ্গে সাতশ মার্ক পারিশ্রমিক। সেই প্রথম শিল্পী

হিসাবে রোজগার, অতগুলো টাকা মাত্র ছ'মিনিটের জন্যে ভাবা যায় না! ওই সময় টাকার ভীষণ টানাটানি। স্রেফ পাঁউরুটি এবং জেলি খেয়ে বাবলুর জীবনধারণ। প্রচণ্ড শীতেও ঘর গরম করার জন্যে জ্বালানি কেনার সামর্থ্য নেই, ফলে স্রেফ গরম জলের বোতল নিয়ে কট্টর রাতের শীতের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হতো।

টিভিতে বাবলুর বেশ সুনাম হলো। ছোট্ট শহরে অনেকেই ওকে চিনে গেলো। স্থানীয় কাগজেও কিছু প্রশংসা বেরুলো। এবার ছায়ার শো-টা কীভাবে আর একটু বড় করা যায় তার জন্যে চিন্তা। স্টুটগার্টে ভারতমজলিশ বলে এক ক্লাব ছিল। সেখানে এক বাঙালি ভদ্রলোক বাবলুর প্রতি দয়াপরবশ হলেন। বললেন, "আমাদের ক্লাবের ইন্টারন্যাশনাল নাইট অনুষ্ঠান হবে, দেখি আপনাকে এক চান্স করিয়ে দেওয়া যায় কি না।" কিন্তু ছায়াখেলা সম্পর্কে তাঁর মনেও যথেষ্ট সন্দেহ। তবু সুযোগ মিললো—এবং সে-রাতে সবার হৃদয় জয় করলো বাঙালি বাবলু মল্লিক। তেষট্টি দেশের নমুনা অনুষ্ঠান ছিল—বেশির ভাগই গান বাজনা অথবা নাচ, অনেকদিন ধরে একই ধরনের শো দেখে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে ছিলেন, একটু নতুন স্বাদ পেয়ে সবাই নতুন শিল্পীকে দীর্ঘস্থায়ী হাততালি দিলেন। বাঙালি ভদ্রলোকের মুখরক্ষা হলো এবং কাগজে বাবলু মল্লিকের শো সম্পর্কে নানা প্রশংসাসূচক মন্তব্য বেরুতে লাগলো।

বাবলু মল্লিক আমাকে বলেন, জীবনটা একটা শিকলের মতন। একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা ঠিক শিকলের মতন এগিয়ে আসে। পরে পিছন ফিরে তাকালে অবাক লাগে। স্টুটগার্টের খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে এক বুড়ো এজেন্ট বাবলুকে সুইজারল্যাণ্ডে বাইশদিনের বাইশটি ভ্রাম্যমাণ শোয়ের প্রস্তাব দিলেন। বিদেশে শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা সবাই এজেন্টের মাধ্যমে কাজ করেন। এঁরা সাধারণত শিল্পীদের আয়ের আট থেকে দশ শতাংশ নিয়ে থাকেন, কিন্তু মূল্যবান যোগাযোগ করিয়ে দেন। আমাদের দেশেরও খ্যাতনামা শিল্পীরা সামনে একজন প্রতিনিধি রাখেন দরদস্তুরের জন্যে—কিন্তু তাঁকে সরাসরি এজেন্ট না বলে 'পারিবারিক বন্ধু' 'সেক্রেটারি' ইত্যাদি বলে চালানো হয়। পশ্চিমে ব্যবসাটা সোজাসুজি হয়।

বাবলুর তখনও ড্রাইভিং জানা হয়নি। কিস্তিতে টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ড্রাইভিং শিখলো। পুরনো একটা গাড়ি কেনবার জন্যে জার্মানবন্ধু টাকা ধার দিলো। এই গাড়ি ছাড়া বাইশ জায়গায় শো করা অসম্ভব।

একটা ভারতীয় ড্রেশও তৈরি করাতে হলো। অনেকটা জাদুকর পি সি সরকারের মতন। মাথায় পাগড়ি। কয়েকটা শোয়ের পর পাগড়ি ছেড়ে দিলো বাবলু, মনে হলো পি সি সরকারের বড্ড নকল হয়ে যাচ্ছে। নকল করে কখনও

যে জাত শিল্পী হওয়া যায় না, এই দূরদৃষ্টি বাবলু জার্মানিতে আয়ত্ত করেছিল।

বাইশটা শোতে কিছু সাফল্য এবং অনেকটা স্বীকৃতি এলো। এই সময় স্টেফান প্রাপার নামে এক হাঙ্গারিয়ান শিল্পীর সঙ্গে বাবলুর ভাব হয়ে যায় আর একজন বন্ধু জার্মান লোকগীতির গায়ক, এঁরা ছোট ছোট শো করে বেড়াতেন। একদিন একটা অনুষ্ঠানে ওদের সঙ্গে গিয়ে আচমকা শো দেখাবার সুযোগ পাওয়া গেলো, কিন্তু বিনামূল্যে। দর্শকমহলে আবার সাফল্য। পরের সপ্তাহে আবার ফোন এলো ওই ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে আনুন, ওঁকেও পয়সা দেবো।

এইভাবে একরাত্রে জেনেভাতে শো করতে গিয়ে বাবলুর ভাগ্য আবার সুপ্রসন্ন হলো। পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত শোয়ের রাজধানী হলো প্যারিস। যে-শিল্পী প্যারিসে কল্কে পেয়েছে সে দুনিয়া জয় করেছে। প্যারিসের এজেন্টরা নতুন-নতুন প্রতিভা আবিষ্কারের জন্যে অনেক সময় দুনিয়া চষে বেড়ান। প্যারিসের এজেন্ট মাদাম বাজোর এসেছিলেন জেনেভায়, সেখানে বাবলু মল্লিকের শো দেখে হোটেলে দেখা করতে বললেন।

যা ছিল স্বপ্ন তা এবার সম্ভব হলো। মাদাম বাজোর জানালেন, প্যারিসের নাইট ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে একটা সুযোগ আছে কিছুদিনের জন্যে। ঠিকানা না পাল্টে স্রেফ ব্যাগ হাতে বাবলু মল্লিক প্যারিসে হাজির হলেন। মেড ইন ভবানীপুর ছেলেটি দুনিয়ার বারো ঘাটের জল খেয়ে এখন পাকা আর্টিস্ট হয়ে উঠেছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের মঞ্চ থেকেই আরও এক-পা এগোনো গেলো—আইফেল টাওয়ারের রেস্তোরাঁয় ডিনার টাইমে শো। আসলে প্যারিসের অসংখ্য প্রমোদশালায় চিত্তবিনোদনের জন্যে শত-শত অনুষ্ঠান হচ্ছে প্রতি রাত্রে, মানুষের চাহিদা মেটাতে দুনিয়ার নারী ও পুরুষ শিল্পীরা এখানে হাজির হচ্ছে। কেউ জোসেফিন বেকারের মতন বিখ্যাত হচ্ছে, কেউ ব্যর্থ হয়ে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

এক ঘটনা থেকে কী করে আরেক ঘটনার উৎপত্তি হয় আইফেল টাওয়ার রেস্তোরাঁর অভিজ্ঞতা তার প্রমাণ। একদিন মুলাঁ রুজের কর্তাব্যক্তি ডিনার করতে এসে বাবলুর শো দেখে গিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায় হঠাৎ অঘটন ঘটলো। মুলাঁ রুজের এক স্থায়ী শিল্পী হঠাৎ অসুস্থ, তিনি আসতে পারছেন না। টেলিফোন এলো আইফেল টাওয়ারে, বাবলু কি আজ এখনই এসে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারে? দুরু-দুরু বুকে মুলাঁ রুজে হাজির হলো ভবানীপুরের বাবলু। কর্তৃপক্ষের চিন্তা, মুলাঁ রুজ হল-এর আকার বৃহৎ, এখানে কি ছায়ার খেলা সকলে দেখতে পাবে? ও-ব্যাপারে চিন্তা হলো না বাবলুর, যত বড় হোক হল্ যত বড় হবে বড় পর্দায় ছায়াও তত বড় করা যাবে। ভগবানকে স্মরণ করে বাবলু মল্লিক শো শুরু করলেন। সেদিন ন'মিনিট পরে

মুগ্ধ দর্শকের হাততালি থামতেই চায় না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাবলুর এবার প্রকৃত পদক্ষেপ ঘটলো।

মুলাঁ রুজের কর্তৃপক্ষ বললেন, আগামী কালও যদি নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে আসতে হবে। সেবার পর-পর একুশ দিন হাতছায়ার শো চললো, কারণ শিল্পী অসুস্থ, তিন সপ্তাহ কাজে আসতে পারেননি।

বাবলু মল্লিক আমাদের বললেন, "ভাগ্যের কতরকম রসিকতা চলেছে এই মানব সংসারে। কখন যে কী সুযোগ বা কী পরীক্ষা এসে যাবে তা কেউ জানে না।" ওঁর এই ধরনের কথা বলার এক্তিয়ার আছে, কারণ মুলাঁ রুজ কর্তৃপক্ষ জানালেন, কিছুদিন পরে যখন অনুষ্ঠানসূচি পাল্টানো হবে তখন বাবলুকে একটা বড় রকমের সুযোগ দেওয়া হবে।

পৃথিবীর নামকরা লোকদের পদধূলি পড়ে মুলাঁ রুজে। কত খ্যাতনামা লোক যে বাবলুর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছে তার হিসাব নেই। একবার ওঁকে ডেকে পাঠালেন সৌদি আরবের রাজা ফৈজলের ছেলে প্রিন্স আবদুল্লা। খুব দুশ্চিন্তা হলো, কারণ ফৈজলের কার্টুন ছায়াতে দেখাচ্ছিলেন বাবলু। কয়েকজন আরব ইতিমধ্যেই বাবলুকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন, ওসব কথা ঠিক নয়। প্রিন্স আবদুল্লার ঘরে ঢুকলেন বাবলু, অন্য আরবরা যা বলেছে তা তিনি রাজকুমারের কাছে লুকিয়ে রাখলেন না। রাজকুমার বললেন, "আমি আপনার গুণমুগ্ধ। কে কি বললো তাতে আপনি কান দেবেন না। নিজের কাজ করে যান।" তারপর একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন যার ওপর রাজা ফৈজলের স্কেচ খোদাই করা রয়েছে।

এর পর এক দশকের বেশি সময় ধরে বাবলুর বিজয়রথ গতিশীল থেকেছে, প্রমদা প্যারির রাত্রিতে। এতো দীর্ঘ সময় ধরে মুলাঁ রুজ কোনও শো অপরিবর্তিত রাখেনি। একবার নতুন শোয়ের উদ্বোধন করতে এলেন ব্রিটেনের রাজকুমারী প্রিন্সেস অ্যান ও তাঁর স্বামী মার্ক ফিলিপস। প্রথম শো-টি হয়েছিল পৃথিবীর দুর্গত শিশুদের সাহায্যকল্পে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার লাস ভেগা শহরে মুলাঁ রুজের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো। ওখানকার কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালেন, বাবলু মল্লিককে আসতেই হবে। প্যারিসের মুলাঁ রুজ বাবলুকে ছাড়লেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। আমেরিকায় লাস ভেগাতে প্রায় এক বছর শো করলেন বাবলু। "সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি শো দেখাচ্ছি সেই একই মঞ্চ থেকে যেখানে একদিন এলভিস প্রেসলে ও বিং ক্রসবির মতো বিশ্ববিজয়ীরা দিনের পর দিন শো করে গিয়েছেন।" লাস ভেগাতে দীর্ঘদিন থাকার অনুরোধ ছিল, কিন্তু পুরনো চুক্তি অনুযায়ী প্যারিসে ফিরতে হলো বাবলু মল্লিককে।

অবশেষে এই ১৯৯০ তে এসে মুলাঁ রুজের সঙ্গে বিশেষ চুক্তির মেয়াদ শেষ হলো। যদিও ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে। কাজের সুবিধের জন্যে প্যারিসে যেখানে বাবলু মল্লিক বাড়ি কিনেছেন সেটি মুলাঁ রুজ থেকে হাঁটাপথে মাত্র সাত মিনিট। বলা বাহুল্য, বাবলু মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী অনুরাধা এখন মার্সেডিজ গাড়ি চালান।

বিদেশে শত-শত সুন্দরীদের সান্নিধ্যে এসেছেন বাবলু। এঁদের সঙ্গে রাতের পর রাত শো করেছেন বাবলু, কিন্তু জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে বঙ্গললনার প্রতি দুর্বলতা থেকে গিয়েছে। ১৯৭৮ সালে একবার কলকাতায় এসে এ-এ-ই আইয়ের রেস্তোরাঁয় অনুরাধার সঙ্গে দেখা এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাবলু মনস্থির করে ফেললেন। কুড়িজন বরযাত্রীসহ বিনাপণে অচিরেই বিবাহ প্রস্তাব। কিন্তু পাত্রীপক্ষের পুরুতমশাই বেঁকে বসলেন, চৈত্র মাসে হিন্দুবিবাহ অসম্ভব। তখন বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করে বিপদ এড়ানো গেলো। এবার হনিমুনের পরিকল্পনা। শুভযাত্রার দিনে আবার অঘটন! একটা টেলিগ্রাম এলো ব্রিটেনে টিভিতে মস্ত শোয়ের নিমন্ত্রণ। হনিমুন মাথায় উঠলো। শো বিজনেসের মানুষ এমনিই হয়, বাবলু মল্লিক ছুটলেন লন্ডনে।

অবশ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ এঁদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছে। প্যারিসে এই বাঙালি পরিবার একেবারেই "ভেতো বাঙালির গেরস্ত" জীবনযাপন করছে দশ বছরের একটি কন্যা অনীতার সঙ্গে।

বাবলুর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। জানালেন, "বিয়েটা একটু বেশি বয়সেই করেছি। জানেন তো শিল্পীর জীবনে অনিশ্চয়তার কথা। আজ কাজ আছে, কাল নেই, আজ পয়সা আছে, কাল কী হবে কেউ জানে না, ভাবতাম দেশের একটা মেয়েকে ঘরছাড়া করে বিদেশে নিয়ে এসে বিপদে ফেলবো? মোটামুটি অর্থ সম্বন্ধে চিন্তামুক্ত হয়ে তবে বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধতে সাহস পেয়েছি।"

বাবলু বললেন, "আমি যে শো দেখাই তা ভারতবর্ষেরই দান। এর মধ্যে আমাদের নৃত্যকলার বিভিন্ন মুদ্রার বিশেষ দান আছে। পশ্চিমের লোকের ধারণা এটা চিন থেকে এসেছে। কিছু চিনা এ-ধরনের শো করে, কিন্তু ওরা কাগজ এবং কার্ড বোর্ডের সাহায্য নেয়। সাহেবরাও আমাকে নকল করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওদের হাতগুলো ভীষণ মোটা-মোটা, ওদের আঙুলে ভারতবর্ষের নমনীয়তা কী করে আসবে? চেষ্টা করেও পারে না। আমার কাজে তো লুকোচুরি নেই, সবার চোখের সামনে একটা প্রোজেক্টরের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শককে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি। এর জন্য অনুশীলনের দরকার হয়, কখনও-কখনও দশবারো ঘণ্টা টানা অভ্যাস করি!"

প্যারিসের যে-বাড়িতে বাবলু মল্লিক থাকেন সেখানে রাত্রে ওঁদের বেডরুমে

প্যারিসের রাস্তার আলো এসে পড়ে। অনেক সময় গভীর রাতে ওই আলোয় সাধনা শুরু করেন বাবলু মল্লিক, নতুন-নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনার দ্বার ওই সময় খুলে যায়।

দুনিয়ার এমন কোনও দেশ নেই যেখানে না বাবলু মল্লিক শো করে বেড়ান। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সাফল্য সত্ত্বেও মানুষটি একেবারে সাদাসিধে এবং গোবেচারা থেকে গিয়েছেন। বললেন, "যতই এখানে ওখানে শো করি মনটা দেশেই পড়ে রয়েছে। আর মাঝে-মাঝে ভাবি, এদেশে কত সাধারণ প্রতিভা সাফল্য অর্জন করছে, আর আমাদের সেরা আর্টিস্টরা সামান্য একটু ট্রেনিং এবং পরামর্শের অভাবে দেশের সীমানার বাইরে আসতে পারছে না।"

বাবলু মল্লিক মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখেন দেশে ফিরে আসবেন। এইখানে স্থায়ী ঠিকানা করে সমস্ত দুনিয়া চষে বেড়াবেন, কারণ তাঁর এখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেই সময় দেশের জন্যেও কিছু করতে হবে। বিশেষ করে, স্থানীয় কিছু প্রতিভাকে যদি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছনোর পথ দেখানো যায় তা হলে বিশ্বের আনন্দমঞ্চে ভারতবর্ষের অনুপস্থিতির বদনাম ঘুচে যাবে।

বাবলু মল্লিকের সঙ্গে আর কথা বলার সময় নেই। তিনি জাপানে এবং কোরিয়ায় শো দেখাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ছেন। ওখান থেকে হয়তো যাবেন সিঙ্গাপুরে কিংবা লাস ভেগায়, কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে। একদা ভবানীপুরের খরচের খাতায় লিখে দেওয়া প্রদীপ বসু মল্লিক এখন প্রকৃত অর্থেই দাবি করতে পারেন, দেশে-দেশে মোর ঘর আছে।

ও লা লা! প্যারিসের হাওয়া আমার গায়েও লেগেছে। নিজের অজান্তেই আমার সবচেয়ে প্রিয় ফরাসি শব্দটি একটু সুরের সঙ্গেই গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। "সব জায়গায় দুনিয়া যা চায় তাই তোমাকে করতে হয়, একমাত্র প্যারিসেই তোমার যা ভাল লাগছে তা করা যায়।" এই বিখ্যাত উক্তিটি আমার আবিষ্কার নয়। সম্বিতের সুপারনানা সহকারিণী ক্যারোলিন এই উদ্ধৃতিটি উপহার দিয়েছে। ক্যারোলিনের গুণের শেষ নেই। লা হেক্সাগন (অর্থাৎ ফ্রান্স) সম্বন্ধে তার যতো ভালবাসা ততো আগ্রহ পৃথিবী সম্বন্ধে। মন দিয়ে ইংরিজি শিখেছে, হাতের লেখা তো মুক্তোর মতন। তার ওপর অঙ্কেও এমন ব্যুৎপত্তি যে সম্বিৎপুত্র

সৈকতের প্রাইভেট টিউটরেরও দায়িত্ব সে নিয়েছে।

কত সুন্দর কথার মণিমুক্তো যে ক্যারোলিনের সঞ্চয়ে আছে কে জানে। আমাকে প্রায়ই উপহার দেয়, আমি চটপট লিখে নিই। আজ ক্যারোলিন বললো, "প্যারিসের যে-প্রশস্তি তোমায় দিলাম তা লিখেছেন আমেরিকান সাহিত্যিক হ্যারিয়েট বিচের স্টো, যাঁর আঙ্কল টমস্ কেবিন সমস্ত পৃথিবীকে কাঁদিয়েছে। আঙ্কল টমস্ প্রকাশিত হওয়ার পরেই ১৮৫৩-র জুন মাসে প্যারিসে এসে এই অকপট সত্য কথাটা লিখে গিয়েছেন ফরাসি নিন্দুকদের মুখ চিরদিনের মতন বন্ধ রাখতে।"

ক্যারোলিন এর আগে আমার পথপ্রদর্শিকার কাজ করেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রসিকতা করেছে, "প্যারিসকে ঠিক মতন দেখতে গেলে আপনাকে পাঁচশ বছর বাঁচতে হবে মিস্টার মুখার্জি!" তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ক্যারোলিন। কিন্তু এই ক'দিনেই যা গিলেছি তা উগরোতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে।

আমরা রাজপথে দাঁড়িয়েছিলাম। ক্যারোলিনকে বললাম, "এতো চওড়া-চওড়া রাস্তা দুনিয়ার কোনও শহরে নেই। আড়াআড়ি গোলপোস্ট বসালে শত-শত ফুটবল গ্রাউন্ড হয়ে যাবে।"

ক্যারোলিন সঙ্গে-সঙ্গে ছোটখাট রাস্তা ধরে আমাকে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো। ও আমাকে প্যারিসের সবচেয়ে সরু এবং ছোট রাস্তা দেখাবে। নামটি অদ্ভুত, রু দু চ্যাত কুই পার্সে, সোজা বাংলায় বেড়াল শিকারের অপেক্ষায় রয়েছে। রাস্তাটি সত্যি সরু, কিন্তু যে কাশীধাম বা হাওড়া থেকে এসেছে তাকে সরু গলি দেখিয়ে কাত করা শক্ত। সুপারনানাকে বললাম, "তুমি কলকাতায় আসবে তখন এই রকম রাস্তা ডজন-ডজন দেখাবো, শুধু ওখানকার নামগুলো তেমন মজার নয়। লোকের নাম ছাড়াও যে রাস্তার নাম রাখা সম্ভব এই সরল সত্যটুকু আমাদের বেরসিক পৌরপিতারা প্রায় ভুলতে বসেছেন।"

ছোট রাস্তা থেকে বেরিয়ে আবার প্যারিসের বড় রাস্তায় আসা গেলো। ক্যারোলিন জিজ্ঞেস করলো, "এবার কোন জায়গা দেখতে চাও?"

কিন্তু জায়গা দেখে কী করবো? ক্যারোলিন, আমি মানুষ দেখতে ভালবাসি। প্রত্যেকটি জায়গার পিছনেও মানুষ রয়েছে, দ্রষ্টব্য স্থানে গেলে তাদেরই খোঁজ করি।"

ক্যারোলিন হাসলো। বললো, "ভাল জায়গা নিয়েও মানুষের মধ্যে কত তর্কবিতর্ক। সমকাল প্রায়ই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলো বুঝতে পারে না।" দূর থেকে আইফেল টাওয়ার দেখিয়ে ক্যারোলিন বললো, "ওই টাওয়ার যখন তৈরি হলো তখন অনেক লোক একে কদর্য বলেছিল। এর বিরুদ্ধে যাঁরা লিখিত আবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ লেখক, শিল্পী ও দার্শনিকরা।"

কিছুদিন আগেই আর একটা সমীক্ষা হয়েছিল। প্যারিসের লোকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন-কোন কুশ্রী সৌধ তোমরা ভেঙে ফেলতে চাও? অপছন্দর এই তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছিল হাল আমলের জর্জ পম্পিদু সেন্টার এবং তার পরেই আইফেল টাওয়ার। আইফেল টাওয়ারকে জাত ফরাসি এখনও শিল্পকর্ম বলে মেনে নিতে পারে না। আমি ভাবলাম, কলকাতায় এমন একটা ভোট হলে, কলকাতায় গত পঞ্চাশ বছরে যত সরকারি বাড়ি তৈরি হয়েছে সব ভাঙা পড়বে। স্থাপত্য থেকে সৌন্দর্যকে চিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বাঙালিদের মতন পৃথিবীর কোনও জাত এই শতাব্দিতে সফল হয়নি। আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, এইটাই তো স্বাভাবিক। চণ্ডীমণ্ডপে এবং ইঁটের পাঁজা ছাড়া বাঙালির মস্তিষ্কে কিছুই ছিল না। অত কাছে থেকেও ওড়িশার রুচিমান স্থপতিরা বাঙালিকে মানুষ করেতে পারেননি। মধ্যিখানে ইংরেজ কিছুদিন ছড়ি নেড়ে কলকাতাকে পৃথিবীর পাতে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। তারপর আবার সেই পুরনো বাঙালি বর্বরতা। কয়েকশ চমৎকার সৌধ ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলা ছাড়া ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমরা কিছুই করিনি। অমন যে অমন বিধানচন্দ্র রায় তিনি যে কেমন করে নিউ সেক্রেটারিয়েট নামক বীভৎস সৌধের নক্সা মঞ্জুর করলেন তা ঈশ্বরই জানেন।

বয়সের তুলনায় ক্যারোলিনের মনটি বেশ পরিণত। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রায়শই যেসব চিরখুকি দেখা যায় সে তাদের দলে নয়। একা প্রায় তিনজনের কাজ করে, কিন্তু কর্তব্যের চাপকে তোয়াক্কা করে না, সবসময় প্রজাপতির মতন ফুরফুর করছে এবং একই সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে উৎসাহের সহ অবস্থিতি সাধারণত ঘটে না, কিন্তু ক্যারোলিন আমার সঙ্গে এখনই অফিস ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

আমি প্রশ্ন করলাম, "ক্যারোলিন, ফরাসিরা কি একটু নিঃসঙ্গ?"

ক্যারোলিন হাসলো। "সঙ্গ পেতে গেলেও এদেশে পয়সা খরচ করতে হয়, মিস্টার মুখার্সি। রাস্তার মোড়ে ওই হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে দেখো। এখানে শত-শত প্রতিষ্ঠান হয়েছে তারা টেলিফোনে মানুষকে সঙ্গ দেয়।"

এইসব কোম্পানি কোটি-কোটি টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করছে। বলছে, একাকিত্ব বোধ করার কোনও প্রয়োজন নেই, স্রেফ কিছু গাঁটের কড়ি খরচ করে আমাদের ফোন করো। টেলিফোন কোম্পানির সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে, তোমার টেলিফোন বিলে চার্জ উঠে যাবে। তুমি যদি দশ, পনেরো বা আধঘণ্টা অশ্লীল কথা শুনতে চাও বা শোনাতে চাও তারও ব্যবস্থা রয়েছে। কিংবা স্রেফ একজনের সঙ্গে তুমি কথা চালাতে পারো।"

"অনেকেই নিশ্চয় নিঃসঙ্গ, না-হলে এই ব্যবসার এমন রমরমা হবে কেন?"

ক্যারোলিন বললো, “প্যারিসে অনেক লোক সঙ্গী জোগাড় করতে পারে না। কেউ-কেউ সঙ্গী পেলেও রেস্তোরাঁয় সময় কাটাবার টাকা জোগাড় করতে পারে না। অনেকে যার সঙ্গ পাচ্ছে তাকে পছন্দ করতে পাচ্ছে না। অনেকের স্রেফ সময়ের অভাব। রাত এগারোটার সময় হয়তো তার নিঃসঙ্গতা জেগে উঠলো। সেক্ষেত্রে এই সব কোম্পানির ইলেকট্রনিক সান্নিধ্য খুব কাজে লেগে যায়। ডায়ালের দিকে হাত বাড়ালেই বন্ধু। এই সব কোম্পানি জানে কী করে খরিদ্দারের কাছ থেকে বেশি পয়সা আদায় করতে হয়। তারা এক-একটা নোংরা গল্প বলবে যাতে অনেক সময় কেটে যায়, বিল বাড়ে। তবে খরিদ্দারকেও মনে রাখতে হবে, অনেক সময় স্রেফ যন্ত্রের সঙ্গে সে কথা বলছে। তুমি মনের সব বোঝা টেলিফোনে নামিয়ে দিতে পারো, ওই যন্ত্র তা শুনে নেবে এবং তোমাকে তোমার ইচ্ছে-অনুযায়ী সুড়সুড়ি দেবে। জ্যান্ত মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পারো, কিন্তু চার্জ অনেক বেশি, তবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে পারো।”

যে-প্রতিষ্ঠানে ক্যারোলিন কাজ করে সেখানে পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন ধরনের বিপণনে সম্বিতের শাইনিং কোম্পানিকে উপদেষ্টার কাজ করতে হয়, তাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে ওখানে সংগৃহীত থাকে।

ক্যারোলিন আমাকে যা বললো তা মাথায় ঢুকিয়ে নিয়ে নিজের দেশের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের নব্বই কোটি লোকের তুলনায় ওদের সাড়ে পাঁচ কোটি লোক। ভারতবর্ষে অন্তত কুড়ি কোটি সংসার, ওখানে দু'কোটির মতন। যা ভাববার, প্রতি একশজনের মধ্যে পঁচিশজন ফরাসি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন অথবা বাসস্থানে এঁদের একমাত্র সাথী কুকুর অথবা বেড়াল।

শতকরা পঁচিশজনের মতন মানুষ দোকলা থাকেন। ফরাসির জনসংখ্যায় কিন্তু বাড় নেই। তবে গৃহপালিত কুকুর-বেড়ালের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং পণ্ডিতদের ধারণা, এদের সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যাকে অতিক্রম করবে। এইসব কুকুর-বেড়ালকে এমন ভালবাসে যে প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্যে নিজেরাও পশুখাদ্য খাওয়া শুরু করে। হ্যাঁ আর-একটা খবর, এদেশে যতো শিশু জন্মায় তার শতকরা পঁচিশজন অবৈধ, আরও খবর, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা একটু বেশি হওয়ায় ফরাসি পুরুষদের রমরমা। পুরুষের মন জুগিয়ে না চললে ফরাসি মেয়ের কপালে অনেক কষ্ট আছে, যদিও মেয়েরা আগের তুলনায় এখন অনেক স্বাধীন। স্ত্রী স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা এসেছে আতলান্তিকের ওপার থেকে। তবু কারুর মনে যে তেমন সুখ নেই তার প্রমাণ প্রতি এক লক্ষ মাথার হিসাবে রেপের সংখ্যা ফরাসি দেশে ভারতবর্ষের সাত গুণ। আত্মহত্যাতেও ফরাসি এগিয়ে আছে চার গুণ। আর মদ্যপানজনিত রোগে

ফরাসি অবশ্যই দুনিয়ার নেতৃত্ব জোগাচ্ছে। এইসব শুনলে বলা যায়, জয় হোক ভারতসন্তানের। শত দুঃখের মধ্যেও এখনও ভারতমাতার সন্তানরা মায়ের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে জাতীয় আয়ের হিসেবে ইউরোপের মধ্যে জার্মানির পরেই দ্বিতীয় বড়লোক হলো ফরাসি। ফরাসির মাথাপিছু আয় আমাদের চল্লিশ গুণ।

টেলিফোনে সঙ্গদানের বিজ্ঞাপনগুলো আমাকে আর আশ্চর্য করছে না। যে-দেশের শতকরা পঁচিশজন লোক সংসারে একলা থাকে সে দেশে একাকিত্ব ঘোচানোর চেষ্টা অবশ্যই বড় ব্যবসা হয়ে উঠবে। আমি যথাসময়ে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের একটা ছবি তুলিয়েছি টেলিফোনে ওঁদের সার্ভিসের নমুনাও সংগ্রহ করেছি। নিঃসঙ্গ মানুষ আসঙ্গলিপ্সু হলে কী ধরনের আষাঢ়ে গল্প শুনতে রাজি থাকে এই টেলিফোন-সংলাপগুলি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। খবর পেলাম, টেলিফোনের এই আষাঢ়ে কথাবার্তার গতিপ্রকৃতি ঠিক করার জন্যে নামকরা মনস্তাত্ত্বিকদের নিয়োগ করা হয়।

ইন্দ্রিয় জয়ে ফরাসি পুরুষমানুষ এখনও সুনাম অর্জন করেনি বলাটা হয়তো তেমন অসঙ্গত হবে না। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনে ঔৎসুক্য ও কুশলতা দুনিয়ার আলোচনার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত আমেরিকান প্রচারক বিলি গ্রাহাম কয়েক বছর আগে প্যারিসে এসেছিলেন। তাঁর কথামৃত শুনবার জন্য হাজার-হাজার ফরাসি জড়ো হয়েছিলেন। বিলি গ্রাহাম এদেশের পুরুষদের পথে বসালেন। "পাপ, পাপ, পাপ। সারাক্ষণ পাপে লিপ্ত হয়ে ফরাসি নিজেকে দুর্বল করছে। তোমরা কেন তোমাদের স্ত্রীদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখো না?" প্রশ্ন করেছিলেন বিলি গ্রাহাম, কিন্তু মেলেনি উত্তর।

এই বক্তৃতায় একটি মাত্র ফল হয়েছিলো। যে হলঘরে বিলি গ্রাহাম বক্তৃতা করেছিলেন সেটি ভেঙে ফেলা হলো! আর এক বিদেশী সাংবাদিক লিখছেন, "ফরাসি পুরুষকে বিশ্বাস করা দায়। একদিন আলাপ হলো, খুব মুখ মিষ্টি। ওমা! তার পরেই আমি যখন অফিসে গিয়েছি তখন আমার বউকে বাড়িতে টেলিফোন করে তাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছে আমার ফরাসি পড়শি। নারীঘটিত ব্যাপারে ফরাসি পুরুষের মাথা একটু বেশি খেলে যায়!"

ফ্রান্স ভ্রমণে এসে বিদেশি মেয়েদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চমৎকার একটা রচনা আমাকে উপহার দিলেন এক বাঙালি মহিলা। বললেন, "দয়া করে যেন আমার নামটা লিখে বসবেন না।" হাল্কা মেজাজের এই স্কেচটা পাঠকের জেনে রাখা মন্দ হবে না।

রোমান্সের শহর প্যারিস। কিন্তু পরিস্থিতিটা কী রকম তা ঠিকমতন জানতে

পারিনি যতক্ষণ না তিনটি বিদেশি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। এরা কিছুদিন প্যারিসে বসবাস করেছে। এই বিদেশিনীরা ফরাসি পুরুষ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত বিনিময় করছিলেন এবং অনুগ্রহ করে আমাকে তা শুনবার অনুমতি দিলেন।

সমস্ত ছোকরা ফরাসির স্বভাব একই রকমের, এক তরুণী বললেন। মনে করো, তুমি একলা কোনও কাফেতে বসে আছো। ফ্রেঞ্চম্যান দেখতে পেলো তুমি বিদেশি ম্যাগাজিন বা বই পড়ছো। ফরাসি পুরুষ তোমার পায়ের গোড়লিতে কিক করবে, কিংবা "ভুল করে" তোমাকে ধাক্কা দেবে!

তারপর পুরুষটি ফরাসিতে বলবে, "মাদামাজোল আমাকে ক্ষমা করুন, আমি খুবই দুঃখিত। আশা করি আপনাকে আঘাত দিইনি।" তারপর টেবিলের তলায় সে নজর করবে পায়ে কতখানি লেগেছে তা দেখবার জন্যে নয়, তোমার পা দুটো সত্যিই আকর্ষণীয় কি না তা যাচাই করার জন্যে।

যদি তরুণীর পায়ের আকার মনে ধরে তা হলে ফরাসি পুরুষ বলবে, "তুমি তো দেখছি বিদেশিনী। কোন দেশ থেকে এসেছো?"

যদি বলো আমেরিকান, তা হলে উত্তর দেবে, "ওঃ আমেরিকান! আমি ভীষণ ভালবাসি আমেরিকাকে। আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই মনট্রিয়লে থাকে!"

তুমি চুপ করে রইলে। তখন জিজ্ঞেস করবে, "কতদিন এখান আসা হয়েছে? তোমার ফরাসি ভাষা তো চমৎকার!"

যদি বলো, ছ'মাস কি এক বছর, তা হলে লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বলবে, "তা হলে তুমি তো প্যারিস এবং ফরাসিদের ভাল ভাবেই জেনে গিয়েছো।" অর্থাৎ ফরাসি পুরুষদের স্বভাব কী ধরনের হয় তা তোমার জানা হয়ে গিয়েছে!

"কতদিন থাকা হবে?" এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি বলো পাঁচ বছর, তা হলে ফরাসি পুরুষ হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। যদি বলো, এই ক'মাস, সঙ্গে-সঙ্গে ফরাসির চোখে প্রায় জল এসে যাবে। "এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবে! কী দুঃখের কথা!"

তারপর ফরাসি জানতে চাইবে, "এখানে কী করা হয়?" যদি বলো ছাত্রী, তা হলে তোমার দাম খুব বেড়ে গেলো। কারণ, ছোকরাদের ধারণা, বিদেশের সম্পন্ন ঘরের মেয়েরাই ফ্রান্সে পড়তে আসে।

ফরাসি ছোকরা মুখে-মুখে প্রচার করে, বিদেশি মেয়েরা নিজের দেশে যা করবে না তা প্যারিসে নির্দ্বিধায় করবে।

যদি বলো, তুমি ট্যুরিস্ট, তা হলে দাম কমে গেলো। ফরাসির কাছে ট্যুরিস্ট মানেই খরচের ব্যাপার। রোমান্স কোথায় তার ঠিক নেই আগেই আইফেল

টাওয়ার, লুভ্র মিউজিয়াম, নতরদাম গির্জা, ওয়াক্স মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে হবে। বেড়ানো শেষ হবে যখন, অনেক খরচাপাতি উশুল করার জন্যে পরবর্তী পদক্ষেপের সময় এসেছে, ঠিক সেই সময় ট্রাভেল এজেন্ট টমাস কুকের লোক সামনে এসে মেয়েটিকে বলবে, এখনই ভেনিসের ট্রেন ধরবার জন্যে বেরুতে হবে।

ট্যুরিস্ট না হয়ে ছাত্রী হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। ফরাসি পুরুষের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। সে জিজ্ঞেস করবে, ভিক্টর হুগোর সম্বন্ধে কিছু জানো? যদি বলো হ্যাঁ, তা হলেই হয়ে গেলো। দু'জনের অতি চেনাজানা লোক যেন বেরিয়ে পড়েছে। দু'জনে আর অপরিচিত নয়।

এবার সিরিয়াস প্রশ্ন। "কোথায় থাকা হয়?" যদি বলো, কোনও ফরাসি পরিবারের সঙ্গে, তা হলে ফরাসি পুরুষের মুখে মেঘ নেমে আসবে। যদি বলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে তা হলেও হতাশা। যদি বলো মপাঁরনের একটা হোটেলে তা হলে, মুখ হাসিতে ঝলমল করে উঠবে। ফরাসি পুরুষ অনুমতি চাইবে একটা ড্রিংক অর্ডার দেওয়ার জন্যে।

এই পর্যন্ত শুনে আর একটি মেয়ে বললো, ফরাসি ছাত্র বা তরুণরা এইভাবে শুরু করবে, কিন্তু যে বয়স্ক ফরাসি তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করার আর্থিক হিম্মত রাখে তার সান্নিধ্যে আরও বেশি সমস্যা। ফ্রেঞ্চম্যান কখনও তোমাকে ডিনার খেতে বলবে না। বলবে, 'একটি চমৎকার সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটাতে চাই।" ডিনার এই নাটকের প্রথম পর্ব। ফরাসি পুরুষ খাদ্যরসিক, কিন্তু কোনও মেয়েকে নেমন্তন্ন করলে খাবার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মাথায় ঘোরে।

ডিনার টেবিলে ফরাসি পুরুষ নিজেকে যতখানি সম্ভব আকর্ষণীয় করে তুলতে উঠে-পড়ে লাগবে। অতীতে রমণীসংসর্গে তার নানা সাফল্যের ইঙ্গিত দেবে।

এরপর আলোচনার বিষয়, "ডিনারের পরে তুমি কোথায় যাবে?" এই অবস্থায় ফরাসি পুরুষের একমাত্র লক্ষ্যস্থল তার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট। যদি তুমি বলো, না, তা হলে মনোকষ্ট পেয়ে রেগে উঠবে ফরাসি। বলবে, "আমার ধারণা সেই রকমই ঠিক করা ছিল।" কোথায় যাওয়া হবে এই নিয়ে আলোচনা রাত দুটো পর্যন্ত কাফেতে বসে চলতে পারে। বিদেশিনীর আপত্তি না থাকলে ফরাসি পুরুষ সারারাত এই আলোচনা চালাতে পারে। এর পরেও না বললে, ফরাসি ভীষণ বদমেজাজি হয়ে উঠবে। আমেরিকান হলে, ফরাসি পুরুষ বলবে, আমেরিকান মেয়েদের "জাগানো" অসম্ভব। স্ক্যান্ডিনোভিয়ান হলে বলবে, ওই মেয়েরা পাথরের মতন "ঠাণ্ডা"। জার্মান হলে বলবে, জার্মানি ছাড়া তুমি আর কিছুই ভাবতে পারো না। ফরাসি-মহিলা হলে বলবে, আমি জানি, তুমি কোনও

আমেরিকানের জন্যে তোমার সমস্ত ভালবাসা জমিয়ে রাখছো।

আর একটি মেয়ে এবার বললো, প্রেমে না পড়লে কোনও ফরাসি পুরুষ তিনবারের বেশি কোনও মেয়েক নিয়ে বেরুবে না। প্রথমবারেই সাধারণত ফরাসি পাট চুকোতে চায়, যদি-না কোনও বন্ধু ফোন করে বলে, কাল কাফেতে তোমার সঙ্গে যে-মেয়েটিকে দেখলাম তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। এইরকম ফোন পেলে ফরাসি অবশ্যই দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালাতে আপত্তি করে না। খুব কম ক্ষেত্রেই তৃতীয় প্রচেষ্টা এবং সেবার কোনওক্রমেই ডিনারে নেমন্তন্ন নয়, স্রেফ কাফেতে বসে কম পয়সার কফি পান।

একজন মেয়ে এবার মন্তব্য করলো, সব চেয়ে যা আশ্চর্যজনক, প্রথম সাক্ষাতেই যদি দু'জনের মধ্যে কিছু ঘটে যায় তা হলে পরের বার দেখা হলে ফরাসি পুরুষ এমন ভাব দেখাবে যেন কিছুই ঘটেনি। আর প্রথমবার যদি কিছুই না ঘটে থাকে তা হলেও ফরাসি তার ইয়ার বন্ধুদের কাছে গিয়ে বড়াই করবে—যা হওয়ার তাই হয়েছে গতকাল! আসলে ফরাসি পুরুষ তার প্রেস্টিজে আঘাত সহ্য করবে না।

এই মজার লেখাটি পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া গেলো। আসলে ফরাসিকে এক হাত নিতে পারলে ইংরেজ বা আমেরিকানরা বেজায় খুশি হয়। ফরাসি পুরুষ যেভাবে মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করে এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তা ইংরেজ ও আমেরিকানের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাই ফরাসি পুরুষ সম্পর্কে যতো রকমের বদনাম গোপনে ছড়ানো হয়। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো : সমস্ত পৃথিবীতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যাচ্ছে—ফরাসি পুরুষদের মুখে সবচেয়ে দুর্গন্ধ। এই অবস্থায় মোকাবিলা করার জন্যে জগদ্বিখ্যাত এক মাউথওয়াশ কোম্পানির কয়েক হাজার বোতল মাউথওয়াশ ফরাসিদেশে বিনামূল্যে বিতরণ করতে রাজি হয়েছেন।

ফরাসি স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরসংসার করছেন এমন এক বাঙালি মহিলা বললেন, "ফরাসি পুরুষদের মধ্যেও নানারকম মানুষ আছে। আমার স্বামীটি সদাশিব, ফ্রান্সের বাইরে এক বছর মেলামেশা করেছি, ও কখনও আমাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটানি করেনি, যত অধৈর্য ভাব দেখিয়েছে আমেরিকান এবং ইংরেজ বন্ধুরা।"

আন্তর্জাতিক প্রেমের হাটে ফরাসি মেয়েদেরও প্রচণ্ড সুনাম। এইসব সুন্দরী ও সর্বগুণান্বিতা মহিলার পাণিগ্রহণের জন্যে ইংরেজ ও আমেরিকান একসময় অত্যন্ত লালায়িত ছিল। কিন্তু বিয়ের আগের প্রেমিক ইংরেজ এবং জামাই ইংরেজের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য! বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সময় ইংরেজ শুধু ফরাসি লালনার পা জড়িয়ে ধরতে বাকি রাখে, কিন্তু তারপরে ম্যারেজ

সার্টিফিকেট সমেত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলে ইংরেজ পুঙ্গবের অন্য রূপ।

এক বিশ্বাসঘাতক জামাই সম্প্রতি জগদ্বিখ্যাত এক ইংরিজি দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় পুরো এক পৃষ্ঠা ধরে ফরাসির জামাই হওয়ার হাজারো অসুবিধা সম্পর্কে রসালো প্রবন্ধ লিখেছে। এই ধরনের ফরাসি বিরোধী রচনার জন্যে কাগজগুলো মোটা টাকা দিতে রাজি আছেন। কিন্তু কোন মুখে ইংরেজ তাঁর ভিনদেশী স্ত্রীর শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব সম্বন্ধে নানা কটু মন্তব্য করতে সাহস পায়? ইংরেজ জামাই দুঃখ করেছে, প্যারিসে এসে শ্বশুরের দাড়িতে চুমু খেতে-খেতে ফরাসি সুন্দরী বিয়ে করার সব আনন্দ উবে যাবে। আভাসে-ইঙ্গিতে জামাই বুঝিয়েছে সাংস্কৃতিক ফারাকের কথা। যেমন, ডিনারে ইংরেজ চায় মিষ্টির পরে চিজ, আর ফরাসি চায় চিজের পরে মিষ্টি। আরও কঠিন সমস্যা জ্বর হলে। ইংরেজ থার্মোমিটার দেয় জিভে, আর অধোদেশে, ফরাসি যেখানে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে জ্বর মাপতে অভ্যস্ত, তা না বলাই ভাল! যস্মিন দেশে যদাচার।

ফরাসি মেয়েরা এই সব কারণে এখন জাপানি বিয়ে করতে আগ্রহিণী, কিংবা ইতালিয়ান। কিন্তু ইংরেজ নৈব নৈব চ। আর কোন দুঃখে হিরের টুকরো ফরাসি ছেলেরা বিদেশে গিয়ে আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করে দেশে ফিরছে তাও বুঝতে পারে না ফরাসি মেয়েরা।

একটি ফরাসি মেয়ে আমাকে বললেন, "করুক বিয়ে বিদেশে। হট ডগ আর হামবার্গার খেয়ে-খেয়ে যখন জীবনে অরুচি ধরে যাবে তখন ইতিহাস পড়তে শুরু করবে এবং বুঝতে পারবে, আমেরিকানের মধ্যে আর যাই থাক কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। ফরাসির জন্যে যারা স্বাধীনতা পেলো তারাই ফ্রান্সের বিপদের সময় দেখেনি, চরম বিপদের সময় নেপোলিয়নকে কুটো নেড়ে সাহায্য করেনি। এই সব সত্য ছেলেরা যথাসময়ে সব বুঝবে, কিন্তু কোনও ফরাসি মেয়ে তখন আমেরিকান মেয়ের এঁটো ডিশে খাবার খেতে রাজি হবে না, তার জন্যে যদি উপবাস করে থাকতে হয় তাও ভাল।"

যে-বাঙালি মহিলা আমাকে প্যারিসের তিন তনয়ার অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "যাই বলুন, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা ফরাসি পুরুষের থেকে ভাল কেউ জানে না। সব বাঙালি ছেলেকে তো প্যারিস ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বাঙালি যাতে মেয়েদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ফরাসি শিক্ষকের। ফরাসির মনে রাখা প্রয়োজন, আলিয়াঁস ফ্রাসেঁতে ফরাসি ভাষা শেখার চেয়ে ফরাসি ভব্যতা শেখাটা বাঙালি পুরুষমানুষের পক্ষে অনেক বেশি জরুরি।"

অর্থাৎ বাঙালি বেয়াক্কেলে। মেয়ের বাপের মন গলানোর জন্য স্রেফ একটা নির্ভরযোগ্য চাকরি থাকলেই হলো। তারপর মেয়েকে ছাঁদনাতলা ঘুরিয়ে বাড়ি

নিয়ে এসো এবং বাকি জীবন খিটখিট করো এবং বুকের অম্ল উদ্ধার করো।

প্রেমের জগতে ফরাসি পুরুষ যে নিজের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন তা আর একটা চুটকি থেকে জানা গেলো। বলা বাহুল্য, এটিও আমার মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। প্যারিসের সহৃদয়া বঙ্গললনার সংগ্রহ থেকে সংকলিত।

ফরাসি পুরুষের বক্তব্য : তিন তনয়া যেখানে ভুল খবর ছড়িয়েছেন তা প্রচারিত হলে অনেক আকর্ষণীয় সুন্দরী ফরাসি দেশে বেড়াতে আসা বন্ধ করবেন। এটা অবশ্যই সত্য যে, ফরাসি পুরুষ জানে কী করে মেয়েদের মন জয় করতে হয়। যেসব বিদেশিনী মেয়ের সঙ্গে আমার প্যারিসে পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউ ফরাসি পুরুষের ব্যবহার সম্বন্ধে কখনও অভিযোগ করেননি। বরং বহু মেয়ে অত্যন্ত সুখী হয়ে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন।

বিদেশি মেয়েরা স্বভাবতই ফরাসি পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তার কারণ ফরাসি পুরুষের স্বভাবই হলো মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়, এই দুনিয়ায় মেয়েদের মতন মহামূল্য জিনিস কিছু নেই এবং ফরাসি পুরুষের ভূমিকা হলো যেনতেন প্রকারেণ মেয়েদের সুখী করা।

অ্যাংলো স্যাক্সন ও আমেরিকান মহিলারা নিজেদের দেশে মহিলা হিসাবে কোনও সম্মন পান না, তাই এখানে ফরাসি পুরুষের লক্ষ্যস্থল হয়ে তাঁদের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্দেহ কেটে যেতে বেশি সময় লাগে না এবং তখন এই সব মেয়েরা বুঝতে পারে মেয়েদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এমন পুরুষ সম্প্রদায় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। মেয়েদের সমস্ত স্বপ্ন সফল করবার জন্য ফরাসি পুরুষ তার অর্থ এবং জান কবুল করতে রাজি।

সাইডওয়াক কাফেতে ফরাসি পুরুষের সঙ্গে মহিলার ধাক্কা লাগার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা নিশ্চয় একজন আমেরিকান মহিলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ফরাসি পুরুষটি সৌজন্যবশতই ওইরকম কথাবার্তা বলেছে।

কোনও মেয়েকে পছন্দ হলে ফরাসি বলতে অভ্যস্ত : ভদ্রে, আপনি অত্যন্ত সুন্দরী, আমি ভালবাসায় পড়ে গিয়েছি, আপনি কি আমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করবেন?

কিন্তু এইভাবে বললে আমেরিকান ললনা ভয় পেয়ে যাবে এবং পুলিশ ডাকতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই নানা হেঁজিপেঁজি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হয়।

অন্য জাত মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তার জন্য ভোগান্তি সহ্য করতে হয় ফরাসি পুরুষকে। ইংরেজ এবং আমেরিকান মেয়েদের ছোট বয়সে শেখানো হয়, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা না বলতে। ওদের দেশ সম্পর্কে যোগ্য উপদেশ, কারণ ওখানে মেয়েদের সম্মান দেখানো হয় না। কিন্তু

এদেশে কোনও পুরুষ যখন অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে তখন অসম্মান করার প্রশ্নই ওঠে না। নিজের হৃদয়ের কথাটাই সে বলেছে, যা ওই মেয়েটিও মনে-মনে শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল।

ফরাসি পুরুষের কাছে এই দুনিয়ার চিরকৃতজ্ঞ থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে। ফরাসি পুরুষ ছাড়া কোথায় থাকতো ফরাসি পারফিউম, ফরাসি বেশবাস এবং সুন্দরী ফরাসি রমণী? ফরাসি মহিলারা নিজেদের আকর্ষণীয়া করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে কারণ তারা জানে ফরাসি পুরুষ এর মূল্য বোঝে।

মহাশয়, ফরাসি পুরুষের যত খামতি থাক, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা তাদের অজানা নয়।

আমি এবং প্যারিসের সুরসিকা বাঙালি মহিলাটি লেখাটি পড়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসাহাসি করেছি। ওই মহিলা সুনিশ্চিত, মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত তা বাঙালিদের মন দিয়ে শেখার সময় এসে গিয়েছে।

এক সপ্তাহের অধিক প্যারিসে বসবাস হলো অথচ এখনও লুভ্র মিউজিয়াম পরিদর্শন হলো না এমন অপরাধ আমি ছাড়া পৃথিবীর কোনও ট্যুরিস্ট কখনও করেনি।

সম্বিতের পার্টনার শাইনিং কোম্পানির অপর প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টর জেনারেল জঁ ফ্রাঁসোয়া তো ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না। জঁ ফ্রাঁসোয়া একেবারে নতুন যুগের ফরাসি।—এঁর ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর জগদ্বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করেছেন। সম্বিতের শাইনিং-এ বিপণন হিসাবে যোগ দেবার ঠিক আগে জঁ ফ্রাঁসোয়া কাজ করতেন ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত রমণীদের অন্তর্বাস কোম্পানিতে। সম্বিতের রসিকতা, ফরাসি রমণী-শরীরের ভিতরকার কথা জঁ ফ্রাঁসোয়ার থেকে বেশি কেউ জানেন না। যেমন ধরুন ফরাসি রমণীদের শরীরের আকার। অন্তর্বাসের সে সাইজটি (৩৪) বাজারে প্রায় সবটাই অধিকার করে বসে আছে তার থেকেই এই রমণী-শরীর সম্পর্কে নানা তথ্য নাকি সহজেই বেরিয়ে আসে।

জঁ ফ্রাঁসোয়া আমেরিকা প্রবাসকালে এক আমেরিকান রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনিও ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ এবং এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপে প্যারিসের আর

এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন এবং সেই সঙ্গে দু'টি উঠতি ফরাসি নাগরিকের জননী হিসাবে গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। জঁ ফ্রাঁসোয় কোনও দিন ভারতবর্ষে আসেননি, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। সম্বিতের প্রভাব ছাড়াই উনিশ শতকের বেশ কিছু দীনদয়াল ফটোপ্রিন্ট নিজের ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন।

একদিন দুপুরে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এই ফরাসি আমেরিকান দম্পতি আমাদের প্রকৃত ফরাসি রীতিতে আপ্যায়ন করলেন। আমাদের সাহচর্য দেবার জন্যে নিজের ভাইকেও নেমন্তন্ন করেছিলেন জঁ ফ্রাঁসোয়া। এই তরুণটি পেশায় আর্কিটেক্ট— ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রচণ্ড আগ্রহ, যদিও ভারতবর্ষ এখনও নিজের চোখে দেখা হয়নি। ইনি সঙ্গে এনেছিলেন এক অসামান্যা সুন্দরী ফরাসি তরুণীকে, মনে হলো এই মহিলাই অদূর ভবিষ্যতে জঁ ফ্রাঁসোয়ার ভ্রাতৃবধূ হবেন। এঁর বাবা একজন খ্যাতনামা শিল্পী। মহিলা নিজে টি-ভি স্টুডিওতে স্ক্রিপ্ট রচনা করেন।

আর্কিটেক্ট ভ্রাতা আমাকে ফরাসি স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু বললেন। একটা মজার খবর পাওয়া গেলো, প্যারিসে বাড়ির দেওয়ালে পোস্টার লাগানো আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু জল নিষ্কাশনের পাইপে এই ধরনের কোনও বিধিনিষেধ নেই, তাই ফরাসিরা সেই সুযোগ পুরোদমে গ্রহণ করে। এই প্রেমিকযুগলকে অত্যন্ত সুসভ্য এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনে হলো, এঁরা যে ভবিষ্যতে এক আদর্শ দম্পতি হবেন সে সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ রইলো না।

যুবকটি আমাকে একটি শক্ত প্রশ্ন করলো, যার উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না। মুসলিম যুগের তুলনাহীন প্রাসাদগুলির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থাকলেও, প্রাচীন কালের হিন্দু রাজপ্রাসাদের কোনও খবর পাওয়া যায় না কেন? সেকালের হিন্দুরাজারা কি প্রাসাদগুলিকে তেমন শক্তভাবে তৈরি করতেন না? অথবা পরবর্তী যুগের বিদেশি আগ্রাসনে তা সব বিনষ্ট হয়েছে? এমনও হতে পারে, মন্দিরের দিকে রাজশক্তির যতটা নজর তত নজর ছিল না মকানের দিকে।

জঁ ফ্রাঁসোয়া আমাকে একটি মদের পকেট এনসাইক্লোপিডিয়া উপহার দিলেন, যাতে যে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে আমি ফরাসি মদের ঠিকুজি কোষ্ঠি বিচার করতে পারি।

দু'দিন পরে শাইনিং অফিসে বসে এই ফ্রাঁসোয়া যখন শুনলেন আমি এখনও লুভ্র মিউজিয়াম দেখিনি তখন হৈ চৈ বাধালেন। সম্বিতকেই সবাই দোষী করছে। কিন্তু সে বললো, "আমি করবো কী? পুরো প্যারিসই তো ওঁর কাছে ওপেন সিটি। কিন্তু উনি কোথায় ট্যাক্সিওয়ালা, ঠোঙাওয়ালা, ছায়ানট আছে খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন। যা অন্য সবাই দেখেন তার থেকে লেখার বিষয় জোগাড় করা

নাকি ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।”

জঁ ফ্রাঁসোয়া মিটমিট করে হেসে বললেন, “তা হলে একটা ককটেল করে দাও। লেবুর রস খাইয়ে, রাস্তার গান শুনিয়ে, মোনালিসায় হাজির করাও।”

সঙ্গে-সঙ্গে সেইমতন কাজ। জঁ ফ্রাঁসোয়া আমাকে পরে এ-যুগের বিস্ময় ফরাসি হাইপার মার্কেটে নিজে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে আর্ট কালচারের সঙ্গে একটু যোগাযোগ স্থাপন করে রাখা নাকি অবশ্যকর্তব্য।

অতএব আবার আমি প্যারিসের পথে। এবারেও সঙ্গিনী সুপারনানা ক্যারোলিন। ওকে বললুম, “ভাগ্যে আমি ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করিনি।”

“সে কি! মিস্টার মুখার্সি! ফরাসি ভাষা শিখলে তুমি কিন্তু খুব সুখ পাবে।”

“কিন্তু অন্য সুখ হারাতে হতো, ক্যারোলিন। ফরাসিতে আমার জ্ঞান থাকলে সম্বিৎ তোমাকে আমার সঙ্গে কিছুতেই পাঠাতো না।”

ক্যারোলিন খুব হাসলো। বললো, “আমি আন্দাজ করতে পারছি। তোমার লেখায় খুব রসরসিকতা থাকে। আমরা ফরাসিরাও ওই ধরনের লেখা পছন্দ করি, বিশেষ করে চরম দুঃখের সঙ্গে যে-লেখক প্রচণ্ড হাসি মেশাতে পারেন তাঁকে আমরা খুব ভালবাসি।

“তোমরা অদ্ভুত জাত, ক্যারোলিন। সুখ দুঃখ ব্যবসা বাণিজ্য যন্ত্রপাতি সবার সঙ্গে সঙ্গীতকে, শিল্পকে, সাহিত্যকে মিশিয়ে দিতে তোমাদের লা জবাব। সাধে কি আর দুনিয়া এক কথায় মেনে নিয়েছে প্যারিসের শ্রেষ্ঠত্বকে।”

ক্যারোলিন বললো, “জঁ ফ্রাঁসোয়া তো বিপণন বিশেষজ্ঞ। তাই প্যারিসকে তোমার কাছে মার্কেট করবার জন্যে ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছেন। ওই মার্কেটিং ফর্মুলা আমার মাথায় আসেনি। তা হলে তোমাকে অনেক আগেই কমলালেবুর রস খাইয়ে গান শোনাতাম।”

“ক্যারোলিন, স্বীকার করছি, মাতৃ আজ্ঞার ফলে আমার পক্ষে ফরাসি ওয়াইন আস্বাদ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু তা বলে ফলের রস অফার করে অপমান কোরো না।”

মিটমিট করে হাসছে ক্যারোলিন। বলছে, সে একজন অফিস সেক্রেটারি মাত্র। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট-ডিরেক্টর জেনারেলের অর্ডার অমান্য করার দুঃসাহস তার নেই। “যদি তুমি নিশ্চয় এতো দিনে শুনেছো, ফরাসিরা তাদের কোম্পানিকে জার্মানদের মতন বা জাপানিদের মতন ভালবাসে না। এখানে সবাই কোম্পানিতে কাজ করে, কিন্তু কেউ কোম্পানির জন্যে কাজ করে না।”

অতএব ফরাসি-সুন্দরী আমাকে ফলের রসের দোকানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আমি স্মরণ করলাম শহর কলকাতাকে। শহরের জন্মসময় থেকে

এই ফলের রস নিয়ে কলকাতায় পৌরপিতাদের সঙ্গে রসওয়ালার খণ্ডযুদ্ধ চলেছে। রসসৃষ্টির সঙ্গে সুস্বাস্থ্যের নাকি কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে খেজুর রস, আখের রস, ঠেলাগাড়িতে মুসুম্বির রস সবই স্বাস্থ্যসচেতন ভদ্দরলোকের আওতার বাইরে। তারপর এলো যন্ত্রযুগ। গজিয়ে উঠলো সিনেমা হাউসের কাছাকাছি অসংখ্য জুস সেন্টার। দোকানে ফলের শোভা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—আম, আনারস, আঙুর থেকে আরম্ভ করে এমন ফল নেই যার রস না এখানে নিষ্কাশিত হয়। অবশ্যই সোনার সিংহাসনে বসে আছে কমলালেবু, যদিও মাঝে-মাঝে মুসুম্বি তার সবুজ খোলা নিয়ে লড়ে যেতে চায় অরেঞ্জ কালারের অরেঞ্জের সঙ্গে। এইসব দোকানে কিন্তু কেবল রসাস্বাদানের আয়োজন, পরিবেশ তেমন প্রীতিপ্রদ নয়। বেশির ভাগ দোকানে কয়েকটা লম্বা-লম্বা আয়না থাকে যার কাঁচগুলি রিজেক্ট কোয়ালিটির, ফলে নিজের বিকৃতরূপ দেখে রসসেবন করতে-করতে নিজের ওপরেই ভালবাসা নষ্ট হবার উপক্রম হয়।

ক্যারোলিন আমাকে একটা পার্কে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, "ফরাসিদের জীবনদর্শন হলো সুন্দর করে করো, না হলে কোরো না। শুধু অন্তরে সৌন্দর্য থাকলেই চলবে না, বহিরাবরণও সৌন্দর্যময় হওয়া প্রয়োজন। ভিতরের ঐশ্বর্যকে যে লোক সৌন্দর্যের মোড়কে ঢাকতে পারে না সে প্রকৃতির কাছ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি।"

আমার মনে হলো, জাপনি সভ্যতার মর্মমূলেও এই দর্শনটি বিরাজ করছে, তাই মোড়কহীন পদার্থের কোনও স্থান নেই ওই জাতের কাছে। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টা থেকেই জাপানি ও ফরাসি এখন দুনিয়ার নেতৃত্ব করতে চলেছে।

দূর থেকে যা নজরে পড়লো তা একটি বিশাল প্লাস্টিক কমলালেবু মনে হলো। সাধারণ প্লাস্টিক নয়। প্লাস্টিকের এই দাদার নাম এইচ-ডি-পি-ই, যা দৃষ্টিনন্দন অথচ প্রচণ্ড কষ্টসহিষ্ণু। এই পদার্থটি তৈরি হতে পারে একদিন পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে যা দিয়ে সংসারজীবনে কম খরচে নানা সুখকর বিপ্লব আনা সম্ভব হবে। বিশাল লেবুটি যেন মধ্যিখান দিয়ে আধখানা করে কাটা। ওপরের অংশটি হাঁ করে আছে, কিন্তু নীচের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আর রং যেন দার্জিলিংয়ের কমলা থেকে ফরাসি আর্টিস্ট টুকলিফাই করেছে।

তারিফ করার মতন জিনিস। পার্কের মধ্যে বসানো এই শিল্পনির্দশনটি যে একটি ফলের দোকান তা বুঝতে পারিনি। ক্যারোলিন বললো, "এই অরেঞ্জ স্টল তুমি প্যারিস শহরে কয়েকশো পাবে। প্যারিসের মেয়র ওগুলো বসাচ্ছেন, সরকারি সাহায্যে। কখনও বেসরকারি দাক্ষিণ্যে। কিন্তু প্যারিসের মেয়র এমন

কিছু করবেন না যা এই শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি না করে।” আমার মনে পড়লো। বাষট্টি সালের চিনা আক্রমণের পর নিহত সৈনিকদের পরিবারের জন্যে কলকাতায় আমরাও জয় জওয়ান স্টল করেছিলাম, কিন্তু এগুলির পরিকল্পনা এতোই কদর্য যে বেশি তাকালে চোখে ঘা হয়ে যাবে। পরবর্তী ক'বছরে জয় জওয়ান স্টলগুলি কী আকৃতি ধারণ করেছে যে-সম্বন্ধে কেউ অবশ্য কোনও খোঁজখবর রাখে না।

ক্যারোলিন বললো, “আর্ট শুধু আর্ট এগজিবিশনের ব্যাপার নয় আমাদের এই শহরে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আর্ট না থাকলে ফরাসি বাঁচতে পারবে না, তার মন সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠবে, সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে ফেলবে। তাই প্যারিসের মেয়র সেরা শিল্পীদের দিয়ে এই অরেঞ্জ স্টল বানিয়েছেন। দূর থেকে মনে হবে একটি মনোহারী ভাস্কর্যের নিদর্শন। শহরের সৌন্দর্যের ঘাটতি হলো না অথচ সামাজিক কাজটা হলো।

এবার কাজটা ব্যাখ্যা করলো ক্যারোলিন। “আমাদের এখানে অনেক তরুণ-তরুণী বেকার রয়েছে। তাদের কাজ দরকার। কিন্তু এই শহরে যারা লোক নিয়োগ করতে চায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে? তা ছাড়া চাকরির অপেক্ষায় যখন কেউ রয়েছে তখন তার চলবে কী করে? মেয়রের ধারণা, কোনও মানুষকে চোখে না দেখলে, তাকে পছন্দ না হলে লোকে তাকে কাজ দেবে কেন? সেই জন্যে এই অরেঞ্জ যোগসূত্র। চাকরির খাতায় নাম লিখোলে, এই সব অরেঞ্জ স্টলে পার্টটাইম কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু ফরাসিরা বসে-বসে বেকার ভাতা নেওয়া পছন্দ করে না, আত্মসম্মানে লাগে। ফলে এখানে আট ঘণ্টা বসে লেবুর রস বানাও, বিক্রি করো। লোকে জেনে গিয়েছে অরেঞ্জ স্টলে গেলে কাজের লোক পাওয়া যায়, তারাও এখানে আসে। এই ভাবে অনেকে কাজ পাচ্ছে, কিছু বিদেশিও আছে। এতো বড় শহরে বেকার বসে থাকলে মানুষের ভীষণ কষ্ট, মিস্টার মুখার্সি!”

আমি কী আর বলবো। আমাদের স্থানীয় ছেলেরা রাজনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামী মনোভাবের কথা বললেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংগ্রামী মনোভাব বিস্তারের প্রয়োজন এখনও উপলব্ধি করেনি। যেদিন জীবনসংগ্রাম সত্যিই সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াবে সেদিন বিরাট-বিরাট শহরগুলোতে যেসব ছোটোখাটো সুযোগসুবিধা রয়েছে তার পূর্ণব্যবহারের জন্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত উঠে পড়ে লাগবে। স্বনির্ভরতার এই মনোভাবের সঙ্গে সরকারের আশীর্বাদ যুক্ত হলে আমাদের শহরগুলি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে এবং জনসাধারণও উপকৃত হবেন। যেমন ধরুন, কলকাতার রাস্তায় ওজনে ঠকানো প্রায় জাতীয় পেশায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অরেঞ্জ স্টলগুলি ন্যায্য দাম ও ওজনের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে

পারতো।

যে আমাদের সামনে লেবু কেটে রস তৈরি করে দিলো, সে পেরুর মেয়ে। এক বছর হলো প্যারিসে এসেছে কমপিউটার সম্পর্কে পড়াশোনা করতে। এখন অর্ধেক দিন ফলের রস বিক্রি করে এবং প্রত্যাশা করে একটা ভাল কাজ জুটে যাবে। কনট্যাক্ট অরেঞ্জের মাধ্যমে কর্মী নিলো যে নিয়োগকর্তার সুবিধা তা মেয়েটি আমাকে বুঝিয়ে দিলো। পেরুর মেয়েটিকে বেশ শান্তস্বভাবা মনে হলো। পৃথিবীর মানুষ এখন দূরত্বকে জয় করতে অভ্যস্ত—এই বয়সে দেশ ছাড়া হয়ে ভাগ্যসন্ধানে অন্য এক মহাদেশের মহানগরীতে বসে পরমানন্দে লেবুর রস বিক্রি করে জীবনধারণ করছে। দেশে-দেশে মোর ঘর আছে কথাটা এখন নিতান্তই কবির কল্পনা নয়।

রসের প্রভাব পড়লেই ফরাসি গান গাইতে শুরু করে। আমার কণ্ঠে সুর নেই, কিন্তু বুকে সঙ্গীতের তৃষ্ণা আছে। ক্যারোলিন আমাকে নিয়ে চললো ওদের অফিসের কাছাকাছি রাস্তার মোড়ে। সেখানে ভর দুপুরে সাড়ে ছ'ফুট হাইটের এক ফরাসি মনের আনন্দে গান ধরেছে। এই ফরাসি বয়স্থ পুরুষ। বেশ ভারী গলা, সামনে তেমন লোকজন নেই, কিন্তু ছোট্ট পাড়া গানের সুরে গমগম করছে। গান শুরু হতেই অনেক বসতবাড়ির অর্গল খুলে গেলো। ঘরে-বসা ফরাসিও পথের সুরকে কখনও অপমান করে না, শিল্পীর জন্যে তার হৃদয়ে বিশেষ এক আসন পাতা রয়েছে।

ভিখিরি ফরাসিও কিছু-কিছু যন্ত্র ব্যবহার করে—টেপ রেকর্ডার, রেডিও এসব ফুটপাতের জীবনযাত্রারও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ক্যারোলিন ফিস-ফিস করে বললো, "লা এয়ার দুচ পেভ—ফুটপাতের গান।"

লোকটি অদ্ভুত এক যন্ত্র ঠেলে এনেছে। যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক নয়, হস্তচালিত। একটা চৌপায়ায় বসানো হয়েছে। মনে হয় গ্রামাফোনের জ্যাঠামশাই। কতকগুলো ফুটো করা কার্ড পুরে দিয়ে হাতল ঘোরানো হলেই চমৎকার আবহসঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে। গায়কের উদার কণ্ঠে সুরেলা সঙ্গীত।"

একটা গান শুরু হবার পরে আর এক সেট কার্ড গায়ক পুরে দিলো তার ওই কলের গানে। আবার হাতল ঘুরতে লাগলো—কী চমৎকার সুর। প্রাণভরে গান গাইছে ফরাসি ফুটপাতের গাইয়ে।

গান শেষ হবার পরে ক্যারোলিন ফিস-ফিস করে বললো, "এই যন্ত্র এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে—লে ব্যালাদিন।" গাইয়ে ভদ্রলোক প্রথমে ডিস্টার্বড হতে চাইছিলেন না, কিন্তু যেমনি শুনলেন আমি ভিনদেশি লেখক অমনি ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, "এই যন্ত্রটার বয়স প্রায় একশো বছর, ১৯০০ সালের তৈরি। রাস্তার গাইয়ে হলে কী হবে, ভদ্রলোক খবর রাখেন অনেক কিছু।

নাম মঁশিয়ে জঁ পিয়ার লোরেন্স। ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা নিশ্চয় গ্রামাফোনের চোঙা দেখেছো। নাম শুনেছো আমেরিকান এডিসন সায়েবের, যিনি ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ রেকর্ডিং শুরু করেছিলেন। কিন্তু মঁশিয়ে, তুমি দেশে ফিরে গিয়ে তোমার লেখকদের বোলো, এডিসনের অনেক বছর আগে এই প্যারিসে লিওঁ স্কট বলে এক ফরাসি ফোনঅটোগ্রাফ বলে এক কল বের করেছিলেন।"

জঁ পিয়ার মুহূর্তে আমার বন্ধু হয়ে যাওয়ায় ক্যারোলিন কৌতুক বোধ করলো। বললো, "একটা আর্ট সব সময়ে আরেকটা আর্টকে টানে। আমরা এতো দিন ফুটপাতের গান শুনছি, কিন্তু কখনও এই সব খবর পাইনি।"

জঁ পিয়ার লোরেন্স বললেন, "আমার এই যে যন্ত্র দেখছো, এর সম্ভাবনা প্রচুর। অনেক গান বাজাতে পারো, এই সব গানের কার্ড সেট আমি ধীরে-ধীরে সংগ্রহ করেছি। এখনও পুরনো দোকান থেকে গান কিনে আনি।"

এরপর জঁ পিয়ার আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন, "আমি লেখকের দুঃখ বুঝি, তোমরা তো গাইয়েদের মতন এই দুপুর বেলায় এখানে দাঁড়িয়ে গল্প পড়তে পারো না।" জঁ পিয়ার অনেক ফরাসি লেখকের নাম জানেন, কারণ ভবঘুরে জীবনের আগে ছোট্ট এক বইয়ের দোকানে তিনি কাজ করতেন।

"চিরকালই গানের শখ ছিল। হঠাৎ মনটা ভবঘুরে হয়ে উঠতে চাইলো, বন্ধন ভাল লাগলো না। "তারপর হঠাৎ একদিন এই যন্তরটা পনেরো হাজার ফ্রাঁতে কিনে ফেললাম। এক সেট গানের কার্ডের দাম চারশো ফ্রাঁয়ের মতন।"

"জানো মঁশিয়ে, পরের লেখা বই বিক্রি থেকে নিজের এই গান রাস্তায় শোনানোর মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ।"

সায়েবের যেদিন ইচ্ছে হয় সেদিন এই যন্ত্র নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। আধঘণ্টার বেশি একটানা গান গাইতে ইচ্ছে করে না। গানের ফেরিওয়ালা হিসাবে দিনে ঘণ্টা পাঁচ-ছয় ডিউটি করেন।

সায়েব অবিবাহিত—"বিয়ে করলেই তো হাজারো দায়িত্ব, মঁশিয়ে। ছেলেপুলে হলে তুমি যাবজ্জীবন বন্দি হয়ে গেলে। আমার বউ নেই, ছেলেপুলে নেই। তবে একজন বান্ধবী আছে—সেও ছোটখাটো কাজ করে, আর আমি এইভাবে প্রতিমাসে পাঁচ-ছ'হাজার ফ্রাঁ তুলে ফেলি।"

সায়েব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গান শোনান বটে কিন্তু ভিক্ষে চান না। এদেশে শিল্পীকে ভিক্ষে করতে হয় না। "লোকে বোঝে, তারা কিছু-কিছু দিয়ে যায়। তাতেই চলে যায়। তা ছাড়া বেশি টাকা মানেও তো আবার বন্দি হয়ে যাবার ভয়, মঁশিয়ে। আমি রাস্তায় গান করি আমার আনন্দে, লোকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আমাকে কিছু বলতে হয় না।"

জঁ পিয়ার লোরেন্স আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলেন। "এসো আমার গরিবখানায়। দু'জনে প্রাণভরে গল্প করা যাবে। আমার এই কাজে পেন্সন নেই, সোসাল সিকিউরিটির সুবিধে নেই, কিন্তু যা আছে তা হলো লিবার্তি। স্বাধীনতা না থাকলে গলায় সুর আসে না, মঁশিয়ে। স্বাধীনতা না থাকলে লেখকের কলমেও কালি সরে না।"

সত্যিই খুশি মনে হলো পঞ্চাশোর্ধ মঁশিয়ে জঁ পিয়ার লোরেন্সকে। বললেন, "তুমি জিজ্ঞেস করছো এই কাজে আমি আনন্দ পাই কিনা? আমি শুধু আনন্দ পাই না, উত্তেজনা অনুভব করি। এই ধরো আজকের কথা, আমি যদি ফরাসি বইয়ের দোকানের অন্ধকার স্টক রুমে কাজ চালিয়ে যেতাম তা হলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতো? শোনো মঁসিয়ে, প্যারিসের হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, সে স্বাধীন হতে চায়, উড়তে চায়। তোমাকে একটা স্পেশাল গান শোনাচ্ছি।"

কলের গানের মধ্যে একটা সেট নতুন কার্ড পুরে দিলেন মঁশিয়ে জঁ পিয়ার লোরেন্স। তারপর এক অজানা ভারতীয় লেখকের সম্মানে উদাত্ত সুরে গান ধরলেন। আমি এর অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, তবু গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে। মানুষের মন আজও কীভাবে মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গানটির যে অনুবাদ আমি ক্যারোলিনের কাছে সংগ্রহ করেছিলাম তা এইরকম : প্যারিসের হাওয়াকে বোঝা খুব মুশকিল। কবে যে প্যারিসের হাওয়া প্যারিসে ঢুকেছিল কেউ তা জানে না। কিন্তু সবাই বোঝে প্যারিসের হাওয়ায় মিউজিক আছে। আর্ট আছে। আবার এই হাওয়া বুঝলে "প্রফিতে"ও আছে। কবে যে প্যারিসের হাওয়া প্যারিসে ঢুকেছিল কেউ জানে না।...বলা বাহুল্য, প্রফিতে মানে লাভ।

ঘড়ির দিকে তাকালো ক্যারিলেন। আমাকে রস খাইয়ে, গান শুনিয়ে তৃতীয় একটি আনন্দ দেবার জন্যে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সায়েবকে দু'হাত তুলে যখন ভারতীয় প্রথায় নমস্কার জানালাম তখন সায়েব চোখ বুজে মনের আনন্দে আর একটি নতুন গান ধরেছেন।

অবশেষে লুভ্র মিউজিয়াম। আমাদের হাতে সামান্য সময়। আমি আদার ব্যাপারি জাহাজের খবর নিয়ে কী করবো? যা নিজের চোখে দেখে প্রথম লেখা যায় সেদিকেই সময়ের সিংহভাগ দিচ্ছি। ক্যারোলিন বললো, "রাজাদের প্রাসাদ ছিল, পরে কিছুদিন শিল্পীরাও থাকতেন, তাঁদের ভিজিটিং কার্ডে সেরা ঠিকানা—লুভ্র। আগে রাজারাই এসব ছবি দেখতেন, বিপ্লবের সময় সাধারণ মানুষ এসব দেখবার অধিকার পেলেন, রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

চিত্র মিউজিয়াম।”

লাখ-লাখ লোক এখানে বারবার ঘুরে ফিরে আসে চোখের সুখ চিরতরে মিটিয়ে নিতে। এইখানে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে অনেকের সৃষ্টি প্রতিভার দ্বার খুলে যায়। শুধু চিত্রকর ও ভাস্করদের নয়, বিজ্ঞানীদেরও। এক ফরাসি ডাক্তার এখানে আসতেন। মিউজিয়ামের মাঠে তিনি দেখলেন ছেলেরা খেলা করছে বাঁশের চোঙা নিয়ে, কান দিয়ে শব্দ শুনছে। ডাক্তারবাবুর সৃষ্টিশক্তি উন্মীলিত হলো, তিনি মানবজাতিকে উপহার দিলেন স্টেথোস্কোপ, যা গলায় না ঝুললে কোনও ডাক্তারকেই ডাক্তার মনে হয় না। এই যন্ত্রটি যে ফরাসি আবিষ্কার তা আমার জানা ছিল না।

ক্যারোলিন ফোঁস করে উঠলো, “আমরা শুধু গলা কাটার গিলোটিন আবিষ্কার করিনি, ডাক্তারিতেও বেশ কিছু করেছি। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশন, মিস্টার মুখার্সি,” ক্যারোলিন শুনিয়ে দিলো, “ডাক্তার গিলোটিনের স্কেচকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিল একজন জার্মান। লোকটা পিয়ানো তৈরি করতো, ভাবতে পারো?”

লুভ্র মিউজিয়ামে ইচ্ছে করলে একটা মানুষ সারাজীবন কাটাতে পারে কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাদের হাতে এক ঘণ্টাও সময় নেই। ক্যারোলিনকে জানিয়ে দিয়েছি, এই মিউজিয়াম সম্বন্ধে প্রাণ খুলে লেখবার পরিকল্পনা নেই। “সময়ও নেই, সামর্থ্যও নেই, ক্যারোলিন। আমি ছবির ভিতরকার ব্যাপারটা বুঝি না, তবে ছবি দেখতে ভাল লাগে।”

আমাদের ধারণা ছিল লুভ্র মিউজিয়ামে এক যুগের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে থেমে গিয়েছে। চলমান সময়ের একটা ফ্রিজ শট। কিন্তু ক্যারোলিন অন্য কথা বললো। “সময়কে বাস্তিলে বন্দি করে রাখার ইচ্ছে ফরাসির নেই, তাই এখন নিত্যনতুন পরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো লুভ্রের লাগোয়া আঙিনায় কাঁচের পিরামিড।”

এই নতুন পিরামিড নিয়ে তর্কের ঝড় উঠছে। ক্যারোলিন হেসে বললো, “যদি ব্যাপারটা তোমার ভাল লাগে তা হলে জেনে রাখো ওটা ফরাসির শিল্পকর্ম নয়, ফরাসি কেবল পয়সা জুগিয়েছে। পিরামিডের স্রষ্টা একজন চাইনিজ-আমেরিকান ইও সিং পে। কেউ-কেউ বলে, হিংসুটে আমেরিকান সুযোগ পেয়ে ফরাসির ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কেউ বলে, লুভ্র সংস্কারের যে বিরাট কাজ চলেছে তা শেষ হবে ১৯৯৬ সালে। যখন লুভ্র মিউজিয়ামের দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হবে, তখন মতামত দিও।”

আমি দেখলাম লুভ্রে প্রচণ্ড ভিড়। শিল্পকর্ম দেখতে পৃথিবীর মানুষ যে সত্যিই পাগল তা এখন না এলে বোঝা যায় না। শুনলাম, কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। একজায়গায়

বড্ড বেশি শিল্পকর্ম, না বড্ড বেশি মানুষের ভিড়, লুভ্রের প্রধান সমস্যা কোনটা তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। দেখি তো মোনালিসা। ভিড় ঠেলে আমরা চলেছি বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময়ী সুন্দরীর সাক্ষাতে, যাঁর আর একটি নাম মিসেস গিয়োকন্ডা।

সেই ছোটবেলা থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পকর্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনে আসছি। হাওড়া থেকে আরম্ভ করে হাওয়াই পর্যন্ত কত জায়গায় যে আমি মোনালিসা নামের মেয়ে দেখেছি। সেবার কানাডার টরন্টোতে গিয়ে নীলাদ্রি চাকির বাড়িতেও মোনালিসার গল্প শুনেছি। নানা আর্ট ক্যাটালগ সংগ্রহ করা নীলাদ্রির স্বভাব, তার মধ্যে অশেষ মূল্যবানটি আমেরিকায় মুদ্রিত। মোনালিসার আমেরিকা ভ্রমণের সময় ১৯৬২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অমর কীর্তি প্যারিসেই দীর্ঘকাল বন্দিনী রয়েছে, একবার সে বিদেশভ্রমণ করেছে মার্কিনি প্রেসিডেন্টের অতিথি হয়ে।

ক্যারোলিন বললো, "আমি দেখেছি যাঁরা বাইরে থেকে আসেন তাঁরা মোনালিসা সম্পর্কে আমাদের থেকে বেশি জানেন। যদিও দর্শকদের নিয়ে নানা গপ্পো ফাঁদা হয়েছে—যেমন ডাচরা নাকি হিসাব করে মাত্র চার হাজার মুদ্রায় এই শিল্পকর্মটি ক্রয় করে কত টাকা লাভবান হয়েছে ফরাসিরা। ইতালিয়ানদের দুঃখ, ফরাসিরা এমন হাবভাব দেখায় যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি প্যারিসেই জন্মেছিলেন, ইতালির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমেরিকান টুরিস্ট নাকি কৌতূহল প্রকাশ করে, এই ছবি নেবার সময় মিস্টার দ্য ভিঞ্চি ক্যামেরায় কত অ্যাপারচার দিয়েছিলেন?"

আমি বললাম, "একটা ইন্ডিয়ান গাপ্পোও আছে, ওই বিখ্যাত মোনালিসা হাসি সম্বন্ধে। আমি যে কোম্পানিতে অনেক বছর কাটিয়েছি সেই ডানলপের বিজ্ঞাপনে একবার মোনালিসাকে ব্যবহার করা হলো। কনান ডয়েলের সৃষ্টি অমর ডিটেকটিভ শার্লক হোমস্ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সহকারীকে বলছেন, এলিমেন্টারি ওয়াটসন। ইনি ডানলোপিলোর ওপরে বসে আছেন। এই বিজ্ঞাপনটি ভারতবর্ষ থেকে ডানলোপিলো উঠে যাওয়ার পরেও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কেউ-কেউ জানতে চাইতো, সত্যিই কিসের ওপর মোনালিসা বসে আছেন? কেউ জানতে চাইতো, ওঁর মুখে হাসি না, দাঁতের যন্ত্রণা চেপে রাখার চেষ্টা মাত্র?"

মোনালিসা শিল্পীর মানসকন্যা বা মানসপ্রেমিকা নয়। রক্তমাংসের মডেল থেকে এই ছবির সৃষ্টি। নায়িকার জন্ম ফ্লোরেন্সে ১৪৭৯ সালে—শ্রীচৈতন্যর সমসাময়িক। এঁর বাবার নাম অ্যানটোনিও ঘেরাঘডিনি। ষোলো বছরে বিয়ে হয়

ফ্রান্সেসকো গিয়োকন্ডার সঙ্গে। ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য ভাল, মোনালিসা তাঁর তৃতীয় পক্ষ। এর আগে দু'টি স্ত্রী অসময়ে মারা গিয়েছেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছবি আঁকেন ওঁর বাইশ বছর বয়সে।

যদিও ডানলপের লোকদের স্থির বিশ্বাস মোনালিসার হাসির পিছনে রবারের গদি রয়েছে, লিওনার্দোর সমসাময়িক এক ভদ্রলোক লিখে গিয়েছেন, দীর্ঘসময় বসে থেকে মডেল যাতে বিমর্ষ না হয়ে ওঠে তার জন্য লিওনার্দো তাঁর স্টুডিওতে গাইয়ে বাজিয়ে রাখতেন যাঁরা হাসির গান গেয়ে মডেলের মুখে হাসি ফোটাতেন। বলা বাহুল্য, এই হাসির রহস্য নিয়ে উকিল, ডাক্তার, ধর্মযাজক, মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক সবাই গাদাগাদা বই লিখে ফেলেছেন। এখনও কাজ শেষ হয়নি। নতুন-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে এই সাড়ে তিরিশ ইঞ্চি বাই একুশ ইঞ্চি ছবিটা নিয়ে শত-শত পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সমস্ত দুনিয়ায় ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছে।

ছবির ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কম। শুনলাম, লিওনার্দো অনেক ছবিই ফিনিশ করেননি। এই ছবির ওপর তিনি চার বছর ধরে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে ছবিটা বিক্রি করেননি, যখন যেখানে পালিয়েছেন সেখানে এই ছবি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

সুতরাং এক নজরে এই ছবির সৃষ্টিকাল ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ এর মধ্যে। লিওনার্দো ফ্রান্সে এই ছবি নিয়ে আসেন ১৫১৭ সালে। সম্রাট ফ্রাঁসোয়া ওয়ান চার হাজার স্বর্ণমুদ্রায় ছবিটি কেনেন। হয় শিল্পীর জীবিতকালে অথবা ওঁর উত্তরাধিকারী মেলদির কাছে। ইংরেজরা এই ছবি হাতাবার চেষ্টা করে রাজা প্রথম চার্লসের সময়। বিয়ের প্রস্তাব ছিল এবং সেই সঙ্গে যৌতুক। ত্রয়োদশ লুইয়ের সভাসদরা ইংরেজের এই প্রস্তাবে রাজি হননি। সুরসিক নেপোলিয়ন তাঁর শোবার ঘরে মোনালিসাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন ১৮০০ সাল থেকে।

ইতালিয়ানরা একবার মোনালিসাকে চুরি করেছিল। ফ্লোরেন্সের এক আর্ট ডিলারের কাছে চোরাই ছবিটা কেনবার প্রস্তাব যায়। তারপর হারিয়ে যাওয়া মোনালিসা আবার ফিরে আসে ফ্রান্সে।

মোনালিসাকে দেখলাম, কিন্তু দূর থেকে। কাছে যাওয়া সম্ভব হলো না। আজ অসম্ভব ভিড়। হল্‌-এর বাইরে আরও ভিড়। মিনিট খানেকের মধ্যে সরে না গেলে ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

জগদ্বিখ্যাত মোনালিসা হাসি দূর থেকে দেখলাম। লুভ্র মিউজিয়াম থেকে বেরোবার সময় ক্যারোলিন জানতে চাইলো, "মোনালিসার হাসি থেকে কিছু বুঝলে?"

অবশ্যই বুঝেছি! আমার মনের মধ্যে আর কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ

কেঠো চেয়ারে বসার পর মোনালিসাকে আমার পুরনো কোম্পানির ডানলোপিলো গদি দেওয়া হয়েছে। শার্লক হোম্‌স ও আমার মধ্যে কোনও মতদ্বৈধ নেই!

ক্যারোলিন বললো, "তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে, স্রেফ মোনালিসা দেখবার জন্যে। সেবার তুমি হয়তো একমাস এখানে বসে থাকবে। আমাদের চোখে মোনালিসাকে না দেখে স্রেফ মোনালিসার চোখে পৃথিবীর মানুষদের দেখে একখানা বই লিখতে পারবে।"

প্যারিস আমার গা-সওয়া হয়ে উঠছে ; যেন অনন্তকালের সম্পর্কে রয়েছে এই শহরের সঙ্গে। সম্বিতের অতিথি-কক্ষে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সকালবেলায় নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় জড়ো হয়। জড়ো হবারই কথা, কারণ জীবনসংগ্রামের তাগিদ নেই, স্রেফ যত্রতত্র বিচরণ, যথেষ্ট ভোজন এবং মাঝে মাঝে নোটবুকে কিছু খবরাখবর নথিভুক্ত করা।

সম্বিৎ সকালে আমার শয্যা তুলতে এসে জিজ্ঞেস করে, ঠাণ্ডা লেগেছিল কিনা, নতুন কোনও অভিজ্ঞতার আকাঙক্ষা জেগেছে কি না। তারপর ওই সব নিয়ে রসরসিকতা চায়ের টেবিলে।

প্যারিসের সুন্দরী ললনারা আমার মানসলোক সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রয়েছে কি না জানতে আগ্রহিণী সম্বিতগৃহিণী কাকলি। সে বলে, "মডার্ন ফরাসিনী তুলনাহীনা। সে বাঙালিদের মতন শুধু রাঁধে না, চুলও বাঁধে ও সেই সঙ্গে আজকাল চাকরিও করে। থ্রি-ইন-ওয়ান এই ফরাসি মহিলাদের চাহিদা তাই বিশ্বব্যাপী। কিন্তু দেশের বাইরে সংসার পেতে ফরাসি সুন্দরী কিছুতেই সুখ পায় না, তাই ফরাসি পুরুষ ছাড়া তার গতি নেই।"

আমি বললাম, "আধুনিকা বঙ্গরমণীও তাই—চুলও বাঁধে, রান্নাও জানে এবং আজকাল আপিসেও কাজ করে। সে-তুলনায় যোগ্য বাঙালি পুরুষের সংখ্যা বোধহয় কমে যাচ্ছে, বাঙালিনীর সুপাত্রস্থ হবার সম্ভাবনা কমছে, তারা কদর পাচ্ছে না। পুরুষ বাঙালি একদিন হাড়ে-হাড়ে বুঝবে ব্যাপারটা যখন পাইকারি হারে বাঙালিনীরা অন্য প্রদেশের পুরুষদের গলায় বরমাল্য দিতে শুরু করবে।

সুরসিক সম্বিৎ আমার সঙ্গে একমত হলো। বাঙালি মেয়ের মতন মেয়ে

দুনিয়ায় নেই, এদের প্যাকেজিং যদি একটু উন্নতি করা যায় তাহলে এই দেবী দশভুজা সমস্ত দুনিয়া শাসন করবে।

আমার সাধ-আহ্লাদের কথা সম্বিৎ আবার জানতে চাইছে। ইতালি ও গ্রিস দেখবার জন্যে অনুরোধ করছে। বলছে, ইতালি আপনার ভাল লাগবে। এই ফরাসিরা আজ যা তার অনেক ব্যাপারের মূলেই রয়েছে ইতালি। ফরাসি নাকি ছবি-আঁকা এবং রান্না শিখেছে এদেরই কাছে। ফরাসি রান্না মোটেই আহামরি ছিল না যতক্ষণ-না ফ্লোরেন্সের এক বালিকা ফরাসির রাজবধূ হয়ে এদেশে এলেন। বাপের বাড়ির উন্নত রান্নাবান্নার ধারা তিনি শ্বশুরবাড়িতেও চালু করলেন। ধন্য-ধন্য পড়ে গেলো। এই মহিলার স্বামীও ভোজনের ব্যাপারে ক্রমশ সুরসিক হয়ে উঠলেন। ভোজনের পূর্বে ক্ষুধা উদ্রেককারী হাল্কা আপাটিফ বা মদ্যপানের ইতালিয় রেওয়াজ রাজামশাই চালু করলেন।

আমি এবার অন্য প্রসঙ্গে এলাম। গরিব দেশের গরিব ঘরে জন্মেছি, কিন্তু এসেছি দুনিয়ার বড়লোকদের তীর্থস্থানে। একটু জেনুইন বড়লোকি না দেখে গেলে স্বদেশে ফিরে কেমনে দেখাবো মুখ?

বড়লোকি নানা রকমে প্রকাশিত হয়—ভোজনে, বেশবাশে এবং গহনায়। পুরুষ বড়লোকরা পানশালায় ও কামিনীবিলাসেও বড়লোকি দেখায়, কিন্তু সে সব তো অসামাজিক—ওসবে অতিমাত্রায় কৌতূহলী হবার বয়স আমার নেই।

সম্বিৎ—যাকে আমি মাঝে-মাঝে 'ব্যারন দ্য শহিদনগর' বলে ডেকে থাকি—আমার ইচ্ছাকে লুফে নিলো। মাথায় আইডিয়া এলে ও যে কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। সে বললো, "স্বীকার করছি, ভোগের কিছুই আপনাকে দেখানো হয়নি, কঙ্কালের বৈরাগ্য লিখবার জন্যে আপনি তো এদেশে আসেননি।"

আমার সামনেই টেলিফোন তুলে নিলো সম্বিৎ এবং সাত সকালে ডায়াল করে ফরাসি ভাষায় কী সব কথাবার্তা বলতে লাগলো। পাঁচ মিনিট পরে ফোন নামিয়ে সম্বিৎ বললো, "ব্যবস্থা হয়ে গেলো। পনেরো মিনিট পরেই আপনি একটা ফোন কল পাবেন।"

ব্যাপারটা রহস্যাবৃত হয়ে উঠছে। সম্বিৎ কিন্তু কিছু ভাঙতে চাইছে না। শহিদনগরের দুঃখের দিনগুলো মনের মধ্যে এখনও জাগ্রত থাকায় এদেশের বৈভব সম্বিৎ আরও উপভোগ করতে পারছে। ওর জন্যে আমি দেশ থেকে এনেছি মুড়কি, বাতাসা ও নেড়ো। দেশের এই নেড়ো সে খোদ প্যারিসে বসে উপভোগ করছে এবং বলছে, দুনিয়ার কোনও রুটিওয়ালা কলকাতার এই নেড়োওয়ালার নখের যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, ইংরেজরা কতকগুলো বেরসিক ভাইসরয় এবং আই-সি-এস পাঠিয়েছিলেন ইন্ডিয়ায়,

রাজপুত্র বা রাজপরিবারের কাউকে স্থায়ীভাবে পাঠাননি, তা হলে চতুর্দশ লুইয়ের মতন তাঁরা নানা ভারতীয় গুণের তারিফ করতে শিখতেন। রান্নাবান্নার শিল্পীরা রাজকীয় স্বীকৃতিও লাভ করতেন। যে-ভদ্রলোক লর্ড ক্যানিং-এর গিন্নির সম্মানে লেডিকেনি আবিষ্কার করলেন সে-ভদ্রলোককে লর্ড উপাধি দেওয়া হলো না শুনলে ফরাসি এখন থেকে ইংরেজকে আরও অপছন্দ করবে।

টেলিফোনটা এবার বেজে উঠলো। আমার তাজ্জব হবার অবস্থা। ফোন আসছে ফরাসি রিভিয়েরার কান শহর থেকে। ওখানকার কার্লটন হোটেলের কর্তা মঁশিয়ে তেজে আমাকে সুপ্রভাত জানালেন। তাঁর বক্তব্য : "আপনার মতন একজন লেখক এদেশে এসেছেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য। আপনি এই উইক এন্ডে আসুন কান-এ, আমাদের আতিথ্যগ্রহণ করুন এবং দুপুরে যদি আপত্তি না থাকে আমার ও স্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ করুন।" ভদ্রলোক চমৎকার ইংরিজি বলেন। সম্বিৎ ইঙ্গিতে বললো, 'রাজি হয়ে যান।"

আজ্ঞে হ্যাঁ, একদা কলকাতার হোটেল-জীবনের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল। যার ফলশ্রুতি শাজাহান হোটেলের পটভূমিকায় চৌরঙ্গী উপন্যাস। এই উপন্যাস পাঠ করে কিছু বাঙালি যুবক এক সময় হোটেলের চাকরি নিতে উৎসাহ দেখিয়েছিল, তারা এখন ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু হোটেলজীবন সম্বন্ধে আমি যে কিছুই জানি না তা জানতেও আমাকে দু'তিনবার আমেরিকায় যেতে হয়েছে।

কিন্তু ফরাসি হোটেল! সে তো ভোগের ইন্দ্রপুরী। ফরাসি হোটেল চেন এখন বিশ্বজোড়া প্রতিপত্তি অর্জন করেছে এবং দুনিয়ার সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেল ও রেস্তোরাঁ যে এই ফরাসি দেশেই তা দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই।

সম্বিৎ বললো, "মঁশিয়ে মার্ক তেজে, আপনি লেখক শুনেই নেমন্তন্ন করে বসলেন। একটা বিলাসবহুল হোটেল কী রকম হতে পারে তা আপনি দেখে নিন, উনি নিজেই বললেন, আমি ফোন করবে, যাতে লেখক ব্যাপারটা এড়িয়ে না যেতে পারেন।"

আমি তো রীতিমত গর্ব অনুভব করছি। বাঙালি লেখকও তা হলে বিদেশে একটু-আধটু কল্কে পেতে পারে। পরে মনে হলো, এই ধরনের সম্মান ফরাসির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ শুনলে ফরাসির আর মাথার ঠিক থাকে না, তিনি যে দেশেরই হোন। রাজাকে হারিয়ে ফরাসি এখন এই সব মানুষের মধ্যেই বোধহয় রাজাকে খুঁজে বেড়ায় এবং তাকে রাজ সম্মান দেয়, তার পয়সা না থাকলেও

কানের হোটেল কার্লটন সম্পর্কে খবরাখবর শুনে আমার মাথা ঘুরে যাবার

অবস্থা, দুনিয়ার সব থেকে বিলাসবহুল হোটেল বলতে কার্লটনের শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়া নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে।

ব্যাপারটা এই রকম : দুনিয়ার সর্বত্রই মগজ খাটিয়ে কোটিপতি হওয়া যায়, কিন্তু কোটিপতিকে যোগ্য সুখ দেওয়ার জায়গা দুনিয়ায় বেশি নেই। এ-ব্যাপারে একনম্বর ফরাসি দেশ। আবার ফরাসি দেশের মধ্যে একনম্বর জায়গা হলো এই কান। সুতরাং দুনিয়ার সমস্ত বড়লোককে কানে আসতেই হবে। যদি একটু ভোগ না হলো তা হলে কোটিপতি হবার কোনও অর্থ হয় না। আর কানেতেই যদি পদার্পণ ঘটলো, তা হলো কার্লটনে বসবাস না করলে শুধু-শুধু বড়লোক হওয়া কেন?

দুনিয়ার বড়লোকদের সুখ দেবার জন্যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা হোটেলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কিন্তু হোটেল কার্লটন সবাইকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা সেরা জিনিস চান, দামটা নিয়ে মাথা ঘামাবার নিচু নজর তাঁরা ত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে চিত্রতারকা আছেন, বিজনেস সম্রাট আছেন, নানা দেশের রাজপুত্তুরা আছেন। আজকাল এই দলে চিত্রশিল্পী, লেখক ও গাইয়েরাও যোগ দিয়েছেন। গাইয়েরা যে সংখ্যায় খুব কম যান না, তার প্রমাণ হোটেল কার্লটনে অষ্টপ্রহর ধরে যাঁদের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় তাঁরা সকলেই এই হোটেলে বসবাস করেছেন।

শাজাহান হোটেলের অভিজ্ঞতার আলোকে সম্বিৎকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কার্লটনে ঘর ভাড়া কত? যা শুনলাম তাতে চোখ ছানাবড়া। কার্লটন হোটেলে এমন ঘর আছে যার দৈনন্দিন ভাড়া প্রায় দু'লাখ টাকা। তাও স্রেফ থাকবার খরচ, খাওয়া এবং অন্য খরচ আলাদা। থাকা ও খাওয়া ছাড়া আর কী থাকতে পারে হোটেলে? শুনলাম ওসব সেকেলে ধ্যান-ধারণা—এখন হোটেলে স্নানবিলাসেই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা প্রতিদিন খরচ করা যায়, সেই সঙ্গে শরীরের জন্য আরামদায়ক নানা সংবাহন অথবা মাসাজ।

সম্বিৎ আমার লজ্জা নিবারণ করলো। স্রেফ আমার জেন্যই সে প্যারিসের কাজকর্ম ফেলে কানে যাচ্ছে না। ওখানে কার্লটন হোটেলেই তার একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন চলছে। ভারতবর্ষ অবশেষে জাতে উঠছে, কার্লটন হোটেলে ভারতীয় খাদ্য-উৎসবের কথা হচ্ছে। এই উৎসবের জন্য রাঁধুনি উড়িয়ে আনা হবে ভারতবর্ষ থেকে। সুতরাং আমাকে মিস্টার তেজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়াও সম্বিৎ অন্য কাজ সেরে নেবে।

অতএব আমরা এখন কান-এর যাত্রী। যমরাজের কল্যাণে দক্ষিণ দিকটি কোনও কালেই ভারতীয়দের প্রিয় নয়। আর একজন ঋষিও এই দক্ষিণ দিকে

গিয়ে আর ফেরেননি, যার থেকে অগস্ত্যযাত্রা কথাটির সৃষ্টি হলো। আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও উত্তর-দক্ষিণ কথাটার দক্ষিণ মানেই দারিদ্র্য। কিন্তু এদেশে দক্ষিণ মানেই সেরা। যাঁরা কৃতী, যাঁরা নিজের প্রতিভায় টুপাইস করেছেন, অথবা বাপ-মা যাঁদের ভোগসুখের জন্যে কিছু রেখে যেতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই ফ্রান্সের দক্ষিণমুখো। এর মধ্যে শুধু ফরাসি নয়—ইংরেজ, আমেরিকান, কানাডিয়ান সব আছে। টাকা রোজগার করতে ক্লান্ত হয়ে-হয়ে এঁরা ফরাসি দক্ষিণে বসবাস শুরু করেছেন। নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী এঁদের কেউ কিনেছেন সেতো বা দুর্গ, কেউ বা ভিলা, কেউ বা অতি আধুনিক সূর্যমুখী বাড়ি। কেউ-কেউ ছ'মাস ইংলন্ড, আমেরিকা অথবা কানাডায় টাকা রোজগার করেন আর ছ'মাস কুঁড়েমি করেন দক্ষিণ ফ্রান্সে।

শনিবার বেজায় ভোরে ঘর ছাড়া হলাম। শহিদনগরের মার্সেডিজ গাড়িটি যে প্রয়োজনে বিমানের গতিকেও লজ্জা দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না। হাইওয়েতে অসংখ্য দ্বিচক্রযান। মোটর সাইকেল অথবা সাইকেল চড়তে পেলে ফরাসি আর কিছুই চায় না। এখানে মোটর সাইকেলের গতি বুলেটসম—শুনলাম পুলিশকে কলা দেখিয়ে ২৪০ কিমি বেগে দৌড়চ্ছে। যে-দৃশ্যটি আমাকে অবাক করলো তা হলো প্রায় আধডজন ফরাসি যুবতী বেপরোয়া স্পিডে মোটর সাইকেল চালাচ্ছেন হাইওয়ে ধরে—এবং শরীরে আলোবাতাস লাগাবার জন্যে এঁদের ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। নিজের শরীরকে ঢেকে রাখবে না খুলে রাখবে সে সিদ্ধান্ত শরীরের মালিকের, অন্য কেউ এই টপলেস বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ফরাসি পুলিশেরও অন্য হাজার কাজ আছে, বে-আব্রু রমণীর পিছনে তারা ছোটে না। বরং মাঝে-মাঝে অতিমাত্রায় গতিমান ফরাসির পিছনে পুলিশ নজর দেয়। কিন্তু সমস্ত জাতটাই যদি হাইওয়েতে পৌঁছে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাধাবন্ধহীন হতে চায় তা হলে পুলিশ কী করবে?

আমাদের গাড়িটিও প্রায় উড়ছে—স্পিডোমিটারের কাঁটা তর তর করে ২০০ কিমি পেরিয়ে গেলো, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু শহিদনগরের সুসন্তানের তেমন কোনো চিন্তা নেই। দূর থেকে দেখলাম একটি অদ্ভুত ধরনের কমলালেবু রঙের পোশাক পরা পুলিশ রাস্তার মোড়ে হাত দেখাচ্ছে। সম্বিৎ বললো, "এই লোকটির সঙ্গে আলাপ করবেন?" মন্দ কি! বিদেশে অজানা অচেনা মানুষের সঙ্গে যত আলাপ হয় ততই ভাল, যদি-না ওঁর কোনও আপত্তি থাকে। দুষ্টুমি ভরা হাসি সম্বিতের মুখে, গাড়ি থামলো। তারপর আমার ভুল ভাঙলো। পুলিশ, কিন্তু মানুষ নয়। অথচ পুলিশের ডিউটি দিচ্ছে এই যন্ত্রমানবটি, যার নাম রোবট। এই রোবট বিদ্যায় ফরাসি যথেষ্ট বিজ্ঞ—এবং পথের ক্লান্তিকর ডিউটিতে মানুষের বদলে যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে। এই রোবট লাঞ্চ ব্রেক চায় না,

বৃষ্টিতে ভিজতে আপত্তি করে না, ওভারটাইম চায় না। আশা করি ট্রাক চালকের কাছে ঘুষও চায় না এই যন্ত্রপুলিশ।

সম্বিৎ বললো, "এই পুলিশও বিদ্যুৎনির্ভর। বিদ্যুৎছাড়া এই সভ্যতা অবাঞ্ছনীয়। আধ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে ইউরোপের সভ্যতা ভেঙে পড়বে।"

পথে এক জায়গায় কফি পান করে আমরা আবার এগিয়ে চলেছি। একটা ট্রাক ড্রাইভার উল্টোদিক থেকে আমাদের দিকে হেডলাইট জ্বালিয়ে নিভিয়ে চলে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের গাড়ির গতি কমে গেলো—সম্বিৎ বললো, "এরা হলো পথের বন্ধু। জানিয়ে দিয়ে গেলো অদূরেই পুলিশ ওত পেতে রয়েছে, দ্রুতগামী গাড়িকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে।" শুনলাম, অতিমাত্রায় গতির জন্যে যেমন ফাইন আছে, কম গতির জন্যেও তেমন ফাইন হয়। দুনিয়াতে মধ্যপথটাই যে শ্রেষ্ঠপথ তা আর একবার প্রমাণিত হলো।

মাঝপথে আমরা সমুদ্রতীরে একটু নজর দিলাম। এদেশের মহিলাদের বোধহয় পিত্তের প্রকোপ—শরীরে জামাকাপড় রাখতে খুবই কষ্ট। ডজন-ডজন রমণী কটিমাত্র বস্ত্র পরিহিতা হয়ে সূর্যদেবকে নিজেদের শরীর নিবেদন করছেন। এঁদের কোনও সঙ্কোচ নেই—বাংলায় প্রবাদ আছে, হাগন্তির লজ্জা নয়, দেখন্তির লজ্জা! রমণী শরীর দৈর্ঘ্যে না-হলেও প্রস্থে প্রায় স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হয়ে উঠছে ফরাসি দেশে। মেদাধিক্য এদেশে বিরল।

এবার কান। এই সেই সাগরজলে স্নানকরা সৌন্দর্য নগরী যা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে জগৎবিখ্যাত হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র উৎসবের সময় এই শহরে ঠাঁই পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দুনিয়ার উঠতি সুন্দরীদের দেখবার জন্যে সমস্ত দুনিয়ার সুরসিকরা এখানে ভিড় জমায় ওই সময়। সেই সঙ্গে চলে কোটি কোটি ডলারের সিনেমা সংক্রান্ত লেনদেন।

. কিন্তু ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের বাইরেও কান ঘুমিয়ে পড়ে না, দুনিয়ার আর কোথাও বোধহয় এতো দামি হোটেল নেই। পকেটে পয়সা থাকলে কান-এর কোনও বিকল্প নেই। সমুদ্রতীরে পাঁচ-মিনিট ঘুরে এলেই দুনিয়ার এক দশমাংশ ধনী, তাঁদের বান্ধবী, স্ত্রী অথবা বিধবাদের দেখা হয়ে যাবে। দুনিয়ার বড়লোকরা একটু বিশেষ ধরনের বিলাসিতার সন্ধানে এই সমুদ্রতীরে ছুটে আসেন, যদি কান এই না যাওয়া গেলো তা হলে ধন উপার্জন করে কী লাভ হলো। এই ভিড়ে কিছু আরব এবং বেশ কিছু জাপানিও নজরে পড়লো। ইউরোপ ও আমেরিকাকে ব্যবসায়ে নাজেহাল করে জাপানি এবার একটু ভোগের দিকে নজর দিচ্ছে, এর ফলে ফরাসি নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচছে। যে শিল্পপতি কেবল রোজগার করে অথচ ভোগ করতে চায় না ফরাসি তাকে

নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। এই রকম মানুষের সংখ্যা বাড়লে ফরাসি সভ্যতা লাটে উঠবে—প্যারিস ও কান গোল্লায় যাবে।

কান-এর এই ধনাঢ্য সমারোহে আমরা দুই বঙ্গসন্তান একেবারেই ছন্দোপতন ঘটাচ্ছি। পকেটে কুড়ি ডলার নিয়ে কার্লটন হোটেলে আসার দুঃসাহস দেখাবার কৃতিত্ব বিশ্বের মধ্যে প্রথম বাঙালিরাই দেখালো।

দূর থেকে কার্লটন হোটেলের বাড়িটি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। বড়লোকরা ভোগের জন্যে কিছু নির্মাণ করলে সাধারণ মানুষও সেই সৌন্দর্যে বিনাপয়সায় ভাগ বসাতে পারে। যিনি এই কার্লটন হোটেলের স্থাপত্যের জন্যে দায়ী তাঁকে মনে-মনে নমস্কার জানাই। দুনিয়ার এক নম্বর হোটেল হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অত সহজ জিনিস না মহাশয়। এই সেদিনও, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে ফরাসি হেটেলের কোনও ইজ্জত ছিল না বিশ্বের ধনী সমাজে। তখন আমাদের কলকাতার স্পেন্সেস ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অনেক এগিয়ে ছিল। ফরাসি হোটেলের নোংরামি ছিল বিশ্ববিদিত—প্যারিসের একটি হোটেল তো বিজ্ঞাপনই দিতো, আমরাই একমাত্র ফরাসি হোটেল যেখানে অতিথিদের নিয়মিত গায়ে মাখা সাবান দেওয়া হয়। নোলার দিকেই শত-শত বছর সমস্ত নজর দিয়েছে ফরাসি, স্নান, কলঘর এসব তাদের চিন্তার বাইরে ছিল। যেমন ধরুন ওয়াটার ক্লোজেট—বা চেন টানলেই পায়খানায় জল সরবরাহ এটি ইংরেজের আবিষ্কার। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ফরাসি সম্রাটরাও পটিতে তাঁদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সারতেন এবং ভৃত্যরা তা বহন করে নিয়ে যেতো। ফরাসি চিত্রকলার সমঝদাররা জানেন, কলঘরের কোনও আব্রু ছিল না। রাজা ও রানিরা যখন প্রাত্যহিক কর্মে নিয়োজিত থাকতেন তখন তাঁদের মন্ত্রী, পরিচারক ও পরিচারিকারা নতমস্তকে সামনে হাজির থাকতেন হুকুম গ্রহণ করার জন্যে অথবা মন্ত্রণা দেবার জন্যে।

সেই ফরাসি হুড়মুড় করে বাবু-বিবিগিরিতে কোথায় এগিয়ে গেলো। হোটেলের বিলাস কাকে বলে তা সশরীরে জানবার প্রয়োজন হলে কার্লটন ছাড়া গতি নেই।

বড় হোটেলের গেট থেকেই তার বিশিষ্টতার নমুনা পাওয়া যায়। একজন দারোয়ান এসে আমাদের মার্সেডিজ বেনজকে স্বাগত জানালো। সম্বিৎকে চালকের আসন থেকে নামিয়ে সে গাড়ির দায়িত্ব গ্রহণ করলো। মঁশিয়ে সেনগুপ্ত যে এখানে নিতান্ত অপরিচিত নয় তা এঁদের কথাবার্তায় বোঝা গেলো।

ব্যারন দ্য শহিদনগর এবার ডিউক অফ কাসুন্দিয়াকে নিয়ে কার্লটন হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ জুড়িয়ে গেলো—কাউন্টারে যেন অষ্টপ্রহর বিশ্বসুন্দরী সম্মেলন চলেছে—এতোগুলি সুদর্শনা তরুণী মহিলা এবং সপুরুষ যুবাকে এমন সুসজ্জিত অবস্থায় দুনিয়ার আর

কোথাও কেউ দেখেনি। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা হেথায়। কারণ এই পুরুষ ও নারীর মুখে স্বর্গীয় হাসি লেগে রয়েছে—পৃথিবীর কারও বিরুদ্ধে তাঁদের কোনও অভিযোগ নেই, সন্দেহ নেই—সবাইকে এই নন্দনকাননে আহ্বান করার জন্যে যেন এঁরা উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। মঁশিয়ে সেনগুপ্তা ও মঁশিয়ে মুখার্সি এরই মধ্যে সুপার ভি আই পি আদর পেলেন। একটি তরুণী ছুটে এলেন, আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো? এই সুন্দরী যে কেন হলিউডের হৃদয় কাঁপানো নায়িকা হননি তা কে বলবে আমাকে? এঁকে দেখেই কি রবীন্দ্রনাথ সাগরজলে স্নান করা বিদেশিনীর ছবি এঁকেছিলেন?

এই অপরূপাটি হোটেলের জনসংযোগ আধিকারিকা। দেশ মরক্কো। অমন শরীর নিয়ে কোন দুঃখে মরক্কো ছেড়ে বিদেশে চাকরি করতে এসেছে তা জানা প্রয়োজন। কোনওদিন যদি রাজরানি হয়ে যান তা হলেও আশ্চর্য হবার নয়। হিচককের নায়িকা গ্রেস কেলির কথা মনে আছে? তিনিও প্রথমবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে দ্বিতীয়বার কানে এবং কার্লটন হোটেলে এসেছিলেন। এখানেই মোনাকোর রাজপুত্রর সঙ্গে দেখা হলো এবং তার থেকে পরিণয়, যে বিয়েকে ম্যারেজ অফ দ্য সেঞ্চুরি বলা হয়েছিল সেই সময়।

এই হোটেলের অন্যতম অধীশ্বর মার্ক তেজে এবার আসরে আবির্ভূত হলেন, আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন—সিনেমা ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে আমাদের না জড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার নিবিড় সংযোগের কথা স্বীকার করে গত বছর থেকে আমরা বিশেষ পুরস্কার দিচ্ছি।

মার্ক তেজে জানতে চাইলেন আমরা এখনই গল্পে বসবো কিনা। আমার মন তখন হোটেলঘরগুলো দেখবার জন্যে ছটফট করছে। মার্ক তেজে রাজি হয়ে গেলেন, ওই মরক্কো সুন্দরীর হাতে কিছুক্ষণের জন্যে দায়িত্ব দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমার প্রথম সুবিধা, মার্ক তেজে চমৎকার ইংরিজি বলেন। এই মরক্কো সুন্দরীও কম নয়। সে বললো, "কান-এর সঙ্গে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইংরেজদের যোগসাজস অনেক দিনের, তাই ইংরিজির প্রতাপ এখানে একটু বেশি।"

মরক্কো সুন্দরীকে অপেক্ষা করতে বলে আমি একটু টয়লেট রুম ঘুরে এলাম। পৃথিবীর কোন হোটেল কীরকম তা প্রথমেই যাচাই করা যায় জনসাধারণের জন্য টয়লেট দেখে। ভারতবর্ষে যত হোটেল-টয়লেট আছে তার মধ্যে এক নম্বর বোম্বাইয়ের তাজ। আজকাল প্রায় সমানে পাল্লা দিচ্ছে বম্বের ওবেরয় টয়লেট। কিন্তু হোটেল কার্লটন—লা জবাব। মনে হবে যেন আগ্রার তাজমহলের এক অংশকে টয়লেটে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সাধে কি আর দুনিয়ার সেরা সম্মান জুটেছে এর কপালে।

মরক্কো সুন্দরী এবার আমাদের বাইরে নিয়ে এলো। অসামান্য সুন্দর স্থাপত্য, ওয়েডিং কেক-এর কথা মনে রেখে জগদ্বিখ্যাত স্থপতি ৩৫৪ কামরার এই হোটেল তৈরি করেছিলেন এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—প্রথম মহাযুদ্ধের আগে। যা আমার অবাক লাগলো কোথায় যেন কলকাতার ওবেরয় গ্র্যান্ডের বহিরাঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে—গ্র্যান্ডের স্থপতি নিশ্চয় এই হোটেলের খোঁজখবর রাখতেন। তিনি অবশ্য কার্লটন হোটেলের দু'টি গম্বুজ কপি করেননি। সুন্দরী বললো, "এই গম্বুজ দু'টি সম্পর্কে কিছু খবর আমাদের এই কাগজে রয়েছে।" ঝপ করে পড়তে গিয়ে একটু লজ্জা পেলাম। স্থপতি চার্লস ডেলমা এই ডোম দু'টির অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত নর্তকী বেল ওটেরোর উদ্ধত স্তনযুগল থেকে। শোনা গেলো, প্রতি বছরে কান ফিল্ম উৎসবের সময় যে হাজার পঞ্চাশেক মানুষ এই শহরে ঘুরে বেড়ান তাঁদের অনেকেই বেল ওটেরোকে অবিস্মরণীয় করে রাখার এই প্রচেষ্টাকে প্রাণভরে সাধুবাদ জানান।

মরক্কো সুন্দরীর সঙ্গে আমরা এবার অন্দরমহল দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। এমন পরিচ্ছন্ন রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর আর কোথায় আছে জানতে ইচ্ছে করে। ভারতবর্ষের কোনও হোটেলের অঙ্গসজ্জার সঙ্গে যে এর তুলনা অচল তা স্বীকার করে নেওয়া ভাল। নিউইয়র্ক, লন্ডন ও ওয়াশিংটনের বিখ্যাত কিছু হোটেল দেখেছি, কিন্তু তারাও তুলনায় অনেক পিছিয়ে। প্যারিসে সম্বিতের দয়ায় হোটেল ক্রিল বলে বিখ্যাত হোটেল দেখে এসেছি। তার সঙ্গে কিছুটা তুলনা চলে। ওই হোটেলে রাজীব গান্ধী থাকতেন, সেখানে তাঁর প্রিয় ঘরটিও নিজের চোখে দেখে এসেছি। মনে রাখার মতন ঘর।

মরক্কো সুন্দরীর নাম নার্জিস। আমাদের দেশ হলে নার্গিস বলতাম। সে টপটপ করে কার্লটন হোটেলের ইতিহাস বলে যাচ্ছে। এখানে অনেক ঐতিহাসিক মিটিং হয়েছে যেখানে রাজনীতিবিদরা উপস্থিত হয়েছেন। এমনই একটি মিটিংয়ের সময় হৈ-চৈ করার জন্যে ইতালির এক সাংবাদিককে হোটেল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ইনিই বেনিতো মুসোলিনি—পরে জগদ্বিখ্যাত হন। ইতালীয়রা এই অপমান হজম করেনি, দ্বিতীয় যুদ্ধের কোনও এক পর্যায়ে ইতালীয় সৈন্যবাহিনী এই হোটেল অধিকার করে নিয়েছিল। মুসোলিনি তখন কোনও স্পেশাল হুকুম পাঠিয়েছিলেন কি না তা জানা হয়নি।

সুন্দরী বললো, "কোনও অতিথি আমাদের হোটেলে এক বছর থাকলেও একঘেয়েমি বোধ করবেন না, প্রয়োজনে প্রতি রাত্রে তাঁকে আমরা নতুন ঘর ও বিছানা দিতে পারি। কয়েক বছর হলো ঘরের সংখ্যা কিছু বেড়েছে। অতি সাবধানে নতুন একটি তলা তৈরি হয়েছে।"

আমি হোটেলের করিডোর ধরে হাঁটছি, আর তাজ্জব হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে

এই সময় ভিড় একটু কম, তাই কয়েকটা বিখ্যাত ঘর দেখা হয়ে গেলো।

যদি কার্লটন হোটেলে সুখের চূড়ান্ত উপভোগ করতে চান, তাহলে ১লা জুলাই থেকে ৩১শে আগস্টের মধ্যে আসতে হবে, যদিও এই সময় ঘরভাড়া প্রায় তিরিশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেন কর্তৃপক্ষ। যে-সুইটের দাম একেবারেই ওঠানামা করে না তার নাম সুইট ইম্পিরিয়াল। এইখানেই লাখ দুয়েক টাকার বিনিময়ে এক রাত্রি যাপন করে স্বর্গসুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। তবে পকেটে মাত্র দু'লাখ টাকা থাকলে না-খেয়ে রাত কাটাতে হবে। খাওয়া এবং আনুষঙ্গিক অন্য খরচ অবশ্যই আলাদা। ইম্পিরিয়াল সুইটে থাকার একটি বিশেষ সুবিধা আজেবাজে অর্ডিনারি লোকের সঙ্গে আপনাকে একই লিফট ব্যবহার করতে হবে না, আপনার সুইটের জন্যে আলাদা লিফ্‌ট।

ইম্পিরিয়াল সুইটে যাবার পথে অন্য দু'একটি সুইট দেখা হলো। এগুলির নাম 'সমুদ্রমুখী' অথবা 'পর্বতমুখী'। প্রতিটি ঘরের রং অনুযায়ী সে ঘরের লিনেন, বিছানার চাদর ও পর্দার ব্যবহার। ঘরের রং মিলিয়ে বিছানার চাদরের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোনও হোটেলে দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

অবশেষে ইম্পিরিয়াল সুইট। যা দখলে পাওয়া বেশ শক্ত। বহু আগে থেকেই পৃথিবীর বড়লোকরা তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে রাত্রিবাসের জন্য এই সুইট বুক করে রাখেন। এই সুইট চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়। এই সুইটে সর্বসাকুল্যে উনিশখানা ঘর। বাথরুমই খান চারেক—পৃথিবীর বিখ্যাত দম্পতিরা পথে বেরুলে একই বাথরুম ব্যবহারে আগ্রহী হন না। ইচ্ছে হলে স্পেশাল রান্নাবান্নার ঢালোয়া ব্যবস্থা রয়েছে। সিটিং রুমও রয়েছে একাধিক।

মরক্কো সুন্দরী আমাকে বললো, "সাধারণ লোকরাও শীতকালে আমাদের হোটেলে সহজেই চলে আসতে পারেন, তখন কিছু ঘর আমরা মাত্র তিন হাজার টাকায় ভাড়া দিই। সঙ্গিনী আনলে অবশ্যই রেট বেড়ে পাঁচ হাজার হয়ে যায়।"

এই সব ঘর রূপকথার দেশের মতন ঝকঝক করছে। প্রতিদিন প্রতিটি ঘরকে এই অবস্থায় রাখার জন্য কী ধরনের হাঙ্গামা পোয়াতে হয় তা আমি শাজাহান হোটেলের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

এরপর আমরা স্বাস্থ্য-সেন্টারটি ঘুরে দেখলাম। হঠাৎ দেখলে প্রথম শ্রেণীর নার্সিংহোম মনে হয়। পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখবার জন্যে অপারেশন থিয়েটারের মতন এখানে রাস্তার জুতোর ওপর অন্য জুতো পরিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের শরীরকে সুখ দেবার জন্যে এতো ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় তা আমার জানা ছিল না। একটি ঘরে দেখলাম ওয়াটার বেড—যাকে জলের তোশক বলা চলে—ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করতে এই বিছানা নাকি তুলনাহীন।

হেলথ ক্লাবের সব রকম অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চয় করতে হলে দিনে

হাজার কুড়ি টাকা খরচ প্রয়োজন যা দুনিয়ার বড়লোকদের কাছে সিকি-দুয়ানির মতন। মিনিট কয়েক মাসাজের দক্ষিণা হাজার দেড়েক। হাইড্রোমাসাজ-এর ঘরটিকে প্রথমে নিগ্রহশালা মনে হতে পারে, কিন্তু শরীর নাকি সুখ পায়। আরও একটি সংবাহন কক্ষের নাম ওজোথার্ম। একটি ঘরে জেট শাওয়ার—নানা কোণ থেকে প্রবল বেগে জল বেরিয়ে এসে ক্লান্ত শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে এর নাকি তুলনা নেই। আর একটি কক্ষে প্রেসার-থেরাপি, গেরস্ত বাংলায় যাকে চাপ চিকিৎসা বলা চলতে পারে। চাপ দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব জানতাম, কিন্তু জাঁকে ফেলে ট্যুরিস্টের চিকিৎসা পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। সম্বিৎ অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হলো না। বাবুঘাটের সামনে সংবাহন-বিশারদদের স্মরণ করতে বললো। কর্তব্যকর্মের কোনও এক স্তরে রোগারোগা এই বিশেষজ্ঞেরা বিশালবপু খরিদ্দারের বুকের ওপর যেভাবে চেপে বসেন তা দেখলে দূর থেকে ভয় হয়, কিন্তু শেঠজী যেরকমভাবে কুমিরের মতন পড়ে থাকেন তা দেখলে বোঝা যায়, নির্যাতন থেকে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন।

মরক্কো সুন্দরী আমাদের জানালো পৃথিবীতে এমন কোনও বিখ্যাত চিত্রতারকা নেই যিনি এই হোটেলে-না রাত্রিযাপন করেছেন। ভূতপূর্ব ইংরেজ সম্রাট ডিউক অফ উইন্ডসরের প্রিয় জায়গা ছিল এই হোটেল। লিজ টেলর যখন প্রথম এখানে এসেছিলেন তখনও তেমন বিখ্যাত হননি—সঙ্গে ছিলেন তখনকার স্বামী কনরাড হিলটন। প্রিন্স আলি খানকে বিবাহের পরেই রীতা হেওয়ার্থ এই হোটেলে কয়েক রাত্রি যাপন করেছেন। এই হোটেলেই প্রথম 'মিস্ ফেস্টিভ্যাল' প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। ব্রিজিত বার্দোর আবিষ্কার এখানেই। সে গল্প তো এখন রূপকথার মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাঁটতে-হাঁটতে আর্কেডে আমরা ছোট্ট হোটেল শো কেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কাঁচের মধ্যে সিলডি নিসেন-এর গহনার ডিসপ্লে। একটি মডেলের গলায় সরু হার। আমাদের গাইড বললো, "এর দাম আড়াই কোটি টাকা।" নিশ্চয় বিক্রি হয়, না-হলে শো কেসে রাখবে কেন? যে মডেলের গলায় হার রয়েছে তাঁর মুখটি অনুপস্থিত। অনাবৃত স্তনের একটি গোলাপি ও আর একটি শাদা। সম্বিৎ ব্যাখ্যা করলো, এই সব গহনা কিনে দেন স্বামী না হয় কোনও প্রেমিক—তাই এই মায়ামোহের সৃষ্টি। যিনি কিনবেন তিনি নিজের প্রিয়জনের মুখটি কল্পনা করে নেবেন।

আমি এবার জানতে চাইলাম, "এই হোটেলের মালিক কে?" নার্জিস একটু দ্বিধা করলো। তারপর বললো, "আমরা ইন্টার কন্টিনেন্টাল গোষ্ঠীর অংশ—সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের শ'খানেক হোটেল আছে। সম্প্রতি এই হোটেলের মালিকানা কিনে নিয়েছেন জাপানিরা।"

এই জাপানি কোম্পানির নাম শিবু সাইসন, যা আমরা কেউ শুনিনি। জাপানিরা অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁরা এই হোটেলের ইউরোপীয় বিশিষ্টতায় বিন্দুমাত্র হাত দেননি।

আমাদের এই কথাবার্তার মাঝখানেই নার্জিস ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং বললেন, "মঁশিয়ে মার্ক তেজে এবং তাঁর স্ত্রী নিশ্চয় লাঞ্চরুমে আপনাদের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।" মহিলা সেদিকেই আমাদের নিয়ে চললেন।

কান-এর কার্লটন হোটেলের এক নম্বর কর্মকর্তা ক্রিশ্চিয়ান লা প্রিন্স। দু'নম্বর মার্ক তেজে। জগদ্বিখ্যাত লা কোত রেস্তোরাঁয় সস্ত্রীক তেজে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মার্ক তেজে সুদর্শন সুরসিক পুরুষ, যদিও প্রমাণসাইজ ফরাসির তুলনায় ওঁর শরীরটা একটু ভারী। স্ত্রী অ্যানি অসামান্যা সুন্দরী।

মস্ত হোটেলের দায়িত্বে থাকলেও মার্ক মানুষটি এখনও শিল্প ও সাহিত্যনুরাগী। এঁর স্ত্রীর আগ্রহ ভবিষ্যৎ গণনায়—এ-বিষয়ে ভারতবর্ষের রহস্যময় উপস্থিতির কথা ফরাসি সুন্দরীর কানে পৌঁছে গিয়েছে। অ্যানির জন্ম আফ্রিকায় গিনিতে—আফ্রিকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অ্যানির যথেষ্ট আগ্রহ। মার্ক তেজের জীবন শুরু হয়েছিল আর্টকে কেন্দ্র করে। তাঁর পড়াশোনার বিষয় ছিল 'রাফ্ আর্ট'। ব্যাপারটা কি আমার জানা ছিল না। মার্ক তেজে বললেন, "আর্টের এই দিকটা এখন সমস্ত পৃথিবীর কৌতূহলের বিষয়—যে আর্টের জন্য কোনও শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, যার মধ্যে অতীতের ধারাবাহিকতা নেই। একজন কয়লাখনির শ্রমিক, কিংবা ট্রাক ড্রাইভার হঠাৎ অন্তরের তাগিদে আঁকতে আরম্ভ করলেন, এমন আঁকা যা দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পারে। এঁদের হাত আসলে ঈশ্বরের হাত," বললেন মার্ক। এমন একজন শিল্পীর নাম ফ্যাক্টর শেভাল, যাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন মার্ক তেজে। বেশ কিছুদিন আর্ট গ্যালারিতে কাজ করে তেজের মন ভরলো না। তখন ফ্যাশন সংস্থা পিয়ার কার্দিন-এ যোগ দিলেন মার্ক। ওখানেও বেশীদিন ভাল লাগলো না। হোটেল জগতের এক বন্ধুর সঙ্গে জানা ছিল, তাঁর সাহায্যে এ-লাইনে হাতে খড়ি হলো। তারপর বিশ্বময় ঘুরে বেড়িয়েছেন মার্ক তেজে—প্রথমে আমেরিকার সান ফ্রানসিসকোতে মেরেডিয়ান হোটেলে, তারপর তিনবছর কায়রোতে পিরামিডের খুব কাছের এক হোটেলে। ফ্লোরিডা, আবুধাবি, ব্রাসেলস এবং স্পেনের শহরে হোটেলে কাজ করেছেন মার্ক। ফরাসি হোটেল বিশেষজ্ঞের দাম এখন দুনিয়ার সর্বত্র।

তারপর বছর দুয়েক হলো কার্লটনে এসেছেন মার্ক তেজে। বললেন, "আমার

স্ত্রী আমেরিকা পছন্দ করেন না, আমি মধ্যপ্রাচ্য পছন্দ করি না। ফলে ফ্রান্সই আমাদের পক্ষে সেরা জায়গা।" ওঁদের একটি আদরের ব্লু পারসিয়ান বেড়াল আছে—জগদ্বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ফেলিনি সেবার কান-এ এলেন, ওই সময় ওই মাদি বেড়ালের জন্ম, তাই আদর করে ওর নাম দেওয়া হয়েছে ফেলিনা।

ফরাসিরা কাউকে পছন্দ করলে খোলামেলা হয়ে যান। আমি কোথাকার কোন হরিদাস পাল। ওঁর ব্যবসায়ে কোনও কাজ লাগবো না, তবু তেজে আমাকে গুরুত্ব দিলেন, বললেন, "আপনারা যা জানবার আছে জিজ্ঞেস করবেন।"

"হোটেল মানে একটি বাড়ি, কিছু ঘর এবং খাট-বিছানা এবং রান্নাঘর নয়," বললেন মার্ক। ঘরছাড়া হলেও মানুষ গৃহকোণের নিরাপত্তা ও সেই সঙ্গে কিছু বাড়তি অভিজ্ঞতা খোঁজে। তাই বিশ্বের সেরা হোটেলগুলো অভিজাত এগজিবিশনের মতন হয়। শুধু শোওয়াটাই কাজ নয়, তার আগে মানুষ খেতে চায়। খাওয়ার ব্যাপারেও মানুষ সাবধানী, অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকেও সে এক পা বাড়িয়ে একটু অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। খাওয়া মানে শুধু জিভের এবং পেটের অভিজ্ঞতা নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয়, বিশেষ করে নাক ও চোখের বিশেষ ভূমিকা প্রয়োজন হয়। যা দৃষ্টিনন্দন নয় ফরাসি শেফ তা আপনাকে পরিবেশন করবে না। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন পরিবেশ। গুরমে ও গুরম্যাঁ দু'টি ফরাসি শব্দ ইংরেজরাও গ্রহণ করেছে—এতো কাছাকাছি, উচ্চারণ কিন্তু আকাশপাতাল তফাত। একটা হচ্ছে, পেটুক ভোজনসর্বস্ব, যার কোনও রসবোধ নেই। আর অন্যটির অর্থ ভোজনরসিক। খাওয়াটা তার কাছে আর্টকে তারিফ করার মতন।

মার্ক তেজে বললেন, "এ-দেশে রাঁধুনিরা তাই আর্টিস্টের সম্মান পেয়ে থাকে। অনেক রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পরে শেফের অটোগ্রাফ নেবার জন্যে, তার সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে অতিথিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পল বোকুসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়, ওঁর জনপ্রিয়তা তো ফিল্ম থেকে কম নয়। আসলে খাদ্যরসিকরা জানেন, একটি ডিশ যদি ক্রিয়েশন হয় তাহলে তার পিছনে নিশ্চয় একজন শিল্পী স্রষ্টা আছেন এবং তাঁকে সাধুবাদ না জানালে ভবিষ্যতে নব-নব সৃষ্টি সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে।

যে রেস্তোরাঁয় আমরা বসেছি তার দেওয়ালে দৃষ্টিনন্দন বহুমূল্য আধুনিক চিত্রকলা। সেই ছবি আবার ছাপা হয়েছে মেনুকার্ডের প্রচ্ছদে। মনে হচ্ছে, আগ্রার তাজমহলের আর একটা অংশ যেন রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্বিৎ চুপি-চুপি পাশের সিটের এক বৃদ্ধার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। একলা বসে-বসে লাঞ্চ সারছেন। খাচ্ছেন খুব ধীরগতিতে। মাঝে-মাঝে একটা বইয়ের দিকে হাল্কা নজর দিচ্ছেন। সম্বিৎ বললো, "মাদাম ফুকোঁ। এঁর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত এক ফরাসি মুদিখানা দোকানের মালিক।" সেরা জিনিসের জন্যে

বড়লোক ফরাসি পাগল, তারা দশ টাকার জিনিস একশ টাকায় কিনবে এই দোকান থেকে, যদি তা দুনিয়ার সেরা হয়। টেন্ডার ডেকে, দরকষাকষি করে পৃথিবীর সেরা জিনিস পাওয়া যায় না। তার জন্যে দরাজ হৃদয়ে অপেক্ষা করতে হয় এবং দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, কারণ সেরা জিনিসকে নিজের ঘরে আনবার জন্যে আরও অনেক বড়লোক তৈরি হয়ে আছে।

কর্তৃপক্ষের টেবিলে বসে আমরা রাজসম্মান পাচ্ছি। আর আমার মনে পড়ছে কলকাতার দিলখুসা, সাঙ্গুভেলি, অনাদি ইত্যাদি রেস্তোরাঁর কথা। খাওয়াকেই ওখানে মুখ্য ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, এমন কি স্বস্তিতে বসবার উপায়ও নেই, টেবিল দখল করার জন্যে আর একজন লোক আপনার ওপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে। অনাহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও ভোজনরস যে এক জিনিস নয় তা ভারতীয় হিন্দুরা কোনও দিনই বুঝতে শেখেনি। খাওয়াটা এমনই সিরিয়াস ব্যাপার যে বাউনের তো সুখাসনে সুখাহারের সময় কথা বলাই বারণ। যা কিছু নির্দেশ তা আকারে ইঙ্গিতে দেবার ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রত্যেকটি নবীন ব্রাহ্মণকে উপনয়নের সময়।

পানীয় পরিবেশনের জন্যে যে-লোকটি অদ্ভুত একটি বেশে সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে খানিকটা খ্রিস্টান যাজক, খানিকটা ম্যাজিশিয়ানের মতন দেখাচ্ছে. রহস্যময়ভাবে গলা থেকে রুপোর বাটির মতন কী একটা ঝুলছে। ফরাসি হোটেল জগতে এই মানুষটি শ্রেষ্ঠবিষ্ণু—সোমেলিয়ার। লোকটি পানীয় পরিবেশনের আগে মোমবাতি জ্বালিয়ে, বোতলকে বিভিন্নভাবে নাড়িয়ে, তলানি আছে কি না লক্ষ্য করে এবং সর্বশেষে একটু ওয়াইন কুলকুচি করে যেসব আচার করলো তা অনেকটা মধ্যযুগের রহস্যে ঘেরা। মার্ক তেজে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "হোটেল রেস্তোরাঁয় এই লোকটির মস্ত ভূমিকা। যে-কেউ এই বেশ ধারণ করতে পারে না, সোমেলিয়ার হবার জন্যে দীর্ঘদিনের সাধনা এবং সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সমস্ত ওয়াইনের রহস্য এঁর জানা।"

আমি লোকটির হাবভাব এবং কাণ্ডকারখানা দেখে রীতিমত অবাক। মার্ক তেজে বললেন, "আপনাকে মনে রাখতে হবে, হাজার-হাজার রকম ওয়াইন আছে। প্রত্যেক বছরে ভাইনইয়ার্ডের চরিত্র পাল্টায়, ফলে এঁকে ওয়াইনের চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া হতে হয়। আমাদের এই হোটেলে অন্তত দুশো আশিরকম ওয়াইনের চয়েস আছে—কখন কোন খাদ্যের সঙ্গে কী দরকার তা নির্বাচন করা সোজা কাজ নয়। এই ভদ্রলোক বোতল খুলে আগুন জ্বালিয়ে ওয়াইনকে অক্সিজেন দিচ্ছেন।" আমি সোমেলিয়ার বিদ্যায় কৌতূহলী জেনে সায়েব আমাকে দু'টি সুভেনির সুদৃশ্য মোড়কে উপহার দিলেন। একটি ওয়াইন বোতলের ভিতরের সোলার ছিপিটি এবং ওয়াইনের গায়ে লাগানো লেবেলটি।

এই বোতলের জন্ম কোন অঞ্চলের কোন গ্রামে এবং কোন সালে তা ছাপানো রয়েছে।

আমাদের লেবেলটিতে ১৯৮৩ লেখা আছে। সায়েব বললেন, "ওই অঞ্চলে আঙুরের ফলন কম হয়েছিল, কিন্তু সেরা জিনিস। ১৯৮২ সাল লেখা থাকলে আপনাকে দিতে লজ্জা পেতাম। শেষ মুহূর্তে প্রচুর বৃষ্টি হয়ে ফলন খুব ভালো হয়, কিন্তু আঙুরের চরিত্র সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিল। প্রচুর মদ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু অ্যাসিডিটি ও ট্যানিন নিতান্তই কম। তার আগের বছর আপনি মনে রাখবেন সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি হয়ে আঙুরের রং নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ওয়াইন রাখবার জন্যে নয়। তালিকার শেষে নেই, তার আগের বছর ঐ অঞ্চলে আগস্টে বৃষ্টি হয়ে আঙুরের বারোটা বাজিয়ে দেয়, পান করবার মতন ওয়াইন ও-অঞ্চলে তৈরিই হয়নি।"

আমার মাথা ঘুরছে—কারণ প্রতিটি ফরাসি গ্রামের ইতিহাস ও ভূগোল মগজে না রাখলে ওয়াইন চেনার উপায় নেই। আঙুরকে জাতে উঠতে হলে গাইতে হয়, কোন লগনে জনম আমার, আকাশে চাঁদ ছিল রে! মার্ক তেজে বললেন, "মোদ্দা আইনটা হলো, ওয়াইনের চার রকম শ্রেণীভেদ—সাধারণ ; সাধারণের থেকে এক স্তর ওপরে; নামকরা এবং গ্র্যান্ড। একতারা থেকে চারতারা।"

মাতৃদেবীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আলোকে ফরাসি মদ্যপানে বিরত থাকা গেলো, কিন্তু কিছু সুভেনির সংগ্রহে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

এরপর মধ্যাহ্নভোজন। ভোজনের কার্ডটিতে দামের ইঙ্গিত রয়েছে, হাল্কা মধ্যাহ্নভোজনের খরচ মাথা পিছু হাজার তিনেক টাকা। খাদ্যের নাম দেখে কিছু বাছ-বিচার করা এই বঙ্গসন্তানের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং গোমাংস ও শূকর মাংসকে অধমের অন্নে স্থান দেবেন না কেবল এই করুণ আবেদন জানিয়ে অন্য ব্যাপারে গৃহস্বামীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ফরাসি এই একটি বাধা নিষেধে ঘাবড়ানোর পাত্র নন, কারণ জগৎসংসারে টেবিল ও চেয়ার ছাড়া এমন কোনও দ্বিপদ বা চতুষ্পদ ঈশ্বর তৈরি করেননি যা ফরাসি রাঁধুনি তাঁর ডেকচিতে না ওঠাতে পারেন। এই তালিকার শুরু হলো ঘোড়া থেকে তারপর গাধা, ময়ূর থেকে ব্যাঙ পর্যন্ত কী নেই? তালিকা শুনতে-শুনতে আবৃত্তি বন্ধের জন্য কাতর আবেদন জানাতে হলো। একটি বিশেষ খাবার হলো, হাঁসকে অতিভোজনে বাধ্য করে তার লিভারের বিকৃতি ঘটানো এবং স্বাভাবিক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তার প্রাণহরণ করে স্ফীত লিভারের স্বাদ গ্রহণ করা।

মার্ক তেজের সঙ্গে কথাবার্তায় ফরাসির ভোজনপ্রীতি সম্পর্কে আমার তৃতীয় নয়ন উন্মুক্ত হলো। ইউরোপের রসিকতা ; নরকে ব্রিটিশ রান্না করে, সুইসরা

প্রেম করে, পুলিশির দায়িত্ব জার্মানের এবং ফরাসিরা মেকানিক। স্বর্গে ব্রিটিশরা পুলিশ, মেকানিকরা জার্মান, প্রেমিকরা ইতালিয়ান ও রান্নার দায়িত্ব ফরাসির। ইংরিজিতে শেফ থেকে আরম্ভ করে রান্নার যাবতীয় বিশেষ শব্দ ফরাসি ভাষা থেকে বেমালুম তুলে নেওয়া। ফরাসি রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না এমন দেশও নেই। অথচ এই সেদিনও ফরাসিরা রান্নার র পর্যন্ত জানতো না। গরিব ফরাসির কপালে জুটতো সুপ অথবা পরিজ এবং টোকো রুটি। ধনী ফরাসি খেতো সেদ্ধ অথবা রোস্ট মাংস এবং মধু। প্রায় এক হাজার বছর আগে ফরাসিরা তিমি মাছ খেতে শিখলো, বিশেষ করে তিমি মাছের জিভ রান্না হতো রাজকীয় রসনার তৃপ্তির জন্যে।

সে-যুগে অতিথিরা ফরাসি নেমন্তন্ন বাড়িতে নিজের ছুরি নিয়ে যেতেন—গৃহস্বামী শুধু চামচ সরবরাহ করতেন। কাঁটা তখন কোথায়?

সম্বিৎ বললো, "ফর্ক, ফরাসিদেরই অবদান, কিন্তু তার প্রমাণ কিছু পাওয়া গেলো না। তখনও প্লেট বা ডিশের রেওয়াজ হয়নি। আমাদের দেশের ভদ্দরলোকরা যখন সোনার পাত্রে অতিথি আপ্যায়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন গাঁইয়া ফরাসি তখনও প্লেটের ব্যবহার পর্যন্ত জানে না, তখন প্লেটের বদলে পাঁউরুটি স্লাইসের ওপর মাংস পরিবেশন করা হতো। পরে ঐ পাঁউরুটি কুকুরদের দেওয়া হতো। আর টেবিল ক্লথ! আমাদের জগুদা কলকাতার রেস্তোরাঁয় গিয়ে টেবিল ক্লথে মুখ মুছতেন বলে সবাই হাসাহাসি করেছিল, আর গোটা ফরাসি জাতটা শত-শত বছর ধরে ওই কম্মো করে এসেছে বুক ফুলিয়ে।"

খাবারে বৈচিত্র্য না থাকলেও, ভোজনের পরিমাপে ফরাসি চিরকালই নির্লজ্জ। শুনুন কয়েক যুগ আগেকার এক বিয়েবাড়ির ভিতরকার খবর। অতিথিদের জন্যে রোস্ট করা হলো ন'টি ষাঁড়, আঠারোটি বাছুর, আটটি ভেড়া, আশিটি শুয়োর, একশ ছাগল এবং হাজারখানেক হাঁস-মুরগী এবং বিভিন্ন ধরনের পাখি। যাঁরা ইন্ডিয়ায় সরকারি ভোজনসভায় তিনটের বেশি পদ হয়েছে শুনলে খবরের কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে বসে যান তাঁরা শুনুন, ফরাসি বিয়েবাড়িতে অন্তত দুশো আইটেম না হলে গৃহকর্তার মুখ রক্ষা হতো না। দৈনন্দিন রাজকীয় লাঞ্চ অবশ্যই রাজকীয় হতো—পদ থাকতো অন্তত চব্বিশ রকমের মাছ-মাংস। চতুর্দশ লুইয়ের সময় ফরাসি আলু খেতে শিখলো এবং এই অভ্যেস ক্রমশ সমস্ত ইউরোপে ফ্যাশানেব্‌ল হয়ে উঠলো। যে আলুভাজার জন্য ফরাসি এতো গর্ব করে এবং দেমাক দেখায় তা কিন্তু আবিষ্কার হলো এই সেদিন আমাদের সিপাহী আন্দোলনের সময়ে ১৮৫৭ সালে।

বাঙালিদের মতন ফরাসিও একদিন খেয়ে এবং খাইয়ে ফতুর হয়েছে। জন্মোৎসব থেকে বিবাহ, বিবাহ থেকে মৃত্যু সব স্মরণীয় ঘটনাতেই ফরাসি

এলাহি খাবারের আয়োজন করতো। গ্রামে-গঞ্জে এখনও বিয়ে উপলক্ষে যা ভোজসভা হয় তা শুনলে বাঙালিকে আর কেউ ভোজন সর্বস্ব বলে সমালোচনা করবে না। ফরাসি বিয়েতে অন্তত চারটি মাংসের পদ থাকতো। যত জন অতিথি ততগুলি গোটা চিকেন অবশ্যই। পেটে খিদে থাকুক না থাকুক প্রতিটি পদ মুখে দিতেই হবে যদি-না আপনি পাত্রপাত্রীর অমঙ্গল ডেকে আনতে চান।

শ্রাদ্ধ না হলেও মরণোত্তর ভোজনেও গ্রামাঞ্চলের ফরাসি এখনও বাঙালিকে পাল্লা দিতে পারে। ফরাসি শ্রাদ্ধে মাংস পরিবেশন নিষিদ্ধ—মদ, কফি ও পেসট্রিও বারণ। যা অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে তা হলো ভাত এবং দুগ্ধজাত কিছু। শ্রাদ্ধভোজনের প্রথম আইটেমটি হবে মিল্ক সুপ। এবং ফরাসি পুরুতমশাই মৃতের মঙ্গলকামনায় আলাদা টেবিলে একলা ভোজন করবেন আমাদের ভটচাজ্যি মশায়ের মতন।

রান্নায় বাঙালিও কারও থেকে কম যেতো না। বাঙালি ইচ্ছে করলে দুনিয়ার ওপর প্রভুত্ব করতে পারতো, কিন্তু রাঁধুনির এতো অসম্মান কোনও দেশে নেই। আর্টিস্টকে সম্মান করাটা এ-দেশের ধাতে নেই, তবুও যে চৌষট্টি কলা এখনও টিকে আছে এইটাই আশ্চর্য।

সে তুলনায় ফরাসি রাঁধুনি ভাগ্যবান—শেফ এবং শিল্পীর মধ্যে কোনও তফাত নেই। ছবি আঁকিয়ে, গাইয়ে, কবি, লেখকের সঙ্গে শেফের একাসন। ফরাসি রাঁধুনি শুধু ভক্তদের অটোগ্রাফ দেয় না, দার্শনিকদের মতন কথাবার্তা বলে এবং প্রায়শই সে বই লেখে। এই বইয়ের কী রকম বিক্রি হতে পারে তা বাঙালি উন্নাসিকরা জেনে রাখুন। সম্প্রতি একটি বই এক কোটি বিক্রি হয়েছে, তবেই-না ফরাসি রান্না জগৎসভায় সেরা আসনটি পেয়েছে।

১৫৩৩ সালে দ্বিতীয় হেনরির সঙ্গে বিবাহের সময় ক্যাথারিন তাঁর বাপের বাড়ির দেশ ফ্লোরেন্স থেকে রাঁধুনি নিয়ে এসেছিলেন। বিস্মিত ফরাসিরা এই হালুইকরদের কাছ থেকে রান্না শিখলো। খাবার কী করে দৃষ্টনন্দন করতে হয় তারও তালিম নিলো। সে যুগের এক বিখ্যাত ফরাসি শেফের নাম ভাতেল। ভার্সাইয়ের এক প্রিন্সের কাছে তিনি কাজ করতেন। এই প্রিন্স একদিন রাজা চতুর্দশ লুইকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁর শেফের রান্না খাওয়াতে। দুশো ইয়ারবন্ধু নিয়ে লুই এলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে টাটকা মাছের অভাব হওয়ায় রান্না তেমন জমলো না। এমন অবস্থায় সাধারণ রাঁধুনি বকুনি হজম করে মিটিমিটি হাসে। কিন্তু শিল্পী ভাতেল শিল্পের এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে নিজের ঘরে ঢুকে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

রান্নাকে রাজপেশা বলাটাও ফরাসি দেশে অত্যুক্তি হবে না। সম্রাট পঞ্চদশ লুই রান্না করতেন, তিনি এক বান্ধবীর মনোরঞ্জনের জন্যে যে স্পেশাল ওমলেট

আবিষ্কার করেছিলেন তা ফরাসিরা এখনও খুব পছন্দ করে। রাঁধুনির পক্ষে লেখক হওয়াটা যে গালগপ্পো নয় তা যে-কোনো ফরাসি লাইব্রেরিতে গেলেই বুঝতে পারবেন। শেফদের বেদব্যাস আন্তেনিন কারেম বারো খণ্ডে বিশ্বকোষ লিখলেন, যাতে সুধু রান্নার প্রণালী নয় তার দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর একজনের নাম সাভারিন, এঁর কথামৃত এখনও ফরাসির মুখে-মুখে ঘুরছে। নমুনা : "পশুরা গলাধঃকরণ করে, মানুষ ভোজন করে আর প্রাজ্ঞব্যক্তি ডিনার করেন।"

১৮২৭ সালে আর একটি বইতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ; "মধ্যাহ্নভোজ করবে এই ভেবে যে আজ ডিনার জুটবে না। আর ডিনার করবে এই ভেবে যে আজ মধ্যাহ্নভোজ জোটেনি।"

মার্ক তেজে বললেন, "পূর্বপুরুষ দুশো বছর আগে যেভাবে রান্না করে গিয়েছেন প্রতিদিন তার পুনরাবৃত্তি করে রান্নাঘরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করায় ফরাসি শেফ বিশ্বাস করে না। বিশ্বের খাদ্য ইতিহাসে একালের ফরাসির দান—নভেল কুইজিন বা নয়া রান্না। নতুন রান্নার এই আইনস্টাইনটি হলেন ফরাসি শেফ পল বোকুস। এঁর এক বন্ধুও বিশ্বব্যাপী সম্মান অর্জন করেছেন, নাম মাইকেল জেরার্ড। আর একজন জগদ্বিখ্যাত শেফের নামও শুনলাম মার্ক তেজের কাছ থেকে—রজার ভার্জ।

রান্নার নবযুগকে সম্ভব করে এই সব শিল্পী অক্ষয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। এই নবসৃষ্টির মূল কথা হলো হাল্কা রান্না—এবং তরিতরকারির আদি রূপ যথাসম্ভব নষ্ট না করা। এর ফলে তরকারি এবং সব্জি প্রায় কাঁচাই থেকে যায়।

মার্ক তেজে বললেন, "সব্জির মূলচরিত্র রক্ষা করতে বিখ্যাত শেফরা এতোই আগ্রহী যে এঁরা অটোমেটিক কাটার ব্যবহার করেন না।" বোকুস তো ইলেকট্রিক চুল্লিতে রাঁধতেই রাজি নন। এঁদের রান্নায় তৈলাক্ত কিছু প্রায় থাকে না বললেই হয়—ডিশে খাবারের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে, কারণ আজকাল কেউই আর পেটুক বলে মার্কা হতে চান না।

ফরাসি রান্নার এই নতুন পরীক্ষায় সব থেকে আগ্রহ দেখাচ্ছে জাপান। পৃথিবীর বৃহত্তম রান্নার কলেজ চালু হয়েছে ফরাসি দেশে নয়, জাপানে। ফরাসি বোকুসের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ। জাপানিরা সম্প্রতি ফরাসির পথ অনুসরণ করে রান্নার অনেক উন্নতি ঘটিয়েছে।

মার্ক তেজে রসিকতা করলেন, "এই হোটেলে যতগুলো রেস্তোরাঁ এবং সেখানে যত রাঁধুনি প্রথম আছেন তাঁদের মুকুটহীন সম্রাট হলেন হেড শেফ। কার্লটনের হেড শেফ প্রত্যেকদিন সকালে বাজারে যান। ইনি সব্জি, মাছ ইত্যাদির

সরবরাহের জন্যে ঠিকাদারের ওপর নির্ভর করেন না। ফ্রান্সে এমন কিছু শেফ আছেন যাঁরা নিজেরাই বাগানে ভেজিটেবিল চাষের তত্ত্বাবধান করেন। এই সব শেফের বিশ্বাস, হাতে সব্জি না কাটলে তার স্বাদ নষ্ট হয়। শেফরা সংযমী জীবন যাপন করেন—এঁরা ধূমপান করেন না।"

মার্ক তেজে আমার কিছু ভুল ভাঙলেন। আমার ধারণা ছিল, বড় হোটেলের মেনু বদলায় না। তেজে বললেন, "কার্লটনে তিন মাস অন্তর মেনু পাল্টায়, যদিও কিছু আইটেম সারা বছর সার্ভ করা হয়। মনে রাখতে হবে, অনেক সব্জি বা মাছ সারা বছর পাওয়া যায় না এবং বড় বড় লোকরা ডিপ ফ্রিজকে দেখতে পারেন না।"

মেনু তৈরি যে কঠিন কাজ তারও ইঙ্গিত দিলেন মার্ক তেজে। হেড শেফ শুধু একজন শ্রেণীর শিল্পী নন, একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যানেজারও বটে। তাঁর রাঁধুনিরা কী রাঁধতে পারে, বাজারে কী পাওয়া যাচ্ছে এবং হোটেল কোন খাবর থেকে কতটা লাভ করতে পারে সব হিসেব মাথায় নিয়ে সবগুলির শ্রেষ্ঠ সমন্বয় যিনি করতে পারেন তিনি সেরা শেফ। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, খাবারের মান যেন প্রতিদিন ঠিক এক থাকে, অথচ প্রতি শিফটে লোকের ডিউটি পাল্টাচ্ছে। বড় কঠিন এ কাজ।

আমাদের দেশে খাবার দোকান, রেস্তোরাঁ, কেটারিং কোম্পানি, হোটেল কোথাও কুকের মাইনে বলবার মতন কিছু নয়। বড়-বড় বিলিতি অফিসের গেস্ট হাউসেও কুকের কদর নেই, তার মাইনে অফিসের বেয়ারার থেকে কম। ফরাসিরা ওই সব ভুল এখন আর করে না। মাসে দু'লাখ বা আড়াই লাখ টাকা মাইনে পাওয়া একজন শেপের পক্ষে কিছু ঘটনা নয়। জাপানে যেতে রাজি হলে একজন দক্ষ শেফ মাসে পাঁচ লাখ টাকা পেতে পারেন।

আর কোটিপতি হয়ে বিশ্বময় দোর্দণ্ডপ্রতাপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এমন শেফও ফরাসি দেশে বেশ কয়েকজন আছেন। এঁদের মধ্যমণি অবশ্যই বোকুস। এই ভদ্রলোক সম্বিতের কোম্পানির ক্লায়েন্ট। রান্না ছাড়াও এঁর একটি বড় কাজ বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি খাবারকে সার্টিফিকেট দেওয়া। বোকুস যদি বলেন, এই খাবার আমি রেকমেন্ড করছি তা হলে তার বিক্রি সমস্ত পৃথিবীতে হুড়মুড় করে বেড়ে যায়।

শেফদের নানা পাগলামো ফরাসিরা সানন্দে সহ্য করেন। কয়েকজন তিনতারা শেফ আছেন যাঁরা অতিথির টেবিলে নুন রাখতে দেবেন না, তাঁরা যেভাবে খাবার তৈরি করে দেবেন ঠিক সেভাবে খেতে হবে। আর একজন শেফ বলেছেন, যারা টাকা আনার হিসাব করতে চায়, ভদ্র রান্না তাদের জন্য নয়—আর্টের সঙ্গে হিসাবের যোগাযোগ রাখা অসম্ভব।

আর একজন বিখ্যাত শেফ চার্লস ব্যারিয়ার বলেন, রান্নার মাধ্যমে তিনি বিশ্বভুবনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেন। "যে মানুষটি খাবে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি খাবারটা কেমন লাগলো?"

সৌভাগ্যক্রমে ফরাসি দেশে অসংখ্য ভোজনরসিক আছেন। স্রেফ খাবার আনন্দ মনেপ্রাণে উপভোগ করার জন্যে এঁদের কেউ-কেউ বিয়ে থা পর্যন্ত করেন না। ফুড হোর বা ভোজনবেশ্যা বলে একটা কথা প্রথম শুনলাম। এঁরা এক দোকান থেকে পাঁউরুটি, এক রেস্তোরাঁ, থেকে বিফ, আরেক রেস্তোরাঁ থেকে মাছের ডিশ এবং অন্য এক রেস্তোরাঁ থেকে মিষ্টির পদ কিনে বাড়িতে নিজেদের রসনা তৃপ্ত করেন। জাত ফরাসি শেফ এই ভোজন বেশ্যাদের পছন্দ করেন না।

মার্ক তেজে বললেন, "শিল্পীদের মতন শেফরাও নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে পড়তে চান না, তাই একই ডিশ নতুন-নতুন ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রেঞ্চ ওনিয়ন সুপের কথাই ধরুন না। অন্তত দেড়শ রকম স্বাদের ফ্রেঞ্চ ওনিয়ন সুপ তৈরি সম্ভব।"

আমি ভাবছি আমাদের দেশের কথা। আমরা অতীতের প্রতি এতোই অনুগত যে জীবনের বহুক্ষেত্রে নতুনকে আহ্বান জানাতে সাহস পাই না। তাই আমাদের জীবনযাত্রা ট্রাডিশনের শিকলে যাবজ্জীবন বন্দি হয়ে রয়েছে এবং মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমরা আমাদের রাঁধুনিদের সম্মান বা স্বাধীনতা কোনওটাই দিতে রাজি হইনি। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা কেউ রান্নাঘরে ঢুকতে রাজি হয়নি। জাত রাঁধুনিও রান্নাঘর ছেড়ে অন্যত্র পালাবার জন্যেও উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

মার্ক তেজের ধারণা, ফরাসি রান্নায় জয়যাত্রা আরও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে, কারণ অতীতের প্রতি সম্মান দেখিয়েও ফরাসি শেফ নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে সারাক্ষণ ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে তার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্যেও সমস্ত জাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন মার্ক তেজে। বললেন, "আমাদের প্রধান শেফকে একটু খবর দিয়ে আসি। উনি প্রসন্ন মেজাজে থাকলে আপনাকে একটা অটোগ্রাফ দিতে রাজি হয়ে যেতে পারেন।"

মার্ক তেজের সঙ্গে রান্নাঘর পরিদর্শন করে শেষ পর্যন্ত আরও যেসব জ্ঞান আহরণ করা গেলো, তা সত্যিই তুলনাহীন।

প্রথম জ্ঞান হলো, যে জাতের পুরুষমানুষরা রান্না ও রান্নাঘর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সে দেশে রন্ধনের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রদ্ধেয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খাদ্যরসিক ছিলেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রান্না সম্বন্ধে

তাঁর ছিল বিপুল সংগ্রহ। বলতেন, জাতীয় সংহতির শুরু হোক ভোজনে, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ুক বেশবাসে। গুজরাতের মেয়ে মরাঠি কারিপাতার ঝোল খেয়ে কটকি অথবা টাঙ্গাইল শাড়ি পরতে উৎসাহী হয়ে উঠুক। তারপর যদি কোনও ইনটেলেকচুয়াল বাঙালি ছেলে সম্বন্ধে তার আগ্রহ জন্মায় তা হলে তো কথাই নেই। শরদিন্দুবাবু চিরদিন প্রবাসী বাঙালি, একসময়ে পুনা ও বোম্বাইতে বসবাস করেছেন। তাঁর অভিযোগ, বাঙালিরা ভোজনপ্রিয় কিন্তু খাদ্যপ্রেমী নয়—তাহলে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের রান্নাঘরের এই অবস্থা হতো না। সাবেকি বাঙালি রান্নাঘরে হাওয়াবাতাস আলো কিছুই ঢোকে না, কংসের কারাগারের মতন। এরই প্রতিবাদে তিনি পুনার বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর শোবার ঘরটিকে রান্নাঘরে রূপান্তরিত করেছিলেন। রান্নার রহস্যেও তাঁর ছিল অসীম ঔৎসুক্য।

ফরাসি দেশে শরদিন্দুবাবুর কথা মনে পড়লো, যখন শুনলাম খোদ ফরাসি প্রেসিডেন্টও রাজকর্মে গুলি মেরে প্রায়ই রান্নাবান্নায় মন দেন। প্রেসিডেন্ট গিসকার্ডকে হাতে কলমে রান্না শেখাতে রাষ্ট্রপতিভবনে যিনি যেতেন তিনি স্বয়ং পল বোকুস ছাড়া কেউ নয়। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি প্রচারের জন্য এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কী ভাবে রান্নায় "শিক্ষিত" হচ্ছেন তা নিবেদনের জন্য বাঘা-বাঘা সাংবাদিক ও টি-ভি প্রতিবেদকরা তখন রাষ্ট্রপতিভবনের সামনে উপস্থিত। আমাদের দেশেও রাজভবন ও রাষ্ট্রপতি নিবাস আছে, কিন্তু দূরদর্শনে শুধু দেখানো হয় কোন দেশের কোন প্রতিনিধি আসছেন এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে কেঠো হাসিতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

কোনও দেশ-প্রধান যদি ওই রুটিনের পরিবর্তে রবিবারের সকালে দশপ্রকাশ হোটেলের হেডরাঁধুনির কাছে মশালাদোসা রান্না শিখতেন এবং সেই সংবাদ যদি টি-ভিতে দেখানো হতো তা হলে কী ক্ষতি হতো? শোনা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান রান্নায় আগ্রহী, মোগলাই রান্নায় তাঁর হাতযশও আছে।

এসব সংস্কৃতিতে ফরাসি এগিয়ে আছে সমস্ত দুনিয়া থেকে—ইন্ডিয়া এখনও শিশুমাত্র।

মার্ক তেজের বক্তব্য ; রান্নার অ আ ক খ না জানলে কখনও ভোজনরসিক হওয়া যায় না। তাই ফরাসি প্রেসিডেন্ট, সাহিত্যিক, চিত্রতারকা সবাই রান্নার জয়গানে মেতে ওঠেন।

পল বোকুস বড় রাঁধুনি হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে নিয়ে কি বেশি মাতামাতি হয়?

মার্ক তেজে এবং তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে একমত হলেন না। ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল ১৭৮৯ সালে আর ফরাসি রন্ধন বিপ্লব ঘটলো পুরো দু'শতাব্দী পর এই

শতাব্দীর সত্তরের দশকে।

কেউ-কেউ রেনেশাঁসও বলছেন। বিপ্লব বলুন, রেনেশাঁস বলুন, এর প্রাণপুরুষ হলেন পল বোকুস যাঁর বয়স ষাট পেরিয়েছে। তবে বোকুস এই বিপ্লবের প্রথম পুরুষ নন। তিরিশের দশকে এই স্বপ্ন প্রথম দেখেছিলেন যিনি তাঁর নাম মঁশিয়ে পয়েন্ট, যাঁকে শেফরা তাঁদের পিতৃদেব আখ্যা দিয়েছেন।

বোকুসের পারিবারিক এক রেস্তোরাঁ ছিল। এই রেস্তোরাঁর দায়িত্ব পেলেন পল বোকুস। ১৯৫৯ সাল নাগাদ। শেফদের পিতৃদেব পয়েন্ট তখন দেহরক্ষা করেছেন, কিন্তু পলের মস্তিষ্কে নানা ভাবনাচিন্তা। তিনি দেখলেন রেস্তোরাঁয় শেফের কোনও সম্মান নেই, গুরুত্ব নেই, সেখানে সে একজন সামান্য কর্মচারী মাত্র। পল বোকুস বললেন, লাঙল যার জমি তার, যেমন খুন্তি হাতা যার রেস্তোরাঁ তার। কয়েকজন রাঁধুনি-বন্ধুর সঙ্গে নিয়মিত আড্ডায় বসতেন বোকুস, তারপর বিপ্লবের আহ্বান দিলেন। ফলে প্রতিভাবান শেফরা চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজের রেস্তোরাঁ খুললেন—আকারে ছোট, কিন্তু সৃষ্টিতে বিশাল এই সব প্রতিষ্ঠান।

শেফের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা এই সব নতুন প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত। ফলে এখন ফরাসি দেশে যে গোটা কুড়ি এক নম্বর রেস্তোরাঁ আছে তার গোটা ষোলোর মালিক শেফ মহাশয় স্বয়ং। তিনি এখন রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকেন না, প্রায়ই নিজের ড্রেস পরেই ডাইনিং রুমে হাজির হন, অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন, কী ধরনের খাবার তাঁদের প্রিয় তা জানতে চান।

এঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা, তাঁদের ধারণা রন্ধন বিপ্লবের নামে শেফদের বড্ড বেশি মাথায় তোলা হচ্ছে। এঁরা খাবারের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। রি-অ্যাকশনারিদের বক্তব্য, রেস্তোরাঁ চালাবেন অ্যাকাউনটেন্ট, কারণ একমাত্র তিনিই জানেন কত ধানে কত চাল!

নয়া রান্নার মূল ব্যাপারটাও প্রশ্ন করে জানা গেলো। আসলে এই বিপ্লব প্রচুর তেল, ঘি, প্রচুর মশলা, প্রচুর সসের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থান। বোকুসের বন্ধু পিয়ের ত্রয়গো একবার বলেছিলেন, আমরা চাই না ভোজনের পরে অতিথিদের মনে হোক ওঁদের পেটে সিসে পুরে দেওয়া হয়েছে। ভোজনের পর এই পেটভারী লাগা ভাবটা মোটেই কাম্য নয়।

মোদ্দা কথা হলো, নয়া রান্নাতে ক্যালরির ভূমিকা কম। একগাদা ক্রিম, ডিমের কুসুম, চিনি, ব্র্যান্ডি ছাড়া ক্লাসিক ফরাসি রান্না সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে চাই থকথকে সস, ময়দা ইত্যাদি। নয়া রান্নার মাধ্যমে অতি প্রাচীন রন্ধন পদ্ধতির পুনরাগমন হলো, প্রাচীনকালে তেল মাখন ছাড়াই নিজের রসে যে কোনও জিনিসকে রান্না করা হতো। বিদ্রোহ করো ডিপ ফ্রিজের বিরুদ্ধে, ফিরো চলো

টাটকা মাছ, টাটকা সব্জির যুগে। বেশিক্ষণ সেদ্ধ কোরো না, বা ভেজো না। চীনারা কীভাবে রান্না করে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

মার্ক তেজে বললেন, "আমি আপনাকে পল বোকুসের ছবি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবো। এ-যুগের সবচেয়ে সম্মানিত ফরাসিদের মধ্যে তিনি একজন। পল বোকুসের থেকে ভাল রাঁধুনি হয়তো এদেশে আছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ রন্ধন বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। রান্নায় শিল্পবোধ ও দার্শনিকতা ঢুকিয়ে পল বোকুস রাঁধুনিদের নতুন মর্যাদা দিতে পেরেছেন," এই বলে মার্ক তেজে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

বিলাসের শ্রীক্ষেত্র কান শহরের সবচেয়ে অভিজাত হোটেল কার্লটন ইন্টারন্যাশনালে যে মধ্যাহ্নভোজন হলো তাকে ফাঁসির খাওয়া বলবো? না, রাজকীয় লাঞ্চ বলবো? খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, ফাঁসির আগের দিনে বিনামূল্যে যথেচ্ছ ভোজনের অর্ডার দেওয়ার অধিকার আষাঢ়ে গল্পমাত্র—ওই রাত্রে বহু মৃত্যুপথযাত্রী জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন না। যখন হাইকোর্টে বারওয়েল সায়েবের বাবুগিরি করেছি তখন কয়েকজন ফাঁসির আসামির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থেকে এই কথা বলছি। রাজাদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। তাঁরা কী ধরনের ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন তা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দিয়েছি। ফরাসি বিপ্লবের সময় কারাগারে বন্দি ষোড়শ লুই-এর ষোড়শোপচার ভোজনের কোনো বাধা হয়নি। বিপ্লবী ফরাসিরা রাজাকে হাতে মারবার সিদ্ধান্ত নিলেও ভাতে মারেনি, ফলে রাজাহার জুটিয়ে গিয়েছে গিলোটিনে চড়ানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত।

আমাদের দেশের এক চাষাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি রাজা হলে কী কী খাবে? চাষা অনেকে ভেবেচিন্তে বললো, আমি যদি রাজা হইতাম তো সমস্ত ভাত গুড় দিয়া খাইতাম। যার যদ্দুর দৌড় আর কী! ফরাসি এক রাজার মধ্যাহ্নভোজনের সময় টেবিলে থাকতো অন্তত এই ক'টি পদ—ছ'রকমের শিকারের মাংস, গোটা দশেক ঘুঘু পাখি, সমপরিমাণে কচ্ছপ, অন্তত চার রকমের মাছ, তারপর গোমাংস, মুরগি ইত্যাদি তো আছেই। সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে আলু, যা সে-যুগে প্রচণ্ড এক বিলাসিতা। এরপর অবশ্যই মিষ্টির বিশাল আয়োজন না থাকলে রাজভোগ সম্পূর্ণ হবে কী করে? এই ভোজনের পর রাজা মশাই ছাড়া আর সকল অতিথির ঢেকুর তোলা ছিল নিষিদ্ধ।

সেদিকে ভারতবর্ষে আমাদের অনেক স্বাধীনতা। খেতে বসে ঢেকুর তোলাটাই প্রত্যাশিত, কোনোক্রমেই সামাজিক অসভ্যতার লক্ষণ নয়।

কার্লটনে রাজভোগে নুভেল কুইজিনের বিস্ময় আছে, আবার অপার ভোজনের চূড়ান্ত স্বাধীনতাও আছে। পেট ভারী হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ,

ভোজনের নাম করে বসে আমরা অতি সহজে ঘণ্টা আড়াই সময় অতিবাহিত করেছি। মঁশিয়ে মার্ক তেজের দুঃখ, আমি ভুবনবিদিত ফরাসি মদ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করলাম না। তেজে বললেন, "একটা ফরাসি প্রবাদ্যবাক্য আপনার নোট বুকে লিখে নিন ; মদবিহীন ভোজন, আর সূর্যালোক বিহীন মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।"

আরও কয়েকটি স্মরণীয় উক্তি লিপিবদ্ধ করা গেলো। "মহাকাশে নতুন এক তারা আবিষ্কার থেকে নতুন রান্নার পদ সৃষ্টি করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।" যাঁরা খরচ নিয়ে মাথা ঘামায় তারাই হলো রান্নার মহাশত্রু।" "ওজন কমানোর খাদ্য তালিকা হচ্ছে অর্কেস্ট্রাবিহীন অপেরার মতন।"

ফরাসি রাঁধুনির আর এক বিখ্যাত উক্তি ; "যেমন বাজার তেমন রান্না।" সেইজন্য পল বোকুস থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সব ধনুর্ধর রাঁধুনি প্রতিদিন কাঁচা বাজারে যান এবং স্টলে-স্টলে টাটকা শাক-সবজি ও মাছ্ মাংসের খোঁজ করেন। সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ফরাসি শেফরা নিজের বাজার নিজে করায় বিশ্বাসী। যত অপরাধ আমাদের কলকাতার সাহেববাড়ির বাবুর্চির। বাজার করতে চায় শুনলেই মেমসাযেবের মুখ গোমড়া হয়ে পড়েন। "প্যারিসে আর ভাল রান্না পাবেন না।" দুঃখ করলেন মার্ক তেজে। "কারণ শহর থেকে হাট এবং কাঁচা বাজার সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" পল বোকুস প্রতিদিন সকালে বাজার করতে-করতে ঠিক করেন, তাঁর রেস্তোরাঁয় আজ মেনু কী হবে!

মরক্কোর অসামান্যা সুন্দরী, কার্লটনের পি-আর-ও নার্জিস পুনর্বার আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। কার্লটন হোটেল সম্পর্কে কোম্পানির প্রেস বিজ্ঞপ্তির একটা কপি দিয়ে সে আমাকে অবাক করেছিল। এই কাগজের মাথায় কয়েকটি ভাষার সঙ্গে বাংলাও স্থান পেয়েছে। চমৎকার হরফে লেখা 'সংবাদ'। সেই সঙ্গে হিন্দিও রয়েছে। "আমরা কখনও এখানে আসতে পারবো না জেনেও যে তোমরা বাংলা ভাষাকে সম্মান জানিয়েছো তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

নার্জিস তার মুক্তো-দাঁত বিকশিত করে হাসলো। কান সিনেমা উৎসব সম্বন্ধে নানা মজার খবর নার্জিসের কণ্ঠস্থ। সিনেমা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকলেও জ্ঞান নেই। যতদূর জানি, কান-এর সর্বোচ্চ সম্মান এখনও কোনও ভারতবাসীর কপালে জোটেনি। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি কেবল একটি বিভাগীয় সম্মান পেয়েছিল।

নার্জিস বললো, "প্রতিবছর কান চলচ্চিত্র উৎসবের সময় এই হোটেল অন্য রকম হয়ে ওঠে। রূপকথা, আষাঢ়ে গল্প, রহস্যলহরী সিরিজ, ট্র্যাজেডি, কমেডি সব লিখতে পারবে তুমি তারকাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে।"

দুনিয়ার সর্বত্র কান উৎসবের এতো নাম অথচ এর বয়স তেমন বেশি নয়।

উৎসব শুরু হওয়ার ইতিহাসটা মন্দ লাগলো না। নার্জিস যা শোনালো তা অনেকটা এই রকম : এই চলচ্চিত্র রসিকরা এই উৎসব স্বতঃপ্রণোদিত নয়—হুড়ুম করে বাজে খরচে ফরাসি বিশ্বাস নেই। চলচ্চিত্র উৎসবের ভিত্তিস্থাপন করেননি। এর পিছনে ছিল সুপরিকল্পিত রাজনীতি। তিরিশের দশকে ফরাসি কর্তাদের গভীর দুশ্চিন্তা, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব 'মস্ত্রা' ক্রমশই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ইটালির মুসোলিনি এবং হিটলারের জার্মানির ইজ্জত বাড়ানোই যেন ওই উৎসবের কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটো দেশ এই উৎসবের পিছনে অঢেল টাকা ঢেলে দুনিয়ার সর্বত্র নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার তালে আছে।

শেষ পর্যন্ত ফরাসি মন্ত্রিসভার টনক নড়লো। গোপন ক্যাবিনেট বৈঠকে ঠিক হলো ভেনিসের উৎসবকে ম্লান করে দিয়ে বিশ্বচলচ্চিত্র উৎসবের ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রেঞ্চ আর্ট সোসাইটির ডিরেক্টর ফিলিপ এরলেঙ্গারকে পরিকল্পনা তৈরি করতে বলা হলো। তাঁকে মদত দিলেন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী জঁ জে। ফিলিপ এরলেঙ্গারকে ডেলিগেট জেনারেল নিযুক্ত করা হলো এবং সরকারি হুকুম হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলচ্চিত্র উৎসব শুরু করুন। দুই শহরের মধ্যে কিছুটা টানাটানি হলো—বিয়ারিৎজ ও কান শেষ পর্যন্ত কানকেই পছন্দ করা হলো।

উৎসবের উদ্বোধনের তারিখও ঘোষণা করা হলো—১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯! চারদিকে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। উৎসবে অংশ নেবার জন্যে হলিউডের কয়েকজন বিখ্যাত তারকা কান-এ হাজির পর্যন্ত হয়ে গেলেন—এঁদের মধ্যে রয়েছেন গ্যারি কুপার, জর্জ রাফট, টাইরন পাওয়ার ও অ্যানাবেল। ঘোষণা করা হলো ১লা সেপ্টেম্বর উদ্বোধন রজনীতে উপস্থিত থাকবেন লুই লুসিয়ের। কিন্তু উৎসব যে শেষ পর্যন্ত শুরু হলো না তা সকলেরই জানা, তার বদলে আমরা পেলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সালে এবং পরের বছর ১৯৪৬ সালে অসংখ্য বাধাবিপত্তি এবং অভাব অনটন সত্ত্বেও শুরু হলো কান চলচ্চিত্র উৎসব। কর্মকর্তারা তাঁদের অফিস করলেন অবশ্যই কার্লটন হোটেলে। প্রথম বছরে পনেরো দিনে গোটা কুড়ি ছবি দেখানো হয়েছিল।

পরের বছর সকলের প্রচেষ্টায় সরকারি প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হলো কার্লটন থেকে কয়েক পা দূরে। সেখানে দ্বিতীয় উৎসব বেশ জমে উঠলো। কিন্তু উৎসব শেষ হবার কয়েকদিন পরেই নতুন তৈরি প্রেক্ষাগৃহ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। খবরটা শুনে কলকাতার লোক হিসাবে আশ্বস্ত হলাম—অসাধু ঠিকাদার তাহলে ফরাসি দেশেও রয়েছেন।

একখানা বাড়ি ভেঙে পড়েছে বলে ফরাসি অবশ্য সমস্ত বাড়িঘরদোর তৈরি

বন্ধ করে দেবার আইন তৈরি করে না। ফলে কান ক্রমশ নব-নব প্রেক্ষাগৃহে কল্লোলিত হয়ে উঠলো। ওখানে একের পর এক যেসব সৌধ তৈরি হয়েছে তা দেখলে আমাদের মতন মফস্বলের লোকদের মাথা ঘুরে যাওয়া অন্যায় নয়। বছরের পর বছর ধরে কান-এর উৎসব দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে প্রতিবছর কত রূপকথার এবং উপন্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

নার্জিসের কাছে সবচেয়ে প্রিয় রূপকথাটি গ্রেস কেলি ও মোনাকোর রাজকুমারের প্রেমকাহিনী, যার শুরু অবশ্যই এই কান-এ। আমি চুপিচুপি ওঁকে বললাম, গ্রেস কেলির রাজবধূ বা কুমার রানি হওয়ার কাহিনীটি মধুর রোমান্সে ভরা হলেও আমাদের বয়সী পুরুষদের পক্ষে সে ছিল এক চরম হৃদয় বিদারক ঘটনা।

নার্জিস মুখ টিপে হাসলো। পুরুষদের দুঃখ গ্রেস কেলিকে হারিয়ে, আর ইউরোপে-আমেরিকার সে যুগের মেয়েদের দুঃখ মোনাকোর রাজকুমারকে অন্য নারীর হাতে তুলে দেওয়া।

কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু এখনও রোমান্সের রেশ কাটেনি। নবযুগের রূপকথার পটভূমি হিসাবে কার্লটন হোটেলকে ভাবতে ভাল লাগছে। সুরসিকা নার্জিস বললো, "তোমাকে একটা ছবি উপহার দিচ্ছি—গ্রেস কেলি এই হোটেলের এক অনুষ্ঠানে এসেছেন প্রিন্সেস গ্রেস দ্য মোনাকো হিসেবে। আমি জানি এই ছবি তুমি মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তোমার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

সম্বিৎ ছবিটা দেখে রসিকতা করলো, তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।

নার্জিসকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কার্লটন হোটেলের গেটে চলে এলাম। সুসজ্জিত গেটম্যান মার্সেডিজ গাড়ির চাবি হাতে তুলে দিয়ে প্রিন্স দ্য শহিদনগর সম্বিৎ সেনগুপ্ত ও ব্যারন দ্য কাসুন্দিয়া এই অধমকে রাজকীয় কায়দায় অভিনন্দন জানালো। মন্দ লাগলো না। ভোগে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে মানুষের মোটেই সময় লাগে না, যত হাঙ্গামা মানুষকে যখন ভোগের বহর কমাতে হয়, রাজার সন্তানকে যখন পথে নেমে এসে গরিবের অন্ন ভাগ করে খেতে হয় তখন সত্যিই যে দৃশ্য সৃষ্টি হয় তা হৃদয়বিদারক। কে যেন বলেছিল, এই জন্যে রাজারা পথের ভিখিরি হওয়ার চেয়ে সিংহাসনে বসে খুন হওয়া পছন্দ করেন।

বিদায় কান। বিদায় নার্জিস। এই মেয়ে যদি একদিন ভুবনবিজয়িনী চিত্রতারকা হয় তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। "আপনি তখন প্রমাণসাইজের একখানা নার্জিস-কাহিনী লিখে ফেলতে পারবেন," রসিকতা করলো সম্বিৎ।

"আসলি ব্যারন হয়ে গেলে কোন দুঃখে আমি পরিশ্রম করবো? লেখাতে

বড্ড খাটুনি, সম্বিৎ—লোকে সাধারণত বুঝতে পারে না। অনেকের ধারণা অনুপ্রেরণার জোয়ার এলে চাঁদের আলোয় ভাবের ঘোরে মানুষ হুড়মুড় করে লিখে যায়।”

কার্লটনের সীমানা পেরিয়ে শহিদনগরের মার্সেডিজ ঝকঝকে রাজ রাস্তাকে জবরদখলের জন্যে এগিয়ে চলেছে। গেরস্ত ফরাসি রেনল্টগাড়ি চালাতে-চালাতে সসম্মানে আমাদের জন্যে পথ করে দিচ্ছে। সম্বিৎ বুঝতে পারছে না আমার কি ক্ষতি হচ্ছে—শিবপুর টু এসপ্ল্যানেড মিনিবাসের ঝাঁকুনি সহ্য করে যাকে আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে। তার পক্ষে মার্সেডিজ-এর এই অভিজ্ঞতা ভয়ানক ক্ষতিকর হতে পারে।

অতঃ কিম? এবার কী?

মার্সেডিজ এগিয়ে চলেছে, সারথি আমাকে তার মনে কী রয়েছে তা জানাচ্ছে না। তাই রোমান স্টাইলে এবং কাসলিনিয়ান কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন তুলতে হলো, “কুয়ো ভাদিস?”

সম্বিৎ বহুদিন ফরাসিপ্রবাসী হলেও কম ফচকে নয়। তার সংযোজন : “আমার মনস্কাম কি পূর্ণ হইবে না? ঋষি বঙ্কিমের পর আপনাকে এই প্রশ্ন তুলতে দেবো না। আপনি এই মুহূর্তে যা চাইছেন তাই করতে হবে আমাকে, যদিও আমার নাম কল্পতরু সেনগুপ্ত নয়!”

সারথির পরবর্তী ব্যাখ্যা ; “আপনার পকেটে রয়েছে গ্রেস কেলির ছবি। আপনি মহিলার বাপের বাড়ি মার্কিন দেশ দেখে এসেছেন তিনবার, কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ি দেখার জন্যে মন ব্যাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা এখন মোনাকোর পথে, যার প্রধান আকর্ষণের নাম মন্টিকার্লো।”

কান থেকে মন্টিকার্লোর দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু পথ বেশ দুরূহ। কয়েকটি পাহাড়ে উঠতে অথবা নামতে চালকের নিপুণতা থাকলেও ঈশ্বরকে ডাকতে ইচ্ছে করে।

পথ কঠিন, কিন্তু উচ্ছন্নে যাবার সহজতম পথ যে মন্টিকার্লো তা অনেকদিন ধরে হাওড়া-শিবপুরে শুনে এসেছি। দুনিয়ার ইয়া ইয়া ধনীকে কয়েক রাতের মধ্যে পথে বসানোর সুবিস্তৃত ইতিহাস আছে মন্টিকার্লোর। বেপরোয়াদের,

খেয়ালিদের, জুয়াড়িদের ভূস্বর্গ এই ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র শহর।

রাজকুমারী গ্রেস দেখে-দেখে আর শ্বশুরবাড়ি নির্বাচনের জায়গা পেলেন না, হলোই বা স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজার অর্ধাঙ্গিনী হবার দুর্লভ সুযোগ! আমেরিকানরা সেই কবে রাজমোহ কাটিয়ে, ইংলণ্ডেশ্বরকে দেশছাড়া করেছে ফরাসির সাহায্যে। ডেমোক্র্যাসির তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে তুলেছে নিজস্ব রিপাবলিক। কিন্তু রাজার মায়ামোহ যে জনমানস থেকে দূর হয়নি তার প্রমাণ সুন্দরী মার্কিনী তরুণীদের রাজন্যসান্নিধ্যের তীব্র বাসনা। ডজন-ডজন উদাহরণ একটু খোঁজাখুঁজি করলেই মিলে যাবে। পৃথিবীর রাজপরিবারের পুরুষ ও রমণীরা যেমন সাধারণের মধ্যে জীবনসঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠছেন, ঠিক উল্টো হচ্ছে রিপাবলিকে বড় হয়ে ওঠা সুন্দরীদের মধ্যে। ধরুন আমেরিকান মিসেস সিম্পসনের কথা—যিনি অষ্টম এডওয়ার্ডের সঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলেন ডাচেস অব ইউণ্ডসর হিসাবে। তারপর প্রিন্সেস গ্রেস দ্য মোনাকো। ইদানীং কালে সিকিমে প্রিন্সেস হোপ। কাণ্ডকারখানা দেখলে মনে হয়, আমেরিকান মেয়ে রাজরানি হবার লোভে সব রকম স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে তৈরি আছে।

মিসেস সিম্পসনকে তবু বুঝি—সসাগরা সম্রাজ্ঞী হবার সুযোগ ও স্বপ্ন। কিন্তু গ্রেস কেলি? সমস্ত দুনিয়ার হৃদয়সিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে এলেন এমন রাজত্বে যার আয়তন আমাদের দেশের একটা জমিদারির থেকে বড় বলা যায় না।

পরিসংখ্যানের কথা যখন উঠলো তখন মোনাকোর হিসেবনিকেস হয়ে যাক। আয়তন পৌনে এক বর্গমাইলও নয়, মাপজোক করলে আমাদের গড়ের মাঠও বোধ হয় ওই সাইজের হবে। লোকসংখ্যা? ছোট পরিবারই সুখী পরিবার এই নীতি স্বীকার করলেও বলতে লজ্জা হয় এখানে মাত্র ঊনত্রিশ হাজার লোকের বসবাস— আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও বিধায়কের গলায় মালা দিলেও এর থেকে বেশি লোকের ওপর প্রভুত্ব করতে পারতেন গ্রেস কেলি। প্রিন্সেস নয়, খোদ মহারাণীর টাইটেল যোগাড় করে দিতাম আমরা।

অন্য পক্ষের সওয়াল কী হবে আন্দাজ করতে পারি। 'ওরে বাপধন, সংখ্যা নিয়ে কী করবে সুখী সুন্দরীরা? ওই এক চামচ শহরে যা প্রাচুর্য আছে, যা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে তা শুনলে ইণ্ডিয়ার ফিনান্স মিনিস্টার ভিরমি খাবে। দুনিয়ার যেখানে যত বড়লোক আছে, যত বিধবা ধনী অথবা গেঁটেবাতওয়ালা বৃদ্ধ কোটিপতি আছে তারা এইখানেই চলে আসে শেষ জীবনটা একটু সুখে, একটু ভোগে কাটাবার লোভে। মোনাকো তার দরজা দুনিয়ার সবার জন্যে খোলা রেখেছে যদি তোমার কয়েক মিলিয়ন ডলার রেস্ত থাকে। অন্যদের জন্য এই

শহরের বক্তব্য : 'আরে মশাই, মোনাকো রাজ্যটাকে পাঁড়ের ধরমশালা অথবা রহড়া অনাথ আশ্রম বানিয়ে ফেলবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের রাজাবাহাদুরের নেই।'

রাজাবাহাদুরের ভুললে চলবে না যে ওই ঊনত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে মাত্র হাজার তিনেককে স্থানীয় লোক বা সনস অফ দ্য সয়েল (বা রক) বলা চলে। রক বলাই ভাল। কারণ মাটি থেকে পাথরটাই বেশি নজরে পড়লো আমার।

মোনাকোর রাজাবাহাদুরটির বংশ গৌরব কয়েকশ বছরের। হাজার বছর আগে গ্রিমলদি নামে পরিবারকে সম্রাট অটো ওয়ান এখানে প্রভুত্ব করার অনুমতি দেন এখনকার রাজা তৃতীয় রেনিয়ার। এঁর পূর্বপুরুষ প্রথম রেনিয়ার এখানে রাজত্ব করেছেন ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ছোট দেশের গার্জেনি করবার জন্যে দুই বসসাইজের দাদা এগিয়ে এসেছিলেন—কখনও স্প্যানিশদা, কখনও ফরাসিদা। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মন্ত্র আওড়াতে-আওড়াতে ফরাসিদা খোদ বিপ্লবের সময় মোনাকোকে গাপ করে ফেলেছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর কংগ্রেস অফ ভিয়েনা বসলো, সেখানে পরাজিত ফরাসিকে উগরোতে হলো মোনাকো। ফরাসি যে গুঁতো খেয়েছিল পেটের সেই ব্যথা এখনও মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে।

আরও অনেক পরে ১৯১৮ সালে আবার সন্ধিপত্র সইসাবুদ হলো। ফরাসিরাই দাদা বলে মোনাকোর স্বীকৃতি পেলেন, কিন্তু রাজার সিংহাসন অক্ষত রইলো।

তবে মোনাকোর রাজাদের মনে কখনও সুখ থাকবে না। রাজা বাঁজা হলেই বিপদ। ফরাসিরা লিখিয়ে নিয়েছে, রাজবংশে বাতি দেবার কেউ না থাকলে মোনাকো চলে যাবে ফরাসিদের তাঁবে।

ফরাসির মুদ্রাই মোনাকোতে চলে। ঢুকতে গেলে আলাদা কোনও ভিসা লাগে না। কিন্তু ধনীদের নিশ্চিন্ত করার জন্যে অঢেল ট্যাক্সের সুবিধে দিয়েছে মোনাকো। ধনী ফরাসী হাতের গোড়ায় এমন সুযোগ দেখে সারাক্ষণ ছুঁকছুঁক করছে, মনঃকষ্ট পাচ্ছে। ফরাসি সরকার চটিতং হচ্ছেন, মাঝে-মাঝে মোনাকোর ওপর চাপ দিচ্ছেন, ট্যাক্সো বাড়াও, সব কিছু ফরাসি স্তরে নিয়ে এসো। মোনাকো সবকিছু শুনে যায়—কিন্তু ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ট্যুরিস্ট ছাড়া আর কোনও সাপ্লাই ফরাসির কাছে নিতে তার তেমন মন নেই।

মোনাকো সবিস্ময়ে যা করার তাই করে। ছোট দেশের ট্যাক্সোওয়ালাকে কোন্ বড়লোক সহ্য করবে? সত্যি কথা বলতে কি, কিছু বাড়িঘরদোর এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়া কিছুই নেই মোনাকোর। এখনকার সব আকর্ষণই মাথা খাটিয়ে সৃষ্টি করতে হয়েছে রাজাকে এবং তাঁর মন্ত্রীদের।

যে-বছর আমাদের দেশের ইংরেজ সিংহাসন সিপাহিদের বিদ্রোহে টলমল

করছে প্রায় সেই সময় মোনাকোর রাজা মাথা খাটিয়ে ক্যাসিনো বা জুয়া খেলার কেন্দ্র তৈরি করলেন। প্রথম দিকে জুয়ার ব্যবসা তেমন জমছিল না। তারপর রেললাইনের বিস্তার হলো, ভাল-ভাল হোটেলের পত্তন হলো এবং দুনিয়ার বড়লোকদের নজর পড়লো মন্টিকার্লোর ক্যাসিনোর দিকে।

জুয়াড়িদের অমরাবতী এই মন্টিকার্লো। কে কত টাকা এখানে কামায় বা কে কত টাকা হারে তা লিখলে মহাভারত হয়ে যায়। দুনিয়ার ধুরন্ধর ব্যবসায়ীরা এখানে এসে শিশু হয়ে যান, জুয়ার নেশায় সব ব্যবসায়ীর বিচক্ষণতা লোপ পেয়ে যায়। একজন ধুরন্ধর ইটালিয়ান ব্যবসায়ী বোকার মতন আড়াই কোটি টাকা হেরে চলে গেলেন। আর একজন ইটালিয়ান ওষুধওয়ালা দু'দিনে পঁচিশ লাখ টাকা জিতে বেরিয়ে গেলেন গটগট করে।

তবে হারজিত থাকলেও ক্যাসিনো থেকে জিতে বেরিয়ে আসা সোজা কথা নয়। মানুষ ওখানে যায় টাকা উড়োতে, টাকা রোজগার করতে নয়।

বড়লোকরা টাকা পকেটে করে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন না। তাই ব্যাঙ্কিং-এর শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে মন্টিকার্লো। দুনিয়ার এমন বিখ্যাত ব্যাঙ্ক নেই যে মন্টিকার্লোতে না অফিস খুলেছেন। পৃথিবীর আর কোথাও পৌনে এক বর্গ মাইল জায়গায় এতো রোলস, এতো বেন্টলি নেই। মার্সেডিজ বেন্‌জ এখানে রিক্‌শগাড়ির মতন, কেউ পাত্তাই দেয় না।

শুনলাম, কিছুদিন আগেও রাজ্যের প্রধান রোজগার এই জুয়ার আড্ডা থেকেই আসতো। এখন অন্য পথ খোলা হয়েছে। ট্যাক্সো বাঁচানোর তাগিদে বাঘা-বাঘা বহুজাতিক কোম্পানি ওখানে আফিস খুলেছে। মোনাকো বলছে, পয়সা যদি থাকে কোনও চিন্তা করবেন না, চলে আসুন মর্ত্যের এই অমরাবতীতে। কোনও সুখ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রাখা হবে না। সমুদ্রের ধারে বসে সূর্য স্নান করুন। সূর্য অস্ত গেলে ক্যাসিনোতে পদধূলি দিন, প্রাণভরে মদ্যপান করুন। ব্যালে দেখুন, সুরের সুধায় নিজেকে ভরিয়ে তুলুন। শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলিতে শরীর এলিয়ে দিন। মাঝে-মাঝে গ্রাঁপ্রি মোটর রেসিং-এর উত্তেজনা অনুভব করুন।

প্রিন্সেস গ্রেস প্যাট্রিশিয়া কেলির শ্বশুরবাড়িটা দেখা হলো। ১৯৫৬ সাল থেকে বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন। ১৯৫৮ সালে চটপট পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে রাজার বংশরক্ষার দুশ্চিন্তা ঘুচিয়েছেন।

মন্টিকার্লোর রাস্তা আমার ভাল লাগেনি। ভাল লাগবে কী করে? এই ধরনের পথেই তো দুর্ঘটনা ঘটলো এবং গ্রেস কেলির জীবনাবসান হলো। এই ধরনের পথেই যে পৃথিবীর ধনীরা মোটর রেসিং-এর উত্তেজনায় শারীরিক ও মানসিক

আনন্দ উপভোগ করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী?

যে হাজার তিরিশেক ভাগ্যবান এই ভূকৈলাসে বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে আদি বাসিন্দা ক'জন সে সম্বন্ধে আর একটি সূত্র ধরে গবেষণা চালানো যেতে পারে। বড়-বড় কোম্পানির ফেরিওয়ালা ও ঠোঙাওয়ালা হিসাবে সম্বিৎ এই বিদ্যাটি ভালই আয়ত্ত করেছে। না-করে উপায় নেই। সাবান-স্নো-পাউডার, দাঁতের মাজন, চুলের কলপ জনতাকে গছাতে গেলে জানতেই হবে নানা ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত।

এখানে লোক তিরিশ হাজার অথচ চারটের বেশি ভাষা। বুঝুন ব্যাপারটা! ফরাসি ভাষা বলেন চোদ্দ হাজার, ইটালিয়ান পাঁচ হাজার, ইংরিজি দু'হাজার! আদি বাসিন্দাদের ভাষাটির নাম 'মনেগাসকে'—একেবারেই বাড় নেই। কী করে হবে? সার্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার লোকের মুখে এর প্রচার। ধম্মো? ওখানে বিভেদ কম—হাজার ছাব্বিশেক লোকের কাছে পোপই ভরসা। অতএব রোমান ক্যাথলিজমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। জন্ম-মৃত্যু? যত জন্ম তত মৃত্যু! হাজারে সাতটা মরে, হাজারে সাতটা জন্মায়। অতএব জনসংখ্যা নট নড়ন-চড়ন।

চটপট মুখে অঙ্ক কষে ফেলা গেলো। যে রাজ্যে মা ষষ্ঠী বছরে দু'শো বেবিও পাঠান না সেখানে প্রসূতিসদন, প্রাইমারি ইস্কুলে তালা পড়তে বাধ্য। ছেলেদের ভর্তি করতে যাঁরা কলকাতার খ্রিস্টান স্কুলে দু'রাত আগে থেকে লাইন লাগান তাঁরা বিনা হাঙ্গামায় ইস্কুলে বাচ্চাকে ঢোকাতে গেলে চলে যান মোনাকোয়, কোনওরকম দুশ্চিন্তা থাকবে না।

হ্যাঁ, এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের হাতে দীর্ঘায়ুর রেখা—গড় আয়ু পুরুষের বাহাত্তর, রমণীর আশি। স্বভাবতই বয়স্কদের সংখ্যা একটু বেশি। বুঝতেই পারছেন, কম বয়সে কে আর কোটি ডলার ব্যাঙ্কে জমিয়ে এখানে আনতে পারছে? তাই গড় বয়স একটু বেশি। কিন্তু বুড়ো হয়ে মালা জপবার জন্যে কেউ এই মোনোকোতে আসে না। বয়স তো মানুষের মনে, তাই বুড়িরা এই ছুঁড়ি, বুড়োরাও যৌবনের মদনানন্দ রসে আপ্লুত। চার্চে প্রায়ই বিয়েসাদি হচ্ছে। কিন্তু দাঁত কখনও মনের কথা শোনে না, তাই বার্ধক্যের প্রকৃত ছবিটা ধরা পড়েছে ডাক্তারবদ্যির পরিসংখ্যানে। মোনাকোতে দাঁতের ডাক্তারের সংখ্যা একটু বেশি—গোটা পঞ্চাশেক।

স্থানীয় লোকের অপ্রতুলতা ঢেকে দিয়েছে বহিরাগত ট্যুরিস্টের স্রোত। গাড়িতে, বাসে, জাহাজে, ইয়াটে কত মানুষ যে এখানে আসছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

মোনাকো এদের চায়, তবে খরচাপাতির মুরোদ থাকলে। যাদের পেটে খিদে,

বুকে শখ অথচ পকেট গড়ের মাঠ তাদের জন্যে তো পড়ে রয়েছে কলকাতা, ঢাকা, বেজিং। যাও বাপু এশিয়ায়। যখন রেস্ত হবে তখন বলতে হবে না, তোমারই এখানে আসবার জন্যে মন চনমন করবে, আমরাও প্রস্তুত থাকবো। মোনাকোর বয়স বাড়বে না, সে থাকবে চিরযৌবনা।

চট করে শহরটা দেখে নেওয়া গেলো—এক চক্করে বি-বি-ডি বাগ বা কনট সার্কাস ঘুরে নেওয়ার মতন। শহরটা ইন্দ্রপুরী করে রেখেছে!

সমুদ্র ও পাহাড়, সেই সঙ্গে মানুষের উদ্যম এবং কিছুটা সৌভাগ্য না থাকলে এমন নয়নাভিরাম জনপদ গড়ে ওঠে না। হাজার-হাজার ট্যুরিস্ট পরম বিস্ময়ে ঘুরে-ঘুরে সাগর, পর্বত ও সৌধ দেখছে। সেই সঙ্গে আছে সুবেশা সুন্দরীদের স্রোত—পরিবার পরিকল্পনার নামে এই সব দেবশিশুদের পৃথিবীতে আগমন অবরুদ্ধ করে আমরা মানুষের ভাল করছি কি না জানি না। বলবে "খাবে কী?" আরে বাপধন, মানুষ তো শুধু পেট নিয়ে জন্মায় না, তার সঙ্গে থাকছে একজোড়া হাত এবং একখানা মগজ, ঠিক জুটিয়ে নেবে অন্ন।

মন্টিকার্লোর সমতলে জায়গা কম, যতটুকু আছে তার বেশির ভাগই রাস্তা—লাখ-লাখ গাড়িকে নড়তে দিতে হবে তো? তাই মানুষ পাহাড় কেটে নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সেখানে উঠেছে চোখধাঁধানো প্রাসাদ। রাজার জন্যে নয়, পাবলিকের জন্যে। পকেটে পয়সা দেখিয়ে ওখানে ঢুকে পড়ো, রাজসুখ ভোগ করো। এমন একটি প্রাসাদপুরীর নাম 'হোটেল ভয়েজ'—এমন চমৎকার বাড়ি আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না।

সমুদ্রের ধারে রাস্তা ধরে কিছুটা হাঁটা গেলো। যাঁরা পদব্রজে ঘুরছেন বা ছোটগাড়ি এনেছেন তাঁদের মনে শখ চাপলে সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা হতে পারে। রোলস্ রয়েস, ফেরারি ইত্যাদির একাধিক শো রুম আলো জ্বালিয়ে বসে আছে আপনার জন্যে। কাউকে যদি মনে ধরে থাকে তাহলে সেই সুন্দরীকে সিগন্যাল দেবার সহজ পথ হলো দামি ফুল আর দামি গহনা পাঠানো। লাখো টাকা খরচা করুন না সুশোভন ফুলের ডালিতে, কারও আপত্তি নেই—ফুলের বিলের ঘায়ে যাদের মূর্ছা যাবার আশঙ্কা তাদের মিছে আসা এই অমরাবতীতে। গহনা? রয়েছে শোকেসে—দেখবার জন্য পয়সা লাগবে না। তবে দাম লেখা নেই গহনার তলায়। দামি জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করা এখানে এক ধরনের অসভ্যতা! পছন্দ হলে ঢুকুন, দেখুন জিনিসটা, হিরের আংটি অথবা হিরে বসানো হার আপনার নতুন প্রিয়ার কণ্ঠে কেমন মানাবে, তারপর আপনার হোটেলের নাম ও রুমনম্বর বলে দিন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে এটা মন্টিকার্লো—ছোটলোকের জায়গা নয়।

ভূমধ্যসাগরটি বড় ভাগ্যবান। ভাল-ভাল দেশের খপ্পরে পড়েছে, তাই এর সৌন্দর্য বেড়েই চলেছে। গরিব দেশে সমুদ্রও গরিব ও মলিন। বড়লোকের দেশে প্রকৃতিও বড়লোকি দেখায় তার আকাশে, সমুদ্রে, পর্বতমালায়, এমকি বাতাসে।

ভূমধ্যসাগরতীরে কয়েকটি প্রমোদতরণী নোঙর ফেলেছে—কয়েকটি তরণী রাজহংসের মতন কেলি করছে। একটি জাহাজ ভুবনবিদিত কানার্ড লাইনের। এরোপ্লেনের অভিজ্ঞতা থাকলেও আজও জাহাজে চড়া হয়নি—শুনেছি, যে সমুদ্রগামী বড় জাহাজে চড়েনি সে দুনিয়ার কিছুই দেখেনি।

পথে ট্যুরিস্টদের মুখ অতি সাবধানে দেখে যাচ্ছি। ট্যুরিস্টরা যেমন দেশ দেখে আনন্দ পায় তেমন দেশের লোকরাও ট্যুরিস্টদের দেখে আনন্দ পেতে পারে। তুমি পায়ে জুতো গলিয়ে, পকেটে পাসপোর্ট নিয়ে দুনিয়ার কাছে হন্টন মারছো না, দুনিয়া তার সেরা রঙে সেরা সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে তোমার সামনে হাজির হচ্ছে? এই তুমি জার্মানিতে, পরের মুহূর্তে আমেরিকায়, তার পরেই চিনে অথবা ইতালিতে। জয় হোক ট্যুরিস্টের, ঘর ছেড়ে পরকে তুমি আপন করো। লাঠালাঠি করে, খুনোখুনি করে মানুষ তো অনেক ভুগেছে, অনেক ঠেকেছে এবং শিখেছে, দেশে-দেশেই প্রত্যেক মানুষের ঘর থাকবে না কেন?

মোনাকোতও নানা জাতের প্রবাহ—ওদের প্রাণের স্পন্দন আমাকে হরলিক্সের বিজ্ঞাপনের কথা মনে করিয়ে দিলো। ইতালীয়দের সংখ্যা একটু বেশি। এরা বড় সুন্দর। দুনিয়াকে এরা একদিন হাতে ধরে সভ্যতা শিখিয়েছে। এদের মেয়েরা যেখানে যায় সেখানেই ভুবন আলোকময় হয়ে ওঠে। দোহাই, এরা যেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর খপ্পরে না পড়ে, ইতালিয়ান-এর সংখ্যা যত বাড়বে পৃথিবী তত দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে।

আরও অনেক জাত দেখছি। খুব ভাল লাগছে। যেন চির উৎসবের স্বর্গরাজ্যে হাজির হয়েছি। এদের স্বাস্থ্য আছে, সৌন্দর্য আছে, বিত্ত আছে, ভবিষ্যৎ আছে—এরা মনের আনন্দে নতুন দেশ দেখতে বেরিয়েছে। আমি দেখেছি অভাগা দেশ থেকে, যেখানে স্বাস্থ্য নেই, পরিপুষ্টির অভাবে শরীরের বিকাশ নেই, মুখে হাসি নেই, বিত্ত নেই, বিত্ত উপার্জনের পথও বন্ধ—আছে কেবল অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা। আর আছে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা—সবুজ শস্য ক্ষেত্র হঠাৎ অনাবৃষ্টিতে মরুভূমির আকার ধারণ করে, শান্ত নদী আঁধারে রাক্ষসী রূপ নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। খেয়ালি প্রকৃতি বদখেয়ালি জমিদারের মতো কখনও কিছুই দেয় না, আবার কখনও এতো দেয় যে সব ভেসে যায়।

সম্বিৎ বললো, "ইতালি এখান থেকে বেশি দূরে নয়, ঝট করে চলে আসা যায়। মন্টিকার্লো প্রিয় জায়গা। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওদের একটু পয়সাও হয়েছে অনেকদিনের দুঃখ ভোগের পর।"

আমি রাস্তার ওপর বসে পড়েছি, দেখছি সাগরতীরের মানব প্রবাহ। সম্বিৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, ও হয়তো আমাকে কিছু বলতে চায়।

মোনাকো রাজ্যের মন্টিকার্লো শহরের দৃষ্টিনন্দন পথ ধরে হেঁটে চলেছি। আমাদের একপাশে ভূমধ্যসাগর এবং অপরপাশে পর্বত। সমুদ্র ও পর্বতের সহ অবস্থান না হলে সৌন্দর্য তেমন জমে না—এই একটা ব্যাপারে কলকাতা কখনও বোম্বাইয়ের নখের যোগ্য হবে না। এর নাম মণিকাঞ্চন যোগ।

পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতায় শরৎকালে মহাষ্টমীর রাত্রের কথা আমার মনে পড়ছে। পুজোর সময়ে একবার মধ্যরাত্রে এসপ্লানেডে এসে দেখি সবকিছু গমগম করছে, এমনকি বাস ও মিনিবাস রয়েছে দেদার। মন্টিকার্লোতে যেন নিত্য দুর্গোৎসব—সিঁদুরের টিপের মতন সুন্দর শহর জ্বলজ্বল করছে। লজ্জাবতী বঙ্গবধূর মতন রাত্রি এখানে উপস্থিত হয়েও প্রাধান্য বিস্তার করতে পারছে না।

মোনাকোর হাওয়াতেই একটু উড়নচণ্ডিভাব রয়েছে। আমরা দু'জনে কিঞ্চিৎ বেপরোয়া হয়ে সমুদ্রতীর পর্যন্ত নেমে এলাম। এখানে কয়েকটি প্রমোদতরণী বন্দরের নিরাপদ আশ্রয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। মনে হলো, এখানে অনেক ধনপতি ট্যুরিস্ট আছেন যাঁরা শখ করেই পাশের দেশ থেকে নিজস্ব জলযানে এখানে চলে আসেন। আগেই বলেছি, মানুষের এখানে যা-খুশি তা করবার অধিকার, অবশ্য যদি পকেটে অঢেল পয়সা থাকে। পয়সা হবার পরে মানুষ বুঝতে পারে পয়সাটাই জীবনের সব নয়, তাই পয়সা খরচ করবার জন্যে তার মন তখন আইঢাই করে।

এখানে যেসব প্রমোদতরণী বাঁধা রয়েছে সেগুলি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পশ্চিমের ধর্ম হলো সেরা জিনিস ঘরে এনে তার অবহেলা না করা—সে রমণীই হোক, মোটর গাড়িই হোক, জাহাজই হোক। এখানে এতো লোকাভাব, কাজের লোকের মাইনে এতো বেশি, তবু সবকিছু তকতকে ঝকঝকে রাখা হচ্ছে—স্থিতির দেবতা নারায়ণকে এরা হৃদয়ে গ্রহণ করেছে, তাই স্বয়ং শিব এখানে তাঁর খেলা দেখাচ্ছেন না। সেই কবে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একটা যুদ্ধ হয়েছিল তারপর থেকে তিনি হাত গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত রয়েছেন।

একটি কাঠের সমুদ্রগামী জাহাজ আমাদের নজর কেড়ে নিলো। জাহাজের ওপর একটি এশীয় যুবক বসে আছে। ছেলেটি মিশুকে। তার দিকে একটু হাসি ছুঁড়ে দিতেই ভাব হয়ে গেলো। এই জাহাজের জন্ম আমেরিকায় ১৯০২ সালে। জাহাজের রেজিস্ট্রি কিন্তু লণ্ডনে। জাহাজের মালিকের বয়স মাত্র ২৯ বছর—মাঝে-মাঝে সমুদ্রের হাওয়া খেতে কর্মক্ষেত্র থেকে উড়ে আসেন। জাহাজকে চালু রাখতে তেরো জন কর্মীকে মাস মাইনে দিয়ে রাখতে হয়েছে।

এই ধরনের কাঠের জাহাজের কদর উঠতির দিকে। একখানা প্রমোদতরণী না-থাকলে পশ্চিমের ধনীসমাজে কুলীন হওয়া যায় না। মালিক আজকাল কাজে ব্যস্ত থাকেন, বছরে দশ দিনের বেশি জাহাজে কাটাতে পারেন না। জাহাজের দাম আমার আন্দাজ ছিল লাখ পাঁচেক টাকা। কিন্তু ফিলিপাইনের তরুণ কর্মীটি হিসাব করে যা বললো তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ—কুড়ি কোটি টাকা। যে-লোক জানে তার ঠিক কত টাকা আছে তাকে দুনিয়ার কোথাও বড় লোক বলা হয় না।

ব্যারন দ্য শহিদনগর জিজ্ঞেস করলো, জাহাজে ঢুকবেন? ফিলিপাইনের যুবকটিকে পটিয়ে পাটিয়ে হয়তো ভেতরটা দেখা যেতো, কিন্তু রুচিতে বাধলো। চলমান হলেও এটি তো পর গৃহ—গৃহস্বামীর অনুমতি ব্যতীত সেখানে প্রবেশ করাটা ঠিক নয়। পকেটে মাত্র কুড়ি ডলার থাকলেও নিজের গাঁয়ে আমাদের মানসম্মান আছে, এখানে অপরের কাছে ছোট হবো কেন?

ঊনত্রিশ বছরের ছোকরা মালিকটিকে দেখতে পেলে মন্দ হতো না। নিজের গতর খাটিয়ে সে এই সব সম্পত্তি করেছে, না পৈতৃক টাকা ভোগ করছে তা জানতে লোভ হয়।

সম্বিৎ বললো, "এখানে দাদামশায়ের টাকা, দিদিমার টাকা, বাপের টাকা, মায়ের টাকা পেয়ে লোকে ফুলে ফেঁপে ওঠে, কিন্তু সেখানেই ইতি নয়। অনেক বড়লোকের অস্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও প্রতিভা। তাঁরা রোবটের মতন পরিশ্রম করে টাকা বাড়িয়ে চলেন এবং সেই সঙ্গে খরচও করেন। ছবি কেনা, জাহাজ কেনা, সেকেলে গাড়ি কেনা, কোনও ব্যাপারই নয়। তবে এগুলোকে টাকা জলে ফেলা ভাববার যুক্তি নেই। টাকা সঞ্চয়ের পথও বটে এগুলো। এই যে কাঠের জাহাজ, যার দাম কমবে না যদি রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতি না হয়। যা কুড়ি কোটি টাকায় কিনেছেন ওই ঊনত্রিশ বছরের ছোকরা, পাঁচ বছরের মধ্যে তা হয়তো ত্রিশ কোটি হবে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই আজব দেশে নতুন জিনিসের দাম কমে কিন্তু পুরনো জিনিসের দাম বাড়ে। নতুনের তুলনায় পুরনোর কদর অনেক বেশি।"

আমরা আবার রাস্তা ধরে হাঁটছি। এতো রকমের পুরনো গাড়ি এমন ঝকঝকে অবস্থায় কোনও র‍্যালিতেও দেখা যায় না। আমার চক্ষু দ্বিতীয়বার চড়কগাছ। রোলস রয়েছে, বেন্টলি রয়েছে। একটি গাড়ি আমি কোনও দিন দেখিনি—নাম 'লণ্ডন লেডি'। জন্ম ১৯১০ সাল। গাড়িটিকে তারিফ করতে-করতেই এক বয়সিনী সুন্দরী গাড়িতে এসে বসলেন। এঁর খানদান আছে, নিজের ড্রাইভারি নিজে করেন না, মাইনে করা শোফার রেখেছেন।

ব্যারন দ্য শহিদনগর আমার বিহ্বল ভাব দেখে প্রশ্ন করলো, "কী ভাবছেন?"

আমি ওই শ্বেতাঙ্গিনী ও তাঁর কালো গাড়িটার যোগসূত্র সন্ধান করছি। গাড়ির

নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনিও কি লণ্ডন লেডি? হয়তো বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন কোনও ইতালীয়র সঙ্গে এবং তিনি লণ্ডন লেডিকে উপহার দিয়েছেন একটি লণ্ডন লেডি। অথবা দু'জনেরই জন্ম তারিখ এক—ওই ১৯১০ সাল। অনেক খুঁজে বিচক্ষণ স্বামীদেবতা জন্মদিনের উপহার সংগ্রহ করেছেন।

আরও একটি গাড়ি আমি আগে লক্ষ্য করিনি—'মোকে'। এই গাড়িও চোখ জুড়িয়ে দেয়—একে দেখলে পথের অন্য গাড়ি সসম্মানে পথ ছেড়ে দেবে। গোটা কয়েক বেন্টলি পাশাপাশি রয়েছে। বি এম ডব্লু ও মার্সেডিজ বেন্‌জ-এর স্ট্যাটাস এখানে সাইকেল রিকশার মতন, কেউ তাকিয়ে দেখে না—চুপচাপ ফ্যা ফ্যা করছে। বরং ইজ্জত রয়েছে কমবয়সী ফেরারি গাড়ির। এর দাম শুনলেও বঙ্গসন্তানের ভিরমি যাবার অবস্থা হতে পারে। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের এক ভদ্রলোক উনিশ-কুড়ি বছরের এক নীলনয়না সুন্দরীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে ফেরারিতে উঠলেন। গাড়ি মুহূর্তে অদৃশ্য হলো।

এবার আমরা রেস্তোরাঁয়—রেস্তোরাঁটি আকারে বৃহৎ। এর অর্ধেকটির কোনও আচ্ছাদন নেই, নীল আকাশের নীচেই আনন্দের আয়োজন। আর কিছুটা অংশ ঢাকা। অন্তত হাজারখানেক লোক হেসে খেলে বসতে পারবে এখানে। কিন্তু মোনাকোয় মানুষ আসে বন্যার মতো—মাছি তাড়াবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে কেউ এতো বড়-বড় ভোজনালয় ফেঁদে বসতো না।

এতো ভিড় যে সারারাত বসে থাকলেও কেউ বোধহয় আমাদের অর্ডার নিতে আসবে না। ওয়েটারদের নজর কাড়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিন্তু বাবারও বাবা আছে, ছোট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উঁচু আদালতে আপিল আছে। ব্যারন দ্য শহিদনগর বুদ্ধি করে খোদ ম্যানেজারসায়েবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অনর্গল ফরাসি ভাষায় বন্যায় ম্যানেজার সায়েবের মন গললো, তিনি নিজেই আমাদের খাবার বয়ে আনলেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ফরাসি রেস্তোরাঁয় মহিলা কর্মীদের তেমন ভূমিকা নেই। খানদানি রেস্তোরাঁয় কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, ব্যাপারটা নরম শরীরের মেয়েরা পেরে ওঠে না। তাছাড়া ফরাসি দেশটা আমেরিকা নয় যে আনাড়ি লোকেরা টুপাইস রোজগারের জন্যে যখন খুশি রেস্তোরাঁয় এসে কাজ করবে। এর জন্যে প্রয়োজন অভিজ্ঞতার ও প্রশিক্ষণের।

কফি সেবন করে এবার সোজা ক্যাসিনো। যস্মিন দেশে যদাচার। মন্টিকার্লোতে এসে জুয়ার আড্ডায় হাজিরা দিতে দ্বিধা থাকলে এখানে আসা কেন? হরিদ্বার, কন্খল, মায়াবতী তো খোলা রয়েছে নিষ্ঠাবানদের জন্যে!

জুয়ার আড্ডা বলতে বাঙালির চোখে ভেসে ওঠে সরু গলিতে, হাওয়া বাতাস

প্রায় বন্ধ একটা চাপা ঘর, যেখানে সবাই পুলিশি হাঙ্গামার আশঙ্কায় সদাসতর্ক ও কিছুটা সন্ত্রস্ত। মোনাকোতে পুলিশই আমাদের জুয়ার আড্ডার পথ দেখিয়ে দিলো। এই হলো পশ্চিমের ধর্ম—যখন পাপ করে তখন স্টাইলেই পাপ করে। মনের মধ্যে পুতুপুতু ভাব থাকলে ভোগটা যে জমে না তা পশ্চিম অনেকদিন আগে বুঝে গিয়েছে।

ক্যাসিনো ভবনটি দেখে আমি বিস্মিত। নেপোলিয়নের সমাধিভবনও যেন এর কাছে শিশু। মোনাকোর যে-রাজা এই ব্যবসার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর তারিফ করতে হয়। ভদ্রলোক নিজে জুয়াড়ি ছিলেন না, জুয়াড়িদের এতো ধৈর্য থাকে না। গত শতাব্দীর এই রাজা দেখলেন ভাঁড়ার শূন্য—প্রজাদের কাজকর্ম নেই, কিছু একটা করতে হবে। অনেক মাথা খাটিয়ে এই ক্যাসিনো পরিকল্পনা হলো, যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনীরা টাকা ওড়াতে আসবেন।

এই ক্যাসিনোই হয়ে উঠলো মোনাকোর লক্ষ্মী। রাজকোষের আয়ের নব্বুই ভাগ আসতো জুয়া থেকে। প্রজারাও খুশি—ভাগ্যবান জাত, অন্য কোনও ট্যাক্সো নেই প্রজাদের ঘাড়ে। যতো টাকা রোজগার করবে সবই তোমার, রাজা তোমার ঘাড়ে বসে রাজকীয় ঐশ্বর্য উপভোগ করছেন না।

ক্যাসিনোর ব্যবসা শুরু হলো ১৮৫৮ সালে তৃতীয় চার্লসের রাজত্বকালে—ক্যাসিনো ভবনের উদ্বোধন হলো ১৮৬৩ সালে। ভবন নয়, বিস্ময়কর প্রাসাদ। এই হলো ফরাসি সভ্যতার বিশেষত্ব। জুয়ার পট্টিও হয়ে ওঠে ভুবনমোহন শিল্পকর্ম। বানাও প্রাসাদ, ভরিয়ে দাও শত সহস্র শিল্পকর্মে। এই কাজ পেলে ফরাসির আর কিছুই ভাল লাগে না। সবাই জানে মৃত্যু আসবে একদিন, রাজারাজড়াদের অবিস্মরণীয় হওয়ার একমাত্র পথ শিল্পকর্ম। লোকে জানবে কোন্ রাজা কোন্ শিল্পকর্মের পত্তন করে গিয়েছিলেন। সেই হাওয়া মন্টিকার্লোও গ্রাস করেছে। ফলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়েছে।

ভোগের পিছনে শুধু ছুটবে না ইউরোপ, সেই সঙ্গে চালাবে সৌন্দর্যের সন্ধান। শুধু জুয়াপট্টি তৈরি করে মন ভরবে না তার। তাই ক্যাসিনোর সঙ্গে তৈরি হয়েছে চিত্রশালা। এখানে নিয়মিত শিল্পকর্মের প্রদর্শনী চলেছে—এই প্রদর্শনীর মান এতো উন্নত যে আমেরিকার চিত্রসমালোচকরা উড়ে আসেন তাঁদের প্রতিবেদন রচনা করতে।

খানদানি পশ্চিমের আরও কয়েকটি দুর্বলতা—ব্যালে, অপেরা ও অর্কেস্ট্রা। তাই মন্টিকার্লো শুধু জুয়াপট্টি নয়, এখানে আছে সুবিশাল প্রমোদকক্ষ এবং বিশ্ববিদিত অপেরা হল। এখানে একসময় সারা বার্নাড নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।

ব্যালের ভার দেওয়া হয়েছিল স্বভাবতই এক রুশকে। এই ব্যালেবিশারদ

মন্টিকার্লোকে এমন ভালবেসে ফেললেন যে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন না, এখানেই প্রতিষ্ঠা করলেন জগদ্বিখ্যাত আর এক ব্যালে প্রতিষ্ঠান।

আর অর্কেস্ট্রা? পশ্চিমের যে কোন শহর একটু জাতেই উঠলেই তেড়েফুড়ে লাগবে একটা অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলতে। অর্কেস্ট্রা মানেই আজকাল হাতির খরচ, কোটি-কোটি টাকা কিছুই নয়। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমে যাঁরা বাজনা বাজান তাঁরা ভারতীয় গাইয়ে-বাজিয়েদের মতন হতভাগা নন, যাত্রাদলে তবলা বাজিয়ে পাঁচটাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হবার পাত্র তাঁরা নন। তার ওপর আছেন কণ্ডাক্টর বলে একজন মানুষ—ঝকঝকে জামাকাপড় পরে একটা ছোট লাঠি হাতে নিয়ে তিনি কী যে করেন তা সরলমতি ইণ্ডিয়ানরা বুঝতেই পারেন না। কিন্তু এই কণ্ডাক্টরকে নিয়ে দুনিয়াসুদ্ধু টানাটানি—বাস কণ্ডাক্টর ও অর্কেস্ট্রা কণ্ডাক্টর যে এক জিনিস নয় তা আমরা স্বদেশে অনেকেই খবর রাখি না।

সিমফনি অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টররা কোটিপতি, তাঁদের আকর্ষণ করতে এবং সন্তুষ্ট রাখতে সারবিশ্বে এখন প্রবল প্রতিযোগিতা।

ঊনত্রিশ হাজার লোকের ছোট্ট শহর মন্টিকার্লো, কিন্তু নজর ছোট নয়—এখানে পঁচাত্তর-সভ্যের অর্কেস্ট্রা ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ১৮৬৩ সালে। সে-তুলনায় সার্জি দিয়াগিলেভ প্রতিষ্ঠিত ব্যালে রুশ দ্য মন্টিকার্লোর বয়স কম—প্রতিষ্ঠা ১৯১১ সালে। রাশিয়ার বাইরে আধুনিক ব্যালের যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার প্রথম সারিতে রয়েছে মন্টিকার্লো। অমর শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন কারসাভিনা, নিজিনস্কি, সার্জি লিফার। অপেরা জিনিসটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের বাংলায়। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে বাঙালি গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একত্র হয়ে এই জটিল কাজটি করে বাঙালির মনোহরণ করলেন না। আমার মনে হয়, যদি কখনও অপেরা আসে তা হলে বাঙালি আনন্দসাগরে ভেসে তাকে আদর করবে।

মন্টিকার্লোর অপেরার বয়সও শতাধিক—জন্ম ১৮৭৯ সালে। পুরো পঞ্চাশবছর ধরে একজন প্রতিভাধর এই অপেরার প্রভুত্ব করে গিয়েছেন, তাঁর নাম রল গুন্‌সবুর্গ। আর একজন প্রতিভাধরের নাম মরিস বেনার্ড।

আমার মনে যতটুকু দ্বিধা ছিল তা প্রিন্স দ্য শহিদনগরের রসিকতায় দূর হলো। সে বললো, "কোনওরকম দ্বিধা না রেখে প্রাণভরে উপভোগ করে নিন, বিন্দুমাত্র লজ্জা পাবেন না। এখানে যতো ঐশ্বর্য, যতো থাম দেখছেন তার পিছনে আমাদেরও টাকা রয়েছে।"

"কী বলছো ভায়া? এখানে দুনিয়ার সবাই আসে মজা করতে বা মজা দেখতে, দরিদ্র ভারতবাসী ছাড়া। এখানে কী রকম সঙ্কোচ লাগে, ভাগ্যে জিজ্ঞেস

করে না পকেটে কত পয়সা আছে?"

হা হা করে হাসলো সম্বিৎ। "ওই দ্বিধার জন্যেই তো বাঙালিরা বড় হয়েও বারফট্টাই করতে পারে না। আপনি নিজেকে সত্যিই ডিউক দ্য হাওড়া ভাবুন, মনে রাখুন এসব তৈরি হওয়ার খরচের মোট অংশ আমরা বহন করেছি।"

"আঃ, সম্বিৎ!"

সম্বিৎ এবার মনে করিয়ে দিলো ভারতীয় রাজন্যবর্গের কথা। মন্টিকার্লোর ক্যাসিনোর জন্মমুহূর্ত থেকে যাঁরা এখানে দু'হাতে পয়সা নষ্ট করেছেন এখানে তাঁদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান রাজামহারাজারা সর্বপ্রধান। দেশীয় রাজাদের একসময় ভীষণ কদর ছিল এই মন্টিকার্লোতে এবং অবশ্যই কান শহরে। রাজারা এখনও আসেন, কিন্তু চুপি-চুপি। সর্দার প্যাটেল যে এঁদের কী সর্বনাশ করে গেলেন! যতটুকু বাকি ছিল তা শেষ হলো ইন্দিরা গান্ধীর আমলে—রাজন্যভাতার বারোটা বেজে গেলো।

তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে, একশ বছর ধরে এই প্রাসাদপুরীতে ইণ্ডিয়ান রাজসম্মান ছিল, এখন অবস্থা খারাপ হয়েছে। কিন্তু কে জানে, ইণ্ডিয়া যদি জগৎসভায় আবার নড়েচড়ে বসে, বিদেশে ব্যবসাবাণিজ্য করে দু'পাইস কামাতে পারে, তবে ধনী ভারতীয়দের আবার দেখা যাবে মন্টিকার্লোর প্রমোদাগারে।

ক্যাসিনো ভবনটি যে একটি বৃহৎ প্রদর্শনাগারের মতন তা আগেই বলেছি। প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু ফেলো কড়ি মাখো তেল নয়, সঙ্গে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়।

এই পাসপোর্ট জমা দেবার ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। দুনিয়ার কে কে এখানে দেউলিয়া হতে আসছেন তার খোঁজখবর রাখা? যদি তাঁরা কোনও হাঙ্গামা বাধান তার জন্যে ঠিকুজি-কুষ্টি তৈরি রাখা?

পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে দিলাম সুড়সুড় করে। কমপিউটার যন্ত্র থেকে নামাঙ্কিত একখানা টিকিট বেরিয়ে এলো। ব্যারন দ্য শহিদনগর সঙ্গে না থাকলে এবং অতিথির সব দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এই সব বিলাসিতা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

সম্বিৎ রসকতা করলো, "আপনার বেলুড় মঠমার্কা চরিত্রে একটা স্পট পড়লো! জুয়াড়িদের পার্মানেন্ট রেকর্ডে আপনার নাম লেখা হয়ে গেলো।"

এরপর পাসপোর্ট রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হলো। যা শুনলাম, তাতে গ্রেস কেলির শ্বশুরবাড়ির বংশ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। রাজামশাই বোধহয় বাংলা প্রবাদবাক্যটি শুনেছিলেন—ময়রা সন্দেশ খায় না। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে শুঁড়ি মদ স্পর্শ করে না। স্থানীয় মনেগাসকে অধিবাসীদের জুয়ায় প্রবেশ নিষেধ। জয় হোক রাজামশায়ের। তিনি শুধু তাঁর আদি প্রজাদের ট্যাক্সোর বোঝা থেকে মুক্তি

দেননি, টাকাটা যাতে রাখতে পারে তার জন্যে জুয়ার নেশায় মাততে দেননি। সাধে কি আর পাঁচহাজার মনেগাসকে এখনও রাজা বলতে অজ্ঞান। মন্টিকার্লোর পথে দুটো বিদেশিমুদ্রা কামাবার জন্যে ভারতবর্ষে জুয়ার আড্ডা বসালে এবং সেখানে দিশি লোকদের প্রবেশ নিষেধ থাকলে আমালের সাধুসন্তরাও বোধহয় আপত্তি তুলবেন না।

টিকিট হাতে ভিতরে প্রবেশ করা গেলো। বিরাট-বিরাট হল-এ স্থায়ী শিল্পপ্রদর্শনী চলছে—কিন্তু সেদিকে কারও নজর দেবার মানসিকতা নেই। শুধু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রাতারাতি দেউলিয়া হওয়ার সময়ে মহাকালের এমন প্রেক্ষাপট মনকে হয়তো বিবাগী এবং বেপরোয়া করে তোলে।

খেলাটি কী ধরনের, তার আইনকানুন কী রকম তা বোঝাবার জন্য কাগজপত্র দেওয়া হলো আমাদের হাতে। ঘড়ির মতন ডায়ালে নানা নম্বর লেখা আছে, তার ওপর বিভিন্ন রকমের ঘুঁটি রাখা হচ্ছে এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে।

যাঁরা কর্তৃপক্ষের হয়ে এই খেলা পরিচালনা করছেন তাঁদের নিপুণতা লক্ষ্য করবার মতন। একেবারে নিঃশব্দ, কিন্তু যন্ত্রের মতন কাজ করে যাচ্ছেন। প্রাচীনের পিছু-পিছু আধুনিকতাও উপস্থিত হয়েছে চুপিচুপি। কমপিউটার যন্ত্রতেও শেষ খেলার ফলাফল ঘোষিত হচ্ছে প্রতি টেবিলে।

যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের নীরবতা ও নিষ্ঠাও আমাকে অবাক করছে। কে হারছে, কে জিতছে তা ওঁদের মুখ দেখে বুঝতে পারছি না।

প্রতি টেবিলেই কয়েকজন মহিলার উপস্থিতি লক্ষণীয়। মেয়েদের মধ্যেও যে জুয়াড়ি মনোভাব এমন প্রবল তা আমার ধারণা ছিল না।

এক বৃদ্ধা তো অসুস্থ, তিনি সঙ্গে পরিচারিকা এনেছেন। শরীর সুস্থ নয় বলে তো জুয়া খেলা বন্ধ রাখা যায় না। মন্টিকার্লোতে এসে তাহলে কী লাভ হলো? ধর্মকর্মের জন্যে তো ভেটিক্যান রয়েছে।

এক টেবিল থেকে আমরা অন্য এক টেবিলে গেলাম। এখানেও মানবীদের আধিপত্য। এক অভিজাত মহিলা অভিনিবেশ সহকারে খেলে চলেছেন। এক সময়ে নিশ্চয় অবিশ্বাস্য সুন্দরী ছিলেন। যৌবন কোনও-কোনও শরীরকে ছেড়ে পালায় না, কিন্তু আঙুর শুকিয়ে কিসমিস হয়ে যায়। এই মহিলাটি সেইরকম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশি হাজার টাকার মতন হারলেন এই মহিলা, কিন্তু কোথাও কোনও দুশ্চিন্তার লক্ষণ নেই। প্রতিসন্ধ্যায় এক লাখ টাকা হারানো মানে মাসে তিরিশ লাখ হারা—যা লাখ ডলারের মতন। এই টাকা অনেক বড়লোকের হাতের ময়লা। কিছু এসে যায় না। মালক্ষ্মী, জুয়ায় বসে উড়নচণ্ডি না হয়ে, ধর্ম-কর্মে মন দাও। মন্দিরে যাও, দেবদ্বিজে ভক্তি করো, দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাও—এসব বলে এই সব নিঃসঙ্গ সুন্দরীদের লাভ নেই। এঁরা কোনও দুঃখে

জ্বলতে-জ্বলতে কিছু নোট জ্বালাতে এসেছেন।

এখানে উড়নচণ্ডি শুধু দৃশ্যমান নন, নাসারন্ধ্রে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছি। সবাই দামি-দামি গন্ধদ্রব্যে নিজেদের ঐশ্বর্যময়ী করে এই বিলাসকক্ষে প্রবেশ করেছেন। পুরুষের পারফিউমের সঙ্গে মহিলাদের পারফিউমের বিচিত্র মিশ্রণে এখানে আর এক ধরনের গন্ধ-অর্কেস্ট্রা নিরন্তর সম্মোহিত করছে অভ্যাগতদের। ঠিক এই ধরনের গন্ধ-অনুভূতি আমার ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে কখনও হয়নি।

কিন্তু একেই কি বলে বাধা বন্ধনহীন আনন্দ? প্রমোদপুরীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেও আমি প্রমোদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম না। প্রমোদকে খুঁজে পাওয়া যে অত সহজ নয় তা এই মানুষগুলির মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

উড়নচণ্ডি মহিলাটি আজ বোধহয় এসপার-ওসপার কিছু করবেন। এখান থেকে সরে যাবার কোনও লক্ষণই তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। কেমন একটা বেপরোয়া ভাব ওঁর শরীরে। এঁকে পরামর্শ দেবারও কেউ নেই। বাধা দিতে পারেন এমন কাউকে সঙ্গী করে এখানে আসেননি তিনি।

উড়নচণ্ডিটিকে একটু সমালোচকের চোখে দেখছিলাম এতোক্ষণ। মালক্ষ্মী, কী স্বভাব তৈরি করেছো! কী জীবন যাপন করছো! ভোগে অরুচি ধরলে শেষ পর্যন্ত কী করবে? আড়াই হাজার বছর আগে জন্মালে ভগবান বুদ্ধ তোমাকে না হয় সামলাতে পারতেন, এখন কে তোমাকে শান্ত করবে, শান্তি দেবে? মানুষ কেন এমন হয় শুধু-শুধু? মানুষ কি জানে না, মালক্ষ্মীকে এইভাবে অপমান করতে নেই? মালক্ষ্মী তুমি এমনভাবে অলক্ষ্মীকে ডেকে আনছো কেন?

উড়নচণ্ডির মুখের দিকে আবার তাকালাম। হঠাৎ মনে হলো, ইনি কি ডাইভোর্সি? টাকার পাহাড়ে বসেও মধ্যবয়সে পশ্চিমের মহিলারা আজকাল গৃহহারা হন। কর্তাব্যক্তি কর্মজীবনের প্রচণ্ড সাফল্যের কোনও অধ্যায়ে যুবতী ও সুন্দরী রমণীদের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন বিয়ে ভাঙবার প্রবল উদ্দীপনা দেখা যায়। আগের বধূকে আজকাল প্রায়ই ঘর ছাড়তে হয়। ভাগ্যে সিঁদুর পরবার রেওয়াজ নেই, তাই সিঁথির লালচিহ্ন মুছে ফেলতে হয় না। পশ্চিমের আইন এই সব গৃহহারাদের অন্য কোনও সুরক্ষা দিতে পারেনি, একমাত্র আর্থিক সচ্ছলতা ছাড়া। বিয়ে ভাঙতে হলে বড়লোকদের খরচ করতে হয়, জোগাতে হয় আগেকার স্ত্রীকে বিপুল মাসোহারা। অনেক সময় ব্যবস্থা করতে হয় বেশ কিছু সম্পত্তির। এই বয়সে পুনর্বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না। আবার বিয়ে করলে আচমকা রোজগার কমে যাবার সম্ভাবনা। তাই এই ধনবতী মহিলারা তেরো বছরের বালিকার মানসিকতায় ফিরে যেতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

বৃদ্ধবয়সে টিন এজ মানসিকতায় শ্রেষ্ঠ স্থান ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চল ও অবশ্যই

মোনাকো। যাঁদের কোনও কিছুতেই টান নেই, যাঁদের অতীত দুঃসহনীয় এবং ভবিষ্যৎ মেঘাক্রান্ত তাঁরা যদি উড়নচণ্ডি সাজে ক্যাসিনোতে কিছুক্ষণের জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তা হলে দোষ কী?

লাখ টাকা হারিয়ে মহিলা এবার উঠে পড়লেন। তিনি করুণার পাত্রী হবার জন্য ঈশ্বর এই মানবশরীর গঠন করেননি। মাথা উঁচু করে, যেন কিছুই হয়নি এই ভাব করে মহিলা বেরিয়ে চললেন মন্টিকার্লোর ক্যাসিনো থেকে।

আমিও চললাম ওঁর পিছু-পিছু। ক্যাসিনো ভবনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মহিলা এবার একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর একটা ট্যাক্সি ডাকলেন। পৃথিবীর একমাত্র শহর যেখানে রোলস্ রয়েসকেও ট্যাক্সি খাটতে হয়। সেই ট্যাক্সিতে চড়ে ভদ্রমহিলা আমার বিস্মিত চোখের সামনে হোটেল হেরিটেজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শ্যেন নদীর ধারে প্যারিসের বৃক্ষশাখায় কপোত-কপোতী যেভাবে পরস্পরের প্রতি প্রেমনিবেদন করে তাও লক্ষণীয়—প্রেমের ব্যাপারে ফরাসি পাখিও যেন দুনিয়ার অন্য খেচরদের থেকে আলাদা।

আসলে, প্রেমের হাওয়া বইছে প্যারিস শহরে শত সহস্র বছর ধরে। এখানে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে, এমনই মায়ামোহ প্যারিসের আকাশে বাতাসে। জীবনী, আত্মজীবনী এবং সংবাদপত্র থেকে যদি সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন কোন্-কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি প্যারিসে প্রথম প্রেম নিবেদন করেছেন তা হলে তালিকা এতোই দীর্ঘ হবে যে তা সামলানো বেশ শক্ত হবে। আমাদের দেশও তার থেকে বাদ যাবে না। ধরুন ইন্দিরা গান্ধী-কাহিনী। যে-ষোড়শী এলাহাবাদে ফিরোজ গান্ধীর প্রেমের ইঙ্গিতকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না, শান্তিনিকেতনের বসন্ত বাতাসেও যাঁর মন কেউ কাড়তে পারলো না, তিনিই প্যারিস শহরে এসে প্রস্তাবিত হয়ে ফিরোজ গান্ধীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।

"বিচক্ষণ লোক ছিলেন ফিরোজ গান্ধী, ইংলণ্ডের ভ্যাদভেদে পরিবেশে অসামান্যা সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দিরাকে প্রণয় নিবেদনের ঝুঁকি নেওয়াটা তাঁর পক্ষে ঠিক হতো না। ওই জল হাওয়ায় সাধুও বেনে হয়ে যায়, লেখকরা

প্রেমকাহিনী লিখতে ব্যর্থ হন!” এই মন্তব্য করলেন পাঁচুদা।

পাঁচুদাও একদা এই বসন্তরোগের বলি হয়েছিলেন। প্যারিসেই প্রেম এসেছিল জীবনে। ফরাসি তনয়া নয়, অসামান্যা এক বাঙালিনীর সঙ্গে। হাওড়া-কাসুন্দের ছেলেরা ভীষণ ভদ্র হয়, সংযত হয়। মেয়েদের মধ্যে মাতৃজাতিকে সন্ধান করার শিক্ষা সেই-যে শিশু বয়সে শুরু হয় তা যৌবনকালে প্রণয়পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচুদা যদি হাওড়ায় থাকতেন তাহলে তাঁর পক্ষে যে এতোখানি তৎপর হওয়া শক্ত হতো তা লিখে দিতে পারি। কিন্তু প্যারিস? সে তো ওলালা! এক মধুরভাষিণী শ্যামলাঙ্গিনী বাঙালিনীকে আবিষ্কার করেছিলেন পাঁচুদা এই প্যারিসে কোনও এক সময়। তাঁকে দুম করে বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্যারিসের আকাশ-বাতাসে যে মাদকতা রয়েছে তাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসেব করে কেউ প্রেমে পড়তে চায় না—হৃদয়ের দ্বার খিল দিয়ে বন্ধ রেখে ঘুরে বেড়াবার জন্য ফরাসি তার প্যারি শহর তৈরি করেনি।

পাঁচুদার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। সেই শ্যামলাঙ্গিনীকে আমাদের বউদি বানিয়ে পাঁচুদা ঘরসংসার শুরু করেছিলেন। প্যারিসে প্রেম আসে কিন্তু প্রায়ই টেকে না। এখানকার প্রেম প্রায়ই সময়ের ধোলাই-ধকল সইতে পারে না। বুদ্ধিমানরা তাই প্যারিসে প্রস্তাব করে প্রণয়িনীর প্রশ্রয় ও সম্মতি লাভ করে সরে পড়েন অন্যত্র। দূরদর্শী ফিরোজ গান্ধীও তাই করেছিলেন এবং সাতপাকে বাঁধার পাকা কাজটা সেরেছিলেন স্বদেশে, এলাহাবাদে।

প্যারিসের প্রেম আচমকা ঠান্ডা লাগার মতন! নতুন যারা এসেছে তাদেরই মধ্যে এর প্রবণতা বেশি। প্যারিসেই যাদের জন্মোকম্মো, খোদ প্যারিসিয়ান বলতে যাদের নাক উঁচু হয়ে ওঠে তারা এখনও ওই ব্যাপারে ভীষণ হুঁশিয়ার। রমণী সান্নিধ্যে তাদের আপত্তি নেই, অরুচি নেই, ক্লান্তি নেই, কিন্তু মন নেই বে-থায়। পটিয়ে-পাটিয়ে ভুজিয়ে-ভাজিয়ে ফরাসি পুরুষকে ছাঁদনাতলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসানো রীতিমতো শক্ত কাজ হয়ে উঠেছে। মেয়েরা হিমসিম খাচ্ছে, ফলে অনেক ফরাসি মেয়ের মনে সুখ নেই। সে মনের দুঃখে প্যারিস ছেড়ে আতলান্তিকের ওপারে প্যাসিডোনিয়ায় চলে যাচ্ছে। মার্কিন দেশে ফরাসি কলাবতীর এখনও বেজায় কদর মার্কিনি, প্রণয়ের বাজারে তার স্পেশাল প্রিমিয়াম।

ঘাঘু ফরাসি অনেকসময় বিয়ে করেও ছুক-ছুক করছে। চোরাগোপ্তা প্রেমের ব্যাপারে ফরাসি পুরুষের কাছে যে অনেক কিছু শেখবার আছে তা আমেরিকান ও ইংরেজ অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। আজকাল তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন যোগ হয়েছে সমকামিতা। যার টেকনিক্যাল শব্দ ‘গে’, যা আমাদের ছোটবেলায় বোঝাতো আমুদে। দুষ্টরা তো প্যারিসকে বদনাম

দেবার জন্যে নাম দিয়েছে 'গে পারি'। ওর বিশেষ অর্থ যাই হোক, আমরা 'গে পারি' বলতে আনন্দময়ী প্যারিসই বুঝবো।

প্যারিসে বসবাস করলেও বাইরের মেয়েদের এখানে ধাতস্থ হতে সময় লাগে। নানা এবং সুপার নানা শব্দগুলো কানে মধু ঢালে, শরীর হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, খেয়াল থাকে না, কোন্‌টা কথার কথা আর কোন্‌টা মনের কথা। রমণীকে প্রেম নিবেদন করার জন্যে ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান ভাষা দুটো—একটা ফরাসি, আর একটা সংস্কৃত। সংস্কৃতকে আমরা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি পলিটিশিয়ানদের ইলেকশন বক্তৃতা সংস্কৃতে করা যায় না বলে। ফলে দুনিয়ার একমাত্র ফরাসিই এখনও রমণীরঞ্জনের জন্যে তার ভাষাকে সারাক্ষণ সযত্নে পালিশ করে যাচ্ছে। অতএব মেয়েদের 'মাস্টার' হতে গেলে ফরাসি শেখা ছাড়া উপায়ান্তর নেই দুনিয়ার পুরুষ সমাজের।

হাওড়া-কাসুন্দের মেয়েদের পক্ষে প্যারিস তাই ডেনজারাস জায়গা। কয়েকদিন বসবাস করেই মেয়েরা বুঝতে পারে বাঙালি ব্যাটাছেলে তার সঙ্গে এতোদিন কী খারাপ ব্যবহার করেছে! মেয়েদের সঙ্গে মিষ্টিভাবে কথা বলার মতন কোনও শব্দসম্ভার যে বাংলায় নেই তা আবিষ্কার করে মেয়েরা আরও ক্ষেপে ওঠেন।

পাঁচুদার সুখের সংসার কয়েকবছর পরেই যে এমনভাবে ভাঙবে তা হিসেবে ছিল না। আমাদের বউদি প্রায়ই একটা দোকানে জিনিসপত্তর কিনতে যেতেন। সেখানে দোকানিই প্রেমের টেণ্ডারে পাঁচুদাকে হারিয়ে দিলেন।

পাঁচুদা বললেন, "কাজে এরা যাই করুক, মুখে এরা যেভাবে মেয়েদের বন্দনা করে তা কাসুন্দেতে বসে তোরা কল্পনা করতে পারবি না।" পাঁচুদা যা বলতে চাইলেন, মেয়েদের চিঁড়ে প্রায়ই মিষ্টি কথাতেই ভিজে যায়, প্রকৃত প্রেমের প্রয়োজন হয় না।

ঘর ভাঙবার পরে বেশ কিছুদিন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কেটেছে পাঁচুদার। চাকরিটা হাত ছাড়া হলো। ওই দুষ্ট দোকানদার চেষ্টা করেছিল পাঁচুদাকে দেশছাড়া করার, কিন্তু পারেনি।

এ-ব্যাপারে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সহায়তা দিয়েছিলেন দোকানির একনম্বর স্ত্রী। ডাইভোর্সের আঁচে কত সংসার যে ছারখার হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জাত এই সংসারধর্মের ব্যাপারে যে বোকামি দেখাতে শুরু করেছে তাতে অবাক হবার কথা।

এই ব্যাপারে তর্ক চলে না। ওঁদের বক্তব্য, তোমরাও কিছ ধোয়া তুলসী পাতা নও। সুযোগ সুবিধা নেই বলেই তোমাদের অপলকা বিয়েও 'স্থায়ী' হচ্ছে। দাঁড়াও, হাওয়া এলো বলে! সিঁথিতে সিঁদুর লাগিয়ে এবং হাতে বালা পরিয়ে

মেয়েদের সারাজন্ম বন্দি করে রাখার যুগ শেষ হলো বলে।

এসব দেশেও আগে নাকি এরকম ছিল। এখন বিচ্ছেদের বড় ভূমিকা হচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে গোমড়ামুখো ইংরেজ পুরুষও মেমসায়েবের কোঁতকা খাচ্ছে। প্রতি দশটা ইংরিজি ডাইভোর্সের সাতটাতে মেয়েরা নাকি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে।

সাফল্য যাকে বলে তা পাঁচুদার আয়ত্তে কখনও আসেনি। বিদেশের কর্মজীবনেও এসেছে ব্যর্থতা। যে-কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন সে কোম্পানিটাই উঠে গেলো। এই হচ্ছে আধুনিক যুগের হাওয়া যা অবশেষে ফরাসি দেশেও পৌঁছেছে। বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে যে-কোম্পানি খরিদ্দারের মনোরঞ্জন করতে সফল হচ্ছে না তার বিনাশ অবধারিত। সবচেয়ে সফল দেশ আমেরিকা ও জাপানে প্রায়ই এই কাণ্ড ঘটছে, ইয়া-ইয়া কোম্পানি তাদের দরজার সামনে লালবাতি জ্বেলে দিচ্ছে এবং তার ফল কখনও-কখনও বেশ দুঃখময় হচ্ছে। অবশ্য ব্যাপারটা আমাদের দেশের মতন বেদনাদায়ক নয়। গত দশ বছরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের পারিবারিক জীবন বন্ধ-কোম্পানির দৌলতে যেভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখেছি তা ভাবলে ভীষণ কষ্ট হয়। কোম্পানি বন্ধ হলে এই ধনাঢ্য দেশেও অশেষ কষ্ট আছে, তবে চাকরি হারালে মানুষকে অবশিষ্ট জীবন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না। পাঁচুদা তাই বিভিন্ন উপায়ে জীবনধারণ করে চলেছেন। এখন ছোটখাট কী একটা ব্যবসায় হাত দিয়েছেন, ভগবানের দয়ায় চলে যায়।

কিন্তু নতুন করে সংসার গড়বার কথা ভাবেননি পাঁচুদা। বিদেশিনীদের ওপরেও তাঁর কোনও বিরাগ নেই, যে-রমণীর কাছ থেকে তিনি আঘাত পেয়েছেন তিনি তো বিদেশিনী নন। পুনর্বিবাহে না যাওয়ার কারণটা একটু অদ্ভুত ধরনের। পাঁচুদার ধারণা তাঁর স্ত্রী একদিন ভুল বুঝতে পেরে নিশ্চিত তাঁর কাছে ফিরে আসবে। "ও বুঝবে প্রেমকে টেণ্ডারে তুললে সুখ বা শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না।" যারা 'নিলাম ডাকে' প্রেম কিনে এক সংসার থেকে বধূকে অন্য সংসারে নিয়ে যায় তাদের জন্যে নাকি দুঃখ তোলা থাকবেই। টেণ্ডার ও নিলাম শব্দ দুটো মানব-মানবীর পবিত্রতম সম্পর্ক সম্বন্ধে আগে কখনও শুনিনি। পাঁচুদার নিশ্চিত ধারণা, মায়ামোহ কেটে যাবে এবং পাঁচু বউদি তখন খুব বিপদে পড়বেন। বিদেশে নিরাশ্রয় হয়ে তিনি যখন ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হবেন তখন পাঁচুদা পাশে এসে না দাঁড়ালে তিনি বিপন্ন হবেন।

আমাদের দেশের বিবাহ মন্ত্রগুলো পাঁচুদা খতিয়ে দেখেছেন। যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বিবাহলগ্নে তা সবই সমস্ত জীবনের জন্য। একজন অপারগ হলে অপরজনও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে পারে এমন কোনও

ইঙ্গিত নাকি বিবাহমন্ত্রের কোথাও নেই। পাঁচুদা তাই পুরনো পাট সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়ে আবার নতুন জীবনযাপনে আগ্রহী হননি।

আরও একটি ঘটনা থেকে পাঁচুদা বিশ্বাস ও প্রাণশক্তি আহরণ করেছেন। বউদির কোষ্ঠি বিচার হয়েছিল অনেকদিন আগে, সেখানে নাকি ইঙ্গিত ছিল, জাতিকার কোনও সময়ে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সেই অঘটন যদি ঘটেও তা হলে তাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। ঘর ভাঙবার পরে পাঁচুদা আরও একটা কাজ করেছিলেন। নিজের কোষ্ঠিটাও পাঠিয়েছিলেন হাওড়ার এক জ্যোতিষীর কাছে পুনর্বিবেচনার জন্যে। সেখানেও বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই ওঁর মধ্যে কোনরকম ব্যাস্ততা নেই। পাঁচুদা নিশ্চিত, গ্রহনক্ষত্রের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে না। জ্যোতিষীর কথা মতো, তাঁর জীবনের শেষ প্রান্ত সুখ ও শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

ইচ্ছে ছিল ফরাসি দেশে বিবাহ সম্বন্ধে পাঁচুদার কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণ করে নেবো। কিন্তু দু'-একজন ভারতীয় বন্ধুর বিবাহ ছাড়া দীর্ঘ প্রবাসে পাঁচুদা তেমন কোনও বিবাহ উৎসবে নিমন্ত্রিত হননি। ভারতীয় বিবাহও হয়েছে ঝটপট, সেখানে সময়ের অভাব, অর্থের অভাব, তাই উৎসবের পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। কোনওরকমে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষিত হয়ে সংসারসংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়াটাই ছিল মূল লক্ষ্য।

পাঁচুদা বলেছিলেন, "যদ্দুর জানি প্যারিসে বিয়েশাদিটা বিজনেস অ্যাফেয়ার। যা হবার তা ঝটপট হয়ে যায়। আমাদের দেশে বছরখানের ধরে দুনিয়াসুদ্ধ লোক যেমন বিয়ে নিয়েই হিমসিম খায় তেমন কোনও ব্যাপার নেই প্যারিসে। বিয়ে করবে তো করো! বিয়ে হচ্ছে বললে কর্মক্ষেত্রে মালিক তিনদিন সবেতন ছুটি দিতে বাধ্য। পশ্চিমি জগতে নয়া জমানায় এই তিন দিন বাড়তি ছুটি নেহাত সস্তা নয়।"

ফ্রেঞ্চ লিভের এখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নাকি পৃথিবীর সব থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে। কিন্তু খোদ ফরাসি দেশ থেকে ফ্রেঞ্চ লিভকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হচ্ছে। তারপর আসছে রোবট। এই যন্ত্রমানবের বহুগুণের মধ্যে একটি হলো ছুটিতে তার আগ্রহ নেই, ঘড়ি ধরে বাড়ি ফিরবারও তাগাদা নেই। রোবটের আর একটা গুণ সে ক্যানটিনে যায় না, আড্ডা মারে না, বাইরে থেকে কর্মক্ষেত্রে ইয়ার বন্ধুর টেলিফোন আসে না।

পাঁচুদা বললেন, "যে রকমভাবে ঘরসংসারের জটিলতা বাড়ছে, মানুষ যেভাবে তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে সংসার পাততে চাইছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে রোবটের সঙ্গেই আংটি বদল করতে চাইবে অনেকে।"

আমার ধারণা ছিল, রোবট সব সময়েই পুরুষ—যন্ত্রমানব, তাকে নানা সাজে

দেখেছি, যেমন হাইওয়েতে পুলিশদার বেশে। পাঁচুদা বললেন, "রোবটিনা হতে তো কোনও আইনগত বাধা নেই—এটা নির্ভর করছে মানুষের মর্জির ওপরে। সুতরাং পুরুষরা চাইতে পারে রোবটিনাকে, আর মেয়েরা চাইতে পারে রোবটকে।"

এই আজব দেশে অসম্ভব বলে কিছুই নেই, সবই এখানে সম্ভব হতে পারে। যেমন সমকামীর প্রতি ফরাসির প্রশ্রয়। বিলেতে জেল খেটে সমকামী ওস্কার ওয়াইল্‌ড স্বপ্ন দেখেছিলেন ফরাসি প্রশ্রয়ের। এখন তো এই শহরের মানুষের লাজলজ্জা নেই। ইয়া ইয়া সফল শিল্পী, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক, লেখক নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করে পুংবন্ধুর সঙ্গে ঘরসংসার করছেন, জীবনসঙ্গীকে নিয়ে সামাজিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। এ-ব্যাপারে কোনও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। আর সমাজও এসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে হালে পানি পাচ্ছে না। যার যা ইচ্ছে তা করুক, শুধু রুজি-রোজগার বন্ধ না হয়ে যায়—এই ফতোয়া দিয়ে সমাজ হাল ছেড়ে দিয়েছে। সমাজ বলছে, যা খুশি কর। পুরুষের সঙ্গে পুরুষ, রমণীর সঙ্গে রমণী ঘর করুক। শুধু কাজকর্ম বন্ধ কোরো না, রোগাবিরোগ বাধিও না, খুনোখুনির হাঙ্গামায় জড়িয়ে পোড়ো না।

পাঁচুদা এরপরে অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাধাবন্ধনহীন জীবনের পরিণতি সম্পর্কে। সে-সম্বন্ধে পরবর্তী কোনও পরিচ্ছেদে অবহিত করতে হবে পাঠক-পাঠিকাদের—কিন্তু আপাতত তিনি আমাকে শাইনিং কোম্পানির ক্যারোলিনের হাতে সমর্পণ করে কিছুক্ষণের জন্যে উধাও হলেন।

পাঁচুদা আমাকে শুধু একটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আমাকে বউদির নতুন শ্বশুরবাড়িটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচুদা নিজে দোকানের ভিতরে ঢোকেননি, রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে দোকানটা দেখে নিয়েছিলাম। ছোট্ট দোকান, টুকিটাকি নানা রকম জিনিস সাজানো রয়েছে, সেখানেই আদি পাঁচু বউদি কাজকর্ম করছেন। স্বামীর দোকানে সাহায্যে না-করলে আজকাল ফরাসি দেশে টিকে থাকা সহজ কাজ নয়। বিদেশ থেকে যারা এদেশে এসে প্রাণধারণের জন্যে ব্যবসা খুলে বসেছে তারা অপ্রতিদ্বিন্দ্বী হয়ে উঠছে তাদের পারিবারিক শক্তির জন্য। পরিবারের শক্তিকে বিদেশিরা সঙ্ঘশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দীর্ঘ সময় ধরে পর্যায়ক্রমে দোকান খোলা রাখছে, কাজ করে যাচ্ছে নীরবে যা এখন খোদ ফরাসি পরিবারের পক্ষে অসম্ভব, ফরাসি দোকানদার চিৎকার করছে, এই প্রতিযোগিতা অসম এবং অন্যায়। সে ছুটছে উকিলের কাছে, পুলিশের কাছে, সরকারের কাছে যাতে বিদেশির দোকানও ফরাসি দোকানদারের মর্জিমাফিক খোলা এবং বন্ধ হয়।

শাইনিং-এর প্রাণস্পন্দ ফরাসিনী ক্যারোলিনের সঙ্গে কথা বলার প্রধান আনন্দ তার চমৎকার ইংরিজি। না-জানা ভাষার রাজ্যে কথা বুঝতে না-পেরে প্রাণ যখন হাঁফিয়ে ওঠে তখন ক্যারোলিন আমার কাছে অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মতন—প্রাণভরে মানসিক নিশ্বাস নেওয়া যায়।

দ্বিতীয় আকর্ষণ ক্যারোলিনের রসবোধ। নিজের নারীসুলভ কমনীয়তা ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও ক্যারোলিন রসিকতায় অংশ নিতে পারে। মজা করতে পারে। ওর সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলা যায়, অজান্তে ফরাসি সম্মানে হাত দিয়ে ফেলার কোনো ভয় থাকে না।

ক্যারোলিন স্বীকার করে যে-জাত নিজেদের নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে না তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। এই এক গুণ গোমড়ামুখো বেনে ইংরেজকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নিজেদের নিয়ে হাসাহাসি করতে ইংরেজের মোটেই আপত্তি নেই যদি-না তুমি তার পকেটে হাত দিচ্ছো। আমাদের দেশে আবার ঠিক উল্টো—পকেটে যতখুশি হাত দাও, কিন্তু ধর্মে হাত দিও না। ইদানীং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আঞ্চলিকতাবোধ, যা ঠিক মতন সামাল দেবার চেষ্টা না-হলে আমরা অচিরেই ট্রাইবাল যুগে ফিরে যাবো। জাতীয় সংহতি জিনিসটা যে কি সে বিষয়ে আমাদের কোনও ধারণা নেই। মানুষকে ভালবাসতে পারলে কেমনভাবে সব দূরত্ব ঘুচে যায় তা ভুলে যেতে বসেছি আমরা। কে বিশ্বাস করবে আমাদের পূর্বপুরুষরাই প্রথম বিশ্বকে আপন করে নিয়েছিলেন নতুন এক উদাত্ত বাণীর মাধ্যমে—বসুধৈব কুটুম্বকম্।

ক্যারোলিন বললো, "মিস্টার মুখার্সি, তুমি কি হিউমারাস রাইটার? পাঠকদের নিশ্চয় তুমি সারাক্ষণ হাসাও।"

"এতো বড় সম্মান সংগ্রহ করবার মুরোদ আমার নেই, ক্যারোলিন। আমার গুরুদেব লেখক মুজবতা আলি ও শিব্রাম চকোরবত্তি শুনলে খুব হাসাহাসি করবেন। ওঁদের ধারণা ছিল, আমি মাথামোটা হলেও মিথ্যেবাদী নই। সেই সুনাম আমি তো নষ্ট হতে দেবো না। তবে সত্যি কথা বলতে কি, হুঁকোমুখো হ্যাংলার দেশে জন্মেছি, মানুষকে হাসাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মুরোদে কুলোয় না।"

ক্যারোলিন আমার ব্যাপারে একটু সন্দিহান হয়ে উঠছে। "তুমি সারাক্ষণ কী সব লিখে যাচ্ছো রহস্যময় এক ল্যাংগোয়েজে! তুমি কি ফরাসিদের ডোবাবে?"

ভেসে থাকবার জন্যেই তো ফরাসিদের সৃষ্টি। অ্যাটিলা দ্য হুন থেকে আরম্ভ করে হিটলার পর্যন্ত যারা-যারা ফরাসিকে ডুবোবার চেষ্টা করেছে তারা নিজেরাই ডুবেছে। "ক্যারোলিন, আমি এখন ফরাসি ঘরসংসার সম্বন্ধে একটু খবরাখবর নিতে চাইছি।"

ঘরসংসার মানে তো বিয়ে? ক্যারোলিন নিজে এখনও বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে

পড়েনি। সুতরাং সে বিয়ে সম্বন্ধে কী বলবে?

"যাঁদের বিয়ে হয়নি তারাই তো বিয়ে সম্বন্ধে নতুন কথা বলবার হিম্মত রাখবে, ক্যারোলিন। যদি তাই বিয়েসাদি সম্বন্ধে দু' চারটে খবর সংগ্রহ না করে এদেশ ছেড়ে যাই তা হলে গেরস্ত বাঙালি বাবা-মা আমাকে ক্ষমা করবেন না, ক্যারোলিন!"

"কেন? বিয়েটা কী এমন এক মস্ত ব্যাপার? বিয়ে ছাড়াও মানুষের জীবনে আরও অনেক কিছু আছে, মিস্টার মুখার্সি।"

"শোনো ক্যারোলিন, ফরাসিরা বিয়ে ছাড়াও কী কী করবে তা ফরাসিদের মিষ্টি ইচ্ছে বা সুইট উইলের ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বিবাহ ছাড়া চতুর্থ কোনও চিন্তা নেই। রবিবার আমাদের দেশের কাগজের বিক্রির সংখ্যা লাখ-লাখ বেড়ে যায়, বড়-বড় লেখকদের কেরামতিতে নয়, স্রেফ পাত্রপাত্রীর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জোরে। বিয়েটা আমাদের দেশে মস্ত এক ইনডাসট্রি আর এই বিয়ের মৌলিক দায়দায়িত্ব ছেলের নয়, মেয়ের নয়—তাদের বাবা মায়ের।"

ক্যারোলিন কোনও মন্তব্য করতে চাইছে না। তার বিশ্বাস : যস্মিন দেশে যদাচার—প্রত্যেক দেশের মূল্যবোধ মাপজোকের মাপকাঠি আলাদা, সুতরাং সমালোচনা করে কোনও লাভ নেই।

আমি বললাম, "ক্যারোলিন, প্যারিসের বিয়েসাদির খবরাখবর একটু দাও প্লিজ।"

ক্যারোলিন বললো, "সেদিন রাস্তায় প্রচণ্ড হর্ন বাজানো শুনলে তো? এখানে রাস্তা ক্লিয়ার করবার জন্যে হর্ন বাজালে মোটা ফাইন দিতে হবে। কিন্তু বিয়ের দিনে সাতখুন মাপ—রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ির হর্ন শুনলে ট্রাফিক পুলিশও মিটমিট করে হাসবে, বুঝবে বর-কনে বিয়ে করতে চলেছে। বরকনের সহযাত্রীরাও ওই সময় মনের সুখে হর্ন বাজিয়ে নেবে।"

আমি ভাবলাম অনভিজ্ঞ ফরাসি কলকাতায় এলে ভুল বুঝবে, ভাববে শহরে সারাক্ষণই হাজার-হাজার বিয়ে হচ্ছে।

"মিস্টার মুখার্সি, হিসেবটা ভুল নাও হতে পারে। ইউনিসেফের এক প্রোগ্রামে সেদিন শুনলাম, ইণ্ডিয়াতে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় দু' হাজার বেবি জন্মাচ্ছে, এদেশের লোক ভেবে নেবে, প্রতিঘণ্টায় দু' হাজার বিয়ে না হলে প্রতিঘণ্টায় দু' হাজার বেবি জন্মাতে পারবে না!"

আমি একটু লজ্জায় পড়ে যাচ্ছি বুঝতে পেরে ক্যারোলিন কথা ঘুরিয়ে নিলো। বললো, "ফরাসিরা ভীষণ কৌতুকপ্রিয়। কখন যে তাদের মাথায় কী চিন্তার উদয় হয়। যেমন ধরুন বর-কনের গাড়ি। ওই গাড়ির পিছনে বন্ধু-বান্ধবীরা নিজের

হাতে অসংখ্য খালি টিনের কৌটো রিবন দিয়ে বেঁধে দেবে। যাতে গাড়ি চালাবার সময় ঠনঠন-ঠনাঠন আওয়াজ হয়।” এই আওয়াজে অভ্যাগতরা ভীষণ মজা পায়। কখনও বিরাট পোস্টার ঝুলবে গাড়ির পিছনে, তাতে লেখা থাকবে ‘সদ্যবিবাহিত’।

সেদিন রাস্তায় এইরকম এক দৃশ্য দেখেছিলাম বটে, কিন্তু পুরো তাৎপর্য বুঝতে পারিনি।

ক্যারোলিন লক্ষ্য করেছে, সেই বিবাহ মিছিল শেষপর্যন্ত হঠাৎ নিরানন্দ হয়ে উঠেছিল। আনন্দময় মানুষের গাড়ির মিছিল যাচ্ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। হঠাৎ রাস্তার মোড়ে পুলিশ গাড়ির গতি বন্ধ করে দিলো। উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখো রাস্তায় তখন আর এক মিছিল চলেছে। এই মিছিলে রয়েছে একটি কফিন নিয়ে যাবার গাড়ি।

এই মিছিল দেখে ক্যারোলিন এবং পথের অনেকে বিচলিত হয়েছিল।

“আছে জন্ম, আছে মৃত্যু, আছে বিবাহ, আছে মিলন, আছে বিচ্ছেদ, বিচলিত হবার কী আছে? হয়তো ঐ শবাধারের নায়ক পরিণত বয়সেই সাধনোচিতধামে গমন করছেন।”

ক্যারোলিন মৃত্যুর জন্যে চিন্তিত নয়, শোকযাত্রা সে এই প্রথম দেখছে না। তার চিন্তা অন্য। “জানো মিস্টার মুখার্সি, বিবাহের শোভাযাত্রার সময়ে শোকযাত্রার সাক্ষাৎ মিললে সেটা নবদম্পতির পক্ষে খুবই অশুভ।”

এক-এক দেশে এক-এক রকম সংস্কার। “আমাদের দেশে শোকযাত্রা কখনই অশুভ নয়, পথে দেখা হলে সেটা মঙ্গলদায়ক বলেই মনে করে মানুষ।”

থাকগে যাক অপ্রিয় কথা ; বিয়ের সময়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কী লাভ হবে সংসারের? “ক্যারোলিন, তুমি আমাকে একটু বিয়ের টুকিটাকি সাপ্লাই করো।”

ক্যারোলিন মজা পেলো এবং ভাবতে লাগলো। তারপর বললো, “তুমি কোশ্চেন করো, মিস্টার মুখার্সি। আমার উত্তর দেবার সুবিধে হবে।”

“বিয়ে পাকাপাকি করবার ব্যাপারে বাবা-মায়ের অনুমতি প্রয়োজন?”

“প্যারিসে ওসব প্রয়োজন হয় না, মিস্টার মুখার্সি। বর ও কনে দু’জনে রাজি হলে অন্য কেউ ও-ব্যাপারে মাথা গলাবে কেন?”

আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে ক্যারোলিন বললো, “এখানে দুটো বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়—মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজ ও চার্চ ম্যারেজ।”

“মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজ হলো আমাদের রেজিস্ট্রি বিবাহের মতন, রেজিস্ট্রি অফিসে সাক্ষী রেখে রেজিস্ট্রার সায়েবের সামনে খাতায় সই করলেই হলো। কিন্তু এই বিয়েতে ফরাসি মেয়ের মন ভরে না, তাই সে ধর্মীয় বিবাহেও অংশগ্রহণ করবে চার্চে গিয়ে।

"ক্যাথলিক হলে, সাধারণত বিয়ের দিন শনিবার। প্যারিসের লোকরা বুদ্ধিমান ও হিসেবি, তারা দুটো বিয়েই একই দিনে সারতে চায়।"

"তাতে কী সুবিধা, ক্যারোলিন?"

"খরচ, মিস্টার মুখার্সি, খরচ! দু'দিন বিয়ে হওয়া মানেই তো দু'দফায় খাওয়া-দাওয়া, দু'দফা ড্রিংকস ইত্যাদি দেওয়া। প্যারিসের লোকরা আজকাল খরচের ব্যাপারে ডাচদের মতনই হুঁশিয়ার হয়ে উঠছে। তুমি তো জানো, যাতে খরচ হবার সম্ভাবনা তার থেকে দুনিয়ার দু'টি জাত শত হস্তে দূরে থাকবার চেষ্টা করে—ডাচ ও স্কচ।"

স্কচের ব্যাপারটা বোধহয় সত্য নয়। কারণ এই কলকাতা শহরে বসেই আমি কয়েকজন দিলদরিয়া স্কচকে দেখেছি। খরচের খোদ ইংরেজদের তুলনায় স্কচরা নিচু মনের এমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সায়েবসমাজে আমি লক্ষ্য করিনি।

ক্যারোলিন বললো, "মিউনিসিপ্যাল ম্যারেজের দু'পক্ষ থেকে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বর ও কনের প্রাণের বন্ধুদের সাধারণত এই ভূমিকায় দেখা যায়। কখনও-কখনও কারও প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানোর প্রয়োজন থাকলে তাঁকে এই ভূমিকায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়।"

আমাদের দেশে পয়সা ফেললে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বাড়িতে ডেকে পাঠানো সম্ভব হয়—বিয়ের পিঁড়িতে আশীর্বাদের সঙ্গে এই রেজিস্ট্রিও সেরে নেওয়া হয়। প্যারিসে সেটা সম্ভব বলে মনে হলো না। তাই গরিব ও কোটিপতি সবাইকে মাথা নিচু করে হাজির হতে হয় মিউনিসিপ্যাল অফিসে, যার নাম সিটি হল। আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে, আগে রেজিস্ট্রি বিবাহ তারপর ধর্মীয় বিবাহ। ধর্মীয় বিবাহ সারার পরে আমাদের দেশেও রেজিস্ট্রি বিবাহে নামতে গেলে কিছু আইনগত অসুবিধা দেখা দেয়।

প্যারিসের বাবা-মায়েরা আজকাল নাকি ইংজের ও আমেরিকান বাবা-মায়ের মতন বিবাহসংক্রান্ত খরচের ব্যাপারে হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছেন। সামাজিক দায় বলতে কার্ড ছাপাবার খরচটা এখনও বাবা-মায়ের গাঁট থেকে বেরোয়। অন্য কোনও ব্যাপারে তাঁর লোকনিন্দের ভয় নেই প্যারিসীয় সমাজে। কিন্তু লোকভয়ে ভীত না হয়েও ফরাসি যদি বিয়েসাদিতে টুপাইস খরচ করতে চায় তাতে আপত্তি নেই। ক্যারোলিন জানালো, কেউ-কেউ লাখ চার পাঁচেক টাকা খরচ করছে।

খরচের দুটো বড়ো আইটেম হলো : কনের ড্রেস ও ভুরিভোজন। ভুরিভোজন বলতে দুটো আইটেম। প্রথমটির নাম ব্রাঞ্চ, যা ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ-এর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা বিয়েবাড়িতে জমা হয়েছে মিউনিসিপ্যাল আপিসে যাবার জন্যে তাঁরা কতক্ষণ খালিপেটে থাকবেন? তাই একটু পান, একটু আহার। এই আহার এমন এক ধরনের যে প্রাতরাশ না করে এসেছেন যাঁরা তাঁদের এবং যাঁরা লাঞ্চ

করতে পারবেন না এই দু'পক্ষকেই টিকিয়ে রাখবে। সন্ধ্যাবেলায় ডিনারের আয়োজন। এর জন্যে রেস্তোরাঁয় টেবিল অথবা ঘর বুক করো। প্যারিসের কোনও নামকরা রেস্তোরাঁয় হুট করে হাজির হওয়া যায় না ; গাঁটের কড়ি খরচ করে মনের সুখে ভোজন করার মতন রসিক এই শহরে এতো আছেন যে পয়সার দেমাক দেখিয়ে রেস্তোরাঁ ম্যানেজারের মন জয় করা যায় না।

আর একটি বড় খরচ যে বিয়ের 'বেনারসী' তা ক্যারোলিন নির্দ্বিধায় স্বীকার করলো। বিয়ের দিন চার্চে একটু স্পেশাল সাজসজ্জায় যেতে চাইবে ফরাসি ললনা এতে আশ্চর্য হবে কী আছে? হতে পারে সে অতি আধুনিকা রমণী, কিন্তু বিয়ে ইজ বিয়ে।

যাঁরা বিয়ের বেনারসীতে হাজার পাঁচের টাকা খরচ করাকে বাঙালির বেহিসেবি বেপরোয়া মনোবৃত্তির নিদর্শন বলে মনে করেন, তাঁরা জেনে রাখুন প্যারিসের অতি সাধারণ মেয়েও দুড়ুম করে ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ বা লক্ষ টাকা খরচ করে বসেন এই বিবাহসজ্জা তৈরি করতে। এর জন্যে বিশেষজ্ঞ দোকানদারেরা ঝাঁপ খুলে বসে আছেন। এর মাপজোক নেওয়াও স্পেশাল এক আর্ট। সেদিকে বাঙালিরা ভাগ্যবান—বিপুলা থেকে শুরু করে তন্বী পর্যন্ত সবার জন্যেই বেনারসী শাড়ির মাপ এক। অনেক ব্যাপারে ইণ্ডিয়া যে সমস্ত দুনিয়া থেকে এগিয়ে আছে মেয়েদের শাড়ি তার মস্ত প্রমাণ।

কিন্তু ফরাসিরা এক ব্যাপারে বাঙালির ওপর বদলা নিয়েছে। জলের খরচে বিয়ে-করে আসা সম্ভব যদি তোমার টাকা খরচে অনিচ্ছা থাকে।

ভদ্রাসন বেচতে হলেও বাঙালি মেয়ের বাপ বেনারসী কেনার দায়িত্ব অস্বীকার করবেন না। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামাকাপড়ে বাঙালির প্রবল আপত্তি। কিছু চালাক ফরাসি আজকাল বিয়ের ড্রেস ভাড়া দেওয়ার দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করছে। কিছু সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা দিয়ে ডেকরেটরের দোকান থেকে ফার্স্ট ক্লাশ কনে সেজে চলে যাও বিবাহবাসরে। কার বাবার সাধ্য, বুঝতে পারবে না তোমার শরীরে ভাড়ার মাল। বিয়ে-থা সেরে ঠোঁটে সিঁদুর চড়িয়ে বধূ হয়ে মা লক্ষ্মী পরে ফেলো তোমার নিজস্ব ফ্রক। এবার দোকানে ফিরে গিয়ে ভাড়ার কড়ি মিটিয়ে দিয়ে সুখে ঘরসংসার করো গে যাও। খামকা একদিনের জন্যে এককাঁড়ি ফ্রাঁয়ের শ্রাদ্ধ করবে কোন্ দুঃখে? বরং ওই পয়সায় চলে যাও গ্রিসে, কিংবা ইতালিতে, নিদেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। মা লক্ষ্মী, বরের ভালবাসার সঙ্গে জমকালো বিয়ের ড্রেসের যে কোনও সম্পর্ক নেই তা তুমি হাড়ে-হাড়ে বুঝবে এক হপ্তার মধ্যে। বিশ্বাস না হলে যে কোনও বিবাহিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তাঁরা ব্যাপারটা বুঝেছেন বলেই তো ডেকরেটর গাদা-গাদা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বিয়ের ড্রেস কিনতে পারছে জলের দামে।

কিন্তু ক্যারোলিনের কাছে বিয়ের ভিতরকার খবরাখবর যে পাওয়া যায়নি তা বুঝতে পারলাম কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে।

অপ্রত্যাশিত নেমন্তন্ন পাওয়া গেলো সম্বিতের বন্ধু হেনরির কাছ থেকে। এই নেমন্তন্নর বিশেষত্ব হেনরির জননীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। হেনরি বয়সে তরুণ, এখনও বিবাহিত নয়, তাই বিদেশি অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বটা মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। মা সানন্দে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন জানিয়েছেন।

শ্রীমতী মার্গারেট ডুরে বিদগ্ধ মহিলা। তিনি ফরাসি জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। স্বামী মঁশিয়ে ডুরে যে-প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার বিস্তৃতি এখন ইউরোপ জুড়ে। ফলে রোম, এথেন্স, বন, মাদ্রিদ ও লণ্ডনে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। এইসব শহরকে ফরাসি এগজিকিউটিভ আজকাল বিদেশ বলে মনে করেন না।

শ্রীমতী ডুরের এক পুত্র ও এক কন্যা। এরা এখনও বিবাহ করেনি, কিন্তু কেউই বাপ-মায়ের সঙ্গে থাকে না। হেনরির কিন্তু মায়ের প্রতি টান খুব। প্রায় প্রতিদিনই ফোনে কথা হয়। তাছাড়া তার কাছে বাপ-মায়ের ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবি আছে, যখন খুশি চলে আসে। "বিশেষ করে যখন মায়ের রান্না খাবার ইচ্ছা হয়।" মা-বাবা বাড়িতে না-থাকলেও কোনও অসুবিধে নেই। হেনরি-জননী ছেলে-মেয়েদের আকস্মিক আবির্ভাবের অপেক্ষায় ফ্রিজে খাবার বোঝাই করে রাখেন।

হেনরি রসিকতা করলো, "মাসের শেষে যখন টাকাকড়ির টানাটানি পড়ে তখন আমার এবং আমার বোনের মাতৃপিতৃভক্তি বেড়ে যায়!"

ছেলে-মেয়ের প্রতি এতো টান, তবু আলাদা থাকা কেন?

উত্তর : এদেশে এখন এই নিয়ম। ছেলেরা সাবালক হলে আর বাবা মায়ের সঙ্গে থাকতে চাইছে না, অন্তত বড়-বড় শহরে। তারা ভাড়া করছে ছোট-ছোট অ্যাপার্টমেন্ট এবং সেখানে নিজের খেয়ালখুশি মতন জীবনযাত্রা করছে। এর কষ্ট অনেক, কারণ অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণীদের তুলে নিতে হচ্ছে সংসারের সমস্ত কাজকর্মের দায়দায়িত্ব। সেই সঙ্গে রান্নার কাজ—কারণ এসব দেশে এখন কাজের লোক, রান্নার লোক উধাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বাড়তি হাঙ্গামার বদলে পাওয়া যাচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানে তো স্রেফ রাজনৈতিক স্বাধীনতা

নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতার আরও অনেক দিক আছে যা আধুনিক প্যারিসের তরুণ-তরুণীরা উপভোগ করতে চায়। তারা জানে পৃথিবীতে কোনও কিছুই, এমনকি স্বাধীনতাও বিনামূল্যে পাওয়া যায় না ; ফলে প্রথম সুযোগেই তারা মাতৃসান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সংসার শুরু করে বিয়ে না-হলেও।

হেনরি বললো, "এর ফলে মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা মধুর হয়ে ওঠে, সারাক্ষণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে খেঁচাখেঁচি লেগে থাকে না। একই শহরে পৃথক বসবাস হলে তো কথাই নেই, প্রায়ই দেখাশোনা হতে পারে। এমনকি নতুন কিছু রান্না হলে মা ফোন করে দেন। আজ রাত্রে এসো—ওমুক রান্না করছি, যা তোমার ভাল লাগে। তোমার বাবা আমস্টার্ডাম গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অমুক খাবার নিয়ে এসেছেন তোমাদের ভাইবোনদের জন্যে।" সেক্ষেত্রে হেনরি ও তার বোন সানন্দে সন্ধেবেলায় হাজির হয়। জীবনযাত্রায় আমেরিকান ছায়া পড়তে আরম্ভ করলেও ফরাসি এখনও মায়ের রান্নার প্রচণ্ড ভক্ত।

এতো টান থাকলেও আলাদা হবার প্রকৃত কারণ প্রাইভেসি। ফরাসিকে তো শুধু লেখাপড়া বা চাকরি করলেই হবে না, তাকে জীবনসাথী সংগ্রহ করতে হবে। যার জন্যে প্রয়োজন প্রচণ্ড মেলামেশা। এই মেলামেশা ঠিকমতো চলাতে হলে কে কখন বাড়ি ফিরবে তার স্থিরতা থাকে না। আলাদা থাকার মস্ত সুবিধে, ফরাসি মাকে হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না কখন ছেলে অথবা মেয়ে বাড়ি ফিরবে। চোখের সামনে দেখতে হয় না তারা কী কী অসঙ্গত কাজ করছে। আর ফরাসি ছেলে মেয়েও বুঝে ফেলে আমি যা করবো তার ফলভোগ আমাকেই করতে হবে। এর ফলে নাকি ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়।

হেনরি বললো, "কিছুদিন আগেও বাপ মায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে বহু কমবয়সী ছেলেমেয়ের ভুল ধারণা ছিল। যেহেতু বাবা মায়েদের জীবনে ছেলেমেয়েদের সুখ ও মঙ্গল ছাড়া আর কোনও ভূমিকা ছিল না, সেহেতু ছেলেমেয়েরা প্রায়ই ধরে নিতো ওঁরা বিনাপয়সার চাকর বা ঝিয়ের মতন। সারাক্ষণ ওঁদের ঘাড়ে দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দাও। অর্থাৎ নাবালকত্ব কাটতে দেরি হতো।"

হেনরির মায়ের ফ্ল্যাটটি ছবির মতন সাজানো। মাস্টার বেডরুম ছাড়াও দু'টি গেস্টরুম আছে, তার একটি হেনরি এবং আরেকটি বোনের জন্যে নির্দিষ্ট। ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করে অনেক সময় ময়লা জামা কাপড়ও মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চলে যায়, লন্ড্রির দায়িত্ব তিনি নেন। এর জন্যে মায়ের রাগ নেই। বললেন, "এই সব দুষ্টুমি করছে বলেই এখনও একটু-আধটু বাড়তি দেখা হচ্ছে। কিছুদিন পরে ওসব যখন করবে না তখন আরও কম দেখা হবে।"

একটু প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরাসি বাড়িতে পুরনো ফার্নিচারের ভীষণ কদর। পুরনো ফার্নিচার যে খুব সুখপ্রদ তা নয়। কিন্তু দশগুণ টাকা দিয়ে তিলে-তিলে ফরাসি

সংগ্রহ করে, যেমন করেছেন হেনরির বাবা ও মা।

হেনরির মা আমাকে খুবই আদর যত্ন করলেন। যাকে বলে কিনা আপন করে নেওয়া।

বললেন, "উনি একটু অফিসের কাজে বেরিয়েছেন, এখনই এসে পড়বেন।" 'একটু' মানে লণ্ডন! ওটা আমাদের কলকাতা থেকে ব্যাণ্ডেল যাবার মতন। ইউরোপের অর্থনৈতিক মিলনের আগে ভৌগোলিক দূরত্ব অবিশ্বাস্য ভাবে মুছে গিয়েছে। কিছুদিন পরে বিভিন্ন পাসপোর্টের হাঙ্গামাও থাকবে না। ফলে যতক্ষণে আমরা কলকাতার ট্রাফিক জ্যামে সেদ্ধ হয়ে টালা থেকে টালিগঞ্জ পৌঁছবো ততক্ষণে ইটালিয়ান সায়েব ফ্রান্সে, ফরাসি সায়েব জার্মানিতে, জার্মান সায়েব স্পেনে পৌঁছে গিয়েছেন। বেলজিয়ান সায়েবের দেশ বলতে তো হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি। ওঁরা তো যাতায়াতের ওপরেই টিকে আছেন। যাতায়াত মানেই তো পথঘাট, বিমানবন্দর, হোটেল, রেস্তোরাঁ, টেলিফোন, মোটরগাড়ি। এইসব ব্যবস্থা চালু রাখতে ইউরোপ হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন ধরুন এয়ারপোর্ট স্থাপত্য—এ-ব্যাপারে ফরাসির মাথায় যেসব বুদ্ধি খেলছে তা দুনিয়ার কেউ ভাবতে পারছে না। ফলে টুপাইস আসছে ফরাসির পকেটে।

হেনরির বাবার মুখেই শুনেছি, আন্তঃরাষ্ট্র চলাচল যেভাবে বাড়ছে তাতে স্রেফ কোনও বিশেষ রেস্তোরাঁয় খাবার ইচ্ছে হলেও লোকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে আসবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে এবং পরের দিন সকালে আপিস করবে।

হেনরির মা শুধু রাঁধেন না পড়াশোনাও করেন। পৃথিবীর নানা দেশের লোকাচার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ। নিজের দেশের খবরাখবরও তিনি রাখেন।

আমার কাছে ইণ্ডিয়ার ছেলে মেয়ে, বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ কিছু খবরাখবর নিলেন। তারপর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি ভাল করে খোঁজখবর করে দেখো, বাঙালি ও ফরাসির পূর্বপুরুষ এক। হয় বাঙালিরা কোনও সময়ে ফরাসি দেশে হাজির হয়েছিল, অথবা ঠিক তার উল্টো।"

হেনরির মা খুব একসাইটেড হয়ে উঠেছেন। বললেন, "বিয়ে সাদির ব্যাপারে ফরাসি ও বাঙালির মেজাজ এক। শুধু তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই, এই প্যারিস শহর দেখে কখনই সমস্ত ফরাসি সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা কোরো না। প্যারিসে মানুষকে একটা প্রেসার কুকারে ফেলে সেদ্ধ করা হচ্ছে, সমস্ত বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে একটা মণ্ড তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে আমেরিকান স্টাইলও চলে আসছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে, এখানকার লোক এখন হ্যামবার্গার খাওয়া পছন্দ করছে।"

আমি হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছি। হেনরি-জননীর কাছ থেকে ফরাসির

ভিতরকার খবর বের করে নেওয়া প্রয়োজন। পকেটে নোটবুক রয়েছে। এইসব খবরের লোভেই তো অমন সুন্দর কাসুন্দে-শিবপুর ছেড়ে এমনভাবে নিজেকে নির্বাসনে এনেছি। দূর থেকে প্যারিস দেখবার ইচ্ছে থাকলে তো আমি পিকচারবুক জোগাড় করে নিতে পারতাম। দুনিয়ার কে না জানে রঙিন ছবির বইতে শহরগুলো যতো সুন্দর দেখায় আসলে শহরগুলো তার অর্ধেক সুন্দর নয়। এ যেন আমাদের দেশে বিয়ের আগে কুমারী মেয়ের ফটোগ্রাফি। আলো ফেলে, পাউডার মাখিয়ে, বউদির শাড়ি পরিয়ে স্টুডিওর মালিক পাড়ার পদিকে পদ্মিনী করে তুলছে। বিদেশে সশরীরে আসার একমাত্র কারণ কিছু স্পেশাল কথাবার্তা শোনা।

লজ্জার মাথা খেয়ে আমি নোটবই বের করে ফেলেছি। হেনরির মা আপত্তি করছেন না। ফরাসির কোনও ব্যাপারে ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, ঠিক আমাদের কলকাতার মতন। আমাদের যা কিছু সব খোলাখুলি, এমনকি রাস্তাকে শৌচাগার হিসাবে ব্যবহার করা পর্যন্ত। কানে পৈতে ঘুরিয়ে বসে পড়েছি পথে, ইচ্ছে হলে ছবি তোলো, ফরেনে দেখাও—কলকাতার কিছু এসে যায় না।

হেনরি-জননীও বাঙালি ও ফরাসি কালচারের যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পেরে খুব সন্তুষ্ট। এতো দিন ফরাসি গালাগালি খেয়েছে ইউরোপের অন্য জাতের কাছ থেকে বিয়ে সাদিতে তার চালচলনের জন্যে। গাঁয়েগঞ্জের ফরাসি বিয়ে দিতে গিয়ে ফতুর হয়। শুধু বিয়ে কেন, বাপ-পিতামহের শ্রাদ্ধের ভোজেও ফরাসি ফতুর হয়েছে সেদিন পর্যন্ত।

হেনরির মা অবাক করলেন, পিতৃমাতৃদায়ের পরে আমরা যে খালিপদ হয়ে অনাথ অবস্থায় ঘুরে বেড়াই এই রেওয়াজও ফরাসি অঞ্চলে ছিল। শোকপর্বে তারা জুতো পরে না। বাড়তির মধ্যে শোকের বাড়িতে তারা একটু দেওয়ালির ব্যবস্থা করে—দরজার সামনে বড়-বড় মোমবাতি জ্বেলে দেয়, যা দেখে লোকে বুঝতে পারে এদের অশৌচ শুরু হয়েছে, গুরুজন কেউ সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

চান্স যখন পেয়েছি, তখন ছাড়ছি না। শুরু করছি একেবারে শুরু থেকে। শুধু আমাদের দেশেই লোকভয় বা কুসংস্কার আছে বলে যাঁরা ঢাক বাজান তাঁদের কাছে করজোড়ে নিবেদন—যান একবার ফরাসি দেশে, একটু খোঁজখবর করুন। দুনিয়াকে যারা হাল-আমলের সভ্যতা শেখালো তাদের মধ্যে যেসব চালচলন রয়েছে তা নিজের চোখে দেখে আসুন, তারপর নিন্দে করুন নিজের দেশের মানুষের।

মিসেস ডুরের সঙ্গে আমি একমত। শুরু করতে হয় একেবারে শুরু থেকে—অর্থাৎ পুংসবন থেকে। ফরাসি এখনও জীবনকে ডজনখানেক স্কেলে ভাগ করে

নেবার মতন ভারতীয় নিপুণতা অর্জন করেনি। তাদের হিসাবপত্তর গর্ভকাল থেকে। ওইখান থেকেই কিছু হিসেব নেওয়া যাক।

গর্ভকালে মেয়েদের নানা নিয়মকানুন আছে আমাদের গ্রামেগঞ্জে। বড়-বড় শহরেও সেসব বিশ্বাস-অবিশ্বাস মানুষের সঙ্গে চলে এসেছে গ্রাম থেকে। এখনও তার ব্যবহার হচ্ছে, কোনও বইপত্র ছাড়া কেবল মুখে-মুখে বংশ পরম্পরায় মা-মাসিদের দৌলতে।

ফরাসি দেশে সন্তানসম্ভবা রমণীদের লাল কাপড় দেখা একেবারেই বারণ। দুঃসাহস থাকলে দেখতে পারো, কিন্তু তারপর যদি গর্ভপাত হয় হয় তাহলে কাউকে দোষ দিয়ো না। হ্যাঁ, মদ নিয়েও এই সময়ে খুব সাবধান হতে হবে, দেখতে হবে এক ফোঁটা মদও যেন চলকে গায়ে না পড়ে। আমি বললাম, "আমাদের দেশে আসন্নপ্রসবা রমণীকে পূর্ণপাত্র তৈলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তাকে এমন সাবধানে রাখতে হবে যেন তৈল চলকে না পড়ে।"

চুপি-চুপি বলে রাখি, গর্ভিণী অবস্থায় গা চুলকানো ফরাসির নিয়মবিরুদ্ধ—বিপদ আসতে পারে।

সবিনয় নিবেদন, তাগা কবচ শুধু বাঙালি মেয়েরাই পরে না। বিনা হাঙ্গামায় প্রসবের জন্যে ফরাসিরা পরে একটা কাপড়ের টুকরো যা আশীর্বাদ করিয়ে আনা হয় নোতরদাম গির্জা থেকে। আমাদের যেমন মা-ষষ্ঠী তেমন ফরাসি গর্ভিণীদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে একজন সন্ত আছেন, তাঁর নাম সেন্ট মার্গারেট। গর্ভকালীন যা কিছু প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন তা এই মা মার্গারেটের শ্রীচরণে।

আজ্ঞে, এবার আসল কথায় আসা যাক। গর্ভে ছেলে না মেয়ে, এই কৌতূহল যুগযুগান্তের। আজকাল তো স্বামীস্ত্রী ছুটছেন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্য নিতে। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় আসছে যে আমাদের সরকারবাহাদুর এই পরীক্ষা বেআইনি করবার কথা ভাবছেন। সাবেকি ফরাসি আলট্রা সাউণ্ড পরীক্ষায় খোকা না খুকু তা জানবার জন্যে অপেক্ষা করে না। সোজা পথ আছে, জেনে নিন ভাবী মায়েরা ও তাঁর স্বামী ও শ্বশুরশাশুড়িরা। ফরাসি গর্ভিণী নাইটড্রেস পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর একটি টাকা কপালের কাছ থেকে নাকের ওপর দিয়ে ছেড়ে দেবেন। মুদ্রাটি শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে যদি ডান দিকে পড়ে তাহলে নিশ্চিত থাকুন, খোকা হবে। মেয়ের সাধ থাকলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন, মুদ্রাটি যেন বাঁদিকে পড়ে। যেদিকেই পড়ুক, হতাশ হবেন না, দুঃখ করবেন না, সামনে আরও সুযোগ রয়েছে। এক মাঘে শীত পালায় না। ফরাসি সরকারও আমাদের সরকারের মতন নির্লজ্জ নয়, পাবলিককে নাসবন্দি করার জন্যে সারাক্ষণ তাকে তাড়া করছে না। হোক না বেবি। জাতের একদম বাড় নেই, বেবি হলে খুশি ফরাসি সরকার।

তারপর মা ষষ্ঠীর (থুড়ি, মা মার্গারেটের) দয়ায় বেবি তো ভূমিষ্ঠ হলো। ছেলে হলে একটু আনন্দের বাড়াবাড়ির জন্যে বাঙালি মায়ের বদনাম। যাও না বাপধন ফরাসি গাঁয়ে—দেখবে চার্চের ঘণ্টা বাজছে মা ষষ্ঠীকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে। ছেলে হলে বাজবে বড় ঘণ্টা, মেয়েদের জন্যে ছোট ঘণ্টা। খোকা হলে এক-এক ধাক্কায় তিনবার শব্দ, মেয়ে হলে মাত্র দু'বার শব্দ। এদেশে ধম্মোবাপ বলে একটা জিনিস আছে, যা আমাদের নেই। এই গড্‌ফাদারের কিছু খরচাপাতির দায় আছে। চার্চে কতক্ষণ মা মার্গারেটের জয়ধ্বনি হবে তা নির্ভর করবে উনি কী রকম ভাবে গাঁট আলগা করছেন। যদি একটু দরাজ হাত হন তাহলে গাঁয়ের মন্দিরের (থুড়ি চার্চ) ঘণ্টা এক হপ্তাধরে ঢং ঢং করে বাজবে, লোকে জানবে কোল আলো করা খোকা অথবা খুকু এসেছে কারও ঘরে। মা ষষ্ঠী ওকে বাঁচিয়ে রাখো। বড় হয়ে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করুক এই বেবি। সবাই প্রার্থনা করবে।

আটকড়াই, অন্নপ্রাশন ইত্যাদির কাছাকাছি উৎসব ফরাসিদেরও আছে। এই সময় বেবি যেসব ঝলমলে জামাকাপড় পরে তা দেখলে বাঙালি মায়ের বা দিদিমার আর কোনও লজ্জা থাকবে না। অন্নপ্রাশনে টোপর শুধু বাঙালিরাই পরায় না, বিশ্বাস না-হলে টিকিট কেটে যাও ফরাসি গাঁয়ে। বেবিরা ওখানে যে টোপর পরে তার নাম 'অবেট', এর রং হয় শাদা। শুভকাজের পর এই অবেট খুব যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়। মা মার্গারেট দয়া করলে আবার এই টোপর বের করা হবে, পরানো হবে পরবর্তী নবজাতককে।

এরপর খোকা অথবা খুকু একটু বড় হয়ে উঠেছে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন। কিন্তু খুব সাবধান হতে হবে এই পর্যায়ে, আপনাকে দেখতে হবে কোনও ক্রমেই যেন বেবি হাঁটতে-হাঁটতে টেবিলের তলায় চলে না যায়। এর বিপদ ভীষণ! বেবির বাড় বন্ধ হয়ে যাবে, ভীষণ বেঁটে ছেলে অথবা মেয়ে নিয়ে আপনাকে সারা জন্ম দুঃখ করতে হবে। কতগুলো গাছ আছে, যার তলা দিয়েও শিশুদের হাঁটা বারণ, ওই একই বিপদের আশঙ্কায়। তালিকা জানতে হলে হেনরির মায়ের সঙ্গে আপনাকে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

আসুন এবার, খোকাখুকুর চুল ও নখ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বাবা তারকনাথের জন্যে শিশুর চুল দোর ধরা থাকলে বাঙালি মায়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি নিয়ে সমালোচনা হয়। অনেক ফরাসি অঞ্চলে একবছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুর নখ কাটা বারণ। অনেক গাঁ আছে যেখানে সাতবছর পর্যন্ত নো নখ কাটা। আর নখ যদি কাটতে হয়, দয়া করে কাঁচি বা নরুন আনবেন না। কাজটি সারতে হবে গর্ভধারিণী জননীকে নিজের দাঁত দিয়ে। কাঁচি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু ছেলে বা মেয়ে যদি চোর অথবা দুশ্চরিত্র হয় তার জন্যে সমস্ত দোষটা আপনারই হবে। এই একই কারণে বহু গাঁয়ে ছ'বছর পর্যন্ত চুল কাটা বারণ। হোক না একটু

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোরের-মা হওয়া থেকে ঝাঁকড়া চুল ছেলের-মা হওয়া যে অনেক ভাল তা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

ছেলেমেয়ের জন্যে প্রচণ্ড চিন্তা করলেও ফরাসিরা ছোটদের ট্যাং-ট্যাং করে কথা শোনায়। আমেরিকানদের মতন বাচ্চাদের লাই দেয় না ফরাসি বাপ অথবা মা। একটু ঠেকা দিয়ে, একটু ব্যঙ্গ করে পরস্পরের মধ্যে কথা বলাটা ফরাসি স্বভাব। এটা বিদেশিরা প্রায়ই বুঝতে পারে না। তারা ভুল বুঝে অপমানিত বোধ করে, ভাবে ফরাসি ইচ্ছে করেই পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাচ্ছে। এই ট্যাং-ট্যাং কথাবার্তার শুরু জীবনের আদি পর্বে। ছেলে যখন খিদে পেয়েছে বলে ঘ্যান-ঘ্যান করছে তখন তার উত্তরে ফরাসি যা প্রায়ই বলে থাকে তা শুনলে ইংরেজ অথবা মার্কিনী মা, কিংবা আমাদের এই প্রজন্মের 'সানন্দা'-জননীরা ভিরমি খাবেন! খোকা অথবা খুকু যখন খাবো-খাবো করে আব্দার করছে, তখন ফরাসি জননী ব্যঙ্গ করে বলছেন, "এখন নিজের একটা হাত খাও আর একটা হাত রেখে দাও কালকে খাবার জন্যে!"

ফরাসি জননী যে তাঁর শিশুটিকে কারও থেকে কম ভালবাসেন তা নয়। কিন্তু তাকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে যখন-তখন মিথ্যে কথা বোলো না, অযথা আব্দার করে পরনির্ভরতা বাড়িয়ো না। ছিঁচকাঁদুনে হয়ো না। বাছা, তোমাকে এই দুনিয়াতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং তার শিক্ষা এখনই শুরু হওয়া দরকার।

ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে ছোটদের শক্ত করে গড়ে তোলবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে মারামারিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। নতুন সমবয়সী ছেলে দেখলে তাকে চকোলেট দিয়ে আদর করার চেয়ে লড়ে যাও এক হাত, হয়ে যাক কিছু কিল চড়ের বিনিময়। এক শহরের বাচ্চার সঙ্গে আরেক শহরের বাচ্চাদের লড়াইয়ে অনেক সময় উৎসাহ দেওয়া হয়। একপাড়ার ছেলের সঙ্গে আরেক পাড়ার ছেলের মারামারিতে খবর শুনে যেসব বাঙালি চিন্তানায়ক দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা বোধ করেন তাঁরা জেনে রাখুন বছরের তিনটি নির্ধারিত দিনে (রোগেশন ডে) কোনও জায়গায় দুইদল ছেলে নিজেদের মধ্যে ঢিল ছোড়াছুড়ি করে। দু' একটা জায়গায় দু'পাড়ার ছোঁড়াদের প্রচণ্ড মারামারি হাতাহাতি দেখবার জন্যে বহু লোক জড়ো হয়। তাদের উত্তেজনা থেকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মোহামেডান স্পোর্টিং-এর সাপোর্টারেরা কিছু টেকনিকাল ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন।

এবার আসুন বিয়ে সাদি ও সম্বন্ধের বিষয়ে। আমার এক বন্ধু ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হন যখন শোনেন বরিশালের পাত্রের জন্য বাবা-মা বরিশালের পাত্রী খোঁজেন। ঢাকার লোকেরা এখনও কলকাতায় বসে ঢাকার পাল্টিঘর পেলে ভীষণ খুশি

হন। খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী স্তম্ভে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে যাঁরা সারিডন খান তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, জাতীয় সংহতি এতে গোল্লায় যায় না। অন্য জাতের স্বামী অথবা স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুলেই সংকীর্ণতা কেটে যায় না।

একটা পুরনো ফরাসী প্রবাদ আছে : "বউ এবং গোরু নিজের গাঁ থেকে সংগ্রহ কোরো।" ব্যাপারটা এখন ঠিক গাঁয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলেও এক অঞ্চলের ফরাসি বড় শহরেও সেই অঞ্চলের এক ফরাসিনির সাক্ষাৎ পেলে একটু ভরসা পায়, একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এর মধ্যে সংকীর্ণতা নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে-লোক নিজের গাঁকে ভালবাসতে পারলো না সে আবার কী করে পুরো দেশটাকে ভালবাসবে? নিজের গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করে, নিজের গাঁয়ের গাইয়ের দুধ খেয়েও সারা দুনিয়াকে ভালবাসা যায় যদি মনে কোনও হিংসে না থাকে, পাপ না থাকে, ভয় না থাকে, অভিমান না থাকে।

থাকগে ওসব বড়-বড় কথা। যে দুনিয়াকে ভালবাসবে সে কারও লেকচারের জন্যে অপেক্ষা করবে না। এর জন্যে এম-এ পি-এইচ-ডি মহাপণ্ডিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস না হলে কামারপুকুরের গদাধর চাটুজ্যের লাইফ পড়ে দেখুন। ওঁর ওয়াইফ সারদামণি চাটুজ্যের জীবনটাও নেড়ে চেড়ে দেখুন। অন্তত বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে যান। ছোট্ট জায়গায় জীবন কাটিয়েও কী করে সমস্ত মানুষ জাতটাকে ভালবাসতে হয়, অপরিচিত অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞান করতে হয় তা শিখে আসুন গরিব চাষা, কামার, গরিব দোকানির কাছে।

আমাদের মেয়েরা ভাল স্বামীর জন্যে শিবরাত্রি করে, না খেয়ে না দেয়ে সারারাত জেগে থাকে ঘুমকে তাড়িয়ে। তারা ব্রত করে, মন্দিরে যায়, বাউনকে খাওয়ায়, ফল উপহার দেয়। এইসব দেখে যেসব ইংরিজি-জানা এগারো-আনা মেমসায়েবরা হায়-হায় করেন তাঁরা শুনুন বিশ্ববন্দিত ফরাসি ললনারাও এইসব ব্রত পালন করতেন এবং এখনও করেন।

ধরুন ১লা মে'র কথা। মে দিবসের নাম করে আমরা হাত গুটিয়ে ছুটি উপভোগ করি। অপেক্ষাকৃত কর্মঠরা ছোটেন মনুমেন্টের তলায় সর্বহারার সামিল হয়ে বস্তাপচা বক্তৃতা শোনার জন্যে। (হে ভগবান, আমাদের দেশের নেতাদের একটু বক্তৃতা শেখাও, ওঁদের একটু হোমওয়ার্ক করতে বলো। এতো খারাপ একঘেয়ে ছেঁদো কথা দুনিয়ার আর কোথাও জনগণের ওপর এই ভাবে বর্ষণ করা হয় না।)

যা বলছিলাম, ওই ১লা মে একটি প্রাচীন মেয়েলি ব্রত হলো 'মে রোপণ'। কী ধরনের স্বামী সে চাইবে বা পাবে তার জন্যেই এই ফরাসি ব্রত। ঐদিন আমরা যখন মে দিবসের নাম করে সকাল সাতটা পর্যন্ত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছি তখন

ফরাসি গাঁয়ের মেয়ে সূর্যোদয়ের আগে শয্যাত্যাগ করবে। হাতে থাকবে একটি জলের কমণ্ডলু এবং হথহর্ন গাছের ছোট্ট একটি ডাল। সূর্য ওঠার আগে ফরাসি ললনা হাজির হবে ঝরনার ধারে। এবার এই ব্রতচারিণী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রার্থনা করবে এবং হথহর্ণ গাছের ডালটি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। তারপর শূন্য কমণ্ডলু পূর্ণ করতে হবে ঝরনার জলে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঐ জল নাড়তে হবে এবং মন্ত্র পড়তে হবে। নিতান্তই গোপন মন্ত্র। কিন্তু যেসব পাঠিকা এই ব্রত এদেশেও চালু করতে উৎসাহিনী তাঁদের নিরাশ করে লাভ নেই। খুব সোজা মন্ত্র—'আমি! র‍্যাবি! ভ্যানি!'

এই তিন শব্দের কী শক্তি থাকতে পারে যাঁরা জিজ্ঞেস করবেন তাঁদের কাছে করজোড়ে নিবেদন—ফরাসি তো ভারতের মতন অজ্ঞান তমসান্ধকারে নিমজ্জিত কুসংস্কারপূর্ণ সভ্যতার অংশ নয়। এই মন্ত্র পড়ে ফল হয়েছে বলেই তো শত শত বর্ষ ধরে এই ব্রত চালু রয়েছে।

দাঁড়ান, সব শেষ হয়নি। ভেবে বসবেন না, তিনবার 'আমি, র‍্যাবি, ভ্যানি' বললেই ভবিষ্যৎ স্বামীর মুখটি আপনি দেখতে পাবেন মনের টিভি পর্দায়।

এতোক্ষণে সূর্য নিশ্চয় উঠতে শুরু করেছে। এইবার সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে শান্তভাবে গুনে গুনে ন'বার ঐ মন্ত্র পড়তে হবে। যদি উচ্চারণ নির্ভুল হয়ে থাকে, যদি কেউ কুমারী কন্যাকে ঐ ব্রত পালনের সময় দেখতে পেয়ে না থাকে, পথেও যদি কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় না হয়ে থাকে, তাহলে আর কোনও চিন্তা নেই। মা লক্ষ্মী, এবার ভক্তিসহকারে জলের পাত্রের দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখো। ঐ জলে তোমার ভাবী স্বামীদেবতার ছবি দেখতে পাবে।

মিসেস ডুরে বললেন, "তুমি চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমি বই থেকে কিছু প্রবন্ধের ফটোকপি দিয়ে দেবো, যাতে কেউ না তোমাকে অবিশ্বাস করে।"

আমি বললাম, "তাহলে খুব উপকার হয়। আপনার দেশাচারের সঙ্গে আমার দেশাচারের খুব মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।"

মিসেস ডুরে বললেন, "আমার মনে হয়, নতুন যুগের ইউরোপীয় মেয়েরা তোমাদের মেয়েদের ব্রতকথা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হবে। ঠিকভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে হয়তো দেখবে সারা দুনিয়ার সুন্দরীরা তোমাদের মতই শিবরাত্রি পালন করছে। পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে ভাল স্বামী চায় না বলো?"

আমি ভাবলাম, একজন বাঙালি প্রচারকের অবিশ্বাস্য প্রচেষ্টায় দুনিয়ার অনেকে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ হরে-হরে করে উদ্দাম নৃত্য করছে নিউইয়র্কে, টরন্টোয়, লণ্ডনে, প্যারিসে। কিন্তু লর্ড শিভা এখনও তেমন কল্কে পাচ্ছেন না। একটু চেষ্টা চালাতে হবে। ফরাসি মালক্ষ্মীদের দিয়ে শুরু করতে পারলে মন্দ হয় না। ওঁরা যদি একবার এই শিবরাত্তিরের উপোসটা শুরু করে দেন তখন কে আমাদের

দেখে?

আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে এইসব মালক্ষ্মীদের ভুজিয়ে ভাজিয়ে তারকেশ্বরে হাজির করা। তারকেশ্বর একবার ক্লিক করলে কে তখন আমাদের দেখে! কারণ মালক্ষ্মীরা তো একা আসবেন না। তাঁদের সঙ্গে বা পিছন-পিছন আসবেন ওঁদের শিবঠাকুর সায়েবরা। সুতরাং তারকেশ্বরের চারদিকে গজিয়ে উঠবে অন্তত শতখানেক হোটেল। ইণ্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের নাম করে শুধু কামার, ছুতোর, পোটো এবং গাইয়েদের বিদেশ দেখালে চলবে না। দেখাতে হবে দেশাচার, সৃষ্টি করতে হবে অনন্তকালের মায়ামোহ।

অর্থাৎ দেশে গিয়েই আমাকে ফরাসি ভাষা শিখতে হবে এবং লিখতে হবে আমাদের আচার সম্পর্কে একটা রচনা।

সুরসিকা মিসেস ডুরে আমাকে নিরুৎসাহ করলেন না। বললেন, "আপনি যা করবেন তার জন্যে রইলো আমাদের আগাম সমর্থন।

স্নেহময়ী হেনরি-জননী শ্রীমতী ডুরে আমায় আদর যত্ন করে চলেছেন। ফরাসির বর্ণবিদ্বেষ আছে কি না তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অন্যবর্ণের বিদেশিকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেশছাড়া করবার জন্যে ফরাসি সরকার এবং নাগরিক তেড়ে- ফুঁড়ে লেগেছে, ফরাসি পুলিশ তো আফ্রিকা ও আরবদেশের লোকদের জীবন দুর্বিষহ করবার জন্যেই জন্মেছে, কিন্তু সেই ফরাসি যখন নাটক দেখতে যায়, ব্যালের টিকিট কেনে তখন কালো শরীরের নায়িকা না দেখলে তার মন ভরে না। মুলাঁ রুজের যে বিখ্যাত ক্যান ক্যান ও নৃত্য প্রদর্শনী বহুবছর ধরে চলছে তার মধ্যমণি কোনও না কোনও কালা রমণী।

কালা রমণীর শরীরের প্রতি চাপা টান লুকিয়ে আছে ফরাসি পুরুষের অন্তরগুহায়। আর ব্যবহারে তো কথাই নেই। কিন্তু এই যে হেনরি-জননী আমার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করছেন তার মধ্যে নিখাদ মা-মাসির ভালবাসা ছাড়া কিছুই নেই। সৌন্দর্যের সঙ্গে একটু স্নেহসুধা না-মিশলে ভুবনমোহিনী হওয়া যায় না, সাধে কি আর ফরাসিনির সান্নিধ্যের জন্য দুনিয়া এতো উদ্বেল।

শ্রীমতী ডুরের সঙ্গে ফরাসি ঘরকন্না, বিয়েসাদি সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, হেনরির বাবার কাজ থেকে ফিরতে আরও একটু দেরি রয়েছে, সুতরাং দ্বিধা কোরো না, যা জানবার আছে জেনে যাও। অতএব আমি নোটবই বন্ধ করছি না। বাড়তি খবর পাবো বলে কাল সকালে দু'একটা প্রবন্ধের ফটো কপি হেনরি আমাকে দিয়ে দেবে।

প্রেমের নানা কৌশলে ফরাসি পারদর্শিতার খ্যাতি বিশ্ববিদিত। জার্মান, ইংরেজ তো মেয়ে পটানো ছাড়া বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু ফরাসি জানে প্রকৃত

প্রেমের ভাষা। যেমন আমরা জানি ভক্তির ভাষা। রমণীকে জননী হিসাবে পুজো করার ব্যাপারে আমরা দুনিয়ার একনম্বর, কেউ আমাদের নখের যুগ্যি নয়।

কিন্তু প্রেমের প্রকাশ? মনের মধ্যে প্রেম এলে ফরাসি প্রথমেই বাঙালির মতন গুন-গুন করে গান ভাঁজে না, বা পদ্য লেখে না, বা চিঠি পোস্ট করে না। ফরাসি তার উরুটি দিয়ে ফরাসিনির উরু স্পর্শ করে সিগন্যাল পাঠায়। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, রমণীর ঊর্ধ্বাঙ্গ নিয়ে ফরাসির তেমন মাথাব্যথা নেই, যত কৌতূহল ও আকর্ষণ তার নিম্নাঙ্গে—নিতম্বে, উরুতে, পাদপদ্মে। বক্ষদেশ নিয়ে যত মাতামাতি সংস্কৃত সাহিত্যে ও আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্যে তার সিকিভাগও উৎসাহ নেই ফরাসির। বরং প্রবলাপয়োধরাদের প্রতি ফরাসি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে 'নর্মাণ্ডির গাভী' বলে একটি গালাগালির মাধ্যমে।

প্রেমের প্রকাশের ব্যাপারে নানা আঞ্চলিকতার সংবাদ সংগ্রহ করা গেলো। শুনুন মশাই, প্রেমিকাকে দেখে 'আমার ভুবনে বসন্ত নাই' ইত্যাদি বলে গান ভাঁজতে বসলে ফরাসি গাঁয়ে তেমন কোনও লাভ হবে না। একটি অঞ্চলে (মোরভাঁ) পরস্পরের ঘাড়ে অথবা পিঠে একটি চড় মেরে বিজ্ঞাপিত করতে হবে প্রথম প্রেমের প্রকাশ। আর একটি অঞ্চলে মেয়েটির হাত পাকড়াও করে একটু নিপীড়ন করতে হবে যতক্ষণ না সুন্দরী সায় দিচ্ছেন এবং কোলে বসে পড়ছেন। বললাম, আমাদেরও একসময়ে পাণিপীড়ন বলে একটা কথা ছিল, আজকাল লোকে অবশ্য তার মানে বুঝতে পারে না। হেনরি-জননী খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন, বাঙালিরাই যে ফরাসি ছিল তার আর একটা প্রমাণ তাহলে পাওয়া গেলো!

কুইসপার বলে একটি অঞ্চলে প্রেমপ্রকাশের রীতি হলো পরস্পরের কাঁধে চপেটাঘাত। কিন্তু তার থেকে কিছু দূরেই আর একটি অঞ্চলে চপেটাঘাত অচল। সেখানে প্রয়োজন হ্যাণ্ডশেক, যার বাংলা কী করে করমর্দন হলো তা ভাষাবিদরাই বলতে পারেন। শেক মানে তো ঝাঁকনি, ইদানীং তো 'শেক' বলতে বোঝায় সরবত।

ব্রিটানি বলে একটি অঞ্চলের কথা দুনিয়ার সবাই শুনেছে। অমন যে অমন গ্রেট ব্রিটেন সেও নিজের নামটা টুকলিফাই করেছে এই অঞ্চল থেকে। সেখানে প্রেম প্রকাশ করতে হলে যা করতে হবে তা বলতে হাওড়া-কাশুন্দের রকবাজরাও লজ্জা পাবে। ওখানে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের মুখের দিকে থুতু ছোড়ে। বুঝুন ব্যাপারটা! বঙ্গীয় সমাজে এই ফরাসি আদব ইমপোর্ট করলে থানার মেজবাবু পাড়ার কোনও ছেলেকে আস্ত রাখবেন না! মেজবাবুর এ-ব্যাপারে উৎসাহ না-থাকলেও মুক্তি নেই, তাঁর পিছনে লাগবে কাগজের সম্পাদক—প্রতিদিন সম্পাদকীয় স্তম্ভে গরম-গরম আর্টিকেল লিখে প্রমাণ করে দেবে দেশ

গোল্লায় যাচ্ছে অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়!

বেশ বাপু, থুতু তোমার অপছন্দ, তোমার ধারণা প্রেম ব্যর্থ হবার পরেই যত থুতু ছোড়াছুড়ি হয়ে থাকে। তা হলে ব্রিটানি ছেড়ে চলো অন্যত্র—ফরাসিদেশ তো মোনাকো নয় যে পাঁচপা এগোলেই অন্য দেশের সীমান্ত অতিক্রম করলে। অনেক জায়গা রয়েছে ফরাসি দেশে নানা আচারের জন্যে।

প্রেমের ব্যাপারে আপেল, ডালিম, আঙুর থেকে বাতাবি লেবু পর্যন্ত নানা ফলেরও ভূমিকা রয়েছে। রমণী অঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় নানা ফলের ওপর নির্ভর করেছেন মহাকবি কালিদাস থেকে আরম্ভ করে কবিশেখর কালিদাস রায় পর্যন্ত। প্রেমের ইঙ্গিত হিসাবে ফরাসিরা কোনও-কোনও অঞ্চলে তাই আপেলের শরণাপন্ন হয়। সোজা কাজ, একটা আপেল একটুখানি খেয়ে অন্যপার্টির দিকে এগিয়ে দেওয়া, সেই অর্ধভক্ষিত আপেলে আর একটি কামড় পড়লেই প্রেমের সার্কিটের পরিপূর্ণতা—এবার যাকে বলে কিনা চালাও পানসি রোখে কে!

ঢিল অথবা ইট ছোড়ার ব্যাপারে বাঙালি এবং ফরাসি দু'জনেই সিদ্ধহস্ত—এ বলে আমাকে দ্যাখ, ও বলে আমাকে দ্যাখ। শুধু তফাত, ঢিলটা বাঙালি ব্যবহার করে রাগ প্রকাশের জন্যে আর প্রভেন্স অঞ্চলের তরুণীরা ঢিল ছোড়ে প্রিয়তমের দিকে অনুরোধ প্রকাশের জন্যে। এই ব্যাপারটা বঙ্গবালারা নোট করতে পারেন, আত্মনিবেদন ও আত্মরক্ষার এমন টু-ইন-ওয়ান ব্যবস্থা থানার মেজবাবুর সম্মতি লাভ করবে অবশ্যই।

উর্ধ্বাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ হলে নর্মাণ্ডির গাভীর সঙ্গে রমণীর তুলনা পুরুষ ফরাসির প্রিয়কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছি, কিন্তু নর্মাণ্ডির লোকরা প্রেমের প্রকোপে প্রিয়ার ঝুড়ি বহন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তল্পিবহন করাটা আমাদের দেশে এক ধরনের গালাগালি, কিন্তু ফরাসিতে নয়। আরও একটি অঞ্চলে তরুণ প্রেমিক অত ভার বহন করতে চায় না—সেখানে স্রেফ দিদিমণির ছাতাটি সে তুলে নেয় বহন করবার জন্যে। এখানে এ-ব্যবস্থা চালু করা যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ ট্রামে-বাসে ছাতাচোর হাতেনাতে ধরা পড়লেও মেজবাবু কোনও কঠিন ব্যবস্থা নিতে পারবেন না।

বিবাহের দীর্ঘ জটিল পথে প্রেমের সবুজ সঙ্কেতেই সব নয়। একসময় পছন্দমত মেয়েটিকে বিবাহপ্রস্তাব দিতে হবে। এই কাজটির ব্যাপারে ফরাসি শত-শত বছর ধরে মাথা ঘামাচ্ছে। সেই হিসাব পেয়ে আমার মাথা ঘুরছে—যস্মিন দেশে যদাচার বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না, এ-যুগে এক দেশের মানুষ অপর দেশের শ্রেষ্ঠ আচারকে গ্রহণ করছে নত মস্তকে এবং বিপুল আগ্রহে।

ফ্লানডার্স, লাইমুজিন প্রভৃতি অঞ্চলে ছোকরা প্রেমিককেই মেয়ের বাপের

দ্বারস্থ হয়ে নতমস্তকে প্রস্তাব পেশ করতে হবে। কিন্তু গ্যাসকনি, ব্রিটানি অঞ্চলে ছোকরাকে ব্যস্ত হতে দেখলে মেয়ের বাবা মোটেই সন্তুষ্ট হবেন না, তিনি প্রত্যাশা করবেন ছেলের বাবাকে। যারা দেশাচার জানে তারা হাঙ্গামা না বাড়িয়ে স্বয়ং পিতৃদেবকে ভাবী শ্বশুরের কাছে ঠেলেঠুলে পাঠাবে।

আরও একটি অঞ্চলে কাজটি সারতে গেলে অভিনয়দক্ষতার প্রয়োজন। সেখানে প্রেমিক হাজির হবে ভাবী শ্বশুরশাশুড়ির কাছে এবং হাউহাউ করে কাঁদতে লাগবে—আমার বাবা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে...যার বাবা মা বহাল তবিয়ত তার এই স্পেশাল সুবিধে নেই। সে বলবে, ফসলের অবস্থা এবার খুব খারাপ, গাইবাছুরের অবস্থা কহতব্য নয়—এবার তার চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াতে শুরু করবে। প্রত্যুত্তরে যদি প্রেমিকার বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন তা হলে বুঝতে হবে ওষুধ ধরেছে, এঁরা তাকে জামাই করে নিতে রাজি হয়েছেন। আবার একটি অঞ্চল আছে যেখানে পাত্রী নিজেই আত্মীয়স্বজনপরিবৃতা হয়ে প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন এবং প্রস্তাব পেশ করেন।

আর লিপ ইয়ারের কথা তো জানেনই। প্রতি চারবছর অন্তর যেবার ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিন সেবার ওই ২৯শে ফেব্রুয়ারি মেয়েদের দুর্লভ সুযোগ, তারা নিজেরাই ছেলেদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। স্ত্রী স্বাধীনতার এতো বড়াই করে ইউরোপ-আমেরিকা, কিন্তু মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব করার স্বাধীনতা আজও নেই। তারা কেবল প্রস্তাবিত হলে হাঁ অথবা না বলতে পারে।

এই যে বিয়ের প্রস্তাব, এটি দেওয়ার আগে ফরাসি একটু বাজিয়ে নিতে চায়। যদি 'না' শোনার সামান্যতম আশঙ্কা থাকে তা হলে কোন ছোকরা ভাল জামাকাপড় পরে প্রেমিকের বাপের দরজায় কড়া নাড়বে এবং অপমানিত হবে?

যাই হোক, কাছাকাছি গাঁয়ের ছেলের মুখের ওপর না বলে কোন বাপ দুই পরিবারের সম্পর্ক চিরকালে জন্যে বিষময় করে তুলতে চাইবেন? তাই মেয়ের বাপের পক্ষ থেকে মুখে কিছু না বলে সঙ্কেত ব্যবহারের রীতি দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে।

শুনুন দু'একটা নমুনা। মনে করুন আপনি অভার্ন অঞ্চলের এক রূপসীর বাপের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি মন দিয়ে আপনার অনুনয় বিনয় শুনলেন, এরপর আপনি নিতান্ত অসভ্য না হলে তাৎক্ষণিক উত্তর আশা করবেন না। আপনি একটু পরে নজর রাখুন ঘরের ঝাঁটার দিকে। যদি ঝাঁটার বাঁট নীচের দিকে রাখা দেখলেন তাহলে বুঝলেন, আপনার কপাল-মন্দ। এ-বাড়ির জামাই হবার সুযোগ এ জন্মে-হলো না। বেটার লাক নেকস্ট্ লাইফ!

পাত্র পছন্দ না-হলে তাকে ঝাঁটা দেখিয়ে বিদায় করাটা অনেক করুণহৃদয়

বাপের মনে লাগে। তাই প্রায় অধিকাংশ ফরাসি অঞ্চলে অন্যপন্থা। না বাপু, তুমি আমার মেয়ের নখের যোগ্যি নও এই কথা ইঙ্গিতে বলবার জন্যে পাত্রীর বাপ পাত্রের হাতে একটা খালি থলে ধরিয়ে দেন। এই খালি থলে দেখা মানেই, কপাল প্রসন্ন হলো না। আমাদের জুট মিল মালিকদের পক্ষে আনন্দ সংবাদ, কারণ সুন্দরী মেয়ের বাবাদের বাড়িতে ডজন-ডজন খালি থলে স্টক করার প্রয়োজন হতে পারে।

যাঁরা হাতে খালি থলে (অথবা হ্যারিকেন!) ধরিয়ে দিতে পারেন না, তাঁরা কয়েকটি শস্যের দানা এনে প্রস্তাবকারীর পকেটে পুরে দেন। এর অর্থ কপাল পুড়লো।

কিন্তু যদি প্রস্তাব মঞ্জুর হয়? সেখানেও কেউ মুখ খুলে হাঁ বলবে না। তোমার কথা শুনে যদি বসতে বলা হলো তার অর্থ কেল্লা ফতে। অনেক জায়গায় আবার ঝাঁটার শরণ নেওয়া হয়। প্রস্তাবক যেখানে বসেছে তার চারদিক ঝাঁট দেওয়া হয়—অর্থাৎ আগাম জামাই-আদর শুরু হয়ে গেলো।

প্রস্তাব নাকচের যেসব পদ্ধতি রয়েছে তা শিখতে হলে মেয়ের বাপ হিসাবে আপনাকে দীর্ঘদিন ফ্রান্সে শিক্ষানবিশি করতে হবে।

আরও দু'একটা নমুনা নিবেদন করা যাক। পাত্রের প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় মেয়ের বাপ হাতে মস্ত একটা চাবি ধরে থাকেন। যদি তাঁর মনে না ধরে পাত্রকে তা হলে তিনি হাতের এই চাবিটা তিনবার ঘোরাবেন, এরপর আর কোনও এঁড়ে তর্ক চলবে না, মেনে নিতে হবে ব্যর্থতা।

অনেক হাঙ্গামা করে মেয়ের প্রতি মুগ্ধ হয়ে কেউ এসেছে, তাকে পত্রপাঠ বিদায় করাটা অনেক মেয়ের বাপ-মা পছন্দ করেন না। প্রস্তাব শোনবার পর যদি একটা প্লেটে কয়েকটা ডিম আনা হয় তা হলে বুঝলেন কপাল মন্দ। আর যদি আপনার আপ্যায়নের জন্যে আপেল দেওয়া হলো তা হলে বুঝলেন আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। দুনিয়ায় সর্বত্র শুভকর্মে আপেল ন্যাসপাতির এতো কদর কেন তা মনোবিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন।

ডিম মানেই দেখা যাচ্ছে ফরাসি দেশে না। বুরবন অঞ্চলে ডিম সেদ্ধ নয়, ওমলেট খাইয়ে না জানানো হয়।

ব্রিটানিতে মেয়ের বাপ অপেক্ষা মেয়ের নিজেরও বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। সব প্রস্তাব মুখ বুজে শুনে সে যদি না বলতে চায় তা হলে সে অতিথিকে খাওয়াবে পরিজ ও দুধ। আর যদি ব্রথ ও মাংস খেতে দেয় তা হলে বুঝতে হবে—হ্যাঁ।

শ্রীমতী ডুরে বই দেখে এবার বললেন, তোমাকে একটু ভুলই বলেছি। নিভারন অঞ্চলে প্রেমিকারা ওমলেট দেখলে মন খারাপ করে না, ওখানে ওমলেট মানে ইয়েস—চিজ ও জল দেওয়া মানে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

প্রস্তাবে হ্যাঁ বললেই সব হাঙ্গামার অবসান হলো না। আসলে ওইটাই তো কলির সন্ধে! লক্ষ কথা না হলে ফরাসিও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারে না। এই হ্যাঁ বলার পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে পাত্র এবং পাত্রীপক্ষকে ঘন-ঘন পরস্পরের বাড়িতে এবং দীর্ঘসময় ধরে নানা আলোচনায় প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। শুনে বুকে বল আসছে, দুনিয়ার সবচেয়ে নচ্ছার জাত হিসাবে কেবল আমাদের কেন চিহ্নিত করা হচ্ছে বিয়েসাদি উপলক্ষে অন্তত লাখখানেক কথা বলার জন্য এবং দেনা-পাওনা নিয়ে নির্লজ্জ আলোচনা করার জন্যে। সবিনয় নিবদন। ছাপানো বইতে বলছে অনেকসময় ফরাসি বিয়েতে পয়সাকড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়, এবং ওই বিষয়ে মতৈক্য না হলে আলোচনা ভেঙে পড়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা যাকে 'পাকা দেখা' বা 'আশীর্বাদ' বলি তাও আছে ফরাসি গাঁয়ে। ইংরেজের মতন হাড়কিপ্টে অসামাজিক নয় ফরাসি বাপ, সুতরাং 'বিট্রোদাল' অনুষ্ঠান উপলক্ষে অবশ্যই কিছু খরচাপাতি করার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাকা দেখা ব্যাপরটা অনেক সময় আসল বিয়ের মতনই জমকালো করে তুলতে ভালবাসে ফরাসি। ব্যাপারটা কোনও-কোনও অঞ্চলে চার্চে সারা হয় পুরোহিতের উপস্থিতিতে। আশীর্বাদে বাঙালি পুরুতমশাই দেখলে যাঁরা নাক বেঁকান তাঁরা দয়া করে এ-লাইন ক'টা টপকে চলে যাবেন না।

আশীর্বাদের পর মুখে কিছু না দিয়ে কোথায় যাবেন? পাত্র-পাত্রীর মঙ্গল-অমঙ্গল বলে একটা কথা আছে, সুতরাং জুতো এবং মোজার ধুলো দিন পাত্রীর বাড়িতে। সেখানে হবু জামাইয়ের নাম করে একটা আস্ত বাছুর বা গোরু রোস্ট করা আছে। দই সন্দেশে ফরাসির তেমন রুচি নেই, তার বদলে থাকবে ওয়াইন, ব্রাণ্ডি ইত্যাদি।

পানভোজন পর্ব যখন বেশ জমে উঠবে তখন ছেলের বাপের কিছু ভূমিকা থাকবে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাবী বেয়াই অর্থাৎ মেয়ের বাপকে কাছে ডাকবেন এবং সকলের সামনে তাঁর 'প্রতিশ্রুতি' পালন করবেন—তাঁর হাতে তুলে দেবেন একটা বই, আংটি এবং কিছু রুপোর টাকা। মেয়ের বাপ সেগুলো নিজে গ্রহণ করবেন না, তিনি সেগুলো সটান মেয়ের সামনে রাখবেন। এবং এইবার সেই বহুপ্রতীক্ষিত নাটকীয় মুহূর্ত।

বিয়ের সময় জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্তে আমাদের দেশের মেয়েরা কাঁদে বলে আমাকে কত গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ইংরেজ, আমেরিকান এবং আধা-ইণ্ডিয়ান সায়েবদের কাছে। কিন্তু ফরাসি সংবাদে বুকটা জুড়িয়ে গেলো।

মেয়ের বাপ যে-মুহূর্তে বেয়াই মশাইয়ের দেওয়া উপহারসামগ্রীগুলো মেয়ের সামনে রাখলো অমনি ফরাসি মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাঙালি মেয়ের মতনই সে বুঝতে পারে তার পিতৃগৃহবাস এবার সত্যিই শেষ হতে চলেছে। সেই কালিদাসের আমল থেকে পতিগৃহযাত্রা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে এক দুঃখময় অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। দুনিয়ার অন্যত্র এর পুনরাবৃত্তি না দেখ মনটা অতৃপ্ত হয়েছিল, এতো দিনে ফরাসি দেশে এসে আমার শান্তি হলো।

যার পাকা দেখা হলো তার তো সমস্যা মিটলো। কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে মেয়ের জন্য কোনও প্রস্তাব এলো না তার মা-বাবা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন? আর ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকবেন? ফরাসি বাবা-মা এ-বিষয়ে আমাদের থেকে একটু এগিয়ে। মেয়েকে নিয়ে রবিবারে তিনি হাজির হন চার্চের পুরুতঠাকুরের কাছে। মেয়েরা নিজেরাও এই পথ বেছে নিতে পারে। পুরতমশাই অভিজ্ঞ মানুষ, যজমানের মেয়ে আইবুড়ো থাকুক, অরক্ষণীয়া হয়ে উঠুক তা তিনি অবশ্যই চাইবেন না। তাই পালপিট-এ তুলে পুরুতমশাই পাত্রীর গুণের ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করবেন, সেই সঙ্গে যৌতুক সম্বন্ধেও লোভনীয় টোপ ফেলবেন। তারপর মন্তর পড়বেন—'তি লা তি, সা দোনজেলা অ পারুদা'। এই মন্তরের অর্থ উপস্থিত সবাই সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে নেবেন—এই মেয়েটির বিয়ে করে ঘরসংসার পাতার সাধ হয়েছে!

চার্চে ঘোষণা সত্ত্বেও যদি গাঁয়ের মোড়লদের টনক না নড়লো তা হলে কিং কর্তব্যম্? লজ্জার মাথা খেয়ে আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম।

মিসেস ডুরের কাছে জানলাম, খোদ প্যারিস শহরেই পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন ঢালাও করে ছাপবার জন্যে কয়েকখানা কাগজ আছে। তাদের প্রচার সংখ্যা আমাদের রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের মতন লক্ষ-লক্ষ নাও হতে পারে, কারণ গোটা দেশে ক'টাই বা আইবুড়ো ছেলেমেয়ে বিয়ের জন্যে ধড়ফড় করছে?

মিসেস ডুরে যুগ যুগ জিও! উনি এবারে'ও আমাকে ছাপানো বই থেকে জেরক্স কপি উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গুজবে কান দেওয়ার প্রয়োজন নেই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, ছাপানো বইয়ের পাতা থেকে দেখে নাও, পেটে একটু ফরাসি বিদ্যে থাকলে নিজেই বিজ্ঞাপনগুলো বাছবিচার করতে পারতে।

বিখ্যাত ফরাসি কাগজে সেই ১৮৯২ সাল থেকে একটানা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। চাকরি-সন্ধানের সঙ্গে মানুষ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বামী অথবা স্ত্রী-সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে যার পশ্চিমি প্রতিশব্দ 'সন্ধান' নয় 'শিকার'! এই পত্রিকা বকামো করার জন্যে সঙ্গী-সন্ধানের বিজ্ঞাপন নিতে আগ্রহী নয়। সুতরাং বিয়ের ইচ্ছা না থাকলে বিজ্ঞাপন দেওয়া বারণ।

বিজ্ঞাপনের নমুনা ঃ "চৌত্রিশ বছরের পাত্রর বয়স্থ বাবা-মা সম্বন্ধ করে

ছেলের বিয়ে দিতে আগ্রহী। পাত্র লম্বা, রোগা, নিজস্ব বাটি ও সম্পত্তি, স্থায়ী চাকরি, প্রাইমারি শিক্ষা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত। বিবাহের মাধ্যমে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। পাত্রীর বয়স তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সাতচল্লিশ বছরের পাত্র বিজ্ঞাপন দিয়ে এইরকম উত্তর পান। "আপনি নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন যে আপনার বয়সী এক পাত্রের বিজ্ঞাপনের উত্তরে ছাব্বিশ বছরের একটি মেয়ে উত্তর দিচ্ছে। এর কারণ নেই ভাববেন না.... আমার মনে হয়, মানুষ যখন পঞ্চাশের কাছাকাছি আসে তখন তিরিশ বছরের পুরুষের তুলনায় তার অনেক প্রয়োজন কমে যায়। তখন সে স্ত্রীর প্রতি কম বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমি কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কোনও রকম নষ্টামি আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে না।"

এই গেরস্ত সংবাদপত্রে বক্স নম্বরে পাত্রীর ছবি চেয়ে পাঠানো নিষেধ। সুতরাং যাঁরা ছবি না দেখে এগোতে চান না তাঁদের জন্যে আর একটি সংবাদপত্রের দরজা খোলা আছে। এই কাগজে নানা 'খেলানো' বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যাতে বিয়ের চেয়ে সান্নিধ্য, 'স্বপ্নকে সম্ভব' করে তোলা ইত্যাদি নানা ধরনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে থাকে কিছু রসরসিকতা, নিজের বিশেষ ব্যক্তিত্বকে জাহির করে রমণীদের মনোহরণের প্রচেষ্টা।

বিজ্ঞাপনের বিড়ম্বনা নিয়েও লেখকরা কিছু গবেষণা চালিয়েছেন এবং তার ফলাফল পাঠক-পাঠিকাদের হাতের গোড়ায় রয়েছে। চল্লিশের কাছাকাছি এক ডাইভোর্সি মহিলা স্বামী-সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। তাঁর প্রথম উত্তরটি ঝকঝকে হস্তাক্ষরে ছ' পৃষ্ঠার এক চিঠি। উত্তরদাতা বিজ্ঞাপনদাত্রীকে তাঁর অভিজাত প্যারিস ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বহুমূল্য মিং চায়নীজ সংগ্রহের। জানিয়েছেন তাঁর দুটি পিয়ানো আছে। যোগাযোগের পর দেখা গেলো, এঁর বয়স চুয়াত্তর। খুব আদর করে খুব দামি চা খাওয়ালেন এবং তারপর জানালেন নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আসলে তিনি একজন রক্ষিতা খুঁজছেন!

দ্বিতীয় পত্রটি এলো এক বড় কোম্পানির পদস্থ কর্মীর কাছ থেকে। সদ্য স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন না। তিনি জানিয়েছেন সামাজিক, অর্থনীতিক, মানসিক, সাঙ্গীতিক যত ইচ্ছা বা দাবি নববধূর থাকতে পারে তা তিনি পূরণ করতে প্রস্তুত। ভদ্রলোক জানতে চেয়েছেন, প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি কী ধরনের ড্রেশ পরলে পাত্রী খুশি হবেন তা যেন অকপটে জানানো হয়। কারণ ফিটফাট থাকার দিকে পাত্রের নজর এবং একজন মহিলাকে সম্মান জানানোর জন্যে তাঁর রুচি অনুযায়ী জামাকাপড় পরাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেন। এই ভদ্রলোক চেক সুট ও বো টাই পরে, গায়ে

প্রচুর অ-ডি-কোলন ঢেলে পাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে এলেন। ইনি মুখে হাসি ফোটালেন, তারপর অধৈর্য হয়ে পাত্রীর স্তনের দিকে ঘন-ঘন অস্বস্তিকর দৃষ্টি দিতে লাগলেন এবং সোজাসুজি বললেন, তিনি জীবন থেকে যতরকম সম্ভব মজা পেতে চান। লোকটির মধ্যে সুরুচির অভাব, চোখ দুটো শুয়োরের চোখের মতন এবং তার থেকেও বড় কথা মাথা জোড়া বিশাল টাক। এই টাক ঢাকবার জন্যে প্রেমপর্বে অনেক পরামর্শদাতা পরচুলা পরতে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

মিসেস ডুরে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জানতে চাইলেন, প্রেমের পথে ভারতীয় টাকের ভূমিকা সম্পর্কে। এসব জাতীয় সিক্রেট, বিদেশির কাছে আলোচনা উচিত নয়। কিন্তু মিসেস ডুরে আমাকে অনেক খবর সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন, সুতরাং আমাকে সত্যবাদী হতেই হবে। আমি অস্বস্তির সঙ্গে স্বীকার করলাম, আমাদের মতন গরম দেশে পুরুষের মাথার চুলের তেমন ভূমিকা থাকার যৌক্তিকতা নেই—একমাত্র কোনও কিছু ভুল করলে অনুশোচনায় মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া। কিন্তু প্রেমের পথে এবং দাম্পত্য সুখে এতো বড় অন্তরায় আর নেই। বহু একনম্বর পাত্র স্রেফ এই টাকের প্রকোপে থার্ডক্লাশ পাত্রে পরিণত হয়েছে। স্নেহময়ী শ্রীমতী ডুরে পরামর্শ দিলেন, পরচুলা ব্যবহার করে না কেন?

আমার সবিনয় নিবেদন, পরচুলার থেকে হাজার গুণ ভাল জিনিস আমাদের দেশে ছিল—পাগড়ি। পাগড়ি পরা পাত্রপক্ষ বরের মাথায় কী আছে বা কী নেই তা জানবার সম্ভাবনা কম। যেমন ধরুন, কোনও টোকো শিখের চরিত্র কখনও কি কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে দেখানো সম্ভব হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ভারতীয়রা পাগড়ি পরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছি—এতে কোনও গর্ববোধ নেই। আর পরচুলা? আমাদের কয়েকটা মন্দিরে যে চুল সংগ্রহ হয় তা দুনিয়ার সেরা টেকোরা এমন মোটা দামে কিনে নিচ্ছে যে গরিব ভারতীয় টেকো সম্বন্ধে কারও মাথাব্যথা নেই। যদি পাটজাত পরচুলা, যা এখন কেবল কুমোরটুলির ঠাকুরের জন্যে ব্যবহার হয়, বের করা যায় তা হলে অনেক প্রেম বাস্তবায়িত হবে।

আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিবাহ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। মিসে ডুরে একটু রান্নাঘরে যাবেন শেষ মুহূর্তের তদারকির জন্যে। আমাকে তিনি একটা বইয়ের অংশ পড়তে পরামর্শ দিয়ে গেলেন।

চল্লিশ বছরের এক মহিলা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যাঁর কাছ থেকে উত্তর পেলেন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ। ইয়ংম্যান বলতে যা বোঝায় তাই। সুদর্শন, চমৎকার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ভদ্র এবং চমৎকার কথাবার্তা। দু'জনে কাফেতে গিয়ে ড্রিঙ্ক করলো, তারপর আর এক রেস্তোরাঁয় ভোজন। কিন্তু ফরাসি ছোকরা ছাড়লো না, ডিনারের পর আবার ড্রিঙ্ক। মাত্রাতিরিক্ত পানের ফলে চল্লিশ বছরের মেয়ে নিজেকে অষ্টাদশী ভাবতে লাগলেন। এবং নেশার ঘোরে তিরিশ বছরের তরুণটি

অভিজ্ঞ রমণীদের অভিজ্ঞতার এবং পরিণত বয়সের জয়গান এমনভাবে গাইতে লাগলো যে সঙ্গিনীর সাহস উবে গেলো! বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা মাথায় আবার মনে পড়ে গেলো যে বন্ধুটির চেয়ে সে অন্তত দশ বছরের বড় এবং মিলন মুহূর্ত থেকেই নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা উপস্থিত হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই মহিলা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

আর একটি উত্তর পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। এই লোকটি এগারো বছরের বিবাহিত জীবনের পর ডাইভোর্স মামলা শুরু করেছেন। মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি, কিন্তু পাত্রী অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছেন বিপুল উদ্যমে। ইনি নাকি নিঃসঙ্গতা একদম সহ্য করতে পারেন না, অন্তত সেই রকম লিখেছেন চিঠিতে। আরও জানিয়েছেন তাঁর জীবনের ট্রাজেডি হলো, রমণীর শারীরিক সৌন্দর্য ও হার্দিক স্নেহ কোনওটা ছাড়াই তাঁর চলে না। যখন দু'জনে সাক্ষাৎ হলো, তখন এই ভদ্রলোক তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে কিছু স্বীকারোক্তি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিবেদন করলেন, স্ত্রীর বন্ধুত্ব পেলেই মন ভরবে না, তাঁর প্রয়োজন প্রচণ্ড স্নেহ-ভালবাসা। অতএব ব্যাপারটা আর এগোলো না।

এই মহিলা বিজ্ঞাপন-মাধ্যমে যেসব চিঠি পেয়েছিলেন তার থেকে মনে হয় ফরাসি পুরুষ ভুলে গিয়েছে কী করে প্রেম প্রস্তাব পাঠাতে হয়। অনেক চিঠি ঠিক কোম্পানির ব্যবসাদারি প্রস্তাবের মতন। অনেক চিঠিতে অজস্র বানান ভুল, গ্রামার যেন ফরাসি দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। আসলে চাকরি-সন্ধান ও স্ত্রী সন্ধানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

আমাকে বিস্মিত হতে না দেখে শ্রীমতী ডুরে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন মনে হলো।

বিবাহ সন্ধানে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে ফরাসি যতই হইচই বাধাক, কোনও ভারতীয়কে চমক দেওয়া সহজ নয়, এই কথাটি সবিনয়ে নিবেদন করতে হলো শ্রীমতী ডুরেকে।

স্নেহময়ী গৃহলক্ষ্মীর মতনই মিসেস ডুরে বললেন, "আমার স্বামীর আরও একটু দেরি হতে পারে, তোমরা বরং সোফাতে বসেই সুপ সেবন শুরু করো।" এই প্রস্তাব তিনি করতেন না, যদি আমার ফরাসি ড্রিঙ্কে আগ্রহ থাকতো।

হেনরি-জননী জিজ্ঞেস করলেন, কঠিন পানীয় সম্পর্কে আমাদের কোনও ধর্মীয় বাধা আছে কিনা? সবিনয়ে জানালাম, মোটেই নয়। কয়েকটা পুজো আচ্চার নাম করে বরং ভক্ত ও পূজারিরা কারণপানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দুনিয়ার মধ্যে হিন্দুই তোফা থিয়োরি বের করেছে যে এই সৃষ্টি একদিন অনাদি অনন্ত কারণসাগরে নিমগ্ন ছিল। মিসেস ডুরে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জানালেন, ফরাসি পানীয়-নির্মাতারা শ্যামপেন অথবা ওয়াইনে ঢাকা ভূমগুলের

খবর শুনে পুলকিত বোধ করবেন।

আমরা ভোট দিলাম সুপের বিরুদ্ধে। হেনরির বাবা না-ফেরা পর্যন্ত ডিনার শুরু করার মতন ক্ষুধার্থ আমরা কেউ নই।

অতএব আবার আলাপ-আলোচনা ওই বিজ্ঞপ্তি ও সাধারণ মানুষের আচার-বিচার সম্পর্কে।

ফরাসি বিজ্ঞাপনের আর একটি নমুনা পাওয়া গেলো। "বিরাট চাকুরে, ৪৯, অত্যন্ত সুন্দর, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, সুরসিক এগজিকিউটিভ বিয়ে করতে চান অতীব সুন্দরী ও সুরুচিসম্পন্না মহিলাকে, যাঁর উচ্চতা অন্তত পাঁচ ফুট ছয় এবং বয়স সাঁইত্রিশের কম।"

এই রকম বিজ্ঞাপনের উত্তরে ভদ্রলোক আশিখানা চিঠি পেয়েছেন, যা তিনি বারবার মন দিয়ে পড়েছেন। নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশির ভাগ চিঠিই তাঁকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছে, কারণ যেসব মিনিমাম গুণাবলীর ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছিল তা না মেলা সত্ত্বেও অনেক মহিলা উত্তর দিয়েছেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভদ্রলোক নিজের সম্পর্কে যা বর্ণনা দিয়েছেন তাও সত্য নয়। মোটামুটি ভাল চাকরি করলেও বিরাট চাকরি ভদ্রলোক অবশ্যই করেন না। প্রকৃত বয়স ছাপ্পান্ন। সুরসিক মোটেই নয়, ওটা তাঁর নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে ধারণা। সবচেয়ে অপ্রিয় যা কথা, বিয়ে করা এই মুহূর্তে ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়! কারণ স্ত্রী রীতিমত বহালতবিয়ত। তবু এই ধরনের কিছু লোক লুকিয়ে-লুকিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের বাজারদর যাচাই করে নেন এবং কখনও-কখনও স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে নিগৃহীত হন।

এই অসুস্থ মানসিকতার কারণ কী? জনৈক লেখক বলছেন, বার্ধক্য আসার সময় বহু ফরাসি পুরুষ ভীষণ ভয় পেয়ে যান, তাঁদের ধারণা বুড়ো হওয়ার থেকে ভয়াবহ ঘটনা পৃথিবীতে নেই। তখন এঁরা নানা রকম স্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং এই সব স্বপ্ন- সুখ মিলিয়ে নেবার অন্যতম পথ হলো কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া। এক্ষেত্রে ভদ্রলোক অতীব সুন্দরী চেয়েছেন তার কারণ তাঁর স্ত্রীর রূপ নেই, মানুষটি নিতান্তই ছোটখাট, তাই স্বামী স্বপ্ন দেখছেন অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা জীবনসঙ্গিনীর।

ডাইভোর্স না-করে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক নয়? আমার এই প্রশ্নে শ্রীমতী ভুরে হাসলেন। ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখছেন, কোনও দীর্ঘাঙ্গিনী দেবপ্রতিমা-সদৃশা স্ক্যানডিনেভিয়ান রমণী তাঁর বিজ্ঞাপনের উত্তর দেবেন। তেমন মনের মানুষ কাউকে পাওয়া গেলে ডাইভোর্স বাধাতে কতক্ষণ? বুড়োবয়সের এই মতিভ্রম শুধু ফরাসির বিশেষত্ব নয়। কলকাতা শহরেও এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি, যিনি প্রতিবছর নিয়মিত লুকিয়ে-লুকিয়ে বক্স নম্বরে

পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন এবং উত্তরগুলি সোজাসুজি সংবাদপত্র অফিস থেকে সংগ্রহ করতেন। এই ভদ্রলোকের অবশ্য একটি গুণ, প্রতিবার তিনি বিজ্ঞাপনে বয়স একবছর এগিয়ে দিতেন এবং দেখতেন এখনও তাঁর সম্ভাবনা আছে কিনা। সত্যের খাতিরে এই ঘটনাটির কথা শ্রীমতী ডুরেকে নিবেদন করতে হলো।

সুরসিকা শ্রীমতী ডুরে বললেন, "যে-ফরাসি বিজ্ঞাপনদাতাটির কথা বললাম, তার বিস্তৃত পরিচয় তুমি পড়ে নিয়ো। হেনরি তোমাকে কাল কপি দেবে। এই লোকটির ছেলেমেয়ে আছে, তবু মাঝে-মাঝে এয়ারপোর্টে যায় সুন্দর শরীরের মেয়ে দেখতে। এঁর স্ত্রীর তো ফরাসি পুরষজাত সম্বন্ধেই খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছে। ওঁর মতে ঃ নিরুত্তাপ হৃদয় এবং আত্মম্ভরিতা হলো ফরাসি পুরুষের জাতীয় দোষ, যেমন আমেরিকানদের দোষ হলো সব ব্যাপারেই উপর-উপর দেখা, অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করার অক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে হিপোক্রিসি বা কপটতা।"

থাকগে বিজ্ঞাপন। কোথায় রয়েছে ঘটক অ্যান্ড কোং? আমাদের দেশে বিবাহবন্ধনে এদের মস্ত ভূমিকা। শুধু গাঁয়ে নয়, শহরেও, গরিব থেকে মস্ত বড়লোক পর্যন্ত অনেকেই কোনও না কোনও সময়ে ঘটকের শরণ নিয়েছেন।

জানা গেলো, ফরাসি ঘটকমশাই ছাতা বগলে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ান না, নিজস্ব আপিস খুলে বসে আছেন, যার নাম ম্যারেজব্যুরো। যেমন দরের পাত্র পাত্রী তেমন ধরনের ব্যুরো। এমন হাইসোসাইটি ব্যুরো আছে যার আপিস অভিজাত অঞ্চলে, সেখানে শুধু জিজ্ঞেস করবে না আপনার গাড়ি আছে কিনা, জানতে চাইবে কোন্ মডেল, প্রমোদ তরণী আছে কিনা? মাইনে বা রোজগার কত? কতটাকা ইতিমধ্যেই জমেছে? এইসব পাঁচতারা ব্যুরোর ফি খুব বেশি, কম রোজগারের মেয়েরা এখানে আসতে সাহস পায় না। অনেক ব্যুরো এ বিষয়ে খুবই প্র্যাকটিক্যাল, তাঁরা সোজাসুজি বলে দেন, যে দরের বর চান সেই রকম ফি দিন। যদি কম পারিশ্রমিকে কাজ সারতে চান তা হলে কম রোজগারের বর নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

একসময় আমাদের হাওড়ার ধোলাই ঘরে অর্ডিনারি, আর্জেন্ট ও এমার্জেন্সি তিনরকম ধোলাইয়ের জন্য তিনরকম চার্জ ছিল। কোনও-কোনও ঘটকব্যুরো এই পথ ধরেই প্যারিসে ব্যবসা করছেন। এরা আর্জেন্ট ফিয়ের বদলে চটপট কাজ সারার জন্য অকুস্থলেই দু'পক্ষের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তার জন্যে ছোট-ছোট খুপরি করা হয়েছে বেশ কয়েকটা। এই ঘরগুলোর আয়তন চারফুট বাই ছ'ফুট। এখানে দু'টি চেয়ার বসানো আছে। এক একজন পাত্র এক সিটিং-এ পরের পর সাতজন পাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। সময় সংক্ষেপ, তাই প্রতি

পাত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ সময় পনেরো মিনিট। এর মধ্যেই যদি মনঃস্থির না করতে পারো, তাহালে বুঝতে হবে বে-থার জন্য তুমি ব্যস্ত নয়, এখনও তোমার মনের মধ্যে কোথাও দ্বিধা আছে। বাঙালিদের অবগতির জন্যে নিবেদন, এক একটি আপিসে এইভাবে প্রতিদিন শ' দুয়েক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। ব্যুরো না বলে কেউ-কেউ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বিবাহের সুপার-মার্কেট অভিহিত করে থাকেন।

ফলাফল? অবশ্যই ভাল, না-হলে এঁরা বছরের পর বছর এইভাবে বুক ফুলিয়ে ব্যবসা করছেন কী ভাবে? ম্যারেজ ব্যুরোর মালিকদের দাবি মদনদেবের দয়ায় শতকরা তিরিশটি ক্ষেত্রে তাঁরা সফল হন। কিন্তু দুর্মুখ ও সন্দেহপ্রবণ সাংবাদিকরা প্রচারে বিভ্রান্ত হতে উৎসাহী নন, তাঁরা লিখে দিয়েছেন সাফল্যের হার শতেকে দু'টি। যদি বলেন তাই বা মন্দ কী, তাহলে অবশ্যই এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

না, মশাই, প্যারিসের ঘিঞ্জি ঘরে ঘটকের অফিসের থেকে ঢের ভাল খোলামেলা গ্রাম—উদার অনন্ত আকাশের নীচে সেখানকার সহজ মানুষদের প্রণয়গাথা। সেখানে বিবাহসংক্রান্ত যেসব ব্যবস্থা আবহমান থেকে চালু রয়েছে তার দাম অনেক। যেমন মহামূল্যবান আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের , এমনকি বিভিন্ন গ্রামের লোকাচার।

কর্সিকার কথা নেপোলিয়নের কৌলতে দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই। ওদেশে ভাবী পাত্র পছন্দ না হলেও শ্বশুরমশাইকে অনেকসময় বাগে আনার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য পাত্রীর গোপন ইচ্ছেটা আপনার পক্ষে থাকাটা প্রয়োজন। কথায় বলে, মাগি মরদ রাজি, কী করবে কাজি?

ওখানে প্রেমের ইঙ্গিতে রুমালের এখনও মস্ত ভূমিকা। প্রেমিকের হৃদয়ে বসন্ত এলে সে গ্রামের পার্কে পদমর্যাদা শুরু করবে হাতে একটি রুমাল নিয়ে। যখন পছন্দসই পাত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া গেলো তখন সেই সুন্দরীও যদি নিঃশব্দে তার রুমালটি দন্তথলিকা থেকে বের করলো তা হলে প্রথম রাউণ্ডেই জয় হলো। এরপর বন্ধুবান্ধবসহ নিয়মিত প্রিয়ার গৃহের সামনে হাজির হয়ে একটু গান বাজনা করা, যতক্ষণ না মেয়ের বাপের কান ঝালাপালা হচ্ছে এবং তিতিবিরক্ত হয়ে তিনি পাত্রটিকে জামাই করতে রাজি হচ্ছেন। একটি নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় হলো 'সিরিনেড', সম্বিতের বাড়িতে ফিরে এসে অভিধানে এর অর্থ দেখি আক্কেলগুড়ুম। বিশ্বাস না হলে আপনিও বই খুলুন ; "প্রেমিকার বাতায়ননিম্নে নৈশসঙ্গীত বা বাদ্যবাদন করিয়া তদীয় চিত্তবিনোদন করা।" 'সিরিন' শব্দটি অর্থবহ ; "শান্ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন, স্থির, ধীর, অনুদ্বিগ্ন।" এইসব গুণে গুণান্বিত স্বামীর জন্যেই দুনিয়ার মেয়েরা যুগ-যুগান্ত ধরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা

করছে।

বে-থার প্রস্তাব পাকাপাকি হলো কিনা এ-বিষয়ে শুধু আমাদের সমাজে নয়, ফরাসি গাঁয়েও প্রবল কৌতূহল। আশীর্বাদের সময় গাঁয়ের লোকেরা রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়াবে। আশীর্বাদ জানাবে। কোথাও কোথাও বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত সমস্ত পথে সাদা তীরচিহ্ন এঁকে দেওয়া হবে। কোথাও পথে ছড়ানো হবে কাঠের গুঁড়ো, যাতে কারও না জানতে বাকি থাকে সুসংবাদটি।

সংযুক্তা ও পৃথ্বিরাজের একখানা গল্পতেই আমরা মোহিত। বাপের অনুমতি ছাড়াই প্রিয়তমাকে জোর করে তুলেনিয়ে উধাও হওয়ার ব্যাপারে ফরাসি বেশ দড়! কর্সিকা অঞ্চলে মেয়ের বাপ রাজি না হলে কতক্ষণ আর প্রেমিক ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে? মেয়েকে ঝপ করে তুলে নিয়ে উধাও হও, যদি কোনওরকমে ধরা না পড়ে কয়েকটা রাত কাটাতে পারো তাহলে বাপের আপত্তি আর ধোপে টিকবে না। প্রিয়তমা তোমার অর্ধাঙ্গিনী হবে। গত শতকে এই ধরনের ঘটনা ঘটতো হামেশা, এখন অনেক কম, কিন্তু ঘটছে না এমন নয়।

পড়ুন না কর্সিকার লোকসাহিত্য। পাবেন ঘটনা—যেখানে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রেমিক এসে প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে উধাও হচ্ছে ঘন অরণ্যে। একটা রাত কাটাতে পারলেই অধিকার জন্মালো। কিন্তু প্রেমিকা উদ্ধার করতে গিয়ে শ্বশুরের গুলিতে খুন জখম হওয়াটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। অনেক সময় পরের দিন ফেরার পথেও প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ফলে অনেক সময় ঘরে ফেরা হয়নি, প্রেমিকাকে কাছে রেখেই প্রেমিক হয়ে উঠেছে রাস্তার ডাকাত, রাহাজানিই যার পেশা।

অনেক অঞ্চলে, বাপের সম্মতি থাকলেও এই নকল নারীহরণের অভিনয়টুকু থেকে গিয়েছে। কখনও-কখনও আইনের হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে দু'জন সাক্ষী ডাকা হয়, কনে তাঁদের সামনে বলে সে চায় কেউ তাকে হরণ করুক, তারপর প্রেমিকের কেরামতি!

হরণের প্রচেষ্টা থেকেই বোধ হয় উদ্ভব হয়েছে বরকনের লুকোচুরি খেলা। কনে লুকোনোর প্রথাটি অনেক কালের পুরনো। ব্যাপারটা ঘটে বিয়ের আগের দিনে। কনের সখীরা সেদিন আইবুড়োভাতের আয়োজন করে এবং খাওয়াদাওয়ার পরে কনেকে লুকিয়ে রাখে তাদেরই কোনও বাড়িতে, অথবা বিয়ের পরে বরকনে যে বাড়িতে নতুন সংসার পাতবে সেখানে। কনে গা ঢাকা দিয়েছে এই খবর যখন বরের কানে পৌঁছবে তখন সে সবান্ধবে কনে উদ্ধারের কাজে লেগে পড়বে। সখীদের কাছে গিয়ে বরের পার্টি দাবি করবে; "ভ্যাড়াটিকে ফেরত দাও।" বরকে যে উত্তর দেওয়া হবে তার অর্থ হলো, "এ-বাড়িতে তোমার কোনও ভ্যাড়া নেই।"

তখন সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা ছাড়া বরের কোনও পথ থাকবে না। কনে অনেক সময় সখীপরিবৃতা হয়ে শোওয়ার ঘরে লুকিয়ে থাকে। বর তখন ওই শোওয়ার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাবির পুনরাবৃত্তি করে, "ভ্যাড়া ফেরত দেওয়া হোক।" এইসব দাবি এবং তার উত্তর কাঠখোট্টা গদ্যে হয় না, জানানো হয় চিরকালের লোকগীতির মাধ্যমে এবং শেষপর্বে অবশ্যই কনেকে তুলে দেওয়া হয় বরের হাতে।

অনেক সময় বরের দাবি দীর্ঘ সময় ধরে নানা উপায়ে সংহত করা হয়। বাড়ির দরজা, ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কনে বসে থাকে। পাঁচিল টপকে, ছাদে উঠে কনে উদ্ধার করতে গিয়ে বরকে রীতিমতন হিমসিম খেতে হয়।

উত্তর ফ্রান্সে এই পলাতক কন্যে নিয়ে নানা মজা হয়। বিয়ের দিনে চার্চের পথে সুসজ্জিতা কনে পালাবার চেষ্টা করে বারবার এবং তাকে প্রতিবার ধরে আনবার দায়িত্ব থাকে আত্মীয়স্বজন এবং নিমন্ত্রিত অতিথির ওপর!

অনেক সময় এর জন্যে একজন দেহরক্ষী নিয়োগ করা হয়—নিতবরের মতো এই চরিত্রটির প্রধান কাজ কনে আগলানো, তার পালানো বন্ধ করা। রসরসিকতার এই আদানপ্রদান অনেকসময় ছোটখাট যুদ্ধের আকার ধারণ করে, কনের মূল্যবান বিবাহ-বেনারসি ছিঁড়ে যায় টানাটানিতে। কিন্তু বিয়ের বস্ত্র ছিঁড়ে যাওয়াটা ফরাসি দেশে শুভলক্ষণ। একটু বেসামাল অবস্থায় পলায়মানা কন্যে বিয়ের আসরে প্রায়-বন্দিনী অবস্থায় হাজির হলে সবাই বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। বিয়ের আগে বিয়েতে যত অনিচ্ছা দেখাবে কন্যে বিয়ের পরে সে তত সুখী হবে।

বিয়ের পর কালরাত্রি প্রথা আছে কিনা জানবার চেষ্টা করলাম। শুনলাম, বিয়ের পরে ফুলশয্যার আগেও বউ লুকিয়ে পড়বার প্রথা আছে। বরকে স্বয়ং বেরোতে হয় খুঁজে পেতে বধূকে মধুযামিনীর শয্যায় নিয়ে আসবার জন্যে।

বিয়ের চিঠি বিলিয়ে নেমন্তন্ন করার কী ঝক্কি তা ভুক্তভোগী বাঙালী মাত্রই জানেন। বিয়ে তো একদিনের ব্যাপার, কিন্তু শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ মার্কা চিঠি হাতে টালা থেকে টালিগঞ্জ, বিরাটি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ছোটাছুটি করার হাঙ্গামায় বর ও কনের আপনজনরা হাঁপিয়ে ওঠেন। তবুও পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয় হয় না।

দুঃখ পাবেন না বাঙালিরা, ঠিক একই ঝক্কি সামলাতে হয় গাঁয়ের ফরাসিকে ওখানে নিয়ম, প্রতিদিন একজনের বাড়িতে গিয়ে নেমন্তন্ন করা হবে। নেমন্তন্নর প্রাপক তো নিচু নজরের লোক নন, সুতরাং তাঁর কর্তব্য দূতকে বসিয়ে আদরযত্ন করা এবং রাতের ডিনারের জন্য তাঁকে আটকে রাখা। বার্গাণ্ডির মদের কথা শুনেছি। এই অঞ্চলে নেমন্তন্নর সময় বাড়ির সামনে চিৎকার করে বলা হয়,

"জুতোটুতো পরিষ্কার রাখুন।" সত্যিই তো বুট জোড়া ঝকঝকে না করলে কাজের বাড়িতে কী করে যাবে ফরাসি ভদ্দরলোক?

বাঙালি বিয়েতে যেমন একখানা নেমন্তন্ন মানেই 'সবান্ধবে', ফরাসির ব্রিটানি অঞ্চলেও তাই। কষ্ট করে এসে নেমন্তন্ন করে গিয়েছো এই যথেষ্ট, বাকি দায়দায়িত্ব আমার। জনে-জনে গলবস্ত্র হয়ে তুমি বলবে কেন, আসতেই হবে? কর্তা এবং কর্ত্রী শুধু ছেলেপুলে ভাইপো ভাইঝি নয় ক্ষেতের কাজের লোকদেরও সঙ্গে নিয়েই বিয়ে বাড়িতে হাজির হবেন। 'সবান্ধবে' শব্দটা এখন আমাদের শহুরে বিয়েতে কথার-কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে নিজের বউকেও বে-বাড়িতে নিয়ে যাওয়াটা অসভ্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটানির খানদানি ভদ্রলোকরা এখনও প্যারিসে নাগরিকদের মতন কেষ্টনগরি ভদ্রতা রপ্ত করেনি।

বার্গাণ্ডিতে নেমন্তন্ন করতে এলে পত্রবাহককে আপ্যায়ন করতে হবে মিষ্টি এবং তামাক দিয়ে। গ্যাসকনিতে যেহেতু সন্ধেবেলায় নিমন্ত্রণ করার রীতি, এবং ডিনার যেহেতু আবশ্যিক, সেহেতু একরাত্রে কোনও-কোনও পত্রবাহক কুড়িটা ডিনার হজম করেন!

শুধু ডিনার নয়, পত্রবাহকের জামায় একটি রিবন বেঁধে দেওয়ার রীতি আছে কোনও-কোনও অঞ্চলে। তার ফলে পত্রবাহক বা বাহিকা যখন এক রাউণ্ড নেমন্তন্ন সেরে বাড়িতে ফিরে আসেন তখন তিনি রীতিমতন বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠেন।

লাণ্ডে বলে এক অঞ্চলে আরেক অদ্ভুত রীতি। বউয়ের নেমন্তন্নর চিঠি না পেলে বরের ইজ্জতে লেগে যায়, এবং বরের নেমন্তন্নপত্র না পেলে বউ আদৌ বিয়ের সময় উপস্থিত থাকবে কিনা না ভেবে দেখবে! ফলে দূত আসে কনের নেমন্তন্ন নিয়ে, আর একজন দূতকে বর পাঠান কনেকে নেমন্তন্ন করার জন্য। এই নিয়মটি বাঙালিরা চালু করবে কিনা ভেবে দেখতে পারেন। সত্যিই তো বর কোন মুখে সাজগোজ করে টোপর পরে হাজির হবে কনের বাড়িতে 'অনাহুতের মতন'?

ইংলণ্ড-আমেরিকায় কনের বিয়ের সাজ সাদা। এই শুনে আমার মা খুব আঁতকে উঠেছিলেন। সাদা তো বৈধব্যের প্রতীক। যস্মিন দেশে যদাচার, মা বুঝতে চাননি। ফরাসির কথা শুনলে মা খুশি হতেন। কনের প্রিয় রং লাল, আমাদের লাল বেনারসির মতন। গ্যাসকনিতে আমাদের মতনই লাল ছাড়াও নীল অথবা বাদামি রঙের কাপড় পরার রীতি আছে।

মিসেস ডুরের কাছে শোনা গেলো, ব্রিটানিতে কনের বিয়ের গাউন দেখার মতন, যেমন ঝকঝকে তেমন সুন্দর। কনেকে আবার চারটে শায়া পরতে হয়। একটার পর একটা সবচেয়ে ওপরের শায়াটিকে অবশ্যই হতে হবে লাল রঙের।

কনের বডিসটি হবে হলুদ রঙের, মোজা লাল, কিন্তু জুতো অবশ্যই সাদা। এইসব নিয়মকানুন কাউকে শেখাতে হয় না। বংশানুক্রমে নানা রীতিনীতির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এই মানবসংসারে। ফরাসি এবং ভারতীয় কেউ এর থেকে বাদ যেতে পারে না।

বিবাহ সংবাদ যখন শুনছেনই তখন জেনে রাখুন, বহু জায়গায় কনের মুকুটও আছে এবং কনের লজ্জানিবারণী যার নাম 'ভেল'—যা আসলে একটা পাতলা বস্ত্রখণ্ড।

বিবাহের সাজ তো হলো, এবার শোভাযাত্রা সহকারে বিবাহমণ্ডপে অর্থাৎ চার্চে যাওয়া। বিয়ের প্রশেসন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কলকাতায় অবাঙালি সমাজের কিছু-কিছু আচার যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাও বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার কথা জানেন। যতবড় লোকই হোক, গাড়ি ছেড়ে কিছুটা অংশ পায়ে হাঁটতে হবে বরফে ঘোড়ায় চড়িয়ে। ভি-আই-পি বর ছাড়া আর সবাই পদযাত্রী।

ফরাসি দেশে কনের বাড়ি থেকে যাত্রা শুরুর মুহূর্তটি বাঙালি কনের বিবাহের পরবর্তী প্রভাতে পতিগৃহে যাত্রার মতনই হৃদয়স্পর্শী। ফরাসি কন্যা এইসময় কাঁদতে শুরু করে এবং কনের বাবা তাকে প্রাচীন পদ্ধতিতে আশীর্বাদ করেন।

ফরাসির বৈবাহিক শোভাযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়মকানুন অনেক। রাজনৈতিক শোভাযাত্রার মতন লাইনে যেখানে খুশি দাঁড়ালে চলবে না। শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে কনে যাবে তার বাবার হাতটি ধরে। এরপর বর, তার সঙ্গে গর্ভধারিণী জননী। বিয়েতে বরের মায়ের ভূমিকা বাপের থেকে বেশী। এরপর কনে দু'জন সঙ্গিনী এবং তারপর বরের ছ'জন সঙ্গী। এরপর আত্মীয়স্বজন এবং অভ্যাগতরা। বিয়ের পরে শোভাযাত্রার প্রথমেই বর ও কনের এবং অন্য সবাই বিবাহপূর্বে যে যেখানে ছিলেন।

আসামের কোনও-কোনও অঞ্চলে বাঙালির বিয়েতেও কনের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদের পথ অবরোধ করে। শেষপর্যন্ত অনুমতি মেলে কিছু খরচাপাতি করার পর। ফরাসিরা এই সব বাধা সৃষ্টি করে বিয়ের পরে। আলসাসে নবদম্পতির শোভাযাত্রা থমকে দাঁড়ায় শিকল দিয়ে অবরুদ্ধ রাস্তার সামনে। অনেক জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় গাছের ডাল ইত্যাদি সহ। তবে নিতান্ত শুকনো ব্যাপার নয়। অবরুদ্ধ পথে কিছু ওয়াইন বোতল সাজানো থাকে যা ওই দলকে চড়া দামে কিনতে হয়। আসলে এই অবরোধে প্রধান ভূমিকা নেয় স্থানীয় ছেলেছোকরারা এবং তারা যে-পয়সা আদায় করতে পরে তা দিয়ে একদিন নিজেদের মধ্যে ফিস্টি হয়!

অবশেষে শোভাযাত্রা পৌঁছোয় নবদম্পতির নতুন গৃহের সামনে। এখানেও নবধূকে যেসব উপহার দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশে বধূবরণের সঙ্গে সঙ্গ

তিপূর্ণ। শুনুন, যা দেওয়া হয় বধূকে তার মধ্যে প্রধান হলো একটি ঝাঁটা, একটি সসপ্যান ও একটি শিশুর দোলনা। উপহারগুলি যে ইঙ্গিতময় তা বলাই বাহুল্য।

নিজের আলাদা সংসার পাতার রেওয়াজ থাকলেও কখনও-কখনও নববধূ বসবাস করে শ্বশুরালয়ে। এই কনেদের বলা হয় ডটার-ইন-ল। কিছু-কিছু জামাই এসে ওঠেন শ্বশুরালয়ে—একে বলা হয় সন-ইন-ল (বিবাহ সূত্রে পুত্র)। লজ্জার মাথা খেয়ে একটু খবরাখবরে করে জানা গেলো, ঘরজামাইকে ফরাসি দেশেও একটু খাটো করে দেখা হয়। সারা দুনিয়াতেই ঘরজামাইয়ের হেনস্থা কেন রে বাপু?

বাঙালির মতন ফরাসিও যে বিয়ে উপলক্ষে কব্জি ডুবিয়ে খানাপিনায় বিশ্বাস করে সে খবর তো আগেই পাওয়া গিয়েছে। বিয়ের ভোজের তদারকি করতে মেয়ের বাবা-মা প্রায়ই সারাক্ষণ পাকঘরে রাঁধুনির পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁদের খাওয়াদাওয়া মাথায় ওঠে। বিয়ের খানাপিনা অনেক রাত পর্যন্ত চলে এবং আত্মীয়স্বজনের কাজ হলো বর ও বউয়ের ওপর কড়া নজর রাখা—তারা যেন বৃহত্তর আকর্ষণে টুক করে কেটে না পড়ে। স্বভাবতই কনে চেষ্টা করে হাঙ্গামা চুকিয়ে সরে পড়তে এবং বরও চায় প্রহরীদের কলা দেখিয়ে উধাও হতে। মিলনের প্রথম রাত্রিকে যথাসম্ভব বাধাপূর্ণ করে তুলতে রসিক ফরাসি খুবই ভালবাসে।

যা আমাকে অবাক করলো, আমরা যাকে কালরাত্রি বলি তা ফরাসিরা এখনও কিছু-কিছু মানে। মিলনের আগে কোথাও রাখা হয় একরাত্রির দূরত্ব, কোথাও তিন রাতের, কোথাও বা দশ রাতের। দুষ্ট দৈত্যদানবের দূরে রাখার জন্যে এই প্রথাকে বলা হয় 'টোবিয়াদের রাত্রি' বা 'দ্য নাইট অফ টোবিয়াজ'।

কোথাও-কোথাও রীতি হলো বিয়ের পরে কনে বাপের বাড়ি ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। জামাই তখনকার মতন বিদায় নেবে এবং ফিরবে পরের শনিবার। এই বিচ্ছেদ যাতে অসহনীয় না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যে কোনও কোনও জায়গায় প্রায় সব বিয়েই শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ের রাতে বাসরঘরের সন্ধানও পাবেন ফরাসি দেশে, বিশেষ করে ব্রিটানিতে। ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায়ে বাঙালিরা বোধ হয় এই ব্রিটানিতেই প্রথম পদক্ষেপ করেছিল। এখানে বিয়ের রাত্রে নিভৃতমিলনের কোনও সম্ভাবনাই নেই, সমস্ত রাত ধরে চলবে সখী ও নিকট বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড়, গান ও রসরসিকতা।

নাইট অফ টোবিয়াজ সংক্রান্ত নিয়মকানুন এখন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। এটি পালন করা হবে কিনা তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কনের ইচ্ছার ওপর। কনে পরিস্থিতি বুঝে মনঃস্থির করে। যদি দেখে বর প্রচুর পান করে বেসামাল তাহলে

টোবিয়াজের রাত্রি পালন করাটাই সবদিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। যেসব কনে টোবিয়াজের রাত্রি পালন না-করার সিদ্ধান্ত নেয়, বৃদ্ধা আত্মীয়রা তাদের সম্বন্ধে আড়ালে একটু অসন্তোষ প্রকাশ করে। শুভকাজে তড়িঘড়ি জিনিসটা বয়োজ্যেষ্ঠরা কোনও দেশেই তেমন পছন্দ করেন না।

বাকি রইলো কেবল ফুলশয্যার রাত্রে আড়িপাতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ-বিষয়েও ফরাসির সঙ্গে বাঙালির কোনও তফাত নেই। ফুলশয্যার রাত্রে দরজায় খিল দিয়েও ফরাসি নবদম্পতিকে সাবধান হতে হয়, খোঁজ করতে হয় কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা, কিংবা দরজার বাইরে থেকেও কেউ আড়ি পাতছে কিনা!

বড়র আগে ছোটবোনের বিয়ে হলে বাঙালি পরিবারে যে নিন্দে হয় তার পুনরাবৃত্তি দেখতে হলেও ফরাসি দেশে আসা প্রয়োজন। এ নিয়ে আড়ালে আবডালে নানা কথাবার্তা হয় ফরাসি গাঁয়ে। গাঁয়ের গিন্নিরা এক্ষেত্রে বলেন, ছোটবোন তার দিদিকে ছায়ের ওপর বসিয়ে গেলো। কেউ বলেন, কী লজ্জা! বোনটা তার দিদির পায়ের তলার জমি কেটে দিলো! আইবুড়ো দিদিকে আরও হাঙ্গামা সহ্য করতে হয়। যেমন তার সামনে রাখা হয় এক প্লেট ওট, যা কিনা গাধার খাদ্য—বিয়ে না করে গাধামি করেছো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে। কোনও অঞ্চলে ছোটবোনের বিয়ের ভোজের সময় দিদির গলায় ঝুলিয়ে দেয় খড়ের পুঁটলি এবং সেই অবস্থায় তাকে মদ্য-পরিবেশন করতে হয়। আরও এক অঞ্চলে দিদির সমূহ বিপদ। সকলের সামনে দিদিকে খেতে হয় এক প্লেট রসুন যার দুর্গন্ধের কথা কারোরই অজানা নয়।

বিয়েতে বাগড়া দিতেও ফরাসি পল্লীসমাজ বাঙালিদের মতনই উৎসাহী। প্রকাশ্য এক ধরনের বাগড়া আছে যার নামে 'চারিভারি', যার নমুনা আমাদের দেশেও শুনে থাকবেন। তা হলো বাজে বিয়েতে যুব সমাজের স্বতঃস্ফুর্ত আপত্তি।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা অথবা তরুণের বৃদ্ধাভার্যা সাধারণ ফরাসির এখনও চক্ষুশূল। তাই এই সব বিয়েতে প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া হয়, যার নাম চারিভারি। যার নমুনা আমাদের দেশেও শুনে থাকবেন। তা হলো বাজে বিয়েতে যুব সমাজের স্বতঃস্ফুর্ত আপত্তি।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা অথবা তরুণের বৃদ্ধাভার্যা সাধারণ ফরাসির এখনও চক্ষুশূল। তাই এই সব বিয়েতে প্রকাশ্যে বাধা দেওয়া হয়, যার নাম চারিভারি। বিয়ের সময় চিৎকার, হৈচৈ, ঢাক ঢোল বাজিয়ে টিটকিরি দেওয়া প্রথাসঙ্গত যদিও ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ আইনের চোখে চারিভারি বে-আইনি। বুড়ো বরকে আটকানোর জন্যে হাতাহাতি ধস্তাধস্তি কোনও আশ্চর্য ঘটনা নয়।

বুড়ো বররা সাধারণত বীর্যবান না হলেও বুদ্ধিমান হন। তাই এঁরা পাড়ার

ছোকরাদের সঙ্গে ফয়সলা করে নেন। খানাপিনার জন্যে কাঁচাপয়সা ছড়ালে বিক্ষোভ হয়তো হবে না, হলেও তা হবে নামকাওয়াস্তে। অনেক অবুঝ বুড়ো কিপটেমি করে পয়সা না ছেড়ে পুলিশে খবর দেয়। চারিভারিতে বাধা দিতে পুলিশ আসে, কিন্তু তেমন কাজ হয় না। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুলিশের ওপর জাতক্রোধ মিটিয়ে নেবার জন্যে ছোকরারা অন্য পাড়ার থেকে লোক জড়ো করে এবং বুড়োর বিয়েতে টিটকিরি দেবার জন্যে শতশত বিক্ষোভকারী জমা হয়ে যায়। একে পরিণত বয়স, তার ওপর তরুণীভার্যাকে সামাল দেবার দুশ্চিন্তা, সেই সময় আবার স্থানীয় অসহযোগিতা থাকলে বৃদ্ধ বরের মানসিক ভারসাম্য হারানো অসম্ভব নয়।

শুনলাম এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে পুলিশকে বহু ধরপাকড় করতে হয়েছে। একবার এক বুড়ো বিয়ে করছেন কুড়ি বছরের এক মেয়েকে। বুড়োর পয়সা আছে, কিন্তু তিনি ঘুস দিয়ে মুখ বন্ধ করবেন না। খবর দিলেন পুলিশকে তারপর লাগলো মিনি দাঙ্গা। পুলিশও ছাড়নেওয়ালা নয়, কারণ ওই বুড়োর সঙ্গে ওপর মহলের কর্তাব্যক্তিদের দহরমমহরম আছে। তারা জনতা ছত্রভঙ্গ করলো, অনেককে হাজতে তুললো আর তাদের যোগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে অভিযোগ আনলো দেশদ্রোহিতার এবং 'জাতীয় নিরাপত্তা' বিঘ্ন করার। যাঁরা আমাদের দেশে জাতীয় নিরাপত্তার নামে এমার্জেন্সির সময় কোটালের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তাঁরা খোঁজখবর করতে পারেন আমাদের পুলিশের সঙ্গে ফরাসি পুলিশের কতখানি ভাবের আদানপ্রদান আছে।

আমার নোটবুকের পাতা ভরে উঠছে, আর বিদেশির কৌতূহলের দৌড় দেখে কৌতুক বোধ করছেন মিসেস ডুরে।

কিন্তু এবার তাঁকে ভুগতে হলো না। দরজায় মিষ্টি বেল বাজলো এবং যিনি প্রবেশ করলেন তিনি আর কেউ নন এই পরিবারের প্রাণস্পন্দন এবং হেনরির পিতৃদেব মিস্টার ডুরে।

গৃহস্বামী মিস্টার ডুরের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সান্ধ্য মজলিশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। মিস্টার ডুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি, তবে ঐ বিপজ্জনক রেখা এখনও স্পর্শ করেননি। সান্ত, সৌম্য, সুদর্শন মানুষটি যে সুখী

সংসারের স্নেহপ্রবণ অধীশ্বর তা আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না।

মিস্টার ডুরে সুরসিকও বটে। বললেন, "আজ লণ্ডনে ট্রাফিক জ্যাম ছিল।"

কলকাতার নাগরিক হিসাবে ট্রাফিক জ্যামে ভয় পাবার পাত্র আমি নই জেনে, ভদ্রলোক আমার ভুল ভাঙলেন। তিনি পথের জ্যামের কথা বলেননি, ব্যস্ত বিমানবন্দরে আজকাল আকশেও ট্রাফিক জ্যাম হয়, যখন শত-শত বিমান বিশাল পাখা মেলে অবতরণের জন্যে অপেক্ষা করে। আমাদের কলকাতায় যত বিমান প্রতিদিন অবতরণ করে, পৃথিবীর অনেক এয়ারপোর্টে প্রতি পনেরো মিনিটে তার থেকে বেশি বিমান ওঠানামা করে।

আজকাল ইউরোপের বড়-বড় বিমানবন্দর মাঝে-মাঝে জ্যামের খপ্পরে পড়ছে। শুনে মনে ভরসা পাওয়া গেলো! দুনিয়া যেভাবে সব জিনিস চমৎকার ম্যানেজ করছে তাতে অব্যবস্থার কেন্দ্রমণি কলকাতার মানুষরা সারাক্ষণ হীনমন্যতায় ভুগছে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করাটা মিস্টার ডুরের ডালভাত হয়ে গিয়েছে—তেমন চাপ থাকলে তিন-চারটে দেশ একই দিনে ভ্রমণ করে আবার স্বগৃহে ফিরে আসা আজকাল সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে মূল বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে হয় হেলিকপ্টারে অথবা কয়েকটা মিটিং সারতে হয় এয়ারপোর্ট হোটেলে। এই ধরনের মিটিং যে বাড়ছে তার প্রমাণ বিমানবন্দরের নাকের ডগায় গজিয়ে ওঠা অসংখ্য প্রাসাদোপম হোটেল। পকেটে যার পয়সা আছে তার সেবা এবং সুবিধের জন্যে সারা দুনিয়া এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশে ডেলিপ্যাসেঞ্জারি আরও বাড়বে আগামী কয়েক বছরে। বহুঘাটের জল বহুবছর ধরে খেয়ে ইউরোপ যখন অর্থনৈতিক মিলনের পথে এগোচ্ছে, তখন ঠিক উল্টোপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে আমাদের এই অভাগা উপমহাদেশে। এখানে মানুষ শুধু দরিদ্র নয়, অসহিষ্ণু এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ, ফলে প্রগতির সম্ভাবনা আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

মিস্টার ডুরে একটুখানি ফরাসি পানীয় ঢেলে নিলেন তাঁর গেলাসে। ফরাসিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিয়েসাদি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি শুনে তিনি মজা পেলেন। বললেন, "ঐসব এখন রূপকথার গল্পের মতন। বড়-বড় শহর বিশেষ করে এই প্যারি এখন এখন কিন্তু ক্রমশ লণ্ডন, ওসলো, নিউইয়র্কের মতন হয়ে উঠছে।"

গৃহস্বামী আমাকে তাজ্জব করে দিলেন। মার্কিন ট্যুরিস্ট এবং ইংরেজরা ফরাসি প্রেম এবং ফরাসি রমণী সম্পর্কে যতই বদনাম ছড়াক, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন সম্পর্কে ফরাসিরা এই কিছুদিন আগেও ভীষণ রক্ষণশীল ছিল।

গৃহস্বামী যা বলছেন তা খোলামেলাভাবে। ছেলে-মেয়ে সেই আলোচনায়

অংশগ্রহণ করছে বলে তাঁর কোনও চিন্তা নেই। মজা করে বললেন, এরা বড় হয়ে গিয়েছে। জীবনটা কী রকম তা নিজেরাই বুঝতে আরম্ভ করেছে। প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে পুত্রকে বন্ধুবৎ আচরণের যে প্রস্তাব ভারতীয় ঋষিরা দিয়েছিলেন তা শুনে মিস্টার ডুরে খুব কৌতূহলী বোধ করলেন।

তারপর বললেন, প্যারিসে আইবুড়ো ছেলেমেয়েদের বিয়েতে অরুচি ধরেছে, যেমন হয়েছে দুনিয়ার অনেক বড়-বড় শহরে। বিয়ে না-করেই ঘর সংসার পাতার এই প্রবণতা সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর আমেরিকাতেও একবার করেছিলাম। এবার এখানেও সে—সুযোগ মিলে যাচ্ছে। মিস্টার ডুরে কিছু কাগজপত্তর দিয়ে সাহায্য করবেন বললেন।

বজ্র আঁটুনির দেশে ফস্কা গেরো। ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবে বৈবাহিক জীবনে ফরাসি ছিল ভীষণ সংরক্ষণশীল। নারীর কুমারীত্ব ছিল এখানে এক মূল্যবান সম্পদ যা বিবাহিত স্বামীর জন্য তোলা থাকতো। এখন স্রোত এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে। ফরাসি মায়েরা এই কিছুদিন আগেও মেয়ের ওপর কড়া নজর রাখতেন, বলতেন, "যদি একদিন সুখী হতে চাও, তাহলে নিজের শরীরকে পবিত্র রাখো একজন মানুষকে উপহার দেবার জন্যে। না-হলে স্বামী তোমাকে চাইবে না। যে তোমাকে সত্যিই ভালবাসবে সে তোমাকে স্পর্শ না-করেই বিবাহের বেদিতে নিয়ে যাবে।"

এই ক'বছর আগেও এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, একশ মেয়ের মধ্যে মাত্র তেত্রিশ জন মায়ের সঙ্গে সেক্স সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে। দু'তিন দশক আগেকার কথা ধরুন, ত্রিশ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে সমীক্ষায় বেরিয়েছিল, শতকরা সত্তর জন মেয়ে বিবাহের রাত্রে কুমারী ছিল। অনেকে এই হিসাব বিশ্বাস না করে রটিয়েছিল, ফরাসি মেয়েরা মিথ্যাচারিণী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই সময় এক অঘটন ঘটায় প্রকৃত সত্য কোনদিকে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ফ্রান্সের এক বিখ্যাত শহরে, কর্মরতা মেয়েদের এক হোস্টেলে এক মৃত নবজাতকের দেহ পেয়ে ভীষণ হৈ চৈ হলো। ফরাসি পুলিশের চিন্তাধারা এবং কাজকর্ম বোঝা দায়! তারা বললো, তোমরা যদি সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে চাও তা হলে ডাক্তারি পরীক্ষা দাও। ডাক্তারের রিপোর্ট : সাতজন ছাড়া মেয়ে হোস্টেলের ১৪৪ জনের সবাই প্রকৃত অর্থে কুমারী। পশ্চিমের বেপরোয়া পরিবেশে এই ধরনের পরিসংখ্যান অকল্পনীয়, কিন্তু সত্য।

আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও এই সেদিনের ফরাসি মূল্যবোধের মধ্যে তা হলে আরও মিল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ফরাসি সাহিত্যিক, ফরাসি দার্শনিক বে-থা করে ঘরসংসারের রীতির বিরুদ্ধে সুযোগ পেলেই সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছেন। বিয়ের শত্রু বলা চলতে পারে এঁদের। লুই দ্য সেন্ট জাস্ট বলে ফরাসি বিপ্লবের

এক তরুণ নায়ক (ছাব্বিশ বছর বয়সে এঁর মুণ্ডু কাটা হয়েছিল) অল্প বয়সে যা লিখেছিলেন তা এখনও চালু রয়েছে এক ধরনের লোকের মুখে-মুখে—"যারা পরস্পরকে ভালবাসে তারাই স্বামী-স্ত্রী"। স্বামী-স্ত্রীর এই ঢালোয়া ব্যাখ্যা অনেকেরই মনে ধরে গিয়েছে।

আর এক লেখিকার মন্তব্য : "বিশ্বসংসার যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাতে বলা চলে নরনারীর সম্পর্কটা যে সাময়িক হবে এইটাই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রেত। দুনিয়ার সব কিছু চিরকালের সম্পর্কের বিরুদ্ধে। আসলে মাঝে-মাঝে পরিবর্তন চাওয়াটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি।" সুখী বিবাহিত জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়েছিলেন জঁ পল সার্ত এবং তাঁর সঙ্গিনী। ম্যারেড ব্লিসের বিরুদ্ধে তাঁরা আওয়াজ তুললেন অবিবাহিত জীবনযাত্রার আনন্দের দিকে।

সুতরাং বিয়ে না করে ঘরসংসার পাতার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে। মিস্টার ডুরে বললেন, "বইতে দেখবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক শ্রমজীবী ফরাসি বিয়ের হাঙ্গামায় না গিয়েই ঘর সংসার করতো। ছোটলোকদের সেই হাওয়া এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গায়েও লেগেছে। অন্তত লাখ পাঁচেক শহুরে দম্পতি স্বামী-স্ত্রীর মতন বসবাস করছে বিয়ে না-করেই।"

দেশের আইনও সময়ের স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধ্য হয়। বিবাহবিহীন এই দাম্পত্যজীবনকে ফরাসি তাই ১৯৭৮ সাল থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রক্ষিতা পেয়েছে নানাধরনের আইনগত অধিকার যা এতো দিন বিয়ে করা বউ ছাড়া কেউ পেতো না। এখন অনেকে তাই বিয়ের হাঙ্গামায় যেতেই চাইছে না। অবিবাহিত দম্পতি যদি ঘোষণা করে তারা একসঙ্গে বসবাস করছে 'সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে', তা হলেই হলো। এর ছ'বছর আগে আর একটা আইন করে অবৈধ সন্তানকে সব রকম অধিকার দেওয়া হয়েছে বৈধ সন্তানের সঙ্গে।

অবিবাহিতা মাতার বরং একটু বাড়তি সুবিধে, কোনও কিছু গণ্ডগোল বাধলে সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে আদালতে ছুটতে হবে না, অথচ এই সন্তানের খরচাপাতির জন্যে পিতৃদেব উদার হস্তে প্রাক্তন প্রেমিকাকে ভাতা দিতে বাধ্য। অনেক দেশে প্রমাণ করতে হয়, ইনিই ছেলের জন্মদাতা। বান্ধবীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছিল তা ইঙ্গিতে বোঝাতে পারলেই ফরাসি আদালত অন্য কোনও হাঙ্গামায় যাবেন না। প্রাক্তন বন্ধুটি যদি খরচ এড়াতে চান তাহলে প্রমাণ দিতে হবে ছেলের মা বান্ধবী নন, আসলে পতিতা।

আইন এখন এতোই রক্ষিতার দিকে যে বন্ধুর সোসাল সিকিউরিটির সুযোগ-সুবিধেও তাঁর প্রাপ্য। মনে করুন এঁরা বেড়াতে বেরিয়ে বেরিয়ে কোনও হোটেলের একটা ঘর বুক করেছেন এবং হোটেলের খাতায় একসঙ্গে সই

করেছেন। এরপর সঙ্গিনী বেরিয়েছেন শপিং করতে এবং দোকানে ধারে মাল কিনে সই করে এসেছেন। এক্ষেত্রে এই ধার মেটাবার আইনগত দায় হলো পুরুষ বন্ধুটির।

অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ফরাসির দুঃখ, বিয়ের হাঙ্গামায় না গিয়ে যৌথ বসবাস করলে ইনকাম ট্যাক্সের বাড়তি সুবিধে। আজব এই দেশে ছেলেপুলের বাপ-মা ডাইভোর্স করলে ট্যাক্সো কমে যাবে।

অবিবাহিত দাম্পত্য জীবনের একটাই অসুবিধে—অবিবাহিত 'স্বামী'র হঠাৎ মৃত্যু হলে তাঁর টাকাকড়ি সম্পত্তি হাতানো যাবে না, পেনসনও জুটবে না।

ছাপানো অক্ষরকে সমর্থন করলেন মিস্টার ডুরে। বড়-বড় শহরে, বিয়ের আগেই একত্র বসবাস ক্রমশই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বছর দেড় দুয়েক বিবাহিত জীবনের ট্রায়াল দিয়ে তবে চলো চার্চে, বিয়েটা সেরে নেবার জন্যে। এটাও প্রায়ই করতে হয় বাবা-মায়ের পেড়াপেড়িতে। এঁরা এখনও অবিবাহিত মেয়ে-জামাইয়ের কোলে নাতি-নাতনি দেখলে ভীষণ ঘাবড়ে যান। গ্রাম-গঞ্জের শ্বশুর হলে তো কথাই নেই। মেয়ের বক্তব্য হলো, এটা তো কিছুই নয়। যাও না সুইডেনে, দেখবে প্রায় সবাই বিয়েকে কলা দেখিয়ে ঘর-সংসার করছে, ছেলেপুলে হচ্ছে, কারুর কোনও মাথাব্যথা নেই। আসলে একালের সুইডিশরা এই ব্যবস্থা আবিষ্কার করেনি, সেকালে সুইডিশ চাষিদের মধ্যে এই রেওয়াজ ছিল। আসলে এই একত্র বসবাসটা হলো পাকা দেখার মতন। ফরাসিদের পক্ষে এইটাই বলবার আছে যে বান্ধবী সন্তানসম্ভবা হলে ঐ অবস্থায় বিয়ে করে ফেলাটাই রীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পশ্চিম দেশে এখন মস্ত সুবিধে, গুজব বা গুলের ওপর কিছু করা যায় না। সবরকম হিসাব হাতের গোড়ায় রয়েছে, ইচ্ছে হলেই দেখে নাও। এই যারা একত্র বসবাস করছে তাদের হিসাব নিয়ে নিন। শতকরা তেত্রিশটি দম্পতি বিয়ে করবেন মনস্থ করেই একই ঘরে বসবাস শুরু করেছেন। আরও তেত্রিশ জন এখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেননি, একসঙ্গে থেকে ব্যাপারটা একটু ঝালিয়ে নিতে চান। শতকরা পঁচিশ জন এখনও বিয়ে সম্পর্কে কোনও আলোচনাই করেন নি। শতকরা সাতজন অবশ্য বিয়েতে বিশ্বাস করেন না তবু একত্র বসবাস করছেন। বলা বাহুল্য ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সিরিয়াসনেস বেশি। শতকরা সত্তর জন মেয়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তার সঙ্গে, যাকে সে যথাসময়ে বিয়ে করতে চায়।

মিস্টার ডুরে বললেন, বয়স্থ বাপ-মায়েরা এখন আর ঘাবড়ে যান না। ছেলে বা মেয়ের একত্র বসবাসকে তাঁরা বিবাহের প্রস্তুতি পর্ব বলে ধরে নেন। ওঁদের ধারণা, দুনিয়ার সর্বত্র এই রেওয়াজ ক্রমশ বেড়ে যাবে। আমাদের দেশে এখনও

এই হাওয়া আসেনি শুনে কিছুটা আশস্ত হলেন।

অন্য অনেক ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা যতই অনগ্রসর হই, মেয়েদের অধিকারের ব্যাপারে ইউরোপের অনেক দেশকে আমরা টেক্কা দিয়েছি। জওহরলাল নেহরুকে এদেশের পুরুষমানুষরা যত গালাগালিই করুন, ওঁর কাছে মেয়েদের কৃতজ্ঞতার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কোনওরকম আন্দোলন না বাধিয়েই এদেশে মেয়েরা যেসব আইনগত অধিকার পেয়েছে তা বহুদেশে অকল্পনীয়। অবশ্য সেইসব আইনগত অধিকার কতটা কাজে লাগানো গিয়েছে সেটা অন্য কথা।

ধরুন, ফরাসিরা দুশো বছর আগে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার নামে এতো বিপ্লব করলো, সারা দুনিয়া যার জন্যে আজও ফরাসির নামে ভক্তিভরে কপালে হাত ঠেকাচ্ছে। কিন্তু সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কেবল পুরুষদের জন্যে। মেয়েরা ভোটে অংশ নেবে কিনা এটা মনঃস্থির করতে ফরাসির আরও দেড়শ বছর লাগলো। মেয়েরা সে অধিকার পেলো দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, ১৯৪৫ সালে।

এ নিয়ে ফরাসি মহিলা আন্দোলন তেমন প্রচণ্ড জোরদার হয়নি কখনও। ফরাসি মেয়েরা কখনও তাদের নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে বিটকেল 'ফেমিনিস্ট' হয়ে উঠতে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ভোটের অধিকার পেয়েও মেয়েরা রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করেনি, ফলে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত মহিলার সংখ্যা বাড়া তো দূরের কথা ১৯৪৫-এর ৩০ থেকে কমে ১৯৭৭ সালে দাঁড়ায় ১০-এ। দ্য গ্যল যে মনে-মনে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন তাও মনে হয় না, যদিও শ্রীমতী দ্য গ্যল স্বামীর কাজকর্মে প্রভাব বিস্তার করতেন। কোনও মহিলা ফরাসি প্রধানমন্ত্রী হবেন তা ভাবতে ফরাসির দ্বিতীয় যুদ্ধের পরেও আরও অর্ধশতাব্দী লেগে গেলো। ফরাসি ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে এই 'মানবসাগর তীরে' রচনাকালে সুসংবাদ পাওয়া গেলো একজন মহিলা ফরাসি দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। যদিও ফরাসি দেশে প্রধানমন্ত্রীর রমরমা নয়, যা কিছু শক্তি তা রাষ্ট্রপতির।

এই মহিলাটি প্রধানমন্ত্রী হবেন না-জেনেই তাঁর একটি ছাপানো উক্তি নোটবইতে লিখে এনেছিলাম। এই সোসলিস্ট মহিলা পাঁচ-ছ' বছর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দুঃখ করছেন, "আমাদের রাজনীতি থেকে বাইরে রাখবার জন্যে বেশির ভাগ পুরুষ সব রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের ধারণা রাজনীতি নিয়ে চায়ের দোকান অথবা সংসদে আলোচনা করার অধিকারটা পুরুষ মানুষের।...আমি খোলাখুলি বলতে পারি, রাজনীতিতে-নামা মেয়ের জীবন নারকীয়, যদি-না সে নিতান্ত কুৎসিত এবং বুড়ি হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের ভোটে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না এই আশঙ্কায় যে তারা জিততে পারবে না। কত লোক যে আমাকে বলেছে, রাজনীতি করবার পক্ষে আপনি বড্ড বেশি সুন্দরী। এইটাই হচ্ছে পুরুষ

মনোবৃত্তি—আমার ইচ্ছে হয় ঠাস করে গালে একটা চড় মারি।"

মেয়েরাও ভোটের অধিকার নিয়ে তেমন মন দেয়নি। তাদের অনেকে ভেবেছে, এ-বিষয়ে বেশি মাতামাতি মানে স্বামীর ওপর বিশ্বাস হারানো। "আইনের কচকচিতে সমান অধিকার অর্জনের চেষ্টা না করে, আমরা আমাদের মনোহারিণী শক্তি প্রয়োগ করে পুরুষকে জয় করবো।" তাই নারীসুলভ গুণগুলির দিকে ফরাসি রমণীর এতো নজর এবং তা দেখে পশ্চিমের সর্বত্র ফরাসি রমণীর প্রতি এতো আকর্ষণ।

ফরাসি আধুনিকা এখন চায় সমন্বয়। অবশ্যই কতকগুলো ব্যাপারে আইনের চোখে সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা, সমান সুযোগ এবং বিবাহিত জীবনে সমতা প্রয়োজন। কিন্তু লড়াকু মহিলাকে ফরাসিনি আমল দেয় না। পুরুষমানুষকে ঘেন্না করার, তাকে এম-সি-এইচ বা শুয়োর বলে গালাগালি করার মনোবৃত্তিও ফরাসিনির নেই। একজন লড়াকু মহিলার দুঃখ, বেশির ভাগ মেয়ে গাছেরও নেবে তলারও কুড়োবে। তারা সমান অধিকার চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে ডল পুতুলের মতন সেজেগুজে পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে ভালবাসে। সে পুরুষের প্রেম চায়, ফ্লার্ট করতে চায়, সে পুরুষ-কণ্ঠে শুনতে চায়—"তুমি ভীষণ সুন্দরী।"

তবে রাজনীতিতে সুবিধে না-করার দুঃখটা ফরাসি মহিলা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে পুরুষকে গোহারান হারিয়ে দিয়ে ভুলতে চাইছে। ফরাসি মহিলা মাদাম কুরি বিজ্ঞানে কী কাণ্ড করেছিলেন তা দুনিয়ার সবাই জানে। মেয়েদের প্রতাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। সংখ্যায় এবং মেধায় ছাত্রীরা এখন ছাত্রদের টপকে যাচ্ছে। ডাক্তারিতে মহিলাদের বিশেষ সম্মান। এখন মেয়েরা এরোপ্লেনের পাইলট হচ্ছে, পুলিসের কমিশনার হচ্ছে। এমন কি মিলিটারিতে মেয়ে জেনারেল। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া সব ব্যাপারেই মেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে বিশেষভাবে। আর দেশের শ্রমশক্তিতে মেয়েদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রতি একশতে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা যে ইংরেজের সমান-সমান এবং জার্মানের থেকে বেশি তা অনেকের স্মরণে থাকে না।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সমান কাজের জন্য সমান মাইনে এবং সমান সুযোগ আদায় করতে ফরাসিনির অনেক সময় লেগে গিয়েছে। এখন মেয়েদের প্রতি অনীহা দেখিয়ে কর্মখালির বিজ্ঞাপন ছাপালে সেই মালিক বিপদে পড়তে পারেন আইন অনুযায়ী।

আসলে ফরাসি মহিলাদের আমেরিকান টাইপ ফেমিনিস্ট আন্দোলনে বিশেষ অরুচি। ওঁদের ধারণা, ফরাসি মেয়েরা কখনও পুরুষের দাসী ছিলেন না, তাঁরা চিরকালই তাঁদের নিজস্ব শক্তি প্রয়োগ করে এসেছেন। ফলে নারীর অধিকারের বিষয়ে গরম বক্তৃতা করার আগেও ফরাসি নেত্রী দেখে নেন তাঁকে সুন্দরী

দেখাচ্ছে কিনা।

যেসব মেয়ে তাঁদের নতুন ভূমিকা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান তাঁরা বলছেন, একালের ফরাসিনিরা বড় বাড়াবাড়ি করছে। তার সব কিছু চাই—স্বামী চাই, সন্তান চাই, চাকরি চাই, পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন চাই, রাজনীতি করার সুযোগ চাই। এতোগুলো তো একসঙ্গে হওয়া যায় না।

অনেক মেয়ে তাই হাঁপিয়ে উঠছে। সংসার সামলে আপিসে হাজির হওয়া সোজা কাজ নয় প্যারিসে। অফিসের সময় লম্বা, সেখানকার ম্যানেজার আজকাল পান থেকে চুন খসতে দেবেন না। স্বামীও সব ব্যাপারে পারফেকশন চান। ফলে ফরাসিনির প্রাণান্ত! কেউ-কেউ ফিরে যাচ্ছে রান্নাঘরে। এখন যদি সামাজিক প্রতিপত্তি দেখাতে চাও তা হলে বউকে কাজ করতে দিয়ো না। সরকারও বলছেন, পার্টটাইম কাজ তৈরি করো, ওইসব কাজ দাও মেয়েদের। ওরা হাল্কা কাজ করুক সেই সঙ্গে রান্নাও করুক, চুলও বাঁধুক।

তবে মুক্তির স্বাদ পেলে আর পিছিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে না। এখন বউকে বেশি খোঁটা দিলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। ডাইভোর্সে তার ভয় নেই। স্বামী যদি উড়ু-উড়ু হয় বউও তা হলে মাঝে-মাঝে বদলা নেবে। যা কিছু নষ্টামি পুরুষ করবে আর মেয়েরা মুখ বুজে সহ্য করবে আর আড়ালে চোখের জল ফেলবে সে যুগ শেষ।

আসলে গত এক দশকে হুড়মুড় করে পরিবর্তন এসেছে। ফরাসি রমণীর পক্ষে অকল্পনীয় পরিবর্তন।

ফরাসি কুমারীর নিষ্কলঙ্ক শরীরের জয়গান আগেই গেয়েছি। কিন্তু এখন তা গল্পের বিষয়। কারণ পঁচিশ বছর বয়সে প্রতি শ'তে মাত্র পাঁচজন ফরাসিনি এখনও 'কুমারী'। একজন ডাক্তার বলেছেন, কয়েক বছর আগেও (১৯৭২ সালেও) ফরাসি মেয়েরা একুশ বছরের আগে কুমারীত্ব বিসর্জন দিতো না। এখন ইস্কুলের ছাত্রীরাও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। "এখন কম বয়সে প্রেম নয়, কামদেবের পীড়া নয়, স্রেফ সেক্সের মাধ্যমে 'কমিউনিকেশন' এবং নিজেকে আবিষ্কারের তাড়না।"

এসব কথার প্রকৃত অর্থ কী তা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। মিস্টার ডুরে বললেন, "অপেক্ষা করুন। আবার সব পাল্টাতে চলেছে।" উল্টোরথের যাত্রা শুরু হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র এইডস্-এর ভয়ে। এইডসের ওষুধ তাড়াতাড়ি না বেরুলে মানুষ আবার ফিরে পাবে সেই মনোবৃত্তি, যাকে এতো দিন 'ভিক্টোরিয়ান' মানসিকতা বলে ব্যঙ্গ করা হচ্ছিল।

মিস্টার ডুরে বললেন, "ইতিহাস যখন খুঁজছেন তখন জেনে রাখুন, ডাইভোর্স নিয়েও জল ঘোলা হয়েছিল। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে ইতালির মতন হই-হই হয়নি। কিন্তু দুই পক্ষের সম্মতি থাকলে কম হাঙ্গামায় ডাইভোর্সের সুযোগ

এসেছে মাত্র সেদিন—১৯৭৫ সালে। আজকাল যত ডাইভোর্স হচ্ছে তার বড় অংশ এই দু'পক্ষের সম্মতি থেকে। বিয়ে ভাঙাও বেড়ে যাচ্ছে—পাঁচটা বিয়ের একটা ভেঙে যাচ্ছে হুট্ করে। কিছু করবার নেই।"

প্রাক্‌বিবাহ প্রেম অপেক্ষা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম সম্পর্কে ফরাসির দুর্নাম বেশি। এ-বিষয়ে একটি পত্রিকায় যা বলা হয়েছে তা চিন্তার কারণ। ২০ থেকে ২৫ বছরের বিবাহিতা ফরাসিনিকে প্রশ্নোত্তর করে যে খবর বেরিয়েছে তা হলো : চারজনের মধ্যে তিন জন বিয়ের বাইরেও অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠিকা স্বীকার করেছেন, এই ব্যাপারে তিনি নিজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এক চতুর্থাংশ পাঠিকা বলেছেন, তাঁরা অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠছেন এই কারণে যে স্বামীটি ভীষণ 'বোরিং', একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে ওঠাটাই তো মানুষের প্রকৃতি।

মিসেস ডুরে শুনলেন, কিন্তু একমত হলেন না। বললেন, "এই সব সমীক্ষা সব সময় বিশ্বাস করবেন না। মানুষ আজকাল করে এক বলে এক। বুক আর মুখ সবসময় এক থাকছে না, মিস্টার মুখার্সি। অন্তত আমাদের এই দেশে, আপনাদের দেশে কী হয় জানি না।" আমি নতমস্তকে স্বীকার করলাম, দেশেও একই সমস্যা। কিছু লোক এখন সমীক্ষকদের কাছে কাঁচা মিথ্যে কথা বলছেন বলে বিখ্যাত সমীক্ষক প্রণয় রায় নিজেও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন।

মিসেস ডুরের দেওয়া ছাপানো কাগজ থেকেও আর একটি আজব আইনের কথা জেনে রাখা ভাল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই জনসংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আজব আইন পাশ হলো। জন্মনিয়ন্ত্রণ বেআইনি হলো। অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনার কোনও সরঞ্জাম পাবার উপায় নেই ফরাসি দেশে, অন্তত সোজাসুজিভাবে। গর্ভপাতের তো কথাই ওঠে না।

ভাবতে পারা যায় না যে এই আইন, ফরাসি দেশে চালু ছিল এই সেদিন (১৯৬৭) পর্যন্ত।

মিসেস ডুরে বললেন, আশ্চর্য হচ্ছে কি? ১৯৬৪ পর্যন্ত ফরাসি মেয়েরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতো না। পাসপোর্ট পেতো না ফরাসি মেয়ে স্বামীর লিখিত অনুমতি ছাড়া। দোকান বা ব্যবসা করবার জন্যেও মেয়েদের প্রয়োজন হতো স্বামীর অনুমতি। ইতিহাস অত সহজে তো ভোলা উচিত নয়।

যেহেতু জন্মনিয়ন্ত্রণ বেআইনি সেহেতু ফরাসি মহিলার দুঃখের অন্ত ছিল না। তখন হাস্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হতো। যাদের অবস্থা ভাল তারা বিদেশ থেকে এই সব জিনিস গোপনে পাচার করিয়ে আনতো। শেষ পর্যন্ত এক মহিলা ডাক্তার বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, এই অবস্থা চলতে পারে না। বেআইনি জেনেও তিনি পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন শুরু করে দিলেন ১৯৫৬ সালে। প্রথম ক্লিনিক

খোলা হলো ১৯৬১ সালে। অবশেষে সরকার নরম হলেন, মা ষষ্ঠীর মুখে ছাই দিয়ে এই আইন উঠে গেলো ১৯৬৭ সালে। কিন্তু গর্ভপাত সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি রইলো আরও অনেকদিন। এর ফলে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হলো। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে লন্ডনের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ—ফরাসি মেয়েরা প্রয়োজন হলেই চললেন লন্ডনে। কিন্তু এই সুযোগ তো অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছাড়া কেউ নিতে পারবে না, যত ভোগান্তি গরিব ফরাসির। তাকে যেতে হয় হাতুড়ের কাছে এবং এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

এই সামান্য ব্যাপারেও নানা ভাবনা চিন্তা সরকারের। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মনঃস্থির করে গর্ভপাত আইন পাশ করাতে-করাতে এসে গেলো ১৯৭৫ সাল। প্রথমে কয়েক বছরের জন্যে আইন, ঐ আইন আবার সংসদে পেশ করতে হলো ১৯৭৯ সালে এবং প্রচুর বাকবিতণ্ডার পরে পাকাপাকিভাবে আইন পাশ হলো।

মেয়েদের আইনগত অধিকারের ব্যাপারে ফরাসি যে প্রগতিশীল নয় তার আর একটা প্রমাণ, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পাবার আইন পাশ হয়েছে ১৯৮২ সালে।

আমার অনেক ভুল ভাঙলো। এ-ব্যাপারে ফরাসির অবশ্য লুকোচুরি নেই। সব কথা বুঝিয়ে বলতে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ডুরে মোটেই দ্বিধা করলেন না।

এবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। সময় কেটে গিয়েছে অনেক। আগামীকাল সকালে সবাইকে আবার কাজে বেরুতে হবে। সুতরাং মিস্টার ডুরে ঘোষণা করলেন, "আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত বোধ করছি।"

এঁদের রসিক ছেলেটি বলে উঠলো, "আমরাও দুর্ভিক্ষতাড়িত বোধ করছি, কিন্তু বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।"

মনে-মনে আমি এখন ভীষণ চটিতং। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ডুরে আদরযত্ন করেছেন, খাইয়েছেন, কিন্তু বিদায় নেবার মুহূর্তে এদের কন্যাটি জিজ্ঞেস করেছেন, "তোমাদের দেশে সতীদাহ কেমন চলছে?" ভাবটা এমন : "মেয়েদের জ্যান্ত পুড়িয়ে তোমরা কী ধরনের আনন্দ পাও?"

ভারতীয় মেয়েদের 'হাড় জ্বালিয়ে' খায় পুরুষরা, এ-কথা আমার মাও প্রায়ই ঘোষণা করতেন, কিন্তু তা বলে বিদেশে এসে শুনতে হবে সতীদাহের কথা?

লোকের কেন ধারণা থাকবে, এখনও এই তথাকথিত সভ্য দেশে সতীপ্রথা চালু রয়েছে? সতীদাহ, বহুবিবাহ, শিশু বিসর্জন, ধর্মীয় দাঙ্গা—এই সব ইউরোপের সাধারণ মানুষের মন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে সব শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছে।

ব্যাপারটা আরও অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এই করণে যে কন্যাটিকে সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিলেন শ্রীমতী ডুরে, যেন সে ভীষণ একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছে, সম্মানিত অতিথির সামনে এমন একটা কথা তুলে ফেলেছে যা সৌজন্যমূলক হয়নি। তিনি এমনভাবে প্রশ্নটিকে বিনাশ করলেন যে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়ে আরও জটিল হয়ে উঠলো। প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন সোজাসুজি আলোচনা হলেই বোধ হয় ভাল হতো, সব সন্দেহের নিরসন হতো।

আমার সন্দেহ হলো, এই স্নেহপ্রবণ দরাজহৃদয় ডুরে দম্পতির মনেও সতীদাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, কিন্তু নিতান্ত সামাজিক সৌজন্যবশত তাঁরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন অতিথির মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করে।

দরিদ্র, অনগ্রসর দেশের মানুষ হলে বিদেশে অনেক অসম্মানের সম্মুখীন হতে হয়। যে-দোষের জন্য আমি নিজে মোটেই দোষী নই তারও ভাগিদার হতে হয়। এমনি করেই বিদেশের মাটিতে স্বাজাত্যাভিমান জেগে ওঠে। স্বদেশে অনেক সময় তা হয় না, কারণ অনগ্রসরতার দোষগুলো অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে স্বদেশে চুপচাপ বসে থাকা যায়।

পাঁচুদা, আমার মনোভাব বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। একজন ফরাসি মেয়ে কী বললো তাতে কী আসে যায়? ও নিয়ে মাথা ঘামাসনি।

একজন নয়, এই নিয়ে দু'বার ব্যাপারটা ঘটলো, আর একজন ফরাসি মহিলা বাংলাদেশ বিমানের প্লেনে একই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরও ধারণা, ব্যাপারটা প্রতিদিনই ঘটে যাচ্ছে আমার স্বদেশে।

"তুই কী বলতে চাচ্ছিস?" প্রশ্ন করলেন পাঁচুদা। তাঁর ধারণা, দেশের সব সমালোচনা নিজের সমালোচনা হিসাবে ধরে নিলে বিদেশে প্রত্যেক ভারতবাসীকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

দরিদ্র বলুক, অনগ্রসর বলুক, নিরক্ষর বলুক দুঃখ নেই। কিন্তু তাই বলে ভাববে সতীদাহ চালু রয়েছে ঢালোয়া ভাবে। হ্যাঁ, ভারতীয় মেয়েদের অনক কষ্ট আছে, তার বেশির ভাগ উৎপত্তি দারিদ্র্য থেকে। স্রেফ মেয়ে বলে বাড়তি কিছু কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। মেয়ের বাপের কাছে পণ আদায় করা হয়, অনেক মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে সুখ নেই, জ্বালাযন্ত্রণা সইতে হয়, ছেলেরা দাম্পত্যজীবনের সুখ বলতে কী বোঝায় তা জানবার চেষ্টাও করে না, এই সব ধারণা থাকলে ঠিক আছে, সমালোচনা মেনে নিতে হবে, যদিও কোটি-কোটি ভারতীয় ওই সব

দোষে মোটেই দোষী নয়। মেয়েমানুষকে কেমন করে সম্মান করতে হয় তার চূড়ান্ত হয়েছে এই অধমের জন্মভূমিতে—'শক্তি' বলতে মেয়েমানুষকেই মেনে নিয়েছে একমাত্র এই ভারতবর্ষ। কিন্তু এসব তো দূরের কথা, লোকে ভাবছে সদ্য স্বামীহারা মেয়েকে জ্যান্ত পোড়ানো হয় স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে একই চিতায়। ভারতবর্ষের তা হলে রইলো কী?

পাঁচুদার সঙ্গে প্যারিস প্রবাসের শেষ রাউণ্ডে গল্পগুজবের জন্য এই বাড়িতে আসা। বাড়ি বলা অন্যায়, এক চিলতে ঘর এবং সেই সঙ্গে রান্নাঘর। ঘরখানায় পাঁচুদা তাঁর কাসুন্দের ঐতিহ্য জমা করে রেখেছেন। কাসুন্দেতে আমরা কেউ সাজিয়ে-গুছিয়ে থাকতে শিখিনি। শঙ্করীদা, ছেনোদা, আমার, সবারই ঘর গুদামঘরের মতন হয়ে থাকে বইতে, পুরনো কাগজপত্র, বাঁধানো ছবিতে। বই-ই না শেষপর্যন্ত শঙ্করীদা ও আমাকে ঘর ছাড়া করে, কারণ আর রাখার জায়গা নেই। আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে হেজোদা। হেজোদার সব কিছু সাজানো গোছানো, অবশ্য তাঁর ছিমছাম স্বভাবের পিছনে দমদমের এক মহিলার যথেষ্ট অবদান আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করে।

পাঁচুদার ছোট্ট ঘরে, বই জিনিসপত্তর সরিয়ে কোনওরকমে বসা গিয়েছে। এইখানেই আড্ডা জমানো যাবে।

পরিস্থিতি হালকা করে দেবার জন্যে পাঁচুদা রসিকতা করলেন, "এরা মেয়ে পটায়, আমরা পেটাই।"

"কিন্তু তা বলে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করবে, কত মেয়ে রোজ স্বামীর চিতায় পুড়ছে?"

পাঁচুদা এখনও শান্তিজল ছেটানোর চেষ্টা চালালেন। "এদেশের পুরুষ সবসময় মেয়েমানুষের রূপবহ্নিতে পুড়ছে, আর আমরা মেয়েমানুষকে চিতাবহ্নিতে ঠেলে দিতে উদগ্রীব।"

"সে তো ওয়ান্স আপন এ টাইমের কথা। হিসট্রি যদি বলেন তাহলে তো অস্বীকার করার চেষ্টা না। হ্যাঁ, আমাদের কিছু পূর্বপুরুষ অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে বসবাস করবার সময়ে অন্য কোনও শতাব্দীতে এই সব অপকর্ম করেছেন। কিন্তু তা বলে এখন? এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ পর্বে?"

পাঁচুদা এবার থলি থেকে বেড়াল বের করলেন। "তুই দুঃখ করিস না। দেশে গিয়ে লিখে দিস, জ্যান্ত মেয়েমানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে সায়েবরাও কম দক্ষ ছিল না।"

মনে এবার একটু বল পাওয়া যাচ্ছে। এরা নিজেরাই একদিন মেয়েমানুষকে জ্যান্ত পোড়াতো বলে এখনও ঐ বিষয়ে প্রবল আগ্রহ। অন্য কেউ ওই কাণ্ড করছে কি না সে-সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া চলেছে। যেমন অন্য সম্প্রদায়ের একাধিক

বিবাহের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেকের প্রবল কৌতূহল, যদিও এই সেদিনও ঠাকুরের নাম করে, হিন্দু কুলীন ডজন-ডজন বিয়ে করেছে খোদ কলকাতা শহরেই।

লং লিভ পাঁচুদা। ফরাসির হাঁড়ির খবর আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন পড়ে দেখতে।

আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার পথে! অসহায় মেয়েদের ওপরে ইউরোপের মানুষ শত-শত বছর ধরে যে চরম বর্বরতা দেখিয়েছে, তার তুলনা ইতিহাসের অন্যত্র বিরল। কথায়-কথায় মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিচারকের কাছে। অভিযোগ করা হয়েছে—ধর্মাবতার, এই রমণীটি ডাইনি। তারপর বিচারক সাক্ষীসাবুদ ডেকেছেন। এরপরই শাস্তি। সাধারণ শাস্তি নয়, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার হুকুম।

আগে এই বিচার সম্বন্ধে কোনও প্রকাশ্য মন্তব্য করে কেউ আদালতের অবমাননার ঝুঁকি নিতো না। এ-যুগের সত্যনিষ্ঠ ফরাসি ঐতিহাসিকরা সাহস দেখিয়ে যেসব ঘটনা খুঁজে বের করছেন তার বিবরণ শুনে সমস্ত জাতটা শিউরে উঠছে। এইসব ঐতিহাসিকদের এক-আধজন ভারতবর্ষেও ঘুরে গিয়েছেন, এখানে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, নিজের দেশের কাণ্ডকারখানার ইতিবৃত্তও উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের এসব বিষয়ে আগ্রহ নেই, তাই আমরা সেসব খবর জানতে পারিনি।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে মেয়ে পোড়ানোর ব্যাপারটায় ইংরেজও কমতি যায় নি—তাই আজও ইংরিজীতে "উইচ হান্ট" বলে একটা কথা আমরা ব্যবহার করে চলেছি, যা এখনও খারাপ অর্থে ব্যবহার হয়। আরও দুটো শব্দ ইংরেজি ভাষায় জ্বল জ্বল করছে 'ইনকুইজিশন' ও 'হেরেটিক'। বাংলা অভিধানে ব্যাখ্যাও মিলবে—খ্রিষ্টীয় ধর্মমতের বিরোধীদের অনুসন্ধান করে দমন করার জন্যে স্থাপিত আদালতের নাম ইনকুইজিশন। আর হেরেটিক হচ্ছেন তিনিই, যিনি ধর্মের বিরোধিতা করেছেন। এককালে প্রভু যিশু যেমন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে চিরকালের জন্যে লজ্জায় ফেলেছেন, তেমন তাঁর অনুগামীরাও চান্স পেয়ে বহুকাল ধরে হেরেটিকদের ওপর একই অত্যাচার চালিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনায় এর ইঙ্গিত পেয়েছিলাম বাল্যবয়সে, কিন্তু তখনও এতো ঐতিহাসিক কাজকর্ম হয়নি। ফরাসি ঐতিহাসিকরা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গেছেন তাঁর তিরোধানের পরে। ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি সুসভ্য জাতের কাকে বর্বরতা থেকে বাদ দেবেন?

ফরাসি ঐতিহাসিকদের গবেষণার নমুনা শুনুন। জার্মান হোলি রোমান এম্পায়রের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একটা ছোট্ট জায়গায় ১৫৭০ সাল থেকে

১৬৩০-এর মধ্যে ৩৬৩টা উইচ হান্টের খবর সংগ্রহ করা গিয়েছে। বিচারে ক'জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তাও আন্দাজ করা নিরীহ ভারতীয়র পক্ষে সম্ভব নয়—মাত্র ২৪৭১ জন! ইউরোপে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকের নানা বিষয়ে মতপার্থক্য—কিন্তু খুঁটি পুঁতে আগুন জ্বেলে মেয়েমানুষ পোড়ানোর ব্যাপারে কেউ কম যেতেন না একথা নিবেদন করছেন বিশিষ্ট ফরাসি ঐতিহাসিকরা। ফ্রান্সে এই খুঁটিতে বেঁধে মানুষ পোড়াবার রীতিটা প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছিল ১৫৮০ থেকে ১৬১০-এর মধ্যে। ইংলণ্ডের মহানুভব বিচারকরাও এক শতাব্দীতে যে দু'হাজার বিচার চালিয়েছিলেন তার হিসাব পরীক্ষা করেছেন অ্যালান ম্যাকফারলেন নামে এক সমাজতত্ত্ববিদ।

'সরসারি' বলে ইংরিজি কথাটাও আমাদের মগজে রাখতে হবে যার সাধারণ বাংলা 'জাদুবিদ্যা'। এই জাদুবিদ্যা পি সি সোরকার-এর সোরসারি নয়, যাকে বলে কিনা মানুষের ক্ষতি করবার ভৌতিক বিদ্যা, যা নিয়ে অমন সুসভ্য ইউরোপের মাথাব্যথার অন্ত নেই।

একজন ইংরেজ মহিলা কিছুদিন আগেও আমাকে বলেছিলেন, ধর্মবিরোধী হেরেটিক হিসাবে বিচারের ধারাটি নাকি এখনও তাঁর দেশের আইন বইতে বহাল আছে, যদিও এইভাবে বিচার আজকাল হয় না। অর্থাৎ ওই আইনের খপ্পরে কাউকে ফেলা এখনও আইনের দিক থেকে অসম্ভব নয়।

অমন যে অমন শান্তির পারাবত সুইস, তাদের কথা শুনুন। এদিকে যুদ্ধবিগ্রহে এতো অরুচি, কিন্তু অন্যদিকে নিউচ্যাটেল নামে ছোট্ট একটা মফস্বলে ৫০০ লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ডাইনি অপবাদে।

ফরাসি দেশেও ভৌতিক বিদ্যার সাহায্যে গাঁয়ের লোকদের শরীরের ও মনের চিকিৎসার রীতি বহুদিন চালু ছিল। অর্থাৎ জলপড়া, ফুঁক দেওয়া শুধু ভারতীয়দের বিশেষত্ব নয়—ফরাসিও এইসব পছন্দ করেছে বহুকাল ধরে। যারা এইসব চিকিৎসা চালাতো, পান থেকে চুন খসলেই তাদের ডাইনি বা ডান বলে বিচার হতো। ফরাসি ইতিহাসে এক রক্তলোভী বিচারকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এঁর নাম নিকোলাস রেমি—ছত্রিশ বছরের বিচারক জীবনে (১৫৭৬—১৬১২) এই জজসাবে তিন হাজার নিরীহ মেয়েমানুষকে ডাইনি ছাপ দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পোড়ানোর হুকুম দিয়েছেন।

ফরাসি ঐতিহাসিকরা এখন বলছেন, গ্রাম্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতা এইসব অন্ধ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল। আর নানা ধর্মীয় কুসংস্কারে ইন্ধন জুগিয়েছে মানুষকে অমানুষ করে তুলতে।

উইচ বলতে পুরুষ এবং রমণী দুই-ই বোঝাতো, তবে যারা পুড়ে মরেছে

তাদের শতকরা ৮০ জনই রমণী। আমাদের সভ্যতায় যারা উদাসী, ঘরছাড়া, তারা ভিক্ষে পেয়েছে, গেরস্তের শ্রদ্ধা পেয়েছে, আর ফরাসি এইসব ভবঘুরেদের পাকড়াও করে বিচারকের সামনে হাজির করেছে পুড়িয়ে মারার রায় নেবার জন্যে।

যত দিন গিয়েছে মেয়েদের উপর অত্যাচার তত বেড়েছে। এর প্রমাণ সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে যাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা আশি থেকে বেড়ে নব্বুইতে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের সিংহভাগই হচ্ছেন বুড়ি অথবা অসহায় বিধবা। অনেকের আবার ধারণা ছিল ডাইনির ছেলেমেয়েও উইচ হবে, ফলে সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে ফরাসি বিবেকে বাধেনি। অনেক দুঃখে ভোলতেয়ার তাঁর লেখায় লক্ষ চিতাগ্নির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

রায়ের একটি নমুনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মডলিন নামে এক মহিলার বিচার হলো ১৬৭৯ সালে। রায়ে বলা হলো : এই ডাইনি আট বছর আগে তার ব্যাপটিজম পরিহার করে রাত্রে ডাইনিদের সঙ্গে মেশামেশি শুরু করে। এই সময়ে ডেভিল অথবা শয়তানের কাছ থেকে সে মন্ত্রপূত তেল সংগ্রহ করে এবং সেই তেল আপেলে মাখিয়ে আসামি দু'জন নিরীহ মহিলার (মারি বুলেঙ্গার এবং মারি রুসোর) ক্ষতি করার চেষ্টা চালায়। সুতরাং নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে, আসামিকে কোতোয়ালের হাতে তুলে দেওয়া হোক। আসামিকে খালি পায়ে কেবল একটা শেমিজ পরিয়ে চার্চের সামনে টেনে আনা হোক। এইখানে সবার সামনে তার গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো হবে। তারপর ওর হাতে দেওয়া হোক দু'পাউন্ড ওজনের মোমবাতি এবং সেই জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে আসামি যেন নিজের অপরাধের তালিকা নিজেই ঘোষণা করে। তারপর সে যেন অনুশোচনা প্রকাশ করে, ভগবানের কাছে ক্ষমা চায়। ক্ষমা চায় রাজার কাছে। ক্ষমাপ্রার্থনার পরে একটা খুঁটিতে ঝুলিয়ে নিশ্বাস রোধ করে ওকে মেরে ফেলা হয়।

উঁহু, শুধু মৃত্যুতেই শাস্তি পেতো না তিনশ বছর আগেকার ফরাসি। জজের রায়ে বিস্তারিত নির্দেশ থাকতো কীভাবে মৃতদেহ ভস্মীভূত করে সমস্ত ছাইটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে।

কী ধরনের অভিযোগ আনা হতো ডাইনিদের বিরুদ্ধে তাও শুনে রাখুন। জিন মার্চান্ট নামে এক মহিলা থাকতেন এক ছোট্ট শহরের পুকুর ধারে। এঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তিনি গাঁয়ের চাষার একটা শুয়োর মেরে ফেলেছেন। মারবার পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে সাক্ষী। ঝরনার জল হাতে নিয়ে মন্তর পড়ে ডাইনি সেই জল যেমনি ছিটিয়ে দিয়েছে শুয়োরের দিকে অমনি সে কুপোকাত। যখন চাষি ঐ মরা শুয়োর কাটলো তখন ভেতর

থেকে কালো ভূতুড়ে একটা প্রাণীকে পাওয়া গেলো যেটা ঠিক পাইক মাছের মতন দেখতে। আরেক জন চাষী সাক্ষ্য দিলো, এই দুষ্টু রমণীকে একদিন গেরস্তর গোরু দুইতে ডাকা হয়েছিল। তারপর থেকেই যে-গোরু বালতি-বালতি দুধ দিতো তার বাঁট শুকিয়ে গেলো। আর একজনের সাক্ষ্য : এই দুষ্ট রমণী একদিন তার কোলের ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঠিক তিন মাস পরে দু'বছরের ছেলেটা মারা গেলো। আর একজন সাক্ষীর বক্তব্য : ২১শে সেপ্টেম্বর এই দুষ্ট মহিলা গেরস্তর বাড়িতে এসেছিল মাখন ধার চাইতে। সেই রাতেই বাড়ির ছেলের গুরুতর অসুখ করলো।

একালের ফরাসি ঐতিহাসিক জিন মার্চান্টের মামলাটা খুঁটিয়ে বিচার করছেন। দেখা যাচ্ছে এই মহিলা ছিলেন অতি দরিদ্র। প্রায়ই ধার করতে ছুটতেন সম্পন্ন গেরস্তদের বাড়িতে। যাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে এই মহিলার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করলেন, তাঁরা সবাই অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের।

আর এক মহিলা, তাঁর নাম জিন পেতি। বয়স চুয়ান্ন। এঁর দোষ, তিনটি স্বামী অকালে মারা গিয়েছেন, ফলে চতুর্থবার বিয়ে করেছেন তিনি। এঁর সংসার চলতো গাঁয়ের রাখালের কাজ করে। এঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কয়েকটা গোরু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিশ্চয় কিছু মন্তর পড়া জল ছিটিয়েছে এই ডাইনি। আর একজন সম্পন্ন চাষির বউ মারা গেলো, স্বামীর স্থির বিশ্বাস এটাও এই ডাইনির অপকর্ম। মান্যবর বিচারকের কাছে পরের পর তেরোজন সাক্ষী হাজির হলো।

সবচেয়ে যা মর্মান্তিক তা হলো, সাক্ষীদের কথা শুনবার পরে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আসামির ওপর নিরন্তর নিপীড়ন। অত্যাচার সহ্য করতে না পরে অনেকেই 'অপরাধ' স্বীকার করতো। যেমন জিন পেতি স্বীকার করলেন, ডেভিলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল যখন ডেভিল একটা প্রজাপতির রূপ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। দৈত্যদানার সঙ্গে এই রমণী নাকি দেহসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং একজন অতিপাজি দানা তাঁকে মন্ত্রপূত গম উপহার দেয়। মন্তর-পড়া এই গম কোনও পশুর দিকে ছুড়ে দিলে তার বিনাশ অবধারিত।

আর একজন অসহায় মহিলা অত্যাচারের চাপে স্বীকার করলেন, তাঁর সঙ্গে থাকে মন্তর-পড়া পাউডার। এই পাউডারের সাহায্যে গৃহস্থের যে কোনও অকল্যাণ করা যায়। এই মহিলা শয়তানের নামটাও স্বীকার করলেন। যে-শয়তানের কাছ থেকে এই মহিলা ডাকিনীবিদ্যা লাভ করেছিলেন তার নাম নিকোলাস রিগো। এই নিকোলাস রিগো অশরীরী হয়েও সহবাস করেছে আসামির সঙ্গে এবং যাবার সময় মহিলার 'আত্মা'কে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছে।

ডাইনিদের বিচার প্রসঙ্গে 'স্যাবথ' শব্দটি বেশ কয়েকবার আসা যাওয়া করলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। পাঁচুদা বললেন, "তুই ভাবছিস

স্যাবাথ মানে খ্রিস্টানদের বিশ্রামের দিন। একটা মানে তাই অর্থাৎ রবিবার। আবার প্রাচীন ইহুদিদের কাছে স্যাবাথ ডে বলতে বোঝাতো শনিবার। কিন্তু ইউরোপীয় ডাকিনীতন্ত্রে মানে মধ্যরাত্রে ডাইনিদের গোপন আলাপ-আলোচনা। তুই দেখবি, অত্যাচারের চাপে সব ডাইনিই স্বীকার করেছে, গভীর রাতে গহন অন্ধকারে তারা স্যাবাথ-এ অংশ গ্রহণ করেছে।"

ফরাসি নৃশংসতার আর একটা নমুনা সংগ্রহ করা হলো। ইনশি বলে এক জায়গায় স্বামী ও স্ত্রী দু'জনকে জাদুবিদ্যার অভিযোগে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলো। এঁদের দুটি ছেলে, বয়স দশ এবং বারো। হুকুম দেওয়া হলো বধ্যস্থলে যেন এদেরও উপস্থিত রাখা হয় যাতে বাবা-মায়ের শাস্তিটা তারা নিজের চোখে দেখে। তারপর দু'জনকে যেন প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়, তারপর গাঁয়ের একটা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়। সেই সময় মাঝে-মাঝে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই দুই কিশোরকে প্রভু যিশুর ধর্মশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে।

পাঁচুদা বললেন, "সামান্য কিছুদিন আগেও মানুষ কি হৃদয়হীন ছিল তা ঐতিহাসিকদের বিবরণ না শুনলে বিশ্বাস হয় না। একমাত্র সুখের কথা, সপ্তদশ শতাব্দীতেই এর রমরমা, চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালেই এইসব ডাইনি নির্যাতনের অবসান ঘটলো। তুই তো জানিস, চতুর্দশ লুই দেহরক্ষা করলেন ১৭১৫ সালে।

ফরাসি তাহলে এখন মোহমুক্ত। কিন্তু ফরাসি পণ্ডিতরা একমত হচ্ছেন না। তাঁরা একেবারে হাল আমলের একটা ঘটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে হিলুপ বলে একটা জায়গায় জঁ কামু নামে এক গেঁয়ো ডাক্তারের মৃতদেহ পাওয়া গেলো। এঁকে সবাই হাড়বসানো ডাক্তার বলতো, নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

খবরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় গাঁয়ের দুইভাই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো তারাই জঁ কামুকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ এই লোকটির জাদুর চোটে তাদের এক দাদা মারা গিয়েছেন এবং বেশ কিছু গোরু-বাছুর গোয়াল থেকে উধাও হয়েছে। এই দুই ছোকরার মা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন, জঁ কামু একজন উইচ। শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল জঁ কামুর। প্রমাণ : যে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে কামু তাকেই ক্যানসার রোগ ধরিয়ে দিয়েছে। মহিলার বিশ্বাস, উল্টো মন্তর চালিয়ে তাঁর এক ছেলে একজন ক্যানসার রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু কামুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেনি। এরপর এমন দুষ্ট ডানকে মেরে ফেলা ছাড়া অন্য কী উপায় থাকতে পারে?

পাঁচুদার দেওয়া বই পড়তে-পড়তে আমার জ্ঞানচক্ষু ক্রমশ উন্মীলিত হচ্ছে। যারা এই সেদিনও হাজার-হাজার মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়েছে তারা তো আগ্রহী হবেই খুঁজে বের করতে পৃথিবীর অন্য কোথায় এখনও এই কাণ্ড হচ্ছে।

যা আমাকে অবাক করেছে, এই কিছুদিন আগেও ইউরোপীয় সভ্যতার হালটা কীরকম ছিল। যা আরও খোঁজার দরকার, কোন পরশমণির স্পর্শে ইউরোপ তার অন্ধকার থেকে অমন সুন্দর ভাবে বেরিয়ে এলো? আর কেন আজও আমাদের দেশের কিছু অংশকে আমরা কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে পারলাম না?

পাঁচুদার দেওয়া কাগজে সেকালের চার্চের নানা অত্যাচারের লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে, নতুন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের আলোকে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে চার্চের যে বিদঘুটে ধারণা ছিল এবং জনসাধারণ যা শত-শত বছর ধরে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তা পড়লে মাথা ঘুরে যায়।

জনজীবনে চার্চের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব যার তুলনায় আমাদের গোঁড়া পুরোহিত বা মোল্লা নিতান্ত শিশু। চার্চ ঠিক করতো নরনারীর একান্ত দৈহিক মিলন কীভাবে হবে। সেই নিয়মের পান থেকে চুন খসলে যেসব শাস্তির বিধান ছিল তা নিয়ে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরা লিখছেন এবং একালের ফরাসি হাসিঠাট্টা করছে। পরিবার পরিকল্পনার প্রতি চার্চের ছিল প্রচণ্ড রাগ—তাই কোনও সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বিলম্বিত করা ছিল নরহত্যার সমান অপরাধ। লোকেও ছিল সেইরকম, তারা ছুটতো স্বীকারোক্তির জন্যে। কনফেসনের পর যাজকরা বিধান দিতেন। যার ফলে কাউকে দশ বছর, কাউকে পনেরো বছর উপোস করতে হতো। যারা ভাবে শুধু এদেশের মানুষ কথায়-কথায় ধর্মের নামে উপোস করে তারা পুরনো ইউরোপের খোঁজখবর রাখে না।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা শুধু হিন্দু শ্লোগান নয়, সারা ইউরোপই এই আইনে মশগুল ছিল শত-শত বছর ধরে। তাই স্বামীর সঙ্গে অত্যধিক প্রেমকেও গোঁড়া ইউরোপীয় শাস্ত্রকাররা এক ধরনের বেশ্যাবৃত্তি বলে নিন্দা করেছেন এবং শাস্তিবিধান করেছেন। বিয়ে মানে শুধু গণ্ডায়-গণ্ডায় ছেলেপুলে হোক।

সেকালের সাধারণ মানুষের সুখঃদুঃখকে পাঠকের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপিত করে ফরাসি ঐতিহাসিকরা পৃথিবীর সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ধর্মীয় চাপে, পরিবার পরিকল্পনাহীন সমাজে সাধারণ মানুষের অবস্থা নির্ণয় করতে এক বৃদ্ধার উক্তি তাঁরা খুঁজে বের করছেন।

বৃদ্ধা বসেছিলেন তাঁর মেয়ের পাশে, সে সদ্য একটি শিশুর জন্ম দিয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করেছে, এইটি কত নম্বর ছেলে? মহিলা রেগে মেগে বলেছেন, কেন মিথ্যে বলবো, এইটি সপ্তম সন্তান। চব্বিশ বছরে আমার মেয়ের এই হাল

হবে জানলে আমি চব্বিশ বছরের আগে মেয়ের বিয়েই দিতাম না।

তারপর রয়েছে আরও কিছু উদ্ধৃতি : "গরিবগুব্বো এবং ঝি-চাকরদের দুঃখ কে দ্যাখে? আগে দিনকাল ভাল ছিল, আট ন'বছরের ঝিগিরি করে শতখানেক টাকা জমিয়ে একটা ভাল মুদি বর জোগাড় করা সম্ভব হতো। এখন ওই টাকায় আমরা বর হিসাবে পাই কোচোয়ান বা ঘোড়ার সইস। বিয়ের পরই এরা পরের পর তিনচারটে ছেলেমেয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর। এদের খাওয়াবার মতো মুরোদ এই সব মরদের নেই, ফলে আমরা আবার বেরিয়ে পড়ি ঝিগিরি করতে।"

পাঁচুদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছিস?"

"পাঁচুদা, আমি ফিরে গিয়েছিলাম আমাদের হাওড়ার পুরনো বস্তিতে।

ওখানে অসহায় গরিব মেয়েদের এখনও একই অবস্থা। ফ্রান্স আগে যা ছিল আমরা এখনও তাই আছি। ফরাসি নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু ছুঁড়ে দিয়েছে আমরা এখনও তা পারিনি। ফরাসি যদি কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাদের অতীত কী রকম ছিল দেখবার জন্যে আমাদের সম্বন্ধে একটু বাড়তি খোঁজখবর করে তা হলে বোধহয় অন্যায় কিছু নেই।"

মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার, পরি তো কার্তিয়ার। প্যারিসের রাজপথ ধরে সকালবেলায় চলেছি একান্ন নম্বর রু পিয়ের শ্যাঁরোর দিকে। আমার পথপ্রদর্শিকা সম্বিতের একান্ত সহকারিণী ক্যারোলিন।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না, পরামর্শ দিয়েছেন সম্বিৎ। ফরাসির এবং ভারতীয়র উভয়েরই অতীতের নানা দোষ ছিল, তার ফিরিস্তি করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে, কিন্তু আখেরে কোনও লাভ হবে না। সুতরাং কে কবে কোথায় মেয়েমানুষের ওপর কত অত্যাচার চালিয়েছে তার স্মৃতি রোমন্থন চালিয়ে বিদেশের মূল্যবান সময় নষ্ট করে কী হবে?

তা ছাড়া পাঁচুদার কথাও মনে পড়ছে। তিনি বিদায় দেবার সময় সেদিন বলেছিলেন, দোষ থাকাটা কোনও অপরাধ নয়, অপরাধ হলো দোষটা পুষে রাখা। তাকে দূর না-করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা। সে-বিষয়ে ফরাসি ইদানীংকালে বিস্ময়কর তৎপরতা দেখিয়েছে, তবেই-না সে তার স্বর্ণযুগে এসে

পৌঁছেছে আবার। শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, চারুকলায় ফরাসি তো অকারণে পৃথিবীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেনি। শুধু সরস্বতী নয়, একই সঙ্গে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হয়ে উঠেছে সমস্ত জাতটা।

সম্বিৎ বললো, "ভারতবর্ষও একদিন এইরকম হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা রাখে শংকরদা, এ-বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।"

সম্বিতের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমরা ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে পড়েছি। পরিস্থিতির চাপে যতই পিছোচ্ছি ততই উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ছি। আমরা চিন্তা করি না, শ্লোগান দিই, আমরা নতুন সম্পদ সৃষ্টিতে মন না দিয়ে যা আছে তা কীভাবে ভাগ হবে তা নিয়ে খেয়োখেয়ি করে। আমরা নানা অলীক যুক্তির অবতারণা করে অতীতের অন্যায়গুলো আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। পৃথিবী যদি এর পর আমাদের একঘরে করে দেয় তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার কথা উঠতেই সম্বিৎ-এর খেয়াল হলো আমাকে ফরাসি পারফিউমের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়নি।

মনে ভাবের উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেলো। টেলিফোনে কার সঙ্গে মঁশিয়ে সেনগুপ্তর কথা শুরু হলো। ফরাসি ভাষায় লম্বা কথাবার্তা চলে যখন, তখন কিছুই বুঝতে পারি না। শুধু ভাবতে অবাক লাগে শহিদনগরের এই ছোকরা এই সেদিনও ফরাসির 'ফ' জানতো না, এখন ফরাসিকে প্রায় মাতৃভাষা করে তুলেছে। ফরাসি জাতকে জানবার চাবিকাঠি হলো এই ফরাসি ভাষা। যে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করলো না ফরাসি তাকে কোনওদিন গ্রহণ করবে না। আমি নিজে ফরাসি ভাষা না জানলেও অপেক্ষা করে থাকি একটা বিশেষ শব্দের জন্য। টেলিফোনে সম্বিৎ যখন 'ম্যাসিবুক' বললো বুঝলাম এবার কথাবার্তা শেষ হলো।

সম্বিৎ [illegible] আমাকে অবাক করে দিলো। বিশ্ববিখ্যাত কার্তিয়ার কোম্পানিতে আমার [illegible] পাকা হয়ে গেলো। কর্তৃপক্ষ নাকি আমাকে পেলে খুবই খুশি হবেন! [illegible] সৌজন্যের তুলনা নেই, কিন্তু তাই বলে আমার মতন একজন কুড়ি ডলারের বাঙালিকে কার্তিয়ার কোম্পানিতে নেমন্তন্ন করে এঁরা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। কারণ কোটিপতি ছাড়া আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যে কার্তিয়ার কোম্পানির পড়তায় পোষায় না তা জানতে দুনিয়ার কারও বাকি নেই।

সম্বিৎ ইতিমধ্যেই কার্তিয়ার কোম্পানির খরিদ্দার হয়েছে কিনা তা জানা নেই। কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানে যে ইতিমধ্যে তার রীতিমত দহরম-মহরম সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে ওদের জন্যে কিছু বিশেষ কাজ সে করেছে। কার্তিয়ার কোম্পানির মুখ এমনিতেই উজ্জ্বল হয়ে আছে, কিন্তু সেই

সুন্দর মুখকে আরও সুন্দর করবার জন্যে যে প্রচেষ্টা নিরন্তর চলেছে তাতে ইন্ধন জোগাবার একটা ভূমিকা ব্যারন দ্য শহিদনগরের পাওনা হয়েছে।

শুনলাম, যাঁর সঙ্গে কথা হলো তিনি কার্তিয়ার কোম্পানির কর্ণধার অ্যালাঁ ডোমেনিক পেরেঁ। ১৯৭৭ সাল থেকে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছেন এবং এঁর আমলে কোম্পানির যে প্রচণ্ড অগ্রগতি হয়েছে তা দুনিয়ার ব্যবসায়ী মহলে কারও অজ্ঞাত নয়। দুঃখের বিষয় পেরেঁ আগামীকাল থাকছেন না। কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার সব ব্যবস্থা তিনি পাকা করে যাচ্ছেন।

সম্বিৎ বললে, "এক ঢিলে লোকে দুটো পর্যন্ত পাখি মেরেছে, আপনি এবার তিনটে কিংবা চারটে পাখি মেরে ফরাসির শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবেন।"

"বৎস, সম্বিৎ, তোমার হেঁয়ালি ছাড়ো। একটু আলো দেখাও।"

সম্বিৎ হেসে বললো, "ইণ্ডিয়ার রাজা মহারাজাদের সম্বন্ধে বই পড়ে দেখবেন—ওঁদের গহনাগাটি তৈরি হতো এই কার্তিয়ারে। ইণ্ডিয়ার এখনকার শিল্পপতিদের মণিবন্ধের দিকে তাকাবেন—ওখানে যে হাতঘড়িটি বাঁধা থাকে তার নাম অবশ্যই কার্তিয়ার। আর এঁদের সুন্দরী গৃহিণীরা যে-গন্ধটি সোনার অঙ্গে স্প্রে করে সুখ পান সেটির নামও কার্তিয়ার। তাহলে অলঙ্কার, কাল নির্ণয় ও সুরভি তিনটির চূড়ান্ত রহস্য একই সঙ্গে আপনি আয়ত্ত করতে পারছেন।"

চতুর্থ সম্ভাবনাটিও সম্বিৎ ব্যাখ্যা করলো। "এই কোম্পানি আর্টের মস্ত বড় সমঝদার। অবিশ্বাস্য ব্যবসায়িক সাফল্য থেকে যে বিপুল অর্থ উপার্জন হয় তা সবটাই পকেটস্থ না করে এঁরা স্থাপন করেছেন কার্তিয়ার ফাউণ্ডেশন, যা ইতিমধ্যেই শিল্পরসিকদের বিপুল কৌতূহলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আর্টকে কী ভাবে কদর করতে হয় তাও ফরাসি বিজনেসম্যানরা দেখিয়ে দিচ্ছেন দুনিয়াকে। ইদানীংকার ফরাসির বীজমন্ত্র হলো যা করো তা স্টাইলে করো। পুতুপুতু করে কোনও ভাল কাজ হয় না। আর যে কাজে দুনিয়ার সেরা হবার সম্ভাবনা নেই সে কাজের দিকে হাত বাড়ায় না কার্তিয়ার।"

কার্তিয়ার কোম্পানির সদর দপ্তরের বাড়িখানা দেখবার জিনিস। ক্যারোলিনও ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছে, কারণ ফরাসি হয়েও কার্তিয়ারে ঢোকার সুযোগ সে আগে পায়নি। "ওসব দুনিয়ার বড় লোকদের এবং তাদের সুন্দরী বউদের জন্যে। আমরা ওখানে কী করে ঢুকতে পাবো?"

পথে যেতে-যেতে ক্যারোলিন আমাকে তৈরি করছে। বলছে, "ওদের শোরুমে যে দরজা আছে সেটা কালো গ্রানাইটে তৈরি। ওইটা মন দিয়ে দেখতে ভুলবে না। দুনিয়ায় এরকম দরজা আর কোথাও পাবে না, মিস্টার মুখার্সি।"

মিস্টার মুখার্সি এই মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিচ্ছে, পকেটে যে কুড়িটি ডলার

থাকবার কথা সেটি যথাস্থানে আছে কি না তা দেখে নিচ্ছে।

আমরা দূর থেকে কার্তিয়ার কোম্পানির সদর দপ্তরটি দেখতে পাচ্ছি। ক্যারোলিন বললো, "সেনগুপ্তর কাছে শুনেছি, এখানেই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে দামি লাক্সারী হোটেল। নোভাপ্যান। এখানে সেই সময়ে এক রাত শোবার জন্যে দিতে হতো দেড় লাখ টাকা। জানো মিস্টার মুখার্সি, এক সময়ে এই হোটেলের সামনে ৬০টা রোলস্ রয়েস গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতো।"

এখন তো একখানাও রোলস্ ধারে কাছে দেখছি না। দেখতে পাবো কী করে? ওই হোটেলই উঠে গিয়েছে। অত বড়লোকি প্যারিসও সহ্য করতে পারলো না। ক্যারোলিন অবশ্য অন্য কথা বললো, "মিস্টার মুখার্সি, একালের বড়লোকরা ভীষণ কিপ্টে হয়ে উঠছে। ডাচদের হাওয়া লাগছে দুনিয়ার কোটিপতিদের গায়ে।"

"তা হলে কার্তিয়ার কোম্পানির রমরমা চলছে কী করে, ক্যারোলিন? হোটেলের এতো বড় বাড়িটা কিনে তারা কোন্ ভরসায় কোম্পানির আপিস করলো?"

"মিস্টার মুখার্সি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। কিপ্টে বড়লোকরা হোটেলে ঘুরে ঘুমোবার জন্যে টাকা ঢালবে না, কিন্তু তারা গয়না কিনবে কোটি-কোটি টাকার, ওটা তো ঠিক খরচ নয়, বিনিয়োগ। কারণ কার্তিয়ারের গহনার দাম তো কমে না, বরং যত সময় যায় তত বেড়েই যায়। কার্তিয়ারের 'হল মার্ক'-এর যে কী সম্মান তা দুনিয়ার সমস্ত বড়লোক এবং তাদের ব্যাঙ্কাররা জানে।"

এবার কার্তিয়ারে প্রবেশ—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে! গেটেই ভি আই পি সম্মান পাওয়া গেলো। রিসেপশনের অসামান্য সুন্দরী দুই যুবতীকে ডানাকাটা পরী বলাটা অত্যুক্তি হবে না। তারা আমার নাম শুনেই বলে উঠলো, "মঁশিয়ে মুখার্সি, আমরা তো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

আমরা পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছি। ক্ষমা চাইতে গেলাম। সুন্দরীরা কোনওরকম কোপ প্রকাশ করলো না, শুধু জানালো গত পাঁচ মিনিট ধরে আমার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় থেকে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল।

এক নম্বর সুন্দরী আমাদের নিয়েই অফিসের ভিতরে চললো। সুন্দরী জানালো, প্রথম যাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে তার নাম অলিভিয়ার স্টিপ। ইনিই কার্তিয়ারের চিফ দ্য পারফিউম—অর্থাৎ কিনা সুগন্ধি বিভাগের বড় সায়েব।

বড় সায়বেটি একেবারে মাইডিয়ার লোক। নিতান্তই ছোকরা, বয়স মাত্র তিরিশ। এই ছিপছিপে যুবকটিকে রাস্তায় অথবা মেট্রোতে দেখলে আমার মাথাতেও আসতো না যে এতো বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে।

উঁচু পদের ফরাসিদের মস্ত গুণ এঁদের মধ্যে দেমাক দেখাবার রেওয়াজ নেই। এই দোষে ইংরেজ ঘায়েল হয়েছে—বড় সায়েব না মহারাজা তা ইংরেজ ম্যানেজারের হাবভাব দেখে বোঝা শক্ত হতো। তাল বুঝে ইংরেজ এই রোগটা আমেরিকানের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। তার মূল্য দিতে হচ্ছে এখন আমেরিকানকে। জাপানি দেখলেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতে হচ্ছে। ফরাসিরা বুদ্ধিমান—বিনয় এবং সরলতা এদের মুখোশ নয়, মানুষকে এরা সহজভাবে নিতে পারে। ফলে ফরাসি যে আন্তর্জাতিক বিজনেসে উত্তরোত্তর ভাল করবে তাতে সন্দেহ কী?

অলিভিয়ার স্টিপ মুহূর্তেই আপন হয়ে গেলো। সে জানে আমি যে ভাষায় লিখি সেখানে কার্তিয়ারের কোনও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নেই। দরিদ্র বাঙালির জন্যে রূপকথার সন্ধানে বেরিয়েছি আমি। কিন্তু তার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই অলিভিয়ারের। আমি একজন লেখক এবং লেখক হিসাবে আমি কার্তিয়ারে আসবার তাগিদ অনুভব করেছি তাতেই সে সন্তুষ্ট।

আরও একটি কারণে ছেলেটিকে ভাল লাগলো। আধুনিক ইংরেজ ম্যানেজার এবং আমেরিকান ম্যানেজার সারাক্ষণ দেখাবার চেষ্টা করে তার কাজের চাপ প্রচণ্ড। প্রতিটি মিনিট তার কাছে হিরে বসানো অলঙ্কারের মতন মূল্যবান। এই 'শো অফ' নেই অলিভিয়ারের মধ্যে। সে শান্তভাবে নিজের কথাও দু'একটা বলে ফেললো। যেমন, জীবন শুরু করেছিল এক ব্যাঙ্ক-কর্মী হিসাবে। সেখান থেকে চলে যায় ইণ্ডাস্ট্রিতে। সেখানে কাজ ছিল, খরিদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির। বিখ্যাত ওই কোম্পানি থেকে ব্রিটানির এই ছেলেটি চার বছর আগে চলে এসেছে কার্তিয়ারে। এরই মধ্যে সে পারফিউম বিভাগের প্রধান হতে পেরেছে। কিছুদিন কার্তিয়ারে ঘড়ি বিভাগেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

কার্তিয়ারকে আমি কলকাতার পি সি চন্দ্র ভেবেছিলাম। দুনিয়ার ধনী গৃহিণীদের অলঙ্কার নির্মাতা হিসাবেই তার সুনাম। কিন্তু অলিভিয়ার আমার মনের বোতলকে প্রথমেই একটু ঝাঁকানি দিলো। কার্তিয়ার শুধু গহনা নির্মাতা নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত এবং অবশ্যই সবচেয়ে সফল 'লাক্সারী' বা বিলাস কোম্পানি বলতে কার্তিয়ারকেই বোঝায়।

এঁদের আদি ব্যবসা অলঙ্কার। অলঙ্কার থেকে এঁরা ঘড়িতে গেলেন। কার্তিয়ার কব্জিতে না থাকলে পৃথিবীতে কেষ্টবিষ্টু হওয়ার মানে হয় না। ঘড়ি শুধু মণিবন্ধেই থাকে না, টেবিলে থাকে। এমন একটি ছোট্ট চাইনিজ জেড টাইমপিস তাঁদের দোকানে দেখার এবং আলতোভাবে স্পর্শ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এই অধম বঙ্গসন্তানের—দাম আসলি বড়লোকদের কাছে তেমন কিছু নয়, মাত্র চার কোটি টাকা। যাদের সময় মূল্যবান, তাদের সময় মাপার যন্তরটিও যে একটু

মূল্যবান হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

না, এই মুহূর্তে ঘড়িতে মজলে হবে না, আমাদের লক্ষ্য পারফিউম। এই কারবারে কার্তিয়ারের নামবার কথা ছিল ১৯৩৯ সালে, সব ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধ এসে দুনিয়ার বিলাসস্রোতে বাধা সৃষ্টি করলো। ফলে কার্তিয়ার পারফিউমের ব্যবসায় নামলেন যুদ্ধের অনেক পরে ১৯৮১ সালে। এরপরে এসেছে আরও নানা বিলাসদ্রব্য, যা ভোগ করতে না পারলে ধনী সমাজে কল্কে পাবার বিন্দুমাত্র সম্ভবনা নেই, সে আপনি আমেরিকান ধনীই হোন অথবা জাপানি ধনীই হোন।

এই পারফিউমের ব্যবসার গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে, কার্তিয়ারের মোট ব্যবসার শতকরা আট ভাগের মতন। খান কয়েক দোকান থেকে, যেখানে কোনও ভিড়ই দেখা যায় না সেখান থেকে কার্তিয়ারের ব্যবসার পরিমাণ শুনে চক্ষু ছানাবড়া হবার অবস্থা। খোদ জামশেদপুরের টাটা স্টিল কোম্পানিও লজ্জা পাবেন। ছোকরা বিনীত ভাবে বললো, 'এমন কিছু নয়, মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা বছরে, আমাদের বিক্রিবাটা অনেক বাড়াতে হবে।"

বুঝুন অবস্থা।

খুব বিনীতভাবে ছোকরা বললো, "পারফিউম ব্যবসাকে আমরা অলঙ্কার ব্যবসার অঙ্গ হিসেবে দেখি।" ছোকরার টেবিলে দু'একটি কৌটো শোভা পাচ্ছে—যা অলঙ্কারকে অবশ্যই লজ্জা দেয়। এই সোনালি কনটেনারের মধ্যে ছোট্ট একটি শিশি যার মধ্যে ৫০ অথবা ১০০ মিলিলিটার পারফিউম আশ্রয় নিচ্ছে একটি কাঁচের শিশিতে। কার্তিয়ার বিলাসিতার বিশেষত্ব এই কনটেনারটি চিরকালের, শুধু রিফিলটি প্রয়োজন মতন মাঝে মাঝে পাল্টে নাও। দুনিয়ার এক নম্বর অলঙ্কার নির্মাতা ছাড়া অমন কনটেনার তৈরি যে সম্ভব নয় তা ফরাসির অতি বড় শত্রুও স্বীকার করবে।

অলিভিয়ারকে সত্যি কথা বলে ফেলা যুক্তিযুক্ত মনে হলো। আমি পারফিউমের 'প' পর্যন্ত জানি না। বাবার মৃত্যুর পরে কে একশিশি অগুরু কিনে এনেছিল, সেই থেকে (১৯৪৭) মনের মধ্যে মৃত্যুর একটা গন্ধ তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিয়ের সময়ে একটা সেন্ট কেনা হয়েছিল, ব্যবহার করা হয়নি, কেমন যেন পচা মদের গন্ধ। তারপর থেকে পরের গায়ে সুঘ্রাণ অনেকবার নাকে এসেছে লিফটে, অফিসে, পার্টিতে, বিয়েবাড়িতে—কিন্তু কী তার রহস্য, কোন কোম্পানির কোন জিনিসে কী মায়ামোহ সৃষ্টি হয় তা জানবার সৌভাগ্য হয়নি।

অলিভিয়ার স্টিপ হতাশ হলো না। বললো, "এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে পারফিউমের প্রচারের আরও কত সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। ফরাসিদের মাত্র তিন বিলিয়ন ডলারের পারফিউম ব্যবসা করে সন্তুষ্ট থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।"

অলিভিয়ার আমাকে আরও জব্দ করলো। "মহাশয়, তোমার বিনয়ের প্রশংসা করছি, কারণ তুমি যে-দেশ থেকে এসেছো, সে-দেশে কয়েক হাজার বছর ধরে সুগন্ধি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তোমাদের আতরের কথা আমরা জানি না, একথা ভেবো না। আতরও যে অন্তত দেড়শ রকমের হয় তা আমার জানা আছে। আমাদের যেমন অডিকোলন, তোমাদের তেমনি গোলাপ জল, গোলাপের পাপড়ি থেকে আতর নিষ্কাষণের পর এই গোলাপ জল পড়ে থাকে।"

আমাদের এই আতরেরও বিশ্বব্যাপী সম্ভাবনা আছে। এর সমঝদারও আছে, কিন্তু আমরা এ-বিষয়ে মন দিইনি, তাই ব্যাপারটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে পড়ে আছে. মান পড়ে গিয়েছে এবং জিনিসটা ভেজালসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। ফলে আমাদের আতর রপ্তানি কয়েক লাখ টাকায় পড়ে রয়েছে। আর ফরাসি পারফিউমের জন্যে হাহুতাশ করছে না এমন মানুষ পৃথিবীর কোথাও জন্মায়নি।

অলিভিয়ার যা বললো তার থেকে কিছু-কিছু খবর সংক্ষেপে নিবেদন করছি। ফ্র্যাগরান্স বা পারফিউম গরিবের জিনিস নয়। এসেন্স তৈরি করতে প্রচুর ধৈর্য ও প্রচুর খরচ হয়। যেমন মনে রাখা ভাল, এক টন গোলাপ পাপড়ি থেকে মাত্র কয়েক আউন্স গোলাপ নির্যাস পাওয়া যায়।

আমি অকপটে স্বীকার করলাম, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম না পুরুষ ও মহিলাদের সেন্ট আলাদা। মহিলার সেন্ট গায়ে মেখে কোনও পুরুষের ঘুরে বেড়ানো ফরাসি সমাজে অন্য কোনও ভয়ঙ্কর মানসিক বিকৃতির ইঙ্গিত দেবে।

অলিভিয়ার আমাকে এবার কিছু গোপন জ্ঞান দিলো। পারফিউমের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি হজম করে সুরসিক হতে গেলে সারা জীবনের সাধনা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, একটা মানানসই পারফিউমের মধ্যে অন্তত একশ রকমের নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মিশ্রণ আছে। দুশো রকমের জিনিস লাগে এমন পারফিউমও ফরাসি দোকানদার হামেশাই বিক্রি করছে।

শিশির মুখ খুলে নাকে গন্ধ নিলেই পারফিউম বোঝা গেলো না। মানুষের শরীরে সংস্পর্শে এলেই তাৎক্ষণিক নানা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

সঙ্গীতের মতন প্রতিটি পারফিউমের মোটামুটি তিনটি পর্ব। 'টপ নোট' : শুরুতেই যে গন্ধ নাকে এসে মানুষকে মাত করে দেয়। কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো পরবর্তী ভূমিকা, যাকে বলা হয় 'মিড্‌ল নোট'! এই পর্বে পারফিউমের প্রকৃত চরিত্রটি প্রকাশমান হয়। এর পরে 'এণ্ড নোট' বা 'প্রান্তিক সুর' যা বহুক্ষণ থেকে যায়। আর একটি শব্দ প্রায়ই পারফিউমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে

প্রয়োজনীয়—শরীরে, রুমালে, বস্ত্রে বহুক্ষণ আঁকড়ে থাকার ক্ষমতা। ভাল ফরাসি পারফিউমের এই যে 'স্টে' অবিশ্বাস্য—সস্তাদামের পারফিউম এইখানে মার খায়। গায়ে ছড়াবার কিছুক্ষণ পরেই গন্ধ উধাও, দীর্ঘস্থায়ী হবার ক্ষমতা নেই কমদামি জিনিসের।

বড় সাইজের অডিকোলেনের দাম কম, অথচ এক চিলতে পারফিউমের দাম বেশি কেন তাও এবার জানা গেলো। হ্যাণ্ডকারচিফ পারফিউমে সুগন্ধি নির্যাসের পরিমাণ দশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্টি, বাকিটা অ্যালকোহল। টয়লেট ওয়াটার বা কোলনে এই সুগন্ধির পরিমাণ মাত্র ২ থেকে ৬ পার্সেন্টি। ছিটোবার কোলন বা আফটারশেভ লোশনে এর পরিমাণ আধ পার্সেন্টি থেকে দু' পার্সেন্টি। সুতরাং নিতান্ত আনাড়ি ছাড়া কেউ মাপ দেখে পারফিউমের দাম দিতে চায় না।

শুনুন, মশাই, দোকানে গিয়ে স্রেফ 'আমাকে সেন্ট দিন' বলে লজ্জায় পড়বেন না। এটা হবে, বউবাজারের গহনার দোকানে গিয়ে 'আমাকে গহনা দিন' বলার মতন। দোকনদার জানতে চাইবেন, আপনি রূপোর গহনা, ব্রোঞ্জের গহনা, সোনার গহনা না দামি পাথরের গহনা চান। তারপরেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, আপনাকে বলতে হবে গলার গহনা, না কানের গহনা, না নাকের গহনা, না হাতের গহনা, না কোমরের গহনা, না পায়ের গহনা? তারপরেও যে কত ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়োজন তা যে পাঠক ঠিকমতন জানেন না, তিনি দয়া করে যে-কোনও বাঙালি মেয়ের শরণাপন্ন হোন। সব প্রশ্ন পাঁচ মিনিটে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তেমনি ফরাসি পারফিউম সম্বন্ধে যে কোনও ইউরোপীয় বা আমেরিকান আপনাকে বলে দেবে, মোটামুটি পাঁচটা প্রধান ভাগ ফ্লোরাল (ফুল), সাইপার, ফার্ন, অ্যামবার, লেদার এবং ফ্রেশওয়াটার। ফুলের মধ্যে আবার পাঁচটি প্রধান-প্রধান ভাগ। মোদ্দা কথা, মেয়েমানুষের জন্যে পারফিউম পছন্দ করতে গিয়ে আপনি প্রথমেই পনেরোটি রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। এবার যতক্ষণ-না আপনি পথ নির্বাচন করতে পারছেন ততক্ষণ আর এগোতে পারছেন না।

এরপরে পথে আসুন, দাদা। আপনি ফুলের গন্ধ ভালবাসেন, না মশলার গন্ধ, না গাছের গন্ধ, না চামড়ার গন্ধ, না জন্তুজানোয়ারের গন্ধ? ব্যাপারটায় ঘাবড়ে যাবেন না। আপনি গোলাপের গন্ধে মাতোয়ারা হবেন, না শিউলি ফুলের আঘ্রাণ নেবেন তা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করবে। আপনি চন্দনকাঠে আকৃষ্ট হবেন, না খুসখুস নামের ঘাসে আকৃষ্ট হবেন তা আপনাকে ঠিক করতে হবে। আপনার আকর্ষণ থাকতে পারে মশলার দিকে—লবঙ্গ, কিংবা দারুচিনি। কিংবা কোনও চামড়ার গন্ধ, কিংবা বিশেষ ধরনের গাছের ছাল। কিংবা কোনও ফলের সুরভি। সুতরাং সাধে কি আর ফরাসি আপনার গন্ধের মানসিকতা বুঝতে প্রাণপাত করছে। এক-এক জাতের টান এক-এক দিকে, কেউ তিমি মাছের গন্ধে

নাক সিটকোয় অবার কস্তুরিমৃগের কথায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। ফরাসি গন্ধবিশারদ সেই সব হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে এক-এক মানসিকতায় খরিদ্দারের জন্যে এক-এক রকম পারফিউম তৈরি করছে।

আরও একটু জ্ঞান বাড়লো। আমরা এই হাওড়ায় বসে দুটো তিনটে ফরাসি পারফিউম কোম্পানির নাম শুনেছি। কিন্তু অন্তত ৫৫টা জগদ্বিখ্যাত ফরাসি কোম্পানি এই লাইনের আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করেছে এবং এঁদের অন্তত দুশো পারফিউমের নাম দুনিয়ার গন্ধরসিকদের মুখে-মুখে। এছাড়াও আছে ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত নামী দোকান, যাঁদের পারফিউমের ব্রাণ্ড নেমে দোকানে দোকানে বিক্রি হয় না। কিন্তু সুরসিকরা এই সব দোকান ছাড়া পারফিউম কেনার কথা কল্পনা করতে পারেন না। যেমন বুকবণ্ড, লিপটনের চা বাজার অধিকার করে থাকলেও কলেজ স্ট্রীটের সুবোধের দোকানের সামনে গুণগ্রাহীর লাইন কখনও কমে না।

এই সব দোকানের আর একটি বিশেষত্ব, এঁদের অনেকে শিশি সাজিয়ে বসে নেই। বহুদিনের সুরসিক খরিদ্দার এখানে নিজের পারফিউম আধারটি নিয়ে দোকানে আসেন, এবং খরিদ্দারের সেই আধারটি দোকানদার বোঝাই করে দেন। এই সব আধারগুলি অনেক সময় দুর্লভ শিল্পকর্ম—কোনোটির বয়স দুশো, কোনোটির দেড়শো। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া এই সব আধারের খানদান অন্য। শুনেছি, হাজার বছরের পুরনো ভেনিসিয়ান আধার থেকে নিজের পারফিউম ব্যবহার করেন এমন অভিজাত সুরসিকের অভাব নেই। এঁদের কারও-কারও নেশা, লক্ষা-লক্ষ টাকায় দুর্লভ পুরনো পারফিউম শিশি সংগ্রহ করা।

অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, যে পারফিউম দিয়ে কার্তিয়ার প্রথম বাজার মাত করে ১৯৮১ সালে তার নাম 'মাস্ট'। সুরসিকদের পক্ষে 'অবশ্য', কিন্তু এটি মেয়েদের সেন্ট। পুরুষদের জন্যে একই সময়ে তৈরি হল 'সন্তোষ'। এই শব্দটি সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা তা খোঁজ করা হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ফরাসি পারফিউমের নামকরণের জন্যে ফরাসি বিশেষজ্ঞরা সমস্ত জগৎ তোলপাড় করেন, এবং ভারতবর্ষের প্রতি এঁদের বিশেষ নজর। তাই একেবারে উপরের শ্রেণীর পারফিউমের মধ্যে রয়েছে 'শালিমার' ও 'সংসার'। সংসারের রকমসকম দেখে বাঙালির যখন সংসারে অরুচি ধরেছে, ঠিক তখনই দুনিয়ার সুন্দরীরা 'সংসার' বলতে অজ্ঞান হচ্ছে।

এবার আর বোকা বনতে হবে না ভেতো বাঙালিকে। টুক করে এক চিলতে কাগজে লিখে নিন দুনিয়ার বাজারে গোটা সাতেক বেস্ট-সেলার পারফিউমের নাম। কেউ আপনাকে গেঁয়ো বলবার আগেই আপনি বলে দেবেন, মঁশিয়ে আমি জানি প্রথম সাতটার নাম এবং সেই সঙ্গে এমন ভাব দেখাতে পারেন, এই

সাতটাই আপনার বাড়িতে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখনও আপনার মন ভরেনি। আপনি নতুন-নতুন গন্ধের জন্য নাক ও মনকে প্রস্তুত রেখেছেন। এই টপ সপ্তমের নাম হলো :

১। শ্যানেল নম্বর ফাইভ—(খুরে নমস্কার ফরাসিকে, চ্যানেল বললে হাঁ করে মুখের দিকে তাকায়!)

২। ওপিয়ম—(আমাদের আদ্যিকালের অহিফেন। আমরা ছেড়ে বেঁচেছি, আর সায়েব মেমরা ওপিয়ামের মৌতাতের জন্যে ব্যাকুল।)

৩। সংসার—(বোকা সায়েবরা উচ্চারণ করছে 'স্যামসার'!)

৪। অ্যানি অ্যানি—(একটা মেয়ের নাম লেবেলে ছেপে, ক্যাশারেল কোম্পানি বাজার মাত করে দিয়েছে।)

৫। পয়জন—(আমরা বিষ খাই পেটের জ্বালায়, মনের দুঃখে। আর দুনিয়ার ধনীরা বিষ কেনে প্রেয়সীর মনোরঞ্জনের জন্যে।)

৬। লুলু—(একটি মেয়ের ডাকনাম, দুনিয়া জয় করেছে। আমাদের ইদানীংকালে ইলু ইলু (আই লাভ ইউ) ফিলমি গানের সৃষ্টির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে!)

৭। প্যারিস।

কিন্তু বেস্ট-সেলার হলেই যে এরা দামে টপ তার কোনও মানে নেই। যেসব জিনিস সবাই হুমড়ি খেয়ে কেনে তা বড়লোকের চোখের বিষ। এঁদের জন্যে তাই আজ বেজায় বেশি দামের পারফিউম যা আপনি ইচ্ছে করলে স্বর্ণাধারেও কিনতে পারেন। যেমন ধরুন ১৯৮৭ সালে তৈরি প্যান্থার দ্য কার্তিয়ার। মাত্র হাজার সাতেক টাকায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পরিমাণ সুগন্ধি। পারফিউমের জগতে সিকি-আধুলিও আছে, আবার হিরে-জহরতও আছে। কেউ সোনার শরীর মুড়ে ভাবে কেল্লা ফতে করলাম। আবার কেউ তাকে দেখে মিষ্টি হেসে বলে, আমার হিরের নাকছাবিটির দাম শুনলে তোমার স্বামীদেবতা মূর্ছা যাবেন।

বেস্ট-সেলার নয়, কিন্তু এমনই একটি হিরের নাকছাবি হলো, 'জয়' পারফিউম। ইংরেজিতে এর মানে আনন্দ, কিন্তু-এর যে আরেকটি অর্থ 'বিজয়' তা শুনে অলিভিয়ার স্টিপ খুবই কৌতুক বোধ করলেন। খবরটা ওই কোম্পানির কাছে পৌঁছলে তাঁদের পুলকিত হবার কারণ রয়েছে।

অলিভিয়ার স্টিপ এবারে বললেন, "একটু গরম কফি সেবন করুন। এর পর আপনাকে ফরাসি পারফিউমের রহস্যপুরীতে প্রবেশের সহজ পথ বাতলে দেবো।"

কার্তিয়ার কোম্পানির সদরদপ্তরে বসে কফি পান করতে করতে চিফ দ্য

পারফিউম অলিভিয়ার স্টিপকে বললাম, প্রাচীন ভারতবর্ষেও গন্ধ নিয়ে নানা কাজকর্ম হয়েছিল। বোধ হয় ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে গন্ধের অসংখ্য শ্রেণীভেদ করে প্রত্যেকটির আলাদা নাম দেওয়া হয়েছিল। গন্ধ শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ গন্ধ মানে যেমন গন্ধ, তেমন রসায়নও বটে।

অলিভিয়ার বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। কোথায় এই গন্ধের তালিকা আছে জানতে চাইলেন। আমি মনে করতে পারলাম না। হয় মহাভারত, অথবা যোগবাশিষ্ট রামায়ণ কোথাও পড়েছিলাম, এখন স্মরণ হচ্ছে না। বোকামি করে তখন লিখেও রাখিনি। যদি আবার খুঁজে পাই বা কেউ খুঁজে দিতে সাহায্য করেন তা হলে ফরাসি দেশে পাঠিয়ে দেবো, ওইখানেই তারিফ হতে পারে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের।

আরও কয়েকটা খবর জানা গেলো। জাপান ও ইতালিতে পারফিউমের চাহিদা বেড়েই চলেছে, কিন্তু মার্কিন বাজার কমতির দিকে। এর অর্থ হতে পারে মার্কিনিরা খরচাপাতি সম্বন্ধে সাবধানী হয়ে উঠছেন। ইউরোপীয় বাজারের স্থিতাবস্থা—বাড়ছে না, কমছেও না। মার্কিন দেশে শতকরা ৯৫ ভাগ পারফিউম বিক্রি হয় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মাধ্যমে, ফলে সেখানে বিজ্ঞাপনই একমাত্র ভরসা। ফরাসি দেশে দোকানদারের মস্ত ভূমিকা রয়েছে খরিদ্দারকে সাহায্য করার এবং তাঁর যোগ্য সুগন্ধি খুঁজে দেবার করার, কারণ, এইসব দোকানদার পারফিউমের হাড়হদ্দ জানেন এবং খরিদ্দারের মন বুঝতেও তাঁর সময় লাগে না।

অলিভিয়ার স্টিপ একটি ইংরিজি শব্দ (ফ্র্যাগরান্স) কয়েকবার ব্যবহার করলেন, যার বাংলা করা যেতে পারে 'সৌরভ'। এই সৌরভ সৃষ্টি করার বিরল অধিকার যে বিশেষজ্ঞের, তাঁর নাম 'পারফিউমার'। এই কার্তিয়ার কোম্পানি থেকে শ্যানেল পর্যন্ত সমস্ত বিখ্যাত ব্রাণ্ডের মালিকরা পারফিউমারের শরণাপন্ন হন। এক একসময় চার-পাঁচটা পারফিউমার কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এঁদের একজন শেষ পর্যন্ত উদ্ভাবন করতে পারেন সেই বিশেষ ফ্র্যাগরান্স, যা বিখ্যাত পারফিউম কোম্পানি চাইছেন।

এই পারফিউমার কোম্পানিগুলোই নতুন ফর্মূলার মালিক থেকে যান এবং বিখ্যাত ব্রাণ্ডের মালিকরা এঁদের কাছ থেকে নির্ধারিত দামে নির্যাসটি কিনতে শুরু করেন। এঁরাও দায়বদ্ধ থাকেন—যে কোম্পানির জন্য বহু সাধনার সৌরভের ফর্মূলা তৈরি হয়েছে তা অন্য কাউকে জানানো হবে না।

পারফিউমার হওয়া সহজ কথা নয়—বিখ্যাত সেতারি হওয়া যেমন ধৈর্যসাপেক্ষ তেমন পারফিউমার হতে গেলে অন্তত পনেরো বছরের সাধনা প্রয়োজন হয়। অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে হাল ছেড়ে দেয়। প্রথমে যেতে হয়

পারফিউমের ইস্কুলে—এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের বাইরে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে। পুরো একটা বছর লাগে কাঁচামাল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করতে। মনে রাখতে হবে, একটা বিখ্যাত পারফিউম তৈরির সময় অন্তত দু'হাজার রকম জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। পারফিউমের জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন সম্ভারের সংখ্যা যে তিন হাজার তা শুনে আমার চক্ষু চড়কগাছ। তালিকা দেখে মনে হলো দুনিয়ার যেখানে যতরকম ফুল আছে, ফল আছে, গাছ আছে, মশলা আছে সব লেগে যায় কোনও না কোনও পারফিউমে। এই তালিকায় মাইসোর চন্দন কাঠের সঙ্গে পূর্বভারতীয় চন্দন কাঠেরও উল্লেখ দেখলাম। এই বস্তুটি কি তা খোঁজ করার সুযোগ অবশ্য পাইনি। জর্জিও আমানি বলে এক বিখ্যাত কোম্পানির নামী পারফিউম—আমানি। এটি তৈরি করতে লাগে সিসিলিয়ান লেবুগাছের ছাল, রাশিয়ান ধনে, ইতালিয়ান জেসমিন, স্প্যানিশ জনকুইল, মরক্কোর ওক, সিঙ্গাপুরের 'প্যাচুলি', ফরাসি কমলালেবুর ফুল, হায়াসিনথ, এবং অবশ্যই ওরিয়েন্টাল গোলাপ।

গোলাপের প্রসঙ্গে অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, গোলাপ শাস্ত্রটি আয়ত্ত করা দুরূহ কাজ। হাঙ্গারির গোলাপের সঙ্গে রুমানিয়ার গোলাপের আকাশপাতাল তফাত। আর বুলগারিয়ার গোলাপের তো ব্যাপারটাই অন্য—এই গোলাপ হাজার-হাজার টন চলে আসে ফরাসি দেশে। আরও কত দেশের গোলাপ নিয়ে যে ফরাসিকে কাজ করতে হয়।

গিভেঞ্চি কোম্পানির দামী পারফিউমের নাম 'ইয়াতি'। এর মধ্যে যেসব উপাদান থাকে শুনুন : ব্রাজিলের মান্দারিন, এশিয়া মাইনরের গ্যালবানুল, প্রভেন্সের লেবু ফল, ইতালির লেবু গাছের ছাল, মিশরের গোলাপ, ফ্লোরেন্সের আইরিস, জাভার ভেটিভার, যুগোস্লোভিয়ার ওক মস্, কানাডার ক্যাস্টর, তাহিতির ভ্যানিলা, ইথিওপিয়ার সিভেট। এই সিভেট শব্দটির অর্থ অভিধানে দেখলে ভির্মি খাবেন সুন্দরীরা। শিয়াল ও বেজির মাঝামাঝি একটি জন্তু ; বাংলা খট্টাস বা গন্ধগোকুল!

অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, "তা হলে বুঝতেই পারছেন পারফিউমার হতে গেলে কত রকম ফুল, গাছগাছড়া, জন্তু জানোয়ার চিনতে হয়। এই সাধনায় কয়েকবছর কেটে যাওয়া ফরাসির কোনও ব্যাপারই নয়।"

পারফিউমার হতে গেলে দ্বিতীয় বছরে আপনাকে কয়েকটা সহজ মিশ্রণ শেখানো হবে। মিশ্রণের 'হস্যিদীর্ঘি' জ্ঞান হতে সময় লাগে। তৃতীয় বছর আপনাকে ব্যয় করতে হবে আরও একটু জটিল মিশ্রণে। এরপর ছ'বছর আপনাকে সাকরেদ থাকতে হবে কোনও গন্ধজ্ঞানী ওস্তাদের কাছে। ন'বছরের পর আপনি পাতে দেওয়ার মতন কর্মী হচ্ছেন, যদিও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য

আপনাকে আরও ছ'বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তবে নামী পারফিউমার হতে পারলে আপনার হিল্লে হয়ে গেলো, চার-পাঁচ লাখ টাকা মাইনে পকেটে গুঁজে দিয়ে জাপানিরা আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবে।

গন্ধবিশারদের আঘ্রাণ শক্তি বিস্ময়কর। একটু শুঁকেই এঁরা বলে দিতে পারেন কোন বস্তু কতখানি মেশানো হয়েছে। ফরাসি শেফের মতন এঁদের সংযমী জীবন যাপন করতে হয়। সিগারেট খাওয়ার রেওয়াজ নেই। আর খুব ভোরবেলায় উঠে এঁদের বেশির ভাগ কাজ সারতে হয়। অলিভিয়ার বললেন, "আপনাদের দেশে সকাল-সকাল ওঠার রেওয়াজ আছে। ভোরবেলায় মানুষের ঘ্রাণশক্তি যে অনেক তাজা থাকে তা ফরাসি বিশেষজ্ঞদের থেকে ভাল কেউ জানে না।"

গন্ধবিশারদরা শিল্পীর সম্মান পেয়ে থাকেন ফরাসি দেশে, এঁদের নামডাক অনেকটা সিনেমা তারকার মতন। যেমন ধরুন এডমণ্ড রুতনিস্কা। ইনি জন্মসূত্রে রুমানিয়ান, কিন্তু ফরাসি দেশে এসে জগদ্বিখ্যাত পারফিউমার হলেন। এঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ক্রিশ্চিয়ান ডায়ার কোম্পানির 'স্যাভেজ'। অলিভিয়ারের কাছে শুনলাম, এঁর বয়স আশিরও বেশি, এখন তেমন সৃষ্টি করছেন না। শ্যানেলের জন্য যিনি এখনও সৃষ্টিশীল তাঁর নাম পল্‌জ। এরপর অবশ্যই জঁ পল গ্যাঁল্যাঁর কথা এসে পড়ে, কিন্তু ওঁর সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে হবে একটু পরেই।

পারফিউম সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আরও কিছু খবর সংগ্রহ করা গেলো। যেমন পারফিউমের ফর্মূলা এতোই গোপন যে, তা লোহার সিন্দুকে রেখে দেওয়া হয়, পারফিউমার কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ছাড়া সেখানে কারও হাত দেওয়ার অধিকার নেই। এই শতকরা একশো ভাগ ফর্মূলার মধ্যে তিরিশ ভাগ হচ্ছে পারফিউমের ভিত্তিভূমি, আর সত্তর ভাগ হলো কী জিনিসপত্তর কতখানি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটির কিছু অংশ বাজারের বিশেষজ্ঞদের জানানো হয় যাতে তাঁরা খরিদ্দারের সঙ্গে আলোচনার সময় কিছু তথ্য বিতরণ করতে পারেন। যেমন ধরুন হবিগাঁ কোম্পানির 'সিয়া' বলে একটি বিখ্যাত পারফিউমে 'ওসমানথাস' ব্যবহার করা হয়। এই ফুল নাকি নিতান্তই দুর্লভ এবং সুরভি এতো তীব্র যে মাত্র একগুচ্ছ ফুলে পুরো একটি মন্দির আমোদিত হয়ে ওঠে। আন্দাজ করছি, মন্দির বলতে ভারতীয় হিন্দুদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও ওসমানথাসের ভারতীয় নামটি কি আর খোঁজ করার সুযোগ হয়নি।

অলিভিয়ার স্টিপের কাছে জানা গেলো, গোটা দশেক পারফিউমার কোম্পানি আছেন যাঁরা বিভিন্ন খ্যাতনামা কোম্পানির জন্য নতুন পারফিউম তৈরি করে দেন। এঁদের লাভ হলো মূল নির্যাসটি তাঁদের কাছ থেকে কিনতে হয়, এবং কোনও ব্রাণ্ড সফল হলে এঁরাও বহুদিন ধরে বিক্রির সুযোগ পান। অর্থাৎ ব্যাপারটা বউবাজারের জুয়েলারের মতন, যে-দোকানেই অর্ডার দিন কতকগুলো

কাজ ঘুরে ফিরে এক জায়গায় হাজির হবে। কলকাতায় একই ব্যাপার ঘটতো নামকরা দর্জির দোকানে, যতই সায়েবি দোকানে মাপ দিন কাটিং ও সেলারের কাজ শেষ পর্যন্ত হাজির হতো নাজিরগঞ্জের দর্জিপাড়ায়।

সুরভি রহস্যর গভীরে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নয়, তাই ব্যক্তিগত অভিরুচি থাকলেও সাধারণ মানুষ দিশাহারা হতে পারেন। এই অবস্থা থেকেই ব্রাণ্ড নেমের জয়জয়কার। অর্থাৎ ভাল নামের সুরভি ব্যবহার করলে আপনার দায়িত্ব কমে গেলো। আপনি পারফিউমের জটিল ব্যাপারগুলো বোঝেন না, অথচ গৃহিণীর কাছে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে চান। সেক্ষেত্রে শ্যানেল নম্বর ফাইভ অথবা কার্তিয়ার ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ সবাই স্বীকার করবে আপনার সুরুচি আছে। পৃথিবীর পারফিউম ব্যবহারকারীদের বড় একটা অংশ ব্রাণ্ডের প্রতি অনুরক্ত। এক একজন মহিলা প্রায়ই স্বামী পাল্টান, কিন্তু পারফিউম পাল্টানো নৈব নৈব চ। যে-পারফিউমের আমোদে সুন্দরীর যৌবনযাত্রা শুরু হয়েছে সেই একই পারফিউম ঢালা হবে তাঁর কফিন বাক্সে।

অনেক রমণী একই স্বামীর সঙ্গে আজীবন সতীসাধ্বীর মতন জীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত থাকলেও পারফিউম সম্বন্ধে চঞ্চলা। তাঁরা নূতনত্বের পূজারিণী, বাজারে কোনও বিখ্যাত কোম্পানি নতুন পারফিউম ছেড়েছে খবর পেলেই হলো, সতী ছুটবেন নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে। যতক্ষণ না নতুন মোহভঙ্গ হচ্ছে ততক্ষণ চলবে নবাগত পারফিউমের ব্যবহার, তারপর ব্যাক টু চেনা-জানা পুরনো বন্ধুর কাছে।

আরও একটা পর্ব আছে, পারফিউম বিপণন বিশেষজ্ঞরা বলেন, পরিবেশের চাপ। আপনি যাকে একবার মন দিয়েছেন তার সঙ্গেই একান্ত সম্পর্ক রাখতে চান, কিন্তু যেমনি অফিসে গেলেন বা পার্টিতে গেলেন অমনি পরিচিতারা জিজ্ঞেস করলেন নতুন কার্তিয়ার পারফিউম ব্যবহার করেছেন? আপনি বোকা বনে যাবেন যদি আগ্রহ না দেখান, লোকে ভাববে আপনি নিতান্তই সেকেলে এবং প্রকৃতই বুড়িয়ে গিয়েছেন, কারণ নতুনের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে দুনিয়ার সম্পন্ন গৃহিণীরা শাড়ি-গহনা সম্বন্ধে আলোচনা করে-করে এলিয়ে গিয়েছেন, টি-ভি সিরিয়াল সম্বন্ধে আলোচনাও বন্ধ হয়েছে কয়েক যুগ আগে, এখন কেতাদুরস্ত হতে হবে আলোচনা করে নতুন প্রকাশিত কোনও বই সম্বন্ধে অথবা নতুন পারফিউম সম্বন্ধে।

তাই বড়-বড় কোম্পানিরা কয়েক বছর অন্তর নতুন সুরভি নিয়ে আসেন বাজারে। কার্তিয়ারের শেষ সুরভি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে, এবার যে সুরভি বাজারে ছাড়া হবে তার জন্যে চলছে প্রচণ্ড প্রস্তুতি। বহু বিশেষজ্ঞ কাজ

করছেন পৃথিবীর বিত্তবান ও বিত্তবতীদের মানসিকতা সম্বন্ধে। "পারফিউমের বাজারে জুয়েলার হিসেবে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছি। যে যত্ন দিয়ে সোনার অলঙ্কার ও হিরে জহরত তৈরি হয় সেই যত্ন নিয়েই আমরা যে পারফিউম তৈরি করি তা কার্তিয়ার পারফিউমের আধারের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়", আবার মনে করিয়ে দিলেন অলিভিয়ার।

এই সেন্টের শিশি আর এক বিশেষ শিল্প যা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী দু'তিন হাজার বছর ধরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্বসুন্দরীকে কেউ আটপৌরে গামছা পরিয়ে রাখে না, হিরের আংটিকে কেউ মাটির ভাঁড়ে রেখে দেয় না। প্রয়োজনীয় মায়ামোহ সৃষ্টিতে আধারের বিরাট ভূমিকা। তাই অবিশ্বাস্য এক শিল্প গড়ে উঠেছে শিশিকে কেন্দ্র করে। যাঁরা এই সব শিশির স্রষ্টা তাঁরা ভাস্করের সম্মান পান। কোন পারফিউমের শিশি কে তৈরি করেছে এ-নিয়ে সংবাদপত্র, টি-ভিতে, পার্টিতে আলোচনা হয়, মতামত বিনিময় হয়। আপনি যদি শ্যানেল কোম্পানির 'কোকো' পারফিউমের ভক্ত হন এবং যদি আপনি না জানেন এই বোতলের স্রষ্টা জ্যাক হেলু তা হলে আপনি একজন উজবুক। আপনাকে সেই সঙ্গে জানতে হবে এই একই জ্যাক 'বুর্জোয়া' কোম্পানির ক্লিন দ্য ইল নামের পারফিউম বোতলের স্রষ্টা। আপনাকে জানতে হবে ক্রিশ্চিয়ান ডায়োর কোম্পানির বেশির ভাগ বোতলের অমর স্রষ্টার নাম গিরিকোলা। কার্তিয়ার কোম্পানির গর্ব, তাঁদের বোতলের সৃষ্টি হয় তাঁদের জুয়েলারি বিভাগে, যাঁরা হিরে পান্না নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামান তাঁরাই সৃষ্টি করতে পারেন কার্তিয়ার পারফিউমের বোতল। এই রকম তুলনাহীন বিশ্ববিখ্যাত কার্তিয়ার ডিজাইনারের সংখ্যা সতেরো জন।

পারফিউম শিশির পাশে আমাদের আতরের শিশি দেখলে মনে হবে আপনার চোখে বালি করকর করছে। আমরা বিশ্বাস করে বসে আছি ছেঁড়া কাঁথায় মণিমাণিক্য বেঁধে রাখলে কোনও দোষ হয় না। তাই আমাদের ভাল জিনিসও মার খায়, মোড়কের অভাবে আমরা বিশ্বের বাজারে থাপ্পড় খাচ্ছি প্রতিদিন। বম্বের আতরওয়ালারা দুঃখ করছে, মনভোলানো শিশি দেখিয়ে ফরাসি পারফিউম কোম্পানি এক টাকার জিনিস দশ টাকায় বেচছে, আর আমরা ন্যায্য দামটুকুও আদায় করতে পারছি না। যেহেতু আমাদের শিশিতে ঝকমকানি নেই।

অলিভিয়ার স্টিপ বললেন, "পারফিউম শিশির বিবর্তন লক্ষ্য করতে হলে আপনাকে অন্তত দশ বছর প্যারিসে থেকে যেতে হবে, বিলাসিতায় আধারের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার দার্শনিকতা গড়ে তুলতে হবে।"

আমার মনে পড়লো, আমাদের কলকাতায় সব সন্দেশের বাক্স একরকম দেখতে, নকুড়ের বাক্সর সঙ্গে হরিদাস পালের বাক্সের কোনও পার্থক্য নেই এবং এ-বিষয়ে মিষ্টান্ন সম্রাটদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা ধরে নিয়েছি, ভাল

জিনিস খুঁজে পাওয়ার দায়িত্ব খরিদ্দারের, ব্যবসাদারদের নয়। আমরা আরও ধরে নিয়েছি, ভাল জিনিসের প্রচারের প্রয়োজন হয় না, যার জিনিস নিরেশ একমাত্র সে-ই বিজ্ঞাপনের এবং মোড়কের ঢাক বাজাবে। কিন্তু আমাদের অতীত এমন ছিল না—স্বয়ং দেবতারা নামসংকীর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন তাঁদের প্রচারের জন্যে। আমাদের ভবিষ্যৎও দুনিয়া থেকে আলাদা হতে পারে না, যার বহিরঙ্গও ভাল এবং ভিতরও ভাল তাই জয় করবে পৃথিবী। সেই সঙ্গে চলবে নাম মাহাত্ম্যের প্রচার বা কীর্তন।

পারফিউম আধারের গুরুত্ব এতোই যে, কোনও-কোনও কোম্পানি এই কাজটি করার জন্যে বিশেষজ্ঞদের মাইনে করে রাখেন। যেমন গ্যাঁল্যাঁ (যা রোমান অক্ষরে দেখলে আমার মতন কাসুন্দিয়ানের পক্ষে গুরলেঁ মনে হয়)। এঁদের নিজস্ব 'ক্রিয়েশন' বিভাগ আছে। স্রেফ আধার সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে। ফরাসি পারফিউমের ক্ষেত্রে গ্যাঁল্যাঁর কথা একটু আলোচনা না হলে কলকাতায় এসে কালিঘাট না-দেখার মতন। পিয়ের ফ্রঁসোয়া প্যাসকাল গ্যাঁল্যাঁ ছিলেন ডাক্তার ও সেই সঙ্গে ওষুধের ব্যবসায়ী। ১৮২৮ সালে নিজের জন্মভিটে ছেড়ে প্যারিসে এসে তিনি রু দ্য রিভোলিতে প্রথম পারফিউমের দোকান খোলেন। এঁর বিশেষত্ব ছিল কোনও বিখ্যাত সুন্দরীর জন্য বা বিশিষ্ট ঘটনা উপলক্ষে স্পেশাল পারফিউমের সৃষ্টি করা। যেমন সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের স্ত্রী ইউর্জেনির জন্যে ১৮৫৩ সালে তিনি তৈরি করলেন অডিকোলন ইম্পিরিয়াল। এই অডিকোলনের লেবেলে এখনও নেপোলিয়নের সিল (১৮ ক্যারাট সোনার মৌমাছি) শোভা পাচ্ছে। শুধু সম্রাজ্ঞী নন, সাহিত্যসম্রাট ভিক্টর হুগো নতুন একখানা উপন্যাস লেখার সময় মন মেজাজ সুরভিত রাখার জন্যে এই কোম্পানিকে নতুন এক পারফিউমে সৃষ্টির বরাত দিয়েছিলেন।

তখন বিখ্যাত সব সাময়িকপত্র নিজেদের বিশেষ সংখ্যাগুলিকে অবিস্মরণীয় করবার জন্যে এক-একটি বিশেষ পারফিউমে সুরভিত করতেন। গ্যাঁল্যাঁ যে কাগজের জন্যে অনেক কাজ করেছেন তার নাম লে জার্নাল দ্য এলিগ্যান্স। বিদগ্ধ পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে এই হাওয়া বাংলাতেও এসেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। উন্নাসিকরা বই অথবা ম্যাগাজিন সুরভিত করার এই 'বটতলা মনোবৃত্তি' নিয়ে এখনও হাসাহাসি করেন। প্রসঙ্গত নিবেদন করি, এই রেওয়াজ আবার পশ্চিমি জগতে ফ্যাশেনব্ল হয়ে উঠছে। বিখ্যাত পারফিউম কোম্পানিরা তাঁদের নতুন সুরভির স্ট্রিপ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পাঠককে দিচ্ছেন, যা নখ দিয়ে আঁচড় কাটলেই খুশবাইতে ভরে উঠবে।

সাধে কি আর গ্যাঁলাঁর পারফিউম বলতে ধনীরা মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু ফরাসি সম্রাট নন, এই ফরাসি কোম্পানি

যথাসময়ে স্পেনের রানি ইজাবেলী ও স্বয়ং ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পারফিউমার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

পিয়ের গ্যাল্যাঁর দুই ছেলে—অ্যামি ও গ্যাব্রিয়েল। ১৮৮৯ সালে অ্যামি পারফিউম জগতে রেনেশাঁসের সূত্রপাত করলেন 'জিকি' নামে এক সুগন্ধি সৃষ্টি করে। রাজনীতির ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের যে স্থান, আঘ্রাণের বাজারে 'জিকি'র সেই স্থান—পুরোপুরি একটি বিপ্লব। পুরনো ধ্যানধারণা চুরমার করে নতুন কম্পোজিশন তৈরি হলো, সেই সঙ্গে সিনথেটিক তেলের প্রথম ব্যবহার! ফুলের নির্যাস যাতে খাঁটি থাকে সে-বিষয়েও আমি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। একশ বছর পরেও এই 'জিকি' পারফিউমের প্রতাপ অব্যাহত, পয়সা ফেললে আপনি এখনও কিনতে পারেন—রোজউড, রোজমেরি, লেমন, ল্যাভেণ্ডার ও চন্দনের এই অবিস্মরণীয় সংমিশ্রণ। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে চালু পারফিউমের সম্মান অর্জন করেছে 'জিকি'। নামটি কিন্তু তেমন রহস্যময় নয়। অ্যামি গ্যাঁল্যাঁর ভাইপোর নাম জ্যাক, এঁকে জিকি নামে ডাকা হতো। এই জিকি পরে কোম্পানিতে যোগ গিয়ে নানা সাফল্য অর্জন করেন।

শুধু বিখ্যাত ব্যক্তি নয়, নতুন পারফিউমের মাধ্যমে নানা ঋতুকে সম্মান জানিয়েছে গ্যাঁলাঁ কোম্পানি। কোনও মে মাসে (মধুমাস!) প্যারিসে গেলে আপনাকে যে-পারফিউমটি সংগ্রহ করতেই হবে তার নাম 'মি মে'! এর সৃষ্টি ১৯১৪, স্রষ্টা স্বয়ং জ্যাক গ্যাঁল্যাঁ।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের দেশেও প্রসাধনী নির্মাতাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বোধ হয় ফরাসি হওয়ায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলম ধরেছিলেন পারফিউমার এইচ বোসের জন্য। কুন্তলীন সুরভিত তেলের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র থেকে স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। ফরাসি লেখকরা তাঁদের গল্প উপন্যাসে বিখ্যাত পানীয় এবং বিখ্যাত পারফিউমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—নায়ক-নায়িকার নাটকীয় মুহূর্তে বিশেষ মুড সৃষ্টি করার জন্য জবরদস্ত লেখকরা বিখ্যাত পারফিউমের শরণ নেন। ক্লড ফারি নামক ফরাসি লেখক তাঁর এক গল্পে 'জিকি'র গুণগান গেয়েছিলেন, কৃতজ্ঞ গ্যাঁল্যাঁ ১৯১৯ সালে এই লেখকের মাদাম বাটারফ্লাই উপন্যাসের অন্যতম নায়িকা 'মিতসুকো'র সম্মানে ওই নামের পারফিউম উদ্ভাবন করলেন। ভাবুন তো, আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে হাল আমলের সমরেশ বসুর নায়িকাদের নামে সাবান, সেন্ট তৈরি করতাম তা হলে কি সুন্দর হতো! বিমল মিত্রের সাহেব-বিবি-গোলামের কথা স্মরণ করে যদি একটা ফুলেল তেলের নাম হয় 'পটেশ্বরী' তাহলে কী বিপুল সমাদর হবে সেই প্রসাধনীর।

আসলে আমাদের কথাসাহিত্যে আমরা ভোগকে ভয় করে এসেছি—তাই

মদ মানেই মাতলামো, গায়ে সেন্ট ছড়ানো মানেই কোনও অনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত। অথচ ত্যাগকে বড় করে দেখানোর বুকের জোরও আমাদের নেই, তাই আমরা না ঘরকা না ঘাটকা।

গ্যাঁল্যাঁর সবচেয়ে অবিস্মরণীয় সৃষ্টিটি ভারতীয় নাম বহন করছে। সম্রাট শাজাহান ও মমতাজমহলের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত 'শালিমার' পারফিউমের জন্ম ১৯২১ সালে। শালিমার বোতলের বৈপ্লবিক ডিজাইন করেন রেমন্ড গ্যাঁল্যাঁ ও ব্যাকারা। নামকরণের ব্যাপারে এঁরা সিদ্ধহস্ত। একটি পারফিউমের নাম 'জেদি'। আন্দাজ করছি এই সুরভির জেদ অনেকক্ষণ টিকে থাকে। আর একটি পারফিউমের নাম 'শ্যামাদ', ফরাসি ভাষায় যার ডাবল অর্থ—'হৃদয়ের স্পন্দন' অথবা 'আত্মসমর্পণের বাজনা'। যে-কোনও দিক থেকেই এই পারফিউমের ব্যবহার বিশেষ কোনও মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

পারফিউম শিল্পে যেমন অভিজ্ঞতার জয়, তেমন তারুণ্যেরও জয়। তার প্রমাণ গ্যাঁল্যাঁর 'ওড' সুরভি। দাদু জ্যাক ও ১৮ বছরের নাতি জঁ-পল একত্রে এই নতুন সুরভির স্রষ্টা, ১৯৫৫ সালে। প্রায় দু'শ বছরের সীমানায় উপস্থিত হয়েও পারফিউম শিল্পে গ্যাঁল্যাঁর আধিপত্য সবার স্বীকৃত। নতুন প্রজন্মের জঁপিয়ের কিছুদিন আগে বলেছিলেন আমরা প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ এখনও অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। ফরাসি ডাক্তারবাবুটি বদ্যির পেশা ছেড়ে পারফিউমে মন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "এক নম্বর কথাটা হলো সেরা জিনিস তৈরি করো। কোয়ালিটির ব্যাপারে কোনও রকম আপস করা চলবে না। বাকি ব্যাপারটা হলো—সহজ আইডিয়া বেছে নাও এবং প্রাণমন দিয়ে লেগে থাকো।" সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সংযোজন ঃ "গৌরব ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।"

নিজের দেশে ফরাসি পারফিউমকে আমি কখনও তেমন পাত্তা দিইনি—ধনীর টাকা ওড়ানোর একটা পথ বলে ভেবেছি। এখন যতোই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছি ততোই মাথা ঘুরছে বনবন করে। অলিভিয়ার স্টিপকে জিজ্ঞেস করছি, পারফিউমে নেশা হয়ে যায় কিনা? অলিভিয়ার-এর বক্তব্য ঃ অনেকেরই পারফিউম ব্যবহারটা অভ্যাসে পরিণত হয়, কিন্তু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এ-কথা বলা যায় না। আমি বললাম, শুনেছি আমাদের দেশে অনেক নেশাড়ু অডিকোলন পান করেন। অলিভিয়ার বিশ্বাস করলো না। কে জানে, হয়তো কোনও আষাড়ে গল্প আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি তো আর কাউকে গেলাশে ঢেলে অডিকোলন ড্রিঙ্ক করতে দেখিনি, লোকে যা বলে তা বিশ্বাস করতে হয় লেখককে।

অলিভিয়ার যা বলছেন, পারফিউমে ফরাসিকে মগ ডাল থেকে নামাবার

জন্যে কম চেষ্টা চলছে না, কিন্তু অনেক প্রতিভা ও সাধনার জোরে ফরাসি তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখছে। অনেক কোম্পানি ব্যবসায়িক চাপে পড়ে আমেরিকায় কারখানা খুলছে, কিন্তু খানদানি প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও 'আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই' ঘোষণা করে ফরাসি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখছেন।

এবার আর-একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হলো। গত ষাট-সত্তর বছর ধরে যাঁরা পারফিউমের লাইনে বিশেষভাবে সফল হয়েছেন তাঁদের অনেকেই ফ্যাশনের ডিজাইনার, ফরাসি যাঁদের আদর করে কুতুরে বলে। তালিকার দিকে তাকান—নিনা রিকি, জঁ পতু, শ্যানেল, ব্যালানশিয়াগা, রোচা, উঙ্গারো থেকে শুরু করে ইদানীং কালের ক্রিশ্চিয়ান ডায়র এবং ইভ সাঁ লঁরে পর্যন্ত সবারই খ্যাতি ফ্যাশন জগতে। পুরুষ অথবা মহিলাদের স্টাইলে বিপ্লব এনে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পর অনেকেই ঝুঁকেছেন পারফিউমের দিকে এবং সেখানেও অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

আর-একটা মজার ব্যাপার জানা গেলো। ফরাসি ফ্যাশন জগতের কেষ্টবিষ্টুরা অনেকেই ফরাসি নন, যেমন ফরাসির সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি ফরাসির কেনা, কিন্তু আঁকা নয়। মোটামুটি ব্যাপারটা হলো—ফরাসি জামাকাপড়ের খ্যাতির পিছনে আছেন গোটা তেইশ পুরুষ ও মহিলা ডিজাইনার। এঁরা পৃথিবীর হাজার দুয়েক সুন্দরীর সাজসজ্জার তদারকি করেন। অনেক বিখ্যাত ডিজাইনার ৭৫ জন-এর বেশি সুন্দরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। স্বভাবতই এঁদের দর্জির চার্জ শুনলে আমাদের কলকাতার বাঙালিরা ভিরমি খাবেন! ফরাসিও এই ব্যয়ভার বহনের মুরোদ রাখে না, তাই এঁরা যত জামাকাপড় ডিজাইন করেন তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরবার সৌভাগ্য হয় ফরাসির, বাকি চলে যায় বিদেশে। বিশ্বের বড়লোকরা এবং তাঁদের গৃহিণী ও প্রেয়সীরা আসেন প্যারিসে জামাকাপড়ের অর্ডার দিতে। সুতরাং ফরাসির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকার মিলিয়নেয়রদের ঠোঁটে-ঠোঁটে। কিন্তু ঠিকানা প্যারিস হলেও এই সব দর্জি যে প্রায়ই জাতফরাসি নন তা মনে রাখা মন্দ নয়। পালের গোদা ছিলেন একজন ইংরেজ—নাম ওয়ার্থ। (ইনি পরে কার্তিয়ারের বেয়াই হন।) সম্প্রতি যে তেইশজনের আধিপত্য, তাঁদের মধ্যে চারজন ইতালীয়, একজন নরওয়েজিয়ান, একজন আলজিরিয়ান, একজন জাপানি, একজন স্প্যানিশ।

শুধু খ্যাতিতে পেট ভরে না, তাই বিখ্যাত ডিজাইনাররা তাঁদের নাম ব্যবহার করতে লাগলেন অন্য সামগ্রীতে। যেমন নিনা রিকির শুরু ডিজাইনার হিসাবে, কিন্তু এখন শতকরা নব্বইভাগ রোজগার পারফিউম থেকে। নিনা রিকি বর্তমানে প্রধান একজন গন্ধবিশারদ, দর্জি নন। কিন্তু অনেক কোম্পানি স্রেফ পারফিউমে নাম ধার দিয়ে খালাস। এক জায়গায় পড়লাম, কার্দিনের পারফিউম তৈরি ও

বিক্রি করেন গুলটন নামে এক মার্কিন কোম্পানি। ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের পারফিউম ব্যবসা রয়েছে হেনেসি নামে এক শ্যামপেন কোম্পানির হাতে। ইভ্ সাঁ লঁর কোম্পানির সৌরভ বিপণন ব্যবসা আছে রিৎস্-এর হাতে—কেবল নাম ধার দেওয়ার জন্যে বিক্রির ওপর ভাল কমিশন পান। এটা আমার কাগজপড়া জ্ঞান, ঘোড়ার মুখে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। ব্যাপারটা নাকি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে পারফিউমের ব্যবসায়ে টুপাইস কমাতে গেলে একটা ছোটখাট অথচ প্রচণ্ড বিখ্যাত দর্জির দোকানের মালিক হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কিন্তু তা বলে বিখ্যাত পারফিউম স্রষ্টাদের জীবনের নাটকীয়তা কমছে না। যেমন ধরুন, নিনা রিকি, জন্ম ইতালিতে, কিন্তু পেটের দায়ে তেরো বছর বয়সে ফ্রান্সে সেলায়ের কাজ নিতে হয় এবং কমবয়সে অবিশ্বাস্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এঁর স্বামী ছিলেন জুয়েলার, তাঁরই সাহায্যে ৪৯ বছর বয়সে প্যারিসে নিনা তাঁর কুতুরে হাউস খোলেন। পারফিউম ব্যবসায় নামবার পরিকল্পনা ওঁর ছেলের, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে। নিনা রিকি অবশ্য তখনও কর্মক্ষম রয়েছেন।

পৃথিবীর সেরা পারফিউমের একটি 'জয়'-এর স্রষ্টা জঁ পতু জীবন শুরু করেছিলেন ছোট্ট দর্জির দোকানে। মেয়েদের টেনিস খেলার স্কার্টের ঝুল হাঁটু পর্যন্ত তুলে দিয়ে তিনি হঠাৎ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এঁর দোকানে যেসব সুন্দরীরা ভিড় করতেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু রোজগারের প্রত্যাশায় ১৯২৫ সালে তিনি বিখ্যাত পারফিউম 'আমুর আমুর' সৃষ্টি করেন। গৃহিণীরা যখন দর্জির দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাপ এবং ট্রায়াল দিচ্ছেন তখন স্বামীদেবতারা যাতে অধৈর্য হয়ে না ওঠেন তার জন্যে জঁ পতু দোকানের মধ্যে ককটেল বার স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই ভাল বুদ্ধি খুললো, ককটেল বার-এর পরিবর্তে স্থাপিত হলো 'পারফিউম বার', অর্থাৎ নানা নির্যাসের ককটেল করে নিজের পছন্দমতন পারফিউম সৃষ্টি করুন। এঁদের 'জয়' যে এতো দামি তার কারণ জুঁই ও বুলগারিয়ান গোলাপের নির্যাসের সঙ্গে শতাধিক এসেন্স ও তেল মিশিয়ে এর সৃষ্টি। নকল করবার বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ধনবতীরা জানেন 'জয়' আজও অজেয়।

আমার গিন্নি যা ব্যবহার করবে দুনিয়ার হেঁজিপেঁজি লোকের প্রেয়সীরাও তাই ব্যবহার করবে এই ভাবনা অনেক ধনী আজও সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা অনেক সময় চান এমন জিনিস যা পয়সা ফেললেও হেঁজিপেঁজিরা তাদের গৃহিণী বা প্রেয়সীর জন্যে সংগ্রহ করতে পারবে না। ফরাসি দেশের পারফিউম ব্যবসায়েও এই রীতির চলন আছে একটু চুপি-চুপি। এই সব বিশিষ্ট পারফিউমের ব্যবহারকারী হতে হলে কিছু বিশিষ্টতা অর্জন করতে হয় এবং সীমাবদ্ধ প্রচারের জন্য বেশ কিছু বাড়তি টাকা গুনতে হয়। কিন্তু যখন অন্য বড়লোকরা প্রতি

নিশ্বাসে বুঝতে পারবেন আপনার গৃহিণীর শরীর থেকে এমন এক সৌরভ প্রসারিত হচ্ছে যার কোনও জুড়ি নেই তখন আপনার বুকখানা ফুলে উঠে ডবল সাইজ হবে! এই দুঃসাহসিক কাজের অন্যতম পথিকৃৎ মার্সেল রোচা। এঁর 'ফিঁম' (রমণী!) পারফিউম যখন বছর পঞ্চাশেক আগে তৈরি হলো তখন কোন্ কোন্ রমণীকে এই পারফিউম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে তার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এবং চিঠি লিখে প্রত্যেককে জানানো হয়েছিল, এই সুগন্ধির সীমিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রতিটি বোতলের আলাদা নম্বর থাকবে। বলা বাহুল্য, সঙ্গে-সঙ্গে বিপুল সাফল্য।

দর্জিদের ইতিহাসেও মার্সেল রোচার প্রবল দাপট। কারণ, তিনিই নাকি মেয়েদের স্কার্টে পকেট তৈরি করার বৈপ্লবিক দূরদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। এঁদের সবচেয়ে খানাদানি পারফিউমের নাম 'মাদাম রোচা'। দাম একটু বেশি, কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে কম দামি সুগন্ধিতে কেউ দুশো রকমের নির্যাসের মিশ্রণ ঘটাতে পারে না। পয়সাও খরচ করবো না অথচ ঘেমোগন্ধ চেপে দিয়ে মনোহর খুশবাই ছুটবে সর্বত্র এমন প্রত্যাশা গরিব বাঙালি ছাড়া আর কেউ করবে না।

এবার অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের কথা এসে যায়। এঁকে নিয়ে তো হুদো-হুদো বই লেখা হয়ে গিয়েছে। ফ্যাশন জগতের ভগীরথ, জন্ম ১৯০৫ সালে। প্রথমে ডিপ্লোম্যাট হতে চেয়েছিলেন, পরে খবরের কাগজের অলঙ্করণ শিল্পী হলেন। কিছুদিন ছবির গ্যালারিও খুলেছিলেন, এঁর বন্ধুদের নাম শুনে থাকবেন—সালভাদর দালি ও জঁ ককতো! সঙ্গীতেও ছিল গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ। ফ্যাশন ডিজাইনিং-এ বিপ্লব ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে ইনি পারফিউমে মন দিলেন—প্রথম প্রচেষ্টাতেই বাজিমাৎ! 'মিস ডায়র' এখন ক্লাসিক সৌরভের মর্যাদা লাভ করেছে। এই গন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরে যে কত হৃদয়বিদারক ঘটনা সূচনা হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হলে মহাভারত সাইজের বই লিখতে হবে। এঁদের আর এক বিশ্ববিমোহিনী সৃষ্টি 'অ স্যাভেজ', ১৯৬৭ সাল থেকে অনেক বন্য আবেগের উৎসভূমি হিসাবে কাজ করছে।

এই ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের কাছে কাজ করতেন এক ছোকরা, যিনি জন্মসূত্রে আলজিরিয়ান। বয়স তেমন কিছু নয়—জন্ম সাল ১৯৩৬। ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৬০ সালে তাঁকে আলজিরিয়ান যুদ্ধে যেতে হয়, কিন্তু সেখানে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। ১৯৬২ সালে এই ভদ্রলোক নিজের সালোঁ খুলে জগদ্বিখ্যাত হন। প্রথমে মেয়েদের জামাকাপড়, পরে ১৯৭৪ সাল থেকে পুরুষদের সজ্জা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেন। ইভ সাঁ লঁরের বিখ্যাত পারফিউম 'ওপিয়াম'—বাজারে ছাড়া হয় ১৯৭৭ সালে। এখনও দুনিয়া মাত

করে রেখেছে। এঁদেরই আর একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি 'প্যারিস'।

এবং অবশেষে কুমারী শ্যানেল, সেই ফরাসি মেয়েটি যে ছ'বছর বয়সে বাপ-মাকে হারিয়ে দিদিমার আশ্রয়ে মানুষ হয়ে টুপির দরজি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিল। যে ভাল টুপি করতে পারে ফরাসি তাকেও রাজসম্মান দিতে প্রস্তুত—কুমারী শ্যানেল তাঁর জীবৎকালেই হয়ে উঠলেন কিংবদন্তীর নায়িকা। শ্যানেলের জীবন নিয়ে এঁর জীবদ্দশাতেই তৈরি হয় ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল 'কোকো'। এটি তাঁর ডাকনাম।

দর্জির ব্যবসা থেকে কুমারী শ্যানেল পারফিউমে নামলেন ১৯২১ সালে—প্রথমেই বাজিমাত—নম্বর ফাইভ শ্যানেল। এই পারফিউমের বোতল বিশ্বের শিল্পরসিকদের এমনই প্রশংসা পেয়ে চলেছে যে, নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের সংগ্রহে এর স্থান হয়েছে। আর্টের সংগ্রহ হিসাবে এক বোতল নম্বর ফাইভ শ্যানেল কেনা মন্দ নয়। মায়ামোহ সৃষ্টিতে এই পারফিউমের অদ্বিতীয় ভূমিকা। একসময় বিজ্ঞাপনে বলা হতো : "যেখানে যেখানে আপনি চুম্বিত হতে পারেন সর্বত্র স্প্রে করুন।"

কিন্তু এখনও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত ড্রেশ ডিজাইনাররা কি কেবল বাড়তি অর্থোপার্জনের জন্যে এই পারফিউমের লাইনে এলেন? অলিভিয়ার স্টিপ মৃদু হাসলেন। বললেন, "বিশ্বের সুন্দরীদের কাছে পারফিউমটা বিলাসিতা নয়, সুরভি তাদের অলঙ্কার, তাদের বসন।" মারলিন মনরোর জীবনের একটি ঘটনা শুনলাম। সমস্ত পুরুষের হৃদয়ে আগুনঝরানো এই সুন্দরীকে সাংবাদিকরা লজ্জার মাথা খেয়ে একবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী পরে রাত্রে বিছানায় শুতে যান?" মারলিন মনরোর তাৎক্ষণিক উত্তর : 'শ্যানেল নম্বর ফাইভ!"

কার্তিয়ার কোম্পানির পারফিউম প্রধান আমার মুখের দিকে তাকালেন। মৃদু হেসে বললেন, "মারলিন মনরোর কথাটা নিয়ে যতই চিন্তা করবেন ততই আপনি ফরাসি পারফিউমের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন-নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন।"

'রাজাদের সেকরা এবং সেকরাদের রাজা' কার্তিয়ার সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স ওয়েলস সপ্তম হেনরি যিনি এখনও আমাদের দেশের গ্রামে-গঞ্জে 'ন্যাড়া রাজা' বলে পরিচিত।

প্রায় দেড়শো বছর ধরে প্যারিসের কার্তিয়ার সমস্ত পৃথিবীর রাজরানী, রাজকুমারী এবং পরবর্তী যুগে কোটিপতির গৃহিণীদের মধ্যে অলঙ্কারের যে মায়ামোহ সৃষ্টি করেছিলেন তা নিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা এখনও বিরাট-বিরাট কাজ করে চলেছেন। আমার পকেটে গোনা গুণতি কুড়ি ডলার থাকলেও যখন কার্তিয়ারের অন্দরমহলে ঢোকবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি তখন অলঙ্কারের স্বপ্নরাজ্যে একবার উঁকি মারতেই হবে। কাঁচের চুড়ি বা ফলস গোল্ড গহনা সম্বন্ধে লেখবার জন্যে কেউ তো প্যারিসে আসে না।

কিন্তু পারফিউম বিভাগের অলিভিয়ার স্টিপের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এখনও শেষ হয়নি। এই তরুণটি চমৎকার মানুষ, পৃথিবীর আভিজাত্য সম্পর্কে আমার পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ধৈর্য ধরে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। আমি লজ্জা পাচ্ছি আন্দাজ করে অলিভিয়ার বললেন, "আপনার মনটা এখনও অকর্ষিত ভূমির মতন ভার্জিন রয়েছে, ফলে আমিও শিখছি!" ভগবান জানেন কতটা ভদ্রতা আর কতটা সত্য রয়েছে অলিভিয়ারের মনে, কিন্তু আমি বুঝছি, ফরাসিদেশে আসার আগে প্রত্যেক বঙ্গসন্তানের ছ'মাসের স্পেশাল ট্রেনিং দরকার, না-হলে এই সভ্যতার রস আহরণ সম্ভব নয়।

পারফিউম বিভাগের আগে অলিভিয়ার বেশ কিছুদিন কার্তিয়ারের ঘড়ি বিভাগে কাজ করেছেন। এই ঘড়ি থেকেই কার্তিয়ারের ৪৮ শতাংশ আয়। অলঙ্কারে প্রবেশ করার আগে এ-বিষয়ে কিছু জেনে নেওয়া গেলো।

দুনিয়ার যেখানে যত সফল পুরুষ ও অসামান্যা ধনবতী মহিলা আছেন তাঁদের মণিবন্ধে অথবা টেবিলে যে-নামটি ছাড়া জীবন দুর্বিষহ তা হলো কার্তিয়ার অথবা 'পাতে ফিলিপ'। আমাদের দেশেও যাঁরা শিল্পপতি বলে পরিচিত তাঁদের মণিবন্ধের দিকে নজর দিলেই কার্তিয়ার নামটি দেখতে পাবেন। আজকাল রাজধানীর মহাশক্তিমান মন্ত্রীমহোদয়দের মণিবন্ধেও মাঝে-মাঝে কার্তিয়ার

ঝিলিক মারছে। দোষ দেওয়া যায় না, ভাল জিনিসের দিকে সবারই নজর পড়বে, কে আর দু'নম্বরি জিনিস ভোগ করে সুখ পেতে পারে?

কার্তিয়ারের অসামান্য সাফল্যের ভিতরে প্রবেশ করার আগে একটা হেঁয়ালি প্রশ্ন তোলা যাক। জার্মানির গোয়েরিং, ইংলণ্ডেশ্বর, ফরাসি দ্য গ্যল, মার্শাল পেঁতা ও রাশিয়ান জোসেফ স্তালিনের মধ্যে কোন্ বিষয়ে মতৈক্য ছিল? প্রথমে মনে হতে পারে, এঁরা সকলেই লাঞ্চের সময় নাচ করতেন এবং রাত্রে ঘুমোতেন। এ ছাড়া কোনও ঐক্যমত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আরও একটি বিষয় আছে। নাৎসিদের প্যারিস জয় করার পরে গোয়েরিং নিজে কার্তিয়ারের একটি টেবিলঘড়ি কিনেছিলেন প্যারিস থেকে। ইংলণ্ডেশ্বর ও ইংলণ্ডেশ্বরীর কার্তিয়ারপ্রীতি-যে শতাব্দীর প্রাচীন তা কারও অজানা নয়। বালিকা-বয়সে রানি এলিজাবেথ যখন রাজকুমারীরূপে ফরাসি দেশে এসেছিলেন তখন উপহার হিসাবে পছন্দ করেছিলেন কার্তিয়ার ঘড়ি। ফরাসি দ্য গ্যল যে কার্তিয়ার নির্বাচন করবেন এর মধ্যে আশ্চর্য কিছু নেই, কিন্তু ১৯৪৫ সালে অস্থায়ী ফরাসি সরকারের পত্তন করেই দ্য গাল যে-উপহারটি স্তালিনের জন্য কিনেছিলেন সেটি একটি অসামান্য কার্তিয়ার টাইমপিস। আর যে মার্শাল পেঁতা দেশদ্রোহিতার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুললেন তিনি যখন ফরাসিবীরের শ্রেষ্ঠতম সম্মান 'মার্শাল' পদবী পেয়েছিলেন তখন তাঁর মার্শালের ব্যাটনটি অলঙ্কৃত করার দায়িত্ব পড়েছিল কার্তিয়ারের ওপর। মার্শাল পেঁতা এখন নেই, কিন্তু কার্তিয়ারনির্মিত ব্যাটনটি আজও দর্শনার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে প্যারিসের মিলিটারি মিউজিয়মে।

ঘড়ির ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনলে বঙ্গসন্তানের ভিরমি খাবার অবস্থা হতে পারে। যে টেবিলঘড়ির দাম মাত্র সাড়ে চার কোটি টাকা তা হাত বুলিয়ে দেখার সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে—বনগাঁয়ে জন্ম হলেও বড়লোকের হাওয়া সারাক্ষণ গায়ে লাগবে এমন এক ইঙ্গিত বোধহয় আমার জন্মকোষ্ঠিতে ছিল!

এই সাড়ে চার কোটি টাকাটা স্পেশাল ব্যাপার। পকেটে হাজার পঁচিশেক মুদ্রা থাকলেই একটা আসলি কার্তিয়ার সিগনেচার আপনি শ্রীঅঙ্গে বহন করতে পারেন। এ-অবশ্য দিল্লিমেলের নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণের মতন। যেসব ঘড়ি ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর এগজিকিউটিভ ক্লাশে চকমক করে তার দাম সাড়ে চার লাখের মতন। ইচ্ছে করলে, আগাম অর্ডার না-দিয়েও কার্তিয়ার শোকেস থেকে দশ লাখ টাকার ঘড়ি আপনি স্বচ্ছন্দে সংগ্রহ করতে পারেন।

ঘড়ির বাজারের গোপন খবরগুলো অলিভিয়ার দয়াপরবশ হয়ে বঙ্গ সন্তানকে নিবেদন করলেন, কারণ বাংলায় লেখা পড়ে কেউ মার্কেট ইনটেলিজেন্স সংগ্রহ করবে না, বাঙালিরা বড়জোর অপরের ঘড়িতে দম দেবার জন্যে ঘড়িবাবুর চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারে, কিন্তু দামি ঘড়ি

পরবার সাধ পরবর্তী একশ বছরেও বাঙালির পূর্ণ হবে না। কার্তিয়ার কিনে হাতে বেঁধে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন বাঙালি আমার নজরে পড়েনি, পাঠক-পাঠিকাদের দেখা থাকলে খবর দেবেন, তাঁর কীর্তন করবো।

যাকে লাক্সারি ওয়াচ বলে—পৃথিবীতে তার বিক্রি বছরে লাখ দশেক। এই বাজার প্রধানত দু'জনের হাতে—কার্তিয়ার ও রোলেক্স। বাজারের সিংহভাগ (৪০%) কার্তিয়ারের কব্জায়। ঘড়ির ডিজাইনিং-এ ফরাসি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তৈরিতে সুইস এখনও সেরা, তাই কার্তিয়ারের ঘড়ির মূল কারখানাটি সুইজারল্যাণ্ডে স্থাপন করা হয়েছে। ভাল ঘড়ি তৈরি করতে গেলে যে মানসিক প্রশান্তি প্রয়োজন তার আদর্শ পরিবেশ হলো সুইসপাহাড়। 'টাইম ইজ দ্য আর্ট অফ সুইস'—কথাটা এখনও সত্যি হয়ে রয়েছে—অথচ এর শুরু হয়েছিল পার্টটাইম সুইস চাষিদের কুঁড়েঘরে—দিনে জমিতে চাষ করে অবসর সময়ে সুইস চাষা ধৈর্যের পরীক্ষা দিতো এই ঘড়ি তৈরির মাধ্যমে। ধৈর্যের মাপকাঠিতে ও হাতের নিপুণতায় আমাদের তাঁতি, চাষি বা কামারও কম যায় না কারও থেকে, কিন্তু তাকে ঠিকপথে পরিচালনার কেউ নেই, তাই সে কলুর বলদের মতন সস্তা কাজের ঘানি টেনেই মরছে, না পাচ্ছে দুটো পয়সা, না পাচ্ছে কোনও সম্মান। অযথা দুঃখ করে লাভ নেই, পৃথিবীর সুখ ভোগ করবার জন্যে ভগবান কাউকে এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রেরণ করেননি, সব কিছু থেকেও কোনও কিছুতেই ভাগিদার হবার সুযোগ এই পোড়া দেশে আসে না।

কার্তিয়ার কোম্পানির বয়স খুব বেশি নয়, তা জানিয়ে রাখা ভাল—১৮৪৭ সালে প্যারিসে অতি সামান্য দোকানদার হিসাবে ওঁদের যাত্রা শুরু। খোঁজ করলে কলকাতায় কয়েকজন সেকরা পেয়ে যাবেন যাঁরা ওই সময়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু তফাত এই যে কলকাতার মাটিতে কোনও কিছু বাড় নেই—একমাত্র ভিটের বট বা অশ্বত্থ গাছ ছাড়া। আর ইউরোপে যা সামান্য আকারে শুরু হয় তাই মহীরূহ হয়ে ওঠে অল্প সময়ে। তাই ইংলণ্ডের মুদি সানলাইট সাবান থেকে ইউনিলিভার কোম্পানি গড়ে তোলেন, হল্যাণ্ডের একটা গ্যারাজ থেকে ব্যবসা শুরু করে অ্যানটন ও জেরার্ড ফিলিপস সৃষ্টি করেন জগদ্বিখ্যাত ফিলিপস প্রতিষ্ঠান। সেকরার দোকানের শিক্ষানবিশ লুই ফ্রাঁসোয়া আঠাশ বছরে প্যারিসে ছোট্ট দোকান কিনে ক্রমশ হয়ে ওঠেন জগদ্বিখ্যাত কার্তিয়ার কোম্পানি। ১৩ নম্বর রু দ্য লাপাই-এ দোকান খোলার পর থেকেই এঁদের প্রকৃত রমরমা শুরু। সে তো মাত্র ১৮৯৮ সনের ঘটনা—আমাদের কলকাতার এক বাঙালি সেকরা (বি সি সেন অ্যাণ্ড কোং) তখনই রমরমা ব্যবসা করছেন, এই ক'বছর আগেই তাঁরা শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করলেন।

সেকরার ব্যবসার সঙ্গে ঘড়ির ব্যবসার সংযোগ গত শতকের সাতের দশকে।

লোকের তখন ঘড়িকে জুয়েলারি হিসাবে দেখার ঝোঁক এবং সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্যে কার্তিয়ার অন্য লোকের কাছ থেকে মূল যন্ত্রটা কিনে তার অঙ্গসজ্জায় সোনা, প্লাটিনাম, হিরে ও মানিকের ব্যবহার শুরু করলেন। ১৮৭২ সাল থেকে কার্তিয়ারের এই ব্যবসার সূত্রপাত, কিন্তু পরের বছরই মিশরীয় ধাঁচের আবরণে একটা টেবিল ক্লক তৈরি করে ধনীমহলে হৈ চৈ ফেলে দিলেন কার্তিয়ার। অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে অ্যানটিক ঘড়ির খবরাখবর নেওয়া শুরু হলো এবং কার্তিয়ারের কারিগরিতে চতুর্দশ লুইয়ের আমলের পকেটঘড়ি এবং বিখ্যাত ব্রাগেত পরিবারের তৈরি ঘড়ি নতুন বিশেষত্ব লাভ করলো। এই পর্যায়ে যাঁরা কার্তিয়ারকে মূল ঘড়ি সরবরাহ করতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনেভার এক ঘড়িওয়ালা, ১৭৩৬ সাল থেকে যাঁরা দুনিয়ার সেরা ঘড়ি তৈরি করে আসছেন। এঁদের নাম কনস্টানটিন। ঘড়ির সঙ্গে মণিকাঞ্চনের সংযোগ ঘটিয়ে যে অসাধারণ শিল্পকর্মের সৃষ্টি হতো কার্তিয়ারের কারখানায় তার আদর তখন দুনিয়ার সর্বত্র। ১৮৯৯ সাল নাগাদ কার্তিয়ার নিজেই তৈরি শুরু করলেন বিশ্বের প্রথম প্লাটিনাম পকেট ঘড়ি—এর সঙ্গে বসানো থাকতো হিরে। প্রথম ঘড়িটি কিনলেন আমেরিকান ধনকুবের জে পি মরগ্যান। এই মরগ্যান পরিবার কার্তিয়ারের অন্যতম খরিদ্দার হিসাবে দীর্ঘদিন দুনিয়ার বিস্ময়ের কারণ হয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা কার্তিয়ারের নাতি লুই এই সময় ঘড়ির দিকে বিশেষ নজর দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তিনটি : পকেট বা ট্যাঁক ঘড়ির সঙ্গে টেবিল ক্লকের বিক্রি বাড়ানো, নিজেরাই ঘড়ি তৈরির কাজে মন দেওয়া এবং রিস্টওয়াচের সম্ভাবনা সম্পর্কে খতিয়ে দেখা। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে-রিস্টওয়াচ বিংশ শতাব্দীতে দুনিয়া জয় করলো—উনবিংশ শতাব্দীতে তার কোনও ভূমিকা ছিল না।

কার্তিয়ারের অফিসে শুনলাম, রিস্টওয়াচ বলতে আমরা এখন যা বুঝি তা কার্তিয়ারেরই সংযোজন। বর্তমানে যে ট্যাঙ্ক আকারের চারকোণা রিস্টওয়াচ সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে তার মডেল তৈরি হয়েছিল কার্তিয়ারের কারখানায়—তাঁর এক বন্ধু বিমান বিশেষজ্ঞের কাজের সুবিধের জন্যে। কার্তিয়ারের এই বন্ধুটি (সন্তোষ দুমঁ) চেয়েছিলেন এমন এক ঘড়ি যা দেখতে গিয়ে হাতজোড়া হয়ে থাকবে না। সুতরাং পুরুষমানুষের পকেট অথবা ট্যাঁক থেকে ঘড়ি এসে জুড়ে বসলো মণিবন্ধতে।

কিন্তু রিস্টওয়াচের বিষয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। প্যারিসে বসেই জানা গেলো, হাতঘড়ি প্রথমে মেয়েদের জন্যেই সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলন্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ একটি হিরে বসানো আর্মলেট উপহার পেয়েছিলেন যার মধ্যে একটি 'ঘড়িও' ছিল। ফরাসি

বিপ্লবের কাছাকাছি সময়ে প্যারিসের রু দ্য বুচিতে একজন ঘড়িওয়ালা আংটির মধ্যে ঘড়ি বসিয়ে বিক্রি করতো। প্রায় কাছাকাছি সময়ে জেনেভার এক জুয়েলার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল সে ঘড়িবসানো ব্রেসলেট বিক্রি করছে। নেপোলিয়নের প্রথমা স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন তাঁর পুত্রবধূ ব্যাভেরিয়ার রাজকুমারীর জন্যে এক জোড়া সোনার ব্রেসলেট অর্ডার দিয়েছিলেন, যার একটিতে ঘড়ি বসানো হয়েছিল। প্যারিসের এই সেকরার নাম 'নিতো'।

রিস্টওয়াচ বলতে এখন যা বোঝায় তার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ১৮৬৭ সালে। ঐ বছর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে জুয়েলার রুভেনা একটি রিস্টওয়াচ দেখিয়েছিল যার ডায়ালটি মরকতে ঢাকা। ঠিক তার পরের বছর ১৮৬৮ সালে সুইস ঘড়িওয়ালা পাতেক ফিলিপ প্রথম রিস্টওয়াচ বিক্রি করেন। এই অ্যানটিক ঘড়ির জন্যে সারা বিশ্বের কৌতূহল, সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজেও বিদেশী সংগ্রাহকরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ঐ বছরের একটা পুরনো ঘড়ি পূর্বপুরুষের সিন্দুক থেকে বের করতে পারলে নিশ্চিত বড়লোক হওয়ার সম্ভাবনা। ১৮৮০ সালে জার্মান নৌবিভাগ নৌসেনাদের জন্যে মেটাল স্ট্র্যাপের হাতঘড়ির অর্ডার দিয়েছিলেন এমন রেকর্ড রয়েছে, যদিও এই হাতঘড়ি আদৌ এখনও কারও সংগ্রহে আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

প্যারিসে থাকতে-থাকতেই 'সময় সম্বন্ধে যাদের আগ্রহ আছে' এই বলে একটি বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন থেকে জানলাম, একটা পুরনো পাতেক ফিলিপ রিস্টওয়াচ সম্প্রতি দেড় কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে—অথচ ঘড়িটির জন্ম মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে। যা আমাকে অবাক করলো, দুনিয়ার সেরা ধনীরা এখনও দম দেওয়া নতুন ঘড়ি কেনার জন্য ব্যগ্র। যেমন, পাতেক ফিলিপ এমন এক সূক্ষ্ম ঘড়ি তৈরি করছেন যার একটি হুইল প্রতি চারশ বছর অন্তর একবার ঘুরবে। এটি সময়-রসিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই জন্যে যে, চারশ বছর অন্তর একটি বাড়তি লিপ ইয়ার আসবে ক্যালেন্ডারে এবং যেহেতু পাতেক ফিলিপ মহাকালের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি তৈরি করেন সেহেতু এর জন্যে তাঁরা প্রস্তুত।

সবচেয়ে যা মজার, এই সব ঘড়ি পয়সা থাকলেই সঙ্গে-সঙ্গে কেনা যায় না। অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘদিন। যেমন পাতেক ফিলিপ বিজ্ঞাপনে সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যালিবার ৮৯ বলে যে ঘড়ি (মাত্র চারখানা) তাঁরা তৈরি করছেন তা রেডি হতে ন'বছর লাগবে। তবু রসিকরা গাঁটের কড়ি জমা দিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকতে রাজি আছেন। যাঁরা বলেন ট্যাক ঘড়ি এবং পকেট ঘড়ির বছর শেষ হয়েছে তাঁরা একবার দুনিয়ার বড়-বড় ঘড়ি কোম্পানিতে খোঁজ করে দেখুন।

পকেট ঘড়ির ঢাকনায় আপনার পছন্দ কোনও ছবি এনামেল করে দেবার ব্যবস্থা রেখেছেন বিখ্যাত কোম্পানিরা। স্রেফ এই ডায়ালটির ছবি করতে একজন বিশেষজ্ঞকে টানা চার মাস প্রতিদিন ছ'ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হবে।

এই সব বাবুগিরির খবর ইন্ডিয়ানের জেনে কী লাভ হবে? আমার এই স্বগতোক্তিতে কার্তিয়ার কোম্পানির অলিভিয়ার স্টিপ সায় দিলেন না। বরং আমাকে অবাক করলেন, পৃথিবীর বৃহত্তম কার্তিয়ার ঘড়ি সংগ্রাহক একজন ভারতীয়—কাপুরথালার মহারাজা। এঁর সংগ্রহের বিশিষ্টতা পৃথিবীর অতি মূল্যবান ২৫০টি ঘড়ি। কাপুরথালার এই সংগ্রহের বর্তমান কী অবস্থা আমার জানা নেই—তবে প্যারিসে বসে মনে হলো, দুনিয়ার বড়লোকরা টিকিট কেটে এই সংগ্রহ দেখে চোখের ও মনের সুখ লাভ করতে আগ্রহী। অনেকদিন আগে বালি ব্রিজের কাছে বিখ্যাত জাটিয়া পরিবারে ঘড়ি সংগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ওখানেও নিশ্চয় কার্তিয়ার আছে, তখনও ওই নামের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

আগাম অর্ডার দিয়ে যে-ঘড়ি কেনার জন্যে আজও কার্তিয়ারের দোকানে খরিদ্দার আসেন তার নাম রহস্যময় ঘড়ি বা 'মিসট্রি ক্লক'। মিসট্রি ক্লক প্রতিটি আলাদা-আলাদা তৈরি হয়, প্রতিটির মধ্যে এক একটি রহস্যময় বিস্ময় লুকিয়ে থাকে। এই মিসট্রি ক্লকের জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ড নয়, ফরাসি দেশ। এর আদিতে ছিলেন রবার্ট-হুডিন নামে ঘড়িওয়ালা। তিনি ১৮৩৫ সালে প্যারিসে ঘড়ির দোকান খোলেন। কার্তিয়ারের মিসট্রি ক্লকের সূচনা ১৯১২ সাল নাগাদ, এর পিছনে রয়েছেন এক অসাধারণ স্রষ্টা—মরিস কুয়েত। এঁর ঠাকুর্দা ঘড়ির সময় রেগুলেট করার চাকরি করতেন, বাবার ছোট্ট ঘড়ির দোকানও ছিল। পরে ইনি প্যারিসে চলে আসেন ও নিজেই দোকান শুরু করেন।

অলিভিয়ার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, ঘড়ি তৈরির কাজ সহজ নয়—এর পিছনে থাকে ম্যাথামেটিকস, ফিজিক্স এবং অপটিকস। সেই সঙ্গে আর্টের চরম—তাই ঘড়ি তৈরি শিল্পের সম্মান লাভ করেছে পৃথিবীতে। কার্তিয়ারের জন্যে কাজ করে মরিস কুয়েত অবিনশ্বর খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর তৈরি প্রতিটি ঘড়ি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বড়-বড় প্রবন্ধ রচনা করেছেন, আজও আলোচনার অবসান ঘটেনি বিশ্বময় চলেছে রসিকদের গবেষণা।

শুনলাম, এঁর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কচ্ছপ' ঘড়ি। এই ঘড়িতে কাঁটা নেই, কিন্তু একটি বড় অধ্যায়ে জল দেওয়া থাকে এবং কচ্ছপটি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যায়। এই ধরনের ঘড়ির দাম সংগ্রাহকদের কাছে বেড়েই চলেছে। একটা ঘড়ি হাতে তৈরি করতে অন্তত এক বছর সময় লেগে যায় এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয় অন্তত সাতজন বিশেষজ্ঞের। তারপর এই ঘড়ির দায়িত্ব

নেন জহুরিরা, তাঁরা এই ঘড়ির জন্য বিশেষভাবে কাটা হিরে ব্যবহার পছন্দ করেন।

১৯১৩ থেকে ১৯৩০ এই আঠারো বছর ছিল মিসট্রি ক্লকের সুবর্ণযুগ। এই সময় মোট প্রোডাকশনের সংখ্যা মাত্র নব্বুইটা। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে আবার মিসট্রি ক্লকের চাহিদা হওয়ায় প্রোডাকশন শুরু হয়, চলে ১৯৭০ পর্যন্ত। তারপর কিছুদিন বন্ধ হয়ে আবার শুরু ১৯৭৭ থেকে। কিন্তু সেই সময় ১৯১৩ সালের মিসট্রি ক্লকের অনুকরণে কাজ চালু হয়।

কার্তিয়ার 'মডেল-এ' মিসট্রি ক্লকের প্রথম খরিদ্দার আমেরিকান ধনকুবের জে পি মরগ্যান। এই মডেলের আর একটি কেনেন ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের গৃহিণী। ১৯৪০ সাল গোয়েরিং প্যারিস অধিকার করে আস্তানা গেড়েছিলেন হোটেলে, সেখান থেকে তিনি হাজির হলেন কার্তিয়ারে, বহুদিনের সাধ মেটালেন একটা মিসট্রি ক্লক সংগ্রহ করে।

কার্তিয়ার মিসট্রি ক্লক সম্বন্ধে ঠিকমতন জানতে গেলে অন্তত একটি বছর সময় কাটাতে হবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। দুনিয়ার শত-শত ঘড়ি-পাগল পুরুষ ও মহিলা এই বিষয়ে নিয়মিত চর্চা করে যাচ্ছেন, লেখা বেরুচ্ছে গাদা-গাদা। কোন্ ঘড়ি কোন সালে তৈরি হয়েছিল, কী কী উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল, ঘড়ির নক্সা কে করেছিল, কে এই ঘড়ি প্রথম কিনেছিল, তারপর কতবার তা হাতফিরি হয়েছে। এসব ঘড়িপাগলদের মুখস্থ। প্রত্যেকটি ঘড়ির আলাদা-আলাদা নাম আছে এবং বিশেষজ্ঞরা এক নিশ্বাসে বলে দেবেন মান্দারিন ডাক ক্লকের সঙ্গে চাইনিজ ডেজ কার্প ক্লকের কী তফাত, কোন যান্ত্রিক অঙ্গে কী বিশেষত্বর নির্দশন রেখে গিয়েছেন এই সব অবিনশ্বর ঘড়ির স্রষ্টারা।

শুধু মিসট্রি ক্লক নয়, পকেট ও পেনডান্ট ঘড়িরও কত বৈচিত্র্য। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে রানি আলেকজান্দ্রা কী উপহার দেবেন? একটি বড় সাইজের গিনি চিরে দু'খানা করে তার মধ্যে একটা মহামূল্যবান কার্তিয়ার ঘড়ি বসিয়ে দেওয়া হলো। এমনই বিশেষ ব্যবস্থা যে হাতের একটু চাপ লাগলেই সোনার ঢাকনা উঠে যাবে এবং ঘড়ির কাঁটা দেখা যাবে।

পকেট ঘড়ির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্মানিত নামটি হলো এডমণ্ড ইগার। এই ভদ্রলোকের প্রাথমিক শিক্ষা জগদ্বিখ্যাত ঘড়িওয়ালা আব্রাহাম ব্রিগেত-এর প্রতিষ্ঠানে। এই ব্রিগেত কোম্পানি ঘড়ি সরবরাহ করতো সম্রাজ্ঞী মারি আন্তয়নেত এবং রাশিয়ার জারদের। ইগার ও কার্তিয়ারের বিশেষ সম্পর্ক শুরু হলো ১৯০৭ সালে, যখন ঠিক হলো কার্তিয়ার ছাড়া আর কারুর জন্যে ইগার ঘড়ি তৈরি করবে না।

ছোটঘড়ি যে কোথায় না বসানো হতো! মেয়েদের ছাতার বাঁটেও ঘড়ি! এমন

চারটি মহামূল্যবান ছাতা একসঙ্গে কিনে নিলেন রাশিয়ার কাউন্টেস উভারভ।

ইগারের দূরদৃষ্টি ছিল। কার্তিয়ারকে তিনি বোঝাতে লাগলেন রিস্টওয়াচের সম্ভাবনার কথা। কিন্তু কার্তিয়ার এর আগে ধাক্কা খেয়েছেন। সোনার ব্রেসলেটের সঙ্গে হিরে বসানো তিনটি লেডিজ রিস্টওয়াচ তৈরি করা হয়েছিল ১৮৮৮ সালে, কিন্তু বিক্রি করতে খুব অসুবিধে হয়েছিল। একটা ঘড়ি বছর সাতেক পড়েছিল দোকানে।

হাতঘড়ির সাফল্য কেন বিলম্বিত হলো এ-বিষয়ে মজার কথা শোনা গেলো। মেয়েরা তখন লং স্লিভ জামা পরেন। সেখানে মণিবন্ধের ঘড়ি দেখানোর কোনও সুযোগ নেই। সেই সঙ্গে ছিল সান্ধ্য অনুষ্ঠানে লম্বা দস্তানা পরার রেওয়াজ। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মেয়েদের জামার হাতা যেমন ছোট হলো, যেমন লম্বা দস্তানা আর ফ্যাশনেবল রইলো না, তেমন শুরু ব্রেসলেট ও রিস্টওয়াচের সুবর্ণযুগ। নীলা, চুনি, হিরে, মুক্তো বসানো যেসব হাতঘড়ি এই সময় কার্তিয়ারের শোরুমে হাজির হলো তা কেনবার জন্যে ছুটে এলেন দুনিয়ার ধনীরা। গৃহিণীদের মনোরঞ্জনের জন্যে যাঁরা এই ঘড়ি কিনলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রথসচাইল্ড এবং ভ্যাণ্ডারবিল্ট।

শুধু হাতঘড়ি উপহার দিয়েই যাদের মন ভরে না তাদের জন্য তৈরি হলো আংটি ঘড়ি, হারের লকেট ঘড়ি এবং আরও কত রকমের ঘড়ি।

কিন্তু যে-ঘড়িতে কার্তিয়ার বাজিমাত করলেন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বন্ধু আলবার্তো সন্তোষ-দুমঁ। এই ভদ্রলোক বেলুন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফরাসির হৃদয় জয় করেছেন ১৮৯৭ থেকে। ১৯০৬ সালে সন্তোষ-দুমঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওঁর কাজের সুবিধের জন্যে কার্তিয়ার তৈরি করলেন পুরুষমানুষের হাতঘড়ি। সন্তোষ-দুমঁ ঘড়ির আকৃতি প্রায় একশ বছর ধরে বিশ্বজনের মনোহরণ করে চলেছে—এখন ঘড়ি বলতে সাধারণের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা এই সন্তোষ-দুমঁ ঘড়ি, অথবা প্রথম যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্ক দেখে তৈরি কার্তিয়ার ট্যাঙ্ক ঘড়ি।

এর পরে কার্তিয়ার বছরের পর বছর নতুন ডিজাইন, নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, এবং সমস্ত দুনিয়া তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখনও চলেছে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু দুনিয়ার ধনীরা, তাঁদের প্রেয়সীরা, প্রিয়জনরা জানেন নকল কখনও আসলের মতন হয় না। তাই কার্তিয়ার অঙ্গে ধারণ না-করা পর্যন্ত তাঁদের মনে স্বস্তি হয় না।

কার্তিয়ার অফিসে ঘড়ি সম্বন্ধে যেসব খবরাখবর জমা হয়ে রয়েছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আমার মতন গেরস্ত বাঙালির পক্ষে সম্ভব নয়। ও-চেষ্টা করেও লাভ নেই।

অলিভিয়ার স্টিপ কিন্তু মৃদু হাসলেন, বললেন, "এখন কার্তিয়ারের ঘড়ির খবর দুনিয়ার উচ্চমধ্যবিত্তর কাছেও পৌঁছে গিয়েছে। একজন সম্পন্ন জাপানি, জার্মান, ইংরেজ বা আমেরিকানের পক্ষে কার্তিয়ার কব্জিতে জড়ানোর ইচ্ছেটা অলীক স্বপ্ন নয়। তবে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য বা চরিত্র নষ্ট হতে দিইনি—কার্তিয়ার নামটা যে সস্তা নয়, দামি ঘড়ির যে সত্যিই কিছু বিশিষ্টতা আছে তা আমাদের খরিদ্দাররা জেনে বসে আছেন।"

আমি অলিভিয়ার স্টিপের মুখের দিকে তাকালাম। অলিভিয়ার বললেন, "আমরা লাক্সারি ওয়াচের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিভিন্ন রকমের ঘড়ি তৈরি করে চলেছি। আমরা এখন কোয়ার্টজ ঘড়িতেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছি। কিন্তু ভাববেন না, মেকানিক্যাল ঘড়ির যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখনও বহু সুরসিক খরিদ্দার এই ধরনের ঘড়ি পছন্দ করেন। কোনও একদিন যদি মেকানিক্যাল ঘড়ির ফ্যাশন সাধারণ মানুষদের মধ্যে আবার ফিরে আসে তা হলে আশ্চর্য হবার নয়।"

আমার প্রশ্নের উত্তরে অলিভিয়ার বললেন, "লোকে আমাদের ঘড়ির জন্যে বাড়তি দাম দিতে প্রস্তুত, কারণ কার্তিয়ার তাদের এমন বিশেষত্ব দেয় যা অন্য কেউ দিতে পারে না। আপনাকে মনে রাখতে হবে ঘড়ির 'মুভমেন্ট' অংশটা আমরা লাখে-লাখে তৈরি করি না, আমরা এই অংশকে অলঙ্কারের মতনই যত্ন করি। আমাদের প্রধান শক্তি আমাদের ঐতিহ্য—আমরা যে-মডেলই বের করি তা অসামান্য শিল্পকর্ম বলে স্বীকৃতি পায়। তারপর ফিনিশিং-এর যত্ন। প্রত্যেকটা কার্তিয়ার ঘড়ি এখনও হাতে পালিশ করা হয়—মানুষের হাতের চেয়ে সূক্ষ্ম ও মূল্যবান যন্ত্র এখনও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। আমাদের তুলনাহীন কর্মীরা প্রত্যেকটি ঘড়ির সময় হাতে অ্যাডজাস্ট করেন। এই কাজের সময় যাতে এক কণা ধুলো না বিপর্যয় বাধিয়ে দেয় তা নিশ্চিত করার জন্যে ধুলোবিহীন ঘরে কর্মীরা হাসপাতালের সার্জেনের মতন গ্ল্যাভস পরে কাজ করেন। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, জগদ্বিখ্যাত ঘড়ির জন্মস্থান বড়-বড় কারখানা নয়, এখনও পাহাড়ের ওপর খুব ছোটো-ছোটো ঘরে নিতান্ত শান্ত পরিবেশে এই কাজ করা হয়।"

আরও একটি কথা শুনে আমি তাজ্জব। শুধু কোম্পানির নাম বলেই ঘড়ি কেনা যায় না। যিনি ঘড়ি পরবেন তাঁর হাতের মাপ বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাতের অ্যানাটমি লক্ষ্য করে, বিভিন্ন ধরনের কব্জির 'কন্টুর' অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ঘড়ির আধার তৈরি হয়।

খরিদ্দার অর্ডার করলেই কার্তিয়ার কোম্পানি ঘড়ি গছিয়ে দেয় না। মণিবন্ধের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঠিক মতন ঘড়ি নির্বাচন করা এক কঠিন কাজ এবং

এই কাজের জন্যে বিশেষ ট্রেনিং প্রয়োজন। আমি শুনে তাজ্জব, মোটামুটি কুড়ি রকমের কব্জি আছে। জাপানিদের ছোট কব্জির সঙ্গে আমেরিকানের মোটা কব্জির কোনও মিল নেই। আবার আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলের বিশাল কব্জির সঙ্গে বোস্টনের কব্জির সমতা নেই। এশিয়ানদের কব্জি পাতলা। পুরুষ ও মহিলাদের মণিবন্ধের স্থাপত্য বা অ্যানাটমি সম্পূর্ণ আলাদা। একই মডেলের ঘড়ি বিভিন্ন কব্জির উপযোগী করে তোলার জন্যে বিভিন্ন সাইজের তৈরি করতে হয়, না-হলে বেমানান হয়। কার্তিয়ার কিছুতেই বেঢপ ঘড়ি বিক্রি করবে না। তাতে খরিদ্দার হাত ছাড়া হলেও।

আমি তো তাজ্জব! প্রায় চার দশক ধরে ঘড়ি ব্যবহার করে আসছি। শ্বশুরমশাইও বিয়ের সময় একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন, কিন্তু কখনও হাতের মাপ নেওয়ার কথা ওঠেনি, রাধাবাজারের ঘড়িপাড়ায় কোনও দোকানদার কখনও এ-অধমের কব্জির দিকে তাকিয়েও দেখেনি।

ঘড়ি নিয়ে খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে নানা গল্প ছড়িয়ে আছে।

কার্তিয়ারের কর্মীদের মধ্যে। স্পেশাল ঘড়ি অর্ডার দেবার সময় কত রকমের খেয়ালখুশি প্রকাশিত হয়। প্রেয়সীর এমন অঙ্গ নেই যেখানে মানুষ কোনও না কোনও সময়ে ঘড়ি বাঁধবার চেষ্টা করেছে। সেই সব বিশেষ ঘড়ি এখন সংগ্রাহকদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। কার্তিয়ারের ঘড়ি কেনার এইটাই সুবিধে—স্রেফ একটা ঘড়ি নয়, একটা শিল্পকর্ম কেনা হলো, যেটা কোনও সময়ে মহামূল্যবান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে।

বিশিষ্ট অথচ খেয়ালি খরিদ্দারের হাতে নাস্তানাবুদ হবার যেসব গল্প কার্তিয়ারের ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে রয়েছে তার মধ্যে একটি ভোলবার নয়। প্রিন্স কনস্টানটিন র‍্যাভসুইল ছিলেন বড় খরিদ্দার। তিনি একবার এসে অর্ডার দিলেন—পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত ঘড়ি তৈরি করতে হবে। সবার মাথায় হাত—এমন অর্ডার সামলানো সোজা কাজ নয়। প্রিন্স সোজাসুজি বললেন, "আমার এক আত্মীয় আছে যাকে আমি একেবারেই দেখতে পারি না, অথচ ক্রিসমাসের সময় একটা উপহার না দিলেই নয়। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, উপহারটা কুৎসিত না হলে খুব অসুবিধে হবে।"

কার্তিয়ার অনেক ভেবে চিন্তে একটা কুৎসিত দর্শন ঘড়ি তৈরি করে দিলেন। প্রিন্স খুশি হলেন। কিন্তু এর বিশেষত্ব হলো বাইরে কুৎসিত হলেও, ভিতরের সৌন্দর্য তুলনাহীন। এই ঘড়ির মালিক হবার জন্যে সংগ্রাহকরা এখন কোটি কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত।

পৃথিবীর বৃহত্তম ও সার্থক লাক্সারি কোম্পানি কার্তিয়ারের বিপণন ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ। মধ্যাহ্ন ভোজনের কেন্দ্র হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছেন প্যারিসের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ। যে-কোম্পানির দিনে অন্তত আট কোটি টাকার বিক্রি তাঁর মার্কেটিং ডিরেক্টর মানুষটি নিতান্তই সাদাসিধে, দেখলে মনে হয় কোনও বইয়ের দোকানে কাজ করেন। এঁর নাম হুগো দ্য লা বোর্দনে। বয়স মাত্র ৩৮। দশ বছর কার্তিয়ারে কাজ করছেন, তার আগে পাঁচ বছর ছিলেন ফিলিপ্‌স ল্যাম্প কোম্পানিতে। এঁর স্ত্রী বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

বিলাসের চরমের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত বসবাস করেও বোর্দনের মন পড়ে আছে প্রতীচ্যে—তাঁর প্রবল আগ্রহ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষায়। বুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয়দের অনাগ্রহ এই তরুণটিকে প্রায়ই ব্যথিত করে, বুদ্ধকে তিনি এই ভারতবর্ষ থেকে আবিষ্কার করেননি। সন্ধান মিলেছে জাপান থেকে। খস-খস করে একটা কাগজে গ্রাফ এঁকে দিলেন হুগো : বুদ্ধ-বোধিধর্ম—চিন (তান)-জাপান (জেন)। সেইখান থেকে ভদ্রলোক পৃথিবীর নানা প্রান্তে, এমনকি প্যারিস।

প্রথম প্রশ্নেই এই ভদ্রলোক আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন। একজন ভারতীয় সাধক সম্বন্ধে তাঁর প্রবল আগ্রহ। এই জ্ঞানী মুক্তপুরুষটির সাধনকেন্দ্র বোম্বাই—নাম শ্রী নিসর্গদত্ত মহারাজা। তিনটি অসামান্য গ্রন্থের রচয়িতা, যার একটি 'আই অ্যাম' (অস্মি স্বাহা) গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তরুণ ফরাসি দার্শনিকদের। এই জ্ঞানীপুরুষ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। ভারতবর্ষ আজও নীরবে কত যোগীপুরুষের জন্ম দিচ্ছে, আমরা তাঁদের সম্মান দিই না, সন্দেহের চোখে দেখি, অথচ পশ্চিমে এঁদের নিয়েই যত কৌতূহল। আমি ক্ষমা চাইলাম। বললাম, "এবার বোম্বাই গেলে যোগাযোগ করবো।" হুগো আমাকে লজ্জা দিলেন না। বললেন, "১৯৮২ সালে ইনি দেহরক্ষা করেছেন, তবে ওঁর আশ্রম একটা চলছে।" এই মানুষটি নাকি অসাধারণ, অবিশ্বাস্য ছিল তাঁর জ্ঞান।

কার্তিয়ার কোম্পানির ব্যাপারটা অতি সহজে বুঝিয়ে দিলেন হুগো দ্য লা বোর্দনে। এর প্রতিষ্ঠা ১৮৪৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতার ছেলের সময় কোম্পানির

গৌরবের সূচনা। প্রতিষ্ঠাতার নাতিরা বিংশ শতকের শুরুতে মানবসভ্যতার যে সুবর্ণযুগ এসেছিল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে কার্তিয়াররা ছড়িয়ে পড়েন লণ্ডনে ও নিউইয়র্কে। এখনও বেশি ব্রাঞ্চ নেই, তবে ১৪০টি বুটিকের মাধ্যমে কিছু বিলাসদ্রব্য বিক্রি করা হয়। বছরে যে আড়াই হাজার কোটি টাকার জিনিস বিক্রি হয় তার অর্ধেক ঘড়ি থেকে, এক তৃতীয়াংশ গহনা থেকে, দশ শতাংশ পারফিউম থেকে এবং বাকি অংশ বিভিন্ন গহনা বিলাসদ্রব্য থেকে, যার মধ্যে সিগারেট লাইটার থেকে চশমার ফ্রেম পর্যন্ত বহু কিছু আছে।

আরও একটা খবর পাওয়া গেলো, যে কার্তিয়াররা এই কোম্পানিকে অক্ষয় গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের কেউই এখন কোম্পানির কতৃত্বে নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে কোম্পানিকে নবগৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক দূরদর্শী ফরাসি—অ্যালাঁ ডেমিনিক পেঁরা। কার্তিয়ার পরিবার এখনও টিকে রয়েছেন, দু'একজন এখনও প্রতিষ্ঠানে সাধারণ কাজ করেন। বাকিরা তাঁদের অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন অন্যকে—বর্তমান মালিক এক সিগারেট গ্রুপ, যাঁদের নাম রথম্যানস্। এই কোম্পানির মূল মালিকানা বোধহয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই হোল্ডিং কোম্পানির লক্ষ্য পৃথিবীর বিলাস সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের পরিচালনায় আনা। অনেকখানি সফল হয়েছেন, প্রমাণ—ডানহিল সিগারেট, মঁ ব্লাঁ পেন, কার্তিয়ার। সম্ভবত ইভ সঁ লঁরেতেও এঁদের কিছু বিনিয়োগ আছে।

আজকাল কোম্পানির মূল মালিকানা কোন জাতের হাতে তা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। অমন কট্টর ফরাসি বিলাসিতার প্রতীক কার্লটন হোটেলের মালিক জাপানিরা, অমন ইংরিজি দোকান সেলফ্রিজের মালিক শেখরা, অমন ফরাসি বিলাসিতার সম্রাট কার্তিয়ারের মালিক দক্ষিণ আফ্রিকান। তেমনি দুর্ধর্ষ জার্মান স্পোর্টস সরঞ্জামের কোম্পানি আদিদাসের মালিক ফরাসি। ভাল কোম্পানির দিকে নজর দুনিয়ার বড়লোকদের, তাঁরা কখনও জিনিস কেনেন, কখনও জিনিস পছন্দ হলে কোম্পানিটাও কিনে নেন। তবে যাঁরাই কেনেন তাঁরা মূল কোম্পানির ব্যক্তিত্বে হাত দেওয়া পছন্দ করেন না, বরং তাঁদের জাতীয়তা যাতে আরও বিকশিত হয় সেদিকে উৎসাহ দেন।

যেমন ধরুন কার্তিয়ার—এঁদের বিপুল অর্থসাহায্যে প্যারিসের অদূরে ছোটখাট একটি পার্কে গড়ে উঠেছে কার্তিয়ার ফাউণ্ডেশন যেখানে আধুনিক ফরাসি চারুকলাকে বিকশিত করার জন্যে বিশেষ চেষ্টা চলেছে। এই সংগ্রহশালাটি দেখবার জন্যে প্রতিদিন যা ভিড় হয় তা আমাদের লজ্জা দেবে। কার্তিয়ার কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর তাঁদের প্রচার খরচের এক দশমাংশ এই

প্রতিষ্ঠানকে দেন এবং সেই অর্থে কেনা হয় দুষ্প্রাপ্য ছবি, প্রকাশ করা হয় দুষ্প্রাপ্য বই, নিমন্ত্রণ জানানো হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিষ্ঠিত ও নবীন চিত্রকর, ভাস্কর এবং কলাসমালোচকদের। তাঁরা ফাউণ্ডেশনের অতিথি হয়ে এখানে নিজেদের কাজ করেন। ইচ্ছে করলে তাঁদের নতুন কাজ ফাউণ্ডেশনকে বিক্রি করতে পারেন, নাও করতে পারেন। ব্যাপারটা পুরো তাঁদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও কার্তিয়ার পরিচালনা করেন এক অভিনব শিক্ষানিকেতন—স্কুল অফ লাক্স। লাক্সারি বিপণন সম্বন্ধে শেষ কথা জানতে হলে এই প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। বিলাসিতার ইতিহাস ও রহস্য কে আর গত দেড়শ বছর ধরে এমন ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন? পৃথিবীর সেরা ম্যানেজাররা আসেন এখানে বিলাসদ্রব্যের বিপণন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে।

ফরাসি ঐতিহাসিকরা নতুন-নতুন বিষয়ে অনন্যসাধারণ গবেষণা করছেন। তাঁরা দারিদ্র্যের ইতিহাস, দুঃখের ইতিহাস, রুটির ইতিহাস রচনা করছেন, হয়তো এবার বিলাসিতার ইতিহাস রচনা করেও জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করবেন। বিলাসিতার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে—বিলাসিতা শুরু হয় অতিমাত্রায় পান, ভোজন ও নারীসুখের মধ্য দিয়ে, তারপর ক্রমশ তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। এখন বিলাস মানে মাত্রাতিরিক্ত পান ভোজন নয়, এখন বিলাস মানে নিজেকে এবং নিজের প্রেয়সীকে বিশিষ্টতা দান করা। এমন কিছু উপভোগ করা যা স্বাতন্ত্র্য দেবে, অন্য পাঁচজন যা ব্যবহারে সমর্থ হবে না। ইংরিজিতে এই মনোভাবকে বলে 'ইউনিকনেস', অদ্বিতীয়তা—তাই আমাদের দেশের ধনীরাও এখন চান না তাঁদের স্ত্রীদের জন্য সোনার জরিতে বোঝাই ভারী সিল্কের শাড়ি বা গা-ভর্তি সোনার গহনা। তাঁরা চান এমন কটন শাড়ি যা তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কারও অঙ্গে শোভা পাবে না, এমন একটু হিরে যা অন্য সবার সামর্থ্যের বাইরে থাকবে। এই অদ্বিতীয়তার সন্ধানে বিলাসের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এখন ধনী ইউরোপীয় চাইছেন এমন নেকটাই, যা মাত্র চারটের বেশি তৈরি হবে না। এমন ঘড়ি, যার কোনও জুড়ি থাকবে না। একালের 'মাস' প্রোডাকশনের পরিপন্থী এই ধর্ম। যা সবাই উপভোগ করতে পারে তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকবার সাধ হলে খরচ বেড়ে যায় শত-শত গুণ, এই অত্যধিক খরচের শক্তি আরও বিশিষ্টতা এনে দেয়।

তাই কার্তিয়ার আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অপরের থেকে কীভাবে আলাদা হওয়া যায় এই আর্টের উদগাতা হিসাবে বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে কার্তিয়ার।

গহনা বিভাগে আমি সময় কাটিয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। গিয়েছিলাম কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে, মালক্ষ্মীর কৃপাধন্য ও ধন্যাদের দেখবার পক্ষে এর থেকে ভাল দিন আর কী হতে পারে?

হুগো দ্য লা বোর্দনে আমাকে অত্যন্ত সরলভাবে কয়েকটা জিনিস বুঝিয়ে দিলেন। রুপো নিয়ে কাজকারবার এখনও কম, যদিও একসময় এ-বিষয়ে কার্তিয়ারের বিশেষ সুনাম ছিল। যেমন ধরুন নেপোলিয়নের রুপোর বাসন। ৯১৯ পিসের এই সিলভার সার্ভিস থেকে খানাপিনার জন্য কার্তিয়ার একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন বিশ্বের ধনীদের। রাজকীয় আদবকায়দা না জানলে এই সেট ব্যবহার করার উপায় নেই—এর মধ্যে কয়েকটি রুপোর পাত্রে বিশেষ ছাপ—এর অর্থ এই পাত্রের খাবারটি কেবলমাত্র সম্রাটের জন্য, আপনারা কেউ হাত দেবেন না। গেরস্ত ঘরের ছেলেও যে সুযোগ পেলে ভীষণ বিলাসী হয়ে উঠতে পারে তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মাত্র একজন। ৯১৯ পিসের এই সিলভার সার্ভিস নেপোলিয়নের নির্বাসনের পর, অষ্টাদশ লুইয়ের হাতে গিয়েছিল। তিনি ঝটপট ঐ সব পাত্রে নিজের মনোগ্রাম খোদাই করে নিলেন। তারপর আরও কয়েক হাত ফিরি হয়ে শেষ পর্যন্ত এই সেট হাজির হলো কার্তিয়ারের সংগ্রহে।

হুগো বললেন, "আপনাকে মনে রাখতে হবে সোনা তিন রকমের—সাদা, পিঙ্ক ও হলুদ। এই হলুদ সোনা ভারতবর্ষের অবদান। কার্তিয়ার ভারতবর্ষ থেকে ফিরে মুগ্ধ হয়ে এই হলুদ সোনাকে পৃথিবীর সুন্দরী মহলে জনপ্রিয় করে তোলেন। আর আছে প্লাটিনাম। একসময় প্লাটিনামের গহনা এবং প্লাটিনামের ঘড়ি রেওয়াজ হয়েছিল। এখন আর সেই রমরমা নেই—প্লাটিনামের দাম বহু কারণে বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু হলুদ সোনার মতন সুন্দরীদের মনে ছায়া ফেলতে পারেনি এই ধাতু।"

"আর আছে পাথর। হিরে চুনি পান্না থেকে আরম্ভ করে মুক্তো পর্যন্ত—এ এক অন্য জগৎ। এর রহস্যের শেষ নেই। তবে মণি অথবা কাঞ্চনের কোনও মূল্য নেই যদি-না তা প্রকৃত শিল্পীর হাতে পড়ে। এঁরা আবার দু'রকমের—কেউ নতুন-নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় নক্সা এঁকে দেন, আর কেউ সেই নক্সা দেখে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেন। প্যারিসের কার্তিয়ার কারখানায় এখন বেশ কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত ডিজাইনার আছে। পৃথিবীর অলঙ্কারের ইতিহাস, গতি, প্রকৃতি এঁদের মুঠোর মধ্যে। ভবিষ্যতের অলঙ্কার কেমন হবে তা এঁরাই স্থির করবেন। এঁদের প্রধান হলেন—টেকনিক্যাল ডিরেক্টর কোরিতিঁ কিদুঁ। জাপানিরা এই কর্মশালা দেখে পাগল হয়ে যায়, বলে আমরা মিউজিয়ামে এসেছি। তারা ছবি তোলে।"

আমাদের দেশের কথাও উঠলো। কার্তিয়ারের স্রষ্টারা সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁদের অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে চলেছেন—আফ্রিকা, মিশর, ব্যাবিলোনিয়া থেকে আরম্ভ করে পারস্য, ভারত, চিন, জাপান কিছুই অনুসন্ধান থেকে বাদ যায়নি। ভারতবর্ষ এক সময়ে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে কার্তিয়ারের শিল্পকর্মকে। সত্যি কথা বলতে কী ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর অলঙ্কার ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে আমাদের দেশের অলঙ্কার শিল্পীরা কেন বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হলেন না? কারণ বোধহয় একটা—আমাদের জাতীয় শিল্পীরা ট্রাডিশনের শিকলে বন্দি। পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতায় তাঁরা বিশিষ্ট হলেও নতুন কোনও সৃষ্টির আলোকে তাঁরা নিজেদের উদ্ভাসিত করতে চাননি। তাই আমাদের গহনার দোকানে যা তৈরি হয় তা অনেক সময় পশ্চিম ঘুরে আসা ভারতীয় অলঙ্কারের অনুকরণ মাত্র। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ মণিকার ও স্বর্ণকারদের শৃঙ্খলিত করে রেখেছি, নতুন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে ব্যাকুল হয়ে উঠবার সুযোগ তাঁদের দিইনি।

দাস জাতির শিল্পীদেরও যে দাস হতে হবে এমন কোনও ফতোয়া না থাকলেও আমরা নিজেদের অজান্তেই এই দাসত্বকে মেনে নিয়েছি। তাই স্রষ্টার কোনও বিশেষ সম্মান নেই আমাদের সমাজে। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ যখন প্যারিস ভ্রমণে গেলেন তখন যাঁদের সঙ্গে তাঁরা আলাদা ডিনার করলেন তাঁদের মধ্যে রইলেন কার্তিয়ার। আমরা কি জানি পি সি চন্দ্র অথবা বি সরকারের প্রধান নক্সাকারের নাম? আমরা এঁদের অন্ধকারে রেখেই বাজিমাত করতে চাই। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই, কোনও বিশেষ রাষ্ট্রীয় অতিথির আগমন উপলক্ষে তাঁকে যে স্মারক উপহার দেওয়া হবে তা অমুক কোম্পানি তৈরি করেছেন, কিন্তু জিজ্ঞেস করুন কে এই শিল্পকর্মটি পরিকল্পনা করেছেন? কেউ উত্তর দিতে পারবে না। অন্য দেশে শিল্পীর এমন অবহেলা কল্পনাও করা যায় না। যাঁরা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে নিজেদের সগর্বে ঘোষণা করেন তাঁরাও এই শোচনীয় অবহেলার দায় থেকে মুক্ত নন। তাঁদের নাম পাথরে খোদাই হয়ে অশ্লীলভাবে সর্বত্র শোভা পায়, আর যাঁরা প্রকৃত স্রষ্টা তাঁরা অবহেলায়, অপমানে চিরদিনের জন্য মুছে যান।

হুগো দ্য লা বোর্দনে অনুসন্ধিৎসু মানুষ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অলঙ্কার বিভাগে কোন জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুললো?"

আমি বললাম, "বড়লোকের ভাবমূর্তি আমার কাছে অন্য রকম ছিল। বড়লোকদের চেহারা সম্পর্কেও আমার মনে একটা ধারণা ছিল। কিন্তু দেখলাম, শাদা ঢলঢলে গেঞ্জি, ব্লু জিনস ও চটিপরা একটা মেয়ে দোকানে ঢুকে ঝট করে চার লাখ টাকার অলঙ্কার পছন্দ করে ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে বিদায় নিলো।

এই মেয়েকে ফুটপাতে দেখলে হিপি বা ট্রিপি বলে ভুল হওয়া আশ্চর্য ছিল না।”

হুগো বললেন, “ঠিক ধরেছেন, ধনীর দুলালী বলে যে তার অঙ্গে ঝলমলে জামাকাপড় শোভা পাবে এমন কোনও মানে নেই আজকাল। আমাদের সেলসম্যানরাও সাবধানী হয়ে উঠেছে, ধনীদের যে কখন কী খেয়াল হয় তার ঠিক নেই।”

আরও একটি খবর পাওয়া গেলো—কার্তিয়ারের খরিদ্দারদের মধ্যে জাপানিরাই এখন প্রধান। বাৎসরিক আড়াই হাজার কোটি টাকার মধ্যে জাপানিদের কাছ থেকেই আসে প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা—এঁরা নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস এবং অন্যত্রও বাজার করেন। প্যারিসের দোকানগুলি থেকে জাপানিরা বছরে দেড়শ কোটি টাকার কেনাকাটা করেন।

তবু খরিদ্দার ধরলে এখনও প্রথম স্থান মার্কিনিদের। এরপরেই এশীয়—এর মধ্যে জাপানি, আরব, শেখ ও ভারতীয় সবাই আছেন। ভারতীয় শুনে আমার একটু অবাক হবার কথা—তাঁরা এখন কোথায় পয়সা পাবেন? ধনপতি টাইকুনরাও তো হিসেব করে শ’দেড়েক ডলার প্রাত্যহিক ভাতা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় অতো সহজ নয়, কোনও রহস্যময় কারণে সুদূরপ্রাচ্যে কার্তিয়ারের প্রধান খরিদ্দারদের মধ্যে ভারতীয়রা এখনও জ্বলজ্বল করছেন।

ইউরোপীয় ধনীদেরও একটা হিসাব নেওয়া গেলো। অবশ্যই তালিকার প্রথমেই ফরাসি। তারপরে জার্মান। তৃতীয় ইতালী, চতুর্থ ডাচ। ইংরেজের ইজ্জত চলে গিয়েছে, বড়লোক হিসাবে তার রমরমা এখন আর নেই—পঞ্চম স্থানে স্পেনের সঙ্গে তার সহঅবস্থিতি।

আরও একটা মজার কথা জানা গেলো। সব খরিদ্দার দোকানে আসা পছন্দ করেন না। এমন দু’শ জন ধনী আছেন দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে কার্তিয়ার নিয়মিত হাজির হন তাঁদের জিনিসপত্তর নিয়ে। কলকাতার ধনীদের মধ্যেও একসময় এই রেওয়াজ ছিল, বড়-বড় কাপড়ের দোকানদার ও জহুরী চলে আসতেন ধনীর অন্দরমহলে। কার্তিয়ারের এই সব হোমভিজিট খরিদ্দারদের একজন হলেন সুলতান অফ ব্রুনেই, বিশ্বের অন্যতম ধনী হিসাবে এঁর নাম প্রতি বছর ফরাসি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। মনে হলো, প্রচণ্ড দামি গহনা কেনার লোক একটু কমছে, কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকা ফেলে গহনা তুলে নেবার লোকের সংখ্যা বাড়ছে দেদার। একুনে কোনও অসুবিধা নেই কার্তিয়ারের মতন প্রতিষ্ঠানের।

কার্তিয়ার খরিদ্দারদের অঢেল টাকার বিষয়ে নানা গল্পগুজব এখনও প্রচারিত

হচ্ছে। একটা শুনুন। শ্যামদেশের রাজা একবার তাঁর দোভাষীকে নিয়ে প্যারিসের দোকানে এলেন। কয়েকটা ব্রেসলেট দেখতে চান এই রাজা। কাউন্টারে ডিউটি দিচ্ছিলেন জুলে গ্লিনজার বলে এক সেলস্ সহকারী। ব্রেসলেটের স্টক খুব ভাল। গ্লিনজার একটার পর একটা ট্রে বের করে দেখাতে লাগলেন, কিন্তু শ্যামদেশের রাজার পছন্দ হচ্ছে না, তাঁর দোভাষী ইঙ্গিতে আরও দেখাতে বলছেন। শেষে গ্লিনজার সেই ট্রে-টা বের করে আনলেন যার মধ্যে সবচেয়ে দামি ব্রেসলেটগুলো রয়েছে। রাজা এবার দোভাষীকে ইঙ্গিত দিলেন এবং তিনি বললেন, "হিজ ম্যাজেস্টি একটা পছন্দ করেছেন।"

"কোন ব্রেসলেটটা?" বোকার মতন জিজ্ঞেস করায় দোভাষী একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, "পুরো ট্রে-টা।" সেই যুগে (তখন সস্তাগণ্ডার বাজার) শ্যামের রাজা এককোটি কুড়ি লাখ টাকার ব্রেসলেট এক কথায় কিনে নিয়ে চলে গেলেন।

লেখাপড়া না করে, খোঁজখবর না নিয়ে কারুর উচিত নয় কার্তিয়ার কোম্পানিতে পা দেওয়া। কার্তিয়ার তো শুধু দোকান নয়, গত দু'শতাব্দীর বিলাসিতার এক বিশিষ্ট অধ্যায়ও বটে। না জানা থাকলে লজ্জার কারণ ঘটে। যেমন আমি জানতাম না ভারতীয় অলঙ্কার স্টাইলকে বিশ্বের দরবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পিছনে রয়েছে কার্তিয়ার। এই ঘটনার শুরু উনিশ শতকের গোড়ায় যখন লর্ড কার্জনের স্ত্রী মহারানি ভিক্টোরিয়ার বউমাকে তিনটে ভারতীয় ড্রেস উপহার দেন। রানি ভিক্টোরিয়ার দেহাবসানের পরে, নতুন রাজার অভিষেকের আগে বউমা ডেকে পাঠালেন কার্তিয়ারকে। তাঁর কাছে জমা হয়ে থাকা ভারতীয় গহনাগুলি ভেঙেচুরে এই ড্রেসের উপযোগী কিছু নতুন গহনা তৈরি করিয়ে দিতে। ভারতীয় অলঙ্কারের বিশ্ববিজয়পর্বের সূচনা হলো। এর পরেই তথাকথিত দিল্লি দরবার এবং তারপর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতভ্রমণ। হাওদায়-চড়া সম্রাজ্ঞীর ছবি দেখে বিশ্বের সুন্দরী মহল বিমোহিত। ভারতবর্ষের সব কিছুই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালো—সবচেয়ে প্রিয় রঙের নামকরণ হলো 'হিন্দু ব্রাউন'।

এই সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম থেকে শুরু করে পাটনার মহারাজা পর্যন্ত ছুটলেন কার্তিয়ারে গহনা তৈরি করাতে। ব্যাপারটা আয়ত্তে আনতে জ্যাক কার্তিয়ার ভারতভ্রমণে এলেন ১৯১১ সালে। ভারতভ্রমণে এসে রং সম্বন্ধে, ডিজাইন সম্বন্ধে, কার্তিয়ারের নতুন দৃষ্টি উন্মোচিত হলো। কার্তিয়ার যেমন বিক্রি করতেন বহু অলঙ্কার ও দুর্মূল্য ঘড়ি তেমনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রাচীন ভারতের নানা শিল্প নিদর্শন। মিনার কাজ, খোদাইয়ের কাজ দেখে কার্তিয়ার বিমোহিত। এর ফল ইউরোপের অলঙ্কারশিল্পে বিপ্লব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা মকর, কল্কা,

বাজু ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সুপরিচিতা হয়ে উঠলেন। এক অসামান্যা সোসাইটি সুন্দরী মিলিয়া সার্ত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর যে আট-নরি রুবির নেকলেস কিনলেন তার নাম হলো 'মায়া'। আমাদের কুচবিহার ও দার্জিলিঙ, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলো দুনিয়ার ধনী মহলে। এমনকি 'বাজু', 'নথ' এবং 'হাতফুল', 'গুরু', 'হাসুলি' শব্দগুলো আর বিশ্বসুন্দরীদের কাছে অজানা রইলো না। যে হাসুলি আমাদের কলকাতার বাবুদের কাছে গ্রাম্যতার প্রতীক ছিল তাই হিরে বসিয়ে গলায় পরবার জন্যে পশ্চিমের সুন্দরীদের মধ্যে ব্যাকুলতা। লখনউ বারাণসীর মিনা-কাজ এবার কার্তিয়ারের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় শুরু করলো।

হুগোকে আমি কী বলি, ধন্যবাদ জানাতে গেলাম—ভারতবর্ষের জন্যে যাঁরা কিছু করেছেন তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু হুগো দ্য লা বোর্দনে অবাক করে দিলেন। "আপনি কী বলছেন, মিস্টার মুখার্জি? সমস্ত পৃথিবীর কৃতজ্ঞ থাকার কারণ রয়েছে ভারতবর্ষের কাছে। অলঙ্কারের ব্যাপারে যা কিছু আদি শিক্ষা তা তো আপনারাই দিয়েছেন বিশ্বকে।"

আমার তেমন জানা ছিলো না। প্যারিসে বসে আমাকে শুনতে হলো, খ্রিষ্টের জন্ম চার হাজার বছর আগে থেকে বিশ্বসুন্দরীদের অলঙ্কারবিলাসে ভারতবর্ষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতীয় বণিকরা মহাসমুদ্রের ওপারে পাঠিয়েছে দুষ্প্রাপ্য মণিমাণিক্য—টারকোয়েজ, ল্যাপিস লাজুলাই, কর্নেলিয়ান। রোমান আমলে আমস্টার্ডামের নাম কে শুনেছে? তখন বহুমূল্য পাথরের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র উজ্জয়িনী। ৫০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর কণ্ঠহারের একচেটিয়া সাপ্লায়ার ছিলো এই অধম ভারতবর্ষ। ভারতীয় পুঁতির নাম শোনেনি এবং তা গলায় পরার স্বপ্ন দেখতো না এমন ধনীদুহিতা তখন পৃথিবীর কোথায় ছিল? শুনলাম, পিটার ফ্রানসিস বলে এক সায়েব বিরাট গবেষণা করেছেন, বিষয় ঃ 'হোয়েন ইণ্ডিয়া ওয়াজ বিডমেকার টু দ্য ওয়ার্লড'। এসব কথা মানবসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু প্যারিসে এখন সত্য, কিন্তু যখন দেশে ফিরে যাবো তখন দেশের কোন কর্মকার আমাকে বিশ্বাস করবে? দুনিয়ার রাজা ছিল যারা তারা আজ ভিখিরি হতে বসেছে। দুটো ভাতের জন্যে এবং সরকারি স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইনের জাঁতাকলে পড়ে গরিব ভারতীয় সেকরা অনাহারে মরছে, আর সারা বিশ্ব এখনও হাহাকার করছে ভারতীয় অলঙ্কারের জন্য।

আরও একটা জ্ঞান হলো প্যারিসে বসে। আমরা যাকে কল্কা বলি তা আসলে একটি আম। দুনিয়ার ফ্যাশন মহলে এর নাম 'ম্যাঙ্গো' বা 'কাশ্মির মোটিফ'। 'কল্কা'র উৎপত্তি তুরস্কের 'কল্‌গা' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'পাতা'। হুগো দ্য লা বোর্দনে বললেন, "পড়ুন না—'ফরাসি স্টাইলের ওপর কাশ্মিরের প্রভাব' বলে বই।" আমার চোখ জোড়া ট্যারা হবার অবস্থা—ভারতীয় আংটি সম্পর্কেও

বিরাট বই লিখে ফেলেছেন এমা প্রেসমার বলে এক গবেষিকা। আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি তা আর একবার প্রমাণিত হলো।

কিন্তু আমি এই প্যারিসে বসে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি। কত নতুন ভারতীয় কথা শিখবো এখানে বসে? 'তোড়া' শব্দটা আগে শুনেছি কলকাতায়, যেমন ফুলের 'তোড়া'—কিন্তু পৃথিবীর অলঙ্কারশাস্ত্রে এই শব্দটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। অনেক মুক্তা ও দামি পাথরের 'তোড়া' সুন্দরীদের নতুন মায়ামোহে আলোকিত করে তোলে। কার্তিয়ারের ডিজাইন বিভাগের প্রাণস্পন্দন ছিলেন জিন তুসঁ—এই অলঙ্কার-বিশেষজ্ঞের সবচেয়ে প্রিয় ছিল এই 'তোড়া'। কৃষ্ণের ননি পুঁতি বা বাটার-বিডের কথা আমি জন্মেও শুনিনি—প্যারিসে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। একটি সিলোন রুবির সঙ্গে চারটি ননিপুঁতি দিয়ে তৈরি আংটি পশ্চিমের সুন্দরীদের হৃদয় হরণ করেছে।

পকেটে কুড়ি ডলার সম্বল করে বাজে শিবপুরের বাঙালি আমি কত আর বিলাস-বৈভবের খবর সংগ্রহ করবো। নিদেনপক্ষে কোটি টাকা খরচের মেজাজ না থাকলে কার্তিয়ারের খবরাখবর সংগ্রহ করে কী লাভ? ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় খেয়ে বসেও আমার গলা দিয়ে সুপ পর্যন্ত ঢুকতে চাইছে না। খবরের পর খবর—যেমন যে মিনা-কাজের জন্য ভারতবর্ষের এতো সুনাম তার রং ১৪৪ রকমের হয়। আমরা ১৪৪ ধারা বলতে কলকাতায় যা বুঝি তা হলো পুলিশের লাঠি চালনা ও জনতা ছত্রভঙ্গের ব্যাপার। আরও একটা খবর : একসময় কার্তিয়ার দাঁত খুঁটবার জন্যে সোনার টুথ পিক বা খড়কে কাঠি তৈরি করতেন—স্বাস্থ্যের কারণে টুথ পিক সোনার হলেও দু'বার ব্যবহার সুসঙ্গত নয়। বলাবাহুল্য ক্রেতা একজন ভারতীয় মহারাজা।

কত আর বড়লোকির কথা শুনবো? হিরে জহরত তো একটা আলাদা জগৎ। মণিমাণিক্য সেও বিরাট এক গবেষণার বিষয়। তা হলে মুক্তো সম্বন্ধে একটা খোঁজখবর নেওয়া যাক। হুগো একটু আগেই বলেছেন, "মুক্তো সম্বন্ধে ভারতীয়দের জ্ঞান তুঙ্গে উঠেছিল। শুধু বিলাসিতার নয়, চিকিৎসাতেও (মুক্তাভস্ম) মুক্তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।" মুক্তোর মতন দাঁত কথাটা ভারতবর্ষের গ্রামেগঞ্জেও প্রচলিত ছিল। অপাত্রে ভাল মেয়ে পড়লে বলতো বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

হিরে সম্বন্ধে পাগল হওয়ার আগে দীর্ঘদিন পৃথিবীতে মুক্তাযুগ ছিল। ফরাসি সম্রাজ্ঞী মারি আন্তোয়নে, রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের গলায় যেসব মুক্তামালা শোভা পেতে তার মালিক হবার জন্যে পরবর্তী দুই শতাব্দীর বিশ্বসুন্দরীদের স্বামীরা এই সেদিনও ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। আমেরিকান কোটিপতিদের গৃহিণী—মিসেস ভ্যাণ্ডারবিল্ট, মিসেস হুইটনে, মিসেস হাটন

এঁদের সবার মুক্তোর মালা ছিল যা একদিন ফরাসি বিপ্লবের সময়কার সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে শোভা পেয়েছিল।

জাতে ওঠবার জন্যে আমেরিকার নতুন বড়লোকরা তখন ছটফট করছেন। শুনুন একটা গল্প। ডজ গাড়ির নাম শুনেছেন? এই কোম্পানির মালিক মিস্টার হোরেস ডজ টুপাইস কামিয়েছেন, কিন্তু আভিজাত্যের অ আ ক খ আয়ত্ত করার সুযোগ পাননি। তাঁর মেয়ের বিয়ে বড় ঘরে। হঠাৎ খেয়াল হলো বিয়ের সময় নিজের গৃহিণীর গলাটা ন্যাড়া-ন্যাড়া থাকলে সমাজে কথা উঠতে পারে, বিশেষ করে বেয়ানের গলায় সারাক্ষণ দামি হার থাকে। ভাবী জামাইকে ডজ সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মায়ের হার কোথায় কেনা হয়েছিল?" কার্তিয়ার শুনে বললেন, "কখনও নাম শুনিনি, কিন্তু ওদের সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো।"

কার্তিয়ার তাঁদের দোকানে একের পর এক ট্রে থেকে মুক্তোর মালা দেখাতে লাগলেন। প্রতিবারই মিস্টার ডজ বলেন, "না, না, মিস্টার কার-টায়ার এটা চলবে না। আমি আরও বড় মুক্তো দেখতে চাই আমার স্ত্রীর জন্য। এমন মালা যা আমার বেয়ানের হারের সঙ্গে ম্যাচ করবে।" অবশেষে কার্তিয়ার বললেন, "মিস্টার ডজ, আমার কাছে একটা মালা আছে যা সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন একসময় ব্যবহার করতেন।" "ওঁর নাম কখনও শুনিনি, মিস্টার কার-টায়ার তবু দেখান ওই মালাটা," মিস্টার ডজ বললেন, এবারে যা-মালাটা বেরুলো তা সত্যিই দেখবার জিনিস, মুক্তোর সাইজ রবিন পাখির ডিমের মতন। এবার খুশি হলেন ডজ সায়েব, বললেন, "হ্যাঁ মিস্টার কার-টায়ার, এইরকম জিনিসই তো খুঁজছিলাম," কার্তিয়ার এবার শোনালেন, "মঁশিয়ে ডজ, এই মালার দাম হলো, আড়াই কোটি টাকা।" "এইটাই নেবো", এই বলে মিস্টার ডজ ব্যাগ থেকে বই বের করে খসখস করে আড়াই কোটি টাকার চেক সই করে দিলেন।

যা শুনলাম, চতুর্দশ লুইয়ের আমল পর্যন্ত হিরের সম্মান অনেক বেশি ছিল মুক্তো থেকে। কিন্তু ১৯০০ সাল নাগাদ মুক্তোর সম্মান তুঙ্গে উঠলো, কারণ একশ গ্রেনের বড় মুক্তো এইসময় ১০০ ক্যারাট হিরের থেকেও দুষ্প্রাপ্য। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১০০ ক্যারাটের হিরের সংখ্যা আঙুলে গোনা যেতো, কিন্তু ১৮৭০ সাল নাগাদ আফ্রিকায় হিরের খনি থেকে বড়-বড় সাইজের হিরে পাওয়া যেতে লাগলো, ফলে হিরের ইজ্জত কমলো, আর বড় মুক্তোর ইজ্জত বাড়লো। বড় মুক্তোর দাম তখন হিরের চারগুণ। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্যারিসের বিশ্ব একজিবিশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সময় ওখানে ১২৮ গ্রেনের এক পিস মুক্তোর দাম উঠলো সাড়ে সাত লাখ টাকা। তাহলে একটা মুক্তোর মালার দাম কী হতে পারে আন্দাজ করুন।

একই মালা নিয়ে সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর টানাটানির ইতিহাস যদি শুনতে চান তাহলে কার্তিয়ারে খোঁজখবর করুন। কালো মুক্তোর প্রতি রাজ-রানিদের টান ভীষণ। একবার ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে কার্তিয়ার একটা কালো মুক্তোর মালা দেখালেন। উনি নিতে চাইলেন না, এবং তারপরেই শুনলেন মিসেস লিডস্ নামে এক আমেরিকান মহিলার গলায় সেটি শোভা পাচ্ছে। সম্রাটের তখন খুবই মন খারাপ। হঠাৎ শুনলেন, প্যারিসের যে হোটেলে তিনি আছেন সেখানে মিসেস লিডস্ও রয়েছেন। সম্রাট লাজলজ্জা ভুলে মুক্তোর মালা পরা এই মহিলাকে একবার দেখতে চাইলেন। তার থেকে শুরু হয়েছিল দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। সম্রাট এই সুন্দরীকে একটি রূপোর কুকুর(কার্তিয়ারের তৈরি) স্মরকচিহ্ন উপহার দিয়েছিলেন—তার বকলেসে লেখা—'আই বিলং টু দ্য কিং'।

কালো মুক্তোর জন্মস্থান তুমোতু, গামবিয়ার, ফিজি, পানামা, মেক্সিকো। আর সেরা সাদা মুক্তোর জন্মস্থান ছিল পারস্য উপসাগর, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া। সেই বাইবেলের যুগ থেকে পারস্য উপসাগরের মুক্তোর সুনাম। মুক্তোর ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের ছিল বিশ্ববিশ্রুত ভূমিকা। বোম্বাইয়ের মুক্তো ব্যবসার কেন্দ্রমণি ছিলেন আব্দুল রহমন ও শেখ জসিম। প্রথম যুদ্ধের সূচনার সময় বোম্বাইয়ের ভাগ্য বিপর্যয় হলো এবং মুক্তো ব্যবসায়ের প্রিন্স আব্দুল রহমন দেউলিয়া হলেন। মুক্তো ব্যবসায়ে বোম্বাইয়ের আন্তর্জাতিক ভূমিকা এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, পৃথিবীর সব বড়-বড় জুয়েলারের বোম্বাইতে বিশেষ প্রতিনিধি থাকতেন। কার্তিয়ারের স্থায়ী প্রতিনিধি শেঠনা নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতেন লণ্ডন ও প্যারিসে। জ্যাক কার্তিয়ারও মুক্তোর সন্ধানে ছুটে আসতেন বোম্বাইয়ে।

পৃথিবীর দুই বিখ্যাত মুক্তোর নাম লা পেলেগ্রিনা (১১১.৫ গ্রেন) ও লা পেরেগ্রিনা (১৩৩.২০ গ্রেন)। প্রথমটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল মস্কোতে গ্রিক অ্যানটিক ব্যবসায়ী জোসিমা ব্রাদার্সের সংগ্রহে তারপর থেকে এই মুক্তো বেপাত্তা। এই মুক্তোটির সন্ধান করতে পারলে আজও কোটিপতি হওয়ার সম্ভাবনা। 'লা পেরেগ্রিনা' বহুদিন স্পেনে ছিল, তারপর নেপোলিয়নের ভাই জোসেফ বোনাপার্ট মুক্তোটি নিয়ে চলে আসেন। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই মুক্তোটি বিক্রি করেন এক ইংরেজকে। মুক্তোটি ১৯৬৯ সালে হলিউডের নজরে পড়ে এবং নিলামে কিনে নেন চিত্রতারকা এলিজাবেথ টেলর, যিনি অন্য কারণে সম্প্রতি আবার সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছেন।

হিরে ও মুক্তোর ওজনের ব্যাপারে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো কার্তিয়ারের দয়ায়। ক্যারব গাছের ফলের বিচি দিয়ে ওজন হতো বলে হিরের মাপ ক্যারট। লাল কালো যে ফলে মুক্তোর ওজন সারা দুনিয়া মেনে নিতো তার

নাম 'রতি'। মোটামুটি ব্যাপারটা হলো ১ রতি = $\frac{৭}{৮}$ ক্যারাট ৩ $\frac{১}{২}$ গ্রেন। আসল মুক্তো এখনও রতিতে ওজন হয়, আর কালচার্ড পার্লের ওজন হয় ক্যারাটে।

মুক্তোর অবমূল্যায়ন শুরু বিশের দশকে যখন জাপানি কালচার্ড মুক্তো প্রথম বাজারে হাজির হলো। এরপরের দশকেই ওয়াল স্ট্রিট শেয়ার বাজারের বিপদ। মুক্তোর দাম হুড়মুড় করে কমে এক দশমাংশে দাঁড়ালো। কৃত্রিম পদ্ধতিতে মুক্তো জন্মানোর চেষ্টা চলেছে ছ'শ বছর ধরে, ত্রয়োদশ শতকে চিনারা কিছুটা সফলও হয়েছিল। তারপর চেষ্টা চলে সুইডেনে অষ্টাদশ শতকে। কিন্তু দুই জাপানি তাতমুই মিসে ও নিশিকাওয়া ১৯০৪-এ প্রায় একই সময়ে কিন্তু আলাদা-আলাদা ভাবে কালচার্ড মুক্তো তৈরির পথ উদ্ভাবন করলেন। এর পরেই (১৯১৬ সালে) এলেন কোকিচি মিকিমতো, যাঁর নাম এখন বিশ্বের সব মেয়ের জানা হয়ে গিয়েছে। তাঁর দয়াতেই আসল মুক্তোর বারোটা বাজলেও দুনিয়ার গেরস্ত মেয়েরা মটরদানার মতন ঝকঝকে মুক্তো গলায় পরে সুখ ও শান্তি পাচ্ছে।

আসল মুক্তোর ইজ্জত আবার ফিরে আসতে পারে এমন কথা যে শোনা যায় না এমন নয়। আসল ও ঝুটা যে এক নয় তা নিতান্ত বোকা ছাড়া কে না জানে? মুক্তো শুধু টাকা দিয়ে কিনতেন না বিশ্বের ধনপতিরা, তার তরিবত করতে শিখতে হতো, মুক্তোর জেল্লা অম্লান রাখবার জন্যে যেসব গোপন নির্দেশ দেওয়া হতো, তা জেনে রাখা ভাল।

অলঙ্কার প্রেমিকা বঙ্গললনারা জেনে রাখুন, আসলে মুক্তো শ্রী অঙ্গে সারাক্ষণ ধারণ না করে বাক্সবন্দী করে রাখলে তার জেল্লা কমার সম্ভাবনা থাকে। এদেশের অনেক রাজা মহারাজা তাই কয়েকটি কুচকুচে কালো নফর নিয়োগ করতেন, তাদের কাজ হলো মহারাজার যখন মুক্তোমালা পরার সাধ হবে তখন ওই মালা খালি গায়ে পরে থাকা যাতে জেল্লা না কমে।

আর একটি পথ আছে, যা নিয়মিত অনুসরণ করতেন বিখ্যাত ধনীর আদরের দুলালি বারবারা হাটন। এঁর বিয়ের সময়ে (১৯৩৩ সালে) পিতৃদেব পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান মুক্তোর হারটি কিনে দেন কার্তিয়ার থেকে—এ হার সম্রাজ্ঞী মারি আন্তোয়নও একসময় পরেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পরে এক বান্ধবী খোঁজ করতে এলেন, "বারবারা তোমার সেই বিখ্যাত মুক্তোমালা কোথায়?" মিষ্টি হেসে বারবারা বললো, "ওটা রয়েছে এখানকার একটা রাজহাঁসের পেটে।" "সে কী!" মানে বুঝতে পারছেন না বান্ধবী। কিন্তু মুক্তারসিকদের কাছে এটা কিছু খবর নয়। তাঁরা জানেন, রাজহাঁস যদি মুক্তো গিলে খায় তা হলে সে মুক্তোর জেল্লা তুলনাহীন হয়।

ধনবতীদের জীবনের এই রকম আষাঢ়ে গল্প শুনতে-শুনতে প্যারিসের রেস্তোরাঁয় অনেক সময় কেটে গিয়েছে। এখন রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার সময়। কার্তিয়ারের মার্কেটিং ডিরেকটরকে শেষ প্রশ্ন করেছিলাম। "হাতে গোনা যায় এমন কিছু বড়লোক নিয়ে আপনাদের কাজকারবার। আপনাদের চিন্তা হয় না পৃথিবী থেকে ধনীরা যদি চিরদিনের জন্যে অদৃশ্য হন তা হলে আপনাদের কী দশা হবে?"

হুগো দ্য লা বোর্দনে মোটেই চিন্তিত হলেন বলে মনে হলো না। তিনি মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন, "আগে ছিলেন ইউরোপের রাজরানিরা, তারপর এলেন কলোনি থেকে বড়লোক হওয়া ইংরাজরা, তারপর আপনাদের দেশের রাজামহারাজা, তারপর তেল, মোটরগাড়ি ব্যাঙ্কিং-এ বড়লোক হওয়া মার্কিনি ধনকুবেররা, তারপর মধ্যপ্রাচ্যের আরব শেখরা, ইদানীং জাপানিরা। যাঁরা বড়লোক হবেন তাঁরাই ভিড় করবেন কার্তিয়ারে, না-হলে যে ধনী হওয়ার মানেই হয় না। আপনাকে মনে রাখতে হবে চঞ্চলা লক্ষ্মী এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে হাজির হবেন, কিন্তু পৃথিবী কখনও বড়লোকশূন্য হবে না। বিলাসিতা ছিল, আছে এবং থাকবে।"

এবারে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং। এই বইয়ের দোকানে না এলে আমার মানবতীর্থ পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

ধনপতিদের বিলাসিতার খোঁজখবর নিতে-নিতে প্রাণ যখন একটি নির্মল বায়ুর জন্য অধীর হয়ে উঠছিল তখন আমার সদানন্দ গৃহস্বামী সম্বিৎ বললো, "চলুন বেড়াতে যাই।" বড়-বড় বাড়িতে আমার কৌতূহল কমে গিয়েছে, কয়েক দিন পর-পর বিয়ের ভোজ খেয়ে যেমন পোলাও মাংসে অরুচি ধরে। সম্বিৎ বুঝলো, আমি একমুঠো শাদা ভাত চাইছি।

অবশেষে শ্যেন নদীর ধারে নিজের মার্সেডিজকে স্তব্ধ রেখে সম্বিৎ আমাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। আমার মতন যে একবার রাজপথে ফেরিওয়ালাগিরি করেছে পথ তাকে টানবে আজীবন। আমি পথের এবং পথিকদের প্রেমে পড়ে গেলাম।

প্যারিস শুধু কোটিপতিদের শহর নয়, যাদের পকেটে পাঁচশ টাকা আছে তারাও এখানকার আনন্দ আহরণ করতে পারে। আগেই বলেছি পৃথিবীর সব শহরে যস্মিন দেশে যদাচার, এক মাত্র এই প্যারিস ছাড়া—মানুষের মহাতীর্থ হবার জন্যে এখানে নিজের তাগিদ অনুযায়ী আচরণ করার অবাধ স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা উপভোগ করছে পথের ধারের শিল্পী এবং অলস ফেরিওয়ালা। অনেক পসরা সাজিয়ে বসেছে, কিন্তু বাণিজ্যে মন নেই। অন্য শহর এদের বরদাস্ত

করে না। প্যারিস মনে-মনে হাসে এবং এদের প্রশ্রয় দেয়। আজ যে কোটিপতি, আগামীকাল সে পথের ভিখিরি হয়ে এই প্যারিসেই ফেরিওয়ালা হতে পারে। আজ যে এক কাপ কফি কেনবার মুরোদ রাখে না, কাল তার ছবির রাজা, গানের রাজা, আবিষ্কারের রাজা, অথবা ফ্যাশনের রাজা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ-কথা প্যারিস ভুলতে রাজি নয়। সাধে কি আর দুনিয়ার কোটি-কোটি মানুষের তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নগরী।

নোতরদাম অঞ্চলের কাছাকাছি নিজের খেয়ালেই হেঁটে চলেছি। মনটা অনেকদিন শিকলে বাঁধা ছিল, প্যারিসে এসে যেন প্যারোলে ছাড়া পাওয়া গিয়েছে সাময়িকভাবে। সম্বিৎ আমাকে আলগা দিয়ে দিয়েছে—কিন্তু ওরই মধ্যে নজরও রেখেছে, লোকে যেমন অনেক সময় পোষা কুকুর নিয়ে পথে বেরোয়, শিকল খোলা কিন্তু কড়া নজরও রয়েছে। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই—মনের মধ্যে ছবি আঁকার, কবিতা লেখার তাগিদ আছে, অথচ ভাঁড়ে রং নেই, মনে ছন্দ নেই। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকবো তার উপায়ও নেই, এদের ভাষা বুঝি না। আমার ভাষাও এরা নেবে না। একটা লোক নিজের খেয়ালে যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে, সঙ্গীতের সুর অচেনা হলেও মন টানছে। তারই পাশে আর একজন ছোকরা ছবির পসরা সাজিয়ে বসেছে। যেখানে ছবি নেই, ছবির কদর নেই, সেখানে মনুষ্যত্ব নেই। হঠাৎ আমার মনে হলো, ভাষাগুলো হলো ভারতীয় বা বাংলাদেশী মুদ্রার মতন, বিদেশে অচল, আর ছবি ও সঙ্গীত হলো মার্কিন ডলার বা জাপানি ইয়েনের মতন, দুনিয়ার সর্বত্র তার সম্মান। ছবি যারা আঁকতে পারে, সুর যারা সৃষ্টি করতে পারে তারা শব্দব্যবসায়ী সাহিত্যিকদের থেকে হাজার-হাজার মাইল এগিয়ে।

সম্বিৎ এবার পাশাপাশি হাঁটছে। ভিড়ের মধ্যে আমি হারিয়ে যাই তা তার অভিলাষ নয়। শিবপুরের লোকনাথ চ্যাটার্জি লেনে সশরীরে আমাকে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না।

"কী এতো ভাবছেন দাদা? প্যারিসে তো লোকে ভাবনামুক্ত হতে আসে।" সম্বিতের প্রশ্ন।

"ভাই সম্বিৎ, প্যারিস কেন দুনিয়ার পটেশ্বরী হয়ে বসে আছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালাচ্ছি। বিলাসকে বিশিষ্টতা দিলেও প্যারিস জানে, শুধু পয়সা থাকলেই অভিজাত হওয়া যায় না। বঞ্চিতের প্রতিও তাই টান রেখেছে প্যারিস, যাতে চিন্তার ঐশ্বর্য, সৃষ্টির ঐশ্বর্যগুলো অনাদরে শুকিয়ে না যায়। দুনিয়ার আর কোনও শহর এই আপাতবিরোধী কাজটা এমন সুন্দরভাবে করতে পারেনি। তাই প্যারিকে মাথায় করে রেখেছে দুনিয়ার সব মানুষ যেখানেই তার জন্ম হোক। দিল্লি কা লাড্ডুর ঠিক উল্টো এই প্যারিস কা পেস্ট্রি—যে খেয়েছে সে মজেছে, যে খায়নি সেও মজেছে। পস্তাবার কোনও কথাই ওঠে না প্যারিস প্রসঙ্গে। জয়

হোক প্যারিসের, বেঁচে থাক প্যারিস লাখ-লাখ বছর ধরে।"

সম্বিৎ এখনও কাঁচড়াপাড়া শহিদনগর কলোনির মানসিকতা বর্জন করতে পারেনি। সে বললো, "আমাদেরও দুটো শহর আছে শংকরদা। রোগা হোক, ময়লা হোক, ছেঁড়া কাপড়-পরা হোক—কলকাতা আর ঢাকাকেও আমরা আবার সাজাবো নিজের মনের মতন করে। প্যারিসের তো কোনও মন্ত্রগুপ্তি নেই, এখানকার শিক্ষাগুলো আমরা ওখানেও কাজে লাগাবো।"

যে লাগাতে পারে সে লাগাক, কলকাতা শহরে আমি ছাড়াও নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নশ নিরানব্বই জন মানুষ আছেন। কলমের সেই মুরোদ নেই যা ছিল একশ কিংবা দেড়শ বছর আগে। এযুগে কলমচি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করে, মানুষ যা অর্ডার করে তা এনে দেয় রান্নাঘর থেকে, মানুষটার সত্যিই কী প্রয়োজন তার খোঁজ করার দায় থেকে এযুগের কলমচি অব্যাহতি নিয়েছে।

ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত আকারের সাইনবোর্ড নজরে পড়লো। খোদ ভোলতেয়ারের সাম্রাজ্যে আর এক ভিনদেশি সম্রাটের পতাকা উড়ছে—শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং। রাজা ইংরেজের জাতশত্রুর বংশে আমার জন্ম। আমার গর্ভধারিণীর পিতৃদেব দুর্বিনীত এক ইংরেজকে থাপ্পড় মেরে আর্থিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন কিন্তু তবু শেক্সপিয়রের খাস প্রজা বলতে আমার গর্ব—ভোলতেয়ার সে তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া। জয় হোক সম্রাট শেক্সপিয়রের। কিন্তু তিনি কবে এই প্যারিসে শিবিরস্থাপন করলেন? তাঁর এই দরবারের কথা তো আগে শুনিনি।

অতএব সবকিছু ছেড়ে দ্রুত বেগে ওই শেক্সপিয়র কোম্পানির দিকে ধাবমান হওয়া ছাড়া গতি নেই। আমরা সূর্যের ('রবি') উপাসক ও শেক্সপিয়রের উপাসক। ইংরিজি যাঁদের ডালভাত নয় তাঁদের প্রাণেও দাগা দেয় এই শেক্সপিয়রের কলম।

ভাবা যায় না! খোদ প্যারিস শহরের বুকে ইংরিজি সাইনবোর্ড—'বুকসেলার্স', সেই সঙ্গে ইংরিজি বইয়ের ডিসপ্লে এবং বিরাট একটি ব্ল্যাকবোর্ডে খড়িতে লেখা নানা ইংরিজি বিজ্ঞপ্তি—যেমন 'অনিতা, আমি পায়ে হেঁটে ইউরোপ ঘুরতে চললাম, এইখানে দেখা হবে নভেম্বরের পঁচিশে, দুপুর আড়াইটেতে।' 'কেউ কি আমাকে বিনা পারিশ্রমিকে ফরাসি শেখাবে? বদলে ইংরিজি শেখাতে পারি।' 'জেমস জয়েসের ইউলিসিস কিনতে চাই, টাকা নেই। বদলে কার্লাইলের ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস দিতে পারি।' 'রুমা, সেদিনকার কফি ও সান্নিধ্য দুই ভীষণ ভাল লেগেছিল। সিডনিতে এলে দেখা হবে। ডেভিস।'

শেক্সপিয়র কোম্পানির অবস্থান প্যারিসের হৃদয়ে—সেখান থেকে 'জিরো' মাইলের সূচনা। কলকাতার ক্ষেত্রে এ দিকচিহ্নটি হলো এসপ্ল্যানেডের রাজভবন।

দোকানের সামনে ছোট্ট একটি চত্বর, যেখানে একটি পুরনো ফোয়ারা দাঁড়িয়ে রয়েছে—একদা মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যেতো প্যারিসের সর্বত্র।

যেখানেই যাই বইয়ের দোকানে ঢুঁ না মারলে আমার মন ভরে না। ছোট-ছোট মফস্বল অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বড়-বড় মেগাপলিস পর্যন্ত বহু জায়গায় বইয়ের দোকান দেখেছি, প্রায় বছর কুড়ি হাওড়া খুরুট রোডে অরোরা বুক ডিপো বলে ছোট্ট দোকানে নিত্য সময় ব্যয় করেছি—কিন্তু শেক্সপিয়র কোম্পানির মতন বইয়ের দোকান আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। যদিও, বলতে বাধা নেই, এইরকম একটা দোকান প্রত্যেক জনপদের মানুষের পাওনা।

ভাবছেন, বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। বইয়ের দোকান ও মাংসের দোকান তো এক জিনিস নয়। একটা অদৃশ্য ভালবাসার সুতোয় বাঁধা হয়ে আদর্শ বইয়ের দোকানের শুরু হয়, যার একমাত্র কাছাকাছি তুলনা হলো ভাঁটিখানা। মানুষ এখানে আসে অন্য টানে। ভাঁটিখানায় মদ খেয়ে অনেকে দাম মেটাতে পারে না, বই চুরি করতে গিয়ে কেউ-কেউ বুকশপে ধরা পড়ে, কিন্তু মাংসর দোকানে মাংস চুরি হয়েছে শুনিনি কখনও।

বইয়ের দোকানে তিনজন নায়ক—লেখক, দোকানদার ও পাঠক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে সৃষ্টির আদিতে লেখক নন, পাঠক। কারণ পাঠক থেকেই লেখকের উৎপত্তি, একখানাও বই পড়েননি এমন লেখক এখনও জন্মাননি। পড়তে-পড়তেই লেখবার বাসনা জাগে, যদিও কেউ-কেউ লেখক হয়ে পড়ার মাত্রা কমিয়ে দেন। পাঠক ও লেখকের মধ্যে হাইফেন হলেন বইওয়ালা—পৃথিবীর সেরা বইয়ের দোকানদাররা সবাই বইমাতাল, ময়রা সন্দেশ খায় না এমন কথা বইওয়ালার ক্ষেত্রে খাটে না।

শেক্সপিয়র কোম্পানির কাঁচের শোকেসে থাকে-থাকে অসাধারণ সব বই এমনভাবে সাজানো রয়েছে যা কার্তিয়ারের শোকেসকেও লজ্জা দেবে। এইসব বই পুরনো মনে হলো, কিন্তু সোনার গহনা ছাড়া বইই একমাত্র জিনিস যা যত পুরনো হয়ে তত দাম বাড়ে। বের করুন না একখানা আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণ, কিংবা গীতাঞ্জলির প্রথম মুদ্রণ—দেখুন না কদর হয় কি না। পৃথিবীর কিছু-কিছু বইয়ের দোকানদারও বিখ্যাত হয়েছেন—যেমন ধরুন ওয়াল্টার হুইটম্যান এমারসন, হুইটম্যান ও থোরো—এই তিনজনের থেকে বেশি সম্মান ভারতীয়দের কাছ থেকে পাননি কোনও আমেরিকান। এঁদের সঙ্গে আমাদের মনে মেলে। কোথায় যেন একটা আত্মীয়তা থেকে যায়।

ওয়াল্টার হুইটম্যানকে কোন সময় হৃদয়ে বিশেষ স্থান দিয়েছি, কিন্তু তাঁরই প্রপৌত্রকে যে এই প্যারিসে আবিষ্কার করবো এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারবো তা ভাবতেও পারিনি। শেক্সপিয়র কোম্পানির প্রাণপুরুষ হলেন জর্জ হুইটম্যান,

যাঁর জন্ম ১৯১৩ সালে। সাতাত্তর বছরের এই মানুষটিকে বৃদ্ধ বলবে এমন সাহস কার আছে? মনেপ্রাণে ছোকরা হয়ে আছেন চিরযৌবনের মালিক এই আমেরিকান, যাঁর ধারণা—যে নিয়মিত বইয়ের সঞ্জীবনী সুধা পান করে তার পক্ষে জরায় আক্রান্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বই, পাঠক ও দোকানদারের ত্রিমুখী ধারার সঙ্গম না হলে এমন অবিশ্বাস্য দোকান গড়ে ওঠে না। এখানে নিতান্ত অপরিচিত পাঠকের জন্যেও সারাক্ষণ রাজকীয় ব্যবস্থা। বই কিনতেই হবে এমন কোনও মাথার দিব্যি নেই। বইকে ভালবাসলেই হলো। আমরা যখন শেক্সপিয়র কোম্পানিতে প্রবেশ করলাম তখন কয়েকটি নিতান্ত নবীন ও নবীনা দোকানের পরিচালনায় রয়েছেন। এঁরা সোজাসুজি জানালেন, মালিক একটু পরেই ফিরবেন, আপাতত তিনি দোকানের ভার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন। এই এখনকার নিয়ম, প্রতিটি অভ্যাগতকেই এখানে বিশ্বাস করা হয়। এখানে এক জায়গায় লেখা আছে, 'অপরিচিত আগন্তুককে আপ্যায়ন করো, দেবদূত হয়তো এই বেশেই তোমাকে পরীক্ষা করতে আসবেন।'

শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিতে বই কিনলে তার মর্যাদাই আলাদা, কারণ বইয়ের ওপরে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির রবার স্ট্যাম্প মেরে দিলেই সাধারণ বইও অসাধারণ সংগ্রহ হয়ে উঠলো। বই বলতে নতুন আছে, আবার পুরনোও আছে। নিতান্ত কম সংখ্যা নয়, কয়েক তলা মিলে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাইটেল। প্যারিসে যত দেশ-বিদেশের লোক আসেন ইংরিজি বইয়ের সন্ধানে তারা এখানে ঢুঁ মারেন। বই কিনবে বা না-কিনবে তা পাঠকের মর্জির ওপর নির্ভর করছে, কিন্তু বই যতক্ষণ খুশি পড়তে পারো সেই ভোরবেলা থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত, কারণ শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির দরজা রাত বারোটার আগে বন্ধ হয় না। দরজা যখন বন্ধ হচ্ছে তখন যদি কোথাও যাবার ব্যবস্থা না থাকে তা হলেও ওয়াল্টার হুইটম্যানের নাতি কাউকে তাড়াবার পাত্র নন, ওইখানেই শুয়ে পড়ো এবং শুয়ে-শুয়ে বই পড়ো যত রাত ইচ্ছে। এর মধ্যে ইচ্ছে হলে একবার উপরের ঘরে গিয়ে কিছু গরম করে নিতে পারো, আর খাবার কেনবার মুরোদ না থাকলেও জর্জ হুইটম্যান অনাহারে রাখছেন না। উনি নিজে যা রান্না করেছেন তাতে ভাগ বসানো যেতে পারে সহজে। খেতে-খেতেও বইয়ের গল্প। আবার রবিবার বিকেলে দোকানের সামনে বসবে কফিচক্র। একখানা হাল্কা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ো, কবিতা শোনাও বা শোনো। আলাপ করো, আলোচনা করো, প্রশংসা করো, নিন্দা করো—অর্থাৎ হাত গুটিয়ে থেকো না, বই নিয়ে একটা কিছু করো।

আর রবিবারের এই পাঠচক্রকে নেহাত বাজে বলে দূরে সরিয়ে দিয়ো না,

মনে রেখো দুনিয়ার এমন কোনও বাঘা লেখক নেই যিনি প্যারিস পেরিয়ে যাবার সময় একবার এই শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি না ঘুরে গিয়েছেন।

আমি অনেকক্ষণ ধরে বই ঘাঁটছি। এ এক অদ্ভুত বইয়ের দোকান, যেখানে বইয়ের দাম ক্রেতার সামর্থের ওপরেও নির্ভরশীল। একটা বই তোমার পছন্দ হয়েছে, দাম একটা লেখা হয়েছে, কিন্তু তুমিই তো পাঠক, ভগবান। বেশ তুমিই ঠিক করো যা দাম লেখা আছে তার কম দেবে না বেশি দেবে। এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, যেখানে বড়-বড় করে লেখা রয়েছে—পে হোয়াট ইউ ক্যান, টেক হোয়াট ইউ নিড। অর্থাৎ যা প্রয়োজন তা নাও, যা সামর্থ্য তা দাও। একেবারে আদর্শ মানবসমাজের শেষ কথা, নিতান্তই যদি কিছু না চাও, তা হলে অন্তত দাঁড়াও পাঠকবর, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এই পাঠ্যস্থলে এবং পড়ার আনন্দসাগরে ডুব দাও। বসে পড়ো, দাঁড়িয়ে পড়ো, হাঁটতে হাঁটতে পড়ো, আধশোয়া অবস্থায় পড়ো, চিৎ হয়ে পড়ো, উপুড় হয়ে পড়ো, পড়তে-পড়তে ঘুমোও, ঘুমোতে-ঘুমোতে পড়ো, মা সরস্বতী এই সর্বগ্রাসী আনন্দের জন্যেই তো বইয়ের সৃষ্টি করেছিলেন।

আমি কতক্ষণ বই ঘাঁটছি খেয়াল ছিল না। কিন্তু সম্বিৎ কিছু দুষ্টুমি করেছে, কাউন্টারের ছেলেটিকে বলেছে আমি ভিনদেশী লেখক, এসেছি প্যারিসের তীর্থ পরিক্রমায়। একটু পরেই তুলকালাম কাণ্ড। বঙ্গভাষাজননীর যে এমনই বিস্তার ও প্রভাব তা জানা ছিল না। এক বৃদ্ধ ফরাসি বাগেত বগলে দোকানে প্রবেশ করলেন, আমাকে বললেন, শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি আমাকে পেয়ে গর্বিত, এখানে সবাই জানে, লেখক না থাকলে বই লেখা হতো না এবং বই লেখা না হলে পাঠকদের কষ্টের শেষ থাকতো না।

এবার আরও অবাক হবার পালা। আমার হাতে একটা ফ্ল্যাটের চাবি ধরিয়ে দিলেন শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির মালিক। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আমি বিনা মূল্যে এই ফ্ল্যাটে যতদিন খুশি থেকে যেতে পারি। এই বিশ্বভুবনকে লেখকরা দেখবেন কী করে যদি তাঁদের মাথার ওপর একটা ছাদ না থাকে? ঘুরে-ঘুরে দেখো, দেখে-দেখে ঘোরো, তারপর বসেপড়ো, বিদ্যেবুদ্ধি খেলাও, খাজা আহাম্মক না হয়ে নিজের চোখের আলোকে লেখো নতুন মানুষের কথা, নতুন দেশের কথা। তোমার চোখেই ঘরোয়া মানুষ দুনিয়াকে আবিষ্কার করবে।

দুনিয়ার বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এমন অবস্থায় কখনও পড়িনি। আমি ভাবলাম, বুড়ো কোনও স্পেশাল তালে আছেন। কিন্তু বুড়ো টানাটানি করতে লাগলেন। বললেন, "গরিবের এই বাড়িতে বই আছে আর কিছু খাটবিছানা আছে। জনা দশেক অতিথিকে প্রয়োজনে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। খ্যাত অখ্যাত প্রতিষ্ঠিত-পরাভূত সব রকমের লেখকের পদধ্বনি পড়েছে এই

শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিতে।"

জর্জ বললেন, "লেখক মশাই পথে না বেরুলে বোঝাই যায় না, এই অমানবিক দুনিয়ার এখনও কত দয়ালু মানুষ আছে। কোস্টারিকা থেকে আরম্ভ করে কাঠামাণ্ডু পর্যন্ত কত জায়গায় আমি অযাচিত স্নেহ ও আশ্রয় পেয়েছি—যদি কোনও দিন বেরিয়ে পড়ো তাহলে টুঁ মেরো তাহিতি দ্বীপের কুইনস বার-এ, মোগাদিসুর লিডোতে, কালিম্পঙের হিমালয় হোটেলে।"

বইয়ের দোকানের কথা উঠলো। জর্জ বললেন, "পাঠক যেখানে আপনজন হয়ে ওঠেন তেমন তিনটে দোকানের নাম শুনেছি—কেমব্রিজে 'গ্রলার', ম্যানহাতানে 'গোথাম বুক মার্ট', আর স্যানফ্রানসিসকোর 'সিটি লাইটস'। এই সিটি লাইটস্ বুক শপের মালিক লরেন্স ফার্লিংগেটিও প্যারিসে এসেছিলেন, সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জের সঙ্গে পড়াশোনা করেন, তারপর ১৯৫৩ তে দোকান খোলেন স্যানফ্রানসিসকোতে এবং বিখ্যাত হন ১৯৫৫ সালে গিন্স্বার্গের 'হাউল' প্রকাশ করে।" জর্জের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক শুরু সোরবোনে ছাত্রাবস্থায়, প্রথমে ছোট্ট একটা দোকান করেন, তারপর শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক ১৯৫১ থেকে। এখন যে-বাড়িটায় এই প্রতিষ্ঠান সেটি ছিল এক আরবের মুদিখানার দোকান।

শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাত্রী সিলভিয়া বিচ এখন কিংবদন্তীর নায়িকা— কেউ-কেউ তাঁকে মাদার অফ লিটারেচর বা সাহিত্য জননী বলেও বর্ণনা করেছেন।

সিলভিয়া বিচ-এর বাবা ছিলেন পাদ্রি—তিনি একবার মেয়েদের নিয়ে ফরাসি দেশে এসেছিলেন। কৈশোরের সেই প্রেম আমেরিকান মহিলাকে ফরাসি সংস্কৃতির পরম ভক্ত হিসাবে গড়ে তুললো। ১৯৭১ সালে অভিনেত্রী বোন সাইপ্রিয়াকে নিয়ে সিলভিয়া ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে প্যারিসে হাজির হলেন। পরে আজন্ম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলেন ফরাসি গ্রন্থপ্রেমিকা আদ্রিয়েন মনিয়ারের সঙ্গে। এই মনিয়ারই ঘর জোগাড় করে দিলেন ৮ নম্বর রু দুপাইতে—এখানে ডাইং ক্লিনিং ছিল। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হলো শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি যা আধুনিক ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করলো। প্রথমে শুরু হলো বইয়ের দোকান হিসাবে। কিন্তু সিলভিয়ার দয়ার শরীর, তিনি বুঝলেন সবার পক্ষে টাকা দিয়ে কিনে ইংরিজি বই পড়া সম্ভব নয়। তাই একই সঙ্গে শুরু হলো লেন্ডিং লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির সভ্যরা পরবর্তীকালে ইংরিজি সাহিত্যে ঝড় তুলেছিলেন। শুনুন কয়েকটা নাম : এজরা পাউণ্ড, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, এফ স্কট ফিটজেরাল্ড, শেরউড অ্যাণ্ডারসন, গার্টুড স্টাইন, পল ভ্যালেরি।

বান্ধবী আদ্রিয়েন মনিয়ারও এক ফরাসি বইয়ের দোকান ও প্রকাশন সংস্থা খুলেছেন কাছাকাছি—যাঁর লেখকরাও সমকালীন ফরাসি সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন। এই দুই বান্ধবীর মাধ্যমে ফরাসি ও ইংরিজি সাহিত্যিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব যোগসূত্র স্থাপিত হলো।

শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিকে ১২ নম্বর রু দ্য লা আদিয়নে স্থানান্তরিত করা হলো ১৯২১ সালেই জুলাই মাসে।

শেক্সপিয়র কোম্পানি শুধু বইয়ের দোকান নয়, চলমান লেখকদের সাময়িক বিশ্রামস্থলও বটে। যাঁরা ভবঘুরে তাঁরা এই দোকানকে নিজের ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করতেন, প্রায়ই আসতেন নিজের চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে, চেক ভাঙাতে, অথবা নিছক আড্ডা দিতে। শেক্সপিয়র কোম্পানির এই আড্ডার ধাঁচেই এক সময় আমাদের সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো কলেজ স্ট্রিটের এম সি সরকার অফিসে। বসুধারা পত্রিকার সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যর দপ্তরে, বর্মন স্ট্রিটে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের ঘরে এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্রর আতিথেয়তায় 'মিত্র ঘোষ' প্রকাশনার শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের অফিসে।

এইসব আড্ডা থেকে কখন কী অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা ভাবলে বেশ অবাক লাগে।

যেমন সিলভিয়া বিচ একদিন এক সাহিত্য পার্টিতে গেলেন। তারিখটা স্মরণীয় হয়ে আছে—১১ জুলাই ১৯২০। সেখানে এক আইরিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। কোনও বইয়ের দোকানের নাম শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি হতে পারে শুনে ভদ্রলোক বেশ কৌতূহলী বোধ করলেন। আরও অবাক হলেন যখন শুনলেন, এখানে ইংরিজি সাহিত্যের ভবঘুরে লেখকরা জড়ো হন নিষ্কাম আড্ডা ও বিনাপয়সায় কফি সেবনের জন্য। বললেন, আপনার আপত্তি না থাকলে একদিন আসবো। সিলভিয়া সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, অবশ্যই আসবেন। সমস্ত লেখকের জন্য সারাক্ষণের নিমন্ত্রণ আমার দোকানে।

লোকটি বললেন, "লেখক হিসাবে আমার প্রতিষ্ঠা নেই। আমাকে আপনার মনে থাকবে কিনা জানি না, আমার নাম হেনরি জেমস।"

প্যারিসে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি অফিসে হাজির হলেন অখ্যাত লেখক জেমস জয়েস। জন্মসূত্রে আইরিশ, চোখে বিখ্যাত লেখক হবার স্বপ্ন। জন্মস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে কয়েক বছর কাটাচ্ছিলেন প্রবাসে। প্রথমে ট্রিয়েস্টে—জীবনধারণ করেছেন কায়ক্লেশে ইংরিজির মাস্টারি করে এবং পরে ব্যাঙ্কে কাজ করে। [illegible] বছর ওই কাজ করে মন ভরলো না, হবু লেখক চললেন জুরিখে, ১৯১৫ সালে। ওইখানে এক সময় দেখা হলো, দুর্ধর্ষ আমেরিকান

লেখক ও সমালোচক এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতন এই মানুষটির সাহিত্যকীর্তির কথা ইংরিজি ভাষার পাঠকদের সম্পূর্ণ অবগত, কিন্তু এজরা পাউণ্ডের ব্যক্তিগত জীবনও উপন্যাসকে হার মানায়। একজন সাহিত্যিকের জীবনে যতরকম নাটকীয়তার কথা কল্পনা করা যায় তার সব কিছু পাওয়া যায় এজরা পাউণ্ডের জীবনে—বেঁচেছিলেনও অনেক দিন। তার মধ্যে কোনও বছর কেটেছে চরম বিলাসে ও ভোগে, কখনও প্রায় অনাহারে, কখনও জেলে এবং জীবনের শেষ প্রান্তে দীর্ঘ দিন ধরে পাগলা গারদে। মানসিক অসুস্থতার চরম অবস্থায় এঁর অসাধারণ এক ছবি তুলেছিলেন এই শতাব্দীর পোর্টেট ফোটোগ্রাফার স্মরণীয় পুরুষ ফরাসি আলোকচিত্রী হেনরি কার্তিয়ার-ব্রেসোঁ। এই ফোটোগ্রাফটিও হঠাৎ আবিষ্কার করলাম শেক্সপিয়র কোম্পানির দোকানের সামনে বের করে দেওয়া পুরনো বইয়ের ঝুড়িতে।

শেক্সপিয়র কোম্পানির এই এক বিশেষ ধারা, অসামান্য মণিমাণিক্যকে এঁরা কাচের শো-কেসে তালাবন্ধ করে রাখায় বিশ্বাস করেন না। বই তো দূর থেকে দেখার জিনিস নয়, বই হাতে না তুললে, নিজে অক্ষরে চোখ না বোলালে বইয়ের যে কোনও মানে হয় না তা শেক্সপিয়র কোম্পানির কর্তারা ভালভাবেই জানেন। তাই প্রতি সকালেই কিছু বই বের করে দেন রাস্তার ধারে, লোকে দেখুক, নাড়াচাড়া করুক, পড়ুক। ইচ্ছে হলে এবং সামর্থ্য থাকলে কিনুক। কিন্তু সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে কেউ বইয়ের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হবে তা শেক্সপিয়র কোম্পানির প্রতিষ্ঠাত্রী জননী সিলভিয়া বিচ এবং বর্তমান কর্ণধার ওয়াল্ট হুইটম্যানের বংশধর জর্জের অকল্পনীয়।

বংশধর কিন্তু ইলেজিটিমেট বংশধর, একথাও বলে ফেললেন জর্জ। যখন শুনছো, তখন সব শুনে রাখাই ভাল। অর্ধেক সত্য শুনে-শুনেই তো দুনিয়ার আজ এই দশা। পুরো কথা জানিয়ে দিলে বুক অনেক হাল্কা হয়ে যায়, দায়িত্ব অনেক কমে যায়, তা লেখকদের থেকে ভাল কে জানে মিস্টার মুখার্জি?

জর্জ হুইটম্যান বললেন, "এখানে তুমি যতদিন খুশি থাকতে পারো। তরুণ লেখকদের আমি দু'সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে দিই। সারাদিন তারা যা খুশি করতে পারে কিন্তু রাত্রে একটা বই পড়তে হবে। আর কোনও শর্ত নেই, ইদানীং আর একটা টার্ম ঢোকাচ্ছি—কিছু লিখতে হবে, নিদেন পক্ষে ক'টা লাইন। এবং এখানকার বৈঠকে পড়তে হবে। পৃথিবীতে যখন লেখকরা গল্প করতেন, তর্ক করতেন, পরনিন্দা-পরচর্চা করতেন এবং একসঙ্গে হৈ-চৈ করতেন তখন ভাল ভাল লেখা বের হতো, এখন সবাই একটা দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইছেন, এটা ভাল কথা কি?"

আমি সায়েব লেখকদের লেখা পড়েছি, কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে

তেমন খোঁজখবর রাখিনি। আমি কী বলবো।

জর্জ আমার দিকে চা এগিয়ে দিয়ে বললেন—ইচ্ছে করলে আমি তাঁর রুটিতে ভাগ বসাতে পারি। আমি রাজি হলাম না।

জর্জ বললেন, "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে আমার আপনজন, আমার আপন গাঁ থেকে এসেছো। তুমি এখানে থেকে যাও, একখানা ভাল বই লিখতে পারবে এই শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি ও তার চারদিকের বাউণ্ডুলে মানুষের সম্বন্ধে। তোমার জন্যে কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না, তুমি ইচ্ছে করলে তোমার ঘরে যাকে খুশি আনতে পারবে, তুমি রোজ লিখছো কিনা সে খবরদারিও আমি করবো না। আমি বুঝেছি, ধরাবাঁধার মধ্যে লেখককে রাখতে নেই, তাকে আস্কারা দিতে হয়, বেশি চাপে পড়লে অনেক লেখক ফুলের মতন থেঁতলে যায়।

"চলো, তোমাকে ঘর দেখিয়ে আনি" জর্জ হুইটম্যান আবার উঠে পড়লেন। যে ঘরে এবার ঢুকে পড়লাম সেটি একটি জতুগৃহ—কিছুদিন আগেই আগুন ধরেছিল, জানালার কাঠ, বাথরুমের দরজার কাছ এখনও আধপোড়া অবস্থায় রয়েছে। জানা গেলো একজন অসাবধানী লেখকের কর্ম—সিগারেট খেয়েছেন অজস্র, সাবধানতা অবলম্বন করেননি। পুলিশের হাঙ্গামায়, ফায়ার ব্রিগেডের হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল, ওরা লাইসেন্স কেড়ে নেবার তালে আছে। আমরা লড়ে যাচ্ছি। এই লড়াই তো আজকের নয়—সেই ১৯১৯ সাল থেকে চলে আসছে।"

যে ঘরেই যাই কেবল বই। মহামূল্যবান সব অটোগ্রাফ—হেমিংওয়ে, এজরা পাউণ্ড, জেমস জয়েস, ডি এইচ লরেন্স, গার্টুড স্টাইন, স্যামুয়েল বেকেট—এই শতকের বাঘা-বাঘা লেখকদের প্রীতির স্পর্শ পড়েছে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিতে।

আমরা আবার জর্জের ঘরে ফিরে এলাম। যেন কোনও মন্ত্রবলে আমি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফিরে গিয়েছি—আমি অন্য এক শতাব্দীর আঘ্রাণ পাচ্ছি এই ঘরে। লেখক জীবনে এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ভদ্রলোকের মধ্যে কোনও জাদু আছে, যা অদৃশ্যভাবে আমাকে টানছে।

জর্জের জন্ম ১৯১৩ সালে বোস্টনে, কিন্তু বয়সটা চেপে যান। বলেন, আটাশ বছর বয়সে প্যারিসে এসেছিলাম। প্যারিসে কারও বয়স বাড়ে না। পড়াশোনা বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে, জন্মসূত্রে টান প্রতীচ্যের দিকে, কারণ বাবা নানকিং-এ পড়াতেন। জন্ম-ভবঘুরে এই জর্জ—একবার পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটা আধলা না নিয়ে স্রেফ একবস্ত্রে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন মেক্সিকো থেকে পানামা। এখন আবার বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছে, কিন্তু জড়িয়ে পড়েছেন এই বইয়ের দোকানে। মাঝে-মাঝে ভাবেন, পাঠকদের হাতে দোকানটা

তুলে দিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়বেন। কিছুদিন আগে পিকিং-এ ঘুরে এসেছেন, ওখানে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির শাখা খোলার লোভ।

হয়তো ভাবছেন এইভাবে এই ঢেলে দিলে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, অবশ্যই প্যারিস নন্দনকানন নয় যে চোর থাকবে না। এই মানবতীর্থে ছিঁচকে চোর ছাড়া আছে বুদ্ধি-চোর, খ্যাতি-চোর, মন-চোর, ছবি-চোর, গহনা-চোর এবং অবশ্যই বই-চোর। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটা প্যারিস—লণ্ডন নয়, নিউইয়র্ক নয়, ফ্রাঙ্কফুর্ট নয়। ফলে উল্টোপুরাণও ঘটে। এই শেক্সপিয়র কোম্পানির ভক্তরা চুপি-চুপি রাতের অন্ধকারে অথবা দিনের আলোকে সবার অলক্ষ্যে অসংখ্য বই রেখে দিয়ে যান শেক্সপিয়র কোম্পানিকে সচল রাখতে। এর মধ্যে তাঁরা কোনও স্বীকৃতি বা কোনও দাম প্রত্যাশা করেন না। যে বই পড়ে নিজে আনন্দ পেয়েছেন গুণগ্রাহী পাঠক সেই আনন্দ অপরকেও দিতে চান বই ফেলে রেখে দিয়ে। দুনিয়া থেকে ভালবাসা যে এখনও উধাও হয়ে যায়নি তা এই দোকানে এলে বোঝা যায়। এ এক অপূর্ব আখড়া, যেখানে কীর্তন করা যায়—ভজ পুস্তক, জপ পুস্তক, লহ পুস্তকের নাম রে!

না, আমরা অখ্যাত আইরিশ লেখকের জীবন থেকে সরে আসছি। জেমস জয়েসের সুইস দেশে প্রবাসকালে দেখা হচ্ছে এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে। পাউণ্ড তখন শুধু সাহিত্যস্রষ্টা নন। সাহিত্যের এক তুলনাহীন জহুরিও বটে। বহু উদীয়মান লেখকের সুখ-দুঃখের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন এজরা পাউণ্ড। ভাবতেন, কী করে উপার্জনহীন সীমিত সামর্থ্য লেখকদের একটু সুখ বা শান্তি দেওয়া যায়। জেমস জয়েসকে এই এজরা পাউণ্ডই খুঁজে বের করলেন জুরিখে। পরামর্শ দিলেন, চলে আসুন প্যারিসে, ওইটাই আধুনিক ইংরিজি সাহিত্যের তীর্থভূমি হয়ে উঠছে।

জেমস জয়েস এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। প্যারিসে তাঁর জন্যে বাড়ি ঠিক করবার দায়িত্বও নিয়েছিলেন এজরা পাউণ্ড। তখনও লেখকদের মধ্যে সৌভ্রাত্র ছিল, পরস্পরের দুঃখে অংশীদার হবার জন্যে অনেকে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথচ মমত্ববোধের বহু নিদর্শন পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনেও দেখেছি। বিশেষ করে বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নেহ। আমার প্রথম বই 'কত অজানারে'-র কথাই ধরুন। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে টাইপিস্টের যন্ত্রণা সহ্য করে বইটা লিখে চলেছি নিজের দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্যে—কখনও যে বই-আকারে ছাপতে পারবো ভাবিনি। তখনকার দোর্দণ্ড লেখক রূপদর্শী (গৌরকিশোর ঘোষ) আমাকে পত্রিকা সম্পাদকের দরজায় পৌঁছে দিলেন নিতান্ত উৎসাহভরে। আর একজন দিকপাল লেখক (বিমল মিত্র) তখন খ্যাতির মধ্যগগনে—তিনি সস্নেহে শুধু পছন্দমতন

প্রকাশকের কাছে নিয়ে গেলেন তা নয়, লেখার পরিমার্জনায় পরামর্শ দিলেন। শোনা যায়, এজরা পাউণ্ড এই একই কাজ করেছিলেন আর এক ব্রিটিশ কবি টি এস এলিয়টের বিখ্যাত 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে। আমার প্রথম বইয়ের নামকরণ আমার মুরোদে হয়নি, সেই কাজটি সস্নেহে করে দিয়েছিলেন আর এক দিকপাল লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। বই বেরুবার পরে স্রেফ লেখক এই সুবাদে সীমাহীন ভালবাসা দিয়েছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—পুনা, বোম্বাই, কলকাতা কোথায় না, তাঁর বাড়িতে সন্তানের আদরে রাত্রিবাস করেছি। তেমনি ভালবাসা দিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী ও শিবরাম চক্রবর্তী। আলী সাহেব বাইরের লোকেরা সামনে আমার ভীষণ প্রশংসা করতেন, আর আড়ালে ডেকে বকুনি লাগাতেন লেখার ত্রুটি সম্বন্ধে। এ এক আশ্চর্য মানুষ, এঁদের কাছে এই সেদিনও যা পেয়েছি তা এখনও গল্পকাহিনী বলে মনে হয়।

আমেরিকান কবি এজরা পাউণ্ড শুধু অনন্য কবি ও সমালোচক নন, শতাব্দীর অনন্য সাহিত্যরসিকও বটে। টি এস এলিয়টকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব এঁর, যেমন কৃতিত্ব জেমস জয়েসকে আবিষ্কারের। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই এজরার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিল বলে শুনেছি।

এই সাহিত্যপ্রেমীর জীবনের ওপর দিয়ে যে কত ঝড় বয়ে গিয়েছে তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। প্যারিসে প্রকাশকের দফতরে সামান্য কাজ করে কোনওক্রমে জীবনধারণ করেছেন এবং সাহিত্যস্রষ্টাদের উৎসাহ দিয়েছেন। শেষ জীবন কেটেছে অতি কষ্টে কখনও জেলে, কখনও পাগলা গারদে। ভাল মানুষরাই বোধ হয় পৃথিবীতে বেশি কষ্ট পান।

যে জেমস জয়েসকে, এখন বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম স্তম্ভ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেই ভদ্রলোক প্রায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতেন, হয়তো 'ইউলিসিস' উপন্যাস কোনও দিন প্রকাশিতও হতো না, যদি-না এজরা পাউন্ড মদত জোগাতেন। এখন 'ইউলিসিস' উপন্যাস কীভাবে লেখা হয়েছিল, লেখক কখন কী মানসিকতায় ছিলেন তা নিয়ে বিরাট-বিরাট বই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু বিশের দশকে সিলভিয়া বিচের সেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিই তাঁকে রক্ষা করলো।

একটা পার্টিতে এঁদের দেখা হওয়ার কথা আগেই লিখেছি। তারপর সিলভিয়ার আমন্ত্রণে জেমস এলেন শেক্সপিয়র কোম্পানির দোকানে। নিদারুণ অনটনের মধ্যে আছেন জয়েস, প্যারিসে এসেই বহু কষ্টের মধ্যে বিশাল 'ইউলিসিস' উপন্যাসের একটা প্রধান অংশ শেষ করে ফেলেছেন। শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির মালিক প্রচণ্ড ঝুঁকি নিলেন, বললেন, এই বই আমি ছাপবো। হাতে স্বর্গ পেলেন জেমস জয়েস। ভদ্রলোকের চোখে প্রচণ্ড ব্যামো, গ্লুকোমায় অন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা, কিন্তু ভালভাবে চিকিৎসার সঙ্গতি নেই। বাঁ চোখে একটা

ঠুলি লাগিয়ে ঘুরতেন। লেখক হিসাবে জয়েস ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে—সিলভিয়া বিচ খরচের কথা না ভেবে নতুন এই লেখককে অনুমতি দিলেন প্রুফে যত খুশি সংশোধন করার। ফলে জয়েস অনেক সময় পাতার পর পাতা বর্জন করে নতুন লেখা জুড়ে দিতেন। প্যারিসে তখন সব কিছুই আজব—যে-ছাপাখানায় বই ছাপানো হতো সেখানে কম্পোজিটররা ইংরিজি জানতো না, স্রেফ অন্ধের মতন অক্ষর সাজিয়ে যেতো। কিন্তু সিলভিয়া বিচ ছাড়বার পাত্রী নন, এইভাবে দীর্ঘ দিনের সাধনায় শেষ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হলো ইংরিজি ভাষার যুগান্তকারী উপন্যাস 'ইউলিসিস'। ঠিক যেন আমাদের বই পাড়ার অবস্থা—যতই বিশ্বজয়ী সৃষ্টি হোক, মুদ্রণ সংখ্যা দু'হাজার এবং তাও শেষ হতে বছর কয়েক লেগেছিল। এই বইয়ের শত্রু অনেক। এক মহিলা এঁর প্রশস্তিমূলক সমালোচনা প্রকাশ করে জেলে গেলেন, পরে মনের দুঃখে তিনিও প্যারিসে হাজির হয়েছিলেন।

আর খোদ প্যারিসেও লেখকদের মধ্যে যেমন ভালবাসাবাসি তেমন ঝগড়াঝাটি। এই ইউলিসিস ছাপবার জন্যে বান্ধবী হারাতে হলো শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির জননীকে—জাঁদরেল লেখিকা এবং প্যারিসে ইংরিজি ভাষা ও সংস্কৃত কেন্দ্রমণি গার্টুড স্টাইন সম্পর্কচ্ছেদ করলেন শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে। কিন্তু সিলভিয়া বিচ অটল। তিনি যা ভাল বুঝেছেন তা করবেনই। শেক্সপিয়র কোম্পানি এর পরে যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন তার লেখক ওয়াল্টার হুইটম্যান, আমাদের জর্জ হুইটম্যানের প্রপিতামহ। বইটির নাম—'লিড্‌স অফ গ্রাম'। এই বই নিয়েও পরে অন্য ধরনের বিপদে পড়েছিলেন সিলভিয়া বিচ। প্রসঙ্গত বলা যাক, যে লেখককে সিলভিয়া বিচ অত কষ্ট করে পৃথিবীর পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক রাখলেন না। কয়েক বছর পরে সিলভিয়া বিচ যখন ইউলিসিসের পঞ্চম সংস্করণ প্রেসে পাঠাতে যাচ্ছেন সেই সময় শুনলেন জেমস জয়েস বড় একজন আমেরিকান প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। মনের দুঃখে অভিমানিনী প্রকাশিকা, যাঁর আশ্রয়ে ও স্নেহপ্রশ্রয়ে বিশ ও ত্রিশ দশকের ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে ইংরেজি লেখকরা এখানে লালিতপালিত হয়েছেন, ইউলিসিস ছাপানো বন্ধ করলেন।

হুইটম্যানের বই নিয়ে বিপদ এসেছিল অনেক পরে—চল্লিশের দশকে, তখন সিলভিয়ার শেক্সপিয়র কোম্পানি টিম-টিম করে জ্বলছে। জার্মানের ভয়ে ইংরিজি লেখকরা সব প্যারিস ছেড়ে পালিয়েছেন, কিন্তু সিলভিয়া বিচ ও গার্টুড স্টাইন ফ্রান্স ছাড়তে প্রস্তুত নন। প্যারিস যখন জার্মানদের দখলে তখনও টিম-টিম করে জ্বলছে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং। সিলভিয়া বিচ তখনও নিয়মিত দোকান খুলছেন, যদিও পাঠক উধাও। সেই সময় এক জার্মান মিলিটারি অফিসার ওখানে এলেন

এবং বইয়ের দিকে নজর দিতে-দিতে ওয়াল্টার হুইটম্যানের বইটা চাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে 'লিড্স অফ গ্রামে'র একটি মাত্র কপি পড়ে ছিল এবং সিলভিয়া তা বেচতে চাইলেন না। জার্মান অফিসার বিরক্তভাবে চলে গেলেন এবং সিলভিয়া বিচ বুঝলেন এখানে থাকা নিরাপদ হবে না। এর পর চার বছর তিনি একটা বাড়ির চিলেকোঠার রান্নাঘরে আত্মগোপন করে কাটিয়েছিলেন। সিলভিয়া বিচ আবার দোকানে এলেন যখন জার্মানরা পলায়মান, কিন্তু তখনও গোলাগুলি চলেছে। সেইখানে আবার মিলিটারি ঢুকলো, তবে এবার মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এবং সিলভিয়া অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন এই দলে পুরো মিলিটারির সাজে রয়েছেন পুরনো বন্ধু আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে প্যারিসে প্রবেশ করেছেন এবং প্রথম সুযোগেই ছুটে এসেছেন তাঁর প্রিয় বইয়ের দোকানে, যেখানে বিশের দশকে তিনি দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছেন, কফি পান করেছেন, তর্ক করেছেন, টাকা ধার করেছেন।

হেমিংওয়ের সাহিত্যজীবনে প্যারিসের মস্ত ভূমিকার কথা এখানে বিশ্ববিদিত। সাহিত্যিক হবো এই স্বপ্ন নিয়ে দেশছাড়া হয়ে হেমিংওয়ে যাচ্ছিলেন ইতালিতে। পথে একজন শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিলেন যদি লেখক হবার বাসনা থাকে যাও প্যারিসে। লিরা পাল্টে ফ্রাঁ কিনে হেমিংওয়ে হাজির হলেন ফরাসি দেশে। এইখানেই লেখার কায়দা-কানুন শিখলেন গার্টুড স্টাইনের কাছে, প্রকাশিত হলো ১৯২৩ সালে তাঁর প্রথম বই 'থ্রি স্টোরিজ অ্যাণ্ড টেন পোয়েমস'। প্রকাশক প্রতিষ্ঠান 'কন্ট্যাক্ট এডিশন্স' কেয়ার অফ শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মধার রবার্ট ম্যাকঅলমন্ট ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী এবং সিলভিয়ার স্নেহধন্য। রবার্ট বিয়ে করেছিলেন এক ধনী ইংরেজের দুহিতাকে—শ্বশুরের টাকা কিছু হাতে পেলেই ব্যয় করতেন বাউণ্ডুলে সাহিত্যিকদের পিছনে, যাদের নামকরণ হয়েছিল 'দ্য লস্ট জেনারেশন', বাংলায় যাকে বলা চলতে পারে 'গোল্লায় যাওয়া প্রজন্ম'।

যাঁদের লস্ট জেনারেশন বলা হলো তাঁদের অভাব ছিল, অনটন ছিল, বোহেমিয়ান ভাব ছিল, মাতলামো ছিল, ঝগড়াঝাটি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল দুরন্ত প্রতিভা। কয়েকজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, যাঁরা পাননি তাঁরা ইংরিজি সাহিত্যে অক্ষয় সম্মান রেখে গিয়েছেন—রবার্ট ফিটজেরাল্ড, ডি এইচ লরেন্স, হেনরি মিলার। আর নোবেল প্রাইজের কথা বলবেন না, আজেবাজে লেখক এই সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন আর পাননি জেমস জয়েস অথবা টলস্টয়। অথবা টুর্গেনিভ। বলাবাহুল্য, এই রাশিয়ান টুর্গেনিভও প্যারিসে কিছুদিন ডেরা বেঁধেছিলেন।

হেমিংওয়ের ব্যাপারটা শেষ করে ফেলা যাক। ১৯২৪ সালে এঁর আরেকটি

বই 'ইন আওয়ার টাইমস' এই প্যারিসের আর এক অখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান (থ্রি মাউন্টেন প্রেস) থেকে বেরিয়েছিল। যেসব লেখক এক দিন লক্ষ-লক্ষ বইয়ের মাধ্যমে বিশ্ববিজয় করবেন তাঁদের তখনকার অবস্থা শুনুন। এই বই ছাপানো হলো মাত্র ২২৫ কপি, তার মধ্যে ৫৩ কপিতে খুঁত। প্রকাশক ওই রদ্দি কপিগুলো হেমিংওয়েকে দিয়ে বললেন, এইগুলো বিভিন্ন ইংরিজি কাগজে পাঠান সমালোচনার জন্য।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটতো এইসব লেখকদের যাঁরা এক দিন পৃথিবীর জয়মাল্য লাভ করবেন। পেটের দায়ে নানা কাজ করতে হতো এঁদের। প্যারিসে তখন এক মহাসুন্দরী 'মডেল' ছিলেন যিনি অনেকের রক্ষিতা হয়েছিলেন। শিক্ষিকা পতিতার আত্মকথার মতন কিকি লিখলেন তাঁর স্মৃতিকথা এবং সেই বইয়ের ভূমিকা লিখলেন স্বয়ং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। এই ইংরিজি সংস্করণও প্রকাশিত হলো আর এক খুদে প্রকাশকের দপ্তর থেকে, নাম দ্য ব্ল্যাক ম্যানিকিন প্রেস, মালি এডওয়ার্ড টাইটাস।

পয়সার অভাবে হেমিংওয়ে থাকতেন একটা করাতকলের ওপরে ছোট্ট ঘরে—সেখানে এতো আওয়াজ হতো যে হেমিংওয়ে অস্থির হয়ে উঠতেন। ওঁর ভাগ্য খুললো 'দ্য সান অলসো রাইজেস' বইটি বেস্ট সেলার হবার পরে। নানা উত্তেজনার পিছনে হৈ-চৈ করে ঘুরে বেড়ানোর কথা আমরা শুনে থাকি, কিন্তু হেমিংওয়ে কি অসাধারণ পরিশ্রম করতেন তার খবর পেলাম শেক্সপিয়র কোম্পানিতে বসে। ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে এক ভদ্রলোক হেঁটে-হেঁটে হেমিংওয়ের ছ'তলার কামরায় গিয়ে দেখেন দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বেল বাজতেও কেউ দরজা খুললো না। হেমিংওয়ে নিজেকে ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে এক সপ্তাহ ধরে 'দ্য সান অলসো রাইজেস'-এর প্রুফ সংশোধন করেন সমস্ত দিন সমস্ত রাত ধরে। বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই, শুধু একজন লোক দরজার বাইরে দু'বেলা কফি ও পাঁউরুটি রেখে চলে যায়। বন্ধু লিখেছেন, 'নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে সীমাহীন যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি যদি জিনিয়াসের লক্ষণ হয় তাহলে হেমিংওয়ে অবশ্যই জিনিয়াস।'

জগৎবিখ্যাত হয়ে হেমিংওয়ে বহুকাল পরে ১৯৫৬ সালে প্যারিসের রিৎজ হোটেলে ঢুকেছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে ড্রিঙ্ক করার জন্যে। গেটের কাছে দেখা হয়ে গেলো হোটেলের বেল ক্যাপটেন বা হেড কুলির সঙ্গে। বেল ক্যাপটেন আগন্তুককে চিনতে পেরেই বললেন, "মঁশিয়ে ১৯২৭ সালে একটা ট্রাঙ্ক এখানে রেখে দিয়ে আপনি চলে গিয়েছিলেন, আর আসেননি। আপনি কি এখন ওটি নেবেন?' ধন্যি প্যারিসের হোটেলওয়ালা, তিরিশ বছর ধরে বেল ক্যাপটেন ওই ট্রাঙ্ক আগলাচ্ছেন, যদিও বিল না দিয়ে কেটে পড়ার সময় অনেকে এইরকম

লাগেজ ফেলে যায়। হেমিংওয়ে এই ট্রাঙ্ক ফেরৎ পেয়ে উপকৃত হলেন, কারণ ওর মধ্যেই ছিল তাঁর প্যারিসের স্মরণীয় দিনগুলি সম্বন্ধে মহামূল্যবান নোট। যার সাহায্যে তিনি প্যারিসের স্মৃতিকাহিনী লিখে ফেললেন।

শিল্প ও সাহিত্যের ধাত্রীরূপে প্যারিসের খ্যাতি তুঙ্গে উঠেছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ থেকে। ইংরিজি সাহিত্যের দিকপালরা আমেরিকা ও ইংলণ্ডের জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন এই প্যারিশ মহানগরে, কারণ শিল্পীর পাগলামোকে প্রশ্রয় দিতে প্যারিস তুলনাহীন। এই সময় যিনি ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনিও (পল ডেসকল) ছিলেন অদ্ভুত ধরনের, প্রেসিডেন্টের স্পেশাল ট্রেন থেকে পাজামা পরে নেমে উধাও হতেন, গাছকে জড়িয়ে ধরতেন এবং পরে পুরোপুরি পাগল ঘোষিত হয়ে ফরাসিদের রাঁচি—ম্যালমাসোতে প্রেরিত হন। প্যারিস তখন সস্তাগণ্ডার জায়গা, কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলায় না, সর্বত্র যা কিছু করার স্বাধীনতা। সৃষ্টির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ, তাই অনেকে হাজির হলেন মানুষের মহাতীর্থে। এঁদের কারুর কারুর মাসিক কিছু ভাতা প্রাপ্য ছিল পারিবারিক সূত্রে—সেই টাকায় নির্ভর করে তাঁরা কোনওক্রমে পড়ে থাকতেন প্যারিসে। কারুর কারুর কিছুই নেই, স্রেফ প্যারিসের মায়ামোহে আকৃষ্ট হয়ে চলে এসেছেন শিল্পী অথবা লেখক হবার বাসনায়।

এঁদেরই একজন তিরিশের দশকের শুরুতে তাঁর বন্ধুকে লিখছেন, 'এখানকার পথ গান গায়, এখানকার প্রতিটা পাথর কথা বলে। এখানকার বাড়িগুলো থেকে টপ-টপ করে ইতিহাস, গৌরব ও রোমান্স ঝরে পড়ে। আমি ভালবাসায় পড়ে গিয়েছি, আমি এখানেই সারা জীবন থেকে যেতে চাই। প্যারিসকে আমি একটা বইয়ের মতন পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে চাই এবং এইখানে বসে আমি লিখতে চাই।'

যিনি এই কথা লিখছেন তিনি পরবর্তী কালে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তাঁর 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' ও 'ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন' বইয়ের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৩০ সালের প্রথম শীতের ধাক্কায় কপর্দকহীন হেনরি মিলারের শোচনীয় অবস্থা। অর্ধেক দিন খাওয়া হয় না, থাকবার জায়গা পর্যন্ত নেই, ক'দিন একটা সিনেমা হাউসের পোর্টিকোতে রাত কাটাতে হলো। এই সময় এক আমেরিকান উকিলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা, নাম রিচার্ড অসবর্ন। এই ভদ্রলোক এঁকে বাড়িতে এনে তুললেন—আট তলার একটা ঘর ছেড়ে দিলেন। লিফট নেই, ১২৯টা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওই ঘরে উঠতে হতো। হেনরি মিলারের ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি লেখার স্বপ্নে মশগুল। অসবর্ন প্রতি দিন টেবিলে দশ ফ্রাঁর একটি মুদ্রা রেখে নিঃশব্দে চলে যেতেন এবং তার বদলে প্রতি দিন ফিরে এসে দেখতেন সমস্ত দিনের

সাহিত্যকর্মের ফসল তাঁর অবগতির জন্যে টেবিলে পড়ে আছে।

এখানকার আশ্রয় শেষ হবার পর মিলার পাকড়াও করলেন মাইকেল ফ্লিনকেন নামে এক আমেরিকান বুক সেলারকে, যিনি সাহিত্যিক হবার বাসনায় প্যারিসে হাজির হয়েছিলেন। এঁর কাছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই চাইলেন হেনরি মিলার। আর এক শুভানুধ্যায়ী, উইলিয়ম ব্রাডলে, তাঁকে এক খুদে প্রকাশক ইংরেজ জ্যাক কাহানের কাছে পাঠালেন। জ্যাকের ওবেলিস্ক প্রেস চুক্তি স্বাক্ষর করলেন হেনরি মিলারের সঙ্গে ১৯৩২ সালে, কিন্তু 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' প্রকাশ করতে আরো দু'বছর লেগে গেলো। প্রকাশিত হলো আমাদের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মকালে ১৯৩৪ সালে, আমার যখন ন'মাস বয়স। অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে হেনরি মিলারকে—আইনের হাঙ্গামা পেরিয়ে 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' লেখকের জন্মভূমি আমেরিকায় প্রকাশিত হতে সময় লাগলো আরও সাতাশ বছর, ১৯৬১ সালে।

এতো দুঃখের মধ্যেও হেনরি মিলার লিখলেন, এখানকার পরিবেশ আলাদা। নীরবে অথচ আনন্দে সৃষ্টির কাজে মশগুল রয়েছে এ-পাড়ার মানুষরা। এমন শত-শত পথ আছে প্যারিসে।

দারিদ্র্যের কথা যখন উঠলো তখন ডি এইচ লরেন্সের কথাও মনে পড়ে যায়। এঁর উপন্যাস 'সান' প্রকাশ করেন এক খুদে অথচ দরাজ প্রকাশক হ্যারি ক্রুসবি ১৯২৭ সালে। সাহিত্যিকসঙ্গে প্রীত এই আমেরিকান বড় ব্যাঙ্কের ভাল চাকরি ছেড়ে ব্ল্যাকসান প্রেস নামে প্রকাশক সংস্থা স্থাপন করলেন প্যারিসে। 'লেডি চাটার্লিজ লাভার' প্রথম সংস্করণ নিজেই প্রকাশ করেন ডি এইচ লরেন্স পরের বছরে ফ্লোরেন্স থেকে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন প্যারিসের এডওয়ার্ড টাইটাস তাঁর ব্ল্যাক ম্যানিকিন প্রেস থেকে। ছাপা হয়েছিল তিন হাজার, দাম ছিল ১২ ফ্রাঁ। এই বিশ্ববিখ্যাত সংস্করণ বিক্রি হতেও সময় লেগেছিল দু'বছর।

শেক্সপিয়র কোম্পানির দোকানে বসে আমি কোন সময়ে নিজের অজান্তে চলে গিয়েছি অতীতে আমার জন্মকালে। প্যারিস শুধু ফরাসি সাহিত্যের জন্মভূমি নয়, ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসেও সে অক্ষয় স্থান করে নিয়েছে অভাজনদের আশ্রয় দিয়ে এবং তাদের সৃষ্টিকে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিয়ে।

অথচ সেদিনও বিরাট প্রতিভাধরদের কী কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পরিস্থিতিটা অনেকটা আজকের কলকাতা বা ঢাকার মতন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে বিল মেটাতে পারছেন না। বউকে সেখানে জমা রেখে পয়সা জোগাড়ের জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। জেমস জয়েসের মেয়ে প্রায়ই বাবাকে বলছে, আমার চোখটা দেখানো প্রয়োজন ; বাবা পারছেন না, টাকা নেই

বলে। সেইসব কথা যে তরুণ ইংরিজি শিক্ষক শুনছেন তাঁর নাম স্যামুয়েল বেকেট। 'ওয়েটিং ফর গোদো' লিখে যিনি বিশ্ববিজয় করলেন। স্কট ফিটজেরাল্ড মদ খেয়ে রাতের প্যারিসকে 'শাসন' করছেন, এক ফেরিওয়ালাকে ধাক্কা দিয়ে টাকা গুনাগার দিচ্ছেন। লেখকরা জমা হচ্ছেন এক কাফেতে, যেখানে উন্নাসিক লেখকরা অন্য একজন লেখককে লেখকই মনে করছেন না, তাঁর অপরাধ তাঁর বই দ্রুত বিক্রি হচ্ছে। অথচ ইনিও সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হলেন, নাম সিনক্লেয়ার লুইস।

সিনক্লেয়ার লুইস গোল্লায় যাওয়া প্রজন্মের কাণ্ডকারখানা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এখানে মানুষ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। প্রতিভাধর তরুণরা সাহিত্যিক হবার বাসনায় প্যারিসে এসে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সারাক্ষণ বড়-বড় কথা বলছে, রাজা উজির মারছে, অথচ কিছু লিখছে না। যে লেখক তাঁর বাপান্ত করছেন, বলছেন সিনক্লেয়ার লুইস লেখকই নয়, তিনিই আবার ওঁর কাছে টাকা ভিক্ষে করছেন।

এক লেখককে দেখে সিনক্লেয়ার লুইস ভীষণ কষ্ট পেলেন। বড় বই লেখবার জন্যে প্যারিসে এসে গোল্লায় গিয়ে এখন সস্তা মদের দোকানে সারাক্ষণ পড়ে আছে, রাত আড়াইটের সময় লোকের বাড়িতে বেল বাজিয়ে জ্বালাতন করছে এবং একজন বই না লিখে বেঁচে থাকার জন্যে ঘোড়ার রেসিং সম্বন্ধে লিখছে।

এইসব বাউণ্ডুলে লেখকদের মাতৃস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন শেক্সপিয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানির সিলভিয়া বিচ। আর তাঁরই আদর্শে উৎসাহিত হয়ে গড়ে উঠেছে ছোটো-ছোটো ইংরিজি প্রকাশনা—কনট্যাক্ট এডিশন, থ্রি মাউনটেন প্রেস, ব্ল্যাক সান প্রেস, দ্য ব্ল্যাক ম্যানিকিন প্রেস, ওবেলিস্ক প্রেস। এঁদের মালিকরাও বড়লোক নন, কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করেন, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ। এঁদের সান্নিধ্য তাঁরা ভালবাসতেন, যদিও সম্পর্কটা সবসময় সুখপ্রদ ছিল না। প্রকাশক এডওয়ার্ড টাইটাসের স্ত্রী হেলেনা রুবেনস্টাইন-এর মন্তব্য : "একেবারে বাজে সব লোক...হেমিংওয়ে—মুখে বড়-বড় বাত, সব সময় শো অফ-দেখনাই। জেমস জয়েস—গায়ে ভীষণ দুর্গন্ধ...চোখে দেখতে পায় না...পাখির মতন খেয়ে চলেছে সারাক্ষণ...সবচেয়ে যা খারাপ, এদের খাবার বিল চুকোতে হয় আমাকে।"

এইসব কথা শুনছি আর অবাক হচ্ছি। শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির বর্তমান কর্ণধার জর্জ হুইটম্যান বললেন, "সমকাল অনেকসময় বুঝতে পারে না কাদের আমরা পেয়েছি। দেবতার দূতকেও হেঁজিপেঁজি মনে করে অভ্যর্থনা জানায় না এই সমকাল।"

আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি বৃদ্ধের দিকে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁর

ধ্যানজ্ঞান। বললেন, "আসুন, আড্ডা জমান, খুঁদকুঁড়ো যা জোগাড় করতে পারি তাই খান, বই পড়ুন, বই লিখুন। আপনাদের জন্যেই তো আমি এই ধুনি জ্বালিয়ে রেখেছি।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন যুদ্ধের পরে তাঁদের নতুন করে লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছিলেন মার্কিন সরকার। সেই সুযোগ নিয়ে অনেকে পড়তে এসেছিলেন প্যারিসে। জর্জ হুইটম্যানও ছিলেন তাঁদের একজন। প্রপিতামহের প্রকাশিকা সিলভিয়া বিচের সঙ্গে এইখানেই আলাপ। সিলভিয়া বিচ বেঁচেছিলেন অনেকদিন—১৯৬২ পর্যন্ত। তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে নতুনভাবে শুরু করলেন শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। এখনও চলছে, দুনিয়ার লেখক ও পাঠকদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে, অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে, যেখানে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব।

জর্জ হুইটম্যান একটা মজার খবর দিলেন। সিলভিয়া বিচের শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির ঠিকানা ছিল রু দ্য ল ওডিয়েন। আর স্ট্রাটপোর্ড অন অ্যাভনের অনুকরণে লেখকরা বলতেন, আমরা যাচ্ছি স্ট্রাটফোর্ড অন ওডিয়েনে।

বয়সের ভোরে নত হতে প্রস্তুত নন জর্জ হুইটম্যান। বললেন, "যতদিন আছি ততদিন শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানিকে চালু রাখতেই হবে—অজানা-অচেনা প্যারিসে এসে পৃথিবীর কোনও লেখকই যেন দিশাহারা বোধ না করেন। আপনি বন্ধুর বাড়িতে বেশি সুখে থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না। এখানে চলে এসে আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিন, পড়ুন এবং যত খুশি লিখুন।"

মনঃস্থির করে ফেলেছি এবং সেইমতো কথা দিয়ে ফেলেছি শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোম্পানির প্রাণপুরুষ জর্জ হুইটম্যানকে—এদেশ ছেড়ে যাবার আগে অন্তত তিনটে রাত এই বইয়ের দোকানের দোতলা কিংবা তেতলায় কাটাবো। শুধু বই দেখবার শখ নয়, সেই সঙ্গে মানুষ দেখার আগ্রহ। এই বৈশ্যতন্ত্রী যুগে পশ্চিমি সভ্যতা এখনও কিছু ঘরছাড়া দিক্‌হারা মানুষ সৃষ্টি করেছে, যাদের চোখে কবি হবার, ঔপন্যাসিক হবার, পরিব্রাজক হবার স্বপ্ন। তারা এই প্যারিসের মনবতীর্থে আসবেই এবং অবশ্যই একবার ঘুরে যাবে শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং-এ।

আমার ছোটবেলায় এমনভাবে বেরিয়ে পড়বার স্বপ্ন ছিল, অন্তর থেকেই বিশ্বাস করতাম দেশে-দেশে মোর ঘর আছে। সেই বয়সে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের সূত্র ছিল ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্যরা, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোকাবিলার জন্যে ঘরছাড়া হয়ে এসেছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কিন্তু দারিদ্র্য ও সাংসারিক দায়-দায়িত্বর বোঝা মনের খুশিমতন চলার সুযোগ কেড়ে নিয়েছিল। দায়দায়িত্ব যখন কমলো, তখন বেপরোয়া পথিক হবার মতন সামর্থ্য

নেই শরীরের, কিন্তু মন টানে তাদের দিকে যারা পথকেই ঘর বানিয়েছে নতুন করে। তাঁদের সান্নিধ্য আমি পাবো শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং-এর বাসিন্দা হিসাবে। সেই সঙ্গে গল্প জমানো যাবে ওই বুড়ো জর্জ হুইটম্যানের সঙ্গে, যিনি দীর্ঘ দিন ডাক্তারদের এড়িয়ে চলেছেন এবং অনেকগুলো দাঁত বিসর্জন দিলেও সমস্ত জীবনে কখনও ডেন্টিস্টের শরণাপন্ন হননি।

উৎসাহ পেয়েছি জর্জের কাছ থেকে। বিদায়কালে তিনি আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, মনে থাকে যেন তুমি আবার আসবে বলে কথা দিয়ে গেলে : সেবার আমরা তোমার কলকাতা শহরের গল্প শুনবো। এই মুহূর্তে শুধু আমরা নই, সমস্ত পৃথিবী ওই শহরের গল্প শুনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

এই সম্ভাবনার কথাটা আমার মাথায় আগে ঢোকেনি। কলকাতা যতই ডুবছে ততই সে গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে। এই স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়ার মানুষের একাংশ এখনও অন্য মানুষের দুঃখের কথা শুনতে চায়।

সেই মতন ব্যবস্থা করা গেলো। আমি সম্বিতের অনুমতি নিলাম, ফরাসিবাসের শেষ ক'টা দিন আমি দু'ভাগে ভাগ করে নেবো। দুটো রাত কাটাবো রামকৃষ্ণ মিশনে, ওই সন্ন্যাসীটির সান্নিধ্যে যাঁকে আমি পেয়েছিলাম পথের সাথী হিসাবে যাত্রা শুরুর পর্বে, আর তিন দিন তিন রাত কাটাবো শেক্সপিয়র অ্যাণ্ড কোং-এ। প্রতিষ্ঠাত্রী সিলভিয়া বিচ অনেক ভেবেচিন্তে শেক্সপিয়রের সঙ্গে ওই 'অ্যাণ্ড কোং' কথা দুটো জুড়ে দিয়েছেন, যার অর্থ এই দুনিয়ায় যারাই দুটো লাইন লিখেছে বা লেখার স্বপ্ন দেখেছে তারা সবাই এই আজব কোম্পানির অংশীদার।

কথা তো দিলাম, কিন্তু কপালে যে অন্য ফল নাচছে তা তখনও আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু সে কথা এখন নয়, যথা সময়ে নিবেদন করা যাবে। আপাতত আমি বিদেশে নিজের দেশের মানুষদের স্মৃতিচিহ্নগুলো একটু দেখে নিতে চাই। যখন বয়স কম ছিল তখন পরে করবো, পরে দেখবো বলে অনেক জিনিস সরিয়ে রেখেছি, অসম্পূর্ণ রেখেছি। প্যারিসে এসে পাঁচুদার কথায় সে ভুল ভাঙতে বসেছে। পাঁচুদার কত দুঃখ, আমাদের হাওড়া-কাশুন্দের কত জিনিস ঠিকমতন দেখা হয়নি। এখন মন টানে, দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু উপায় নেই। পাঁচুদার দেখা হয়নি গৌড়ীয় মঠ, পিলখানা,

বাঙালবাবুর বাজার। এমনকি বেলিলিয়াস লেনটাও ঠিকমতন ঘুরে দেখা হয়নি, যদিও ওইখানে পাঁচুদার এক সহপাঠী থাকতেন। ছেচল্লিশের রায়টে সেই বন্ধুর পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল, বহুদিন হাসপাতালে ছিল। তারপর কত দিন বয়ে গিয়েছে—পাঁচুদার বন্ধুর কি ওসব এখনও মনে আছে? না সবাইকে সে ক্ষমা করে দিয়েছে?

পাঁচুদা আমাকে নিয়ে আবার প্যারিসের পথে বেরিয়েছেন। বললেন, "আমার মতন বোকামি করিস না। যা দেখবার সাধ আছে তা ঝটপট দেখে নে। পরে দেখবো বলে কিছু তুলে রাখিস না, তা হলে আমার মতন অবস্থা হবে। লোকে হাজার-হাজার টাকা খরচ করে আইফেল টাওয়ার দেখতে আসতে ব্যগ্র, আর আইফেলের নাকের ডগায় বাস করে আমি দুঃখ করছি যখন হাওড়ায় ছিলাম তখন কেন ভাল জায়গাগুলো সব দেখিনি?"

পাঁচুদা বললেন, "ঝটপট আমাদের দেশের সেরা মানুষগুলোর স্মৃতিজড়ানো জায়গাগুলো দেখে নে। ওই অখ্যাত জায়গাগুলোই তো আমাদের লুভ্র, আমাদের পম্পিদু সেন্টার। লুভ্র-তে কোনও ভারতীয় শিল্পীর ছবি স্থান পায়নি। ওখানে তো সমস্ত দুনিয়াকে আমরা সেলাম করি, হিসাব পাই মানুষ তার সৃষ্টিশক্তির জোরে কত দূর এগোতে পারে। আর ছোট-ছোট জায়গায় খুঁজে পাবি আমার দেশের মানুষের স্বপ্ন দেখার স্মৃতি যা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে।"

আমি বললাম, "পাঁচুদা, সম্বিৎ আমাকে ইউনিভার্সিটির কাছে একটা পার্ক দেখিয়েছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোমাঁ রোঁলার কথা হয়েছিল এবং দু'জনের ছবি তোলা হয়েছিল। মস্ত বড় লোক এই রোঁলা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সেরা মানুষদের কথা দুনিয়ার হাটে পৌঁছে দিয়েছেন।"

পাঁচুদা হাসলেন, "রোমাঁ রোঁলার সম্বন্ধে আর কি শুনলি?"

আমি বললাম, "অসাধারণ এক বাঙালির সঙ্গে দেখা হলো, পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঘাযতীনের ডাইরেক্ট বংশধর, ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ওপর মস্ত কাজ করেছেন, এখানে সম্মানিত অধ্যাপক। ওঁর সঙ্গে কিছু গল্প হয়েছে। ওখানে শুনলাম, ফরাসি দেশে রোঁলার তেমন স্ট্যাটাস নেই, প্রভাব নেই সাহিত্যিক হিসাবে। শুনলাম, বিরাট অহমিকা ছিল ওঁর, নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাবক মনে করতেন। কে যেন বললো, ব্যক্তিজীবনেও রোঁলা অনেক দুঃখ পেয়েছেন, ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভেগেছিলেন একজন পিয়ানিস্ট। রোঁলা ধোপে টিকেছেন কি না সে নিয়েও অনেকের সন্দেহ। জীবিত কালে অনেকে স্বীকৃতি হয়, পরে টেকে না।"

পৃথ্বীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা উপন্যাস পড়ার মতন অভিজ্ঞতা।

বাঘাযতীনের পারিবারিক গল্প, বিপ্লবীদের গল্প—শরীর শির-শির করে ওঠে। ওঁর মুখে আর একজনের কথা শুনলাম—ফরাসি দেশের গবেষণার জগতে সম্ভবত সবচেয়ে সম্মানিত ভারতীয় হলেন কমলেশ্বর ভট্টাচার্য। সেই পঞ্চাশ সাল থেকে কমলেশ্বর ফ্রান্স প্রবাসী, কাম্বোডিয়ায় ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে জগৎ-কাঁপানো কাজ করে যাচ্ছেন এই ঐতিহাসিক।

"পাঁচুদা, আমার খবর কমলেশ্বরবাবু উটকো বাঙালিদের তেমন পাত্তা দেন না, কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেও মনটা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।"

"চেষ্টা করে যা। লজ্জা করে, অভিমান করে মনের সাধ অপূর্ণ রেখে দেশে ফিরে যাস না," আমার পিঠে হাত রেখে বললেন পাঁচুদা। "আমি তো ওই সব হিস্ট্রি-ফিস্ট্রির খোঁজ রাখি না। দেশছাড়া হলাম অথচ কোনও কাজের কাজ হলো না। সমস্ত লাইফটা খরচের খাতায় চলে গেলো বলতে পারিস।"

আমি বললাম, "পৃথ্বীন্দ্রবাবুর অনেক অভিজ্ঞতা, ওঁর কাছেই শুনলাম, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের প্রথম পুঁথি প্যারিসেই আছে। সেকালের ফরাসি সম্রাটের গ্রন্থাগারের জন্যে বইপত্র সংগ্রহ করতেন।"

"সুযোগ পেলে ভাল করে গুছিয়ে লিখিস বাঙালিদের কথা, বিশেষ করে বাঘাযতীনের নাতির কথা। আর রামকৃষ্ণ মিশনের দিকেও ভাল করে নজর দিস—আমাদের হাওড়া বেলুড় মঠের দীপ ওখানে জ্বলছে। একটা খবর নিস তো। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায় বা প্রচার কেন্দ্র বলে সঙ্কীর্ণ করে রাখেনি। শুনেছি, সরকারি খাতায় ওঁদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্যাটাস 'ফার্ম হাউস' বা খামার বাড়ি। ঝড়ের মধ্যে ভারতবর্ষের এই প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখা সহজ কাজ নয় রে।"

"আপনি রামকৃষ্ণ মিশনে যান না, পাঁচুদা?" চুপ করে রইলেন পাঁচুদা। পাঁচুদার যেতে ইচ্ছে করে, ছোটবেলায় প্রতি দিন কাসুন্দে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে না গেলে পাঁচুদার ভাত হজম হতো না। কিন্তু এখানে সব সম্পর্ক এড়িয়ে যান। ওখানে গেলেই দেশের লোকদের সঙ্গে দেখা হবে, দুটো কথার পরেই জিজ্ঞেস করবে, কী করো? মুখরক্ষে করার মতন উত্তর থাকবে না পাঁচুদার। নিজেকে এখন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলার জন্যে তিনি উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

"পাঁচুদা, আমি অষ্টমী পুজোর দিনে সম্বিৎ ও কাকলির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলাম। মন ও প্রাণ দুই জুড়িয়ে গেলো—ভক্তিমতী বিদেশিনিরা শাড়ি পরে চোখ বুজে স্বামীজীর প্রিয় বাংলা গান গাইছেন। পুজোর সময় অমন ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিবেশ আমি দেশে দেখিনি, পাঁচুদা। আমি তো ওখানে আবার যাচ্ছি, ওর ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করবো। খাবার টেবিলে আলাপ হলো আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দর সঙ্গে। ফ্রান্সে বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য

বহু দিন ধরে তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, সেই সব প্রবন্ধের কিছু-কিছু আমি পড়েছি। আরও বিস্তারিত কথা হবে সামনের সপ্তাহে যখন প্যারিসের পালা চুকিয়ে দেশে ফিরবার সময় হবে আমার।”

খুশি হলেন পাঁচুদা। “তা হলে তো ভালই হলো। বিবেকানন্দের প্যারিস লাইফ সম্বন্ধে খবরাখবরগুলো ঝালিয়ে নিয়ে একটু-আধটু লিখতে পারবি। শুধু বড়লোকদের ভোগের কথা লিখলে বুঝতে হবে হাওড়া-বিবেকানন্দ ইস্কুলের হেডমাস্টার হাঁদুদা তোর ওপর পণ্ডশ্রম করেছিলেন।”

“পাঁচুদা, একটা মজার কথা জেনে ফেলেছি। স্বামীজীর পত্রাবলীতে প্যারিসের যে-ঠিকানা ছিল সেটা হলো ৬ নম্বর এতাতি হউনি। শেষ দুটো কথার মানে হলো ইউনাইটেড স্টেট্‌স বা ইউ এস। আমেরিকানদের প্রতি ফরাসিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই রাস্তায় সেকালের বাঘা-বাঘা আমেরিকানরা বাড়ি ভাড়া করতেন। আমেরিকানদের সঙ্গে প্যারিসের সম্পর্ক গভীর, এই শহরটাকে বুঝতে না পারলেও তারা বার বার এখানে ছুটে এসেছে। কেউ শান্তি পেয়েছে, কেউ পায়নি, কিন্তু আমেরিকানদের মায়ামোহ কাটেনি। বিখ্যাত আমেরিকানদের কে কোথায় বসবাস করতেন; কেউ থাকতেন চরম ভোগের মধ্যে, কেউ অর্ধাহারে, কেউ অনাহারে। আমেরিকানরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবার পাত্র নয়, প্যারিসের এক একটি রাস্তা ধরে ইতিহাসের রোজনামচা তৈরি করে ফেলেছে। সেখানে অবশ্যই এতাতি ইউনির নাম আছে। আমরা ইতিহাস-বিস্মৃত জাতি, তাই আমাদের পরম প্রিয়জনরা কোথায় কি করেছিলেন তার হিসাব রাখিনি। স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক কাজই হয়েছে আমেরিকান ভক্তদের প্রচেষ্টায়।’

মজার কথাটা হলো, স্বামীজির চিঠিতে যে ঠিকানা রয়েছে সেটি হলো আমেরিকান ভক্তর ভাড়া করা বাড়ির ঠিকানা। ওখানে সময় কাটিয়েছেন বিবেকানন্দ, কিন্তু সব সময় থাকেননি। থেকেছেন নানা উদ্ভট জায়গায়, তার মধ্যে এক জায়গায় তো সিঁড়ি ভেঙে উঁচু বাড়ির টঙে উঠতে হার্টফেল হবার উপক্রম হতো।

আরও একটা মজার কথা, সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী প্যারিসে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন পশ্চিমি সভ্যতার অর্থনৈতিক অগ্রগতির খোঁজখবর করতে। দিনের পর দিন দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন প্যারিসের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবতম নিদর্শনগুলো। ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষের দুঃখ ও দরিদ্র্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও দোটানায় ফেলে দিয়েছিল, ঈশ্বরের অনুসন্ধান মুলতুবি রেখে তাঁরা খুঁজতে বেরিয়েছিলেন মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ দূর করার পথ।

কিন্তু ভারতের মঙ্গলকামীরা কেন প্যারিসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন? কারণ বোধগম্য। সর্বশক্তির আধার লণ্ডন তখন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর কর্মকেন্দ্র, সেখানে কেমন করে মিলবে মুক্তির পথ? স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পীঠস্থান হয়েও লণ্ডন তো নেমেছে ভারতবর্ষকে চিরকাল দাসত্বশৃঙ্খলে বন্দি রাখতে। আর প্যারিস তার শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবের যুগ থেকে বিশ্বের মুক্তিকামীদের পুণ্যতীর্থ। আর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংযোগ মুহূর্ত তো ফরাসি সভ্যতার স্বর্ণযুগ, যাকে আদর করে ফরাসি বলে, বেল ইপক। শিল্পে, সাহিত্যে, সৃষ্টিতে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায়ে, প্রযুক্তিতে সৃষ্টিকর্তা তো ওই সময়ে ফরাসির কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। ফরাসি তার বিশ্বজয়ী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিভার প্রমাণ দেবার জন্যে আয়োজন করেছে বিশ্বমেলা, যা আকর্ষণ করে এনেছে সমস্ত বিশ্বের বিমোহিত মানুষদের। সেখানে যেমন নব-নব কলাসৃষ্টির সমারোহ তেমন আয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নবতম নিদর্শন, সেই সব নিদর্শন যা সারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিশ্ব সংসারের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।

তাই ফরাসির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় কী স্বাধীনমনা ভারতীয়র? এই ফরাসিরই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন কলকাতার স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকা ও ইংলণ্ড জয় করে এসেও নিজের জয়মাল্যটি তিনি পরিয়ে দিলেন ফরাসির গলায়। সোজা কথায় বললেন গ্রিস ও রোমের দীপশিখা জ্বলে উঠেছে বিলেতে নয় ফরাসি সভ্যতায়। বিবেকানন্দর এই ফরাসি সভ্যতাসন্ধান ইদানীং আরও ঘটনাময় হয়ে উঠেছে আমেরিকান সন্ন্যাসী বিদ্যাত্মানন্দর ধৈর্যশীল গবেষণায়। এ-বিষয়ে আরও দু'একটা কথা স্মরণ করতেই হবে আমাকে, কিন্তু এই মুহূর্তে পাঁচুদা অন্য কয়েকজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন।

পাঁচুদা বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দের কথা তবু তো দেশের লোকের কিছুটা জানা আছে, কিন্তু কেমন নির্লজ্জের মতন আমরা ভুলে গিয়েছি কয়েকজনের কথা যাঁরা এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন এই প্যারিসে বসে।" পাঁচুদা দুঃখ করলেন, কত ভারতীয় এই প্যারিসে আসে, তাদের কেউ জানতে চায় না, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা এবং মাদাম কামা কোথায় বাস করতেন। কোন বাড়ি থেকে তাঁরা ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর মঁশিয়ে রানার কথা তুললে তো ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়—ভাব দেখায় তিনি আবার কিনি? কোন দুঃখে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে ফরাসি পারফিউম ও ফরাসি রান্নার সুখভোগ থেকে নিজেকে মুহূর্তের জন্য দূরে সরিয়ে রাখবো?"

আমি চুপ করে রইলাম। বই খুঁজলে সংস্কৃত পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামার নাম খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের মুখে-মুখে তাঁদের নাম নেই,

যেমন আছে আমেরিকান মুক্তি আন্দোলনের নায়কদের নাম মার্কিনি ছাত্রদের মুখে-মুখে। আমরা সর্ব অর্থে আত্মবিস্মৃত।

পাঁচুদা আমাকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে প্যারিসের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে ভালই করলেন। দুঃখ করলেন, "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কোনও বই এখনও বেস্ট সেলার হয়নি কেন বলতে পারিস? পৃথিবীর আর কোনও দেশে এমন কাণ্ড ঘটেনি।"

পাঁচুদা স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না-রেখেও এঁদের কথা মনে রেখেছেন। বিদেশের মাটিতে জীবনসংগ্রামের প্রচেষ্টা চালিয়ে ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের অংশীদার হওয়া যে কত কঠিন কাজ তা বিদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত না হলে বোঝা যায় না।

ঝটপট অনেক কথা পাঁচুদা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন, "পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিংজি রাওজি রানা, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং মহাত্মা গান্ধী সবাই গুজরাতের সৌরাষ্ট্রের অধিবাসী, কৃষ্ণবর্মার জন্ম ১৮৫৭ সালে, সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তির জোরে অক্সফোর্ডে আসেন, পরে ব্যারিস্টার হন। ১৮৮৩ সালে কিছু দিনের জন্যে দেশে ফেরেন, চার বছর পরে আবার বিলেতে প্রত্যাবর্তন এবং তেত্রিশ বছর ধরে ইউরোপে স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখেন। তারপর মৃত্যু ১৯৩০ সালে। এই পর্বের প্রধান অংশ কেটেছে প্যারিসে। এই ভদ্রলোক তাঁর জীবিতকালের উপার্জনের প্রধান অংশ ব্যয় করেছিলেন বিপ্লবীদের পিছনে, মৃত্যুর পরও সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণের জন্য।"

পাঁচুদা বললেন, "পরের সপ্তাহে তুই মন দিয়ে খোঁজখবর কর কৃষ্ণবর্মা, রানা এবং কামা সম্বন্ধে। দেশে গিয়ে ভাল করে লেখ ওঁদের সম্বন্ধে। তোকে মনে রাখতে হবে ক্ষুদিরাম যে বোমা ফাটিয়েছিলেন তার সূত্রপাত এই প্যারিসে। এই কাজের পথিকৃৎ ছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো (দাশ), এই সেদিনও তিনি বেঁচেছিলেন, বাঙালিরাও ওঁকে নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি। বইপত্তর গোটাকয়েক আছে, কিন্তু সবই লাইব্রেরিতে সাজানো আছে, মানুষের হৃদয়ে স্থান পায়নি এখনও। অথচ ভাব তো মানুষের দুঃসাহসের কথা—মেদিনীপুরে নিজের জমিজমা বিক্রি করে একজন যুবক ফরাসি দেশে হাজির হলেন স্রেফ বিস্ফোরক বানানোর বিদ্যা আয়ত্তের জন্যে। এখানে কার্ল মার্কসের দৌহিত্র লংগে এবং সোসালিস্ট নেতা জয়রে এবং আরও অনেকে বিপ্লব আন্দোলনের বন্ধু হলেন এবং এঁদেরই সাহায্যে বাঙালির ছেলে রুশ বিপ্লবীর কাছ থেকে বিস্ফোরক বানানো শিখলেন। তুই কল্পনা কর প্রমথ নাথ দত্ত নামে আর এক ছোকরা নাম ও জাত গোপন করে ফরাসি বৈদেশিক পল্টনে ভর্তি হয়ে গেলো। তাদের চোখে

ভারতের মুক্তির স্বপ্ন। তুই ভাব, আলিপুর মামলার সময় নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিহত হলে প্যারিসের কাগজে লেখা হচ্ছে, ‘ভারতীয় বিপ্লবীরা জেলের মধ্যে থেকে যেভাবে আততায়ীকে হত্যা করেছে, এ ইউরোপের বৈপ্লবিক ইতিহাসে ঘটে নি।’ তুই ভাব, বিদেশের মাটিতে বসে সেযুগে কৃষ্ণবর্মা চালু করছেন, শহিদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্তর নামে স্কলারশিপ। এই বৃত্তির শর্ত ছিল দেশে ফিরে গিয়ে সরকারি চাকরি করা চলবে না। কৃষ্ণবর্মা পরে সাভারকার এবং হেমচন্দ্র কানুনগোর নামেও বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।”

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার জীবনে ছিল নানা দুঃখের স্পর্শ। প্রিয় প্যারিসেও তিনি নিরাপদে বসবাস করতে পারেন নি। প্রথম যুদ্ধ লাগার সময়ে ইংরেজ ও ফরাসির আঁতাত বাড়বে এই আশঙ্কা করে তিনি প্যারিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভায়। পিছনে পড়ে রইলেন অন্য দুই সংগ্রামী—মাদাম কামা এবং রানাজী। এঁদের এই দুঃসাহসের জন্যে চরম মূল্য দিতে হলো। পুরো যুদ্ধের সময়টা কাটাতে হলো বন্দীদশায়।

পাঁচুদা বললেন, “মিছরি আমাকে একটা বই উপহার দিয়ে গিয়েছিল—মানিকতলা বোমা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কানুনগোর ‘বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা।’ আজকাল ছেলেরা ওই সব বই পড়ে না কেন রে?” আমি কী উত্তর দেবো? কোন্ যুগে কী হাওয়া বয়, মানুষের কি মতিগতি হয় বলা শক্ত।

পাঁচুদা বললেন, “আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তুই আইফেল টাওয়ারে আইসক্রিম চুষে সময় না কাটিয়ে এদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিস। তুই প্যারিসের ভারতীয় মহলে খোঁজখবর কর, প্রয়োজনে বাঘাযতীনের নাতির সঙ্গে আবার কথা বল, লাইব্রেরিতে গিয়ে বস, কাগজপত্তর দেখে কিছু ঠিকানা জোগাড় কর। আমি তোকে ওই সব পুরনো স্মৃতি-ঘেরা রাস্তা ও বাড়ি খুঁজে দেবো, তুই এদের সম্বন্ধে বাঙালিদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোল।”

পাঁচুদা আরও একটা জবর খবর দিলেন। বললেন, “বাঙালিরা যে বহুকাল ধরে ফরাসির তারিফ করছে তা আমি এখানকার ছেলেদের বলি। আমি এখানকার একটা বইতে পড়লাম যে ১৮৩০ সালে বড়দিনের দিন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কলকাতার অক্টোরলোনি মনুমেন্টের চুড়োয় ফরাসি তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছিল। জাত সম্বন্ধে তারিফ না থাকলে বাঙালি একাজ কিছুতেই করতো না।

“তুই ভাব বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই প্যারিসে বসে ১৯০০ সালে নৈরাজ্যবাদী রুশ নেতা ক্রপট্কিনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন! এই আলাপের বিবরণ কোথাও বেরিয়েছে কিনা আমার জানা নেই, তুই রামকৃষ্ণ মিশনের আমেরিকান সন্ন্যাসী বিদ্যাত্মানন্দকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। তবে ওঁর

সঙ্গে কথা বলার আগে ইচ্ছে হলে বিবেকানন্দের একটা প্রবন্ধ পড়ে ফেল, আমি ফটোকপি পাঠিয়ে দেবো। প্রবন্ধের নাম শুনে অনেকেই হাঁ হয়ে যাবে—'আই অ্যাম এ সোসালিস্ট'।"

দুঃখিনী বাংলা মায়ের সোনার ছেলে হেমচন্দ্র কানুনগো (দাশ) তাঁর বিপ্লবজীবনের স্মৃতিচিত্রটি রচনা করেছিলেন বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যসময়ে। এক সময় ঘরছাড়া বিপ্লবীদের হাতে-হাতে ঘুরতো এই বই, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নিষিদ্ধ বই জোগাড় করা সম্ভব হতো না। আর এখন এই বই মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু পাঠকসংখ্যা নিতান্তই কম। আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষেই যে অকৃতজ্ঞ জাতি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল তা ইদানিং প্রায়ই আমাদের স্মরণ থাকে না।

কবে কোথায় কোন্ বাড়িতে হেমচন্দ্র এই প্যারিসে রাত্রিবাস করেছিলেন তা জানা থাকলে মন্দ হতো না। কিন্তু সেসব খবর এখানে কে রাখে? অথচ হেমচন্দ্র দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন, বেঁচেছিলেন ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। আমরা ইচ্ছে করলেই তাঁর কাছ থেকে প্যারিসের সমস্ত ঠিকানা জেনে নিতে পারতাম। প্যারিসে বসেই শুনলাম হেমচন্দ্র ছিলেন এক কলেজে রসায়নের ডিমনস্ট্রেটর ও সেই সঙ্গে স্কুলের অঙ্কন শিক্ষক। একসময় চিত্রাঙ্কনকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সফল না হয়ে জেলা বোর্ডে চাকরি নেন। ১৯০২ সালে অরবিন্দর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। বিবাহিত হয়েও তিনি স্বেচ্ছায় বিপ্লবী গুপ্তদলের হয়ে পূর্ববাংলার লাট ব্যামফীল্ড ফুলারকে হত্যার দায়িত্ব নেন, কিন্তু সুযোগ করে উঠতে ব্যর্থ হন। ১৯০৬ সালে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি ইউরোপে হাজির হন। অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেলে তিনি শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার সাহায্যপ্রার্থী হন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজরে পড়ায় হেমচন্দ্র চলে আসেন বিপ্লবের মহাতীর্থ প্যারিসে। এইখানেই তিনি বোমা তৈরির প্রণালী শিক্ষা করেন। এবং দেশে ফিরে আসেন ১৯০৭ সলে। হেমচন্দ্রের তৈরি প্রথম বোমাটি পড়ে ফরাসি চন্দননগরে মেয়রের ওপর। তিনি বেঁচে যান। তাঁর দ্বিতীয় বোমাটি বইয়ের আকারের, পাঠানো হয়েছিল কিংসফোর্ডের কাছে। তিনি বইটি না খোলায় বেঁচে যান। তৃতীয় বোমাটি ব্যবহার করেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ১৯০৮ সালে ৩০শে মে। পরের মাসেই মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে হেমচন্দ্র ধরা পড়েন এবং দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

শিল্পী হেমচন্দ্রের কিছু খবরাখবর প্যারিসে রয়েছে। জেল থেকে ১৯২১ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি আবার শিল্পী হিসেবে জীবনযাপনের চেষ্টা করেন। এই পর্যায়ে ফটোগ্রাফিতেও তাঁর প্রবল আগ্রহ হয়। হয়তো এই আগ্রহের সঙ্গে প্যারিস প্রবাসের কোনো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে খবর এখন কে আর খুঁটিয়ে দেখবে? আমরা শুধু জানি হেমচন্দ্রই আলিপুর বোমা মামলার একমাত্র আসামী

যিনি শত চেষ্টাতেও পুলিশের কাছে কোনো বিবৃতি দেননি। আরও একটি খবর দুঃখজনক—জীবনের শেষভাগ তিনি মেদিনীপুরে স্বগ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিবাহিত করেন। এই পর্বে তিনি নাকি ভীষণ 'সিনিক' হয়ে উঠেছিলেন।

সংসদ বাঙালী চারিতাভিধানে হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় এক 'রত্ন ব্যবসায়ীর' উল্লেখ আছে। কিন্তু এই রত্ন ব্যবসায়ীটিই যে সর্দার সিংজী রাওজী রাণা, ওরফে ব্যারিস্টার রাণা, ওরফে মঁশিয়ে রাণা তা নিশ্চিত হওয়া গেলো এই প্যারিসের প্রবাসে। কিছু-কিছু কথা পাঁচুদা শুনেছেন, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা গেলো। কিছু কথা যথাসময়ে পেয়েছিলাম বোম্বাইয়ের সলিলদার কাছ থেকে। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের নানা খবরের খনি হলেন এই সলিল দা। ইন্দুলাল ১৯৩৭ সালে শ্যামাজী সংক্রান্ত কাগজপত্র পান প্যারিসে মঁশিয়ে রাণার কাছ থেকে। এইসব নথিপত্র ইংরেজ আমলে গোপনে ভারতে এলেও সেগুলো দেশ স্বাধীন হবার আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বীর সাভারকারের অশান্ত জীবনের অনেক তথ্যও এই রাণা-সংগ্রহ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

পাঁচুদা বললেন, "প্যারিসের লোকেরা শত অন্যায় করলেও আমাদের পক্ষে রাগ করা সম্ভব হবে না, কারণ এইখানেই মাদাম কামা ও শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার কথা মতো হেমচন্দ্র আমাদের জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করেন, যদিও জাতীয় পতাকার আবিষ্কারক তিনি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রইলো এই প্যারিস। যদিও জাতীয় পতাকার ব্যাপারে কলকাতারও ভূমিকা রয়েছে। ১৯০৬ সালে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগতদের নির্দেশ দেন তোমরা জাতীয় পতাকা তৈরি করো। সেই অনুযায়ী শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও তাঁর বন্ধু এক পতাকা তৈরি করলেন, যার রূপ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। ১৯০৬ সালে ৭ই আগস্ট কলকাতায় গ্রিয়ার পার্কে এই পতাকা উড্ডীন করা হয়। তারপর এই পতাকা তোলা হয় কলকাতায় কংগ্রেস সেশনে যেখানে সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নৌরাজী। এই নৌরাজী যখন কংগ্রেস সভাপতিত্ব করার জন্যে ইউরোপ থেকে কলকাতার পথে রওনা হন তখন প্যারিস রেলওয়ে স্টেশনে ভারতবাসীরা তাঁকে বিপুল অভিনন্দন জানান। সেই দলে হেমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এইখানেই কথা ওঠে আরও কয়েকমাসের মধ্যেই জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে দ্বিতীয় সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসের এই সম্মেলনে ৮৮৪ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং লেনিন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মাদাম কামা ও মঁশিয়ে রাণা।

সর্দার সিংজী রাণার পারিবারিক ইতিহাস বেশ রোমাঞ্চকর। এঁদের পূর্বপুরুষ

রাণাপ্রতাপের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতেন। আরাবল্লী পর্বতের যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ মোগল সেনাবাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত হন। প্রতাপকে চিনতে পেরে তিনি যাতে মোগলের হাতে বন্দী না হন তার জন্য সর্দার সিংজীর পূর্বপুরুষ বলেন, রাণাজী আপনার রাজকীয় উষ্ণীষ আমার মাথায় পরিয়ে দিন, বিপদ এলে আমার ওপর আসুক। এই ভাবে মোগলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালেন রাণাপ্রতাপ, আর এঁরা পেলেন রাণা উপাধী অন্তত একবার তো রাণার উষ্ণীষ তাঁদের মাথায় চড়েছে।

১৮৯৭ সালে এলফিনস্টোন কলেজ বোম্বাই থেকে বি এ পাশ করে রাণাজী বন্ধুবান্ধবদের অর্থসাহায্যে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে বিলেতে যান। এর আগে ১৮৯৫ সালে পুণা কংগ্রেসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংস্পর্শে আসেন।

১৮৯৮ সালে ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারি পড়বার সময়েও রাণাজী তাঁর কাথিওয়াড়ী রাজপুত পোশাক পরতেন এবং সেই সঙ্গে পাগড়ি। বিচিত্র-পোশাক এই ভারতীয় যুবককে দেখে লণ্ডনের পথে থমকে দাঁড়ালেন আর একজন ভারতীয়, যিনি নিজেও ব্যারিস্টার হয়েছেন। ইনিই শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা। দু'জনে পরিচয় হলো। এই শ্যামাজীকে পরে স্বদেশীয়ানার জন্যে ব্যারিস্টারের সনদচ্যুত করা হয়। এই অপকর্মটি পরবর্তী কালের ইংরেজরা মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রেও করেন, ব্যারিস্টারির খাতা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। বহুকাল পরে এই সেদিন ঢাক ঢোল পিটিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নাম আবার খাতায় তোলা হয়েছে, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা অথবা বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এরকম কাজ এখনও হয়েছে বলে শুনিনি।

আমাদের রাণাজী ব্যারিস্টারী পাশ করলেও, বুঝতে পারলেন লণ্ডনে থেকে স্বদেশী আন্দোলনের কাজ চালানো শক্ত হবে। তাই তিনি হাজির হলেন প্যারিসে। যথাসময়ে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাদেরও এই পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল।

কার্তিয়ারের দোকানে মণিমুক্তা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে গিয়েই শুনেছিলাম, মুক্তো ব্যবসায়ে এক সময়ে বোম্বাইয়ের মস্ত ভূমিকা ছিল। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মণিকাররা বোম্বাইতে তাঁদের সারাক্ষণের প্রতিনিধি রাখতে বাধ্য হতেন। কিন্তু খোদ প্যারিসের মুক্তো ব্যবসায়েও যে ভারতীয়রা হাত বাড়িয়েছিলেন তা আমার জানা ছিল না। পাঁচুদার কাছেই শুনলাম, প্যারিসের এমনই একজন মুক্তো ব্যবসায়ী ছিলেন শা। এঁর সঙ্গে রাণার পরিচয় হয়েছিল লণ্ডনে। পারিবারিক কারণে শা কয়েকমাসের জন্যে দেশে ফিরে আসতে চাইছিলেন। তখন তো হুস করে কয়েকঘণ্টায় দেশে উড়ে আসা যেতো না, জাহাজে থাকতে হতো বেশ কয়েকদিন। ফিরতেও সময় লাগতো। তাই অন্তত তিন মাসের সময় হাতে না থাকলে ভারত থেকে ইউরোপে, ইউরোপ থেকে ভারতে আসবার মানে হতো না।

রাণাজী চিঠি পেলেন, শা-য়ের সাময়িক অনুপস্থিতির সময় তিনি যদি প্যারিসে এসে মুক্তোর ব্যবসা দেখাশোনা করেন। ১৮৯৯ সালে রাণাজী তখন সবে ব্যারিস্টার হয়েছেন, তিনি এ-সুযোগ হাতছাড়া করেলেন না। ওই বছরের শেষের দিকে তিনি হাজির হলেন প্যারিসে মুক্তো ব্যবসায়ে যোগ দিতে। পরে তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রভূত বিত্তশালী হন।

রাণাজী ১৯০৪ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এক জার্মান মহিলাকে। এই ভারতপ্রেমী মহিলা ১৯৩১ সন পর্যন্ত আমৃত্যু রাণাজীর সমস্ত কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেন এবং নীরবে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্যারিসে রাণাজীর বাড়ি ছিল সবরকমের ভারতীয়দের মিলনকেন্দ্র। যার যখনই প্রয়োজন তখনই হাজির হবার স্বাধীনতা ছিল। খ্যাত-অখ্যাত সবাই রাণাজীর অতিথি হতেন। রাণাজীর স্ত্রীর প্রীতিমুগ্ধদের তালিকায় ছিলেন সরোজিনী নাইডু, বিটলভাই প্যাটেল, লাজপত রায়।

রাণাজী শুধু বিপ্লবী ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, সাহিত্যে ছিল বিরাট অনুরাগ। এঁর লাইব্রেরী ছিল বিরাট। যার কিছু অংশ পরবর্তী কালে তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেন। সুতরাং রাণাজীর ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ দেখবার লোভ হলে টুক করে একবার বিশ্বভারতী ঘুরে আসা যেতে পারে। এঁদের পরিবারে রবীন্দ্রভক্তি কেমন ছিল শুনুন। এঁর বড় ছেলে রণজিৎ সিং এবং ছোট নটবর সিং। রণজিৎ সিং ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'গার্ডেনার' অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই পরিবারের যোগাযোগ ছিল দীর্ঘদিন। রণজিৎ সিং অকালে ক্ষয়রোগে মারা যান প্রথম মহাযুদ্ধের সময়—এই সময় ফরাসীরা ভীষণ ইংরেজভক্ত হয়ে ওঠেন এবং ইংরেজের শত্রুকে নিজের শত্রু মনে করে মাদাম কামা ও রাণা পরিবারের সবাইকে প্যারিস থেকে সরিয়ে বন্দী রাখেন। এই সময়েই ক্ষয়রোগে রণজিৎ-এর মৃত্যু হয়।

রাণাজীর জীবনে দু'টি প্রধান অধ্যায়—১৯০৫-১৪ এবং ১৯২০-৪৮। দ্বিতীয় অংশটি তাঁর সাংস্কৃতিক জীবন। প্যারিসে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতীয়দের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৫ সালে। এই সভার উদ্যোক্তা রাণাজী।

বরোদার সেনানায়ক মাধবরাও যাদব ছিলেন বিপ্লবী। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার জন্যে তিনি প্যারিসে হাজির হন, কিন্তু ফ্রান্স অথবা জার্মানিতে স্কুলে ঢুকতে পারলেন না। রাণা তখন পাকড়াও করলেন রাশিয়ান দূতাবাসকে এবং এঁদের সুপারিশে মাধবরাও ঢুকলেন সুইজারল্যাণ্ডের এক মিলিটারি স্কুলে।

পাঁচুদা বললেন, "১৯০৫-৭ সালের প্যারিসের কথা একবার ভেবে দেখ। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে এই শহর, দুই নিবেদিতপ্রাণ

ভারতীয়র নেতৃত্বে। একজন রাণাজী আর একজন মাদাম কামা। এঁরা দুজনেই ভায়া লণ্ডন মুক্তি-আন্দোলনের পীঠস্থান প্যারিসে হাজির হয়েছেন।'

মাদাম কামার জন্ম এক পার্শি পরিবারে ১৮৬১ সালে। এঁর বাবা সোরাবজী ফ্রামজী প্যাটেল ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি সেযুগে প্রত্যেক ছেলে মেয়ের জন্যে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। মাদাম কামার বিয়ে হয় রোস্তম কামা নামে এক ধনী সলিসিটরের সঙ্গে। রাজনৈতিক কারণে এই বিয়ে টেকেনি। বিবাহ বিচ্ছেদের পর ১৯৩১ সালে মাদাম কামা লণ্ডনে পাড়ি দেন এবং ওখানে দাদাভাই নৌরাজীর সহকারিণী হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের কাজ গ্রহণ করেন। শোনা যায় মাদাম কামা ছিলেন অসাধারণ বক্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনের খবর ছিল তাঁর নখাগ্রে। আয়ার্ল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, মিশর, তুরস্ক, মরক্কো সর্বত্র মুক্তিকামীদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলতো।

শুনলাম, মাদাম কামা থাকতেন প্যারিসের এতোয়ান অঞ্চলের একটা ছোট্ট বোর্ডিং হাউসে। সেই ঘরেই জমতো তরুণ বিপ্লবীদের ভিড়। পাঁচুদা বললেন, "কিছু না পারিস চিন্মোহন সেহানবীশের রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী সম্পর্কে লেখাগুলো পড়ে নিস। অনেক খবর জানতে পারবি।

"কী রকম তেজস্বিনী ও দুঃসাহসিনী ছিলেন এই মহিলা তা শোন। মঁশিয়ে রাণা তো শুধু বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোকে বোমা বানাতে শিখতে সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে অস্ত্র চালানও করতেন। ১৯০৯ সালে রাণাজী কুড়িটা অটোমেটিক ব্রাউনি পিস্তল পাঠিয়েছিলেন বীর সাভারকারকে। ১৯০৯ সালে নাসিকের ম্যাজিসট্রেট জ্যাকসনকে এবং টিনাভেলির ম্যাজিসট্রেট এশেকে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করেন রাণাজীর পাঠানো পিস্তল দিয়ে। প্যারিস থেকে রাণাজীর পাঠানো পিস্তলগুলো গিয়েছিল লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে। ওখানকার রাঁধুনি ছত্রভুজ আমিন ওগুলো পৌঁছে দিয়েছিল ভারতবর্ষে।

"জ্যাকসন হত্যা মামলায় সাভারকারকে জড়িত করা হয়। একই মামলায় ধরা পড়ে ছত্রভুজ আমিন রাজসাক্ষী হয় এবং স্বীকার করে সে প্যারিসে রাণাজীর বাড়ি থেকে পিস্তল নিয়ে বোম্বাই পৌঁছে দিয়েছিল। রাণাজীর নাম জড়িয়ে পড়ায় মাদাম কামা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হলো এই মামলায় রাণাজী ও সাভারকারের নাম থাকলে প্যারিসের মুক্তি আন্দোলন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন রাণাজীকে বাঁচাবার জন্যে মাদাম কামা দুম করে সব দায় দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। আজকের মানুষ এইধরনের কথা ভাবতেও পারবে না। মাদাম কামা প্যারিসের ইংরেজ কনসাল জেনারেলের অফিসে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিলেন, পিস্তলের বাক্স রাণাজীর বাড়িতে ছিল সত্য, কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে কিছুই জানতেন না। সাভারকারও কিছু জানতেন না। দু'জনেই সম্পূর্ণ নির্দোষ।

পিস্তলগুলো আমি সংগ্রহ করেছিলাম এবং আমিই সেগুলো বাক্সে প্যাক করি। আমিই ছত্রভুজ আমিনের সঙ্গে সেগুলো বোম্বাইতে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং সব দায়দায়িত্ব আমার। যদি কেউ দোষী হয় তা আমি।"

পাঁচুদা বললেন, "বীর সাভারকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ইংরেজ ও ফরাসীরা মার্সাই বন্দরে আইন অমান্য করে ওঁকে পাকড়াও করে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই মামলা হেগের আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এই মামলায় সাভারকারের হয়ে লড়েছিলেন একজন ফরাসী সমাজতন্ত্রী। তিনি অবশ্য যা-তা লোক নন, স্বয়ং কার্ল মার্কসের দৌহিত্র জাঁ লুঙে।"

পাঁচুদা বললেন, "সেকালের বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল সাহিত্যের নিবিড় যোগাযোগ। রাণাজীর বিশাল লাইব্রেরির কথা বলেছি। কামা পড়তেন দেশ বিদেশের সাহিত্য। গোর্কির বিখ্যাত কবিতা 'বাজপাখির গান' পড়বার শখ হওয়ায় তিনি একজন রাশিয়ানকে অনুরোধ করেন ফরাসিতে এই কবিতার একটা তর্জমা দিতে। রুশটির নাম পাভ্‌লোভিচ। তিনি লিখেছেন : 'দিন কয়েকের মধ্যে আমি অনুবাদটি মাদাম কামাকে দিই। যখন ঐ তর্জমা তাঁকে দিলাম তখন তাঁর দু'চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগলো।' গোর্কির সঙ্গে কৃষ্ণবর্মা ও কামা দু'জনেরই পত্রালাপ ছিল। মাদাম কামা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বই পাঠিয়েছেন গোর্কির কাছে। গোর্কি নিজে কামার লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন রুশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে। এইসব বোঝাপড়ার ঘটনা ঘটছে প্যারিস থেকে। আজ আমরা কেমন সহজে এঁদের ভুলে গিয়েছি।"

স্টুটগার্ট সম্মেলন, যেখানে মাদাম কামা ভারতবর্ষে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা (প্যারিসে নির্মিত) তুলে ধরেন সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যাতে যোগদান করতে না পারেন তার জন্যে ইংরেজরা প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই চেষ্টায় মদত দিয়েছিলেন, ব্রিটিশ শ্রমিক নেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ড, যিনি পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এই রামজে ম্যাকডোনাল্ডের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার কথা হয়েছিল। স্ত্রী বিয়োগ না হলে ১৯১১ সালে রামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতেন। ফরাসীদের চেষ্টায় মাদাম কামা ও রাণাজী সেবার স্টুটগার্টে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন।

প্রথম যুদ্ধ বাধার সঙ্গে-সঙ্গে মাদাম কামাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গাঁয়ে। বলা হয়, ফ্রান্সে যুদ্ধরত ইণ্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে যাতে তাঁর যোগাযোগ না হয় তার জন্যে এই ব্যবস্থা। স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে বন্দিদশায় মাদাম কামার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং ফরাসি

বন্ধুবান্ধবদের প্রচেষ্টায় তাঁকে আর কোনো দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি, যেমন পাঠানো হয়েছিল মঁশিয়ে রাণাকে সেন্ট মার্টিনিক দ্বীপে।

এর পরেও মাদাম কামা বেশ কয়েকবছর বেঁচেছিলেন এবং তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৯৩৫ সালে। আরও এক বছর রোগভোগের পর ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ের এক জেনারেল হাসপাতালে তিনি মারা যান। সাভারকার দুঃখ করে লিখেছিলেন, "মাদাম কামা সকলের অজান্তে বোম্বাইতে মারা গেলেন সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ এক পরিবেশে।"

আমরা ফিরে এলাম রাণাজী প্রসঙ্গে। প্যারিসে বিপ্লবী হেমচন্দ্রর প্রধান ভরসা ছিলেন রাণাজী। 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইতে হেমচন্দ্র লিখেছেন : "তাঁর জহরতের কারবার সেখানকার ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে ছিল ক্ষুদ্র রকমের, কিন্তু তাঁর প্রাণটি ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বড়। তাঁর সহানুভূতিতে সুদূর বিদেশেও ঘরে আছি বলে মনে হতো। অনেকের কাছে বিমুখ হয়ে, শেষে তাঁরই কৃপাতে একটা ছোট ল্যাবরেটরি হয়ে গেলো।"

আমাদের মনে রাখতে হবে, রাণাজীপ্রদত্ত স্কলারশিপ নিয়েই বীর সাভারকার বিদেশে এসেছিলেন।

বোমা নির্মাণ শেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হেমচন্দ্র এবং সহযোগীদের জন্য রাণাজী যে ঘর ভাড়া করেছিলেন তা দেখবার লোভ হলো। কিন্তু কোনো ঠিকানা জানা নেই। পাঁচুদা বললেন "দেশ থেকে হেমচন্দ্র বাবুর পরিবারের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে পরের বার আসিস, বাড়িটা খুঁজে বের করা যাবে। প্যারিসে ইতিহাসে নষ্ট হয় না, এইটা মস্ত সুবিধে। একটু ধৈর্য থাকলে তুই বাড়িটা খুঁজে পাবি।"

এই প্যারিস প্রবাসেই এক রুশ বিপ্লবীর কাছ থেকে রুশ ভাষায় বোমানির্মাণ প্রণালীর একটা পুস্তিকা সংগ্রহ করেন হেমচন্দ্র। এই বইটির প্রতিটি পাতার ফটো তুলে রাণার হাতে দেওয়া হয়। তিনি একজন রুশ সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহায্যে বইটির ইংরিজি অনুবাদ করান। এর অনেকগুলি সাইক্লোস্টাইল কপি করানো হয় বিপ্লবীদের মধ্যে বিলি করার জন্যে। হেমচন্দ্র প্যারিস ত্যাগের পর বোমা তৈরির ঘরটি রাণা ছেড়ে দেন, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্য কোনো বিপ্লবীর কাজে লাগতে পারে ভেবে সমস্ত রসায়ন-সামগ্রী যত্ন করে রেখে দেন।

স্টুটগার্টে যে পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল তা নাকি তিনটে তৈরি হয়েছিল। একটি হেমচন্দ্র কানুনগো ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয়টি আছে পুণার তিলকমন্দিরে—এটি রাণাজীই ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয়টি রাণাজী যখন স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে ভারতবর্ষে আসেন তখন সঙ্গে করে আনেন এবং পণ্ডিতজীর হাতে তুলে দেন।

এই পতাকাটি এখন কোথায় তা খোঁজ করার সুযোগ পাইনি। হয়তো দিল্লির কোথাও আছে।

আর এক বিপ্লবী লালা হরদয়াল কাউকে খবরাখবর না দিয়ে গৈরিক বেশ পরিধান করে হঠাৎ প্যারিসে হাজির হন। এরপর তিনি লণ্ডনে যান, কিন্তু ইংলণ্ডের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্যারিসে ফিরে আসেন। রাণাজীর অর্থেই হরদয়াল বন্দোমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯১১ সালে হরদয়াল ত্রিনিদাদে চলে যান এবং পরে হার্ভাডে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক হন এবং স্থানীয় শিখদের নিয়ে গদরপার্টি স্থাপন করেন। আমেরিকা থেকে পালিয়ে জেনেভা যাবার পথে আবার প্যারিস। এবারেও তাঁর আশ্রয় মিলেছিল রাণাজীর কাছে।

মদনলাল ধিংড়া যে রিভলবারে বিলেতে সায়েব খুন করে শহীদ হন, সে রিভলবারটিও প্যারিসে সংগৃহীত হয়েছিল শুনলাম। এই ব্যাপারেও পুলিশ রাণাজীর বাড়িতে হানা দেয়। রাণাজী কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে যান। তিনি বলেন, আমার এখানে কত লোক আসে। তাঁদের মধ্যে কে কি জিনিস কিনছে তার খবর জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চার বছর সেন্ট মার্টিনিক দ্বীপে নির্বাসন রাণাজীর জীবনে সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা। তাঁর ছেলে এই সময়েই মারা যান। তাঁর নিজের শরীরও ভেঙে পড়ে। প্যারিসে ফিরে এসে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু প্যারিসের ভারতীয় ছাত্রদের তিনি সবসময় সাহায্য করতেন। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভীর সহায়তায় ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যাপারে রাণাজী উদ্যোগী হন। ফরাসী গবেষকদের ভারতবর্ষে পাঠানোর ব্যাপারেও তিনি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সংস্কৃত অধ্যাপক মঁশিয়ে ফশে, প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক মঁশিয়ে ফিনো ছাড়াও জুল ব্লো, রেনো প্রমুখ পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। রোমাঁ রোঁলার সঙ্গেও তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রাণাজীর অর্থে লাজপত রায়ের বই 'আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া' ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়।

রাণাজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও বন্ধুত্ব হয়। প্যারিসে রাণাজীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকবার হাজির হয়েছেন এবং সময় কাটিয়েছেন। পুত্রের স্মৃতিতে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তিনি ফরাসি বইগুলি দান করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও রাণাজী শান্তি পান নি। ফ্রান্স দখল করার পর রাণাজী জার্মানদের হাতে গ্রেপ্তার হন। সুভাষচন্দ্র বসুর জার্মানিতে আসার পর তিনি মুক্তি পান। নেতাজীর সঙ্গে রাণাজীর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। জার্মানরা চেয়েছিলেন রাণাজী তাঁদের হয়ে কাজ করুন, কিন্তু রাণাজী তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কাজ করতে সম্মত হন নি। যুদ্ধের পরে প্রস্তাব ওঠে রাণাজীকে

লিজন দ্য অনার দেওয়া হোক। ইংরেজরা এবারও বাগড়া দিলেন, কারণ রাণাজী ইংরেজ-প্রজা। ভারত স্বাধীন হবার পরে ১৯৫১ সালে রাণাজী শেষ পর্যন্ত এই সম্মান পান।

রাণাজী দেশত্যাগ করার অর্ধশতাব্দী পর দেশে ফিরে এসেছিলেন। রণক্লান্ত সৈনিকের শরীর তখন জরাজীর্ণ। ব্যবসাতেও মন্দা পড়েছিল। দেশে ফিরবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। প্রবাসের সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে রাণাজী যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন বিদেশে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম', 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট', 'তলোয়ার' ইত্যাদি পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি। সেই সঙ্গে বিখ্যাত মনীষীদের লেখা পত্রাবলী, যার মধ্যে রবীন্দ্রপত্রাবলীও ছিল।

মঁশিয়ে রাণা বেঁচেছিলেন ৮৮ বছর পর্যন্ত। শেষ জীবন কেটেছিল নাতি দিলওয়ার সিং-এর সেবায় সৌরাষ্ট্রের লিমডিতে ঘনশ্যামনিবাসে। রাণাজী আত্মজীবনী লেখার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, কিন্তু পক্ষাঘাতে পঙ্গু হওয়ার ফলে তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয় নি।

পাঁচুদা বললেন, "পরেরবারে খোঁজখবর নিয়ে তৈরি হয়ে আসিস, আমি তোকে বিপ্লবের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিটা বাড়ি খুঁজে বের করে দেখিয়ে দেবো।" কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা অরণ্যে রোদন করছি, স্রেফ একটা আবছা ধারণা নিয়ে আমরা প্রায় একশ বছর আগে ফিরে যেতে চাইছি।

পাঁচুদা বললেন, "শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা ও মঁশিয়ে রাণা এই তিনজনকে সামনে রেখে প্যারিসের পটভূমিকায় লেখনা একখানা বই, দ্যাখনা ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালীরা দেশ জননীকে ভুলতে বসেছে কিনা। কোনদিন ডোমিনিক লাপিয়ারের মতন কোন সায়েব এই কাজ করে বসবে, সিটি অফ জয়-এর মতন বই বেরুবে, তখন তোরা গালাগালি করবি, ভারতবর্ষের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আরে বাপু, যারা নিজেদের প্রতি সুবিচার করতে পারে না, তারা অন্যের কাছে কী ভাবে বিচার প্রত্যাশা করে?"

আমি প্যারিসের রাজপথে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে। ভারতের বিপ্লববহ্নির তিন শিখার কথা যতই ভাবছি ততই মন বিস্ময়ে ভরে উঠছে। সে কত দিন আগেকার কথা—ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূর্য তখন মধ্যগগনে, তখন কে স্বপ্ন দেখতে পারতো ভারত একদিন স্বাধীন হবে? সেই সময় সুদূরপ্রবাসে উপার্জন ও আত্মসুখে নিমগ্ন না হয়ে বর্মা-কামা-রাণা যে বীরত্ব ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, যে কষ্ট সহ্য করেছিলেন তার তুলনা নেই। এঁদের একজন দেশেই ফিরতে পারলেন না ; একজন ফিরলেন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে, কিন্তু দেখতে পেলেন না দেশের মুক্তি ; আর একজন বেঁচে থাকলেন অনেক দিন, কিন্তু আমাদের

দেশের নতুন প্রজন্ম তাঁদের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

পাঁচুদা বললেন, "দু'দিনের জন্যে বিদেশ বেড়াতে এসে মন খারাপ করিস না। তোরা না পারলেও তোদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কাজ করবে, যার প্রতি যা অবিচার হয়েছে তা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেবে।"

আমি ভাবছি অন্য কথা। সাফল্য অসম্ভব জেনেও বিদেশের মাটিতে যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে চেয়েছিল তারা কোন্ ধাতুতে গড়া?

পাঁচুদা শুনলেন আমার কথা। বললেন, "রক্ত মাংস দিয়েই সব মানুষ গড়া, কিন্তু ফরাসীর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-প্রীতির প্রদীপে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে এঁরা শুরু করেছিলেন উদয়পথের যাত্রা। এঁরা আজ নেই, কিন্তু এঁদের কথা দেশের লোককে যত বলবি তত মঙ্গল হবে ভারতবর্ষের।"

প্যারিসের আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ চুপচাপ ঘরে বসে থাকার উত্তম সময়। কিন্তু উপায় নেই—পাঁচুদা মেট্রো স্টেশনের সামনে উপস্থিত থাকবেন। ওইখান থেকে আমাকে নিয়ে বেরোবেন একটু বিবেকানন্দ অনুসন্ধানে।

সম্বিৎ বললো, "আমার রেন-কোট নিন, মাথায় টুপি চড়ান, যতই বৃষ্টি হোক বিবেকানন্দ দর্শনে বাধা দেওয়াটা উচিত হবে না, দেশে ফিরে শুধু সায়েবসুবোর কথা লিখলে লোকে কী বলবে?"

এর আগে সম্বিৎ আমাকে গ্রেটজে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে গিয়েছিল। অতি চমৎকার পরিবেশ। ওখানে বিদেশিনীদের কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান আমাকে উন্মনা করে তুলেছিল। প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হলো। কলকাতা থেকে আমার আকাশপথের সঙ্গী স্বামী গঙ্গানন্দজীও আদর করলেন। সবচেয়ে মন কাড়লেন, আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ, যিনি এই মুহূর্তে মিশনের ম্যানেজার মহারাজ বলে পরিচিত। স্বামীজীটি বেজায় রসিক। প্রবুদ্ধ ভারতের এক সংখ্যায় নিজের এই ভূমিকা সম্পর্কে রসরসিকতা করেছেন। শুনেছিলাম, এই সন্ন্যাসী ফরাসি দেশে থাকাকালীন বিবেকানন্দ সম্পর্কে নানা খবরাখবর অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন। এসব তখন মন দিয়ে পড়িনি। প্যারিসে যে আদৌ কখনও

আসবো তা হিসেবের মধ্যে ছিল না।

গ্রেটজ মিশনে এসে বিদেশী মানুষরা কীরকম অভিভূত হয়ে পড়েন তা আমার পড়া আছে। সামনের সপ্তাহে আমিও ওখানে যাবো এবং কয়েকদিন রাত কাটিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবো তা তো ঠিক করাই আছে।

কিন্তু তার আগে প্রস্তুতি দরকার। সেই জন্যেই মুশকিল আসান পাঁচুদার শরণাপন্ন হওয়া।

টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে আপাদমস্তক ওয়াটার প্রুফে মণ্ডিত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া গেলো। ভারতীয়রা ইদানীং কালে প্যারিসে তেমন দাগ কাটতে সক্ষম হন নি, কোনো বিষয়েই তেমন দুনিয়া-নাড়া কাজকর্ম হয় নি, সুতরাং আমাকে বাধ্য হয়েই ফিরে যেতে হচ্ছে বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে। তখনই ঘটবার মতন কিছু ঘটেছিল। তবু ঐ সময়ে প্যারিসের মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে পৃথিবীর প্রতিভাধরদের প্যারিসে সমাবেশ লক্ষ্য করে সিমলের নরেন দত্ত নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারেন নি। তুলনাহীন বাংলায় লিখেছিলেন : "নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ প্যারিসে এ মহা কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান ফরাসি ইংরেজ ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গ ভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে?"

নব্বুই বছর পর আজও আমার একই দুঃখ, পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। আগে শুধু অবজ্ঞা করতো, এখন আবার সন্দেহ করে, চোরাগোপ্তা ঢুকে পড়ে বিদেশে থেকে যাবার জন্যে যারা বেপরোয়া তাদের তালিকার সর্বাগ্রে বাংলাদেশের ছেলেরা। ভারত, পাকিস্তান, বাঙলাদেশ একত্রে আমরা সারা বিশ্বের করুণার পাত্র! একশ কোটি মানুষ আমরা প্রতিবছর এই উপমহাদেশকে হুড়মুড় করে পিছনে ঠেলে নিয়ে চলেছি আর সেই সঙ্গে সতেজ রাখছি ভ্রাতৃবিরোধ ও বিদ্বেষের উনুনকে। কবে আমাদের চৈতন্যের উদয় হবে গো? কবে আমরা জেগে উঠবো? কে জানে?

পাঁচুদার বিবেকানন্দ ইস্কুলের ট্রেনিং বৃথা যায় নি। মরদ কা বাত হাতি কা দাঁত। এই বৃষ্টিকে ডোন্টকেয়ার করে নির্দিষ্ট দোকানের সামনে আমার জন্যে যথাসময়ে অপেক্ষা করছেন।

পাঁচুদা বললেন, 'স্বামী বিদ্যাত্মানন্দর সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন ওঁকে সব জিজ্ঞেস করে নিলি না কেন? স্বামী বিবেকানন্দর ফরাসি দেশ ভ্রমণ সম্বন্ধে ওঁর থেকে ভাল তো কেউ জানে না। বহু খোঁজখবর করে ধৈর্য ধরে নষ্ট ইতিহাস

উদ্ধার করেছেন, এমন কি প্যারিসের কোন কোন হল্‌-এ স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন তাও মোটামুটি বের করে ফেলেছেন।"

আমি বললাম, "প্যাঁচ কষছি, পাঁচুদা! ওস্তাদের মার হবে শেষ রাত্রে। নিজের চোখে সবটুকু দেখে নিয়ে তারপর হাজির হচ্ছি গ্রেটজে, তখন দেখবো বিবেকানন্দ এবং তাঁর বাণী এখনও কেমনভাবে এখানে বেঁচে রয়েছে, শেষ কথাগুলো বিদ্যাত্মানন্দ মহারাজের কাছে জেনে নেওয়া হবে।"

পাঁচুদা আমার পদ্ধতিতে সায় দিচ্ছেন না। আমি এবার আত্মতেজ প্রকাশ করলাম। "পাঁচুদা, ক্লাস সিক্স-এ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সেকেণ্ড হয়ে দু'খানা বই বিনামূল্যে হাঁদুদার হাত থেকে পেলাম—পরিব্রাজক ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য। ছ'ক্লাসের ছেলেকে ওই বই দেওয়ার মানে হয় না, কিন্তু সেবারে পুরস্কারটা পাবার সম্ভাবনা ছিল অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রর, লাস্ট মোমেন্টে পেট খারাপ হওয়ায় সে প্রতিযোগিতার দিনে ইস্কুলে এলো না।"

"আঃ! পেটখারাপ-টারাপ আবার কী কথা?"

বাঃ, স্বামী বিবেকানন্দও তো পেটের রোগে ভুগতেন। উনি নিজেই তো লিখেছেন, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে, উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ি মরে। সায়েবরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। এক সায়েব ডাক্তার তো এঁকে বলেছিলেন পেটের রোগগ্রস্ত লোকরা নিরুৎসাহ ও বৈরাগ্যবান হয়, তিনি জানতে চেয়েছেন, এই জন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ, মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য" করেছে?

যাই হোক, আমার বক্তব্য হলো, ভ্রমণ সংক্রান্ত দু'খানা বই না-বুঝেও আমি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বিবেকানন্দর রচনায় দু'রকম বাংলা আছে—একটা শ্রেণী প্রাণে দাগা দেয় না, এগুলো বেশির ভাগ ইংরিজি থেকে অপরের অনুবাদ। আর একটা হলো সিমলিয়াতে মানুষ-হওয়া নর্থ ক্যালকাটার ওস্তাদ ছেলের প্রাণবন্ত বাংলা যা বুকে সেঁটে থাকে আঠার মতন। এই বাংলাকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী এবং পুনর্বার আসর মাত করেছিলেন।

পাঁচুদা মিটমিট করে হাসছেন। ওঁর অভিজ্ঞতা আরও ভয়ঙ্কর। লেখাপড়ায় তেমন মতি ছিল না, কিন্তু ওয়াকিং কমপিটিশনে সেকেণ্ড হয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন পরিব্রাজক এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য। ওই ছিল আমাদের ইস্কুলের হাঁদুদার বদ্‌স্বভাব—চান্স পেলেই গছিয়ে দিতেন বিবেকানন্দর বই। বিনাপয়সায় বিষ পেলেও খাবার লোভ হয়, বইও পড়তে হয়। তাই শুধু আমি নই, স্বয়ং পাঁচুদাও ছাত্রাবস্থায় ওইসব বই হজম করেছেন।

পাঁচুদা আজ একটা দামী স্বীকারোক্তি করলেন। বিবেকানন্দের বইতেই তিনি প্রথম ফ্রান্সের নাম শোনেন এবং বিদেশে পাড়ি দেবার লোভ হয়। এখন অবশ্য

ওঁর অবস্থা দেখে মনে হয়, শাকচচ্চড়ি ভাত খেয়ে দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেই ভাল হতো, প্রবাসের নিঃসঙ্গতায় এমন ভাবে কষ্ট পেতে হতো না।

সুতরাং বিশেষ কিছু না জেনে, স্রেফ দু'খানা ভ্রমণকেতাব, ডজনখানেক চিঠি এবং গোটা কয়েক বিদ্যাত্মানন্দ লিখিত ইংরিজি প্রবন্ধ পড়েই আমরা প্যারিসের বিবেকানন্দকে খুঁজতে বেরিয়েছি তাঁর অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার প্রায় একশ বছর পর।

পাঁচুদাকে খুব তোল্লা দিয়েছি, তেরো বছর বয়সে যিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গিলে খেয়েছেন তাঁর থেকে ভাল গাইড দুনিয়ার কোথায় পাওয়া যাবে? আমার কাছে পাঁচুদাই সব, নানা পন্থাবিদ্যতেয়ম্।

খুব খুশী হলেন পাঁচুদা, "আমি জানতাম বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে আমার ওপরেই নির্ভর করবে, অন্য লোকে তার মন ভরবে না। সেই অনুযায়ী কাল রাত্রে আমি ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিয়েছি। অজানা তথ্য আমার কাছে কিছু নেই, কিন্তু সবসময় অজানার পিছনে ছুটতে হবে এই মনোবৃত্তি খবরের কাগজের রিপোর্টারের সাধারণ মানুষের নয়। পৃথিবীতে এতো কিছু জানবার পরেও মানুষ যে কত কি বেমালুম ভুলে বসে আছে তার হিসেব নেই। সেই সব দ্বিতীয়বার নাড়াচাড়া করলেও দুনিয়ার মঙ্গল।"

আমি বললাম, "দু'হপ্তা প্যারিসে থেকে আমি নতুন কিছু আবিষ্কারের স্পর্ধা রাখি না। পুরনো সব জিনিস আমি মফস্বলের দৃষ্টিতে নতুন করে দেখছি, তাতেই আমার আনন্দ। আমি স্বামীজীর প্যারিস-যাত্রাটা একটু মনের মধ্যে অনুভব করতে চাই।"

পাঁচুদা ভরসা পেলেন। "ঠিক বলেছিস। এই ধর নেপোলিয়নের সমাধি। কয়েক কোটি লোক দেখে ফেলেছে, কিন্তু সেদিন আমাদের চোখে ওটা নতুন। নতুনের চোখে পুরনো জিনিসও নতুন। সেদিন তোকে নেপোলিয়নের অত হিসট্রি বললাম, কিন্তু বিবেকানন্দ যখন ওখানে হাজির হলেন তখন ওঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল বলা হলো না। উনি মহাবীরের মস্ত ভক্ত—চোখ বুজে বলতে লাগলেন, শিব শিব। সত্যিই তো নেপোলিয়ন শিব ছাড়া আর কী? এই ফরাসি বিপ্লবকে একশ বছর আগে কয়েকটা সেনটেন্সে কেমন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ।"

স্বামীজী লিখেছেন : "তখন রাজাদের আধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন।...দেশসুদ্ধ লোক এসব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা', 'সব সমান', 'ছোট বড় কিছুই নয়'—এ ধ্বনি উঠলো, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারানীকে আক্রমণ করলে, সেসময় প্রথমেই এ মানুষের অত্যাচারের

ঘোরনিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় একরাত ধরে নাচগান আমোদ করলে!...প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারানীকে মেরে ফেললে, দেশসুদ্ধ লোক 'স্বাধীনতা সাম্যের' নামে মেতে উঠল, ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র হল।...শুধু তাই নয়, বললে 'দুনিয়া-সুদ্ধ লোক, তোমরা ওঠ, রাজাফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক।...'লা পাত্রি আ দাঁজে'—জন্মভূমি বিপদে...ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ 'মার্সাই-এ' মহাগীত গাইতে গাইতে...দলে দলে জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পান্ন ফরাসি প্রজা-ফৌজ বিরাট সমগ্র ইউরোপী চমুর সম্মুখীন হ'ল, বড় ছোট ধনী দারিদ্র—সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল, 'পরিত্রাণায়...বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম' বেরুল। সমগ্র ইউরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসি জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর—তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে ধরা কাঁপতে লাগলো, তিনিই ন্যাপোলেঅঁ।"

পাঁচুদা বললেন, "ফরাসি সভ্যতা ও প্যারিস শহরটা ভদ্রলোক সত্যিই গুলে খেয়েছিলেন। ক্যাথলিক ধর্মে মাতৃপূজার ব্যাপারটা চমৎকার ধরে নিয়েছিলেন, 'জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটীরে 'মা' 'মা' 'মা'!। বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গবাহাদুর (ফিল্ড মার্শাল) সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী'—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।...আর মেরীর পুজো...এদের দিনরাত, বারমাস। আগে স্ত্রী লোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর, খাতির।...এপুজো ইউরোপে আরম্ভ করে মূরেরা...তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হ'ল...আর শক্তির সঞ্চয় হ'ল ইউরোপে।"

কলকাতার কায়েত নরেন দত্তর নজরটা ছিল তীক্ষ্ণ। ঠিক ধরে নিয়েছিলেন, "কলিযুগের একাধিপতি ইউরোপকে বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রাঁন্স থেকে বুঝতে হবে।"

পারিকে মহাসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। আর মজেছিলেন ফরাসি দেশের সৌন্দর্যে—"সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই।" পাঁচুদা বললেন, "যদি কখনও সুযোগ পাস, ওই সুন্দর দেশটাও দেখে আসিস। আর কিছু না হোক, ওই জাতটা সায়েবদের শৌচাগারে টয়লেট পেপার ব্যবহার করতে শিখিয়েছিল।"

আমরা মেট্রোর গহ্বরে ঢুকে পড়েছি। একটা ট্রেনের অপেক্ষায় রয়েছি। পাঁচুদা আমার কাণ্ডারী, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে চলুন। চল্লিশবছর ধরে যে দুটো বই হাঁদুদার দৌলতে আগলে রেখেছি, অথচ ঠিক যার মানে বুঝতে পারিনি আজ তা কিছুটা সড়গড় হবে। স্বামীজীর দু'খানা বইকে আরও একটু তলিয়ে দেখা যাবে।

পাঁচুদা বললেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের ওই আমেরিকান সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলে দেখবি, বিবেকানন্দ প্রথম ফ্রান্সে এসেছিলেন ১৮৯৫ সালে। পরের বছর সামান্য সময়ের জন্য দু'বার। তারপর ১৯০০ সালে সব চেয়ে লম্বা সময়ের জন্যে, যেসময়ে তুই এসেছিস। জুলাই মাসে বিদেশীর ভিড় বেড়ে যায়। কিন্তু আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর খুব ভাল সময়, বিবেকানন্দ মজে গিয়েছিলেন। ওইসময় আবার চলছিল বিশ্বমেলা, সুতরাং কোনো কথাই নেই। ফরাসির গৌরবের মাহেন্দ্রক্ষণ ওই ১৯০০ সাল, তখনও ইউরোপের মানসিকতায় আসন্ন প্রথম মহাযুদ্ধের ছায়া পড়েনি।"

পাঁচুদা আজ কোনো ঝুঁকি নেন নি, সঙ্গে একখানা প্যারিস পথপ্রদর্শিকা নিয়ে এসেছেন। "এ-শহর চেনা সহজ নয় রে। এই বইতে ছ'হাজার রাস্তার নাম আছে। তোকে খেয়াল রাখতে হবে, প্যারিসে ৬০টা থিয়েটার, ৮৪টা মিউজিয়ম, বিশটা বিশাল লাইব্রেরি, সাতটা ইয়া ইয়া মিউজিক হল আছে। হুট করে কিছু খুঁজে বের করে সহজ কাজ নয়।"

আমরা যে মেট্রো স্টেশনে অবতরণ করলাম তার নাম কনকর্ড। ইদানীং দ্রুতগামী এরোপ্লেনের কল্যাণে নামটা হাওড়াতেও হাজির হচ্ছে। মস্ত স্টেশন, একেবারে কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চল বলা চলে। ওইখানেই বড় একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেলো, রু কাস্তিলিয়ঁ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বইতে এক "প্রাসাদোপম হোটেলে রাজভোগ খাওয়া-দাওয়ার" উল্লেখ আছে, কিন্তু হোটেলের নাম নেই। এখন এই হোটেলের নাম বেরিয়েছে—হোটেল কন্টিনেন্টাল। প্যারিসের গাইডবুকে একটা হোটেল কন্টিনেন্টাল রয়েছে, যার ঠিকানা তিন নম্বর রু কাস্তিলিয়ঁ। এই হোটেলটাই হবে নিশ্চয়, প্যারিসে হুট করে কিছু পাল্টায় না, না নাম, না বাড়ি, না প্রতিষ্ঠান। ঐ রোগটা আমেরিকান এবং ওদের কাছে থেকে কলকাতায় হাজির হয়েছে, কোনো কিছুকেই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেওয়া আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই কন্টিনেন্টাল হোটেলেই স্নান ঘর নেই বলে বিবেকানন্দ তাঁর লেখায় দুঃখ করেছেন। দু'দিন ধরে সহ্য করে আর পারলেন না, বললেন, "এ রাজভোগ থাকুক এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এরপর বারোটা প্রধান-প্রধান হোটেল খোঁজা হলো, স্নানের স্থান কোথাও নেই। ফরাসি এই দুর্নাম ঘুচিয়েছে অনেক পরে, এ-

বিষয়ে তারা শিখেছে আমেরিকানদের কাছে, আমেরিকানরা শিখেছে ইংরেজের কাছে, ইংরেজরা শিখেছে আমাদের কাছে।

কলঘরের দুশ্চিন্তা বিবেকানন্দর পরবর্তী প্যারিস প্রবাসেও ছিল। এই খবর উৎসাহী গবেষকরা বের করেছেন ডঃ লুইস জেনস নামে এক ভক্তর চিঠি থেকে। ভদ্রলোক নিয়মিত তাঁর গিন্নিকে বিস্তারিত চিঠি দিতেন। যে-বাড়িতে বিবেকানন্দ থাকতেন তিনি সেখানে কিছুদিন বসবাস করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং এই সময় বউকে লিখেছেন দুঃখ করে : "আশ্চর্য এই ফরাসীরা, এদের বাড়িতে বাথরুম থাকে না।" আরও একটা মন্তব্য করেছেন, "আলোর ব্যাপারেও প্যারিসের বাড়িগুলো পিছিয়ে আছে। এখানে প্রত্যেকেই মোমবাতি জ্বালায়। যাঁর বাড়িতে আছি সেখানে গ্যাসও নেই, ইলেকট্রিকও নেই। যা কিছু গ্যাস এরা রাস্তায় পোড়ায়।"

এই যে বাথরুম এবং বিদ্যুৎবিহীন বাড়ি এইটাই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যস্থল। ৬৬ রু অ্যামপিয়র-এর অবস্থিতি ১৭ অ্যারোঁদিসমে। মেট্রো স্টেশনটির নাম ওয়াগ্রাম। পাঁচুদা এবার আমেরিকান সন্ন্যাসীর লেখা থেকে সুড়সুড় করে বলে গেলেন, তোকে মনে রাখতে হবে, ১৯০০ সালে আমেরিকা থেকে দেশে ফেরবার পথে দলবল দিয়ে বিবেকানন্দ প্যারিসে হাজির হয়েছিলেন। তখন প্যারিসে বিশ্বমেলা চলেছে এবং সেই উপলক্ষে বিশ্বধর্মসভা যার আগেরটি হয়েছিল শিকাগোতে। যদিও আকারে ও আয়োজনে দু'টির মধ্যে বহু তফাৎ। এবারেরটি অনেকটা ভারততত্ত্ববিদদের বিশিষ্টসভার মতন যেখানে সভাপতিত্ব করার কথা স্বয়ং ম্যাক্সমুলারের। এই সভায় বিবেকানন্দর নাম ঢুকিয়েছিলেন জেরাল্ড নোবেল। এই চিরকুমার সদাহাস্যময় মানুষটি পরের উপকারে ব্যগ্র থাকতেন। ৩রা আগস্ট 'শ্যামপেন' জাহাজ থেকে বিবেকানন্দ ফ্রান্সে নামলেন এবং ট্রেনে প্যারিসে হাজির হলেন। ওঁর মালপত্তর ম্যানেজ করবার জন্যে স্টেশনে হাজির ছিলেন জেরাল্ড নোবেল এবং প্রথম পর্বে ওঁর ৬৬ নম্বর রু-অ্যামপিয়র বাড়িতেই বিবেকানন্দর রাত্রিবাস।

আমরা জানি পরের দিনই (৪ঠা আগস্ট) আইফেল টাওয়ারের রেস্তোরাঁয় বিবেকানন্দ মধ্যাহ্নভোজ সারেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্য অনেকের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, এইসময় প্যারিস শহরটা তিনি আবার ঝালিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ ফরাসি ভাষা রপ্ত করার চেষ্টা এদেশে আসবার আগেই চালিয়েছেন। তারপর নিজেই লিখেছেন : "পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে।...এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে

তা ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী—এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।”

“মহাকদর্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড”, ইংরেজ প্রচারিত প্যারিসের এই বদনাম সম্পর্কে বিবেকানন্দর মতামত চাঁচাছোলা : “লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবণিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ : তবে তফাত এই যে, অন্যদেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া ; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচের যে তফাত।”

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এরপর যা মন্তব্য করেছেন তা স্মরণে রাখবার মতন। “ভোগ-বিলাসে ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বলো? নইলে দুনিয়ার যার দু'পয়সা হয়, সে অমনি পারি-নগরী অভিমুখে ছোটে কেন?...ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না ; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।”

আগস্ট—অক্টোবর ১৯০০ সনে আরও দু'টি বাড়িতে স্বামীজী বসবাস করেছেন। একটির ঠিকানা তাঁর পত্রাবলীর শিরোনামে বেশ কয়েকবার স্থান পেয়েছে—৬ নম্বর দে-জেতাৎ ইনি অথবা ইউনাইটেড স্টেটস। এই বাড়িটি দেখার আগে পাঁচুদা দক্ষিণমুখো হলেন। বললেন, “এই প্যারিসেই সাধু করেছেন সাহিত্যিকসঙ্গ। এই তরুণ লেখকের নাম মঁশিয়ে জুল বোওয়া।” বিবেকানন্দ পাঠকের কাছে নামটি অপরিচিত হয়। পাঠকরা জানেন, এঁর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, লিখে সংসার চালাতেন। পরে স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন।

দুম করে ধনী আমেরিকান ভক্তদের আতিথ্য এড়িয়ে স্বামীজী এঁর বাড়িতে হাজির হলেন। সেকেলে ফরাসী বাড়ি—নো লিফ্ট্—সিঁড়ি ভেঙে ছ'তলার চিলে কোঠায় ওঠো। কিন্তু ভদ্রলোক ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না, সুতরাং ঝটপট ফরাসি শেখার, যত ইচ্ছে বই পড়ার এমন চমৎকার জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

এই সময়ের একটি মন্তব্য আমার নজর কেড়েছে। মিস্ ম্যাকলাউড তাঁর এক বান্ধবীকে লিখছেন, স্বামীজীকে বালকের মতন দেখাচ্ছে। তাঁর ওজন ঝরেছে ত্রিশ পাউণ্ড।

আন্দাজ করা যায় ডায়াবিটিস তখনই প্রবল, যদিও প্রাণদায়ী ইনসুলিন ইঞ্জেকশন তখনও অজানা।

জুল বোওয়া স্বামীজীর দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন, ওঁর রঙ যে চাপা ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে। জুল বোওয়ার ওখানে অন্তত চারসপ্তাহ কাটিয়েছেন স্বামীজী। লেখকটি পরে বোধ হয় একটু বিগড়েছিলেন, কারণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু

ব্যাজস্তুতিও তাঁর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচুদার হাতে একটা ছোট্ট স্লিপে কয়েকটা ঠিকানা লেখা। আমরা হাজির হলাম প্যারিসের আর এক প্রান্তে, মেট্রো স্টেশনের নাম সাইট ইউনিভার্সিয়েট। নির্ঘাত বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলে—আমার আবার কোনো শহরের ভূগোল মনে থাকে না, চেনা জায়গাতে এসেও অচেনা মনে হয়, আবার অজানা জায়গায় গিয়ে মনে হয় এখানে তো আগে এসেছি।

ঠিক মেট্রো স্টেশন জানা থাকলে প্যারিসে খুব বেশী হাঁটাহাঁটি প্রয়োজন হয় না। পাঁচুদা মেট্রোর লাগোয়া একটা ম্যাপে ঠিকানাটা ঝালিয়ে নিলেন। রাস্তার নাম রু গাজাঁ। চন্দ্রবিন্দুটা একটু এদিকে এলেই গাঁজা হয়ে যেতো। বাড়িটার ছবি আগে দেখেছি, এবার স্বচক্ষে ৩৯ নম্বর ভবনটি দেখা হয়ে গেলো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার সাধ হলেও সাহস হলো না। কবে একশ বছর আগে কে এখানে চারসপ্তাহ ছিলেন তার জন্যে বর্তমান বাসিন্দাকে ভরদুপুরে জ্বালাতন করাটা একালের ফরাসি বরদাস্ত নাও করতে পারেন।

জুল বোওয়া তাঁর রাস্তার লাগোয়া পাবলিক পার্কের কথা বলেছেন। সেটি বহাল তবিয়ত রয়েছে। কলকাতা শহরের নাগরিকদের মতন প্যারিসের নাগরিক বোকা নয়। তাঁরা তাঁদের পার্কগুলো রাতারাতি লোপাট হতে দেন না। একশ বছর আগে যেখানে সবুজ ছিল এখনও সেখানে প্রাণ জুড়ানো সবুজের সমারোহ।

এরপর ঝটিতি আমাদের গন্তব্যস্থল সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়। সম্বিৎ এখানে আমাকে এনেছিল, কিন্তু গুলিয়ে যাচ্ছে। পাঁচুদা জানালেন, এখানেই বসেছিল কংগ্রেস অফ দ্য হিসট্রি অফ রিলিজিয়ন্স—৩রা থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সালে। এইখানেই স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন ৭ সেপ্টেম্বর সকালে। ওই শুক্রবার জুল বোওয়ার বাড়ি থেকে এখানে নিশ্চয় টুক করে চলে আসতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাত্মানন্দর হিসেবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসে ওদিন তিনি দু'বার বলতে উঠেছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার আমরা এক রিপোর্টার বিবেকানন্দকে পাচ্ছি একই সঙ্গে। উদ্বোধন পত্রিকায় বেনামে তিনি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তা মজার। "স্বামী বিবেকানন্দ পারি-ধর্মেতিহাস সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু শারীরিক প্রবল অসুস্থতানিবন্ধ তাঁহার প্রবন্ধাদি লেখা ঘটিয়া উঠে নাই; কোনমতে সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন মাত্র।" এই সভায় এক সায়েব বলেন শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন এবং শালগ্রাম শিলা স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। বিবেকানন্দ বিদেশীদের এই ভুল ভেঙে বলেন, শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব বেদ সংহিতার যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র থেকে। শালগ্রাম শিলাকে যোনিচিহ্ন বলে কল্পনা সায়েবদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে।

ম্যাক্সমূলার সভায় আসেন নি কিন্তু লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন যা বিদ্যাত্মানন্দ ফরাসী থেকে ইংরিজী করেছেন। কয়েকটি লাইন মনে রাখবার মতন : যে কেবল একটা ধর্মের খোঁজখবর রাখে সে কোনো ধর্মই জানে না। ধর্মে আদি ইতিহাস যে জানে তা তার পক্ষে সে ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব নয়।...মন্দির ও পুরোহিত ছাড়াও ধর্ম হয়। সাইবেরিয়ার দরিদ্র রমণীরা সকালে তাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে সূর্যকে প্রণাম করে বলে : 'যখন তুমি উদিত হও তখন আমিও বিছানা থেকে উঠি ; যখন তুমি শুতে যাও, আমিও তখন ঘুমোতে যাই', এও একধরনের পূজা।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে বেরিয়ে পাঁচুদা বললেন, "তোকে আর একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া উচিত। ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের অফিস, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে মাদাম কামা গিয়েছিলেন হলফনামা করতে। তোকে মনে রাখতে হবে, বেলুড়মঠের প্রথম ট্রাস্ট ডিড এই প্যারিসেই সই করেছিলেন বিবেকানন্দ। এর আগে সম্পত্তিটা কিনেছিলেন বিবেকানন্দ নিজের নামে—সে নিয়ে জল ঘোলা করেছিল নিন্দুকরা। কেউ-কেউ ইনকাম ট্যাক্সের হাঙ্গামাতেও জড়াতে চেয়েছিল। এই ট্রাস্ট ডিড-এর গল্প বাঙালিদের জানা উচিত—মহাপুরুষরা জীবিতকালে কত হাঙ্গামায় পড়েন, কত ভুল বোঝাবুঝি হয়! সেপ্টেম্বর মাসেই প্যারিস থেকে বিবেকানন্দ লিখছেন, "হরি ভাই, আমার শরীর-মন ভেঙে গেছে।...নির্ভর করবার লোক কেউ নেই, তায় আমি যতক্ষণ থাকব, আমার উপর ভরসা করে সকলে অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে যাবে। ...লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনঃকষ্ট। কাজেই...সব লিখেপড়ে আলাদা হয়ে গেছি...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কত্তাত্তির! কত্তাত্তি ছাড়া বাকী সব সই ক'রে দিয়েছি।"

"মানুষ কোন অবস্থায় এরকম চিঠি লেখে আন্দাজ করতে পারিস নিশ্চয়", পাঁচুদা বললেন, আমি চুপ করে রইলাম।

ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের আপিস তখন কোথায় ছিল তা আমাদের জানা নেই। সুতরাং এবার আমাদের গন্তব্যস্থল ৬ নম্বর প্লেস দ্য এতাত-ইউনি। এর অবস্থান ১৬ নম্বর এরোঁদিসমে। স্টেশনের নাম ক্লেবার।

এই বাড়িটাও বাইরে থেকে মন দিয়ে দেখা গেলো। অভিজাত অঞ্চলের বাড়ি। ধনী আমেরিকান ভক্ত লিগেট ঠিক জায়গায় বাড়ি নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি আমন্ত্রণ করতেন দুনিয়ার সেরা মানুষদের। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গাইয়ে, অধ্যাপক চিত্রকর, ভাস্কর কেউ বাদ যেতেন না।

তখনকার প্যারিসের কথা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। স্বামীজীর পুরনো ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন সারা বার্ণাড, এমা কালভে, এমা থার্সবে, হিরম ম্যাক্সিম

(কামানের গোলার আবিষ্কারক), সিস্টার নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু। প্যারিসের বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছেন বাঘা-বাঘা মানুষ—এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁন্স, পিয়ের লোতি, এঁদের সঙ্গে যোগ দিন চিত্রশিল্পীদের—পিসারো, ক্লড মোনে, মাতিস ও ব্রাক।

ইচ্ছে হলো একবার ঢুকে যাই বাড়িটার ভিতরে। কিন্তু পাঁচুদা বারণ করলেন। ফরাসিরা উটকো ভিজিটর বরদাস্ত করে না। আসতে হলে চিঠি লিখে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

পাঁচুদা শুধু বললেন, "জায়গাটা চমৎকার। এখান থেকে পায়ে হেঁটে রোজ সকালে বিশ্বমেলায় যাওয়াটা খুবই সহজ ছিল বিবেকানন্দর পক্ষে। মেলার বিরাট আয়োজন ভদ্দরলোকের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সব কিছু ত্যাগ করেও ভারতবর্ষকে সাজিয়ে গুছিয়ে শিল্পসমৃদ্ধ করবার কিছু ভাবনা-চিন্তা নিশ্চয় এখানে পেয়ে গিয়েছিলেন।"

সেই সময় সম্বিৎ হাজির হবার কথা। সেইরকমই কথা ছিল। পাঁচুদা বিদায় নেবেন এবং সম্বিৎ আমার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

যাবার সময় হলো। সাগরপারের পাখি আবার সাগরের ওপারে ফিরে যাবে। ইঙ্গিতটা সম্বিতই বহন করে এনেছে। কিন্তু সে এখনই কিছু বলতে চাইছে না।

বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত দে-জেতাৎ ইনি রাস্তার ছ'নম্বর বাড়ির সামনে আমি ও পাঁচুদা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করেছি। আমাদের নর্থ ক্যালকাটার ছেলে নরেন দত্ত এখান থেকেই পশ্চিমী সভ্যতাকে যাচাই করেছেন ঝানু বাঙালীর চোখে, মাথা ঘামিয়েছেন কী এদের কাছ থেকে গ্রহণ করা যায় এবং এদের কী কী বর্জনীয়।

পাঁচুদা বললেন, "লোকটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে যা দেখেছিলেন এবং সব দেখেই ফ্রান্সকে বলেছিলেন 'ভুবনস্পর্শী', যদিও সে সেই সময় প্রতিহিংসানলে পুড়ে জাতটা আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে। ফরাসী জাতটাকে দেখে মজেছিলেন সন্ন্যাসী সন্ধান পেয়েছিলেন আশার আলোকের। তবু হিসেবটা মন্দ দেন নি : কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিশুপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস। প্যারিস ছাড়া দুনিয়াতে আর নগর নেই, এমন কথাও দুম করে বলে

ফেলেছেন। জাহাজে, স্টিমারে, ট্রেনে ঘুরতে ঘুরতে ঘরছাড়া পরিব্রাজক বিবেকানন্দ চোখা চোখা ডায়ালগ ছেড়েছেন ফরাসী জাতটার হাড়হদ্দ বুঝে নিয়ে। ফরাসি যখন রোয়াব দেখাবার জন্যে মাস্‌ল ফোলায় তখনও সে রূপপূর্ণ। "ফরাসি প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর", "ফরাসির সভ্যতা স্নায়ুময়। কর্পূরের মতন—কস্তুরির মতো একমুহূর্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়" ; "ফরাসিরা নরম শ্রেণীর মেয়ে মানুষের মতো ; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা, তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।"

দুনিয়ার সব বড়-বড় শহরেই তো ঘুরেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের চাটুজ্যে মশায়ের চেলা সিমলের দত্তমশাই। কিন্তু শিরোপাটা কেন দিলেন এই প্যারিসকে?

পাঁচুদা আমার প্রশ্নে ঘাবড়ালেন না। বললেন, "শিরোপা দেবার যোগ্য বলেই শিরোপা দিলেন।"

"কিন্তু পাঁচুদা ছাড়ুন দু'চারটে গালাগালি। পরচর্চার সময় পরনিন্দা একটু না হলে বাঙালীরা যুত পায় না।"

পাঁচুদা দমলেন না। "তুই তো জানিস। দত্তমশাই এতো প্রশংসার মধ্যেও ফরাসিকে বলেছিলেন আসল চার্বাকের দেশ। ভোগ করতে করতে বদ হজম হয়ে হয়ে চোঁয়া ঢেকুর তুলছে জাতটা। তবু ভোগে ক্লান্তি নেই।"

"আরও দু'একটা ছাড়ুন পাঁচুদা, প্লিজ।"

পাঁচুদা বললেন, "ওই যে তোকে বলেছিলাম, ফরাসি হলো শশার মতন, সব কিছু হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে হজম হবে না কিছুতেই। নিজের সভ্যতাকে কুমারী মেয়ের শরীরের মতন অপরের সমস্ত স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে—ফরাসি সভ্যতার গায়ে কেউ হাত দিতে গেলেই সে মরবে। অথচ ফরাসি সবাইকে নিজের রূপে মাত করে রাখবে। একবার যে এই শহরে পা দেবে সে আর পুরোপুরি ইংরেজ, ইতালিয়ান, আমেরিকান, বাংলাদেশী অথবা ইণ্ডিয়ান থাকবে না। আর দেখবি ইণ্ডিয়ানের ফরাসি ঘরণীদের—দূর থেকে ভীষণ মিষ্টি, ভীষণ নরম, কিন্তু কিছুতেই হজম হবে না, চিরকাল শুধু নিজে জাঁদরেল থাকবে না, স্বামীকে এবং ছেলেপুলেকে ফরাসি করে তুলবে। অথচ যে ইণ্ডিয়ান মেয়ে ফরাসি স্বামীর গলায় মালা পরিয়েছে তাকে দেখ, যতই তাদের ভাব হোক ফরাসি সভ্যতার গরম কড়ায় ফুটে ফুটে সে একেবারে গলে ফরাসি হয়ে যাবে।"

এবারে অদ্ভুত একটা কথা বললেন পাঁচুদা। "যে-বিদেশী ফরাসি হতে চায় না, তার এখানে অস্তিত্ব নেই, তিরিশ বছর থাকলেও।"

পাঁচুদা বোধ হয় নিজের কথা বলছেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন পাঁচুদা। বললেন, "তুই শুধু-শুধু দেশের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুঁজে বের করবার

চেষ্টা করে নিজেকে ফরাসি-সুখ থেকে বঞ্চিত করছিস। তোকে মনে রাখতে হবে, এটা আমেরিকা নয়, এখানে বাঙালিদের, ভারতীয়দের, বাংলাদেশীদের কোনো ভূমিকা নেই। যে-অঘ্রাণ ফরাসি সেন্টের গন্ধে ডুবে যায় না তার কোনো স্থান নেই এদেশে। তাই তুই এখানে একটু গভীরে প্রবেশ করলে পাবি শুধু নিঃসঙ্গতা, ভীষণ ব্যর্থতা অথবা ভীষণ দম্ভ। যার হারিয়ে যাবার ভয় থাকে সেই নিজের সংস্কৃতির দম্ভ দেখায়। কিন্তু ফরাসি হলো একেশ্বরবাদী—বহু সংস্কৃতির বহু দেবতায় তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।"

আমি এই ক'দিনে কার্যত পাঁচুদাকে এইভাবে দেখিনি। ফরাসির কাছে নিজের বউকে হারিয়েই কি পাঁচুদার এই মানসিকতা? একথা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা যায় না, জিজ্ঞেস করে লাভও নেই।

পাঁচুদা ধীরে ধীরে বিবেকানন্দনিবাসের সামনে পায়চারি করতে-করতে বললেন, "যদি তুই ধৈর্য ধরে এখানে খোঁজ খবর করিস তা হলে আমাদের অনেক ব্যর্থতার সন্ধান পাবি। আমেরিকায়, কানাডায়, এমনকি ইংলণ্ডে তুই যেমন নিজের দেশের লোকের সাফল্য খুঁজে পেয়েছিস, এখানে তেমন কোনো দাগ দেখতে পাবি না। অথচ কী আশ্চর্য, যারা এখানে দু'সপ্তাহও বসবাস করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছে তারা সারাজীবন ফরাসির ভক্ত থেকে গিয়েছে। এই সভ্যতা পেটে হজম করবার নয়, শ্রেফ ফরাসি পারফিউমের মতো নাকে শুঁকবার।"

পাঁচুদা বললেন, "এই প্যারিসে একজন বাঙালি ছিল যে ফরাসি ভাষার ব্যাপারে ফরাসিকে লজ্জা দিতো। এই সভ্যতার নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়ে হঠাৎ তার পুরো ফরাসি হবার বাসনা হলো। বাঙালী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সে ফরাসিনীর পেছনে ছুটলো, কারুর কারুর সঙ্গে শ্রেফ ফরাসি স্টাইলে খেলা করলো, কাউকে জীবনসঙ্গিনী করতে চাইলো। ফরাসি হওয়া যায় না এক জন্মে। ফরাসির পেটে যত মদ গঙ্গাজলের মতন হজম হয়ে যায় তত মদ একসঙ্গে দেখলে বাঙালীর পেট ফুটো হয়ে যাবে। গাই দুধের জন্য যে পেট তৈরি হয়েছে সেখানে অতো অ্যালকোহল সহ্য হবে কী করে? ফলে ঘরসংসার নষ্ট হলো, ফরাসি সঙ্গিনী সরে পড়লো। চাকরি গেলো, চরম দারিদ্র্য ও শারিরিক অসুস্থতা একসঙ্গে আক্রমণ করলো তাকে। সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গতা ও অপমানবোধ।

"তারপর যা হয়, একদিন মনের ও শরীরের সমস্ত জ্বালা শান্ত করবার জন্যে সে নদীতে ঝাঁপ দিলো সবার অলক্ষ্যে। শ্যেন নদীরও ফরাসি মেজাজ, সে বাইরের সভ্যতাকে গ্রহণ করলো না, ফিরিয়ে দিলো জলে ডুবে ফুলে ঢোল হওয়া এক ভারতীয়কে। তারপর চাঁদা করে সৎকার হলো, সৎকারের ব্যাপারে ইজ্জত হারাতে চায় না কোনো দেশের অনাবাসিরা।

"এই ছেলেটাকে নিয়ে ভাল একটা গল্প লেখা যেতো, যদি-না সে আত্মহত্যা করতো, আত্মহনন দিয়ে যেসব গল্প শেষ হয় তা সেকেলে। 'বরং তুই আমার কথা বিবেচনা করিস। আমি টিকে আছি, আমি মদ খাই না, মেয়ে মানুষের পিছনে ছুটি না, কিন্তু আমি হেরে গিয়েছি। ফরাসিরা আমার ঘরসংসার নষ্ট করেছে, কিন্তু আমি সারেণ্ডার করতে রাজী নই। কারণ, আমি জানি, আমি জিতবোই। তুই দেখিস, তোর বউদি একদিন ভুল বুঝতে পারবে। ফরাসিতে অরুচি ধরে যাবে, আবার সে ফিরে আসবে।"

পাচুদা ভীষণ নিঃসঙ্গ। অনেক অনুরোধ করলাম আরও কিছুক্ষণ থেকে যান, কিন্তু সম্বিত আসবার আগেই তিনি টুক করে সরে পড়লেন।

সম্বিৎ এসেছে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। ওর ওপর নির্ভর করা যায় ভীষণ ভাবে। আজ কিন্তু ওর মুখটা একটু গম্ভীর। কারণটা সে বলছে না।

আমি এসে শহিদনগরের মার্সেডিজে আসন গ্রহণ করেছি। সেখানে ১৯০০ সালে বিশ্বমেলা বসেছিল তা কিছুটা দেখা গেলো। তারপর সম্বিৎ জিজ্ঞেস করলো, "আর কি কি দেখার ইচ্ছে আছে দেখে নিন।"

আমি ব্যাপারটা তখনও বুঝিনি। আমি জানি এখনও দিন দশেক হাতে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু দেখে আমার সঞ্চয়ের ঝুলি পূর্ণ করে নেওয়া যাবে। সম্বিৎ বললো, "কোনো বড় রেস্তোরাঁ বা হোটেল দেখার ইচ্ছে আছে!" হোটেল রেস্তোরাঁ তো গুলে খেয়েছি সারাজীবন ধরে সেই শাজাহান হোটেলের দিন থেকে। গরিবের ছেলে হয়েও অনেক বড়লোকী দেখে নিয়েছি নিজের চোখে, এখন একটু গভীরে প্রবেশ করতে চাই। পৌঁছতে চাই ফরাসি সভ্যতার শিকড়ে।

গাড়ি ঘুড়িয়ে নিয়েছে সম্বিৎ। আমরা একটা বিশাল পার্কের মধ্যে দিয়ে চলেছি। বিবেকানন্দ ভবনের খুব কাছেই, পায়ে হাঁটা পথ। পার্ক নয় তো, ছোটোখাটো অরণ্য বলা চলে। এখানে আলো জ্বলছে, তবু কোনো কিছুই যেন স্পষ্ট নয়।

পার্কে ল্যাম্পপোস্টের তলায় তলায় অথবা গাছের তলায় তলায় অদ্ভুত ধরনের কিছু মানুষকে দেখা গেলো। কেমন বিচিত্রভাবে এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সম্বিৎ বললো, "আপনি লেখক মানুষ, আপনার জেনে রাখা ভাল। সুন্দর এই অঞ্চলটা সন্ধ্যার সময় বিচিত্র ধরনের পতিতালয়ে পরিণত হয়। দুনিয়ার বিকৃত রুচির মানুষ এইড্সের ভয়, অন্য অসুখের ভয় তোয়াক্কা না করে এখানে চলে আসে কামনার নিবৃত্তির জন্যে। দূর থেকে এদের রমণী বেশ্যা মনে হলেও এরা এক বিচিত্র জীব। এদের পুং-রমণী বলতে পারেন—শরীরের ওপর নানা

শাসন করে, নানা হরমোন এবং সিলিকোন ইঞ্জেকশন নিয়ে সুপুরুষ এখানে নারীরূপ ধারণ করে বেপরোয়া এক পুরুষসমাজের রোগের নিবৃত্তি করতে।” ইংরিজি শব্দটা হলো ট্রানসভেস্টাইল। এরা রমণীর মতন স্কার্ট পরে, মোজা পরে, গহনা পরে, কিন্তু এদের যারা খরিদ্‌দার তারা জানে কীসের সন্ধানে এখানে আসে।

আমি স্তম্ভিত। নানা বিকৃতির কথা শুনেছি এবং পড়েছি, কিন্তু এমন বিশাল আয়োজনের কথা কখনও শুনিনি। একটা নয় দুটো নয়, শত শত পুং-রমণী এখানে পুলিশের নাকের ডগার সামনে নিজেদের পসার সাজিয়ে বসেছে। এরা এসেছে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে—ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলা, পেরু, নিকারাগুয়া, আর্জেন্টিনা, ইকুয়াডোর, কলম্বিয়া, খোদ ফরাসি এখন এতো সস্তায় নিজেদের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করতে রাজী নয়, তাই বিদেশীদের হাতে ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছে। সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছে, দু'একজন ইণ্ডিয়ানেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এই দলে। এদের অনেকে দিনের বেলায় ছাত্র। অনেকে দরিদ্র ভাইবোনকে বাবা-মাকে টাকা পাঠায়।

যা শুনলাম তাতে মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। রমণী সমাজের এই বৃহন্নলারা পশ্চিমের হাইটেক মেজাজ আয়ত্ত করে নিয়েছে অনায়াসে। এরা পায়ে হেঁটে এসে অসহায়ভাবে রাতের অতিথির জন্যে অপেক্ষা করে না। এদের সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট ভ্যান, যার পিছনটা হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সের মতন। এদের সঙ্গে থাকে নানা রকমের ইঞ্জেকশন, অতিথির আনন্দবর্ধনের জন্যে। আর ভ্যানিটি ব্যাগে থাকে মিনি সাইজের টিয়ার গ্যাস ক্যান। এই গ্যাস প্রয়োজন হয় বেপরোয়া দজ্জাল খরিদ্দারের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে।

দেখলাম, একজনের সঙ্গে রয়েছে ছোট একটি কুকুর—পেট পুড্‌ল। লোম ভর্তি, একটু আদর পাবার জন্যে মনিবের পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করছে।

শুধু সভ্যতা নয়, বিকৃতির বিশ্ব-রাজধানী রূপেও বিচিত্রভাবে বেঁচে রয়েছে প্যারিস। আমাদের চোখের সামনেই দামী-দামী গাড়ি আসছে। দরদস্তুর হচ্ছে, তারপর খরিদ্দারকে নিয়ে বনানীর মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে বিক্ষত শরীরের পুং রমণীরা।

ক'দিন আগেই নাকি মর্মস্পর্শী এক বিবরণ বেরিয়েছে ফরাসি ম্যাগাজিনে—চরিত্রটির নাম লুলু। জন্ম হয়েছিল ব্রাজিলে, দুই ভাইয়ের এক ভাই। তারপর ভাগ্যের পরিহাসে ফ্রেডারিক হয়েছে লুলু—সহ্য করতে হয়েছে অস্ত্রোপচার। এখন খোদ প্যারিসে লুলুর প্রতিপত্তি অনেক। এক রাত্রে দশ হাজার ফ্রাঁ দেন এমন ফরাসী ভক্ত আছে লুলুর। লুলুর সাক্ষাৎকারটা পড়ে বিশ্বাস হয় না। তার নিঃসঙ্গতা আছে, কিন্তু দুঃখ নেই। লুলু বলেছে, “যখন আমি দেখি পুরুষ ও রমণী

হাতধরে রাস্তা ধরে চলেছে তখন আমি অহংকারে ভুগি, কারণ একমাত্র আমার মধ্যে দু'জনেরই অর্ধেক অস্তিত্ব রয়েছে।"

আমি বললাম, "গাড়ির গতি বাড়িয়ে দাও সম্বিৎ। প্রদীপের তলার অন্ধকার দেখার জন্যে সময় খরচ করে লাভ হবে না। আমি কাগজপত্তর যোগাড় করে নিয়েছি, কিন্তু প্রয়োজন হবে না আমার।"

শুনলাম পুলিশ আজকাল লোক দেখানো অভিযান চালায়। দু'একজন হাজতে ঢোকে, আবার বেরিয়ে আসে। এইডস্ সম্বন্ধে এতো কিছু বেরোয়, তবু মানুষের দুর্মতি দূর হয় না।

আমার খারাপ লাগলো, ভারতীয়দের উল্লেখ দেখে। চেষ্টা চরিত্র করলে, তাদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতো, দু'একটা কথাও বলা যেতো, কিন্তু ওসবে কী হবে? বিদেশে নিজের মানুষের সর্বনাশ দেখবার জন্যে আমি পথে বেরোইনি। আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এতো দূরে এসেও দেশটাকে ভুলতে পারি না, সারাক্ষণ শরীর ও মনটাকে লেপ্টে জড়িয়ে থাকে দুঃখিনী জন্মভূমির কথা। কিছুই ভাল লাগে না।

"সম্বিৎ, চলো একটা গীর্জায় যাই। গোরু কাউকে ঠকায় না, দেওয়াল মিথ্যে কথা বলে না, মানুষ ওইসব করে, আবার এই মানুষই দেবতা হয়ে ওঠে, এই ধরনের কী একটা কথা ইস্কুলে সুধাংশুবাবুর কাছে শুনতাম।"

গীর্জায় এলাম আমরা। ভিতরে কী হচ্ছে কে জানে। কিন্তু বাইরেও ভক্তের ভিড়। একটা লোক যন্তর নিয়ে উদাত্তস্বরে গান গাইছে—মাতা মেরীর বন্দনা। ভক্তিরসে ডুবে রয়েছে লোকটা, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ঈশ্বরের চরণে নিজেকে নিবেদন করতে চাইছে, যেমন চায় আমাদের দেশের কীর্তনিয়রা।

সম্বিৎ জিজ্ঞেস করছে, "কী অতো ভাবছেন?"

"বড় অদ্ভুত দেশে আমাকে নিয়ে এসেছো, সম্বিৎ। এখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। ভোগ চাও, ত্যাগ চাও, বন্ধন চাও, মুক্তি চাও, কদর্যতা চাও, সৌন্দর্য চাও, নরক চাও, স্বর্গ চাও, সব তোমার হাতের গোড়ায় রয়েছে। তোমার ইচ্ছেমতো তুমি তুলে নাও, কেউ তোমার ব্যাপারে নাক গলাবে না।"

সম্বিৎ চুপ করে রইলো, কিছু বললো না। আমি বললাম, "বাকি ক'টা দিন আমি ফরাসির আয়নায় নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করবো। অনেক আমেরিকান এই প্যারিসে বসে নিজের দেশকে আবিষ্কার করেছে, আমারও ভীষণ ইচ্ছে ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়ার। নিজের দেশে যখন থাকি তখন মাঝে-মাঝে ভারতবর্ষ হারিয়ে যায়, কোথাও তার হদিশ পাই না।"

আমরা এবার একটা কাফের সামনে হাজির হলাম। কিন্তু সম্বিৎ বললো, "আপনাকে মস্ত জায়গায় নিয়ে যাবো। এখানকার দুর্দান্ত রেস্তোরাঁ ক্যাসেরোল,

অভিজাতদের শেষ কথা। ওখানে আঁদ্রে মলরো নিয়মিত আসতেন। ওখানে আপনাকে মস্ত সম্মান দিতে চাইছে রেস্তোরাঁর মালিক। লেখক ও শিল্পীকে সম্মানিক সভ্য করে নিয়ে ওরা সম্মান দেখায়, আপনিও আজ সভ্য হবেন।" এসব সভ্য হওয়ার কোনো মানে হয় না, কিন্তু তবু কেউ যখন সম্মানের কথা তুলেছে তখন মন্দ কী? ভাল জিনিসের ভেকও ভাল।

ওইখানে বসে হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো। দেখলাম রেস্তোরাঁ বাড়িটার ছাদ সরে গিয়ে আকাশ উঁকি মারছে। নীল আকাশ, সেখানে অনেক তারা, ফরাসি তারা কিনা বলতে পারবো না, অথবা তারার কোনো জাত থাকে না, আমরা যে মাটি থেকে তাদের দেখি সেই দেশের তারা বলে মনে করি। সম্বিৎ বললো, "এইটাই এই রেস্তোরাঁর বিশেষত্ব—ইচ্ছে হলেই ছাদ সরিয়ে আপনাকে বিশ্বভুবনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।"

আমরা যে-টেবিলে বসেছি সেইখানেই নিয়মিত সময় কাটাতেন বিশ্ববিখ্যাত লেখক আঁদ্রে মলরো। আমি ওঁর লেখার ভক্ত, প্রকৃতই বিশ্বনাগরিক ছিলেন, বিশ্ব ইতিহাসের ধারাটুকু ছিল নখাগ্রে। তবু প্রচণ্ড ফরাসি ছিলেন ভাবে ও চিন্তায়।

আমি বললাম, "সম্বিৎ, ভোগের দিগটা আর দেখবো না। অতীতের দিকেও তেমন আর নজর দেবো না। বাকি ক'টা দিন আমি ভবিষ্যতের সঙ্গে মুলাকাত করবো। বিশেষ করে বিজ্ঞানের সঙ্গে, প্রযুক্তির সঙ্গে। কেমনভাবে দুম করে ফরাসি আবার বিশ্বসভায় নিজের জন্যে সম্মানের আসনটা ফিরে পেলে তা খোঁজ করবো। তোমার ছেলে সৈকত অনেক খোঁজখবর রাখে। জন্মেছে ফরাসি দেশে, এখানকার আকাশ-বাতাশ থেকে ষোলো বছর নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েও চমৎকার বাঙালিভাব রক্ষে করছে। বাঙালিকেও ভালবাসে, ফরাসিকেও ভালবাসে। ও আমাকে লিস্টি দিলো, দুনিয়ার অনেক বড় বড় আবিষ্কারই ফরাসি, কিন্তু দুনিয়া তা জানে না। যেমন বাষ্পীয় জাহাজের আবিষ্কারক ফরাসি। প্রথম এরোপ্লেন উড়িয়েছিলেন এক ফরাসি নৌসেনা ১৮৭৪ সালে। সেলাইকল বার করেছিল ফরাসি, ক্যামেরা আবিষ্কার করেছিল ফরাসি, বইসাইকেল আবিষ্কার করেছিল ফরাসি চলচ্চিত্র আবিষ্কার করেছিল ফরাসি, অন্ধদের পড়ার ব্যবস্থা ব্রেল আবিষ্কার করেছিল ফরাসি, গানে রেকর্ডিং প্রথম করেছিল ফরাসি এবং আরও কত কি। ঐসব আমাকে একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সম্বিৎ। আমাদের মুক্তি তো ঐ পথেই, ভক্তিতে মজে থেকে তেমন কিছু তো হলো না।"

সম্বিৎ এবারে খবরটা দিলো, কলকাতা থেকে টেলিফোনবার্তা এসেছে, কর্মক্ষেত্রের জরুরি প্রয়োজনে আমাকে এখনই দেশে ফিরতে হবে।

"এ কেমন করে হয়? সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অর্ধে এলেন, আর সবে অক্টোবরে

পা দিয়েছি আমরা। আরও দু'সপ্তাহ আপনার থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পুরো একমাস থাকবেন ছাত্রের মতন, আর শেষ তিনদিন ট্যুরিস্টের মতন। মাথায় তখন কোনো চিন্তা থাকবে না, এমনকি লেখারও। একটু উদ্দামভাবে ফরাসিকে না দেখলে দেখাটা সম্পূর্ণ হতে পারে না।"

ওইখান থেকেই স্বদেশে ফোন করা গেলো। কিন্তু কোনো উপায় নেই, দেশে ফিরতেই হবে। কর্মক্ষেত্রের বন্ধন মানলেও মুশকিল, না মানলেও মুশকিল। সাধে কি বিমল মিত্র বলতেন, দাসত্ব থাকলে জাত লেখক হওয়া যায় না। শ্যামুয়েল বাটলারের সেই বিখ্যাত উক্তি ভদ্রলোক কতবার শুনিয়েছেন : "ইণ্ডিপেনডেন্স ইজ এসেনশিয়াল টু পার্মানেন্ট বাট ফেটাল টু ইমিডিয়েট সাকসেশ।"

তড়িৎ গতিতে কাজ হলো। বাংলাদেশ বিমানের বাঙালি ম্যানেজারের দয়ায় বিমানেও তড়িঘড়ি একটা সীট পাওয়া গেলো। মনে হলো, যে থাকতে চায় না ফরাসি তাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিতে তৎপর।

এয়ারপোর্টে সম্বিৎ, কাকলি ও সৈকত এসেছিল। আর এসেছিলেন বাঘাযতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ফরাসি স্ত্রী। ওঁদের সঙ্গে অনেক কথা বাকি রয়ে গিয়েছে।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, "একবার এলে ফরাসিকে বোঝা যায় না।"

বিমানের বাংলাদেশী ম্যানেজার রসিকতা করলেন, "বিপদটা হলো, দু'বার দেখলে ফরাসিতে মজে না এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি।"

হিসেব করে দেখলাম, কথাটা মিথ্যে নয়। অমন যে অমন বিবেকানন্দ, চারবার এসেছিলেন এবং মজে গিয়েছিলেন।

সৈকত চিন্তিত হয়ে উঠলো। বললো, "আপনি মজবেন, আবার মজবেন না। তার মানে এবার যা দেখলেন তা ঝট করে লিখে ফেলে আবার চলে আসুন। তারপর নিজের লেখার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের দেখাটা মিলিয়ে নেবেন।"

সম্বিৎ বললো, "এই রকম ঝপ করে কোনো চলচ্চিত্র শেষ করা যায় না। গোড়ায় ও মধ্যিখানে যতই কাট অথবা জাম্প কাট থাকুক শেষে একটা ফেড আউট প্রয়োজন। আপনার এই চলে যাওয়াটা 'দ্য এণ্ড' নয় এটা স্রেফ বিরতি। আপনাকে আবার আসতে হবে।"

ফরাসি দেশের মাটি ছেড়ে বাংলাদেশ বিমানে আশ্রয় নিয়েছি। দূর থেকে সম্বিৎকে দেখতে পাচ্ছি। সে হাত নাড়ছে।

যাবার আগে কাকলি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, "কী দেখলেন, শংকরদা?"

"মানুষের মহাতীর্থে এসেছিলাম---মহাতীর্থে যাত্রীরা যা দেখে এসেছে চিরকাল তাই দেখে গেলাম এই ক'টা দিনে।"

কাকলি প্রশ্ন করেছিল, "তা হলে শেষ কথাটা কী?"

আমি বললাম, "যা দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর বই পরিব্রাজক শুরু করেছিলেন সেইটাই বোধহয় আমার শেষ কথা—নমো নারায়ণায়।"

বাংলাদেশ বিমানের সীটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলে পকেটের ডাইরিটা বের করলাম, লিখলাম, 'নমো নরদেবায়। নমো নারায়ণায়।"

মহামানবের সাগরতীর ভারতবর্ষ থেকে এই মানবসাগর তীরে না এলে এই মানবজীবন সত্যিই অপূর্ণ থেকে যেতো।

ঘরছাড়া দিকহারা

স্বদেশে বসে বিদেশের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির কথা এবং বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সারাক্ষণ দুঃখিনী স্বদেশের চিন্তা করাটা আমার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এক রমণী চরিত্রের উল্লেখ ছিল যে শ্বশুরবাড়িতে অত্যধিক বাপের বাড়ির প্রশংসা করায় অচিরেই পিত্রালয়ে প্রেরিতা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও সারাক্ষণ শ্বশুরালয়ের প্রশংসায় ব্যস্ত থাকায় সে পিত্রালয়েরও প্রিয় হতে পারেনি।

আমার অবস্থা প্রায় একই রকম। এসেছি ফরাসি দেশে, খ্যাতনামা ফরাসি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে, কিন্তু মানবসভ্যতার পীঠস্থান পারির কিছুই তেমনভাবে আমাকে টানতে পারছে না।

প্যারিসের বাইরে ভুবনবিদিত এক প্রাচীন শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়েছিলাম, সেখানেও বিরাট বইমেলায় তিন প্রজন্মের ফরাসি আমার ফ্রান্সে প্রকাশিত উপন্যাসে স্বাক্ষর নেবার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তবু মনে হচ্ছিলো আমার শহর কলকাতার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ কি তাঁদের ভালো লাগবে? আরও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, পাশ্চাত্যের এই নবলব্ধ প্রাচ্যপ্রীতির পিছনে কোন্ অভাব বা কোন্ কৌতূহল কাজ করছে? আমরা কেমন করে আশ্চর্য এই জাতের সমস্ত কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবো?

সেবার আমেরিকায় এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। সুযোগ ছিল নায়াগ্রা জলপ্রপাত দর্শন করার। অথচ সেইসময়ে এক অপরিচিত অনাবাসী ভারতীয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশায় ভেবে-চিন্তে আমি ওই অনাবাসীর কাছেই গেলাম। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য মাথায় রইল সাময়িকভাবে। এর কারণ ভারতবর্ষ দূর থেকে আমাকে টানছে, আমি আমার জন্মভূমির মোহিনী মায়াপাশে বন্দি হয়ে পড়েছি। গতবার প্যারিস প্রবাসী ডিজাইনার সম্বিৎ সেনগুপ্তর পাঠানো টিকিটের দৌলতে মানুষের মহাতীর্থ প্যারিসে এসেও একই অবস্থা হয়েছিল—একজন বাঙালি চরিত্রের সন্ধান করতে গিয়ে আইফেল টাওয়ারই দেখা হলো না। এমনই লজ্জার ব্যাপার যে কাউকে বলতে পারি না যে দু'দুবার প্যারিসে এসেও আইফেল টাওয়ারে যাবার সময় আমার হলো না।

এবারে আমার জাঁদরেল অবস্থা, এর আগের বার কাঁচরাপাড়ার প্রাক্তন রিফিউজি সম্বিৎ ছিল ব্যারন দ্য শহীদনগর, আর হাওড়ার হরিদাসপাল আমি ডিউক অফ কাসুন্দিয়া—ঢাল নেই, তরোয়াল নেই দুই নিধিরাম সর্দার। থ্যাংকস টু দি প্রবাসী বেঙ্গলি, সেবার ভারিক্কিচালে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি হোটেলের সবচেয়ে দামি সুইটেও কিছুক্ষণ সময় কাটানো গিয়েছিল। এই সুইটে রাজরাজড়া ধনকুবের এবং চিত্রতারকাদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করতে গিয়ে বারবার ছায়া পড়ছিল হাওড়া চৌধুরীবাগান লেনের কানাগলিতে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের ঘরটার, যার ছাদ ফুটো, জানলার রেলিঙ ভাঙা, দরজার পাল্লা বহুদিন অদৃশ্য এবং ঘরে উঠতে গেলে একটা নড়বড়ে সিঁড়ি অতি সাবধানে পর্বত আরোহীর নিপুণতায় ব্যবহার করতে হয়।

এবারে আমি একজন কেউকেটা। মেড-ইন-বনগ্রাম, প্যাক্‌ড্ ইন হাওড়া-কাশুন্দে—এসব ইতিবৃত্ত চেপে রেখে স্রেফ বলতে পারি আমি একজন রাইটার, খোদ ফরাসিরা ইচ্ছে করলে মূল্যবান ফ্রাঁ খরচ করে প্যারিসের প্রখ্যাত প্রকাশন সংস্থা থেকে আমার সাহিত্যকর্মের নমুনার সঙ্গে এবং আমার সারস্বত সাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। ভায়া ফরাসি রাজদূত ইন ইন্ডিয়া, তাবড় তাবড় বঙ্গীয় লেখকবৃন্দের সঙ্গে আমি এক্স-এন প্রভিসের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে এদেশের নিমন্ত্রিত অতিথি। আতিথেয়তার বহর দেখেই বোঝা যায় কেন ফরাসিরা দুনিয়ার সেরা জাতের একটা হয়েছে, কেন বিবেকানন্দ থেকে সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত সবাই ফ্রেঞ্চ বলতে 'ইগনরান্ট' অর্থাৎ অজ্ঞান!

কিন্তু মহাশয়, আমি ফরাসি জাতের গুণকেত্তন শোনাবার জন্যে আজকে কলম ধরিনি, আমার লক্ষ্য বিদেশ বাসের দুঃখের কথা বঙ্গভূমির বঙ্গজনদের কাছে সবিনয়ে এবং সকাতরে নিবেদন করা।

অধমের নিবেদন, ফরাসি দেশে ভারিক্কিচালে চযে বেড়ানো, লেকচার দেওয়া, সুন্দরী সুন্দরী ফরাসিনীর খাতায় অটোগ্রাফ দেওয়া ইত্যাদির ধারাবিবরণ আত্মপ্রচারের অপরাধে পড়বে। আমি শুধু বলবো, ফরাসি দেশে যদি আসতেই হয় তাহলে আর্টিস্ট হয়ে এসো, রাইটার হয়ে এসো, ফিলজফার হয়ে এসো—ফরাসি তোমার সেভেন মার্ডার ক্ষমা করে দেবে। শিল্পীকে প্রশ্রয় দিতে এবং মাথায় তুলতে এ জাতের তুলনা নেই।

ফরাসি দেশ বিজয় করতে করতে এরই মধ্যে টুক করে দুটো রাতের জন্যে লন্ডন ঘুরে এসেছি। পুরনো প্রভুদের সেলাম জানানো এবং সেইসঙ্গে একটু এপার বাংলা ওপার বাংলার যোগসূত্র খুঁজে বেড়ানো। গঙ্গা এবং পদ্মা এখনও আমাদের মধ্যে দূরত্ব রেখেছে, কিন্তু টেমসের তীরে বেঙ্গলিরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, যদিও শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবরা নাম দিয়েছে ব্ল্যাকি। আরে হতভাগারা, 'কালো যদি মন্দ তবে

চুল পাকিলে কান্দ কেনে?' বুঝবে বাছা বুঝবে, যখন বয়স বাড়বে দাঁত নড়বড় করবে এবং সেইসঙ্গে চুল সাদা হবে, তখন কালোর মর্ম বুঝবে! আরে বাছা, সৃষ্টির আদিতে কালো, অন্তে কালো, মধ্যিখানে সূর্যের লণ্ঠনে মহাবিশ্বে সামান্য আলো হয়েছে। দার্শনিকদের জিজ্ঞেস করে দেখো।

এবার আটচল্লিশ ঘণ্টায় লন্ডনে সোনার খনির সন্ধান পেলাম। ইচ্ছে হলো, ঘর-সংসার ছেড়ে মুজাহির অর্থাৎ স্বেচ্ছানির্বাসিত হয়ে কিছুদিন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে ওঁদের আবিষ্কার করি। বাংলাদেশের বাঙালিরা অনেকদিন আমার হৃদয় হরণ করেছে—বেশি বয়সের প্রেম! ঘোর কাটিয়ে ওঠা বড়ই কঠিন কাজ। এই যে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়া, এই যে ভালোবাসার দাপটে অন্যসব কিছু তুচ্ছ হয়ে ওঠা, এর পিছনে রয়েছে এক সিলেটি গবেষক-ঐতিহাসিক যাঁর নাম নুরুল ইসলাম।

বিনীত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত এই মানুষটি একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। লন্ডনে সিলেটিদের এক সভায় আমার কাছে এসে, আমাকে তাক লাগিয়ে দিলেন। হাতে একখানা অভিধান সাইজের বাংলা বইয়ের মোড়ক ধরিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বললেন, আমার কোনো একটি রচনা তাঁকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছে এই বই রচনায় এবং যথাস্থানে তা স্বীকৃত হয়েছে।

আমার লেখা পড়ে কারুর কারুর বাংলা সাহিত্যে অরুচি ধরে গিয়েছে তা স্বদেশে বিভিন্ন সূত্র থেকে শুনেছি, কেউ কেউ আমার কোনো লেখা নেই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরেই শারদ সংখ্যা ক্রয় করেন একথাও বন্ধুরা বলে থাকেন। কিন্তু সুদূরপ্রবাসের কোনো বঙ্গসন্তানকে সুবৃহৎ এই রচনায় অনুপ্রেরণা দান!

এই অপকর্মটি আমি কেমনভাবে করলাম তা জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সিলেটি এই গবেষক নুরুল ইসলামের জন্ম ১৯৩২ সালে, কিন্তু দেখলে অনেক কম মনে হয়। প্রবাসের সভায় সামান্য ভিড় ছিল, তারই মধ্যে বিরাট বাংলা বইটি বগলদাবা করলাম। লেখক সুযোগ বুঝে সবিনয়ে কিছু কথা বললেন। সেইসব কথা আমার মধ্যে অনেকদিন জড়ো হয়ে আছে।

বিদেশের মাটিতে স্বদেশের ভাষায় বই উপহার পাওয়ার মধ্যে কী আনন্দ আছে তা সকলকে বোঝানো কঠিন। আকারে বৃহৎ বই, আমার ব্যাগটি নিতান্তই ছোট। যা নিজে বহন করতে পারবো না তা প্রবাসের পথে নানা বিঘ্নের কারণ হতে পারে জেনেই এই ছোট্ট ব্যাগ নির্বাচন করে এনেছি। তবু নুরুল ইসলামের বইটি আমার অমূল্য সংগ্রহের অংশ হয়ে দাঁড়াল। লন্ডনে বসে এবং লন্ডন থেকে প্যারিসের দ্যগল বিমানবন্দরে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে ঘুরতে ঘুরতে এই বইয়ের যত অংশ পড়েছি ততই বিস্মিত হয়েছি।

প্যারিসের মতো শহরে ভেতো বাঙালিকে কে আর কল্কে দিচ্ছে? কিন্তু ধন্যি এই ফরাসি জাত, গুণের সমাদর করবার জন্যে গত দু'শ বছর ধরে সারাক্ষণ উঁচিয়ে আছে।

ফরাসি যা কিছু করে তা নিজস্ব স্টাইলে করে। নিজের ভাষায় বইমেলা যখন করে তখন তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশ বা ভাষার সাহিত্যকে নিজের দোসর করে নেয়। কারা এই দোসর হবার যোগ্য তার জন্যে অনুসন্ধান চলে সারা বছর ধরে। এবছর তাঁরা বেছে নিয়েছেন বাংলাকে। ফরাসি জানে স্রেফ লেখা পড়ে সুখ সম্পূর্ণ হয় না, যদি না চোখের সামনে গোটা কয়েক লেখক জলজ্যান্ত ঘুরে বেড়ান। অতএব নিয়ে এসো আধডজন কবি, গল্প লেখক, প্রবন্ধকারকে তাঁদের স্বক্ষেত্র থেকে।

অতিথিদের আদর-যত্ন করো, কিন্তু সামনাসামনি বসিয়ে চোখা চোখা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে লজ্জা পেয়ো না। এই হচ্ছে ফরাসির স্বভাব—লেখককে বাজিয়ে নিতে ভীষণ ভালোবাসে। স্রষ্টাকে মুখোমুখি পেলে তোমার সমস্ত সন্দেহের নিরসন করিয়ে নাও। নির্জলা প্রশস্তির অর্থ যে লেখককে অপমান করা তা ফরাসি বহুবছর আগেই আবিষ্কার করেছে। এমন হয়েছে বলেই তো ইউরোপে সাফল্যের সিংহদ্বার এই ফরাসি দেশ। ফরাসি যাকে প্রবেশের গেট পাশ দিলো সমস্ত ইউরোপ তার দখলে।

বাংলাকে স্বীকৃতি দিয়ে ফরাসি এবার মস্ত সম্মান দিয়েছে বাঙালিকে। এসম্মান আড়াইশ বছরের মধ্যে ইংরেজ কখনও দিতে পারলো না, কারণ তার সে দিল নেই, তার ধারণা ইংরিজির বাইরে কোনো সভ্যতা নেই, ভাষা নেই, এমনকী আড়ালে-আবডালে ফরাসিকেও ওরা ভ্যাংচায়। ফরাসিদের স্টাইল অন্য। তারা দুনিয়ার যেখানে ভালো কিছু আছে তার স্বাদ নেবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে। তারা তোমাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে নিয়ে গিয়ে গলায় মালা দিলো, প্রশস্তি গাইল, রাজসম্মান দিলো, প্রঁভসের খোদ হাইকোর্ট ভবনকে তোমার সম্মানে সাময়িকভাবে সাহিত্যভবনে রূপান্তরিত করলো। কিন্তু সেইসঙ্গে তলে তলে তোমার মাপজোক নিতে শুরু করলো। যাচাই না করলে লেখকের অসম্মান হয় একথা জানে সুরসিক ফরাসি। অথচ তোমার রাগ করার উপায় নেই। পৃথিবীর আর কোথায় সাহিত্যিকের সম্মানে রাজদ্বারে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান হতে পারে? বিশালপুরীতে একই সঙ্গে চলেছে ন্যায়বিচার ও সাহিত্য বিচার। যাকে রসবিচারও বলতে পারেন।

এইসব সেরে প্যারিসে ফিরে এসে আবার সাহিত্য সভা। বাংলার বাঘা বাঘা লেখক-লেখিকাদের মঞ্চে বসিয়ে এবার রসের লিমিটেড ওভার টেস্ট ম্যাচ। বিষয়টিও দুর্দান্ত। গোপনে গোপনে খোঁজখবর নিয়েই বিদগ্ধ ফরাসি যে

আলোচনাসভা ডেকেছে তার বিষয় বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ। এই ডবল লাইফের অনুবাদ 'দ্বৈত জীবন' করা যেতো, কিন্তু ঠিক রসটা পাওয়া যেতো না। ডবল লাইফ বললে অনেক কিছুর ইঙ্গিত থাকে, এমনকী জেকিল হাইডের ভূমিকায় একালের বাংলার বুদ্ধিজীবী। দুমুখো দুই জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে বাঙালি লেখক কি থমকে দাঁড়িয়েছে? কী এই টানাপোড়েন? কেন তার দ্বৈতভূমিকা? এই দ্বৈতভূমিকা একেশ্বরবাদীরা কেন সহজে বুঝতে পারে না। এরই নাম কি কপটতা অথবা হিপক্রিসি? এবং আরও নানা গভীর প্রশ্ন।

বিশাল প্রেক্ষাগৃহে হাজির হয়ে আমি তাজ্জব! মফস্বলের বঙ্গীয় লেখকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন প্যারিসের বিশিষ্ট ফরাসি লেখকরা এবং প্রকাশ্য সভায় যে কোনো রসিকজন যে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারেন এই উন্মুক্ত বিচারসভায়। এই হচ্ছে ফরাসির ধর্ম—যাকে তাকে যে কোনো প্রশ্ন করার স্বাধীনতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখবেই ফরাসি। তবে ফরাসি মঞ্চ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে তোমাকে জেরা করবে না, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার কথা স্মরণে রেখে তোমাকে ভ্রাতার সম্মান দেবে। বুঝিয়ে দেবে তুমিও এখানে বসে আছো তার সঙ্গে।

সাধে কি আর দুনিয়ার সেরা জাতের রাজতিলক জুটেছে ফরাসির কপালে। ফরাসিকে দেখে প্রেমে না পড়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র ইংরেজ জাতের। খালের ওপারে বসবাস করেও এই সভ্যতার ছিটেফোঁটা ওদের সমৃদ্ধ করলো না। ফরাসির সাজগোজ, ফরাসির আতর আর ফরাসির রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু নেবার উদারতা ইংরেজের হলো না।

প্যারিসের সভাগৃহে একবার উঁকি মেরে আমি তাজ্জব। হলঘর বোঝাই! সায়েব মেম গিজগিজ করছে সুদূর দেশের বাঙালি লেখকদের দেখবার এবং শুনবার জন্যে। অন্যপ্রান্তে বাঙালি লেখকদের ফরাসি সংস্করণ কেনবার জন্যেও লাইন। সুরসিক ফরাসি এই বিষয়ে সজাগ—গাঁটের কড়ি খরচা করে একখানা বই কিনে লেখকের দস্তখত আদায়ের জন্যে সে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াতে রাজি। এমন গুণগ্রাহী নাহলে কি আর বড় জাত হওয়া যায়? এসব ট্রেনিং নিতে এক একটা জাতের শত শত বর্ষ কেটে যায়। সৃষ্টির জগতে অসামান্য হবার পথে ফরাসিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। তবেই না দুনিয়া তার কাছে মাথা নত করেছে।

আরও অবাক হলাম দর্শকদের আসনে কিছু বাদামি রঙের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করে। সভা আরম্ভ হবার আগে দু'জন সুসজ্জিত স্মার্ট তরুণ আমার কাছে এসে নির্ভেজাল বাংলায় বললো, "খবরের কাগজে দেখে বাংলা ভাষায় গৌরবের সাক্ষী হতে চলে এলাম।"

এই দু'জনই বাংলাদেশী। সেলিম (নামটা কাল্পনিক) বললো, "বাংলা ভাষা যে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ভাষা তা তো আমরা চিরকালই জানি ; কিন্তু ফরাসিরাও সেটা স্বীকার করল তা দেখবার জন্যে কাজ ফেলে চলে এলাম। এমন সুযোগ আবার কবে পাবো তা আল্লাই জানেন।"

প্যারিসের সাহিত্যসভা খুবই আকর্ষক হয়েছিল। নানা প্রশ্নে এঁরা বাংলার লেখক সমাজকে জর্জরিত করলেও উইকেট নিতে পারেননি। দক্ষ ব্যাটসম্যানের মতো কয়েকটি শক্ত প্রশ্নকে উল্কাবেগে বাউন্ডারিতে প্রেরণ করলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী ও সুনীল গাঙ্গুলি। এঁদের ভালো রান তুলতে সাহায্য করলেন ফরাসি ভাষাবিদ কলকাতার পুষ্কর দাশগুপ্ত।

ফরাসি দেশে মস্ত সুবিধে বাংলায় কথা বলা যায়। তুমি তোমার মতন করে কথা বলো, তারপর ফরাসিতে বুঝে নেবার দায়িত্ব আমার। এই সেতুবন্ধনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত মশাই তাঁদের অন্যতম। আলোচনাসভায় বোঝা গেল, ফরাসিরা আমাদের অনেক খবরাখবর রাখেন, সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে যেসব খোঁজখবর বিশেষ প্রয়োজন তা ফরাসি আগেভাগেই নিয়ে বসে। সাধে কি আর সারা দুনিয়া ফরাসিদের দিকে মুখ চেয়ে বসে আছে—ফরাসি যাকে কল্কে দিল সে তো দুনিয়ার প্রবেশপত্র পেয়ে গেল এক ঝটকায়।

বাঙালির যদি কোনোদিন পয়সাকড়ি হয়, তখন বাপধন আজে বাজে জায়গায় সময় নষ্ট না করে প্যারিসে দু'একটা আখড়া গড়ো। শুধু চিত্রকর নয়, বিশ্বসাহিত্যের লাইসেন্স পাওয়ার আগে প্যারিসপ্রবাস সব ভাষার লেখকদের পক্ষে আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। সাধে কি আর শ্যামচাচা এই প্যারিসে ইউনেসকোর সদর দপ্তর বসাতে বাগড়া দিয়েও সফল হয়নি। সাধে কি আর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্যারিসের প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠতেন। ফরাসিরা যে মস্ত জাত তা স্বীকার যে করবে না সে নিতান্তই ছোট জাত, অথবা হাড় হিংসুটে!

ফরাসির চোখে বাঙালি লেখকের ডবল লাইফ আজকের লেখার বিষয়বস্তু নয়। এর বিবরণ ধীরেসুস্থে অন্য কোনোসময়ে দেওয়া যাবে। কয়েকটা বাউন্ডারি পেটালেও তাবড় তাবড় লেখকদের উইকেট কীভাবে যাওয়ার দাখিল হয়েছিল ফরাসিদের বোলিং-এ তার বিবরণও স্বদেশবাসীর মুখরোচক হবে। তবে এই মুহূর্তে আমার নায়করা ফরাসি নন। তাঁরা নেহাতই দেশোয়ালি বঙ্গসন্তান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

মিটিঙের মধ্যেই সেলিম কয়েকবার মঞ্চে আমার উদ্দেশে স্লিপ পাঠিয়েছে। সে উৎসাহ দিয়েছে, "দাদা, দুর্দান্ত হচ্ছে! লড়ে যান! পিটিয়ে ফেলুন। এরা বুঝুক বাংলা সাহিত্য কত বড়! এরা, বুঝুক, ইংরেজ কীভাবে আমাদের চেপে রেখে

দিয়েছিল।"

আমি অবশ্যই উৎসাহিত বোধ করেছি, বিদেশের মাটিতে এমন স্বদেশি সমর্থন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

স্লিপের মাধ্যমে আবার ষড়যন্ত্র হয়েছে! "দাদা, প্যারিসে আপনাকে দেখাবার অনেক স্পেশাল জিনিস আছে।"

ফরাসি যেমন কাজ করে তেমন ভোগ করে। বেশি কাজটা ফরাসির কাছে এক ধরনের অশ্লীলতা। তাই সাহিত্যসভারও বিরতি থাকে, একটু পানাহার থাকে। পেটুক বাউনের মতন গোগ্রাসে গিলবার জন্যে ফরাসিরা আহার করে না, ঢক ঢক করে গলায় পানীয় ঢেলে মাতাল হওয়ারও ঘোরতর-বিরোধী এই ফরাসি। সবার মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্ন পরিমিতিবোধ হলো ফরাসির জাতীয় ধর্ম। পরিমিতিবোধ ফরাসি একবারই হারিয়েছিল যখন প্যারিসের রাজপথে গিলোটিন বসিয়েছিল অভিজাত মানুষের গর্দান নেবার জন্যে। তার ঠেলা সামলাতে ইউরোপের একশ বছর লেগে গিয়েছিল।

এখানে আজ একটু পানীয়ের সুব্যবস্থা আছে, তারপর আইফেল টাওয়ার দর্শনের বিশেষ সুযোগ। কিন্তু সেলিম আমাকে টানছে। একজন বাঙালির পক্ষে আইফেল টাওয়ারের থেকে শতগুণ আকর্ষণীয় কিছু সে আমাকে দেখাবে।

সুতরাং মূল সভার শেষে আমি চুপি চুপি কাটিতং। মুখ টিপে হেসে ফরাসি এইসব সহ্য করে। লেখক মানুষ, একটু নিয়ম এবং একটু সামাজিক ব্যাকরণ বিভ্রান্তিং, একটু ছটফটানিং, তো থাকবেই! সুতরাং কোনো লেখক কিছুক্ষণের জন্য সন্দেহজনকভাবে উধাও হলে স্থানীয় অভিভাবকরা তেমন কিছু মনে করেন না। দু'দশটি সুন্দরী সুরসিকা যদি স্রষ্টাকে ঘিরে না ধরলো তাহলে লেখক জীবনের হাঙ্গামায় যাবে কোন্ শর্মা?

অতএব আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছি সেলিমের সঙ্গে। সেলিম ছেলেটি বাংলা, ইংরিজি এবং ফরাসি তিন সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "বাঙালিরা কারও থেকে কম যায় না দাদা।"

"তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বাঙালিরা যেন তাদের হারানো গর্ব ফিরে পায়। আমাদের সাহিত্যকে আমরা তো বিদেশের পাঠকদের সামনে ঠিক মতন পৌঁছে দিতে পারিনি। অথচ এখন পাশ্চাত্যের পাঠকরা সুদূর দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠছে।"

সেলিম আমার খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। পরপর দু'দিন নিজের কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে সে আমার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্যারিসের গলিঘুঁজিতে।

সেলিমের জীবিকা অতি সাধারণ, প্যারিসের এক ট্যুরিস্ট অধ্যুষিত অঞ্চলে

একটা ছোট্ট পিকচার পোস্টকার্ডের দোকান আছে, সেখানকার কর্মী। ছোট্ট দোকানদারের ছোট্ট কর্মী বলতে পারেন। দোকানে কাজ করতে করতে হিমশিম খেতে হয়, "কিন্তু আনন্দ আছে দাদা। কত ট্যুরিস্টদের যে মুখ দেখি। এ এক আশ্চর্য শহর এখানে আসবার জন্যে সারা দুনিয়া উঁচিয়ে আছে। যে মানুষ প্যারিস দেখেনি তার মানবজন্মই বৃথা।"

তাই কিছু পয়সা জমলেই ট্যুরিস্টরা ছুটে আসে মানুষের এই মহাতীর্থে। প্যারিসে যত লোক বাস করে বছরে তার থেকে বেশি আসে ট্যুরিস্ট। গরিব-গুর্বো থেকে আরম্ভ করে কোটিপতিরা। সেইসঙ্গে আসে দেশবিদেশের পকেটমাররা। পশ্চিমের পকেটমার, তার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অন্য। তার নিজের পকেটে পাসপোর্ট, এরোপ্লেনের টিকিট, সে থাকে হোটেলে এবং ব্রেকফাস্ট সেরে নিজের প্রফেশনাল কাজে নেমে পড়ে। পড়তায় পোষায় বলেই বিদেশের পকেটমাররা এখানে আসে। নাহলে আসতো না, তারা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে রাজি নয়।

সেলিম বললো, "এখানেও অনেক বাঙালি পাবেন শংকরবাবু। বাঙালিদের কালচারই আলাদা। তারা গরিব বটে, কিন্তু চোর-জোচ্চোর-পকেটমারের দলে একজনও নেই। এইটাই আমাদের জাতের বৈশিষ্ট্য।"

ধীরে ধীরে সেলিম আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখালো। বললো, "প্যারিসের মেট্রোতে যত ফেরিওয়ালা দেখবেন তার বড় অংশ বাঙালি। এরা চুড়ি বেচে, ফিতে বেচে, টুকিটাকি জিনিস বেচে। অমানুষিক পরিশ্রম করে, তাই পেট চলে যায়।"

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দু' একজন দেশওয়ালির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সেলিম। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল এঁদের বিনয় ও ভদ্রতা দেখে। আরও অবাক হলাম, এঁরা স্বদেশে আমার বই পড়েছেন। একজন তো জিজ্ঞেস করে বসলেন, "সাজাহান হোটেলের স্যাটাদা এখন কোথায়?" আর একজন বললেন "জন অরণ্যের সোমনাথের জন্যে দুঃখ হয়। নিজের বন্ধুর বোনটাকে অপরের হাতে তুলে দিলো! একবার ভেবেছিলাম, আপনাকে লিখবো সোমনাথকে অত ছোট করবেন না, ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিন। চলে আসুক রোম অথবা প্যারিসে। আমরা ওকে দাঁড় করিয়ে দেবো।"

"বাজার কেমন?" সেলিম জিজ্ঞেস করলো।

"খুব-উ-ব ভালো। যা নিয়ে আসছি তা হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমাদের দাম দোকানের থেকে অনেক কম। লোকে জেনে গিয়েছে, বাংলাদেশিরা গরিব কিন্তু তারা ঠকায় না। মুশকিল হলো ওই পুলিশ। আজকাল ঘনঘন প্ল্যাটফর্মে হামলা চালাচ্ছে। গতকাল হল্লা করেছিল। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। কিন্তু আকবর এবং শাজাহান ধরা পড়ে গেল। রাত্রে ওদের খালাস

করে আনতে অনেক খরচ হয়ে গেল। এ মাসে বোধ হয় বাড়িতে টাকা পাঠানো যাবে না। সব উকিলের পেটে চলে যাবে।”

সিরাজ এরই মধ্যে জিজ্ঞেস করলো “ক'দিন আছি? গরিবের সঙ্গে দুটো ডাল ভাত খাবেন? সোনার দেশ, এখানে ডালভাতের কোনো অভাব নেই।”

সিরাজের মনে দুশ্চিন্তা। এখনই বোধ হয় আর এক দফা পুলিশ রেড হবে, “দেখে দেখে শুধু বাঙালিদের ধরে। আরবদের গায়ে হাত তুলবার সাহস নেই। এক জায়গায় আরবরা পুলিশকে ধরে এমন মেরেছে যে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। বাঙালিরা সাতে নেই, পাঁচে নেই। খদ্দেররাও তাদের ভালোবাসে। না হলে এত মাল আমরা বিক্রি করছি কী করে?”

সেলিম একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো, বললো, “আজ আর হাঙ্গামায় যাওয়া কেন? দু'নম্বর পেশায় মন দাও।”

দু'নম্বর শুনে সিরাজ হেসে ফেললো। “তাই যাবো। কিন্তু এখানে আরও কয়েকটা ফ্রাঁ বেচে দিয়ে। নাহলে ‘ক্যাপিট্যাল’ শর্ট হয়ে যাবে।”

সেলিম আমাকে নিয়ে আর একটা মেট্রোতে উঠলো। গাড়ি চলমান হলে বললো, “কে বলে বাঙালি পরিশ্রমী নয়, উচ্চাভিলাষী নয়? এইসব ছেলেরা দিনে কত ঘণ্টা খাটতে পারে তার হিসেব নেই। এরা ট্রেনে ভিড়ের সময় হকার। তারপর দু'নম্বর পেশায় পার্কের ধারে বাদামওয়ালা।”

বাদাম মানে চীনেবাদাম নয়। এর ডাক নাম নোয়া। ওরা পথে বেরিয়ে পার্কের ধারে এক বাদামওয়ালার কাছে আমাকে নিয়ে গেলো। তার ঠেলাগাড়িতে আগুন জ্বলছে এবং সেই আগুনে চীনাবাদামের ডবলসাইজের কালো খোলাওয়ালা বাদাম বালিতে ভাজা হচ্ছে এবং গরমাগরম ফরাসিদের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে। লোকে সেই বাদাম অথবা নোয়া খেতে খেতে পথ হাঁটছে।

দোকানের সামনে কয়েকজন যুবকযুবতীর ভিড়। সেলিমকে দেখেই লোকটি বললো, “এই যে দাদা একদম ভুলে গেলেন, দেখাই নেই! দেশের খবর কী?” কথাও চলছে, একই সঙ্গে কাজও চলছে নিপুণ হাতে।

আমার পরিচয় পেয়ে ছেলেটির চোখ বিস্ফারিত। “অ্যাঁ কী সৌভাগ্য আমার। আপনার ‘কেরাকটার’ বারওয়েল সাহেব আমার আব্বার খুব প্রিয় ছিল। উনিও ওকালতি করতেন সিলেটে।” সব খরিদ্দার বন্ধ রেখে ছেলে পরম যত্নে আমার জন্যে বাদাম তৈরি করল আগুনে, আমার হাতে উপহার তুলে দিয়ে সে যেন কৃতার্থ হলো। দাম দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। সেলিম বললো, “যে আপনাকে জানতে পারবে, সে আপনাকে বাদাম খাইয়ে ধন্য হবে।”

লোকটি বললো, “বাসায় আসবেন? তাহলে দোকান বন্ধ করি।” “শুধু শুধু রোজগার বন্ধ করবে কেন? বিদেশ বিভুঁয়ে যত পারো কামিয়ে নাও।” বললো

সেলিম। "টাকা নিয়ে কি সেদ্ধ করে খাবো, দাদা? মেহমানের আদরযত্ন যদি না হলো তাহলে আর বিদেশে বিজনেস করে কী লাভ?"

সেলিম বললো, "আমাদের সিরাজ অভিজ্ঞ লোক। দেশ ছেড়ে অনেক বছর বিদেশের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সিরাজ নিজেই জানালো, "এর আগে ছিলাম গ্রীসে। পাকা দু'বছর। লোকে ওখানে গরিব হয়ে যাচ্ছে, বাইরের মানুষ দেখলেই চটে যায়। বড্ড কড়াকড়ি শুরু হলো, তখন বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে চলে এলাম। এরা স্যর মেজাজি লোক। এক একজন এমন ভালোবাসবে, আদর করবে যে চোখে জল এসে যাবে। আর একজন এমন ভাব করবে যেন আমরা না খেটে স্রেফ ফ্রান্সের পয়সা লুট করতে এসেছি। বাদাম বেচে, দোকান দিয়ে, রেস্তোরাঁ খুলে আমরা ক'টা পয়সা নিয়ে যেতে পারব? নিয়ে যাচ্ছে তো জাপানিরা স্যর। চাঁদির জুতো মেরে, কম দামে এমন ভালো ভালো জিনিস পাঠাচ্ছে যে সায়েবদের চোখ মাথায় উঠে যাচ্ছে। জাপানিদের খুব খাতির, স্যর। বড়লোক জাপানির বকে যাওয়া ছেলেমেয়েরা এখন তো ফ্রান্সেই ঘুরে বেড়ায়। ওদের সঙ্গে অঢেল পয়সা। পকেটে পয়সা থাকলে এখানে জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামানো নেই—আমীর ওমরাহ, রাজারাজড়া, মিলিয়নেয়ার, বিলিয়নেয়ার সবার বেজায় খাতির এই দেশে। ফেলো কড়ি মাখো তেল।"

সিরাজ ইউরোপের বহু দেশে পোড় খেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। জার্মানি, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম কিছুই তার বাদ নেই।

আমরা সিরাজকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "হুস করে তোমার বাদামের স্টক শেষ হয়ে যাক।"

"আজকে হবে মনে হচ্ছে। সায়েবদের এক একদিন বাদাম খাওয়ার মেজাজ হয়—আকাশের রঙ অনুযায়ী। আমাদের এই স্টক কিন্তু শেষ হবার নয়। সামনের রুটির দোকানে আরও দু'বস্তা বাদাম জমা রেখে এসেছি, ফুরনো মাত্র ওখান থেকে নিয়ে আসবো। রুটিওয়ালা চালু লোক, দানছত্র করছে না। বস্তা পিছু ভাড়া নেবে। স্টক না থাকলে ব্যবসা হয় না, অথচ স্টক সঙ্গে রাখার উপায় নেই। কখন যে পুলিসের হাঙ্গামা হবে ঠিক নেই। গতকাল এক পুলিসের খপ্পরে পড়েছিলাম। লোকটি ভালো, গরম বাদামভাজা খেয়ে খুশি হলো, বললো একঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাও, আর দু'দিন এখানে বোসো না। ওই পুলিসই এই জায়গার খবর দিল। বললো, পার্কে অনেক ছেলেমেয়ে প্রেম করতে আসে, তোমার সব বাদাম বিক্রি হয়ে যাবে। বড় ভালো জিনিস এই নোয়া। প্রেম করবার সময় সায়েবরা খাবে, প্রেম ভাঙবার সময় নোয়া খেতে খেতে ঝগড়া করবে, তারপর নতুন বে করবার সময় আবার খাবে। যে সায়েবের রাস্তায় বাদাম

খেতে রুচি নেই সে বুড়ো হয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে।”

এই বাদামের ব্যবসা সায়েবরা নিজেরা করছে না কেন? আমি জানতে চাইছি।

“পাগল হয়েছেন। সমস্ত ইউরোপের সায়েবরা এখন নবাব খাঞ্জাখাঁ হয়ে গিয়েছে। ঠেলাগাড়িতে জ্বলন্ত উনুন চাপিয়ে সায়েবের বাচ্চা পাঁচটা দশটা ফ্রাঁর জন্যে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকবে! সেসব যুগ অনেক দিন আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। সায়েবরা এখন কেবল ভোগসুখ চায়। আর কেনই বা চাইবে না স্যর? অঢেল টাকা, ছেলেপুলে তেমন হয় না, বাপপিতেমহ মরবার সময় বস্তা বস্তা টাকা রেখে যাচ্ছে, সায়েবরা কোন দুঃখে গতর খাটাতে যাবে?”

“সিরাজ, তোমার কাগজপত্তর হলো?” জিজ্ঞেস করলো সেলিম।

“আপনি তো জানেনেই, স্যর।’

“একেবারে পাগল লোক। জার্মানিতে ইমিগ্রেশন পেপার হয়েছিল অনেক কষ্টে। তা আর এক সিরাজুদ্দিনের কষ্ট দেখে নিজের ইমিগ্রেশনের কাগজ তাকে বিনা পয়সায় দিয়ে চলে এল।”

“তা কী করে সম্ভব?”

“সম্ভব স্যর। পথ জানা থাকলে, খরচাপাতি করলে সায়েবদের দেশে অসম্ভব কিছুই নেই। যার পকেট গড়ের মাঠ, এজেন্টের টাকা, উকিলের টাকা, পুলিসের টাকা জোগানো যার পক্ষে অসম্ভব সে জেলে পচবে, কিংবা ঘাড় ধরে তাকে দেশের বাইরে বার করে দেবে।”

সেলিম বললো, “এরা বলছে, কাগজপত্তর ছাড়া একটা মাছিকে দেশে ঢুকতে দেবে না। আরে বাবা, তোমাদের বাপঠাকুদ্দা যখন জাহাজে চড়ে আমাদের দেশে হাজির হয়েছিল, তখন কোন্ কাগজপত্তর ছিল তাঁদের কাছে? ক্লাইভের মাইনে ছিল মাসে ক’পাউন্ড? কিন্তু ঘুষ নিয়েছিলেন ছাব্বিশ লাখ পাউন্ড! সুরাটে প্রথম যে জাহাজ এসেছিল তার ক্যাপ্টেনও তো বোম্বেটে!”

সিরাজ লোকটি এখানকার এই ভাগ্যহীন বাঙালি সমাজের অভিভাবক বিশেষ। সমস্ত ইউরোপের পথঘাট তার মুখস্ত। কোন্ ট্রাভেল এজেন্টকে বিশ্বাস করা যায়, কাকে করা যায় না, রাতের অন্ধকারে দেশের সীমানা পেরোতে হলে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ এসব তার নখদর্পণে। তার কথা শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন আইনও তার জানা, কোথায় কোন্ আইন কিছুদিনের জন্য শিথিল হবে, কোথায় আরও কড়াকড়ি হবে এবং পুলিসি হাঙ্গামা বাড়বে তারও খবর রাখে সিরাজ।

“তাছাড়া উপায় কী স্যর? যাদের কাগজপত্তর নেই তাদের অবস্থা রাস্তার নেড়িকুত্তার থেকেও খারাপ। লোকে খাটিয়ে নেবে পয়সা দেবে না, মাথার উপর আশ্রয় পাবেন না, পুলিস সারাক্ষণ তাড়া করবে, তার মধ্যে প্রাণধারণ করা এবং

অপেক্ষা করা কবে সুদিন আসবে।”

সুদিন কীভাবে আসবে তাও জানা গেল। বছরের পর বছর কড়াকড়ির পরে এক একটা দেশ বুঝতে পারে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু মানুষ দেশে ঢুকে পড়েছে। তারা চোর নয়, ডাকাত নয়, তারা সমর্থ মানুষ। তাদের প্রয়োজন নেই এমনও নয়—দেশে এমন অনেক কাজ আছে যা দেশের মানুষ করতে চায় না। এদের অযথা ভয় দুটো বাড়তি মানুষ হাজির হলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। এটা বাজে কথা। কোনো দেশের অর্থনীতি বহিরাগতরা নষ্ট করেনি। বরং বহিরাগতদের শ্রমেই এক একটা দেশ রাজার হালে রয়েছে। স্থানীয় লোকরা যেসব কাজ চায় না কেবল সেসব কাজই তো বহিরাগতরা পায়।

“আমরা মাইনে পাই অনেক কম, তার থেকে আবার দালাল পয়সা কেটে নেয়। পুলিসে খরচ আছে, উকিলের খরচ আছে। বলতে পারেন, তবু আমরা দেশ ছেড়ে এখানে রয়ে গেছি কেন?”

একটু থেমে সিরাজ বললো, “যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তাকে একথা কখনও জিজ্ঞেস করবেন না। দেশে তেমন কিছু নেই বলেই তো মানুষ প্রবাসে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রশ্ন শুনলে মনে বড় কষ্ট হয়।”

সেলিম শুনছিল আমাদের কথা। সে বললো, “কোন্ দুঃখে মানুষ দেশ ছাড়ে তা সায়েবদের থেকে বেশি কেউ জানে না। এরাই তো জাহাজে চড়ে বোম্বেটেগিরির জন্যে একদিন আমাদের দেশে হাজির হয়েছিল। শুনুন শংকরবাবু, কয়েক হাজার লোককে কাগজপত্তর দিতে এরা নারাজ, আর ১৮২০-১৯৬৩ এই দেড়শ বছরে আমেরিকায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ বিদেশ থেকে আমেরিকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে ভাগ্যসন্ধানে, তার শতকরা ৭৮ ভাগ মানুষ গিয়েছিল ইউরোপের বারোটা দেশ থেকে। আমরা রাস্তায় পুলিসের ধাক্কা খাই বটে, কিন্তু কিছু খবরাখবর রাখি। আমাদের বাপমায়েরা পেটে ভাত না দিলেও কিছু বিদ্যে দিয়ে তবে বিদেশে পাঠিয়েছেন।”

“আমাদের দেশের লোকরা ওইসময় যায়নি কেন আমেরিকায়?” আমি জিজ্ঞেস করি।

“যাবে কী করে? ওরা নিলে তো! ওই সময় চার লাখ চীনে এবং সাড়ে তিন লাখ জাপানিও দেশ ছেড়ে মিরিকিনি হয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশীর সংখ্যা আপনি হাতে গুনতে পারবেন। নামমাত্র। এখন আমেরিকায় যতটুকু দেখতে পাবেন তা ওই ষাটের দশকের শিকে ছেঁড়া!”

সিরাজ এরই মধ্যে নিজের বিজনেস অব্যাহত রেখেছে। তার হাত চলেছে ঝটপট। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভেজে বাদাম সরবরাহ করতে বেশ নৈপুণ্য লাগে। “বাদাম বেচে, কিংবা ট্রেনে মণিহারি বেচে আমরা এদেশের কী ক্ষতি

করছি বলুন তো? বরং লোকে সস্তায় কিছু পছন্দসই জিনিস পাচ্ছে। কিন্তু পুলিস এসব শুনবে না। সে বলবে কাগজ দেখাও। আরে বাপধন, কাগজই যদি থাকবে তা হলে এখানে হকার হবো কেন? তা হলে তো আমি নিজেই দোকান দেবো।"

"চাকরি?"

"চাকরি মানে তো আজীবন দাসত্ব। বরং আল্লার দয়ায় একটু গুছিয়ে নিয়ে কিছু সাহেব-মেমকে চাকর রাখো তোমরা বিজনেসে, তবেই তো সুখ। তবেই তো বাপ-মা বলবে ছোঁড়াটা ঘর ছেড়ে গিয়ে কাজের কাজ করেছিল।"

সিরাজ ফিসফিস করে বললো, "স্যর, এখানকার হাওয়ায় পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে দামে কিনে যে দামে বেচে এখানকার লোক তা ভাবলে বাঙালির মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। বড্ড ভোগী জাত হয়ে উঠেছে এই সাহেবরা, এদের পতন কেউ আটকে রাখতে পারবে না। দেখবেন, পঞ্চাশ বছর পর এদের কী হাল হয়। চীনে জাপানে কোরিয়ানের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করার জন্যে এরা তখন কাগজপত্তর বানাবে। ইতিমধ্যে কিন্তু এ ব্যাটারা রান্নাও ভুলে যাচ্ছে। পৈতৃক পেশায় মন নেই। দিক না আমাদের সিলেটিদের কয়েকটা ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁ চালু করতে। অর্ধেক-সায়েব-মেম যদি না আমাদের দোকানে চলে আসে তাহলে আমার নামে একটা দুম্বা রাখবেন!"

বেশ মজার কথা বলে সিরাজ। ফিসফিস করে আরও বললো, "রহস্যটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মশল্লা! এই মশলার মায়া এরা কোনোদিন কাটাতে পারবে না। এরা আতর তৈরি করতে পারে, চিজ তৈরি করতে পারে, কিন্তু মশলার অ আ ক খ জানে না। আপনি তো জানেন, এই মশলা নিয়েই চার পাঁচশ বছর ধরে কী ব্যাপার ঘটল।"

সিরাজের কথাবার্তা শুনে আমি তাজ্জব। দেশ ছাড়বার আগে সে বি এ পাশ করেছিল। তারপর মাথায় ভূত চাপলো।

সিরাজের সে জন্য অবশ্য কোনো দুঃখ নেই। সে বললো, "এই যে আমার বাদামের দোকানে এত ভিড়, তার কারণ গোপন মশলা। একটু মাখিয়ে দিই বাদামে— সায়েবদের জিভে ম্যাজিক খেলে যায়। কী আছে, কেন আছে, কেমন করে আছে কিছুই বুঝতে পারে না, অথচ বাদাম মুখে দিলেই মনে হবে কোনো নীল পরী পরানে হাল্কা ধাক্কা দিল। এ পাড়ায় আর দুটো গোমড়ামুখো ফ্রেঞ্চ নোয়া বেচতো, তারা লড়তে না পেরে উধাও হয়ে গেল, এখন দোকানে চাকরি করে—ফলের রস বিক্রি করে।"

সিরাজের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি ও সেলিম পথ হাঁটছি। পথের আলোগুলো জ্বলে উঠে সাঁঝের প্যারিস তার মোহিনীমায়া বিস্তার শুরু করেছে।

সেলিম বললো, "মাঝে মাঝে কোনো কোনো দেশ বেআইনি

অনুপ্রবেশকারীদের অপরাধ মকুব করে দেয়। যাদের কাগজপত্তর নেই তাদের পক্ষে তখন স্বর্ণযুগ। তাড়াতাড়ি অ্যামনেস্টির সুযোগ নিয়ে আইনসঙ্গত পথে দেশে থেকে যাবার সুযোগ মেলে।

সিরাজ সব খবর রাখে, কোন্ দেশ কখন অ্যামনেস্টির কথা ভাবছে তা বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ে। হতভাগা মানুষগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সিরাজ কিছুটা বেপরোয়া, নিজের কাগজপত্তর দানছত্তর করে দিয়ে পুলিসকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কোনো দুশ্চিন্তা দেখতে পাবেন না ওর মধ্যে। সিরাজ আশা করছে ফরাসি দেশে অ্যামনেস্টি অথবা অপরাধ মকুবের সময় আসছে। যদি সুযোগ না আসে অনেকেই চুপি চুপি হল্যান্ডে পালাবে। পাসপোর্ট নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই বলে কোনো দুঃখ নেই ওদের মধ্যে। দুর্জয় ওদের প্রাণশক্তি। কে বলে বাঙালি ঘরকুনো? বাঙালি ভীতু। বাঙালি বিপদের মুখোমুখি হতে চায় না? সব বাজে কথা।"

সেলিমের সঙ্গে পথে যেতে যেতে সায়েবদের মশলাপ্রীতির কথা আবার উঠলো। সেলিম অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "দেশে গিয়ে খোঁজ করে দেখবেন, এই গোলমরিচের দাম ওলন্দাজরা এক পাউন্ডে পাঁচ শিলিং বাড়িয়ে দিল বলে ইতিহাসের ধারাই পাল্টে গেল। অতি তুচ্ছ এই কারণ থেকে ইংল্যান্ডের ভাগ্য খুলে গেল। ওলন্দাজ বিজনেসম্যানদের বিরুদ্ধে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৪ জন নাবিক লন্ডনের এক ভাঙা বাড়ির দালানে সমবেত হলেন ১৫৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এবং ৭২,০০০ পাউন্ড মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যাতে ভারতের গোলমরিচ, এলাচি এবং দারুচিনির দামটা নিজেদের আয়ত্তে রাখা যায়। কয়েক মাস পরে উইলিয়াম হকিন্স নামে এক বোম্বেটে ক্যাপ্টেনের পরিচালনায় ৫০০ টন ওজনের একখানা জাহাজ সুরাটে এসে নোঙর করলো। ভারতবর্ষের ইতিহাসও পাল্টে গেল।

সেলিম জানালো, আমেরিকা আবিষ্কারের পিছনেও রয়েছে গোলমরিচের সন্ধান। সে যুগে পচা মাংস এবং আঁশটে মাছকে, খাওয়ার যোগ্য করে তুলবার জন্যে সায়েবদের প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের গোলমরিচের। এই তো কয়েক বছর আগে (১৯৮৩) সালে সাড়ে-চারশ বছর আগে (১৫৪৫) ডুবে যাওয়া এক নৌজাহাজকে (মেরি রোজ) সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হলো। যেসব নাবিক ডুবে মরেছিল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে গোলমরিচের পুঁটলি ছিল এমন নিদর্শন পাওয়া গেল।

সেলিম অনেক খবরাখবর রাখে। সে বললো, "বহু বছর বহু দেশে পুলিসের তাড়া খেয়ে খেয়ে অবশেষে পরিষ্কার কাগজপত্তর হয়েছে আমার। এখন আমার সুখের শেষ নেই। আমি এখন নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে পারি, তাই বাড়তি

সময়টা নষ্ট করি না, নিজের দেশের লোকদের একটু আধটু সাহায্য করি, কিছু ম্যাগাজিন, কিছু বই পড়ি, দেশ থেকেও বাংলা বই আনাই কিছু কিছু। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমার দেশের লোকদের কাগজপত্তর নেই, কিন্তু সঙ্গে আপনার লেখা এপার বাংলা ওপার বাংলা আছে। বাংলা না পড়লে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে কী করে? অনেকে আট-দশ বছর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেশে ফেরবার পয়সা থাকলেও যাবার উপায় নেই।"

সেলিমকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত কষ্ট ভালো লাগে?"

সেলিম হাসলো, "আগে ভাবতাম আমরা মুষ্টিমেয় নিজের খেয়ালের বশে বিদেশবাসের যন্ত্রণা মাথায় তুলে নিয়েছি। তারপর কোথায় দেখলাম, পৃথিবীতে আমাদের মতন লোক অন্তত তিন কোটি আছেন, যাঁরা প্রবাসের দুঃখ বলুন সুখ বলুন সব মুখ বুজে ভোগ করছেন। বাঙালিরা তো দলে দলে বাংলাদেশ ছাড়া হচ্ছে। অন্তত লাখ আষ্টেক বাঙালি দেশছাড়া হয়েছে এই ক'বছরে। বাঙালি ছেলেদের এইটাই নেশা—দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসা।"

"কলকাতার ছেলেদের মাথায় তো এই নেশা চাপেনি," আমি বলি।

সেলিম কথাটার উপর গুরুত্ব দিল না। "কলকাতার ছেলে আর ঢাকার ছেলের মধ্যে কোনো তফাত নেই, শংকরবাবু। হয়তো আপনাদের দেশটা আকারে মস্ত বড় বলে ওরা দেশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, বিদেশে আসতে হয় না। তবে কারুর আসবার ইচ্ছে হলে এখনও তাকে নিরুৎসাহিত করবেন না। এই দুনিয়াটা তো কেবল সাহেবদের ভোগের জন্যে তৈরি হয়নি। তাছাড়া অনেকদিন ওরা আমাদের উপর রাজত্ব করেছে, শোষণ করেছে, অপমান করেছে, ছোট জাত বলে মিথ্যে অপবাদ ছড়িয়েছে। আমরা এবার তার হিসেব নেব।"

আমি সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে বললো, "জানেন শংকরবাবু, এই সেদিন এখানে পড়লাম, স্বয়ং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ইন্ডিয়া দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন, স্বীকার করেছিলেন—ইন্ডিয়া দশ শতাব্দী এগিয়ে আছে। তারপর ওই গোলমরিচওয়ালারা সিংহাসনে চড়ে বললো, এরা জাত হিসেবে এত নিচু যে কোনোদিন দেশ চালাতে পারবে না। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগে কী কাণ্ডটা করল। ওই হতভাগা সায়েব জেনারেল ডায়ারকে অপরাধী জেনেও কর্তারা শাস্তি দিলেন না, স্রেফ ওই পোস্ট থেকে বদলি করে দিল। ইংরেজের আস্পর্ধা দেখুন। যে লোক দু'শজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারলো, ১২০০ জনকে গুলিতে জখম করল, তাকে সম্মানিত করার জন্যে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা ২৬০০০ পাউন্ড চাঁদা তুলল। ব্যাটারা এখনও ইংল্যান্ডের স্কুলে সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা গল্প ছেলেদের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছে।"

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্যারিসের প্রবাসে আমি নিজের দেশের মানুষদের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

সেলিমের সঙ্গে দেখা না হলে আমার প্যারিস ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যেত। সে বললো, "ভাবতে পারেন এই সায়েবদের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেড় লাখ ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল। ইংরেজের বাণিজ্যতরীতে কত ভারতীয় জাহাজী যে ডুবে মরেছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। এদের পুরো নামটাও অনেকসময় সায়েবদের খাতায় থাকত না, স্রেফ লস্কর বলে চালানো হতো।"

"এতোসব জানলেন কোথা থেকে ভাই?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"এখানকার বাংলা বই আনিয়েছি লন্ডন থেকে—নাম 'প্রবাসীর কথা' সেখানে অনেক খবর পাচ্ছি, পড়ছি, আর ভাবছি, ভাবছি আর পড়ছি, আমার চোখ খুলে যাচ্ছে!"

"প্রবাসীর কথা! লেখক নুরুল ইসলাম! ওঁর সঙ্গেই তো লন্ডনে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার!"

খুব খুশি হলো সেলিম। "আপনি বইটা দেশে নিয়ে যান, যত্ন করে পড়বেন।" আপনার প্রশস্তিও আছে। আপনি বলেছেন, এই মুহূর্তে বাঙালিদের থেকে অ্যাডভেঞ্চারাস জাতি পৃথিবীতে নেই।"

"ঠিকই তো। বাংলার বাঙালি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। আর কোন্ জাত পৃথিবীতে এত কষ্ট সহ্য করতে পারে?"

সেলিম বললো, 'আগামীকাল দুপুরে আপনাকে একটা গোপন ডেরায় নিয়ে যাবো। প্যারিসের বাঙালিদের দেখে আপনার বুক জুড়িয়ে যাবে।"

সারা রাত ঘুম এলো না চোখে। 'প্রবাসীর কথা' আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিলো। এতো পরিশ্রম করে বই লেখা বাংলা থেকে উঠে গিয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল। প্রবাসী বাঙালিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে লেখক ইতিহাস ভূগোল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন বছরের পর বছর ধরে। শুধু বইপড়া বিদ্যা এবং দলিল-দস্তাবেজের অনুসন্ধান নয়, সেই সঙ্গে বহু জনের সঙ্গে পৃথিবীর নানা প্রান্তে সাক্ষাৎকার।

কয়েক বছর আগে আমি নর্থ আমেরিকায় বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে ক্লিভল্যান্ড, ওহায়োতে গিয়েছিলাম। সেখানে ১৮৮০ সালের সেনসাসে উল্লেখ আছে, শহরের ১ লাখ ৬০ হাজার নাগরিকের মধ্যে ১২ জন ভারতীয়। এঁদের সবাই প্রায় বাঙালি, অনেকেই নাবিক হিসেবে পাড়ি দিয়ে, জাহাজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এর উল্লেখ ছিল আমার 'জানা দেশ অজানা কথা' বইতে। লেখক নুরুল ইসলামের নজর এড়ায়নি। আমি তখনই দুঃখ করেছিলাম, বাঙালির

অ্যাডভেঞ্চারের কোনো প্রামাণিক ইতিহাস আজও রচিত হলো না।

'প্রবাসীর কথা' পড়তে পড়তে মুগ্ধ হচ্ছি। বইটা ধরলে ছাড়া মুশকিল। এর মধ্যে চমকপ্রদ খবর ছাড়াও বাঙালি জাতের সুখদুঃখ হাসিকান্না ছড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, প্রবাসী সিলেটিয়াদের দুঃখ। কেউ এদের আপন করে নেয় না, অথচ বাঙালিকে বিশ্বপথিকে রূপান্তরিত করার প্রয়াসে সিলেটিদের দান সবচেয়ে বেশি। একজন প্রবাসী সিলেটিয়া দুঃখ করেছেন : "আমরা লন্ডনে ব্ল্যাকী, করাচীতে বাঙালি, ঢাকায় সিলেটি, আর সিলেটে লন্ডনী।"

আমেরিকা ফেরত সিলেটিরও একটা চমৎকার নাম আছে—মিরিকিনি! অনাবাসী বাঙালি বা এন আর আই বাঙালি না বলে এই মিরিকিনি শব্দটি আমরা সবাই গ্রহণ করলে কেমন হতো?

প্রথম যুগের মিরিকিনিদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প আরম্ভ করলে রাত কেটে যাবে। অন্য কোনো সময় সে গল্প ফাঁদা যাবে তাঁদের জন্য যাঁরা দুর্নাম রটান আমরা বাঙালিরা নড়তে চড়তে চাই না। নড়াচড়ার ব্যাপারে দুনিয়ার সব জাত আমাদের কাছে শিশু!

'প্রবাসীর কথা' বইয়ের প্রতি পাতা থেকে মজাখবরের মণিমুক্তা ছড়িয়ে পড়ছে। কখনও প্রাসঙ্গিক, কখনও অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু বাঙালির পক্ষে অপরিহার্য। যেমন নবমুসলিমদের প্রাণশক্তি। অনেকেরই জানা নেই, পাকিস্তানের পিতা মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্ দুপুরুষ আগেও ছিলেন হিন্দু। পিতামহ ছিলেন হিন্দু তাঁতী, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ছেলে জিন্নাভাই এবং নাতি মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্।

জাহাজী বাঙালির গলায় মালা পরাও, তাকে সব রকম সম্মান দাও। এখন পৃথিবীতে ফিলিপাইনের নাবিক সংখ্যা সর্বাধিক—বোধহয় এক লাখ। কিন্তু পাঁচ দশক আগেও বাঙালিরাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাবিক সম্প্রদায়। জেনে রাখুন, ১৯৪০ সালে আমাদের এই কলকাতায় ভারতীয় আর্টিকেলে তালিকাভুক্ত নাবিকের সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। আর এই খিদিরপুরের নাম ছিল দ্বিতীয় সিলেট। আর সিলেট প্রবাসীদের ডাক নাম ছিল কলকাত্তি। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় খিদিরপুরের রেজিস্ট্রিকৃত নাবিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল এক লাখ সত্তর হাজার।

খিদিরপুর নিয়ে মস্ত জাহাজীয়া উপন্যাস লেখার সময় চলে যাচ্ছে। বাঙালি লেখকরা সাধারণ বাঙালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে পারছে না। জয় হোক বাঙালি জাহাজীর, জাহাজে যাদের ডাক নাম ছিল কলকাত্তি!

বইটা পড়ে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আমার কেমন ধারণা ছিল রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম কালাপানি পেরিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস নানা সুরে কথা

কইছে। একটু নমুনা নিন।

১৬৮৮ সালে বিলেতের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে : তেরো বছর বয়সের ব্ল্যাক ইন্ডিয়ান বয় মালিকের অধীন থেকে পালিয়েছে। ইতিহাস বলছে, ইন্ডিয়ান ক্রীতদাসদের বাজারদর আফ্রিকানদের থেকে অনেক কম ছিল। একটা আফ্রিকানের দামে দশটা ইন্ডিয়ান পাওয়া যেত।

শুনুন, রামমোহন রায় ১৮৩১ সালে বিলেতে পৌঁছন আর সিলেটিরা জাহাজে নাবিক হচ্ছে ১৭৭৪ সাল থেকে। বিলাতযাত্রায় রামমোহনের সঙ্গী হন পালিতপুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও ভৃত্য শেখ্ বক্স্। ১৭৭৫ সালে বিলেতে মেমসায়েব বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, ভারতীয় ক্রীতদাসী পাওয়া যাবে, জাহাজে সেবাযত্নের জন্যে। ভারতে ফিরেও তিন বছর সার্ভিস পাওয়া যাবে বিনা মাইনেতে।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা [illegible] ফেরার সময় দু'জন দাস বালক এবং চারজন দাসী নিয়ে যান।

শুনুন, রামমোহন রায়ের দু'দশক আগে ১৮০৯ সালে সিলেটের সৈয়দ আলী বিলেতে যান। কেন জানেন? যে সায়েব তার বাবাকে হত্যা করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী যা একজন সায়েবই তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে স্বীকার করে গিয়েছেন।

ঠিক আছে বাবা, শুধু সিলেট সিলেক্ট করবো না। সিলেটিরাই যে বিশ্ববিজয়ী বাঙালির মধ্যমণি সে কথা আমার বলার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। শুনুন, এই কলকাতা শহরেই বিলেত থেকে ফিরে এসে এক ভদ্রলোক বসবাস করতেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ১৮০৩ সাল থেকে। তাঁর স্মৃতির প্রতি এখনও কলকাতাবাসীরা কোনো সম্মান দেখাননি। তাঁর নাম আবু তালেব লন্ডনী!

শুনুন সেকালের খিদিরপুরের একটা গল্প। অনেক কলকাতাবাসী নাবিকদের ঘরভাড়া দিতেন। ভাড়া দিতে না পারলে নগদ বিদায়। শাস্তির নাম 'পেটিচাপা'! ভাড়া বাকি পড়লেই বাড়িওয়ালার গুণ্ডা এসে ভাড়াটিয়ার হাত-পা বেঁধে মেঝের উপর শুইয়ে বিরাট এক কাঠের বাক্স বুকের উপর চাপিয়ে দেবে। দয়া করে কেউ লিখুন না হারিয়ে যাওয়া খিদিরপুরের গল্প—আমরা আর কতদিন আত্মবিস্মৃত জাতির বদনাম কুড়বো?

প্যারিসে বসে স্বদেশের কথা পড়তে পড়তে কখন যে রাত কেটে গিয়েছে তা বুঝতে পারিনি। যস্মিন দেশে যদাচারের সুযোগ পাওয়া গেল না, কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও অপ্রাপ্তির বেদনা নেই।

নিজের দেশের মানুষদের বিদেশের মাটিতে বসে আমি নবরূপে আবিষ্কার করছি। মনটা হঠাৎ অপার আনন্দে এবং আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল। শত শত

বৎসরের ধারাবাহিকতা রয়েছে আমাদের দুঃসাহসিকতার ইতিহাসে। আমরা পারবো, আমরা যা মন দিয়ে করবো পৃথিবীর কেউ তা পারবে না।

দুপুরে সেলিম আমার জন্যে মেট্রো স্টেশনের কাছে অপেক্ষা করছিল। লাজুক মানুষ, আমার সঙ্গতিপন্ন গৃহস্বামীর মুখোমুখি হতে সে অনিচ্ছুক। জোর করে আমার টিকিট কাটলো সেলিম। কোনো বাধা শুনলো না। বললো, "আজ আপনি আমাদের অতিথি। দেখে যান দেশের ছেলেদের। দেশ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এরা আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করছে। আজ এদের কাগজপত্তর নেই, কিন্তু কাল হবে। তারপর এরা খেটে খেটে পয়সা জমাবে, দোকান নেবে, প্রয়োজনে কলকারখানা বসাবে। পরের বারে যখন আসবেন তখন এদের হয়তো আপনি চিনতেই পারবেন না।"

খুব ভালো লাগছে আমার সেলিমের কথাগুলো শুনতে। সেলিম বললো, "দুঃখ একটাই। অমানুষিক কষ্টে এবং পরিশ্রমে সবার শেষ রক্ষে হবে না— কেউ অসুখে ভুগে অকালে মারা যাবে, কেউ দুঃখের বোঝা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করবে। পুলিস বড় নির্মম, শংকরবাবু। তবু এই স্রোত বন্ধ হবে না। বাঙালিদের রক্তে জেগে উঠেছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। তারা দুনিয়ার হাটে হাজির হবেই, তার জন্যে যত কষ্টই হোক সব তুচ্ছ।"

দু' একবার মেট্রো বদল করে সেলিম অবশেষে আমাকে যেখানে নিয়ে এল তা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিরাট এক পোড়ো ব্যারাকবাড়ি, বহু বছর আগে কোনো সময়ে হয়তো সৈন্যদের রাত্রিবাসের কেন্দ্র ছিল। একতলা দোতলা মিলিয়ে প্রায় শতখানেক খুপরি। তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই আমার দেশের ভাইরা প্রবাসের জীবনসংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

সেলিম আজ আমার পরিচয় দিল না। সে বললে "তাহলে হইচই পড়ে যাবে। এদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে পারবেন না। কাগজপত্তরের গোলমালের জন্যে অনেকের ভীষণ ভয়। এরাই প্যারিসের ফেরিওয়ালা, বাদামওয়ালা, ফুলওয়ালা, এরা কখনও ওয়েটার, কখনও ভৃত্য, কখনও ঠিকে শ্রমিক, কখনও সাফাইদার। কিন্তু কখনও চোর নয়, পকেটমার নয়, ছিনতাইবাজ নয়।"

তখন দুপুর তিনটে। শিফ্‌ট বদলের সময়। একদল বাঙালি কাজ থেকে ফিরছে এবং আরেকদল কাজে বেরুচ্ছে। প্রতি ঘরে অন্তত দু'জন, কোথাও তিনজন। দেশের লোকদের প্রতি এদের টান ভীষণ। কাউকেই নিরাশ্রয় হয়ে থাকতে হবে না। ঠিকানা নেই, কাগজ নেই, অর্থ নেই, রোজগার নেই তো কী হয়েছে? তুমি তো বাংলায় কথা বলো। এসো, এখানে থাকো, দেশের লোকদের পরামর্শ নাও, তেমন হলে

ফেরিওয়ালার কাজে বেরিয়ে পড়ো। পুলিসকে ভয় কোরো না। তুমি রাত্রে বাড়ি না ফিরলে ভোরবেলায় আমাদেরই কেউ থানায় খোঁজ করবে, তোমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে গাঁটের কড়ি খরচ করে। তুমি না আমার দেশের লোক।

প্রতি ঘরে ঘরে পরিচয়হীন আমার এবং ওদের পরিচিত সেলিমের জন্যে ভালোবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার। সবাই জানতে চায় আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন কি না। তার চেয়ে যা আশ্চর্য, সবাই বলে, "দাদা দশটা মিনিট বসুন। ডালভাতের ব্যবস্থা করে ফেলি। প্রেসার কুকার আছে, হুস করে হয়ে যাবে। গরিবের রান্না বউদির হাতের রান্নার মতন হবে না, কিন্তু বিদেশে দুটি ভাত পাবেন না কেমন করে হয়?"

দেশে এঁদের মধ্যবিত্ত পরিবার। কারুর বাবা ডাক্তার, কারুর বাবা উকিল, কেউ সরকারি কর্মচারী। সুখ ও নিরাপত্তার সেই জীবনত্যাগ করে কেন এই ভাবে বেরিয়ে পড়া? একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "এত কষ্ট জেনেও কেন দেশ ছাড়লেন?" ছেলেটি হাসলো, "বেরোতে তো হবেই। দুনিয়া দেখতে হবে না?"

মনটা গভীর আনন্দ ও গভীর বেদনায় একসঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়েছি। নিখাদ ভালোবাসার স্পর্শে আমার চোখে জল টলমল করছে। এতো ভালোবাসা কী করে ওদের বুকের মধ্যে জমে থাকে?

সেলিমও হাঁটছে। আমি বললাম, "আইফেল টাওয়ার দেখা হলো না বলে আমার কোনো দুঃখ নেই, সেলিম। এখানে এসে বাঙালিদের না দেখলে আমার মস্ত ক্ষতি হতো।"

সেলিম বললো, "যদি কখনও এদের সম্বন্ধে কিছু লেখেন, নামধাম সম্বন্ধে একটু সাবধান হবেন। বুঝতেই পারছেন, কাগজপত্তরের গোলমাল।" তারপর কী ভেবে সেলিম বললো, "আপনাকে কী আর বলবো। শুধু কলকাতা আর ঢাকার লোকদের বলবেন, আমরা ঘরছাড়া হলেও দিক্‌হারা নই। আমরা সারাক্ষণ দেশের দিকেই তাকিয়ে আছি।"

ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের উৎস সন্ধানে

'ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ' কথাটি প্রথম শুনি নিউ ইয়র্কের কুইন্স নামক শহরের জামাইকা অঞ্চলের একটি ভেজিটারিয়ান রেস্তোরাঁয়। আগেই বলেছি, এর নাম 'অন্নম্ ব্রহ্মম্'—ঝকঝকে তকতকে এমন একটি ভোজনালয় যা দেখলেই আনন্দে মন ভরে ওঠে। সেই চৌরঙ্গী রচনাকাল থেকে স্বদেশ ও বিদেশের হোটেল-রেস্তোরাঁর বহিরাঙ্গ এবং রান্নাঘর সম্পর্কে আমার কৌতূহল। বহু বছরের অনুসন্ধান থেকে শিখেছি, রেস্তোরাঁর নাম যাই হোক তার চারটি প্রধান অঙ্গ—রান্নাঘর, মেনু বা খাদ্যসূচি, পরিবেশ ও সেবক-সেবিকারা। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরা তার সঙ্গে যোগ দেন 'লোকেশন' বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি—সবকিছুতে সেরা হয়েও, স্রেফ ঠিকানা ভালো না হওয়ায় অনেক সময় বহু রেস্তোরাঁ তার প্রাপ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

মার্কিনী সায়েবদের উচ্চারণে 'অ্যানাম ব্রাহ্ম্ম্' বিশিষ্টতা উপার্জন করেছে, এই সংস্কৃত শব্দটি যে একদা মানব সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করেছে তা বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু আমার মতন কলকাতার অতিথির কাছে যা আশ্চর্য লাগে, আমাদের দেশের রেস্তোরাঁগুলির বেশিরভাগ নাম বিদেশি, নতুন উদ্যোগীরা লন্ডন, প্যারিস ও নিউ ইয়র্কের গাইড বই তন্ন তন্ন করে দেখেন মন মাতানো নামের জন্য। আর এই উল্টোপুরাণের দেশে খাঁটি ভারতীয় নাম খুঁজে বার করতে চিন্ময়-অনুরাগীদের কি আগ্রহ।

যতদিন বেঁচেছিলেন শ্রীচিন্ময় এই 'অন্নম্ ব্রহ্মে' প্রায়ই আসতেন, রেস্তোরাঁর দেওয়ালে তাঁর ছবি টাঙানো এবং এক কোণের একটি টেবিল তাঁর জন্য সারাক্ষণ রিজার্ভড্ থাকত, কারণ সাধন ভজন সেরে কখন এসে উপস্থিত হবেন ঠিক নেই। অতিথি অভ্যাগতদের এখানেই তিনি আপ্যায়ন করেন, কথাবার্তা বলেন এবং মালিক ও কর্মীরা তাঁর উপস্থিতিতে প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এইটাই যে গুরুসেবার ব্রাহ্মমুহূর্ত তা তাঁদের তৎপরতা থেকে বোঝা যায়।

আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে যে বিদেশিনী আমাকে কফি দিতে চাইলেন তিনিই আশ্বস্ত করলেন, গুরুজি এখনই এসে পড়বেন এবং কে এই প্রতিষ্ঠানের মালিক তা জানতে চাইলে বললেন, এটি একটি ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ—এখানে মালিক আছেন, কর্মী আছেন, কাস্টমার আছেন, এদেশের সমস্ত নিয়মকানুন আছে, কিন্তু বাড়তি আছে শ্রীচিন্ময়ের আশীর্বাদ ও নির্দেশ।

তিনি কি এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার? না, অবশ্যই নয়, কিন্তু মালিকেরও

ওপরেই তিনি আছেন সবসময়, তাঁর ইচ্ছাকেই আমরা সবাই এখানে সারাক্ষণ প্রতিফলিত করার চেষ্টা করি।

ঠিকানা ৮৪-৪৩ ১৬৪ স্ট্রিট, জামাইকা হিল্‌স। এই ভেজিটারিয়ান রেস্তোরাঁর জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। শুধু ইন্ডিয়ান নয়, দেশবিদেশের ভেজ্ ডিশ এখানকার মেনুতে স্থান পায় এবং প্রায়ই মেনুকার্ডে পরিবর্তন আসে। সবচেয়ে যা নজরে পড়ে তা এখানকার পরিচ্ছন্নতা। আমাদের দেশের রান্নাঘরেও পরিচ্ছন্নতা থাকে, কিন্তু এই পরিচ্ছন্নতার 'ভিসুয়াল' দিকটা প্রায়ই দুর্বল। পশ্চিমী রাঁধুনিদের দৃষ্টিনন্দন পরিচ্ছন্ন বেশবাসের কথা স্বামী বিবেকানন্দ রসিয়ে-রসিয়ে বর্ণনা করেছেন, আর সায়েবদের দুর্বলতার কথাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু 'অন্নম্ ব্রহ্মে'-র প্রথম বাণীটাই যেন এর শুচি-শুভ্রতা। পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যাঁরা অর্ডার নিচ্ছেন এবং টেবিলে নিপুণভাবে তা সরবরাহ করছেন তাঁদের স্নিগ্ধতা। সব মিলিয়ে যা অভ্যাগতের মনে পবিত্রতার ভাব ছড়িয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় আপনি যে পাবলিক বা বারোয়ারি রেস্তোরাঁয় পদার্পণ করেছেন সেখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পৃথিবীর বেশিরভাগ রেস্তোরাঁয় খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্নম্ ব্রহ্মের খাদ্যতালিকা সুবৃহৎ নয়, দাম সীমিত, তবে জলের দাম নয়। আর আছে ব্যবহারে আন্তরিকতা যা সেবাধর্মকে মনে করিয়ে দেয়। আচরণটি সোচ্চার নয়, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে স্পষ্ট যে প্রাচীন ভারতের 'অতিথি দেবো ভব' কথাটি মার্কিন মুলুকেও বিস্মৃত নয়। এখানে অবশ্যই শ্রীচিন্ময় শিষ্যদের নিত্য আনাগোনা, কিন্তু তাছাড়াও নিয়মিতভাবে অনেকে আসেন যাঁদের সঙ্গে শ্রীচিন্ময় মেডিটেশন সেন্টারের কোনো যোগাযোগ নেই।

একটু ভাবলে মনে পড়ে যায় আমাদের দেশেও স্বদেশি যুগে এবং পরবর্তীকালে বেশ কিছু চায়ের দোকান বা কেবিন গজিয়ে উঠেছিল যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন যাওয়া-আসা এবং সংবাদের আনাগোনা। এইসব ভোজনালয়ের মধ্যমণি অবশ্যই ম্যানেজার, যিনি প্রায়শই সংস্থার মালিক এবং প্রায়ই এই আদর্শবাদী মানুষটি সি-আই-ডি পুলিশের নজরে পড়ে নিগৃহীত হতেন। বাংলা থিয়েটারে একসময় এই ধরনের একটি রেস্তোরাঁ দর্শকদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠত। শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবীভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এক সময় কলকাতা থেকে সরে গিয়ে পাটনায় একটা চায়ের দোকান খুলেছিলেন, যেখানে গরম চা, টোস্ট, ওমলেট ছাড়াও অন্য ভাবের আদানপ্রদান হত।

চিনের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন সে দেশেও মাও সে তুং ইত্যাদি বড় বড় নেতাদের ফেভারিট রেস্তোরাঁ থাকত যেখানে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চলত। আমার মনে এল, আমাদের কলকাতায় চিরকাল ছিল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের প্রভুত্ব, তারপর একসময় খাদ্যরসিক

ও চা-প্রেমী বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, অদূরভবিষ্যতে পাড়ায় পাড়ায় টি-শপ অথবা কেবিনের উৎপত্তি হবে এবং দোর্দণ্ডপ্রতাপ ময়রার দোকান তার প্রভুত্ব হারাবে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে কলকাতায় চায়ের দোকানের বিস্তার হয়েছে, কিন্তু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বন্ধ হয়নি। যদিও প্রশ্ন জাগে, কেন ময়রার মিষ্টিকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো বৈপ্লবিক মিলনকেন্দ্র কলকাতায় গড়ে ওঠেনি? একটা কারণ হয়তো, আমাদের ময়রার দোকানগুলো প্রধানত 'টেক-অ্যাওয়ে' শপ। দোকানের কাউন্টার থেকে ঠোঙা অথবা ভাঁড় নিয়ে ঘরে ফিরে খাওয়া-দাওয়ার ট্রাডিশন। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিঙাড়া, জিলিপি, কচুরি, দই, সন্দেশ খাওয়াটা যেন আমাদের কালচারের বিরোধী। আজকাল কোথাও কোথাও মিষ্টির দোকান ও চায়ের দোকানের সমন্বয় ঘটিয়ে নামী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কয়েকটা টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত সামাজিক কারণে তা কোথাও তেমন জমে ওঠেনি।

নিউ ইয়র্কের সেই দিনে আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে শ্রীচিন্ময় নিজেই এসেছিলেন, তাঁকে পেয়ে অন্নম্ ব্রহ্মের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা। কিচেনের দুই রন্ধন পটীয়সীও বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে মেনু সম্পর্কে শলাপরামর্শ করলেন, বোঝা গেল আধ্যাত্মিক পাঠশালার বাইরে শাকাহার সম্পর্কে শ্রীচিন্ময় যথেষ্ট খবরাখবর নেন এবং তাঁর শিষ্য-শিষ্যার পরিচালিত রেস্তোরাঁগুলির মেনু সৃষ্টিতে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বহুদিন দেশছাড়া হলেও জন্মভূমির কয়েকটি বিশেষ পদ সামান্য 'আমেরিকানাইজড্' হয়ে অন্নম ব্রহ্মম-এর খাদ্যতালিকায় প্রায় স্থায়ী স্থান অধিকার করে আছে। জানা গেল, শাকাহারী শ্রীচিন্ময়ের প্রিয় একটি পদ স্বদেশের প্রিয় খিচুড়ি ছাড়া কিছু নয়, যদিও আটলান্টিক অতিক্রম করে মার্কিন মুলুক জয় করবার সময় খিচুড়ি তার ঘনত্ব কিছুটা হারিয়েছে এবং তার সঙ্গে মিশেছে ছোট ছোট করে কাটা ফুলকপি এবং সেই সঙ্গে সবুজ তাজা কড়াইশুটি। বহু বছর আগে তাঁর বোন লিলি পণ্ডিচেরি থেকে নিউ ইয়র্কে এসে ভাইয়ের শিষ্যাদের অনুরোধে অন্নম্ ব্রহ্মের রান্নাঘরে ঢুকে সবাইকে চাটগাঁয়ের রান্না শিখিয়েছিলেন।

শ্রীচিন্ময়ের দেহান্তের তিন বছর পরে (২০১১) তাঁর ৮০তম জন্মদিনে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হয়ে বোঝা গেল চিটাগাঙের খিচুড়ি এখনও ভক্তজনের রসনা আকর্ষণ করছে। বাঙালি শিষ্যা ইংরিজির অধ্যাপিকা মহাতপা পালিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য এই স্পেশাল খিচুড়ি আমার জামাইকা বাসস্থানে 'হোম ডেলিভারি'র ব্যবস্থা করেছিল। মহাতপা সাধারণত নিজে না খেয়ে সেকালের বঙ্গীয় রমণীদের মতন কেবল অপরকে খাওয়ায় এবং জানতে চায়, আরও একটু দেবে কি না।

কিন্তু প্রয়াত গুরুর কথা চিন্তা করেই এবং ইন্দো-আমেরিকান খিচুড়ির প্রতি আমার আগ্রহ লক্ষ করে, নিজেও কিছুটা খেলো। বলা যায় না, এই ধরনের খিচুড়িই একদিন প্রবাসের ঘরে ঘরে সবচেয়ে লোভনীয় ও ফেভারিট ডিশ হয়ে উঠবে। মেনুকার্ডে শতাধিক নাম—সাড়ে তিন ডলারে কারি, রাইস এবং ডাল বেশ লোভনীয়।

আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য অন্নম্ ব্রহ্মের খাদ্যতালিকা বা জনপ্রিয়তা নয়, আমরা এই ধরনের প্রচেষ্টার পিছনে যে গভীর চিন্তা ও দূরদর্শিতা রয়েছে তার বিবরণ সংগ্রহে আগ্রহী। লাভের জন্য পৃথিবীতে তো লক্ষ লক্ষ রেস্তোরাঁ চালিত হচ্ছে, কিন্তু ডিভাইন এন্টারপ্রাইজেসের সঙ্গে তাদের একটা সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

এক এক সময় এই ডিভাইন এন্টারপ্রাইজেসকে একজন দূরদর্শী বাঙালির অর্থনৈতিক চিন্তা বলে মনে হয়, যার গুরুত্ব বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনিসের গ্রামীণ ব্যাংকের সমতুল্য মনে হয়। গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে সারা বিশ্বে বহু আলোচনা হয়েছে, দরিদ্র গ্রাম্যরমণীদের জীবন সংগ্রামে মূলধন ধার দেওয়ার পিছনে আদর্শ এবং ইকনমিক্স দুই-ই কাজ করেছে, প্রমাণ হয়েছে গ্রামের মেয়েরা দরিদ্র হলেও তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য এবং সব আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে স্বীকৃত হয়েছে, ধার দেওয়া টাকার অপব্যবহার না করে মহিলা উদ্যোগীরা তা সততার সঙ্গে যথাসময়ে ঋণদাতাকে ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী।

'ডিভাইন এন্টারপ্রাইজ' শব্দটির বাংলা কি করা যায়? 'দেবোদ্যোগ' শব্দটা মন্দ নয়, ভাবতে ভালো লাগে একজন বাঙালি আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানী অতি প্রয়োজনীয় পথের মানচিত্রটি বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। দেব শব্দটিতে অস্বস্তি থাকলে, বলা চলে 'দিব্য উদ্যোগ'।

আমি যতদূর বুঝি, ব্যাপারটা এইরকম। যুগে যুগে মহাপুরুষরা আধ্যাত্মিক, ও সামাজিক বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়ে অনুরাগীদের জড়ো করেছেন নতুন এক পথের যাত্রী হবার জন্য। বুদ্ধ তাঁর অনুগতদের আশ্রয়ের জন্য গড়েছিলেন সঙ্ঘারাম, খ্রিস্ট অনুরাগীরা গড়েছিলেন চার্চ এবং অ্যাবে, জগদগুরু শঙ্করাচার্য গড়েছিলেন তাঁর নামাঙ্কিত মঠ, শ্রীচৈতন্যভক্তরা গড়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ, স্বামী বিবেকানন্দ গড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন। প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ততীর্থও গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের জন্য একই পথে এগিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের পথ একটু আলাদা। তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা সন্ন্যাসী নন।

আজব দেশের আজব নাপিত

১৯৬৭ সালে প্রথম যেবার ইংলন্ড ছুঁয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম, সেবার পণ করেছিলাম যতদিনই প্রবাসে থাকি প্রাণ থাকতে কোনো নাপিতের দোকানে ঢুকবো না, কারণ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দকে মার্কিনী বার্বার শপে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল সেই ১৮৯৩ সাল থেকে। গাঁটের কড়ি দিয়ে সন্ন্যাসীমানুষ চুল কাটবেন দাড়ি কামাবেন তাতেও তথাকথিত সায়েবী সেলুনের মালিকদের আপত্তি, কারণ হেঁজিপেঁজি লোককে ক্ষৌরকর্ম করলে রেগুলার শ্বেতাঙ্গ খরিদ্দাররা নাকি দোকানে আসা বন্ধ করে দেবেন। বর্ণবৈষম্যের এই প্রেসিডেন্সিয়াল সংস্করণ ইস্কুলজীবন থেকেই আমাকে উত্তেজিত করত।

বার্বার শপে প্রবেশ আশঙ্কাজনক হওয়ার নানারকম ফল হয়েছিল। বিবেকানন্দ প্রথমবার যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তাঁর গুরুভাইরা অবাক, প্রচণ্ড গতিতে তিনি নিজের ক্ষৌরকর্ম করেন, অথচ তাঁর আয়নার প্রয়োজন হয় না। বিদেশে সায়েব নাপিতদের বর্ণবৈষম্য নীতিতে তিনি ক্ষুর চালানোর দক্ষতা অর্জন করেছেন। মনে রাখতে হবে, আমেরিকান জিলেট সায়েব তখনও সেফটি রেজর আবিষ্কার করে এই ধরণীর দাড়িওয়ালা পুরুষজাতকে উপহার দেননি। কিং ক্যাম্প জিলেটের মাথায় মিলিয়ন ডলার বুদ্ধিটা এলো ১৮৯৫ সালে, তখন স্বামীজি আমেরিকায় এবং যখন বোস্টনে জিলেট কোম্পানি খোলা হল ১৯০৩ সালে তখন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত নেই।

ইংলন্ডের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। পশ্চিমের জীবনযাত্রায় অনভিজ্ঞ মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে লন্ডনে স্বামীজির আচমকা দেখা হলে ভ্রাতার কোঁকড়ানো দাড়ি দেখে চিন্তিত হয়ে সহকারী গুডউইনকে স্বামীজি নির্দেশ দিলেন নাপিতের দোকানে নিয়ে যেতে। তখন ইংরেজের দেশে জার্মান নাপিতদের রমরমা। খাঁটি ইংলিশ গুডউইন মহেন্দ্রনাথকে বঙ্গাট্‌জ্ নামক জার্মান নাপিতের দোকানে নিয়ে গিয়ে দাড়ি ছুঁচলো করে ফ্রেঞ্চ ফ্যাশানে কেটে দিল। ভাইয়ের ছুঁচলো ছাগলদাড়ি দেখে স্বামীজি হাসতে লাগলেন, আরে ছ্যাঃ, ঠিক চুনোগলির ফিরিঙ্গি হয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মধ্যমভ্রাতা দিনকতক পরেই বঙ্গাট্‌জ্-এর দোকানে গিয়ে দাড়ি মুড়িয়ে এসেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ লিখছেন, "স্বামীজির যখন মাথার চুল কাটাইবার আবশ্যক হইত তখন তিনি কোনো বিশিষ্ট লোকের সহিত গিয়া চুল ছাঁটাইয়া

আসিতেন। সাধারণের সেই সকল দোকানে প্রবেশ নিষেধ...তবে বিশিষ্ট লোক সঙ্গে যাওয়ায় স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া চুল কাটাইয়া দিত।"

একদিন স্বামীজি লন্ডনে বসে প্রিয় ভাইকে বলতে লাগলেন, "আরে, আমেরিকায় নাপিতের দোকানে যাওয়া কি ফ্যাসাদ! কোনো বিশিষ্ট লোক সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে নাপিতের দোকানে ঢুকতে দেয় না, বলে কিনা কালা আদমি কালা, সে এক মহা বিরক্তির কথা। নাপিতের দোকানে চুল কাটতে যাবে, আবার সঙ্গে সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে। কি দুর্গতি।" চুল দাড়ি নখ সম্বন্ধে স্বামীজি সংক্রান্ত আরও অনেক খবরাখবর আছে। ১৮৯৬ সালে লন্ডনে বিবেকানন্দ তাঁর ভাইয়ের ঘরে ঢুকে দুপুরবেলায় বলেছিলেন, "নখে যেন ময়লা না থাকে। বড় নখ হলে কেটে ফেলবে। দ্যাখ, আমার জামার পকেটে বা ট্রাঙ্কের ভেতর একটা লোহার রিং করা নখ কাটবার অনেকরকম যন্ত্র আছে। আমার নখ কাটবার জন্যে আমেরিকার একজন দিয়েছিল, সেইটে দিয়ে নখ পরিষ্কার কর।" আরও পরামর্শ : "মাথার চুল সবসময় বুরুশ করে রাখবে, চুল যেন উস্‌কো-খুস্‌কো হয় না। তাহলে এদেশের লোক বড় ঘৃণা করে।"

ছাত্রাবস্থায় এইসব বিবরণ পড়েও পুরো আমেরিকান জাতের ওপর রাগ পুষতে পারিনি, কারণ স্বামীজির ভগ্নীসমা ঐ দেশের কন্যারা অপূর্ব ভালবাসায় সন্ন্যাসীকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের এবং পায়ের নখ কাটবার জন্যে স্বামীজি একটা ছুরি চাইলেন। তারপর বোনদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একটা মেয়ে কার্পেটের ওপর পা মুড়ে বসে স্বামীজির জুতো খুললো, মোজা খুললো, তারপর পা-টা নিজের হাঁটুর ওপর রেখে নখ কাটছে, কখনও বা হুমড়ি খেয়ে পড়ে নখ চাঁচছে। তারপর দু'পায়ে মোজা পরিয়ে দিল, বুট পরিয়ে দিল, বুটের ফিতে বেঁধে দিল এবং যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে বললো, "দিন দাম দিন। আমরা আমেরিকান, দাম না পেলে কোনো কাজ করি না।" স্বামীজি মজা করে বললেন, "এই আমার পা ছুঁয়েছ এবং নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ, এর দরুন কি দেবে, আমাকে বলো। পোপদের পা ছুঁতে পেলে কত টাকা দিতে হয়?"

এই গল্পটা প্রথমবার মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে এসে পড়েছিলাম, ফলে সেবার ধনুর্ভঙ্গ পণ, কোনো বার্বার শপে ঢুকে মানসম্মান খোওয়ানোর ঝুঁকি নিচ্ছি না। তিনমাস মার্কিন দেশে অবস্থান, কিন্তু নো হেয়ার কাট, দেশে যখন ফিরলাম তখন প্রায় জটাজুটধারী যোগীর অবস্থা! তথ্যাভিজ্ঞ মহল অবশ্য বললো, খুব বেঁচে গিয়েছো, কুটকুট করে তিন মিনিট চুল ছাঁটবার নাম করে সায়েব নাপিত কষ্টার্জিত ডলারগুলো অপহরণ করত এবং তারপরেও উদার হস্তে বকশিস দাবি করত, যার সায়েবী নাম 'টিপস', যা ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় TIPS—টু ইনসিওর প্রম্পট সার্ভিস। তা মশাই চুল ছাঁটতে গিয়ে কোন বাঙালি তাড়াহুড়ো চায়, সবাই

ধীরেসুস্থে সেবাপ্রার্থী। হাওড়া চৌধুরীবাগানে তখন বহুযুগ ধরে আমি যে সেলুনে চুল ছাঁটাতাম তার মালিক একজন সাহিত্যপ্রেমী। একজন বিখ্যাত বাঙালি লেখকের সেলুনে গিয়ে 'সবচেয়ে দুঃখের আধঘণ্টা' নামক একটি লেখা পড়ে সমগ্র বাঙালি লেখকসমাজ সম্বন্ধে এই নরসুন্দর বিশ্বাস হারিয়েছিল। সে যখন শুনলো মার্কিন নাপিত হেয়ার কাটিং-এ যা চার্জ করে তাতে হাওড়ায় অন্তত একশবার চুল ছাঁটা যায়, তৎক্ষণাৎ আমার মার্কিনদেশে গজানো চুলের ওপর হাওড়া সারচার্জ বসিয়ে রেট ডবল করে দিল!

বহুবছর পরে, শেষবার যখন নিউইয়র্কমুখো হলাম, তখন আমার আর ঝাঁকড়া চুল নেই, সময়ের ষড়যন্ত্রে মাথাটা অনেকটা অযত্নে রাখা হাওড়া ময়দানের মতো ঘাসবিহীন মসৃণ হয়ে গিয়েছে। তবু সেবার ভিনদেশের বার্বার শপে গিয়েছি। সেবারে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে করজোড়ে মার্কিন নাপিতকুলের কাছে ক্ষমাভিক্ষার জন্যে এই লেখা লিখতে বসেছি।

প্রকাশ্যে সবার কাছে আমার নতমস্তক স্বীকারোক্তি, নিউইয়র্কের নিভৃতপল্লীতে এমন নাপিতের সান্নিধ্যে আমি এসেছি যার তুলনা ভারতে কেন, সারা পৃথিবীতে নেই। এই নাপিতের প্রসঙ্গে আসব একটু পরে, কিন্তু জেনে রাখুন, ভুবনবিদিত ট্রিনিটি কলেজের গ্র্যাজুয়েট তার শিক্ষক একজন বাঙালির সান্নিধ্য কামনায় স্বেচ্ছায় নাপিতবৃত্তি অবলম্বন করে সুদূর নিউইয়র্কে বসে বসে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠের চেষ্টা করছেন। এটা কিন্তু আমার বানানো কোনো গল্প নয়। আজও এই আশ্চর্য পৃথিবীতে কত আজব ঘটনা ঘটে যার খবরাখবর আমাদের কাছে পৌঁছয় না।

শেষবার আমেরিকা যাবার আগে, খেয়ালের বশে টাকের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করছিলাম। ফোকলার যেমন ডেনটিস্টের ভয় থাকে না, টেকোর তেমনি চুল পাকবার রিস্ক নেই। এই ক্রিটিক্যাল আত্মবিশ্লেষণের সময়ে একখানি সাহেবী কাগজে একটি নিটোল বুক রিভিউ পড়লাম—"টেকোরা কি আর্ধেক দামে চুল ছাঁটতে পারেন? অন সার্চ অফ আমেরিকান গ্রেট বার্বার শপ।"

লেখার প্রতিটা লাইন তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেলেছি। লেখক ভিন্স স্ট্যাটেন এই বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্যে তিনশ আমেরিকান নাপিতের দোকানে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এই বইতে জনৈক মার্কিনী নাপিত লেখককে বলছেন, "আমরা শুধু চুল ছাঁটি না, আমরা হলাম সোস্যাল ওয়ার্কার, মানুষের বন্ধু, পরামর্শদাতা, অনেকটা পাদ্রীর মতো কাজ আমাদের।"

একজন মিস্টার রজার্সের কথা আছে, বয়স পঞ্চাশ, একদশক ধরে প্রতি

সপ্তাহে দোকানে চুল ছাঁটাতে আসেন। "যদি কোনোদিন মনটা বিগড়ে যায়, তাহলে চুল ছাঁটার দোকানে কিছুক্ষণের জন্যে এসে নিজেকে চাঙ্গা করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আরও একটি খবর : "বেশিরভাগ লোক আমেরিকায় বলতে পারবে না ভূমিষ্ঠ হবার সময় কোন ডাক্তার তার মায়ের পাশে ছিল, কিন্তু প্রত্যেকে অনেক সহজে বলে দেবে, কোন নাপিতের দোকানে প্রথম চুল ছাঁটা হয়েছিল।" অনেক আমেরিকান মা সন্তানের প্রথম চুল ছাঁটার একগুচ্ছ নমুনা কেশ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সারাজীবন অ্যালবামে রেখে দেন।

স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে চুলের ভূমিকা আন্দাজ করতে পারি, কারণ বিবেকানন্দ-অনুরাগিণী আমেরিকান মিস ম্যাকলাউড একবার আচমকা কাঁচি দিয়ে স্বামীজির কেশাগ্র কেটে নিয়েছিলেন, স্বামীজি এতে তেমন খুশি হননি, কিন্তু সেই চুল একটি মূল্যবান লকেটে পুরে এই মার্কিন মহিলা সারাজীবন তা ধারণ করেছিলেন।

যে বইটার কথা বলছিলাম সেখানে এক নাপিতের দার্শনিক উক্তি রয়েছে : "এমন একটা পেশায় থাকা ভাল যেখানে দিনের শেষে মনটা ভাল থাকে।"

দুধের সাধ যেমন ঘোলে মেটে না তেমন বিস্তারিত বুক রিভিউ থেকে মূল বইপড়ার আনন্দ পাওয়া যায় না। মূল বইটা জোগাড় করতে পারিনি নিউইয়র্কে, বিশ্ব সংসারে ইংরাজী ভাষায় কত যে মজার বই বেরোয়, সেসব সংগ্রহ করতে গেলে কোটিপতিও ফকির হয়ে যাবেন। আর আমাদের এই দুর্ভাগা কলকাতা শহরের কথা বলে লাভ নেই, লাইব্রেরিহীন এই মরুভূমিতে চুল ছাঁটা সম্পর্কে বই বেশি খুঁজলে মাথা খারাপ ভেবে পুলিসে খবর চলে যাবে।

নিউইয়র্কের পুরানো বইয়ের দোকানে মিক হান্টার নামক মনোবিদ-লেখক-ফটোগ্রাফারের ক্ষৌরকর্ম সম্পর্কে একটা বই দৈবক্রমে পাওয়া গেল। ১৫ বছর ধরে (১৯৮২-১৯৯৬) গাঁটের কড়ি খরচ করে এই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক সমস্ত আমেরিকার চুল ছাঁটাই দোকান চষে বেড়িয়েছেন এবং ছবি তুলেছেন।

বইয়ের শুরুতেই ছোট্ট ইংরাজী কবিতা ছেপেছেন যা বাংলায় অনুবাদ করার দুঃসাহস আমার নেই :

Babies havn't any hair;
Old men's heads are just as bare;
Between the cradle and the grave
Lies a haircut and a shave.

—Samuel Hoffenstein

মুখবন্ধেই লেখক এক বিশিষ্ট নাপিতের মুখে জনৈক খামখেয়ালি খদ্দেরের গল্প শুনিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে এই লোকটি চুল ছাঁটতে আসবেন এবং দোকান

থেকে বেরিয়েই পাশের স্টুডিওতে গিয়ে প্রতিবার একটা ছবি তোলাবেন। ওঁর বিশ্বাস, কোনোসময়ে কারও কাছে এই ছবির সিরিজ বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠবে, তখন এই পৃথিবী আবার বুঝবে, সাধারণের মধ্যেই সবরকমের অসাধারণত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

হান্টার তাঁর অনুসন্ধানকালে বহু নাপিতের দোকানের ভিজিটিং কার্ড সংগ্রহ করেছেন, কত রকমের নাম : মিরাকল বার্বার শপ, প্যাটস, ব্র্যাড্‌স, স্যাম্‌স, ভিলেজ বার্বার শপ, ব্ল্যাকি'জ ফোর কর্নার্স বার্বার শপ!

আমেরিকান চুল ছাঁটাই দোকানে দু'রকম নাপিত আছেন। একদলের ধারণা, যতদিন মানুষের মাথায় চুল থাকবে ততদিন নাপিত থাকবেই। আর একদলের ধারণা অদূর-ভবিষ্যতে এইসব দোকান ঝাঁপ বন্ধ করবে। হিসেব রয়েছে হাতের গোড়ায়। ১৯২৯ সালে সারা মার্কিন দেশে ২,৬০,০০০ নাপিত, ১,৩০,০০০ ডাক্তার এবং ৬০,০০০ ডেনটিস্ট ছিল। দশবছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর সময় নাপিতের সংখ্যা নেমে এল ৮০,০০০-এ কিন্তু ডাক্তারের সংখ্যা বেড়ে হল দেড় লাখ। এইরকম সংখ্যার ওঠানামা কেন, সে বিষয়ে আমেরিকান নাপিতরা আজকাল মাথা ঘামায়। কাছাকাছি সময়ের মোদ্দা কথাটা হল, ১৯৭২-১৯৯০ এই সময়ে ১,১০,০০০ নাপিত মরে-হেজে গিয়েছেন কিংবা ছাঁটাই লাইন ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দোকানের সংখ্যা কমে গিয়ে ৬০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে।

নাপিতরা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ইদানীং আমেরিকান পুরুষদের অর্ধেক মাত্র ক্লাসিক বার্বার শপে আসছেন। বাকি অর্ধেকের চুল হয় বাড়িতে ছাঁটা হচ্ছে, না হয় তাঁরা ছেলেমেয়েদের উভয়ের জন্যে তৈরি ইউনিসেক্স হেয়ার স্টাইলিস্ট শপে। ঝটপট চুল ছাঁটাই করতে হলে আপনাকে যেতে হবে টেক্সাস স্টেটে, সেখানে প্রায় দশ হাজার দোকানে এখনও বিশ হাজার নাপিত, প্রতি ৮০০ জন পুরুষের চুলদাড়ির সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন একজন নাপিত। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ ইন্ডিয়ানায়, সেখানে আড়াই হাজার পুরুষ মাথার জন্যে একজন নাপিত।

যে রাজ্যে আমার পদার্পণ ঘটেছে সেই নিউইয়র্কে পাঁচ হাজার বার্বার শপে তেরো হাজার নাপিত জনগণের কেশচর্চা করছেন। দুঃখের বিষয় দোকানে দাড়ি কামানোটা কিং জিলেটের দৌরাত্ম্যে এবং অন্যান্য নানা কারণে প্রায় উঠে গিয়েছে। আত্মনির্ভর জাত সেল্‌ফ শেভিং-এ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। মানুষের চুলটা এমন জায়গায় যে নিজের চুল নিজে ছাঁটা শ্রেষ্ঠ নাপিতের পক্ষেও কোনোদিন সম্ভব হবে না।

আমেরিকান ক্ষৌরকর্ম বিদ্যালয়গুলিতে এই দাড়ি কামানো নিয়ে কত বই লেখা এবং কত গবেষণা যে হয়েছে! যাঁরা মনে করেন ক্ষুর চালানোটা ছেলেখেলা

তাঁরা জেনে রাখুন, একটি দাড়ি আয়ত্ত আনতে ১৪ রকম গতিতে রেজর চালানো শিখতে হয়। হাতের টান চার রকমের—ফ্রি হ্যান্ড, ব্যাকহ্যান্ড, রিভার্স হ্যান্ড এবং রিভার্স ব্যাকহ্যান্ড। আদ্যিকালের স্ট্রেট রেজর এখন বার্বার শপে দরকার হয় না, কিন্তু হবি হিসেবে যাঁরা ক্ষুর সংগ্রহ করেন তাঁদের অনেক ডলার ব্যয় করতে হয়। এদেশে যাঁদের বাড়িতে এখনও বাপ-পিতামহের বিলিতি ক্ষুর আছে তাঁরা যেন ঝপ করে তা হাতছাড়া করবেন না, আমেরিকান সংগ্রাহকরা এদেশে এলেন বলে। তবে জেনে রাখুন, এই 'স্ট্রেট রেজরের' ব্যাপারে বার্বার শপে অনেক সেন্টিমেন্ট আছে, দোকানের সংগ্রহালয়ে দেড়শ দুশ বছর ধরে সযত্নে রেজর সাজানো থাকে। এক প্রবীণ নাপিত এই সেদিন যখন বুঝতে পারলেন আর বেশিদিন দোকান চলবে না তখন এক বিশিষ্ট লেখককে ড্রয়ারের চাবি খুলে একটি পুরনো রেজর উপহার দিলেন, যা দিয়ে তাঁর বাবা প্রথম খরিদ্দারের দাড়ি কামিয়েছিলেন।

দাড়ির ব্যাপারেও সায়েবের যেমন সেন্টিমেন্ট তেমন পরিসংখ্যান! তিনটে মানুষের দাড়িতে হয় এক স্কোয়ার ফুট, প্রতিটি পুরুষ মুখে কেশসংখ্যা সাড়ে পনেরো হাজার, প্রতিদিনে গড়ে ওর বাড় ১/১০০০ ইঞ্চি! তবে এই বাড়ের হার নির্ভর করছে আপনি চিনে, জাপানি, ককেশীয়, না কোন্ জাতের তার ওপর। আমাদের দেশেও একসময় শ্মশ্রুসংক্রান্ত গবেষণা নিশ্চয় হয়েছিল, না হলে 'মাকুন্দ' ইত্যাদি বিশেষ শব্দের সৃষ্টি হলো কী করে?

দাড়ি কামানোটা যে একসময় সায়েবদের দেশে দুরূহ আর্টের পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল তার প্রমাণ অনেক নাপিত বিদ্যুৎগতিতে দাড়ি কামিয়ে জাতীয় সম্মান লাভ করেছিলেন। এই সেদিন (১৯৮৪) মিস্টার হার্লে নামে এক নাপিত পরের পর ২৩৫ জনকে শেভ করেছেন, মুখ পিছু সময় নিয়েছেন মাত্র ১৫.৩ সেকেন্ড। বুঝুন ব্যাপারটা। ৮ বছর পর আর এক নাপিত দাড়ি কামানোয় বিশ্বরেকর্ড করলেন, তাঁর গতি মুখ পিছু ১.৮ সেকেন্ড। কিন্তু তাঁর অস্ত্র একালের সেফটি রেজর, ক্ষুর নয়। সেকালের রেজর বস্তুটি কি ধরনের শাণিত অস্ত্র তা জেনে রাখার জন্যে দাদামশায়ের দাড়ি কামানোর বক্স থেকে জার্মান বা শেফিল্ড স্ট্রেট রেজরটি খুঁজে বার করে একটা শানে ঘষে নিন। বুঝতে পারবেন বেদ উপনিষদেও আমাদের পূর্বপুরুষরা কেন 'ক্ষুরস্যধাবা' নিয়ে এতো মাথা ঘামিয়েছেন এবং সেই উক্তি নিয়ে বড় বড় সায়েব উপন্যাসিকরা কেন বই লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

মার্কিন দোকানে শেভিং যখন উঠে গিয়েছে তখন হেয়ার কাটিং-এর বিষয়ে বাড়তি একটু নজর দেওয়া যাক। হায়েস্ট লেভেলে ক্ষৌরকর্মীদের দাপট কীরকম তার প্রমাণ সংবাদমাধ্যম প্রায়ই দিয়ে থাকেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেউ প্রয়াত

হলে টিভি ও সংবাদপত্রের দুঁদে সংবাদ সংগ্রাহকরা ছোটেন তাঁর নাপিতের কাছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দেহাবসানে তাঁরা পাকড়াও করলেন নাপিত মিস্টার মিল্টন পিটসকে। তিনি জানালেন, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রতি সপ্তাহে চুল ছাঁটতেন। চুল ছাঁটার সময় কীসব কথা হয়েছে, তারও টেপ আছে কিনা এসব বিতর্কিত বিষয় নিপুণভাবে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতির নাপিত জানালেন, খুব উদারহস্ত টিপস দিতেন নিক্সন। এই মিল্টনকে একসময় নিয়ে উচ্চতম স্তরে ক্রাইসিস হয়েছে। ইনি হোয়াইট হাউসের অনেকদিনের নাপিত, কিন্তু জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট হয়ে এসে এঁকে স্যাক করলেন, বললেন, আমি নিরুপায়, সেকেলে মিল্টন একবগ্গা লোক কেবল পুরুষদের ছাঁটবেন, মেয়েদের কেশস্পর্শ করবেন না। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে এসে, মিল্টনকে ফিরিয়ে আনলেন, তবে পার্ট টাইম, সায়েবরা কাউকে বসিয়ে রেখে ডলার খরচ করবার লোক নন।

টিপস টিপস এবং টিপসের দেশ এই আমেরিকা। গুজব ছিল, মনের মতন টিপস না পেলে ট্যাক্সিওয়ালা প্যাসেঞ্জারকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে! কিন্তু অনুসন্ধানী লেখক খবর পেলেন গর্বিত এক নাপিতের। ইনি টিপস নেন না, এঁর বক্তব্য, "আপনি কি আপনার ছেলের শিক্ষিকাকে টিপস অফার করেন? আমরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রফেশনাল, ফেয়ার প্রাইস চার্জ করি, কমও নিই না, বেশিও নিই না!" অন্য নাপিতরা মুখ টিপে হাসেন, "ছেড়ে দিন ওসব মিটিং কা বাত! ছাঁটাই-এর ছাপানো রেটটা রাখুন সাড়ে আট ডলার, তাহলে দশ ডলারের নোট দিয়ে খদ্দের আর খুচরোর হাঙ্গামায় না গিয়ে চক্ষুলজ্জায় বলবেন, চেঞ্জটা আপনি রেখে দিন।"

যারা বলে বেড়ায় সায়েবদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান নেই তারা সত্যের অপলাপ করে। সাহিত্যিক বন্ধু তারাপদ রায় একবার প্রবাসকালে মার্কিন লন্ড্রিতে যাতায়াত করতেন, একবার বলে ফেললেন তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, কাজ থেকে অবসর নিয়ে ছেলের কাছে। সেই শুনে লন্ড্রির ছেলেটি তারাপদকে ডেকে কিছু পয়সা ফেরত দিয়ে বলল, আপনারা সিনিয়র সিটিজেন, কত কষ্ট করে, ধৈর্য ধরে আপনারা এই দেশ গড়েছেন। আপনাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। মার্কিন দেশে বার্বার শপের প্রায় সর্বত্র সিনিয়র সিটিজেনদের স্পেশাল রেট। তবে ব্যতিক্রমও আছে। একজন নাপিত বুড়োদের বেশি চার্জ করেন, তাঁর বক্তব্য বুড়োগুলো বড্ড খিটখিটে এবং পিটপিটে হয়, এদের সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন, সুতরাং এদের কাছ থেকে দাম বেশি নাও, তাতে যদি ওরা অন্য নাপিতের কাছে চলে যায়! আর এক বাজেট সচেতন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন পুরো চুল ছাঁটাই না করে সাইডগুলো একটু ফিনিশ করালে কত কম রেট পড়বে? নাপিত বিরক্ত হয়ে

উত্তর দিলেন, "শুনুন মশাই, এই চেয়ারে পশ্চাৎদেশ স্পর্শ করলেই এই রেট, চেয়ার ছেড়ে ওঠবার সময় কত চুল কাটা হলো, কত চুল মাথায় রয়ে গেল এসব হিসেব কষার বিদ্যে আমার নেই।"

বার্বার শপে খরিদ্দারদের জন্য ৬টি অদৃশ্য নিয়ম আছে :

১। মেঝেতে থুতু ফেলা চলবে না।

২। দোকানের ফার্নিচার ভাঙা চলবে না।

৩। পদবি ধরে ডাকা চলবে না।

৪। ভিড় থাকলে আপনাকে আপনার টার্নের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে, যতই মিলিয়নেয়র হোন আপনি।

৫। আপনি নিজেকে যতই কেষ্টবিষ্টু ভাবুন, নিজের টার্নের জন্যে বসে থাকতেই হবে। কাউকে পাশ কাটিয়ে এগনো যাবে না।

৬। এছাড়া সব কিছু চলবে।

দোকানের খদ্দেররা কখনও কখনও টানা তিনঘণ্টা অন্য চেয়ারে বসে অপেক্ষা করেন নিজের পছন্দসই নাপিতের কাছে কেশ কর্তনের জন্যে। একই দোকানে তিন-চারজন নাপিত থাকলে একটা অলিখিত আইন আছে, হাত খালি হলে কোনো নাপিত অপেক্ষমান কোনো অতিথিকে নিজের চেয়ারে ডেকে নেবে না, সে শুধু বলবে : নেক্সট। এর অর্থ, যে তার প্রিয় নাপিতের জন্যে অপেক্ষা করতে চায় সে অবশ্যই করতে পারে।

অভিজ্ঞ নাপিতের অনেক দায়িত্ব। বস্ত্রখণ্ডটি জড়িয়ে দিয়ে চেনা খদ্দেরকে সে জিজ্ঞেস করবে : দ্য ইউজুয়াল? যেমন হয় তেমনই তো? পাশের চুল ছোট, মধ্যিখানের চুল বড়?

খদ্দের—কাটুন, তবে খুব বেশি কাটবেন না। যতটুকু না কাটলে নয়। বেশি কাটলে চুলগুলো খাড়া হয়ে থাকে।

শুনে যাচ্ছেন নাপিত মহাশয়। খদ্দের কখনও বলবেন, শীতের সিজন, চুল একটু বড় থাকলেই তো ভাল। আবার কখনও তাঁর নির্দেশ "গরম পড়ছে, এখন একটু ছোট হলেই তো ভাল।"

অভিজ্ঞ নাপিতের শিক্ষা, খদ্দের যা বলছেন তা মন দিয়ে শুনতে হবে, কিন্তু খদ্দেরের মাথায় যা করা উচিত তা এমনভাবে করতে হবে যে তাঁর মনে হবে আমি যা চেয়েছি তাই হয়েছে। যা চেয়েছি এবং যা পেয়েছি তার সমন্বয় করার কাজটা পৃথিবীতে সহজ নয়!

খদ্দেরের মতন সায়েব নাপিতেরও ১৬ দফা আচরণবিধি আছে। তার কয়েকটি উদাহরণ :

- দোকানে উঁচুগলায় চিৎকার করে কথা বলা চলবে না।

- খদ্দের কথা বললে তার উত্তর দিতে হবে।
- কিন্তু নিজে গায়েপড়ে কথাবার্তা কিছুতেই শুরু করবে না।
- খদ্দেরের সঙ্গে তর্কাতর্কি একেবারেই চলবে না।

নাপিতের দোকানে এই বাকসংযমের ধারাটি এসেছে সমুদ্রপারের ইংল্যান্ড থেকে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন, টাওয়েল লাগিয়ে ইংরেজ নাপিতের বিনম্র প্রশ্ন : "মাই লর্ড, আপনার দাড়িটা কেমনভাবে কামাব?"

"একেবারে নিঃশব্দে", লর্ডের সুচিন্তিত উত্তর।

তবু বহু মানুষ দুটো কথা বলে বুকটা হালকা করার জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করে পরিচিত নাপিতের দোকানে যায়। নিজের বাড়ি, নিজের কর্মস্থলের বাইরে একটা 'থার্ড প্লেসের বিশেষ প্রয়োজন একালের মানুষের'—সেইজন্যেই চায়ের দোকান, পাব এবং বার্বারশপ।

এখানে অন্য খদ্দেরের সঙ্গেও কিছুক্ষণের সখ্যতা গড়ে ওঠে, নাপিতমশাই তো আছেনই। বার্বারশপের নাপিতমশায়ের তাই নানা ভূমিকা—তিনি রাজনৈতিক ভাষ্যকার, ক্রীড়া সাংবাদিক, নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, পাদ্রীর কাছে কনফেশনের মতন তাঁকে অনেক পাপকর্মের স্বীকারোক্তিও শুনতে হয়।

এবিষয়েও নাপিতমহলে অনেক রসরসিকতা আছে। যাঁদের কাছে মানুষ সারাক্ষণ মিথ্যেকথা বলে—তাঁদের মধ্যে নাপিতের স্থান তৃতীয়। মিথ্যাবাক্য শ্রবণের প্রথম সারিতে অবশ্যই পত্নীরা, দ্বিতীয় স্থানে চার্চের পাদ্রীরা এবং এঁদের ঠিক পরেই বার্বারশপের নাপিতরা।

বড়লোক, কিন্তু বড় দুঃখী দেশ এই আমেরিকা। এখানে নাকি তিনটি সর্বাধিক বিক্রি হওয়া ওষুধ ট্যাগামেট (আলসার শান্ত করে), ইনডেরল (হাই ব্লাড প্রেসার) এবং ভ্যালিয়াম (উদ্বেগ কমায়)। সাধারণ মানুষের তো দু'দণ্ডের মুক্তি চাই। হাসির হিসেবও হাতের গোড়ায় রয়েছে, সাধারণ আমেরিকান গড়ে দিনে ১৫ বার হাসে। কিন্তু জেনে রাখুন, চুল ছাঁটার দোকানের হাসির পরিসংখ্যান : প্রতি ঘণ্টায় পনেরোবার।

মার্কিনী বার্বারশপের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে—এমন দোকানও আছে যার প্রতিষ্ঠা সেই ১৭০০ সালে। ঐতিহ্যময় নাপিত-দোকানের খানদানি আলাদা। এমন দোকান আছে যাঁর কর্তার বয়স ৮০, তিনি খাতায় কলমে রিটায়ার করেছেন, কিন্তু প্রতিদিন দোকানে আসেন, ইচ্ছে হলে দু'একটা চুলও ছাঁটেন, মনের সুখে বলেন, "এটা আমার অফিস নয় আর, এটা এখন আমার বাড়ির লিভিং রুম।" এঁর পাশের চেয়ারটাতে মন দিয়ে কাজ করেন বর্তমান মালিক, বয়স ৬০, চল্লিশ বছর আগে এখানে শিক্ষানবিশ হয়ে এসেছিলেন, তখন বলা হয়েছিল যদি মন দিয়ে কাজ করো, যদি কাজে আসতে দেরি না করো, যদি খদ্দেরের সঙ্গে কটুকথা

না বলো, মুখে যদি মদের গন্ধ না ছাড়ে তাহলে একদিন তোমাকেই এই দোকান কেনবার প্রথম সুযোগ দেওয়া হবে। আরও দুটি নিষেধাজ্ঞা—'রেলরোডিং' ও 'সোলজারিং'।

এই দুটি জটিল টেকনিক্যাল শব্দ, নাপিতমহলে রয়েছে এর বিশেষ অর্থ। প্রথমটি হল, একজনের চুলছাঁটা হচ্ছে, সেইসময় বিশিষ্ট খরিদ্দার কেউ এসে পড়লেন, যিনি মোটা বকশিস দেন। তাঁকে চেয়ারে তোলবার জন্যে তড়িঘড়ি হাতের খদ্দেরের কাজ সেরে ফেলা হলো রেলরোডিং। এর ঠিক উল্টো হল সোলজারিং—এমন কেউ এসে পড়েছেন যাঁকে নাপিতের খুবই অপছন্দ, তাঁকে এড়িয়ে যাবার জন্যে হাতের খদ্দেরের ছাঁটা ঢিমেতালে চালানো, যাতে অনভিপ্রেত খরিদ্দার অন্য কোনো চেয়ারে চলে যেতে পারেন!

এই দোকানের "নতুন 'ছেলেটির' বয়স চল্লিশ—তিনিও জয়েন করেছেন কুড়ি বছর আগে! এখন একজন কুড়ি বছরের সদ্য পাশ করা নাপিতের খোঁজ চলছে।"

৮৫ বছর বয়সের নাপিতের সন্ধান পেয়েছেন মিক হান্টার। একই দোকানে ভদ্রলোক টানা ৬৫ বছর চুল কাটছেন। সাক্ষাৎকারের সময় যাঁর চুল ছাঁটা হচ্ছিল তাঁর বয়স ৬০—এই ভদ্রলোক সগর্বে বললেন, এই নাপিতই শৈশবে তাঁর প্রথম চুল ছেঁটেছেন, তারপর তাঁর প্রত্যেকটি হেয়ারকাট এই দোকানে।

হান্টারের বইতে সিনিয়রমোস্ট নাপিত হিসেবে উল্লেখ আছে টেক্সাসের "বার্ড" হ্যারিস রেনো মহাশয়ের। ১৯২৬ সাল থেকে এলাইনে আছেন, নাপিতের লাইসেন্স পান ১৯৩০ সালে। ১৯৯৫ সালে রেনো বলছেন, তিনি তাঁর লাইসেন্স আবার নবীকরণ করবেন। তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি : হুড়োহুড়ি না করে এক সময়ে একটা কাজ করা। তাঁর দোকানের খদ্দের জানেন এখানে তিনি কি পাবেন। খেয়ালি মিস্টার হ্যারিস একটি মাত্র স্টাইলের চুল কাটেন। "খরিদ্দার অন্য কিছু চাইলে তাঁকে অন্য নাপিতের কাছে যেতে হবে," এই হলো মিস্টার হ্যারিসের সাফ বক্তব্য!

স্থানীয় সমাজে বর্ষীয়ান মিস্টার হ্যারিসের বেজায় কদর। চুল কাটবার সময় মিস্টার হ্যারিস যেসব মতামত দেবেন তা খরিদ্দারকে অবশ্যই মন দিয়ে শুনতে হবে। একজন পুরানো খরিদ্দার লেখককে বলেন, "চুল ছাঁটবার জন্যে মিস্টার হ্যারিসের পারিশ্রমিক খুব কম, বাকি টাকাটা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মূল্যবান মতামতের জন্যে ফি!"

সত্যিই মার্কিন নাপিতের দোকানে সময় কাটাতে পারলে শেখার শেষ নেই। হাওড়ায় মানুষ হয়ে আমি 'আফটারশেভ', 'কোলন' ও 'পারফিউমের' পার্থক্য বুঝতাম না। আফটার শেভ হল এক ধরনের সুগন্ধ কিন্তু 'সংকোচক' (অ্যাসট্রিনজেন্ট) লিকুইড, ক্ষৌরকর্মের পর যা চামড়ায় লাগালে রোমকূপের

রন্ধ্রগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর কোলন হল কয়েকটি সুগন্ধি তেলের সমন্বয়, যা থেকে সুগন্ধ ছড়ায়।

আদর্শ আমেরিকান নাপিত কখনও খরিদ্দার সম্পর্কে অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। ফলে অনেক অবাক কাণ্ডও ঘটে। মিনেসোটায় এক ভদ্রলোক দু'বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে প্রথম চুল ছাঁটাতে দোকানে এসেছিলেন, তারপর ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিমাসে একই বার্বারশপে এসেছেন, এরজন্যে নাপিতের গর্বের শেষ নেই, কিন্তু প্রশ্ন করতে এই খরিদ্দারের নাম বলতে পারলেন না। সোজা উত্তর : "উনি কখনও নাম বলেননি, আমিও কখনও জিজ্ঞেস করিনি।"

চুল ছাঁটা সম্পর্কে এতোসব খবর পেয়ে শেষবার নিউইয়র্কে এসে আর ভুল করিনি। আমার গাইড দুই চিন্ময়শিষ্য উইলিয়ম ও রিচার্ড সোয়ানসন। এঁদের দুজনেরই ভারতবর্ষ ও বাংলা সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ। ১৯৬৪ থেকে শ্রীচিন্ময়ের অনুরাগী ছাত্র এঁরা।

নিউইয়র্ক জামাইকা অঞ্চলে শ্রীচিন্ময় স্ট্রিটের আশেপাশে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এক ভেজিটারিয়ান রেস্তোরাঁয় চা খেতে ঢুকে পড়েছিলাম। এই অঞ্চলের সেরা নিরামিষ রেস্তোরাঁর শিরোপা পেয়েছে শ্রীচিন্ময় শিষ্যাদের এই উদ্যোগ।

মার্কিন বার্বারশপে আমার আগ্রহ দেখে ভারতপ্রেমী আমার দুই গাইড মোটেই অখুশি হলেন না। আমি ইতিমধ্যেই সায়েব নাপিতদের সম্বন্ধে যেসব তথ্য জোগাড় করেছি তার কিছু নমুনা পেয়ে এঁরা বেশ মজা পেলেন। একসময়ে এঁদের নিবেদন, আমার একটি ধারণা ভুল যে বার্বার ইস্কুলে প্রশিক্ষণের জন্যে তেমন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কোনোরকমে ইস্কুলে চারটে পাঁচটা বছর কাটিয়ে নাপিত ইস্কুলে প্রশিক্ষণ নাও, তারপর কোনো নাপিতের অধীনে অন্তত তিন হাজার ঘণ্টার শিক্ষানবিশী হলেই সরকারি লাইসেন্স!

আমার গাইড বললেন, এই শহরেই এমন নাপিত আছেন যিনি বিখ্যাত ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, সুপণ্ডিত এবং মনের সুখে চুল ছাঁটছেন। ৮৪-৪৩ ১৬৪ স্ট্রিট-এর অন্নম্ ব্রহ্ম থেকে মহাজ্ঞানী নাপিতের সন্ধানে আমরা চলে এলাম ৮৬-১০ পার্সন্স বুলেভার্ডে। দোকানের নামটিও অদ্ভুত—পারফেকশন ইন দ্য হেড ওয়ার্লড—অর্থাৎ 'মস্তিষ্ক জগতের উৎকর্ষ!' একমেবাদ্বিতীয়ম্ বার্বার চেয়ারের শিল্পী সুদর্শন এক ভদ্রলোক পরম সমাদরে এক গ্রিক খরিদ্দারের কেশকর্তন করছেন। আমরা অপেক্ষা করলাম, ওঁর কাজ শেষ হতে বেশি দেরি হলো না। এবার নাপিত আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "সংস্কৃতভাষা বড়ই ঐশ্বর্যময়, 'বার্বার' শব্দের মধ্যে যে বর্বরতা আছে তা 'নরসুন্দর' শব্দে নেই। অনেক ভেবেচিন্তে আমার শিক্ষক শ্রীচিন্ময় নাম দিয়েছেন 'সুন্দর'। সংস্কৃতে লব্ধি

মালিক হলেন 'সভাসুন্দর' এবং হেয়ারকাটার হলেন 'নরসুন্দর'। অবাককাণ্ড, নিউইয়র্ক শহরে মহাপণ্ডিত নাপিত, যাঁর বাঙালি নাম। আরও অবাক কাণ্ড, নিউইয়র্কের চুল ছাঁটাইয়ের দোকানে বসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েন!

গল্পের মতো শোনালেও সুন্দরের জীবনকথাটি বানানো নয়। এমন পণ্ডিত মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ভারত মহাদেশের ইতিহাস গুলে খেয়েছেন। সুন্দরের প্রথম ক্যুইজ, মুখোপাধ্যায় কী করে মুখার্জি হল? দ্বিতীয় কঠিন প্রশ্ন, কায়স্থরা শূদ্র না ক্ষত্রিয়? নিজেই বললেন, স্বামী বিবেকানন্দর ছোটভাই, একদা নিউ ইয়র্কনিবাসী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা মন দিয়ে পড়েছেন। বাংলা ইতিহাস যে কোনো নাপিত এইভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন তা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আর এক প্রশ্ন, সেকালের বাংলায় নীলকররা কি সত্যিই চাষীদের ওপর অত্যাচার করত, না স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটেছিল? সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবিষয়ে লেখা মিস্টার সুন্দর মন দিয়ে পড়েছেন। এরপরেই আরও দু'জন খরিদ্দার এসে গেল, আমি পরেরদিন এখানে কিছু সময় কাটাবার ব্যবস্থা করলাম।

এমন হেয়ার কাটিং সেলুন পশ্চিমেই সম্ভব! সুন্দরের আদিনাম গ্রাহাম ডাল্টন, এদেশে ডাল্টনগঞ্জ আছে শুনে তিনি মজা পেলেন। পৈত্রিক দিক থেকে স্কটিশ, কিন্তু জন্ম আয়ারল্যান্ডে, মা বেলফাস্টের মেয়ে। গ্রাহাম ডাল্টনের জন্ম ১৯৪৯, ফিলোজফি ও সাইকোলজি পড়বার জন্যে ইউনিভার্সিটি অব ট্রিনিটি। তারিখটা মনে আছে ১লা ডিসেম্বর ১৯৭০, বয়স একুশ হতে তখনও দু'সপ্তাহ বাকি। গ্রাহাম শুনলেন, এক ইন্ডিয়ান দার্শনিক স্টুডেন্ট হলে লেকচার দেবেন। শ্রীচিন্ময়ের বক্তৃতা শুনে গ্রাহাম অভিভূত। কোনোদিন ভারতবর্ষের আদি ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ইন্ডিয়ানটিকে খুব সিনসিয়ার মনে হল। পরেরদিন আরও একটা বক্তৃতা, সেই সঙ্গে ধ্যান সম্বন্ধে আলোচনা, গ্রাহামের মনে হল, ইয়োগার ভিতরে কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

শ্রীচিন্ময় চলে গেলেন, গ্রাহাম ডাল্টন এবার ইশারউডের রামকৃষ্ণ এবং আধ্যাত্মিক ভারত সম্বন্ধে বেশ কিছু বই পড়ে ফেললেন। ১৯৭২-এ খবর এল শ্রীচিন্ময় লন্ডনে আসছেন, সেখানে দু'জনের আবার দেখা। ইতিমধ্যে মাছ-মাংস-মদ এবং সিগারেট ছেড়ে দিয়ে মানসিক আনন্দ পেতে শুরু করেছেন গ্রাহাম। লন্ডনেই আলাপ হল বিখ্যাত গিটারবাদক জন ম্যাকলফলিন ও তাঁর স্ত্রী ইভের সঙ্গে, এঁরা দু'জনেই ইংরেজ, কিন্তু এঁদের সঙ্গীতসংস্থার নাম 'মহাবিষ্ণু অর্কেস্ট্রা'। ইভের একটা বাংলা নাম আছে—মহালক্ষ্মী। "আমার নিউইয়র্কে যাওয়ার সাধ রয়েছে শুনে ইভ বললো, তুমি চলে এসো, আমাদের অন্নম্ ব্রহ্ম রেস্তোরাঁয় একটা

কাজ হয়ে যাবে।"

গ্রাহাম ডাল্টন যখন নিউইয়র্কে এলেন তখন শিক্ষক শ্রীচিন্ময়কুমার ঘোষ দেশের বাইরে।

আবার ডাবলিনে ফিরে যাওয়া, শিক্ষকের পরামর্শে পরীক্ষায় বসা। তারপর আবার খেয়ালি জীবন। বাবা চিরকালই মার্কসিস্ট ভাবনার লোক, তাঁর ধারণা ইংরেজরা ভারতবর্ষকে অন্যায়ভাবে শোষণ করেছে। গ্রাহাম ডাল্টনের প্রথম চাকরি বিখ্যাত বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে। ভাল লাগল না। তারপর ডকের চাকরি। তাও ভাল লাগল না। তারপর কিছু ফরাসিকে ইংরিজি শেখানো।

বাঙালি পথপ্রদর্শক শ্রীচিন্ময়কে ডাবলিন থেকে ফোন করলেন ডাল্টন, তিনি বললেন, প্যারিসে যাও, সেখানে ইংরিজি শেখাও। "প্যারিসে গেলাম, তেমন সুবিধে হল না। এবার চলে এলাম নিউইয়র্কে, শ্রীচিন্ময় বুঝলেন আমার এই শহরেই একটা কাজ দরকার। ওঁর ছাত্রদের অনেকেই সারা দেশজুড়ে ছোট ছোট দোকান, রেস্তোরাঁ, লন্ড্রি, ছাপাখানা, কারখানা হেল্‌থ ফুড শপ চালায়। ওঁদের বিশেষত্ব চাকরির ব্যাপারে ছাত্ররা একটু সুবিধে পায়। এইসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, কিন্তু সবাই শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে, লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব যে দোকান চালাচ্ছে তার।"

এমনই এক রেস্তোরাঁ 'স্মাইল অফ দ্য বিওন্ড'—নিরামিষ খাবার, সেখানেই পার্টটাইম কাজ। ৮৬-১৪ পার্সনস বুলেভার্ডের এই ধরনের দোকানের টেকনিক্যাল নাম 'লাঞ্চেনেট'। এই সময় হল মেলজার বলে এক আমেরিকানের সঙ্গে আলাপ হল, শ্রীচিন্ময় তার নাম দিয়েছেন 'পাহাড়'। পাহাড় এখানেই এক বার্বারশপ চালায়, আমাকে বলল, আমার একজন সহকারী দরকার। কিন্তু এই কাজ কি শিক্ষিত লোকের ভাল লাগবে? আমি লাফিয়ে উঠলাম, নাপিতের কাজের সঙ্গে, শিক্ষার তো কোনো সংঘাত নেই। বরং অনেক সুবিধে, মানুষের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ, কাজ যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণই করা যায়। আমি পাহাড়ের পরামর্শে ছ'মাস খেটে নাপিতের লাইসেন্স নিয়ে নিলাম।"

পরে পাহাড় প্রেমে পড়ল, বিয়ে করল, বার্বারশপটা সে আমাকে প্রায় দান করে চলে গেল, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান সে আর চালাতে পারল না। সেই থেকে আমি এখানে মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছি। ভোরবেলায় উঠে ধ্যান করি, তারপর একটু হাঁটি, তারপর সকাল সকাল দোকান খুলি। আমি পাকিস্তান ভারতবর্ষ, বাংলাদেশে কখনও যাইনি, কিন্তু এখানে আমার দোকানে এই দেশগুলো নিত্য চলে আসে। বাঙালি দেখলেই আমি চিনতে পারি, বাংলায় বলি, আসুন। কেমন আছেন? কখনও বলি, 'আজ খুব ঠাণ্ডা', কখনও বলি, 'আজ খুব গরম', কখনও বলি, 'আজ কলকাতায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে'। খরিদ্দাররা এখন আর

অবাক হয় না, তবে খুশি হয়।"

"পাহাড় যে নাম দিয়েছিল বার্বারশপের, সেইটাই রেখে দিয়েছি। চার্জ একটু নিচের দিকে রেখেছি—রেগুলার হেয়ারকাট ৭ ডলার, দাড়ি ট্রিমিং ৪ ডলার, সিনিয়র সিটিজেনদের চুল ছাঁটতে আমি মাত্র পাঁচ ডলার নিই। কী হবে প্রচুর ডলার রোজগার করে? গোটা পনেরো খদ্দের দিনে এলেই খরচখরচা বাদ দিয়ে আমার ভালভাবে চলে যায়।

সুন্দরের দোকানে পাকিস্তানি, ভারতীয়, বাংলাদেশি ছাড়াও ফিলিপিনো, গ্রিক, ইতালিয়ান ও অবশ্যই মার্কিনীদের আনাগোনা।"

সুন্দর আমাদের বাংলায় কখনও না এলেও বাংলার বিশেষ ভক্ত। ওর ধারণা, বাঙালিদের মধ্যে কোমলতা আছে, যা গ্রিকদের মধ্যে একেবারেই নেই। ওরা অনেক রাফ ও কর্কশ। কিন্তু আকাশপাতাল তফাত দুই জাতের, এদেশে সারাজীবন থেকেও গ্রিকের মন সারাক্ষণ পড়ে থাকে ছেড়ে আসা জন্মভূমিতে, সম্ভব হলে সেখানেও একটা আস্তানা কিনে ফেলে এবং প্ল্যান করে শেষ জীবনে অবশ্যই স্বদেশে ফিরে যাবার। এরা ছেলেমেয়েদের গ্রিক স্কুলে পাঠায়, গ্রিক ভাষা শিখবে না বিদেশে আছে বলে তা হতেই পারে না।

সুন্দর বললেন, বাংলা দেশটা নরম পলিমাটির দেশ। যেমন দেশ তেমন মানুষ হয়, বাঙালিরা ভীষণ নরম। "এরকম সভ্য জাত আপনি দেখতে পাবেন না। শুধু ইতিহাস বাঙালিদের সঙ্গে রসিকতা করেছে। দেখুন ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে বাঙালিদেরই দীর্ঘতম সময়ের পরিচয়, এর ফল কি হয়েছে তা খুঁটিয়ে দেখা উচিত আপনাদের।" বাঙালিরা ভীষণ ইমোশনাল। অপমানিত হলে ঝট করে জ্বলে উঠতে পারে, তখন ভেবেচিন্তে কাজ নয়।

এরপরের মন্তব্য আরও চিন্তার বিষয়, "আমি এই দোকানে বসে কাজ করতে করতে বুঝতে পারি, গ্রিকরা এই দেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধে রয়েছে, কিন্তু বাঙালিরা এখানে থাকবার জন্যে আসে।" দুই প্রজন্মের বাঙালির মধ্যে কিন্তু অনেক দূরত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠদের দুঃখ, ছেলেমেয়েরা আর বাঙালি থাকছে না। আচরণে, জামাকাপড়ে, খাওয়াদাওয়ায়, চিন্তায় ভাবনায় বাঙালি বাবা-মায়ের অজান্তে আমেরিকা ঢুকে পড়েছে এখানকার বাঙালির লিভিংরুমে এবং বেডরুমে।" সিলেটি ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার দোকানের এই চেয়ারে বসে দুঃখ করে, 'আমি বাড়িতে রেগেমেগে চিৎকার করি, কিন্তু ছেলেমেয়েরা কেন আমার কথা শোনে না বলুন তো?' পরের দিন ছেলে চুল ছাঁটতে এসে বলে, 'ভাবছি, বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। অসহ্য শাসন বাবার।'

মজার ব্যাপারটা হল, বহু বছর থেকেও এখানে বাবা-মা একেবারে বাঙালি, কিন্তু ছেলে পাকা আমেরিকান—হট ডগ ভালবাসে, বেস বল ভালবাসে। তবে

একটা ভাগ্যের ব্যাপার, যতই আমেরিকান হোক, এদের মধ্যে মার্কিনী রুক্ষতা আসে না।'

সুন্দরের সঙ্গে আরও অনেক কথা হয়েছিল। সুন্দর বলল, "সকাল দশটায় দোকান খুলি, টিকিট না কেটেই, খরিদ্দারের মাধ্যমে কখনও গ্রিস, কখনও ইতালি, কখনও কলকাতা, কখনও ঢাকা ঘুরে বেড়াই। সকাল সাড়ে দশটায় সুযোগ পেলেই কফি বা হট চকোলেট তৈরি করে কাছাকাছি ডিভাইন এন্টারপ্রাইজের দোকানের তিন-চারজন বন্ধুকে ডেকে পাঠাই, কাজ কম থাকলে এখানে বসে বসে ইয়েটস পড়ি, বিবেকানন্দ পড়ি, বঙ্কিম পড়ি। সাড়ে ছ'টায় দোকান বন্ধ করে শ্রীচিন্ময় কেন্দ্রে চলে যাই, ওঁর অনেক বই, সেগুলো দেখাশোনা করতে ধৈর্য লাগে, সময় লাগে।"

মহাপণ্ডিত এই লোকটি কিন্তু এখনও ইন্ডিয়া দেখেনি। আমার মনে পড়লো, সারাজীবন বেদ বেদান্ত অনুবাদ করেও ম্যাক্সমুলর কখনও ইন্ডিয়া দেখেননি।

সুন্দরের বার্বারশপ থেকে বেরিয়ে মনে হল, কী আশ্চর্য ব্যাপার। এক শতাব্দী আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশের বার্বারশপে অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন সেই দেশেই একজন পণ্ডিত বাংলা শিখে, বাংলা নাম নিয়ে, তাঁর বই পড়ছে চুল ছাঁটার দোকানে বসে। হোটেলে ফিরে এসে সুন্দরের ফোন পেয়েছিলাম। তিনি বললেন, "আমি ভারতবর্ষ দেখিনি কথাটা ঠিক বলিনি, প্লেনে মালয়েশিয়া যাবার পথে বহু উঁচু থেকে ভারতবর্ষের মুখ দেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। একটু আর্থিক সামর্থ্য হলেই আমি কিন্তু একবার ইন্ডিয়া দেখে আসব।"

—